অন্দর
মহলের
গল্প

অস্থির সময়ের গল্প

অস্থির সময়ের গল্প

সম্পাদনা

সৌমিত্র লাহিড়ী
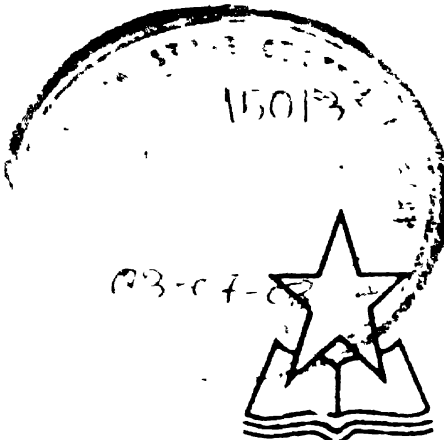
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

অস্থির সময়ের গল্প

ভয়ে ভয়ে কয়েকটি কথা।

ছেঁড়া কাঁথাব মতো অপবিচ্ছন্ন চেহাবায় পড়ে আছে ভাবতবর্ষ। স্বাধীনতাব পব পাঁচটি দশক অতিক্রম করে ছয় দশকেব মাঝামাঝি চলে এসেছি আমবা, কিন্তু নতুন জাতিসত্তাব বিকাশ ঘটল না আজও। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দেশ ছেড়ে যাওযাব সময যে ভযঙ্কব বিপদেব বিষ ছড়িয়ে গিয়েছিল তাব থেকে মুক্তি আমবা আজও পাইনি। স্বাধীনতাব অনেক আগে থেকেই আমাদেব দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হিংস্র হানাহানি ও অমানবিক বর্ববতাব নানা ঘটনা ঘটত। এ সবই দেশ ভাগেব পটভূমি বচনা কবেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিন্দু মুসলমানেব বিবোধ ব্যবহাব করে দেশটাকে টুকবো টুকবো কবতে সফল হয়েছিল। ইতিহাসেব নিবিষ্ট পাঠক মাত্রই জানেন জাতীয় স্তবে নীতি নির্ধাবণ ও নিযন্ত্রণেব ক্ষমতা ও অধিকাব ছিল যে বাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিসমূহেব তাবা প্রায সকলেই দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তব ও সামযিক লাভেব আশায দেশবিভাজন মেনে নিয়েছিল।

নেতৃবৃন্দেব ওপব স্তবে ক্ষমতাব অন্দবমহলে দ্রুত পৌঁছে যাওযাব তাগিদ থাকলেও, সাধাবণ মানুষ বিভাজনেব অবর্ণনীয় ফলাফল মেনে নেওযাব জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দশভাগ মানুষেব এপাব থেকে ওপাব ওপাব থেকে এপাব চলে আসা এবং চলে যাওযাব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আব অপমানেব অমানবিক জীবন মেনে নিতে বাধ্য হওযাব দুঃসহ পবিণতিতে সাধাবণ মানুষেব যুক্তি বিচাববোধ ও বাজনৈতিক চেতনাব সামান্য শিথিলতাব সুযোগ পেলেই উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি পা বাখাব জাযগা খুঁজতে শুরু করে।

স্বাধীনতাব পব ভাবতে ধর্মনিবপেক্ষতাব নীতি সংবিধানেব স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু ব্যবহাবিক জীবনে প্রযোগেব প্রশ্নে শাসকশ্রেণীব মধ্যে দোলাচলতা সৃষ্টি কবেছে এক মাবাত্মক বিপদ। সবভাবতীয সববৃহৎ বাজনৈতিক দল কংগ্রেস একটানা অবিচ্ছিন্ন প্রায ৪০ বছব কেন্দ্রীয সবকাব পবিচালনা কবেছে। মাঝে মোবাবজি দেশাই ভি পি সিং চন্দ্রশেখব দেবগৌড়া গুজবালবা শাসনভাব হাতে তুলে নিলেও দেশজুড়ে কংগ্রেস দলই শাসক শ্রেণীব প্রতিনিধিত্ব কবেছে। দলগতভাবে জাতীয কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি বপাযণ কবেনি, গ্রহণ বা অনুমোদনও কবেনি। কিন্তু অস্বীকাব কবাব কোনো উপাযও নেই যে, সংকীর্ণ বাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা সংকীর্ণতা ও জাত-পাত ধর্ম বর্ণেব বক্তাক্ত অভিযান নির্মূল কবাব জন্য প্রযোজনীয ভূমিকা পালনে তাব অনাগ্রহ সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহকে সংঘবদ্ধ হতে পবোক্ষে সাহস জুগিয়েছে। স্বাধীনতাব পববর্তী পাঁচ ছয় দশকে তাই সাম্প্রদাযিকতা নির্মূল হওযাব পবিবর্তে প্রবল থেকে প্রবলতব রূপ নিয়েছে।

সম্প্রতি সাম্প্রদাযিকতাব বিপদ আবও বেড়েছে। শাসক দলেব প্রত্যক্ষ মদতে দাঙ্গাবাজ ও সাম্প্রদাযিক শক্তি ধর্মেব নামে সাধাবণ মানুষকে বিপন্ন কবে তুলছে। ধর্মেব জিগিব তুলে সাধাবণ মানুষকে ভাগ কবাব এক বিপজ্জনক খেলা শুরু হয়েছে।

মানুষকে তাব মানুষ পবিচয ভুলিয়ে ক্রমশই হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান মানুষ

রূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে, তাদের নতজানু করে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মানুষের অনুগত ভৃত্যে পরিণত করার। তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করতে পারলে, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তি সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে পারবে।

ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তি আওয়াজ তুলছে, ভারতে থাকতে হলে মুসলমানদের ভারতীয় হতে হবে, ভারতীয় জীবনধারা অনুসরণ করতে হবে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হবে এবং ভারতীয় চিন্তায়-চেতনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তা না হলে ভারতে বসবাসের সুযোগ পাওয়া যাবে না।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এ-রকম নিম্নরুচির ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় হতে হবে মানে কী? মুসলমানরা কি বিদেশি? তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী এদেশে বসবাস করছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংগীত-স্থাপত্যকলা-শিল্প-সংস্কৃতি-কৃষি সর্ব ক্ষেত্রে পাশাপাশি চলছেন, চর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন, দেশকে সমৃদ্ধ করছেন, আর শুধুমাত্র ধর্মের কারণেই তাঁরা বিদেশি? তাঁরা ধর্মের কারণেই দেশপ্রেমিক হতে পারবেন না? দেশদ্রোহিতাই তাঁদের 'জাতিগত' পরিচয় হবে!

দেশপ্রেমিক মুসলমান সাধারণ নিরপরাধ মানুষের জীবনে এর চেয়ে মর্মান্তিক অপমান এবং হৃদয়হীন আচরণ আর কিছু হতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, শিক্ষিত সাধারণ মানুষও মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অথচ ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক সমস্যাই আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। ধর্মের চেয়েও বড় সমস্যা, মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা।

এক অদ্ভুত আঁধার আমাদের সামনে। এই অস্থির সময় আমাদের পটভূমি। এই আঁধার ঠেলে ঠেসে এই অস্থিরতার সময়ে জীবন যেমন, তারই এক খণ্ডচিত্র আমরা উদ্ধার করতে চেয়েছি। ছেঁড়া কাঁথার মতো অপরিচ্ছন্ন চেহারায় পড়ে-থাকা ভারতবর্ষে জীবনের প্রতিলিপি, আমাদের মানবমনের ইঞ্জিনিয়ার লেখকরা কীভাবে আঁকছেন, তাঁদের অনুভূতির বর্ণমালায় অস্থির সময় কতটা ধরা পড়েছে, তাই আমরা জরিপ করতে চেয়েছি এই সংকলনে।

আঁধার আমাদের তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য ধর্মের জিগির, সবকিছু ভাগ করার মরিয়া প্রচেষ্টা। রাজ্য ভাগ, রেল ভাগ, কলকারখানার মালিকানা ভাগ, বহুজাতিক সংস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুনাফা ভাগ, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার ভাগ থেকে শুরু করে মানুষকে এখন তার আদিম অস্ত্র দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা হচ্ছে যার মূল লক্ষ্য মানুষের সমবেত উদ্যোগকে ধ্বংস করে দেওয়া।

লেখক-শিল্পীরা মানবমনের কারিগর। প্রতিদিনের জীবন যাপনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা নির্মাণ করেন সময়ের চরিত্র। মানুষের ক্রোধ-ক্ষোভ-জ্বালা-যন্ত্রণা শিল্পীর তুলিতে, সাহিত্যিকের কলমে বাঙ্ময় রূপ লাভ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা যেমন সত্য, তার বিরুদ্ধে মানুষের মিছিলের স্রোতও সত্য। বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক শোষণ, শ্রেণী নিপীড়ন যেমন বাস্তব, একইরকমভাবে বাস্তব তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম। আপাত দৃষ্টিতে মানুষের

সংগ্রামকে অমানবিক বর্বরতায় অবরুদ্ধ করে অশুভ শক্তি হয়তো সাময়িকভাবে দেশজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার ক্ষয়ে যাওয়ার অন্তর্লীন স্রোত আপাতদৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই।

লেখক-শিল্পীরা সংবেদনশীল মানুষ। তাঁরা মানবসমাজের অন্তর্লীন স্রোত অনুভব করতে পারেন। তাঁরা শুনতে পান নতুন কালের নূপুরধ্বনি। তাই হৃদয়হীন অমানবিকতার দিনগুলিতে মানবিকতার আশ্রয় খুঁজতে বারবার লেখক-শিল্পীদের কাছে ফিরে ফিরে যেতে হয়।

আমরা লক্ষ করছি সময়চেতনা লেখক-শিল্পীদের মধ্যে একই রকম না থাকলেও অনেকেই আশ্চর্য দক্ষতায় নিজের সৃষ্টিসম্ভারে প্রতিবিম্বিত করছেন সময়ের জলছবি। তাঁদের একক-বিচ্ছিন্ন তৎপরতাগুলির থেকে সামান্য কিছু নমুনা সংগ্রহ করে একত্রিত করার চেষ্টা আছে এই সংকলনে।

'অস্থির সময়ের গল্প' সংকলিত করার সময় লেখকদেরও যুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কোনও সন্দেহ নেই, প্রথিতযশা লেখক-শিল্পীদের অনেকেই এখনও এক ধরনের 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' দর্শনে বিশ্বাস রেখে হৃদয় দেওয়া-নেওয়া আর শরীরের ব্যাকরণ নির্মাণ করার কাজেই নিজের প্রতিভা ও দক্ষতা সীমাবদ্ধ রাখছেন। আবার এমন লেখকের অভাব নেই, যাঁরা রাজনীতিতে আপাদমস্তক জড়িয়ে আছেন, মিছিলে-সভায় সোচ্চারে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন অথচ দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের সাহিত্যে তার মানবিক প্রতিফলন ঘটাতে পারছেন না। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা সাহিত্যে রাজনীতির ছায়াপাতে বিশ্বাস করেন না, সচরাচর এ-সব প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন না, অথচ তাঁদেরও কলম থেকে আশ্চর্য মানবতার স্পন্দন অনুভব করা যায়। তাই আমরা লেখকের চেয়েও গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম লেখার ওপরই। খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আড়ালে থেকে যাওয়া কোনো মুখ খুঁজে পাওয়া যায় কি না। 'অস্থির সময়ের গল্প' সংকলনের জন্য গল্প দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছিল, 'আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিকতা-প্রাদেশিকতা-সংকীর্ণতা ইত্যাদি নানা সমস্যায় দীর্ণ এবং বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক অসাম্য ও শ্রেণী নিপীড়নের অমানবিকতায় বিপন্ন অস্থির এই সময়ের প্রতিলিপি সমকালীন লেখক-শিল্পীদের কলমের আঁচড়ে নানাভাবে বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করছে। তারই এক নির্বাচিত খণ্ডচিত্র হিসাবে সংকলনটি প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সংকলনটিকে প্রতিনিধিস্থানীয় করে তোলার জন্য আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশা করি।' গল্প নির্বাচনের পদ্ধতিতেও একটু ভিন্ন মাত্রা যোগ করার চেষ্টায় বলা হয়েছিল, 'অস্থির সময়ের গল্প' সংকলনে সংকলিত করার জন্য আপনার একটি সাম্প্রতিক গল্প দিতে অনুরোধ জানাই। গল্পটি অপ্রকাশিত হলে ভালো হয়।'

লেখকদের কাছে আরও একটা অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছিল, 'প্রতিদিন অসংখ্য ছোটগল্প ছোটবড় নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে যার বেশিরভাগ গল্পই আমাদের অনেকের নজর এড়িয়ে যায়। কোনও ব্যক্তির পক্ষেই সব গল্প সংগ্রহ করা বা পড়ে ওঠা সম্ভব হয় না। ফলে ভালো গল্পও অনেক সময় সংকলিত হওয়ার সুযোগ লাভে বঞ্চিত

হয়। তাই আপনার কাছে একান্ত অনুরোধ, আপনার বিবেচনায় এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে মনে করছেন এমন পাঁচটি গল্পের সন্ধান আমাদের দিন। আপনার প্রস্তাবিত গল্পগুলি কোন্ পত্রিকায়/গ্রন্থে পাওয়া যাবে তা অনুগ্রহ করে উল্লেখ করবেন।'

এই অনুরোধের মূল লক্ষ্য ছিল বহুজনের অনুসন্ধানে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিকে একত্রিত করার সুযোগ গ্রহণ করা এবং লেখকদের আরও একটু সম্পৃক্ত করে নেওয়া। আমরা লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা সফল হয়েছি, আবার অনেকাংশে সফল হইনিও। কয়েকজন লেখক তাঁদের অনুসন্ধান ও বিচারবোধ প্রয়োগ করে তাঁদের সুপারিশ পাঠিয়েছেন, কেউ কেউ নিজেই গল্পটি সংগ্রহ করে দিয়ে গেছেন। আবার অনেক লেখকই ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন—কোনও সুপারিশ পাঠানোর তাগিদ অনুভব করেন নি। যে-লেখকরা কষ্ট-স্বীকার করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। সময়-চেতনা থেকেই তাঁরা এ-ভাবে এগিয়ে এসেছেন। অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপট বদল করার প্রয়োজন অনুভব করেই তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। আর যাঁরা সময় মতো সুপারিশ পাঠাননি, আমরা ভবিষ্যতে আবারও তাঁদের কাছে সাহায্য চাই, আমাদের বিশ্বাস তাঁরাও এগিয়ে আসবেন। সাধারণভাবে, এই পদ্ধতিতে সংকলন করা হয় না, একটু নতুনত্ব ছিল, হয়তো সে কারণেই অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেন নি। আবার এমনও হতে পারে, তাঁদের বিবেচনায় অনুমোদনযোগ্য গল্প নেই।

সে যাই হোক, আমরা লেখকদের সুপারিশ থেকেও কয়েকটি গল্প এই সংকলনের জন্য গ্রহণ করেছি। আয়তন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে দেখে আরও কয়েকটি গল্প আমরা এই মুহূর্তে গ্রহণ করতে পারলাম না, অন্য কোনও সময়ে তা যথাযথ মর্যাদায় ব্যবহার করা হবে।

'অস্থির সময়ের গল্প' সংকলনটি প্রচলিত ধারার সংকলন নয়। এই সংকলনে প্রাধান্য পেয়েছে সময়। কোনও সন্দেহ নেই আমরা খুব নিখুঁতভাবে খুঁজে খুঁজে গল্প নির্বাচন করতে পারিনি, পরিচিত এবং অতি জনপ্রিয় লেখকদের ওপর থেকেও আমাদের নজর খুব সরে যায়নি। তবে সাধারণভাবে লেখকদের অনুরোধ করা হয়েছিল, বহুবার বহু সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন গল্প বিষয়ের গুণে মনোনয়ন দাবি করলেও পরিহার করে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাঠক যেন একই গল্প বারবার কেনার জুলুম থেকে রেহাই পান। আমাদের ধারণা খুব বেশি পুনরাবৃত্তি নেই।

প্রবীণ লেখক বিমল করের একটি আশ্চর্য গল্প আমরা এই সংকলনে দিতে পেরে আনন্দিত। গল্পটি ৫৫ বছর আগে বারাণসী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা' পত্রিকায় (১৩৫৩-৫৪ সালের আষাঢ়-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় বিমল করের কোনও গল্পসংকলনেই এটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দীর্ঘদিন পর গল্পটি পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। লেখক 'অস্থির সময়ের গল্প' সংকলনে প্রকাশের জন্য সানন্দে অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সময় যেহেতু সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র হানাহানিতে সমাচ্ছন্ন 'অস্থির সময়ের গল্প' সংকলনের জন্য অধিকাংশ লেখকই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গল্প দিয়েছেন। কেউ ভুল করে এই সংকলনকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গল্পের সংকলন বলতে চাইলে অবাক

হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাতে বিভ্রান্তির সামান্য অবকাশ থেকে যাবে। প্রবীণ কয়েকজন লেখকের এমন কয়েকটি গল্প নেওয়া হয়েছে যার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন প্রবীণা লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর 'জন্মদিন', কিংবা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর 'আলমারি', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'দক্ষিণের জানালা এবং কাটা মুণ্ডুর গল্প', মতি নন্দীর 'বুড়ো এবং ফুচা'। সাম্প্রদাযিকতা নয়, এই সব গল্পের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের অন্তর্লীন সংকটের ছবি স্পষ্টতা পেয়েছে। প্রবীণ সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় দেশভাগের পটভূমিকায় অনেক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। সংকলিত গল্পটি তাঁর সেই ধারার একটি চমৎকার সৃষ্টি। বিশ্বাযন, অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণী নিপীড়নের কয়েকটি মাত্র গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্বীকার করাই উচিত যে, বিশ্বায়নের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া গল্পের আঙিনায় এখনও সেইভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে এক ধরনের উদাসীন মনোভাব আমাদের সাহিত্যজগতে খুব দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে। আরও বিষয়-বৈচিত্র্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ গল্পের প্রতীক্ষায় আমাদের থাকতে হবে।

সংকলনটি হাতে নিলেই বোঝা যাবে সংকলন পরিকল্পনায় ছক ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা আছে। সাধারণভাবে প্রবীণ থেকে নবীন অথবা নবীন থেকে প্রবীণ গল্পকারের বয়সের ক্রম অনুসারে সংকলন সাজানো হয। কেউ কেউ নাম অথবা পদবীর আদ্যাক্ষর ধ্রুবে ধরে বিন্যস্ত করে থাকেন। আমরা সেই পথে হাঁটি নি, যেহেতু লেখক নয়, লেখা এবং সময়ের স্বরলিপিই এখানে প্রধান। শ্রদ্ধেয় বিমল কর ঘটনাচক্রে বয়সে প্রবীণ এবং লেখাটির অনন্যতাযও বিশেষভাবে উজ্জ্বল, তাই তাঁকেই সূচনায় রাখা হয়েছে। প্রবীণ সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ ও বিভাজনের বিরুদ্ধে খুবই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন, কলম ধরেন মানবিকতার সপক্ষে। সংকলনের শেষ গল্প সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দৈববাণী' ও জ্যোতিষের অন্তঃসারশূন্যতাকে কেন্দ্র করে রচিত। চমৎকার এই ছোটগল্পে সমকালের উচ্চবিত্ত সমাজের বিস্ময়কর মানসিকতার উন্মোচন পাঠকসমাজকে চমকে দিতে পারে।

গল্প বা গল্পকার ধরে আলোচনার সম্ভবত কোনও প্রয়োজন নেই। পাঠক পড়েই গল্পের অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন। বড় সংকলন প্রকাশ করার জন্য যে সময় ও প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়, আমাদের হাতে তা ছিল না। অত্যন্ত দ্রুত এই বিরাট সংকলনের পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হয়েছে। তাই অনেক ত্রুটি ও ঘাটতি থেকে গেল। আরও আগে বিচার-বিশ্লেষণ করা শুরু হলে সংকলিত কয়েকটি গল্প পরিবর্তন করে ঐ লেখকদেরই আরও অর্থবহ ভালো গল্প হয়তো নেওয়া যেত। লেখকদের গল্প বাছাই করে দিতে বলায় লেখকরা একটু অসুবিধায় পড়েছেন। কেউ কেউ নিজের সৃষ্টির বিচারে খুবই ব্যর্থ হন। কয়েকটি লেখা লেখকদের সুপারিশে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার সবগুলিই খুব উন্নতমানের তা বলা ঠিক হবে না। তবে এরই মধ্যে আনসারউদ্দিনের 'শিল্পী' গল্পটি এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

গল্প সংকলন করতে বসলে অজস্র গল্প ও গল্পকারের নাম সহজেই চলে আসে যার মধ্যে থেকে সীমাবদ্ধ পরিসরে মুদ্রণের জন্য গল্প বাছাই করা খুবই শক্ত কাজ। অনেক গল্পকারকে বাদ দিতে হয়েছে শুধুমাত্র আয়তনের কথা বিবেচনা করে। কোনও কোনও

লেখক দীর্ঘ লেখা দিয়ে বেশ বিপদেও ফেলেছেন, গল্পের প্রয়োজনে বড় পরিসর তাঁদের দিতে হয়েছে, কিন্তু তাতে সম্পাদকের অস্বস্তি বেড়েছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাঁদের গল্প নিতে পারলাম না, আগাম তাঁদের কাছে মার্জনা চেয়ে রাখছি। সংকলনের গল্প নির্বাচন ও প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে অনেকেই সাহায্য করেছেন। গল্পকার শচীন দাশ, অনিশ্চয় চক্রবর্তী, বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, শুভময় মণ্ডল, কাজী কামাল নাসের, শ্যামল জানা, পার্থ মুখোপাধ্যায়, মধুমিতা মুখোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র প্রমুখ সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অস্বস্তিতে ফেলার কোনও কারণ নেই। এঁরা সকলেই এই সংকলনের জন্য দায়িত্ববোধে এগিয়ে এসেছিলেন। অনিশ্চয় চক্রবর্তী ও বিদিশা ঘোষ দস্তিদার দিনের পর দিন প্রেসে গিয়ে আন্তরিক তৎপরতায় সাহায্য না করলে নির্দিষ্ট সময়ে সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। সংস্কৃতি কর্মী শতদ্রু চাকী এই সংকলনের জন্য সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটি নিয়ে এসেছিলেন যেদিন, সেদিনই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে, অসুস্থ শতদ্রু গল্পটি সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ তিনি নেই, তাঁর জন্য গভীর বেদনা অনুভব করছি।

'অস্থির সময়ের কবিতা'-র মতোই, অস্থির সময়ের গল্প প্রকাশ করার কাজে নিরন্তর সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি সি পি আই (এম) নেতা অগ্রজপ্রতিম শ্যামল চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তাঁর উৎসাহ আমাদের উজ্জীবিত করেছে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির অন্যতম কর্ণধার নন্দলাল চ্যাটার্জি এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা নানাভাবে পরামর্শ ও সাহায্য দিয়েছেন। তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

২৯ জানুয়ারি, ২০০৩ — **সৌমিত্র লাহিড়ী**

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

অস্থির সময়ের কবিতার পর অস্থির সময়ের গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কলকাতা বইমেলা শেষ হওয়ার মুখে ছেপে এসেছিল অস্থির সময়ের গল্প। আশ্চর্যের বিষয় ফের বইমেলা আসার আগেই দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। দ্রুততায় কাজ সারতে হয়েছিল বলে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ এবং বানান অসমতা থেকে গিয়েছিল, এ সংস্করণে তা সংশোধন করা হল। এর পরও যদি প্রমাদ থেকে যায় তাহলে তা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সংশোধনের কাজে সহায়তা করেছেন সাহিত্যিক শুভময় মণ্ডল এবং ন্যাশনাল বুক এজেন্সির কর্মী অশোককমল বসু। তাদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিমল কর এবং সত্যপ্রিয় ঘোষ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

২০ ডিসেম্বর ২০০৩ — **সৌমিত্র লাহিড়ী**

তৃতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে

অস্থির সময়ের গল্প আবার ছাপা হচ্ছে, আমাদের কাছে এটা শুধুমাত্র একটি সুসংবাদ নয়, বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণও। প্রথম মুদ্রণের সময় আমরা একটু শঙ্কায় ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে সময়কে চিনে চিনে জীবন নির্মাণের সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে। তাই হয়ত এরকম গ্রন্থের মুদ্রণ ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। পাঠকদের কুর্নিশ জানাতেই কয়েকটি কথার উল্লেখ মাত্র, কারণ তৃতীয় মুদ্রণে কোনো সংশোধন বা পরিমার্জন করা হয়নি।

প্রেসে যাওয়ার সময় এই সংকলনের অন্যতম গল্পকার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসানের দুঃসংবাদ এলো। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

১০ জানুয়ারি ২০০৬ — **সৌমিত্র লাহিড়ী**

অস্থির সময়ের গল্প

অন্তরে

বিমল কর

রাত হয়ে এল। নয়, দশ কে জানে কত! গোলমাল একটু থেমেছে। কলাবাগানের যে কোনটায় টিনের শেড্ দিয়ে লোহা লক্কড়, ভাঙা কলাইকরা মগ, ছেঁড়া ফাটা রবারের বুটগুলো জড়ো করে গুদোম করা ছিল, তার মধ্যে থেকে একটা লোক সন্তর্পনে মাথা বাড়াল।

স্তূপীকৃত সেই জঞ্জালের মধ্যে থেকে তার মাথাটা একটা তোবড়ানো গামলার মতন মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ তেমনি স্থির বিসদৃশ থাকার পর লোকটা আবার মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। যেন খুব সাবধানে একটা বেড়াল এগিয়ে আসছে।

লোকটা যতই সাবধানে আসুক, তার সামনে এমন একটুও পরিষ্কার রাস্তা ছিল না যাতে স্বচ্ছন্দে সে আসতে পারে। বাধ্য হয়েই তাকে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সামনে একটু পথ করে এগুতে হচ্ছে। হাত, হাঁটু রগড়ানির দরুণ ছিড়ে গেছে, কেটে গেছে। জ্বালা করলেও, একটু জিরিয়ে যে হাত বুলোবে কাঁটা ছেঁড়া জায়গাগুলো সে ধৈর্য তার নেই। কী করে থাকবে?

আটাশ ঘন্টারও বেশি তার পেটে একফোঁটা জল পড়েনি। পেটের মধ্যে নাড়ীভুড়িগুলো কেউ যেন মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে। পেট থেকে ব্যথাটা পাক দিয়ে উঠে বুকের কোলে ছড়িয়ে পড়ছে। ঝিম ঝিম ক'রে মাথা। হাত পা গুলো অবশ অসাড়।

বার কয়েক পিত্তিবমি করার পর বিকেল থেকে মুখে থুতু উঠছিল না।

অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় যতটা সম্ভব সতর্ক হ'য়ে সে এগুতে লাগল।

হাত লেগে কোথায় যেন কী সরে গেল। বহুরূপী বিরোধিত বিশ্রী একতাল শব্দ। সমস্ত জায়গাটা শব্দায়িত হয়ে উঠল। সাপের ছোবল দেখার মতন চমকে লোকটা পিছিয়ে এল। স্কুলের ছুটির ঘন্টা যেমন বেয়াড়াভাবে বাজে, তার বুকের মধ্যেও তেমনি করে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। ঘোলাটে চোখ দুটোও শেষ শক্তিটুকু নিয়ে জ্বল জ্বল করে উঠল। পাঁচ, দশ প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে যাবার পর লোকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক্, কেউ আসছে না!

অবশেষে! এক সময় লোকটা কলাবাগানের মধ্যে এসে পড়ল। ঠান্ডা পাতাগুলো মুখে জল দেওয়ার মতোই আরাম দিতে পারে আগে কে জানত! খানিকটা কলাপাতাও .সে দাঁতে চিবিয়ে পরখ করল। না, বড় বেশি কষা। শুকনো জিব আরো শুকিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হল না।

কলাবাগানের বাইরে এসে দাঁড়াতেই উত্তর কোণের লাল আভা চোখে পড়ল।

আগুন জ্বলছে। শিখা আর বাঁশের কুণ্ডলীর মধ্যে স্ফুলিঙ্গগুলো ছিটকে উঠছে। মাঝে মাঝে বিশ্রী শব্দ। বুঝি কোনো বাড়ির কড়ি, বরগা ফাটল কী জানলা দরজা। যদি বস্তি হয়, কথাই নেই, ঘুণ ধরা বাঁশগুলো চৌচির হয়ে গেল।

দূরে আবার একটা গন্ডগোল, ফাঁকায় থাকা উচিত নয়, যেমন করে হোক একটু জায়গা আর একটু খাবার জোগাড় করতেই হবে।

সামনের সরু অন্ধকার গলিটা ধরেই ও এগিয়ে চলল।

বোধ হয় কুড়ি গজও লোকটা এগোয় নি, তার মনে হল সামনে থেকে জনকয়েক লোক আসছে। অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করবার যো নেই। তবে পায়ের শব্দ আর ফিস্‌ফাস শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াল। কান পেতে শুনল কেউ আসছে কি না! এমন সময় দূরে টর্চ জ্বলে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের বাড়িটার মধ্যে সে ঢুকে পড়ল।

বোধ হয় ফ্ল্যাট বাড়িই হবে। ঘোলা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

প্রায় ছুটেই ও এগুচ্ছিল,—হঠাৎ পায়ে কী জড়িয়ে যাওয়ায় হোঁচট খেয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠিকরে পড়ল.....সংগে সংগে একটা মৃদু আর্তনাদ। ভীত, আর্ত, ক্ষীণ। আর্তনাদটা যেন ঝিলিক মেরেই থেমে গেল। লোকটা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। দেওয়ালে পিঠ ঘেঁষে সেও থমকে দাঁড়াল। কে.....কে...শব্দ করল।

আবার ভয়। সর্বাংগে যেন বরফের সাপ কিলবিল করে উঠল।

দুই পক্ষই চুপ। নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আর সে নিশ্বাসের শব্দ দু'জনে দু'জনেরই শুনতে পাচ্ছিল। দু'জনেই উপলব্ধি করেছে দু'জনের উপস্থিতি কিন্তু কেউ কাউকে ভয়ে কিছু প্রশ্ন করতে পারছে না।

কতকটা সময় কেটে গেল।

দৌড়ে আসা লোকটার শেষ পর্যন্ত ভয় ভাঙল। যেই থাক এখনো পর্যন্ত যে এগিয়ে আসেনি সে নিশ্চয়ই ভয় করবার মতন কেউ নয়। কে? নিশ্বাসের সুরে লোকটা প্রশ্ন করলো। অনেকক্ষণ কোন উত্তর নেই। কে? এবার আগের চেয়ে জোরে অথচ মৃদু সুরে প্রশ্ন হল।

'আমি!' ক্ষীণ ভীতার্ত স্বর।

'আমি, আমি কে?'

'আ—মি—'। স্বরটা কেমন দ্বিধাগ্রস্ত জড়ানো। কী বলবে ঠিক করতে পারছে না, শেষ পর্যন্ত — 'আমি—মানুষ, মেয়েমানুষ!'

'মেয়েমানুষ!' লোকটার গলায় বিস্ময় বুঝি অন্য পক্ষের আরো ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

'আমায় বাঁচা—!' মিনতি আর কাকুতিতে তার অশ্রুরুদ্ধ স্বর অর্ধস্ফুট।

'কে-কাকে বাঁচায়! আমিও তোমার কাছে ও কথা বলতে পারি!" লোকটা বলল 'এটা কার বাড়ি—তোমার?'

'না!' মেয়েটি জবাব দিল।

'তবে— ?'
'জানি না।'
'একা পালিয়ে বাঁচতে এসেছ ?'
'হ্যাঁ —।'
'আমিও তাই।'
চুপচাপ খানিকটা সময় কাটল।
লোকটা শেষে আবার কথা বলল, 'এমনি করে কতক্ষণ আর থাকব ? দেড় দিন পেটে কিছু পড়ে নি। মালের গুদামে একা লুকিয়েছিলাম।...'
'আমিও তাই। দেড় দিন আমিও কিছু খাইনি।'
'দিনের বেলায় বেরোবার চেষ্টা করলে না কেন ?'
'উপায় থাকলে করতাম।'
দুজনে আবার খানিকটা চুপচাপ থেকে কথা কয়ে উঠল।
'কী করা যায়— ?'
'কিছুই ভেবে পাচ্ছি না—।'
'আমি পেয়েছি। এটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে বলবে না ? খোঁজ করলে দড়ি পাওয়া যাবে অনেক। গলায় লাগিয়ে ঝুলে পড়ি।' লোকটা রসিকতা করল না, উপায়ান্তর না দেখে অতি আত্মীয়তার কথাটা বলল, তবুও পারা গেল না। অপর পক্ষের সাড়া নেই, নিঃশব্দে কী যেন ভাবছে।
'এ পাড়ায় আমার বাড়ি না হলেও এ রাস্তা দিয়ে অনেকবার গিয়েছি। নিচে কতকগুলো মিস্ত্রি-মজুর থাকত। খোঁজ করলে খাবার কিছু পেতে পারা যায়—।' শেষ পর্যন্ত মেয়েটি বলল।
লোকটির পেটে আবার সেই পাক দেওয়া তীব্র ব্যথাটা জেগেছে।
'খোঁজ করলে তো অনেক কিছুই পেতে পারা যায়। বাইরের লোকগুলো যদি খোঁজে, আমাদের এখানে জবাই করবার জন্যে পেতে পারে'—যন্ত্রণাবিদ্ধ তিক্তস্বরে সে বলল, 'আলো আছে ?'
'না।'
'না তো সারাদিন করছিলে কী—খোঁজ করতেও পারো নি ?'
'আমি সন্ধেবেলা এ বাড়িতে এসেছি।'
লোকটার খেঁকানো স্বর। অপর পক্ষের ভেজা গলা।
'বেশ করেছ। এখন বসে থেকে একটু একটু করে ম'রো।'
'তুমি— ?'
'আমিও মরব।'
সেই নিটোল অন্ধকারে দুই নিঃশব্দ প্রেতের মতন তারা অনেকক্ষণ বসে থাকল।
এক-একটা মিনিট তো নয়, যেন এক এক ফোঁটা গলানো মোম কেউ তাদের ঘিলুতে ছিটিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি যদিও বোবার মতন স্তব্ধ, লোকটা মাঝে মাঝে কাতরে উঠছে।

মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত লোকটা উঠল। 'তুমি এসো। আমি একটু এগিয়ে দেখি?'

'বাইরে যাবে?' ভীতার্ত স্বর।

'না ভেতরে। বাড়ি তো ফাঁকা। এগিয়ে যেতে বাধা নেই। চাই কি আমাদের মতন আরো কোনো হতভাগাকে পাওয়া যেতে পারে।'

'আমার ভয় করছে, আমিও তোমার সংগে যাব!'

'ভ-য়?' লোকটা বুঝি অন্ধকারেই হাসল। 'আচ্ছা এসো!'

অন্ধকারে দুজনেই এগুতে লাগল। লোকটার হাত এমনভাবে তার সংগী আঁকড়ে ধরেছে যাতে তার পক্ষে যে কোনো সময় টলে পড়ে যাওয়া সম্ভব।

'অত জোরে আঁকড়েছো কেনো? গা-মাথা টলছে, শেষে যে তোমার গায়েই টলে পড়বে।'

খানিকটা গিয়েই সামনে বাধা। হাত বুলিয়ে বুঝল দেওয়াল। বাঁদিকে পা বাড়াবার পথ পাওয়া গেল।...আর তারপরই দুজনেই অবাক.....পথটুকুর শেষে ফাঁকা উঠোন। আলো এসে প'ড়ছে। দূরে যে আগুন জ্বলছে তার আভা।

উঠোনের আলোতে দু'জনে এসে দাঁড়াল। অর্ধেকটা ভয় এই আলোয় যেন উবে গেল। ইস্—কী আগুনটাই ধরিয়েছে!

পশু! মেয়েটি স্বগতোক্তি করল।

উঠোনের এক কোণে টিনের উনুন, চারদিকে এঁটোকাঁটা ছড়ানো।

জলের কলও চোখে পড়ল।

তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতন ওদের চোখ দুটো ঝলসে উঠল।

কলের মুখে মুখ লাগিয়ে ওরা জল খেল—যতটা পারা যায়। থাবা থাবা করে জল দিল মুখে, ঘাড়ে, মাথায়। আঃ কী আরাম!—

পাশে একটা ছোট ঘর। তালা বন্ধ।

'রান্নাঘর।' মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে বলল।

'তালা বন্ধ।'

'ভাঙা যাবে না?'

'ভাঙতেই হবে!'

শুধু হাতে লোকটা একবার চেষ্টা করল। ঝিমধরা হাত তাতে আরো কনকনিয়ে উঠল। খোঁজখুঁজি করে মেয়েটি নিয়ে এল একটা লোহার পুরু শিক। তালার মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দুজনে দুদিকে চাপ দিল। শিক ঢুকিয়ে শাড়ীর আঁচলটা ভাগাভাগি করে ধরবার জায়গাটা ওরা জড়িয়ে নিয়েছিল যাতে সমস্ত শক্তিটুকু তালা ভাঙার কাজে ব্যয় করা যায়।

বার কয়েক চেষ্টা করার পর তালা ভাঙল।

বিরাট ভুল। রান্নাঘর নয়, এমনি একখানা ছোটো ঘর। তবে মেয়েটি যা বলেছিল কতকটা ঠিক। যার বাড়ি তৈরি হচ্ছিল তার সরকার বা দারোয়ান থাকত এখানে। নিজের হাতেই রান্না-খাওয়া করত।...

মাটির হাঁড়ি আর টিনের কৌটো খুঁজে পাওয়া গেল, খানিকটা চিড়ে, চাল, গুড়,

শুকনো কাগজি নেবু ইত্যাদি। একটা দেশলাইও।

মাটির যে হাঁড়িটাতে চিঁড়ে ছিল, সেটা নিয়েই ওরা বসে পড়ল। শুকনো চিঁড়ে আর গুড়। কয়েক থালা খেয়েই দুজনে যেন ঝিমিয়ে পড়ল। শুকনো চিঁড়ে গলা দিয়ে নামছে না। সমস্ত মুখ গলা, আর গালে জড়িয়ে বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আবার সেই কলের কাছে যাওয়া। পেটভরে জল খাওয়া।

'চিঁড়েগুলো ভিজিয়ে দেবো!'

'তাই দাও! এখন তো আর খেতে পাচ্ছি না, খানিক পরে হয়তো খিদে পাবে।'

চিঁড়ের হাঁড়িটা এনে জল ভর্তি করল মেয়েটি।

হঠাৎ অসংখ্য কণ্ঠে সেই হিংস্র আরণ্যক চিৎকার, বন্য উল্লাস। দক্ষিণ কোণটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে উঠছে। মাঝে মাঝে দু একটা তীব্র তীক্ষ্ণ স্বর বাতাস চিরে ছড়িয়ে পড়ছে।

এরা দুজন নির্বাক নিস্পন্দ। যেন তারা চমকে উঠবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে! ক্রমাগত এই নারকীয় পরিস্থিতির মোচড়ে মনটা বুঝি অনেকখানি সহনশীল হয়ে উঠেছে।

'এখানে নয়—চলো আগের জায়গায় ফিরে যাই!' মেয়েটি বলল।

'না। তার চেয়ে দোতলা বা ছাদে চলো। সেটাই নিরাপদ হবে। নিচেটা ভাল নয়, যে-কোনো সময় লোকটা ছিটকে আসতে পারে। নতুন বাড়ির ছাদ কেউ সন্দেহ করবে না।'

ওরা এগোবার জন্যে পা বাড়াল। 'দাঁড়াও।' লোকটা বলল।

ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে এল একটা ঘটি! জল ভর্তি করে দিল মেয়েটির হাতে।

'না। পারবে না। চিঁড়ে আর জলের ঘটি আমি নিচ্ছি। তুমি শুধু দেশলাই জ্বেলে পথ দেখাও!'

আলোয় পথ খুঁজে ছাদে আসতে দেরি হল না। বাঁশ, লোহা, ইট, সুরকি—সমস্ত ছাদটা জঞ্জালে ভরা।

সিঁড়ির কোণ ঘেঁষে একটু পরিষ্কার জায়গা।

এখানে গোলমালটা অনেক চাপা পড়েছে।

পা ছড়িয়ে দুজনে এলিয়ে বসল।

রাত কত হবে কে জানে!

চাঁদ উঠেছে আকাশে।

আলো পড়েছে ছাদে। বাঁশগুলোর ছায়া বীভৎসভাবে ছড়ানো।

তবু এতক্ষণে ওরা পরস্পরের প্রতি যেন ভাল করে তাকাল। সান্নিধ্যের কৌতূহল জাগ্রত হল।

লোকটি মেয়েটিকে ভাল করে দেখতে লাগল।

ময়লা শাড়ি আর হাজারো বিশৃংখলতার মধ্যে থেকেও যেন একটা চকমকে ভাব উঁকি দিচ্ছে। ভদ্রঘরের বলেই মনে হয়, সভ্যতার ছায়া আছে।

মেয়েটিও তাকে লক্ষ্য করছে। জঞ্জালের মধ্যে থেকে পরিচয় জানা তার পক্ষে

সম্ভব নয়। তবু এই বিসদৃশ লোকটিকে তার ভাল লাগছিল। নিরাপদ আশ্রয়ের মতন মধুর, উত্তপ্ত।

'তোমার নাম?' লোকটি প্রশ্ন করল।

'মাধবী। আপনার?'

লোকটি শীর্ণভাবে হাসল। প্রথম বার আলোয় মেয়েটিকে দেখে সন্দেহ একবার চিড়িক দিয়েছিল মনে। কিন্তু তখন তার ভাববার মতন অবসর ও মন ছিল না।

'কবীর! আমি মুসলমান। আপনি নিশ্চয় হিন্দু?'

'মু-স-ল-মা-ন' মাধবীর হৃৎপিন্ডটা যেন গলায় এসে বিঁধল। বিস্ময়, ভয়, বেদনা, সব মিলিয়ে তার মুখটা বিকৃত ও বীভৎস হয়ে উঠলো।

'ভয় পেলেন?' কবীর ম্লান হেসে বলল।

মাধবী কোনো জবাব দিল না। পাথরের মতন সে নিথর।

'ভয় পাবারই কথা। আমি একে মুসলমান, তায় পুরুষ। আপনি হিন্দু মেয়েমানুষ।'

....একটু থেমে 'আমায় বিশ্বাস করুন। খোদার নামে শপথ করছি, আপনার কোনো ক্ষতি করব না। শুধু আপনার কেন, কারুরই সামান্য ক্ষতি করতেও ইচ্ছে নেই।'....

মাধবীর অনুভূতিশক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। দেখল কবীরের চোখে কী অজস্র সমবেদনা ও করুণা। দুর্বলতা আর মিনতি।

'ভয় পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু আপনাকে ভয় পাওয়া বোকামি।'

তারপর চাঁদের আলোয় বসে তারা গল্প করতে লাগল।

'কম্পোজিটার....। কথার পর কথা গুছিয়ে চলি। বিস্বাদ একটা জীবন। তবু আমাদের বাঁচতে হয়। কেন কে জানে?'

'নার্সিং পড়ি। এখানে আমার মাসতুতো বোন থাকতেন। নার্স। তাঁর কাছে প্রায়ই আসতাম। এবারে এসে এই বিপদ। জানেন, দিদির জন্য আমি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। ও ফিরল না। কোথায় আছে কে জানে?'

'আমারও ঠিক তাই। আত্মীয়ের বাড়ি থাকতাম। অবশ্য এখন আর আত্মীয় বলবার কেউ নেই।' কবীরের গলার স্বর ধরে এল। চোখ দুটোও ছলছল করে উঠল।

ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে আসে। চাঁদের কোলে কোলে মেঘ জমেছে। মাধবী কোন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হেলে-পড়া মাথাটা কবীরের কাঁধে।

কবীর নিস্তেজ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

মাঝে মাঝে দেখছে মাধবীকে। কী পরম নির্লিপ্ততায় মাধবী ঘুমিয়ে পড়েছে। যেন তার সমস্ত শংকা, বিপদ সব ভারটুকু তুলে দিয়েছে কবীরের হাতে। শুধু নিয়েছে বিশ্বাস আর বন্ধুত্ব।

কবীরের জ্বালা-ধরা বুকটায় শান্ত আনন্দের রেশ ছড়িয়ে যায়।

আর তারপর......তারপর সে অকস্মাৎ ফুলে উঠে কেঁদে ফেলে!

বৃষ্টির ছিটে গায়ে লাগতেই মাধবী চোখ খুলল।

তার পাশে বসেই কবীর ঘুমোচ্ছে। মাথাটা নুয়ে পড়েছে।

'কবীর—কবীর'.....মাধবী ওর গা নাড়া দিয়ে ডাকল।

চমকে উঠে কবীর চোখ তুলল। 'বৃষ্টি পড়ছে!'

'সিঁড়িটার ভেতরে ঢুকে বসি, এসো!'

'চলো!'

সিঁড়ি যেখানে ছাদের মুখে এসে থেমেছে সেখানে খানিকটা জায়গা ঢাকা। ওরা দুজনে সেখানেই বসল।

'আর গোলমাল শুনেছ?' কবীর প্রশ্ন করল।

'না! কাছাকাছি কোথাও শুনছি না!'

'আগুন কিন্তু ভীষণভাবে ধরেছে দেখছ?'

'বৃষ্টি আসছে—নিভবে না?'

'মাথা খারাপ, ওই আগুন কি বৃষ্টিতে নেভে? হাতে জ্বালানো আগুন, হাত ছাড়া নেভে না!'

১৮ই আগষ্ট কলকাতার আকাশে সূর্য উঠল।

পাড়ায় পাড়ায় ছেলে, বুড়ো, মেয়ের দল অনিদ্র চোখে রাত কাটানোর পর একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কী দাংগাই বেঁধেছে। যাক, আপাতত রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত।

ওদিকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাধবী আর কবীরের মুখে।

পাশাপাশি তারা শুয়ে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বিশৃংখল দুটো মূর্তি—ঝড়ো পাখীর মতন।

সূর্যের আলোয় মুখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটের কোণে কাঁপছে এক ফালি মিষ্টি হাসি। অনেক কষ্টে যে হাসি কল্পনা করতে হবে আমাদের আরো অনেক ওঠার পর। ▢

আত্মপক্ষ

আ ফ সা র আ মে দ

অমরদা আমার বন্ধু। মহিষবাথানে অমরদার বাড়িতে আজই আমি চলে এলাম স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে। অমরদা নতুন বানিয়েছেন বাড়িখানা। পাশেই আমার জায়গা আছে দু-কাঠা। সল্টলেক মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্ল্যানও মঞ্জুর হয়েছে। এ বছর থেকে আমিও বাড়ি করব। আট বছর আগে আমরা দুই বন্ধু জায়গা কিনেছিলাম। আশা ছিল শহরে বসবাস করবার। সেই স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে। হাওড়ার গ্রামে থাকতাম আমরা। শহরে অফিস তাই শহরে আসা। আজ থেকে আর ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতে হবে না। ছেলেমেয়েরা সল্টলেকে ভালো স্কুল পাবে।

আমাদের বুড়ো মা-বাবা থাকেন গ্রামে। ওঁদের বয়েস আরো বাড়লে এখানে নিয়ে চলে আসব, এই ভেবে এখানে চলে আসার এক ধরনের স্বস্তি খুঁজেছিলাম। বেদনাবোধ করেছিলাম গ্রাম-প্রতিবেশ থেকে ছিন্ন হয়ে আসার। আমাদের পুরনো বাড়িটার ওপর মায়া ঢের। ওখানেই বড় হয়েছি। আমাদের পাঁচিলঘেরা উঠোন, পুকুরঘাট আর দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, এই সব ছেড়ে এসে বেদনা তো হবেই।

গতকাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি। এক দুশ্চিন্তায়। শেষ মুহূর্তে এখানে চলে আসার দুর্ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। কেননা আমরা মুসলমান। হিন্দু এলাকায় থাকব। নিরাপত্তাহীন এক ভয় আমাকে গ্রাস করেছিল। কেননা এখন গুজরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা চলছে। বীভৎস সব খবর বেরোচ্ছে সংবাদপত্রে। আমার স্ত্রী নাসিমা খবরের কাগজ পড়ে না, তার এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। আমি একা একা নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, স্ত্রী পরিবারকে মহিষবাথানে যে নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক করছি কি? এখানের পরিস্থিতি যে খারাপ হবে না, তার নিশ্চয়তা কি আছে। গ্রামে মুসলমান এলাকায় থাকি, খানিকটা মনে জোর পাই। মহিষবাথানে তো সবাই হিন্দু, আমরা একমাত্র মুসলমান।

জায়গা কেনার সময় এ কথা মাথায় আসেনি। মানুষজন যেভাবে জায়গাজমি কেনে, বাড়ি ঘরদোর করার স্বপ্ন দেখে, আর পাঁচজনের সঙ্গে আমার কোনো তফাত ছিল না। বরং মনে হয়েছিল হিন্দু এলাকায় মুসলমানরাও থাকবে। সহাবস্থানের প্রেম খুঁজেছিলাম। আর সেই প্রেমবাবুকে শেষ পর্যন্ত লালন করতে পেরেছিলাম বলে গতরাত দুর্ভাবনায় কাটিয়েও আজ মহিষবাথানে চলে আসতে পেরেছি।

ভোর ভোর ম্যাটাডোরে মালপত্তর নিয়ে সকাল নটার মধ্যে চলে এসেছি। ঘরের ভেতর স্তূপীকৃত মালপত্র। গোছগাছ শুরু করা যায়নি। ছেলেমেয়েদের জামা খুলে দিয়েছি। গরমে কষ্ট পাচ্ছিল। মাঝবয়সী প্রতিবেশী হরেনদা এলেন। বোতলে জল

নিয়ে এলেন। ছেলেমেয়েদের জল খাওয়ালাম, নিজে খেলাম, নাসিমাকে খাওয়ালাম।

হরেনদা চলে গেলেন। এখানে আসার ব্যাপারে হরেনদার উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। অমরদার টিউবওয়েলটা খারাপ, হরেনদা তাঁদের টিউবওয়েল ব্যবহার করতে দেবেন। পরে টিউবওয়েলটা মিস্তিরি ডেকে সারিয়ে নিলেই হবে। বাজার-দোকান চেনাবেন। গ্যাস কানেকশনের ট্রান্সফার করিয়ে দেবেন। গত সপ্তাহে এসেছিলাম এখানে। পাড়ায় হরেনদা শেতলা পূজো করছেন। নিজে যেচে চাঁদা দিলাম। হরেনদার কথায় খুবই উৎসাহিত হয়েছি।

হরেনদা আবার এলেন। হরেনদার হাতে একটা বাটি। এই যে আপনাদের জন্য প্রসাদ তুলে রেখেছিলাম।

আমি প্রসাদ খেলাম। নাসিমা ইতস্তত করতে করতে নিল। ছেলেমেয়েদের মুখে দিলাম। বাটিটা ফিরিয়ে দিলাম। আর লাগবে না।

হরেনদা বললেন, "রান্না করবেন তো, না দুপুরে আমাদের কাছে খাবেন?

নাসিমা বলল, 'রান্না করব। সবকিছু এনেছি।'

'বেশ। খাট খাটাবেন, পাখা টাঙাবেন তো? আমার বড়ছেলে সুমিত্রকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' হরেনদা চলে গেলেন।

নাসিমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো আমার।

নাসিমা বলল, এখানে থাকব কী করে?'

'যেমন সবাই আছে।'

'এ তো গ্রাম, আমার সে গ্রামই ভালো ছিল।'

'আচ্ছা, কোনো আজানের শব্দ শুনলাম না তো? কাছাকাছি কি কোনো মসজিদ নেই?'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

'কী হলো, বলছ না কেন?'

'জানি না।'

'দূরে কোথাও নেই?'

'আছে, হয়তো অনেক দূরে। কেন?'

'না, রোজ আজান শুনি তো। কেমন কেমন লাগছে।'

'কেমন লাগছে?'

'কেমন ফাঁকা ফাঁকা।'

'প্রথম প্রথম ও একটু মনে হবে।'

'এখানে কি সবাই হিন্দু?'

'হ্যাঁ। সবাই ভালো। তিনটি যে বউ এসেছিল তারা কেমন?'

'ভালোই তো।'

'তুমিও এখানে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে?'

চিন্তিত মুখে নাসিমা পাশের ঘরে ফিরে গেল। সত্যি মেয়েটাকে বিপদে ফেলেছি। বেচারি যে পরিবেশে অভ্যস্ত, তা থেকে ছিন্ন করেছি। প্রথম প্রথম তো একটু অসুবিধে

হয়েই। এখন নাসিমার তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে, এখানে যে তাকে থাকতে হবে, মেনে নিয়েছে। কিছু কিছু অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু কিছু খটকার সামনে পড়ছে। সে পড়ুক। এখন ইচ্ছেমতো গোছগাছ করছে, ঘর সাজাচ্ছে। বেশ খুঁতখুঁতে, তাই সময় লাগে বেশি। আজ বোধহয় অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করবে। নাসিমাকে নিরস্ত করা যাবে না। নাসিমার এমনই স্বভাব। আমি বাধা দিই না। ও কাজ করতে থাকে। আর আমি লেখাপড়া করতে থাকি। আমার নজরে থাকে নাসিমার গতিবিধি। চলাফেরার চেনা ধরন ঠিকঠাক আছে কিনা বুঝি। কোথাও ছন্দপতন হলে আগাম ধরতে পারি। ঠিকই আছে। ঠিকই চলছে। এখানে বসবাস করা যাবে। সামনের মাস থেকে বাড়ি করব। লেবার কনট্রাক্ট দেব। চোখের সামনে বাড়ি উঠছে। কোনটা কীরকম হবে, নাসিমা ইচ্ছেমতো বানিযে নিতে পারবে। অফিসের লোনও স্যাংশান হয়ে গেছে। নাসিমারও স্বপ্ন নতুন একটা নিজস্ব বাড়ি।

গরমও পড়েছে বেশ। বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। আকাশে মেঘ নেই। বাতাসও নেই। পাড়াটা এমনিতে শান্ত। বাড়ি ঘরদোর কম। লোকজনও কম। ধীরে ধীরে সবাব সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। অফিসের বাস ধরতে গেলে খানিকটা হাঁটতে হবে। সে হাঁটব। হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। বাজার চিনতে হবে। গ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

'শোনো।' পাশের ঘরে থেকে নাসিমার আতঙ্কিত স্বর ভেসে এল।

ধীরে সুস্থেই ওঘরে নাসিমার কাছে গেলাম। দেখলাম নাসিমা পূব দেওযালেব দেওয়াল আলমারির তাকের কাছে তাকিযে আছে। স্থির অনড়। চোখের পলক পড়ছে না। কী দেখছে? দেখলাম একটি ফ্রেমে বাঁধানো কালীঠাকুরের ছবি। ফ্রেমের ওপর ফুলের মালা পরানো ছিল। ফুলগুলো শুকিযে গেছে।

নাসিমা বলল, 'তুমি একটা কিছু কব।'

'কী করব?'

'আমি এটাকে নিযে কী কবব?'

'কী করবে মানে, যেমন আছে তেমন থাকবে। অমরদাদের বাড়ি, অমরদাবা রেখে গেছেন। ওটা ওভাবেই থাক।'

'তাহলে আমি থাকতে পারব না, আমার কেমন ভয করছে।'

'ভয় কি, ওটা তো একটা ছবি।'

'না, ওটা ওঁদের ঠাকুর।'

'বেশ তো, তোমার অসুবিধে হবে কেন?'

'আমার অসুবিধে হবে না? আমি কি ঠাকুর-দেবতা মানি? আমাদের ধর্মের কি।'

'বেশ, তাহলে তুমি কী করতে চাও?'

'তুমি থাকো এ বাড়িতে, আমি থাকব না।'

'পাগলামি কোরো না। কী করলে তোমার অসুবিধে হবে না, তাই কর না। ওটাকে সরিয়ে রাখতে চাও, আমার ঘরেই না হয় রাখো।'

নাসিমা একমুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'তোমার ঘরে খাটের তলায় রেখে এসো।'

'ঠিক আছে দাও, আমি রেখে আসছি।'

'তুমি নিয়ে যাও, আমি ছোঁব না।'

'ঠিক আছে।' ছবিটাকে পাশের ঘরে নিয়ে এসে খাটের তলায় রাখি। অনুতাপ হলো। ঠিক করলাম কি? ওঁদের পূজার দেবী, তাঁকে এমন অনাদরে রাখা কি ঠিক হলো? নাসিমার দিক থেকে অসুবিধে অমরদারা নিশ্চয় বুঝবেন। নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। নাসিমাকে যে সামলানো গেছে, তাতে আমার স্বস্তি। আমরা সবাই সহজ সমাধান খুঁজি।

গভীর রাতে নাসিমা আমাকে ঠেলা মেরে ঘুম থেকে তুলল।

আমি বললাম, 'কী হলো?'

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে?'

'কেন?'

'জানি না।'

'কী কষ্ট হচ্ছে?'

'নিশ্বাস নিতে পারছি না।'

'ভারী কিছু চাপিয়েছিলে?'

'না। একটুও ঘুমোইনি।'

'একটুও ঘুমোওনি?'

'না।'

'নতুন জায়গায় এসেছ বলে ঘুম আসছে না, আর ঘুমোতে পারছ না বলে কষ্ট হচ্ছে দেখ।'

'কষ্ট হলে কেউ ঘুমোতে পারে।'

'কী কষ্ট?'

'দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'এরকম আগে কখনো হয়েছে?'

'না।'

'বুকে পেন হচ্ছে?'

'না।'

'কালকেই ভালো একটু ডাক্তার দেখাতে হবে।'

নাসিমা চুপ করে পড়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। আমিও চুপ করে থাকি। যাতে নাসিমা ঘুমিয়ে পড়তে পারে। মানসিক টেনশনে হতে পারে। আমি চুপ করে পড়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি, জানি না। সকালে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি নাসিমা চোখ খুলে শুয়ে আছে।

আমি বললাম, 'একটু ঘুমিয়েছিলে?'

'কি জানি।'

'ঘুমিয়েছিলে কি না তাও জানতে পারনি।'

'বুঝতে পারিনি। হয়তো একটু ঘুম হয়েছে।'

'এখন কেমন লাগছে।'

'কেমন হচ্ছে যেন।'

'কী হচ্ছে।'

'সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করি?'

'দেখি, এমনিতে সেরে যাবে হয়তো।' কথাটা বলে নাসিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

যথারীতি নাসিমা বিছানা ছেড়ে ওঠে। সংসারের কাজকর্ম করে। ছেলেমেয়েদের সেবাযত্ন করে। আমি হরেনদার সঙ্গে বাজারে যাই। আমি নাসিমাকে সচল দেখে আশ্বস্ত হই। শারীরিক অসুবিধেটা হয়তো সাময়িক। বাজার থেকে তরকারি কিনি। মাছ কিনি। ছোট বাজার। কিন্তু সবকিছু টাটকা পাওয়া যায়। পাড়ার কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো।

বাড়ি ফিরে দেখলাম নাসিমা রান্নাঘরে। বাজার রাখতে রাখতে বললাম, 'এখন কেমন বোধ করছ?'

নাসিমা কিছু বলল না। আমার দিকে তাকাল না। বুঝে নিলাম ভালো নেই।

বললাম, 'ভাত চড়িয়েছ যে?'

'তোমাকে যে অফিস যেতেই হবে। না হলে অসুবিধে হবে!'

'তোমার শরীর খারাপ, আমি অফিস যাই কী করে?'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক হয়ে যাব।'

'তাহলে বলছ আমি অফিস যাব! তোমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে, অথচ—'

নাসিমা চা দিল। বেশি কথা বলছে না। বুঝলাম শরীর ঠিক নেই। নাসিমা সাহস দিচ্ছে যখন অফিস যাব। অফিসে যাওয়ার খুব প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে এসেছি।

বাজারে গিয়ে খবরের কাগজ কিনে এনেছিলাম। চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ি। আবার দাঙ্গার খবর। দাঙ্গার খবর পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।

কয়েক বালতি জল তুলে দিই। নাসিমার শরীর খারাপ। পারবে না। নাসিমা রান্নার কাজ করছে। অন্য আর কিছু কাজ করছে না। ছেলেমেয়েদের খাতায় খাতায় নাসিমা অঙ্ক দিয়েছে, তারা বিছানায় বসে অঙ্ক কষছে। সল্টলেকের এইচ বি-তে একটা স্কুল আছে, সেখানে ওদের ভরতি করতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা আছে। গ্রীষ্মের ছুটি চলছে এখন। এর মধ্যেই ভরতি করিয়ে নিতে হবে। ভাবনা এখন নাসিমাকে নিয়ে। নাসিমার শরীর খারাপ হয়েছে।

সন্ধে সাতটার মধ্যে অফিস থেকে ফিরি।

নাসিমা টিভিটা বের করেছে। ওর একটা প্রিয় সিরিয়াল দেখছিল। আমি হাতমুখ ধুই। পাশের ঘরে গিয়ে বসি। দেখলাম নাসিমা ভালো আছে। চোখেমুখে আগের

চঞ্চলতা ফুটে উঠেছে। আগের তৎপরতায় দরজা খুলে দিয়েছে।

'খুব দ্রুত এসব জায়গা ডেভেলপ হয়ে যাবে।'

'আমার ভালো লাগছে না।'

'কেন?'

'জানি না।'

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে। গালে হাত রাখে। নীরব হয়ে যায়।

আমি তাড়া দিলাম, 'কি হলো, এবার গোছগাছ শুরু কর।'

নাসিমা মুখ ফেরাল। নাসিমার চোখে জল।

হরেনদার স্ত্রী আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'ও মন খারাপ করছে বুঝি? কাঁদছে? কান্নার কি হলো, আমরা সবাই আছি, তোমরাও থাকবে। প্রথম প্রথম নতুন জায়গায় এলে সব মেয়েদেরই কান্না পায়।'

নাসিমা হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে।

আমি বালতি বের করে জল আনতে ছুটি।

হরেনদার স্ত্রী আর নাসিমা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করে। আমাদের আট বছরের অভি আর ছ বছরের কুসুম বাইরে বেরিয়ে আসে। পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েরা এসেছে। তাদের সঙ্গে মেশে।

আমি স্বস্তি পাই। হরেনদার ছেলে সুমিত এসেছে। পাখা লাগাচ্ছে। খাটটাকে খাটিয়ে দেবে। আমি তাকে সাহায্য করছি, নাসিমাও এসে হাত লাগাচ্ছে। নতুন বাড়িতে এসে সংসার সাজানোর ঝামেলা কম নয়। সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়। যেখানে যেটা থাকার সেখানে সেটা রাখতে হয়। এ ব্যাপারে আমি আনাড়ি। নাসিমা সেটা ভালো বোঝে। নাসিমাই করে। আমি তাকে সাহায্য করি। এই বৈশাখে গরমও পড়েছে। ঘেমে নেয়ে একশা। বৃষ্টির খুব প্রয়োজন। গত সপ্তাহে কালবৈশাখী হয়েছিল. আমাদের গ্রামের বাড়ির বাদামগাছটার একটা ডাল ভেঙে পড়েছিল উঠোনে। সাংঘাতিক ঝড় আর বৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে ধুলোর ঝড়। তারপর বৃষ্টি আর ঝড়। ছুটির দিন রবিবার ছিল। ছেলেমেয়েরা তাদের দাদা দাদির কাছে ছিল। আমি আর নাসিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝড়ের তাণ্ডব দেখছিলাম। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছিলাম। ভিজতেই চাইছিলাম।

দুটো ঘর। আর ডাইনিং স্পেস আছে। আমি যে ঘরটাতে থাকব, পড়াশোনা করব, সে ঘরের আসবাব সাজানোর দায় আমারই। র‍্যাক এনেছি, বই এনেছি। টেবিলও এনেছি। একটা ছোট খাটও আমার ঘরে পাতা গেছে। র‍্যাকে বই সাজাচ্ছিলাম।

পেছনে নাসিমা এসে দাঁড়িয়েছে এক কাপ চা নিয়ে।

আমি আনন্দে হেসে ফেলি।

গৃহিণীপনার সুধায় ভরে আছে নাসিমা।

আমি বললাম, 'এত কিছুর মধ্যে চা?'

নিস্পৃহ গলায় নাসিমা বলল, 'সকাল থেকে চা খাওনি।'

'তোমার মনে ছিল?'

'বা, মনে থাকবে না কেন?' কিন্তু মুখে একটুও হাসি নেই নাসিমার। 'আমার কান্না পাচ্ছে শুধু, আমি কী করে থাকব।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিমর্ষ মুখে ফিরে গেল নাসিমা।

আমার মনের মধ্যে সেই দুশ্চিন্তা ভয় এসে বসল। ঠিক করলাম কি এখানে এসে। গুজরাতের দাঙ্গার ভয়াবহ খবর সংবাদপত্রে পাচ্ছি। এখানে যে পরিস্থিতি খারাপ হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? আমি প্রেসারের রোগী। এসব চিন্তা এলে প্রেসার বাড়ে। মাথা গরম হয়ে যায়। এসব দুর্ভাবনার কথা নাসিমাকে বলি না। বললে তো নাসিমা এই মুহূর্তে ফিরে যেতে চাইবে। নিজেকে প্রবোধ দিতে থাকি। নিজেকে বোঝাতে থাকি। চায়ের স্বাদের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজি। এখানকার পরিস্থিতি এমন নয়। শুধু শুধু দুর্ভাবনা করছি হয়তো। এই যে হরেনদারা কি খারাপ? তাঁরা তো জানেন, আমরা মুসলমান, কই অনাত্মীয় ভাবছেন না তো? আমার এই দুর্ভাবনা আমাকে কি সাম্প্রদায়িক করে তুলছে না? আমি নিজেকে ভোলাতে চাই এই কথা ভেবে। আর এই কথাই যদি আমার সব হতো, সর্বস্ব হতো, তাহলে এখানে আসতাম না। এসে নাসিমাকে বোঝাতাম না।

চায়ের শূন্য কাপটা নিয়ে রান্নাঘরে যাই।

নাসিমা ভাত চড়িয়েছে। ছুরি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে।

আমি বললাম, 'অমরদার বাড়িটা পছন্দ নয়?'

নাসিমা কিছু উত্তর করল না। দেওয়ালের দিকে মুখ করে আছে। ফিরেও তাকাল না আমার দিকে।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম রান্নাঘরে, নাসিমার পেছনে। রান্নাঘরের জিনিসপত্র তেমনভাবে এখনও সাজাতে পারেনি। বেলা বাড়ছে তাই রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। দুদিন অন্তত লাগবে সব গোছগাছ করতে। আমি বললাম, 'আমাদের জায়গাটা দেখেছ? ঠিক এর পাশেই। গাছপালাও আছে। নারকেলগাছটা কাটব না, বুঝলে? ছেলেমেয়েরা নারকেল ভালোবাসে।'

নাসিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ডাইনিং স্পেসে দক্ষিণদিকের দরজার কাছে দাঁড়ায়। আমাদের জায়গাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছিল দুপুরবেলা। নাসিমা ঘুমোয়নি। সারাক্ষণ গোছগাছ করেছে। ছেলেমেয়েরা তো ঘুমোবেই। ভোর থেকে উঠেছিল। কম ধকল কি গেছে। আমিও না ঘুমিয়ে আমার বই গোছগাছ করেছি। দুটো ঘরে সিলিং ফ্যান টাঙানো হয়েছিল বলে টেঁকা গেছে। গরমও পড়েছে বিস্তর।

বিকেল হতে ছেলেমেয়েদের বিছানা থেকে তোলে নাসিমা। ওদের হরলিকস গুলে দেয়। আমাকে চা দেয়।

ছেলে অভি বলল, 'মা, নানিকে ফোন করব।'

নাসিমা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে টেলিফোন বুথ নেই?'

আমি বললাম, 'সামনেই মুদির দোকানটাতেই তো ফোন আছে। ওখানে পয়সা

দিয়ে ফোন করতে দেয়।'

'তুমি ঠিক জান?'

'জানি।'

অভি বলল, 'দোকানটা তো সামনে। চল কুসুম, নানিকে ফোন করে আসি। নানিকে বলব আমরা নতুন জায়গায় এসেছি।'

মেয়ে কুসুমও উৎসাহিত হয়ে উঠল। শিশুরা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

নাসিমা অভিকে খুচরো পয়সা দিল। 'মা চিন্তা করছে, ঠিকঠাক এসেছি কিনা। তুমিও তো গ্রামের বাড়িতে একটা খবর দিতে পারতে। তোমার মা-বাবা চিন্তা করছেন। পঞ্চায়েত অফিসে ফোন করলে কেউ খবর দিয়ে আসবে না?'

'এখন পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। পৌনে ছ-টা বাজে। কাল অফিস থেকে ফোন করে দেব।'

'তুমি কাল অফিস যাবে? আমাকে একা ফেলে রেখে? আরো দু-একদিন অফিস যেও না।'

'সে হয় না, অফিসে কাল যেতেই হবে।'

অভি কুসুম ফোন করতে চলে গেছে।

'ও মা, অভি কুসুম যে একা একাই চলে গেল। আমার কেমন ভয় করছে। ওরা যদি হারিয়ে যায়?'

'হারিয়ে যাবে কেন? এই তো কাছে।'

'তুমি যাও লক্ষ্মীটি। একটা ফিনাইল কিনে আনবে।' আমাকে তাড়া লাগাল নাসিমা। নাসিমার চোখে আতঙ্ক আর ভয়।

'পেছন পেছন আমিও গেলাম। ততক্ষণে ওরা ফোনে কথা বলছে ওদের নানির সঙ্গে। দোকানদার ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। নতুন ছেলেমেয়ে দেখেছে। নানি বলে সম্বোধন করছে বলে দোকানদার চমকেছেন। আমি মনে মনে হাসি।

ওদের ফোন করা হয়ে গেছে।

দোকানদার বললেন, 'কি রে তোরা মুসলমান নাকি?'

অভি ঘাড় কাত করল। তারপর প্রশ্ন করল, 'কেন?'

দোকানদার বললেন, 'নতুন বাড়িটায় এসেছিস, আজ সকালে?'

ওরা সমস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

দোকানদার ফিরে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি। দোকানদার বললেন, 'ও, আপনার ছেলেমেয়ে বুঝি? আজই তো নতুন এলেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম কি?'

আমি নাম বললাম।

দোকানদার বুঝলেন আমার ছেলেমেয়েরাই শুধু মুসলমান নয়, আমিও মুসলমান। ততক্ষণে ছেলেমেয়েরা ফিরে গেছে। বাড়ির কাছাকাছিই দোকানটা।

দোকানদার বললেন, 'আপনাকে দেখে কিন্তু মুসলমান মনে হয় না?'

আমার খুব প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল, 'কী দেখলে মুসলমান মনে করতেন?' কিন্তু বললাম না। বললাম, 'ফিনাইল আছে?'

'আছে। সবকিছুই আমার দোকানে পাবেন। এখান থেকেই সংসারের মালপত্র কিনতে পারেন। দাম বেশি নিই না।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে। পাড়ায় আছি, পাড়ার দোকান থেকেই কিনব।'

ফিনাইল নিয়ে ফিরলাম বাড়িতে। বাড়িতে ফিরতে দেখলাম নাসিমা ব্যস্ত। পাড়ার কমবয়েসী তিনজন বউ এসেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছে। আলাপ করতে এসেছেন তাঁরা। আমার ভালো লাগল। নাসিমা দ্রুত এই পরিবেশ প্রতিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিক চাইছিলাম। এখন চোখেমুখে বিমর্ষ ভাবটা কম। প্রতিবেশীসুলভ ভঙ্গিতে ওঁদের সঙ্গে কথা বলছে। নাসিমা ঠিকঠাক থাকতে পারলে আমার শান্তি।

সন্ধ্যা এল। তারপর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল। ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি খাইযে শুইয়ে দিয়েছে নাসিমা। টিভিটা এখনও বের করা হযনি, কার্টুনবন্দি হযে আছে। আমারও খবর শোনা হলো না। নাসিমাও আজ কোনো সিরিযাল দেখেনি। আমি পাশের ঘরে পড়াশোনা করছিলাম। নাসিমা গোছগাছ করেই চলেছে।

নাসিমা আমার ঘরে ছুটে এল। 'শোনো।'

'কী হয়েছে।'

তেমনই মুগ্ধতায় তার প্রিয সিরিয়াল দেখছে। কালকের বাতের মতো নিষ্প্রভ ম্লান লাগছে না। একি ম্যাজিক? কেমন করে ভালো হলো শরীর নাসিমার? এখনই শুধোব না। যাক, বাঁচা গেছে। চমৎকার লাগছে আমার নিজেরই। অফিসে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন বেশ মনের আরাম পাচ্ছি। নাসিমা সিরিযাল দেখছে। দ্রুত খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

একটু পরে নাসিমা চা দিতে এল। চলে যাবার সময় আমি হাত টেনে ধবলাম। বললাম, 'চলে যাচ্ছ যে।'

'কেন? কী দরকার?'

'শরীর ঠিক আছে?'

'একদম ঠিক।'

'কখন থেকে ভালো হলো?'

'এই সন্ধে থেকে। তুমি চলে যাবার পর তো বিছানা নিয়েছিলাম।'

'কী হয়েছিল কি?'

'সে বলবখন।'

'গোপন ব্যাপার?'

'পরে সব বলছি, ডাল চড়িয়ে এসেছি।' নাসিমা হাত ছাড়িয়ে চলে যায় রান্নাঘরে। একটু পরে এসে বলল সব ব্যাপারস্যাপার। নাসিমা যে গতকাল রাতে কালীঠাকুরকে তার আসন থেকে সরিয়ে আমার খাটের তলায় চালান করেছিল, নাসিমার বিশ্বাস, অন্যের ঠাকুর-দেবতাকে অনাদর অসম্মান করার জন্য তার পাপ হয়, আর সেই

পাপের ফল, অসুস্থ হয়ে পড়া। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আর অসুস্থ থাকতে থাকতে, বিকেলবেলা একথাটা তার মনে হয়। তখন সে কালীঠাকুরকে তাঁর আসনে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়। নিজে ঝেড়ে মুছে যত্ন করে যথাস্থানে রাখে। তারপর থেকে সে সুস্থ হতে শুরু করে। এখন তার বসবাসের ঘরেই দেবী আছেন। আমি বুঝি, সমস্ত ব্যাপারটাই মানসিক ব্যাপার। নাসিমা ধর্ম মানে বলে অন্য ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান করা মানতে পারেনি, তাই তার মানসিক কষ্ট হয়েছিল। এখন দেবীকে যত্নের সঙ্গে রেখেছে।

একটু আগে নাসিমা আমার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে গেল। তার রান্নাঘরের দেশলাইটা শেষ হয়ে গেছে। অথচ নাসিমা রান্নাঘরে গেল না। তাহলে নাসিমা দেশলাই নিয়ে কী করছে? পাশের ঘরে গেলাম। দেখলাম নাসিমা ধূপদানিতে ধূপ জ্বালিয়েছে। আর ধূপদানিটা কালীঠাকুরের পটের পাশে রেখেছে। সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় সারাঘর ম ম করে উঠছে। আমি শান্তির নিশ্বাস ফেললাম। □

দক্ষিণের জানালা এবং কাটা মুন্ডুর গল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কাল রাতে বছরের প্রথম কালবোশেখি হানা দিয়েছিল। কৃপাসিন্ধু গিয়েছিল বেণীপুরে একটা বিবাদ মেটাতে। ফেরার পথে হঠাৎ ঝড়। ঝড়ের মধ্যে মোটর সাইকেল চালিয়ে আসার জেদ ও ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ঢুকতে হয়েছিল দুনিগ্রামের বাউরি পাড়ায়। একে তো ওই প্রাকৃতিক হুলুস্থুল, তার মধ্যে দোগাছিয়ার খেপুবাবুর আবির্ভাব। ঘনা, মনা, ভ্যাঁটা, ঘোঁতন এইসব নামের গতরজীবী মানুষগুলো তাড়ির নেশা কেটে খেপুবাবুকে কোথায় জায়গা দেয়, সে নিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ডাকাডাকি, লন্ঠন জ্বালা, ডাকাত পড়ার ব্যাপার। শেষে কৃপাসিন্ধু ঘনার দাওয়ায় জায়গা পায়। মোটর সাইকেলটা দাওয়ার নিচে ভিজতে থাকে এবং বিদ্যুতের ঝিলিকে মুহুর্মুহু ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তখন ঘনা বুদ্ধি করে একটা চট চাপিয়ে দেয়। ঘনার বাড়ির মেয়েরা ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য খেপুবাবুকে দেখছিল।

মাঝরাত নাগাদ ঝড়টা থেমে যায়। টিপটিপিয়ে তারপরও কিছুক্ষণ বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টি থামলে আধখানা চাঁদ ঝলমলিয়ে ওঠে। কৃপাসিন্ধুর মোটর সাইকেলের চাকা স্লিপ করছিল। পিচের চাঙড় ছেড়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত। আব্দুল কন্ট্রাক্টর এই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা বানিয়ে দোতলা বাড়ি তুলেছে। কৃপাসিন্ধু বাকি রাস্তা আব্দুলের বাড়িটা লক্ষ্য করে একটা স্টিমরোলার চালিয়ে নিয়ে আসছিল।

সকালে নিজের হাতে মোটর সাইকেলটা সাফ করছিল কৃপাসিন্ধু। টিউবওয়েল থেকে বালতি করে জল এনে ঢালছিল। কাঠি দিয়ে মাডগার্ড খোঁচাচ্ছিল। বারান্দা থেকে বড়দি রেবা বকাবকি করছিলেন, এভাবে কেন তুই রিস্ক নিস বল তো খেপু? তোর অত শত্রু শুনি। কার কী মনে থাকে।

রেবা শহরের বধূ। ভাইয়ের বাড়ি এসেছেন বেড়াতে। বাবা-মা বেঁচে নেই। থাকলে কৃপাসিন্ধুর এত গোঁয়ার্তুমি সাজত না বলে তাঁর ধারণা। বলছিলেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কি মানে হয়, তুই আমাকে বল খেপু! আর এখন পরিবেশ যা হয়েছে শুনতে পাই, তোর জন্য সবসময় অস্থির থাকি। রোজ নাকি খুনোখুনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তোকে কবে থেকে বলছি, জমিজমা বেচে চলে আয় আমার ওখানে। বিজনেস কর।

থামের কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছিলেন পিসিমা চারুবালা। সুযোগ পেয়ে বললেন, আমিও তো একই কথা পই পই করে বলি। ও মাসে সাত বিঘে জমির ধান দিনদুপুরে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। কী হলো শেষ পর্যন্ত? মগের মুলুক পড়েছে আজকাল।

রেবা বাঁকা হেসে বললেন, হ্যাঁ রে, তুই নাকি বড়ো লিডার হয়েছিস! পারিসনি ধানগুলো উদ্ধার করতে? তবে তুই কিসের লিডার খেপু?

কাজ শেষ করে মোটর সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে ছিল কৃপাসিন্ধু। আজ সকালে পৃথিবীর ঝলমলানির সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে তার বাহনটা। রোদে ঝকমক করছে দুর্ধর্ষ গোঁয়ার যৌবন।

বড়দির সামনে এখনও ভদ্রতা করে সিগারেট খায় না কৃপাসিন্ধু। হাল্কা পায়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঁচু বারান্দায় উঠল সে। তারপর ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

দক্ষিণের জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে আছে তার স্ত্রী রত্না আর ছোট বোন ছায়া। কৃপাসিন্ধুর পায়ের শব্দে রত্না একবার ঘুরল। কিন্তু কিছু বলল না। যা দেখছিল, আবার দেখতে থাকল। কৃপাসিন্ধু সিগারেট ধরিয়ে বলল, কী?

ছায়া আস্তে বলল, ওখানে কী যেন হয়েছে দাদা! একগাদা লোক ভিড় করে কী দেখছে?

কোথায় রে?

বুড়োতলার নালার ধারে।

ছেড়ে দে। বলেও কৃপাসিন্ধু ওদের মাঝখান দিয়ে একবার দেখতে গেল।

এই জানালা থেকে বুড়োতলার নালা পরিষ্কার দেখা যায়। কয়েক টুকরো সব্জিক্ষেতের পর আগাছাভরা খানিকটা পোড়ো জমির কোনায় ফণিমনসার ঝোপের ভেতর বুড়োবাবার থান। তার পেছনে গভীর ওই নালাটা আসলে গ্রামের জলনিকাশী খাল। তার আঁকাবাঁকা গতি নিচু মাঠ পেরিয়ে নদী পর্যন্ত। বর্ষায় বানের জল আটকাতে ক'বছর আগে নদীর মুখে স্লুইস গেট বসানো হয়েছে। নালাটা অবরে-সবরে সেচের জলও মাঠকে জোগায়।

কৃপাসিন্ধু বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রত্না চাপা গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দেখে আসি।

রত্না ওর পেছন পেছন আসছিল। বলল, সবতাতেই তোমার যাওয়া চাই। মিছিমিছি—

রেবা বললেন, কী হয়েছে খেপু? অমন করে যাচ্ছিস কোথায়?

কৃপাসিন্ধু খিড়কির দরজা জোরে খুলে বেরিয়ে গেল। রত্না বলল, কোনো মানে হয়?

রেবা বললেন, হয়েছেটা কী বলবে তো?

বুড়োতলার ওখানে কী যেন হয়েছে। একগাদা লোক ভিড় করে দেখছে।

রেবা মুখ টিপে হাসলেন। বুঝেছি। এ আর নতুন কী? বরাবর যা হয়, তাই। এই জন্য তো বলি, পৃথিবীটা দেখতে দেখতে কত বদলে গেল, আর এই দোগাছিয়া যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল।

চারুবালা হাসতে হাসতে বললেন, তা ঠিক নয়। তুমি ছোটবেলায় যেমন দেখেছ, তেমনটি কি আছে? আহা, আমিও তো তোমার মতো এ বাড়ির মেয়ে। বুড়োতলায় বাঘের ডাক শুনেছি, তখন তুমি কোথায়? তখন এত দালানকোঠাও ছিল না।

ইলেকট্রিসিটি ছিল না। বাজার ছিল না। হাট বসত হপ্তায় দুটো দিন। আর এখন দেখ, দু'বেলা হাট বসছে চৌমাথায়। এদিকে সারাক্ষণ রাস্তায় ভিড়—ট্রাক, বাস, টেম্পো, রিকশো।

রেবা চোখ কটমটিয়ে বললেন, সে কথা নয়। আমি কী বলতে চাইছি, আর আপনি কি বলছেন!

দমে গিয়ে চারুবালা বললেন, বলো খুকু, শুনি।

চাপা গলায় রেবা বললেন, আজকাল তো আইন হয়েছে রে বাবা! অ্যাবর্সান যদি করাবি, টাউনে মাতৃসদনে যা। নয় তো হাজারটা নার্সিং হোম হয়েছে—পয়সা থাকলে। এখনও বুড়োতলায় নালা? রেবা হাসতে লাগলেন।

লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে চারুবালা বললেন, ও। তাই?

বুড়োতলার নালার ধারে গ্রামের আঁতুড়ঘরের আবর্জনা ফেলার জায়গা আছে। চারদিকে কাঁটামাদার কেয়াঝোপ আর ফণিমনসার জঙ্গল। কখনোসখনো সেখানে মৃতজাতক পুঁতে দিয়ে আসে গ্রামের ধাইমারা। কখনো-সখনো দেখা গেছে কুমারী মায়ের নাড়িছেঁড়া একটুকরো ভ্রূণও। কাঠ-কুড়ুনি মেয়েদের নজর এড়ানো কঠিন। গ্রামে রটতে দেরি হয় না। আর একদল মানুষও আছে, যারা তারিয়ে তারিয়ে নোংরা দেখতে পছন্দ করে। চলে এসে ভিড় করে দেখতে থাকে। পুরুষ হলে গোঁফের ওপর হাত, স্ত্রীলোক হলে নাকে আঁচল এবং বারবার মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলার ঢঙ। তারপর কিছুদিন ধরে গোপন গোয়েন্দাগিরি। কুমারী এবং বিধবার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত। চারুবালারও এই বাতিক আছে। কিন্তু রেবা এখন বিয়ের পর থেকে দজ্জাল মেয়ে। কৃপাসিন্ধু অকুস্থলে চলে গেল কোন আক্কেলে? এক ফাঁকে চারুবালা রত্না বউমার ঘরে ঢুকে পড়লেন। তখনও ছায়া জানালায় উঁকি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। চারুবালা ভাইঝিকে ঠেলে বললেন, কই, সর তো দেখি, কী হয়েছে।.....কৃপাসিন্ধু হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল।

বুড়োতলার ওই নালা সম্পর্কে একটা বিভীষিকাময় অবচেতনা আছে দোগাছিয়ার। আজকাল আর কেউ ভূতপ্রেত মানে না। তবু ভূতের ভয়টা ওই অবচেতনাগত একটা বোধ। রাতে কখনো দক্ষিণের জানালা খুলে কৃপাসিন্ধুর মনে হয়েছে, যদি সত্যি কিছু থাকে! তখন যদি তাকে একা যেতে বলা হয় বুড়োতলার দিকে, সে বন্দুক নিয়েও পা বাড়াতে পারবে না। দিনদুপুরেও ছমছমে নির্জনতায় কেমন যেন দুর্জ্ঞেয় প্রাণীতে পরিণত হয় জায়গাটা। কাঁটামাদারের গাছগুলো, কেয়া আর ফণিমনসার ঝোপগুলো রহস্যময় অসংখ্য চোখে যেন তাকিয়ে থাকে তার দিকে। নদীর দিক থেকে নিচু মাঠের ওপর দিয়ে হঠাৎ একটা বাতাস আসে ঘুরপাক খেতে খেতে বুড়োতলায় ঢুকলেই তার ধুলস্থুল যায় বেড়ে। খড়কুটো, ন্যাকড়াকানি, হলদে পাতার পোশাক পরে অশরীরীর নাচন। ফণিমনসার কাঁটায় সাপের খোলস পত পত করে ওড়ে। আসলে [illegible] বহু জন্ম-মৃত্যু, রক্ত ও গোপন কান্নাকাটি, অতৃপ্ত বাসনা-কামনা এবং [illegible] অমরতা নিয়ে এই একটা ভূগোল।

ছেলেবেলায় কৃপাসিন্ধু [illegible] সময় ওই নালার জলে একটা কাতলা মাছ ধরেছিল। ধরেছিল বলা ঠিক নয়, মাছটা হঠাৎ তার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়েছিল।
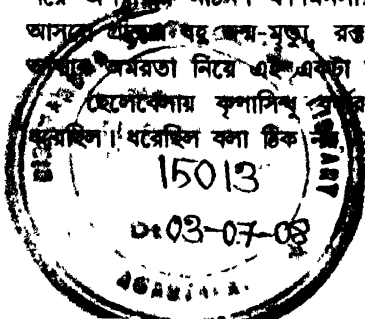
খানের জল ঢুকছে নাকি দেখতে এসে এই অদ্ভুত ঘটনা। কিন্তু মাছটা খাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত। ছ্যা ছ্যা, ফেলে দিয়ে আয় এক্ষুণি, এই বলে হাত নেড়ে মায়ের সে কী চিক্কুর! বুড়োতলার নালার মাছ ভদ্রলোকে খায় না। আঁতুড়ের আবর্জনাধোয়া জল। তার ওপর কত অসতীর ঘৃণ্য শরীরস্রাব।

অথচ কৃপাসিন্ধু দেখেছে, ওই নালার কলমি আর শুসনি শাক তুলে নিয়ে যায় গ্রামের কুড়ুনি গরিবগুরবো মেয়েরা। শীতে পাঁক ঘেটে মাছ ধরে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমাদার চাঁদঘড়ির শূওরের পাল নরম মাটি খুঁড়ে শেকড়বাকড় খোঁজে। এই বসন্তে নালার বুকে দূর্বাঘাসের চাবড়া। কন্টিকারি, কুকুরশুঁকো, হাতিশুঁড়ো এইসব কতরকম গুল্ম। বদ্যিবুড়ি ঝুরন মেঝেন জড়িবুটির খোঁজে কাটারি হাতে কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়ায় নালার ভেতর। কখনো কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে হাড়কুড়োনি কোনো ধাঙড়কন্যা উদাস চাউনিতে নালার বুকের দিকে চোখ রেখে হেঁটে যায়।

কাল রাতে বাড়ি ফিরে কৃপাসিন্ধু দক্ষিণের জানালার কাছে বসে সিগারেট টানছিল। একটু গরম পড়েছে। রাতের ঝড়ের পর দোগাছিয়া জুড়ে অন্ধকার ছিল। লোডশেডিং নয়। ঝড়ে কোথায় হয়তো বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে। খুঁটি উপড়েছে। প্রতি বছর এমনটা হয়।

জানালার পর্দা সরিয়ে যেন বিভীষিকাকেই খুঁজছিল কৃপাসিন্ধু। রত্না ততক্ষণে আবার ঘুমে কাঠ। ঝলমলে জ্যোৎস্নায় ভিজে নিসর্গ বুড়োতলার সীমানা অব্দি রহস্যময় হাতছানির মতো, এবং হঠাৎ ওদিকে এক ঝলক আলো দেখে চমকে উঠেছিল কৃপাসিন্ধু। পরে ভেবেছিল ভুল দেখল নাকি! বুড়োতলার ওখানে আলো দেখার গল্প সে শুনে আসছে ছোটবেলা থেকে। এই হয়তো প্রথম সে দেখতে পেল। জানালাটা তক্ষুনি বন্ধ করে দিয়েছিল সে। ঠিক ভয় নয়, একটা অস্বস্তি। যদি অশরীরী আত্মা বলে কিছু সত্যিই থাকে?

সকালে মোটর সাইকেল ধুতে ধুতে কথাটা মনে পড়ায় তার হাসি পাচ্ছিল। সে সাহসী ও জেদী মানুষ বলে এ তল্লাটে বিখ্যাত। রাতবিরেতে সে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পায় না। অথচ নিজের ঘরে ফিরে ওই দক্ষিণের জানালায় দাঁড়ালেই সে ভিতু গোবেচারা হয়ে যায়।.....

কৃপাসিন্ধুকে দেখে ভিড়টা নড়েচড়ে গেল। খেপু, এস। বয়স্করা ডাকছিলেন। খেপুদা, দেখুন তো কী ব্যাপার। কমবয়সীরা চেঁচিয়ে উঠল। কৃপাসিন্ধু বলল, কী হয়েছে। এমন করে কী দেখছ সব?

হিনু কৃপাসিন্ধুর হাত ধরে নালার পাড়ে ওঠালো। বলল, দেখুন তো খেপুদা, ওটা কী?

রাখহরি চক্কোত্তি নাক কুঁচকে বললেন, আমি বলছি ওটা একটা কাটা মুন্ডু। তবু খালি তক্ক।

কৃপাসিন্ধু বলল, কই?

হিনু লাফ দিয়ে নালায় নেমে গেল। তারপর জিনিসটার কাছে গিয়ে বলল, দেখছেন খেপুদা?

কৃপাসিন্ধু এতক্ষণে দেখতে পেল। কন্টিকারির ঝাড়ের ভেতর চাঁদঘড়ির শূওরেরা বেপরোয়া খুর চালিয়ে মাটি উদোম করে দিয়েছে। কাত হয়ে গেছে কিছু কন্টিকারি এবং উপড়েও গেছে কয়েকটা। তার মাঝখানে নরম কাদামাটিতে মাখামাখি কী একটা পড়ে আছে। একরাশ চুলের গোছার মতো জিনিসটা। খানিকটা রক্তও মেখে গেছে কালো কাদায়।

কৃপাসিন্ধু অবাক হলো, এতক্ষণ ধরে এই সন্দেহজনক জিনিসটা এতগুলো লোক মিলে দেখছে এবং জল্পনা করছে। অথচ পরীক্ষা করার জন্য কেউ হাত লাগায়নি। সে পাশের ঝোপ থেকে একটা ডাল ভাঙতে গেল।

তাই দেখে হিনু ঝটপট পায়ের কাছ থেকে একটুকরো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে নিল। নালার পাড় থেকে তার দাদা যখন চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাই হিনে! ছুঁবি না বলছি!

খেপুদার চেলা হিনু। খেপুদাকে দেখে সে এখন বেপরোয়া। কাঠটা দিয়ে জিনিসটা উল্টে দেখার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কাদার মধ্যে আটকে গেছে ওটা। জোরে চাপ দিতে দিতে সে বলল, প্রথম আমারই চোখে পড়েছিল, খেপুদা! একটা কুকুর মুখ ঢুকিয়ে টানাটানি করছিল দেখে—ইশ! এগুলো রক্ত না কী? উরে ব্বাস!

জিনিসটা উল্টে দিয়ে সে আঁতকে দু'পা পিছিয়ে গেল। রাখহরি চক্কোত্তি দম-আটকানো গলায় বলে উঠলেন, বলেছিলাম কাটা মুন্ডু।

ডাল ভেঙে কৃপাসিন্ধু নালায় নামল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার বুকের ভেতর ঠান্ডা হিম একটা ঢিল গড়িয়ে গেল। জিনিসটা যে সত্যিই মানুষের মাথা, তাতে কোনো ভুল নেই। মুখের চামড়া আর মাংস কামড়ে খেয়ে ফেলেছে কোনো জানোয়ার—হয়তো হিনুর দেখা কুকুরটাই। চোখ আর নাকের জায়গায় লাল গর্তে থলথলে জেলির মতো কী মেখে আছে। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, হুঁ।

নালার পাড় থেকে একজন-দুজন করে সরে যাচ্ছে এবার। ব্যাপারটা গোলমেলে এবং থানা-পুলিশের এক্তিয়ারে এসে গেল টের পেয়েই কেটে পড়ছে একে-একে। রাখহরি চক্কোত্তি দোনামনা করছিলেন। বললেন, কী মনে হচ্ছে খেপু? মেল, না ফিমেল?

হিনু বলল, ফিমেল নয়। মেল। চুল দেখে বুঝতে পারছেন না?

জগন বলল, খুব হয়েছে। উঠে আসবি তো এবার?

হিনু গ্রাহ্য করল না। কাঠটা ফেলে দিয়ে বলল, খেপুদা, খুব মিসট্রিয়াস ব্যাপার, না?

কৃপাসিন্ধু ভারি শ্বাস ছেড়ে বলল, হিনু! তুই একবার থানায় যা না ভাই। আমি থাকছি। যাবার পথে পূর্ণ চৌকিদারকে বলে যাস।

হিনু চলে গেলে কৃপাসিন্ধু পাড়ে উঠে এল। কাটামাদারের গাছে দুটো কাক ওত পেতে বসে আছে। নালার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে সেই কুকুরটাই জিভ চাটছে। কৃপাসিন্ধু ডালটা তুলে কুকুরটাকে শাসিয়ে বলল, যাঃ! ভাগ! কুকুরটা তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

তখন দুটো উৎসাহী ছেলে ঢিল কুড়িয়ে তাড়া করতে গেল তাকে। কৃপাসিন্ধু সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে থাকল।

চক্কোত্তি ছাড়া সব প্রবীণই কেটে পড়েছেন। জগনও রাগী মুখে চলে গেল। জনাকতক তরুণ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা একবার কাটা মুন্ডুটার দিকে একবার কৃপাসিন্ধুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। চক্কোত্তি কৃপাসিন্ধুর কাছ ঘেঁষে এলেন। চাপা স্বরে বললেন, কিছু বুঝলে খেপু?

কৃপাসিন্ধু একটু হাসল। কী বুঝব? যা বোঝবার, পুলিশ এসে বুঝুক।

না-মানে আমি বলছি কী, চেনা-টেনা মনে হয় কী না?

কৃপাসিন্ধু আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, না।

চক্কোত্তি থুথু ফেলে বললেন, খুঁজলে বডিটা পাওয়া যাবে। হয়তো নালাতেই কোথাও পুঁতে রেখেছে। শুধু একটাই মিসট্রি, মুন্ডুটা পুঁতল না কেন? একেবারে টাটকা মুন্ডু লক্ষ্য করেছ? হয়তো কাল রাত্তিরেই—

কৃপাসিন্ধু চমকে উঠে তাকাল চক্কোত্তির দিকে। কাল রাতে এখানেই কি একঝলক টর্চের আলো দেখেছিল?

চক্কোত্তি কষ্ট করে একটু হাসলেন। ....দোগাছিয়ারই কেউ হবে। কী বলো খেপু?

বুড়োতলার থানের পেছন থেকে আবার একটা ভিড় আসছে। সামনে পূর্ণ চৌকিদার নীল উর্দিপরা। মাথায় পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে আসছে এবং কাঁধে আটকানো লাঠি।

কৃপাসিন্ধু বুঝতে পারছিল, পুলিশ এসে গেলে এই বুড়োতলা জুড়ে তখন মানুষের হাট বসে যাবে। যারা কেটে পড়েছে, তারাও আবার আসবে। দোগাছিয়ায় খুনখারাপি আজকাল প্রায়ই হয়। বুড়োতলার নালায় কাটা মুন্ডু পড়ে থাকার ব্যাপারটাও নতুন হতো না, যদি ওটা কাচ্চাবাচ্চার মুন্ডু হতো।.....রাখহরি চক্কোত্তি বহুদর্শী বিচক্ষণ মানুষ। তাঁর অনুমানই ঠিক হলো। বুড়োতলার নালা যেখানে নিচু মাঠে শেষ বাঁক নিয়েছে, সেখানে এক বাজপড়া অশ্বত্থ। নালার বুকে আঁকড়ে ধরে আছে গাছটার শেকড়বাকড়। তার কাছে দুর্বাঘাসের চাবড়া বসানো ছিল, কন্টিকারির ঝোপসুদ্ধ। এ তল্লাটে শেয়ালবংশ অনেকদিন আগেই লুপ্ত। তা না হলে তারা ঠিকই টের পেত। বডিটা যে রাতের ঝড়বৃষ্টির আগে পোঁতা হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। এ বসন্তকালে বাজপড়া অশ্বত্থও কচি চিকন পাতায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে ছিল। রাতের ঝড়টা হিংস্র হাতে যথেচ্ছ পাতা ছিঁড়ে তাকে ছন্নছাড়া করতে চেয়েছিল। দুর্বার চাবড়ার ওপর লালচে রঙের একরাশ পাতা পড়ে ছিল। বডিটা টুকরো-টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে পুঁতে রেখেছিল। শুধু বোঝা যায় না, মুন্ডুটা অতদূরে নিয়ে গিয়ে ফেলল কেন? বংকু দারোগা খি খি করে হেসে বলছিলেন, কাউরে প্রেজেন্টেশান দিতে লইয়া যাইতেছিল। শ্যাষে সাহস হয় নাই। ফেলিয়া পলাইয়া গেছে।

চক্কোত্তির মতে, তাও হতে পারে। বুড়োতলার থানের কাছে এসে ভয়টয় পেয়ে কাটা মুন্ডুটা দমাস করে ফেলে পালিয়ে গেছে। জায়গাটা তো চিরকাল ভূতের বাগান। এমনও হতে পারে, যার মুন্ডু সেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সারাটা দিন বাজারে, বারোয়ারিতলায়, ভানু ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে, রিকশোর স্ট্যান্ডে এই রহস্য নিয়ে আলোচনা চলেছে। রাখহরি চক্কোত্তি সবখানে একবার করে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন। প্রাইমারি স্কুলের অবসরভোগী শিক্ষক। দুই মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছেন। ছেলে দুর্গাপুর কারখানায় চাকরি পেয়েছে। চিঠি কিংবা মানি অর্ডারের আশায় ডাকঘরে সকালবেলা গিয়ে বসে থাকেন। তারপর প্রায় সারাটা দিন এবং রাত দশটা অব্দি এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরির নেশা। সবতাতে নাক-গলানে মানুষ।

দোগাছিয়ার কেউ নিপাত্তা হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না এত শিগগির। কত লোক কাজেকর্মে নানা জায়গায় গেছে। কেউ গেছে আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে। কিন্তু ভেতর-ভেতর উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তিতে সেইসব বাড়ির লোকেরা অস্থির।

কৃপাসিন্ধু গুম হয়ে আছে। এদিন তার কোনো কাজে মন নেই। পঞ্চায়েত অফিসেও যায়নি। সেক্রেটারি কাদের আলি এসে কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়ে গেল। বিকেলে সদগোপপাড়ায় একটা বিবাদ ফয়সালার কথা ছিল। সেটা আগামীকাল হবে, বলে পাঠিয়েছে। আজ সারাক্ষণ কৃপাসিন্ধু দক্ষিণের জানালা খুলে সেখানে চেয়ার পেতে বসে আছে। সিগারেটের পর সিগারেট খাচ্ছে। দুপুরে ভালো করে খেতে পারেনি। খালি গা ঘিনঘিনে ভাব। বমি করতে পারলে বেঁচে যেত।

রত্না বড়ো ননদের সঙ্গে কাদের বাড়ি গেছে। রেবা শ্বশুড়বাড়ি থেকে এলেই এরকম। কৃপাসিন্ধু জানে, বড়দি গ্রামের বাড়ি-বাড়ি নাগরিক জেল্লা দেখাতে যায়। বাড়িটা আজ ভীষণ স্তব্ধ যেন। চারুবালার সাড়া নেই। ছায়া হয়তো বি. ডি. ও.-র কোয়ার্টারে আড্ডা দিতে গেছে। বি. ডি. ও.-র বউ কৃপাসিন্ধুর দূর সম্পর্কের বোন, এটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘটনা। তারপর থেকে ছায়াকে আর আটকানো চলে না। নইলে বোনের চলাফেরা সম্পর্কে কৃপাসিন্ধুর কড়াকড়ি ছিল এতদিন।

বুড়োতলার নালার দিকটায় তাকিয়ে সিগারেট টানছিল কৃপাসিন্ধু। রাত্তুর ঝড়বৃষ্টির পর সারাদিন ঝলমলে রোদ। বৃষ্টিধোয়া নিসর্গ খুব প্রাণবন্ত। তার ওপর ঝড়ের নখের আঁচড়ের মতো বিভীষিকার ছায়া-কুটিকুটি আভাস ফুটে বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে। রোদ যত কমে যাচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে ওই বিভীষিকার শরীর।

রোদ একেবারে মুছে গেলে কৃপাসিন্ধু জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর মনে পড়ল, বিদ্যুৎ নেই। ট্রান্সমিটারে নাকি বাজ পড়েছিল। বিদ্যুৎ আসতে এক হপ্তার ধাক্কা। পিসিমা, আলো! বলে কৃপাসিন্ধু আবার বসে পড়ল। শরীরের ভেতর থেকে ধস ছাড়ার মতো অনেককিছু ধসে গেছে যেন। মাথার ভেতরটাও শূন্য লাগছে।

চারুবালা চুপচাপ লন্ঠন রেখে গেলেন। তারপর বারান্দার তাক থেকে শাঁখটা নিয়ে ফুঁ দিলেন। গোয়ালঘরের দিকে রাখাল ছেলেটার চিৎকার শোনা গেল, পিসিমা! আলো!

কৃপাসিন্ধু একটা কাটা মুণ্ডুর কথা ভাবছিল। আজ সকালেরটা নয়, অন্য একটা। ছেলেবেলার দোগাছিয়া স্কুলের পেছনের মাঠে সেবার ম্যাজিকের তাঁবুর ভেতর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁবুটা ছিল ছোট। ভেতরে কোনো স্টেজ ছিল না। কালো প্যান্ট কোট আর সাদা শার্ট-পরা ম্যাজিশিয়ান এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। শেষ

খেলাটা ছিল কাটা মুন্ডুর কথা বলা।

কোনায় একটা কাঠের টব। দুজন সহকারী কালো কাপড়ে পর্দার মতো ঘিরে রেখেছিল টবটা। পেছনে ম্যাজিশিয়ান দাঁড়িয়ে। সে অনর্গল কথা বলছিল কাটা মুন্ডু সম্পর্কে। তারপর পর্দা সরিয়ে নিয়ে সহকারী চলে যেতেই কৃপাসিন্ধু অবাক। টবের ওপর সত্যি একটা কাটা মুন্ডু। গলার কাছে চাপচাপ রক্ত। অথচ মুন্ডুটা জীবন্ত। মুচকি হাসি তার ঠোঁটে। মাঝে মাঝে ভুরু তুলে চোখদুটোও নাচাচ্ছে।

ম্যাজিশিয়ান একটা শাদা হাড় মুন্ডুটার মাথায় ঠেকিয়ে বলল, এবার কাটা মুন্ডু কথা বলবে। মা-সকল, বাবা-সকল, ভাইভগ্নী-সকল, খোকাখুকুরা! একবার জোরসে হাততালি দাও—জোরসে।

হাততালির পর ম্যাজিশিয়ান বলল, কাটা মুন্ডু! তোর নাম কী?

কৃপাসিন্ধুর এখনও স্পষ্ট মনে আছে কাটা মুন্ডুটাকে, অবিকল কানে ঢুকে আছে তার কন্ঠস্বরও। কেমন গোঙিয়ে ওঠা, ঘড়ঘড়ে এবং নাকি তার কন্ঠস্বর। শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল কৃপাসিন্ধুর। কাটা মুন্ডু বলল, ঘঁংঘায়াম!

ম্যাজিশিয়ান দাঁত কিড়মিড় করে বলল, স্পষ্ট করে বল কাটা মুন্ডু! কী নাম তোর?

কাটা মুন্ডু আবার বলল, ঘঁংঘায়াম।

ম্যাজিশিয়ান হাসতে হাসতে বলল, বুঝলেন কিছু? কাটা মুন্ডু বলছে তার নাম গঙ্গারাম। তো ওরে বাবা গঙ্গারাম, তোর দেশ কোথায়?

কাটা মুন্ডু বলল, কাঁটিহাড়!

ভয় পাওয়ার ভঙ্গী করে ম্যাজিশিয়ান দু'পা পিছিয়ে বলল, ওরে বাবা! কাটি হাড় বলছে নাকি? শুনছেন আপনারা? হাড় কাটার কথা বলছে। ও বাবা গঙ্গারাম, কলকাতায় হাড়কাটার গলি আছে শুনেছি। এ আবার কেমন হাড় কাটাকাটি বাবা? কার হাড় কাটবে মানিক?

তাঁবুর ভেতর হাসির হল্লা। শুধু কৃপাসিন্ধু কাঠ হয়ে তাকিয়ে ছিল।

কাটা মুন্ডু গোঙানো কন্ঠস্বরে বলল ফের, কাঁটিহাড়! কাঁটিহাড়!

ম্যাজিশিয়ান চেঁচিয়ে উঠল, উরে ব্বাস! কাটিহার বলছে গো! বুঝতে পারছেন তো আপনারা? বিহার মুলুকের সেই কাটিহার। তো বাবা কাটিহারের শ্রীমান গঙ্গারাম, তোমার মুন্ডুটি কাটল কে?

কাটা মুন্ডু বলল, ঘঁড়েশ ভোঁস।

ম্যাজিশিয়ান একটু ঝুঁকে শোনার ভঙ্গী করছিল। চমকে ওঠার ভান করে সোজা হয়ে চাপা গলায় বলল, সর্বনাশ! কী নাম বলল যেন—

কাটা মুন্ডু বেজার মুখে ফের উচ্চারণ করল, ঘঁড়েশ ভোঁস।

ম্যাজিশিয়ান চোখ বড়ো করে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, ওরে বাবা। এ যে গণেশ বোস বলছে। গণেশ বোস যে আমারই নাম। আমায় ফাঁসিতে চড়তে হবে যে! এক্ষুণি পুলিশবাবুরা যদি জানতে পারেন, প্রোফেসর গণেশ বোস কাটিহারের গঙ্গারামের মুন্ডু কেটেছে, তাহলেই হয়েছে। কাজেই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা করে কাটা মুন্ডুটা লুকিয়ে ফেলা যাক।

সহকারীরা দৌড়ে এসে কালো কাপড়টা ঘিরে ধরল কাটা মুন্ডুর চারপাশে। তারপর খেলা শেষ।

এই খেলাটা মাঝে মাঝে খেলত নিজের সঙ্গে কৃপাসিন্ধু। বুড়োতলার থানে নির্জনে দাঁড়িয়ে প্রোফেসর গণেশ বোসের গলায় বলত, কাটা মুন্ডু, তোর নাম কী?

ঘঁংঘায়াম?

তোর দেশ কোথায়?

কাঁটিহাঁড়।

কে তোর মুন্ডু কাটল?

কৃপাসিন্ধু মুচকি হেসে বলত, খেঁপু। তারপর হি হি করে এমন হাসত সে হাফপেন্টুল খুলে যেত বোতাম ছিঁড়ে। নিজের ডাকনাম খেপুটা সে অবোধ বয়স থেকে শোনার ফলে সহজভাবেই নিয়েছিল। এ বয়সেও কেউ তাকে কৃপাসিন্ধু বলে ডাকলে অচেনা লাগে। খেপু আর কৃপাসিন্ধু সে কিছুতেই মেলাতে পারে না।...

সর্বাণী খিড়কির ঘাটের ধারে ঘাসের ওপর নকশাকাটা একটুকরো চটের আসন বিছিয়ে বই পড়ছিল। বিকেলবেলাটাতে এইটুকুই তার বিলাস। এটাকে পুকুর বলতে ইচ্ছে করে না, আয়তনে নেহাত ডোবাই। কিন্তু পুকুরের সব লক্ষণ এই জলটুকুর আছে। মধ্যিখানে একঝাঁক লাল শালুক আছে। কিছু সবুজ পানাপাতা সাজানো আছে এখানে-ওখানে সরু সরু শাদা ফুলের ফুটকি নিয়ে। ওপারে কোনার দিকে একদঙ্গল কলমি শাক শরতে বেগুনি ছোপ লাগা সাদা ফুল দিতে শুরু করেছিল। এখন বসন্তেও কিছু টিকে আছে। বীরেশ্বরের হামলায় মাঝে মাঝে ফর্দাফাঁই হয়ে যায় কলমিলতার সৌন্দর্য। শাক খেতে খুব ভালবাসে সে। মাঝে মাঝে বলে, খানিকটা শুসনি শাকের লতা এনে ফেলে দেব। সর্বাণী শাসায়, বুড়োতলার নালা থেকে তো? এনেই দেখো না, কী করি। সর্বাণী দোগাছিয়ারই মেয়ে। সে বুড়োতলার নালার অনেক রহস্য জানে।

প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার বীরেশ্বরের পৈতৃক সম্পত্তি বলতে এই মাটির বাড়িটা আর পেছনের জলটুকু। সর্বাণীর তাগিদে তিন পাড় কাঁটাবেড়ায় ঘিরে সামান্য এক সজিখেত আর কিছু ফুল গাছ হয়েছে। এদিকটার ঘাটের পাশে কলাগাছ মাথা তুলেছে। এই প্রথম মোচা এসেছে একটাতে। সর্বাণী বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মুখ তুলে মোচাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। রোদ মুছে এলে সে বই রেখে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সজিখেত আর ফুলগাছে জল দিতে যায়। বীরেশ্বর টিনের ঝারি এনে দিয়েছে শহর থেকে। কোনো কোনোদিন কুনাইপাড়া বাউরিপাড়া হাড়িপাড়ার মেয়েরা কেউ কেউ দরখাস্ত লেখাতে আসে। বীরেশ্বরকে না পেলে সর্বাণী আছে। সর্বাণীর হাত থেকে জলের ঝারিটা কেড়ে নেয়। ভদ্রলোকের মেয়ের কি এই কাজ বাবুদিদি? আমনি দরখাস্ত নেকুন, আমি জল দিচ্ছি আমনার বাগানে।

সর্বাণী তাদের মুখে তার প্রিয় বাগানটুকুর প্রশংসা শুনতে চায়। গাছপালা ফুলফল আর মাটির রহস্য হয়তো তার চেয়ে ওরাই বেশি জানে। বেগুনে পোকা লাগলে কী করতে হয়, তারাই তাকে বাতলে দিয়ে যায়। কোনার দিকে কালোর বউ একটা

কাকতাড়ুয়া বানিয়ে দিয়ে গেছে। বীরেশ্বরের ছেঁড়া পাঞ্জাবি সেটার গায়ে। মাথাটা একটা কেলে হাঁড়ির, তাতে চুন দিয়ে চোখমুখ আঁকা। কালোর বউ মুখে আঁচল চেপে হাসি ঢেকে বলেছিল, থাকো তুমি সাক্ষাৎ মাস্টের মশাইটি হয়ে। সর্বাণীও হেসে অস্থির। বীরেশ্বর বাড়ি ফিরলে বলেছিল, দেখ গে তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি বাগানে। শুনে বীরেশ্বর দেখতে গিয়েছিল টর্চ নিয়ে।

কাল রাতের ঝড়ে কাকতাড়ুয়াটা পড়ে গিয়েছিল। সকালে আবার খাড়া করে দিয়েছে সর্বাণী। কাল রাতের ঝড়টা যা সাংঘাতিক গেছে, সর্বাণী খুব ভয় পেয়েছিল। পুজোর সময় চালের খড় ফেলে বীরেশ্বর টালি চাপিয়েছে। টালির চালের ওপর পেছনের নিমগাছের ডাল আছড়ে পড়ছিল। আর কী সব অদ্ভুত ভাঙচুরের শব্দ। এমন রাতে আবার হাবুর মায়ের জ্বর। শুতে আসেনি সর্বাণীর কাছে।

সকালে উঠোন জুড়ে খড়কুটো ছেঁড়াপাতা ডালপালা পাখির বাসা— সে এক আবর্জনা। সাফ করতে ক্লান্তির একশেষ। দুপুরটা ঘুমিয়েই কাটিয়েছে সর্বাণী। তারপর কুকার জ্বেলে চা করে বই আর চটের আসন হাতে ঘাটে এসেছে। এদিকটায় তার মন পড়ে থাকে।

ডোবার জল থেকে রোদ মুছে আসছিল। জলমাকড়সাগুলো তর তর করে অসম্ভব গতিতে জলের ওপর ছুটে বেড়াচ্ছিল। দিনশেষের এই সময়টাতে কেমন ঘোর-ধরা আচ্ছন্ন একটা ভাব এসে যায়। বইয়ের পাতায় মন বসে না আর। কোথায় বাছুরের গলায় ঘন্টা বাজে। গাইগরু হাম্বা করে ডেকে ওঠে। কেউ চই চই বলে হাঁসগুলোকে ডাকতে থাকে বেনেদীঘির জলে—এত দূর থেকেও কানে ভেসে আসে। মাথার ওপর দিয়ে পাখি উড়ে যায়। মাঝে মাঝে পিচ রাস্তার দিকে মোটরগাড়ির হর্নের শব্দ। তারপর চাপা গরগর গর্জন মিলিয়ে যায় ক্রমশ। আকাশে শেষবেলায় একটা প্লেন। সর্বাণী প্লেন দেখতে দেখতে সিংহবাহিনীর মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজল।

বাইরে কেউ কড়া নেড়ে ডাকছিল। সর্বাণী আসন গুটিয়ে উঠে পড়ল। বীরেশ্বরের গলা নয়। তার ফেরার কথা আগামীকাল অথবা পরশু। আজ আর বাগানে জল দেবার দরকার নেই। রাতের বৃষ্টিটা যথেষ্টই। সর্বাণী বারান্দায় আসন আর বইটা রেখে দরজা খুলতে গেল।

রাখহরি চক্কোত্তি ঢুকেই চাপা স্বরে বললেন, বীরু ফেরেনি?

সর্বাণী একটু অবাক হয়ে বলল, না। ওদের তো আজ অব্দি কনফারেন্স। তারপর ডেপুটেশনে যাবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। কেন জ্যাঠামশাই?

এমনি। চক্কোত্তি হাসলেন।

আপনি বসুন জ্যাঠামশাই।

সর্বাণী সেই আসনটা বারান্দায় পেতে দিলে চক্কোত্তি পা ঝুলিয়ে বসলেন। বইটা একবার পাতা উল্টিয়ে দেখে রেখে দিলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, আজ সারাটা দিন মনটা খুব অস্থির, সাবি! বুড়োতলার নালায়—

সর্বাণী দ্রুত বলল, ও হ্যাঁ। মোনা বলছিল, ডেডবডি পেয়েছে একটা। কার জ্যাঠামশাই?

সেটাই তো রহস্য। চক্কোত্তি গলার ভেতর বললেন। বললাম না মনে শান্তি নেই সারাটা দিন?

চেনা যাচ্ছে না?

না। চক্কোত্তি একটা হাত কাটারির কোপ মারার ভঙ্গীতে নেড়ে বললেন। পিস বাই পিস কেটেছে।

কিন্তু কাপড়চোপড় জ্যাঠামশাই? কাপড় নেই পড়নে?

উঁহু। নেকেড করে কেটেছে। চক্কোত্তি করুণ হাসলেন। কী বর্বর রসিকতা দেখ সাবি, মুন্ডুটা কেটে অন্য জায়গায় ফেলে পালিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, কাউকে প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছিল। ভয় পেয়ে ফেলে পালিয়েছে।

সবর্ণী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, দেখছ, মোনা আমাকে এসব কিচ্ছু বলেনি। আচ্ছা জ্যাঠামশাই, কাটা মাথাটা দেখে মুখটা তো চেনা যাবে? তাই না?

চক্কোত্তি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, যাবে কী করে আর? কুকুরে খুবলে সব খেয়ে ফেলেছে। রায়েদের হিনু সকালে ওখানে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায়।

সবর্ণী চুপ করে রইল। একটু পবে চক্কোত্তি বললেন, পুলিশের যা কাজ! কাটা মুন্ডু আর বডি টাউনের মর্গে চালান করে দিয়েছে। কালকের দিনটা নাকি রেখে দেবে। কেউ শনাক্ত যদি করে, করবে। তবে আমার ধারণা, শনাক্ত দুঃসাধ্য।

সবর্ণী আস্তে বলল, আপনি দেখেছেন?

দেখেছেন কী বলছ? আগাগোড়া আমিই তো গাইড করে—চক্কোত্তি আবার শ্বাস ছেড়ে থেমে গেলেন। পা দুটো নাচাতে থাকলেন।

সবর্ণী বলল, আপনি একটু বসুন জ্যাঠামশাই। চা করি।

সে লন্ঠন জ্বেলে বারান্দায় একটু তফাতে রাখল। তারপর রান্নাঘরে চা করতে গেল। চক্কোত্তিকে চা খাওয়ানোর মানে হয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ মানুষের সঙ্গ হঠাৎ প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সবর্ণীর। কুকার জ্বালানোর সময় তার হাত কাঁপছিল। বীরেশ্বর কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মেলনে গেছে। আগামীকাল বা পরশু বিকেলের মধ্যে তার ফেরার কথা। তাছাড়া সে তো একা যায়নি। এলাকা থেকে একদল প্রতিনিধি নিয়ে গেছে। সবর্ণী টের পাচ্ছিল, তবু খুব ভেতরদিক থেকে একটা উদ্বেগ যেন আঙুল বাড়িয়ে দিচ্ছে-হয়তো চক্কোত্তিজ্যাঠার এমন করে এসে বীরেশ্বরের কথা জিগ্যেস করাটাই কাল হয়েছে। আগুনের নীল শিখা দপদপ করছে। বুকের ভেতরও ওই রকম একটা শব্দ। বীরেশ্বরের এখানে অনেক শত্রু। দোগাছিয়ায় সে ক্রমশ কোণঠাসা এবং একঘরে হয়ে পড়েছে। গত শীতে ক্ষেতমজুর সমিতি করে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। তাছাড়া ভাগচাষীদের কৃষক সমিতি মাঠ থেকে ধান তুলে বারোয়ারি খামারে উঠিয়েছিল। পুলিশ যায়নি। কিন্তু সবর্ণী জানে, বীরেশ্বরই এর পেছনে ছিল। তার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, নিজের জমি নেই বলেই কি বীরেশ্বরের এত রাগ জমিওলা মানুষদের ওপর? বীরেশ্বরকে কিছু বলতে গেলেই বলে, তুমি তো জানো আমি কী। তুমি কি জানো না ইচ্ছে করে আগুনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে এসেছ? সবর্ণী ওর বলার ভঙ্গি দেখে শেষে হেসে ফেলে। থাক, আর নিজের সম্পর্কে বড়াই করতে

হবে না। সর্বাণী একথা মুখে বললেও ভালোই জানে, বীরেশ্বর সত্যিই একটা আগুন। আগুন বলেই তো রাতারাতি তার ঘর করতে আসার সাহস পেয়েছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে চক্কোত্তি বললেন, বীরুর জন্য ভাবনা হয়। খামোকা লোকের সঙ্গে ঝামেলা করে বেড়ায়। যাদের জন্য এসব করে বেড়াচ্ছে, তারা কি ওকে দুঃসময়ে দেখতে আসবে ভাবছ? দোগাছিয়ার লোককে এখনো চেনেনি ও। যে পাতে বসে খাবে, সেই পাতে বসেই উল্টে চোখ রাঙাবে।

সর্বাণীর মনে হলো স্বামীকে সমর্থন করা উচিত। একটু হেসে বলল, সময়টা এখন বদলে গেছে না জ্যাঠামশাই? নিজেদের স্বার্থ সবাই বুঝে নিতে শিখে গেছে। চোখ রাঙানোর কথা বলছেন--আমার মনে হয়, লোকে জানে কে সত্যিকার বন্ধু আর কে সত্যিকার শত্রু।

চক্কোত্তি চুপচাপ চা খেতে থাকলেন। মাখন কোবরেজ ছিলেন তাঁর ছোটবেলা থেকে বন্ধু। তার মেয়ের সঙ্গে তর্ক করার প্রবৃত্তি হয় না। কোবরেজের মৃত্যুর পর অসহায় বিধবা আর এই মেয়ের দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। সর্বাণী কায়েতের ছেলেকে রাতারাতি বিয়ে করে বসেছিল, সেই দুঃখে আর লজ্জায় বিধবা ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন তো গেলেন, আর খবর নেই। এদিকে মেয়েরও এমন শক্ত প্রাণ, ভুলেও মায়ের নাম মুখে আনে না। অবশ্য রতনে রতন বলে কথা আছে। যেমন গোঁয়ারগোবিন্দ বীরেশ্বর, তেমনি—তা কেন, তারও এককাঠি সরেস এই মেয়ে। গ্রামের এক টেরে এই নিরিবিলি জায়গায় একা দিব্যি থাকতে পারে। বীরেশ্বরেরও এতে কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। যেইসান কে তেইসান। চক্কোত্তির নাকের ডগা বেঁকে গেল।

মজার কথা, খেপুই বিয়ে করতে চেয়েছিল সাবিকে। খেপুর সঙ্গে বিয়ে হলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত মেয়েটা। তার মাকেও লজ্জায় পড়ে পালাতে হতো না পরান্নের প্রত্যাশী হয়ে। খেপুও তেজি ছেলে —বীরুর জুটি বললেও চলে। কিন্তু তত বেশি গোঁয়ার নয়। বোঝালে বোঝে এবং স্বভাবে অত্যন্ত ভদ্র। চক্কোত্তি দুজনকেই প্রাইমারিতে পড়িয়েছেন। পড়া না পারলে দুজনের মাথায় টুং লাগিয়ে দিয়েছেন।

তারপরেও তো ওদের মধ্যে ভাব ছিল দেখেছেন। খেপু কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে ছিল। জোতজমিওলা বাড়ির ছেলে। পড়াশোনায় তত মন ছিল না। বীরুকে বাধ্য হয়ে মন দিতে হয়েছিল। বি এ পাশ করে মাস্টারিটা জুটিয়ে বি টি-ও পড়ে নিয়েছে। শেষে পলিটিক্স ওকে খেল। খেপুর যা সাজে, বীরুর কি সাজে?

চক্কোত্তি তেতোমুখ করে বললেন, উঠি সাবি।

সর্বাণী দরজা অব্দি এগিয়ে দিতে গেল দরজা বন্ধ করার জন্য। নইলে তার শরীরটার কেমন হঠাৎ ধসছাড়া অবস্থা। চক্কোত্তিজ্যাঠা এমন করে এসে বীরেশ্বরের কথা জিগ্যেস করলেন!

আজ বাড়িটাও খুব নির্জন আর স্তব্ধ লাগছে সর্বাণীর। আজও কি মাঝরাতে আবার ঝড় আসবে? কালবোশেখির ঝড়ের যেন সেটাই নিয়ম। একবার এলে পর-পর কয়েকটা দিন একই সময়ে আসে।

কিন্তু এখন আকাশভরা তারা। বিশ্বাস হয় না আবার ঝড় আসবে।.....

সকালে কৃপাসিন্ধু বেরুবে ভাবছিল। বিলেপাড়ার কাছে নদীর বাঁধে আজ মাটি পড়বে। অনেক হাঁটাহাঁটির পর মেরামতের টাকা মঞ্জুর হয়েছে জেলা পরিষদ থেকে। বারান্দায় মোটর সাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, আলপথে গাড়ি চালিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

ঘরে কাপড় বদলাতে ঢুকলে রত্না বলল, কোথায় বেরুচ্ছ শুনি?

একটু চটে গেল কৃপাসিন্ধু।....তোমার কী হয়েছে কাল থেকে। আঁচলের আড়ালে পিদিম করবে নাকি?

মুখের ভাষা শোনো!

জানই তো চাষাড়ে মানুষ। কাদামাটি ঘেঁটে বেড়াই। কৃপাসিন্ধু লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পায়ে ঢোকাল। তারপর শার্টটা টেনে নিয়ে ফের বলল, তোমার এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন বুঝতে পারছি না কিন্তু।

রত্না আস্তে বলল, চিত্তচাঞ্চল্য তো তোমারই দেখছি। পরশু অত রাতে ঝড়ের পর ফিরে এলে কোত্থেকে। সারারাত ওই জানালার ধারে বসে কাটালে। কাল সারাটা দিন—তারপর এ রাতেও যতবার ঘুম ভেঙেছে, দেখি ওখানে বসে আছ জানালা খুলে। খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছ। কেন?

কৃপাসিন্ধু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, খুনখারাপি দেখে মন খারাপ। তুমি দেখলে—

থামো! খুনখারাপি কখনও দেখনি? আমি সব জানি।

কী জানো তুমি? কৃপাসিন্ধু বেল্ট আঁটতে আঁটতে গলার ভেতর বলল।

রত্না ঠোঁট কামড়ে কথা খুঁজছিল। একটু পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ঝড়ের রাতে তুমি কোথায় ছিলে?

কৃপাসিন্ধু অবাক হয়ে তাকাল।...কেন—বেণীপুরে।

কক্ষনো না। রত্না হিসহিস করে উঠল। .....তুমি ওই মেয়েটার কাছে ছিলে।

মেয়েটা? কোন মেয়েটা বলো তো?

বীরুবাবুর বউয়ের ওখানে ছিলে তুমি! রত্নার গলা কাঁপছিল। বীরুবাবু নেই—আমি খবর নিয়েছি। তুমি আবার ওখানে নাক গলাচ্ছ, তাও জেনেছি।

রত্না কেঁদে ফেলল। কৃপাসিন্ধু অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হাসতে লাগল। আশ্চর্য তোমার ইমাজিনেশান, মাইরি! একটা কথা বলি শোনো —খেপু এঁটোকাটা খায় না কারুর।

কৃপাসিন্ধু জোরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মোটর সাইকেলটাও তেমনি জোরে উঠোনে নামিয়ে নিয়ে গেল। উঠোনেই স্টার্ট দিল। সদর দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাবার সময় বাড়িটাকে প্রচণ্ড কাঁপিয়ে দিয়ে গেল সে।

পূর্ণ চৌকিদার আসছিল পিচ রাস্তা থেকে। সেলাম দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে কৃপাসিন্ধু মোটর সাইকেল থামিয়ে বলল, কী রে পূর্ণ?

আজ্ঞে, বড়োবাবু জরুরি তলব দিয়েছেন?

কী ব্যাপার ?

আজ্ঞে, কেলেঙ্কারি। পূর্ণ করুণ মুখ করে বলল। স্লুইসগেটের কাছে রক্তমাখা জামাকাপড় পাওয়া গেছে। দুটো স্যান্ডেল জুতোসুদ্ধু। আপনি একটু চলুন স্যার।...

থানার বারান্দায় বড়োবাবু বঙ্কুবিহারী নন্দী বসে ছিলেন। প্রকান্ড টেবিলের ওপর কাগজের মোড়কে রক্তমাখা কাপড় আর স্যান্ডেল। খুলে বললেন, দ্যাহেন কাণ্ডটা।

কৃপাসিন্ধু দেখতে দেখতে বলল, ধুতি পাঞ্জাবি মনে হচ্ছে।

হঃ। বঙ্কুবাবু বললেন। মার্ডার হইছে স্লুইসগ্যাটের ওহানে। বডিটারে কাটছে। কাটিয়া একখানে পুঁতছে। আর হ্যাডটারে লইয়া—

কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, কার ?

মেজবাবু সত্যচরণ পান্ডে বললেন, বীরেশ্বরবাবুর।

কৃপাসিন্ধু নিষ্পলক চোখে তাকাল। বলল, বীরুর! কিন্তু সে তো শুনেছি কলকাতায় আছে। কনফারেন্স না কী হচ্ছে ওদের। কৃপাসিন্ধু শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, কে আইডেন্টিফাই করল ?

বঙ্কুবাবু বললেন, ওনার ওয়াইফ।

পান্ডেবাবু বললেন, রূপপুরের এক টিচার ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে। উনিই আজ ভোরের বাসে ফিরে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। বীরেশ্বরবাবু নাকি কনফারেন্সে ঝগড়া করে গত পরশু দুপুরে চলে এসেছেন।

কৃপাসিন্ধু গলার ভেতর বলল, হুঁ।

পান্ডেবাবু বললেন, মেয়েদের একটা ইনটুইশান থাকে, বুঝলেন না ? তাছাড়া দিস ওয়াজ কোয়াইট এক্সপেক্টেড —যা শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক!

বঙ্কুবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, দুপুর মানে ধরেন, এসপ্ল্যানেডে বাস ছাড়ছে দুইটার পরে। ও বাসে আমি আইলাম না ? দোগাছিয়া আইতে রাইত নয়টা-টয়টা। অত দেরি হওনের কথা না। হক্কল পথ খালি প্যাসেঞ্জার ওঠায়, খালি প্যাসেঞ্জার ওঠায়। বাপ রে বাপ! য্যান ছ্যাকড়া গাড়ি।

কৃপাসিন্ধু বলল, বাস থেকে বীরুকে নিশ্চয় কেউ নামতে দেখেছিল ?

পান্ডেবাবু বললেন, ইনভেস্টিগেশানে জানা যাবে।

বঙ্কুবাবু বললেন, আপনারে ডাকছিলাম, কী ভাবে কী করন যায়। আপনি হইলেন গা এরিয়ার লিডার। আপনারে না জিগাইয়া কিছু করুম না। খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন বড়োবাবু। এরকম হাসি হাসতে না জানলেই বিপদ।

যা ভালো বোঝেন, করুন। কৃপাসিন্ধু উঠে দাঁড়াল। খুনীরা ধরা পড়ুক, সেটাই আমি চাইব। তবে একটা অনুরোধ বড়োবাবু, প্লিজ যেন নির্দোষ লোককে কষ্ট দেবেন না।

কৃপাসিন্ধু মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় গেল। একটু থামল। তারপর সোজা বাজার পেরিয়ে গিয়ে ডাইনে আগাছাভরা জমিটার ওপর সংকীর্ণ পায়েচলা রাস্তায় এগিয়ে গেল। কে তাকে দেখছে বা দেখছে না, গ্রাহ্য করছিল না সে। বুড়োতলার নালার সেই পুরনো বিভীষিকা তার পেছনে। আসলে পালিয়ে কোথাও যেন লুকোতেই

চাইছিল কৃপাসিন্ধু।

কিন্তু বীরেশ্বরের বাড়ির দরজায় তালা দেখে সে মোটর সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে দিল।....

চক্কোত্তি দুবার এসেছিলেন। তৃতীয়বার এলেন সন্ধ্যার মুখে। রেবা চড়া গলায় দোগাছিয়ায় মুন্ডুপাত করছিলেন। তর্কটা ছায়ার সঙ্গে। ছায়া বলে ফেলেছিল, তোমাদের টাউনেও কি কম! সন্ধ্যায মেয়েরা বেরুতে পারে না—তার বেলা? চক্কোত্তি বললেন, খেপু ফিরেছে নাকি? তারপর মোটর সাইকেলটা দেখতে পেয়ে ডাকলেন, অ খেপু!

রত্না বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে মৃদু স্বরে বলল, শরীর খারাপ। শুযে আছেন।

চক্কোত্তির গতিবিধি সর্বত্র অবাধ। চটি ফটফটিয়ে বারান্দায় উঠে সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন ডাকতে ডাকতে। কৃপাসিন্ধু খাটে শুয়ে ছিল। উঠে বসে বিরক্তি চেপে বলল, আসুন জ্যাঠামশাই। তারপর লন্ঠনের দম তুলে আলো বাড়িযে দিল। ফের বলল, বসুন।

চক্কোত্তি দক্ষিণের জানালার ধারে চেযার দেখে বসতে গেলেন। বললেন, অ। তোমার এখান থেকে বুড়োতলা অব্দি নজর হয দেখছি।

চক্কোত্তি বসলে কৃপাসিন্ধু বলল, বলুন।

আমি জানতাম। চক্কোত্তি শ্বাসের মধ্যে বললেন। জানতাম কাটা মুন্ডুটা বীরুরই হবে।

কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, কিছু দেখেছিলেন নাকি?

চক্কোত্তি একটু হাসলেন।...আজ শুক্কুরবার। গত বুধবাব রাত তখন নটা-টটা হবে, গোপালের চায়ের দোকানে বসে আছি। কলকাতার বাসটা এসে একটু থেমে চলে গেল। ওখানটাতে অন্ধকার ছিল। কে একজন নেমেছিল। হনহন করে চলে গেল। মনে হলো, বীরু। গোপাল বলল, বীরু কেন হবে? তার ফেরার কঁথা শুক্কুরবার।

গোপাল বলল!

গোপাল বলল। চক্কোত্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকে বললেন।...গোপালই গন্ডগোলে ফেলে দিয়েছিল আমাকে। নইলে আমি বীরুকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। ধাঁধা কাটছিল না তবু। আসলে গোপালই—

কৃপাসিন্ধু গলার ভেতর বলল, হুঁ।

চক্কোত্তি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, তোমার সাত বিঘে, তারকের দশ বিঘে, আব্দুল ঠিকেদারের তিন বিঘে, হলধরের পাঁচ বিঘে—আরো যেন কার-কাব জমির ধান জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বর্গাদাররা বারোযারিতলায় খামার করেছিল। বীরুই এসব করিয়েছিল। পুলিশ মজা দেখছিল দূরে দাঁড়িযে।

কৃপাসিন্ধু চাপা ও রুক্ষ স্বরে বলল, কী আজেবাজে বলছেন।

চক্কোত্তি একই সুরে বললেন, বর্গা-রেকর্ডের বছরও বীরু নিজে মাঠে মাঠে ঘুরে জে এল আর ও-র সঙ্গে—

আপনি থামুন তো।

চক্কোত্তি অনড়-অটল থেকে বললেন, বুধবার রাতে গোপালের ওখানে আরো ক'জন বসে ছিল। আমি বীরুর নাম করার পরই তারা উঠে গিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি, বীরুর পেছনে সবসময় ওত পেতে বেড়াচ্ছিল খুনীরা। তবে দোষ আমারই খেপু। কেন আমার পোড়া মুখে বীরুর নামটা বেরিয়ে গেল তখন—আমি তো স্পষ্ট করে তাকে চিনতে পারিনি? আমি 'বীরু না কি' না বললে ওরা ছুটে যেত না। ওকে কিডন্যাপড্ করে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে... ঢোক গিলে থেমে গেলেন চক্কোত্তি।

কৃপাসিন্ধু চক্কোত্তির সামনেই সিগারেট খায়। পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন, তবু। কাঁপা কাঁপা হাতে বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করছিল সে। সিগারেট জ্বেলে দেখল, চক্কোত্তি চোখ মুছছেন। সে ধোঁয়ার মধ্যে বলল, চা খান জ্যাঠামশাই।

ইচ্ছে করছে না বাবা। ভাঙা গলায় রাখহরি চক্কোত্তি বললেন। যতবার ভাবছি, বীরুর মাথাটা কোথায় নিয়ে আসছিল ওরা, ততবার খালি মনে হচ্ছে, মাখনের হতভাগী মেয়েটা কি সইতে পারত? যত গোঁয়ার হোক, মেয়েছেলের মন বাবা খেপু, বড়ো কোমল।

কৃপাসিন্ধু সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে নালায় ফেলল কেন মাথাটা?

ভয়ে। বীরুর আত্মা এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। বলে চক্কোত্তি উঠলেন। আরো কিছু বলবেন ভাবলেন। তারপর কয়েক পা এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে ঘুরলেন হঠাৎ। বললেন, সাবির জন্য যত কষ্ট নইলে—

চক্কোত্তি পর্দা তুলে বেরিয়ে গেলে কৃপাসিন্ধু আপন মনে বলল, কষ্ট তো সে যেচে নিয়েছিল।...,

অনেক রাতে, রত্না ঘুম ভেঙে টের পেল কৃপাসিন্ধু বিছানায় নেই। তারপর দেখল দক্ষিণের জানালা খোলা। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার একটা ফিকে হলুদ ফালি বুকে নিয়ে বসে আছে কৃপাসিন্ধু। রত্না কিছু বলল না। অন্য পাশে ঘুরে চোখ বুজল।

বুধবার রাত থেকে এক বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই চলছে কৃপাসিন্ধুর। বুড়োতলার নালায় অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর রক্ত আর অনেক চোখের জলে ভেজা গ্রামীণ অবচেতনার ঐতিহ্যগত খুব পুরনো ওই বিভীষিকার অনেক চেহারা। বুধবার রাত থেকে সে কাটা মুন্ডুর রূপ নিয়েছে।

কাটা মুন্ডু, তোমার নাম কী?

বীরু।

কাটা মুন্ডু, তোমার দেশ কোথায়?

দোগাছিয়া।

কাটা মুন্ডু তোমাকে কাটল কে?

খেপু।

কৃপাসিন্ধু বোবাধরা গলায় বলে, খেপু না, খেপু না। তারক হলধর আব্দুল কৃপাসিন্ধু..... □

শব্দেরা, আমার আকাশে

অ নি শ্চ য় চ ক্র ব র্তী

দময়ন্তী,

কতদিন পরে চিঠি লিখছি তোমায়, হাতের লেখার জড়তা আর অনভ্যাস টের পাচ্ছ নিশ্চয়ই। আমার আগের লেখা চিঠিগুলোর পাশে এটাকে রেখো না, তোমার কাছেও অচেনা মনে হবে এই চিঠি। জীবন থেকে যে অক্ষর হারিয়ে গেছে, তাকে আবার খুঁজে পাওয়ার এক বৃথা চেষ্টায় আজ লিখতে বসেছি। কাল রাতে যখন ফোনটা ছেড়ে দিলাম, তোমার গলায় মনে হল কেমন এক অসহায়তা, কষ্ট হচ্ছিল খুব। ফোনে তো সেসবের মীমাংসা করা যায় না। ওইরকম অসহায়তা টের পেয়ে যে উদাসীন থাকব, সে অভ্যাসও হয়নি এখনও, অন্তত তোমার ক্ষেত্রে। এখনও যে অসহায়তা টের পাই, কেমন এক বিষাদ এসে ঘিরে ধরে আমায়, তাতেই মনে হয় বেঁচে আছি, চেষ্টা করলে পুরনো মনটাকে হয়তো আবার ফিরে পেতেই পারি একদিন।

তুমি বললে, টিভির পর্দায় আর আমার নাম দেখতে তোমার ভাল লাগে না। শুধু নামটাই থাকে আমার, আর কিছুই থাকে না। কোনো কোনো খবরের সঙ্গে কারুর ইন্টারভিউ দেখালে তুমি কিছুতেই আমায় দেখতে পাও না, অথচ আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাও ক্ষীণ, বুঝতে পারো যে আমার হাতেই ধরা আছে মাইকটা, ওটাকে আমরা বলি বুম, অথচ আমায় দেখতে পাচ্ছ না, শুধু আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছ কদাচিৎ, তোমার নাকি টিভি-টা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমি তোমার যন্ত্রণাটা টের পাই, এখনো পাই, তবে আর কতদিন পাব তা জানি না। তুমি বললে, এর চেয়ে নাকি আমার কাগজের অফিসের চাকরিটাই ছিল ভাল। আমার নামে, আমরা বলতাম বাই-লাইন, যেসব কপি ছাপা হত, সেগুলো অন্তত পড়তে পারতে। যেসব কপিতে নাম থাকত না, সেগুলোও পড়ে বোঝার চেষ্টা করতে যে আদৌ সেটা আমার কপি কি না, সেও নাকি তোমার কাছে একটা আলাদা মজা আনত। তুমি নাকি কপিতে লেখা একটা কি দুটো শব্দ পড়ে বুঝে যেতে, কপিটা আমার না অন্য কারুর। আমি ভাবতেই পারি না এতটা। কাগজের হাবিজাবি পাতা ভরানো সব কপি পড়ে কেউ আমার শব্দব্যবহার মনে রেখে আমায় খুঁজছে, আমার উপস্থিতি, এতটা কি নিজের সম্বন্ধে ভাবা যায়? কিন্তু তুমি আমায় বরাবর এভাবেই ভাবতে শিখিয়েছ, আমিই তার যোগ্য হতে পারলাম না। এত অযোগ্যতা আমার নিজেরই আর সহ্য হচ্ছে না, বিশ্বাস করবে নিশ্চয়ই।

তোমাদের বাড়িতে অন্য কাগজ রাখা হয়, আমি জানি। তুমি পাশের পাড়িতে গিয়ে আমাদের কাগজটা পড়তে। অত খুঁটিয়ে পড়লে, সময় নিয়ে, ওরা কি বিরক্তও হত না?

তুমি সেই বিরক্তি উপেক্ষা করেছ, প্রতিটা দিন, আমার জন্য আমার শব্দগুলোর খোঁজে, শব্দের ভেতর লুকিয়ে থাকা আমার মনের খোঁজে, দৃষ্টির খোঁজে। তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলে? আমার বাইলাইন থাকলে তুমি আলাদা করে কাগজটা কিনতে সেদিনের, বাড়িতে টেবিলের ওপর রেখে দিতে, বড়দের বোঝাতে চাইতে তুমি, আমার গুরুত্ব, প্রয়োজন। এসব জেনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক চেষ্টা করেছি, যাতে, সেই কাগজে চলে যেতে পারি, যে কাগজ তোমাদের বাড়িতে রাখা হয়, তোমাদের বাড়ির স্বাভাবিক পছন্দ। পারিনি। এক কাগজ থেকে আরেক কাগজে যাওয়া অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে, তুমি জানো সেসব। তাছাড়া, সময়ও তো লাগে। খুব স্বাভাবিকভাবে রোজ তোমার কাছে পৌঁছে যেতে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম বলেই কাগজটা ছেড়ে দিলাম। শুধু কাগজটা নয়, কাগজই ছেড়ে দিলাম।

রোজ তখন আমার কী কষ্টই যে হত। তোমার সঙ্গে দেখা করা আর কথা বলার জন্য ছটফট করছি, অথচ একদিনও ছুটি নিতে পারছি না, এমন অবকাশহীন কর্মজীবনের কথা কখনও কি ভেবেছি আমরা? আমি অন্তত ভাবিনি। তোমার সঙ্গে কথা না বলেই প্রায় রাতারাতি ছেড়ে দিলাম কাগজের দুনিয়া। তোমাকে পরে যখন বললাম কথাটা, তুমি মানতেই চাইলে না। ঠিকই করেছ। কথাবার্তা যে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছিল, আমি তোমাকে জানাইনি, সেকথাটা তো সত্যি, ভীষণই সত্যি। আসলে, যে আমি প্রতিটি অক্ষর নিয়ে ভাবতাম, সেই আমি অজস্র অর্থহীন, তাৎপর্যহীন, নিজস্বতাহীন শব্দ লিখে যাচ্ছি প্রতিদিন, প্রতিরাত, যার কোনো আত্মপরিচয় নেই, অভিঘাত নেই, আলোড়ন নেই কোনো, এমন দুর্দশা কিছুতেই মনে মনে মেনে নিতে পারছিলাম না। তার মধ্যেও তুমি আমাকে খুঁজতে, আমার একান্ত নিজস্ব শব্দ খুঁজতে, জেনে আমার নিজেরই ওপর হত ভীষণ রাগ। কিছুই না জানিয়ে টিভিতে চলে যাওয়ার বড় কারণ তো সেইটাই, তোমাকে বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। মনে হত, মর্গে গিয়ে মানুষ যেমন মৃতদেহ শনাক্ত করে, তুমিও তেমন অসংখ্য মৃত অক্ষরের, শব্দের, বাক্যের ভেতর থেকে আমাকে খুঁজতে। আসলে তো খুঁজতে ওই শব্দের স্মৃতি, মানুষ যেমন প্রিয়জনের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মৃতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের, উষ্ণতার স্মৃতিতে উথালপাথাল হয়, কাঁদে, ঠিক তেমনই যেন তোমার স্মৃতির খোঁজ, উষ্ণতার স্মৃতি। কিন্তু আমি কী করে পারি বলত, সাধারণ, অতি সাধারণ খবরের মধ্যেও আমার নিজস্ব শব্দ মিশিয়ে দিতে? শব্দ যদি বা লিখলাম, ব্যঞ্জনা আনি কী করে? প্রতিদিন অগণন খবরের স্তূপের ভেতর আমার ব্যবহৃত শব্দ খুঁজে বেড়ানোর কঠিন থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাইছিলাম। যে কোনো খবরের ভেতর অন্তত একটাও অনুভূতিময় শব্দ লেখার ক্রমাগত ব্যর্থতা থেকে আমি নিজেকেও রেহাই দিতে চাইছিলাম। তাই টিভি চ্যানেলের চাকরিটা নিলাম। সেখানে আর যাই থাক বা না থাক, অন্তত অক্ষরের বিড়ম্বনা তো নেই।

যখন প্রথম কাগজে আসি, তুমি তো ভালভাবেই জানতে, আমি নিউজ ডেস্কে কাজ করতাম। নিউজ এজেন্সিগুলোর পাঠানো ক্রিড থেকে বাংলায় লিখতে হত। পাতা সাজাতে হত, ছবির ক্যাপসন, হেডিং, পয়েন্ট, সবকিছুই ঠিক করতে হত আমাদের।

গভীর রাতে কোনো বড় খবর এলে সেটাও কাগজে ধরিয়ে দিতে হত। সেই জীবনটাই ছিল ভাল। পি টি আই, ইউ এন আই, এ পি, এ এফ পি, রয়টার্স-এর পাঠানো ক্রিড থেকে বাংলা কাগজের পাঠকের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী খবর লেখা। সেখানে তুমি আমায় খুঁজবে কী করে? সেই আত্মগোপন আমার টিকল না বেশিদিন।

একদিন অনেক রাতে ইউ এন আই খবর পাঠাল, মাধুরী দীক্ষিতের বিয়ের। তুমি তো জানো, মাধুরী দীক্ষিত বলিউডের একজন অভিনেত্রী, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি ওর সম্বন্ধে জানি না। পর্দায় মাধুরী দীক্ষিতকে দেখলে আমি চিনতেও পারব না কোনোদিন। আমি খবরটা পেয়ে ভাবলাম, মাধুরীর বিয়ের খবর রাত দুপুরে এসেছে, এটা ধরানোর জন্য চেষ্টা করার কোনো মানেই হয় না। সহকর্মীরা তৈরিই ছিল, লাইব্রেরি থেকে ছবিও বার করে আনা হল। কিন্তু আমারই সিদ্ধান্তে, খবরটা লেখাও হল না, ছাপাও হল না। পরদিন সব কাগজে প্রথম পাতায় ছবি দিয়ে বেরল সেই বিয়ের খবর, নেই শুধু আমাদের কাগজে। আমি সারাদিন কাটালাম আত্মধিক্কারে, গ্লানিতে, নিজের অযোগ্যতা গোপন করার এমন চমৎকার সুযোগ আমারই নিজের মূর্খতায় হাতছাড়া করে। সন্ধ্যায় অফিসে যেতেই ডেকে পাঠালেন সম্পাদক। জানতে চাইলেন, খবরটা কেন আমি দিইনি। আমার সত্যিই কোনো যুক্তি ছিল না দেখানোর মতো। বললাম, আসলে সব এজেন্সি তো পাঠায়নি খবরটা। সম্পাদক, পুরোটা না শুনেই বললেন, 'যারা পাঠিয়েছে তাদেরটাই করতে। এমন একটা খবর, সবাই দিল, আমরা দিলাম না। রাতের শিফটে তোমাদের মতো ছেলেরা থাকলে কাগজেরই ক্ষতি। ঠিক আছে, যাও।'

মাধুরী দীক্ষিতের বিয়ের খবরের গুরুত্ব বুঝতে না পারায় আমাকে চলে যেতে হল ডেস্ক ছেড়ে রিপোর্টিংয়ে। আগে ছিল প্রতিদিন রাতের ডিউটি, তারপর হল সারাদিনের দৌড়ঝাঁপ আর ফোনের বোতাম টেপার কাজ। এক সহকর্মী রসিকতা করে বলেছিল, 'মাধুরী দীক্ষিতের জন্য যে তোমার এমন গভীর দুর্বলতা আছে হৃদয়ের গোপনে, এই ঘটনা না ঘটলে তা জানা যেত না কোনোদিন।' সত্যিই, বিয়ের খবর ছাপার যোগ্য না মনে করার যথার্থ কারণ তো মাধুরীর প্রতি আমার গোপন ব্যথার অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সেদিন, তারপর কাগজেপত্রে ছাপা মাধুরীর ছবি আমার চেতনায় গেঁথে গেছে বর্শার মতো। তার আগে কত রাত কত খবর কত কষ্ট করে হলেও ধরিয়ে দিয়েছি পরদিনের কাগজে কাগজে, প্রতিটি রাত সতর্ক প্রহরীর মতো পাহারা দিয়েছি নিউজ ডেস্ক, কিন্তু এক মাধুরী দীক্ষিতের বিয়ের খবর না ধরানোর অবিবেচনায়, হতবুদ্ধিতে আমার সব সতর্কতা আর সংবাদবোধ মিথ্যে হয়ে গেল। খবরের কাগজে কাজ করতে হলে নাকি সব ব্যাপারেই মোটামুটি ধারণা থাকতে হবে। কোনো বিশেষজ্ঞতার দরকার নেই সেখানে। হায় মাধুরী, হায় আমার তাঁর প্রতি দুর্বলতা, হায় আমার সংবাদবোধ।

প্রতিদিন সকাল দশটায় খেয়েদেয়ে অফিস যেতে শুরু করলাম। অফিসে গিয়ে জানতে পারতাম সেদিন কোথায় যেতে হবে, কীসের খোঁজে। আজ কাকদ্বীপ তো কাল কাটোয়া, আজ আলিপুর আদালত তো কাল আলিপুরদুয়ার, খবরের জন্য, কখারেজের

জন্য দৌড়ঝাঁপ, আজ মুখ্যমন্ত্রী তো কাল বিরোধী নেত্রী, আজ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা-জর্জর সফর তো কাল বন্যায় গৃহহীন, খোলা আকাশের নিচে অন্নহীন মানুষ, জীবন যেন এক নতুন চেহারায় আমার কাছে এতদিনের সব চেনাকে ভেঙেচুরে অদ্ভুত আর বিশালের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। টের পেলাম, ছাপার অক্ষর অথবা সাংবাদিকের বিস্তারিত রিপোর্ট অথবা একটা-দুটো স্থিরচিত্র দিয়ে এই বিশাল জীবনের, সমাজের, রাজনীতির অবিরাম অবিরাম স্রোত আর ঘটনাপ্রবাহের কিছুই তুলে ধরা যায় না, বোঝানোও যায় না। বন্যার একটা কি দুটো মর্মান্তিক দৃশ্যের বর্ণনা বা কতগুলো ব্লক জলমগ্ন, কত মানুষ গৃহহীন, কত গবাদি পশু ভেসে গেছে বা কতটা রেলপথ জলের তলায় ডুবে আছে তার পরিসংখ্যান দিয়ে কী বোঝাব প্রকৃত বন্যা-পরিস্থিতি। প্রধানমন্ত্রীর সফরের নিরাপত্তার কোন বিবরণ দিয়ে আমি বোঝাতে পারব, ওই নিরাপত্তার আয়োজনে কত মানুষের প্রকৃত জরুরি কাজ মুলতুবি রাখার দুর্ভোগের সত্যমিথ্যা। বিরোধী নেত্রীর সমাবেশের লোকসমাগম আর বক্তৃতার কোন উল্লেখ দিয়ে আমি পাঠককে চেনাতে পারব তার অন্তরালের প্ররোচনা আর দায়িত্বহীনতা। কেন লোক যায় তাঁর সভায়, কোন আশা বা প্রতিবাদের ভাষা শিখতে, তা আমি সত্যিই বুঝতে পারতাম না। তবু যেতে হত, আমার বোঝা না বোঝায় কিছুই যে যায় আসে না কারুর কোথাও।

যেতে হত, ফিরেই কপি লিখে জমা দিতে হত। কী লিখলাম, কেন লিখলাম, জানতাম না। কী কঠিন সেই আত্মগোপন। নিজের শব্দেরা সব উধাও চরাচর ও চেতনা থেকে, আমার যে চাই একজন রিপোর্টারের ভাষা। কলেজে আমার লেখা সেই কবিতাগুলোর কথা কি তোমার আদৌ মনে আছে? সেই যে লিখেছিলাম, 'মার্চের দুপুরে পোস্তা থেকে পোল্যাণ্ড নিয়ে গলা ফাটান নেতারা, গণতন্ত্রের এক প্রহরী, দূরে, জি.টি রোডের ধারে, কালো ভ্যানের ভেতর অপেক্ষায় থাকে।' অথবা 'কেটলিতে জল ফুটলে এখন আর জেমস ওয়াট নয়, ভেসে ওঠে সুদীপ্তার মুখ।' নিজের, একেবারে নিজেরই শব্দগুলো খুঁজে অথবা তৈরি করে নিতে চাওয়ার সেই অস্থির প্রথম দিনগুলো আমায় এখন ব্যঙ্গ করে, গোপনে, অহোরাত্র। প্রতিদিন অন্তত পাঁচশো থেকে এক হাজার শব্দ লিখতাম, তার একটাও আমার নিজের নয়, সমাজের, সংসারের, দুর্নীতির, আশার, প্রতিবাদের, বিক্ষোভের, সমঝোতার, ষড়যন্ত্রের, মৃত্যুর, হত্যার, আত্মহত্যার, প্রতারণার, চুরির, ডাকাতির, বধূ-নির্যাতনের, ভ্রাতৃহত্যার। আমার অস্তিত্ব তুমি কোথায় খুঁজবে সেখানে, আমি কি আদৌ আছি কোথাও? কোনো শব্দে, কোনো বাক্যে, কোনো যতিচিহ্নে, কোনো সূচনায় বা সমাপ্তিতে? অথচ তুমি যেদিন বললে, আমার অস্তিত্ব তুমি শব্দের ব্যবহার দিয়ে খুঁজে নিতে চাও, আমি অবাক হলেও, তারপর থেকে কী মরিয়া চেষ্টাই না করেছি, একটা অন্তত একটা এমন শব্দ মিশিয়ে দিতে, কপির শুরুতে বা মাঝখানে, যাতে তুমি চিনতে পারো আমার কপিটা, সহজে, টের পাও কাল আমাকে কোথায় যেতে হয়েছে অথবা কোন খবর লিখতে হয়েছে কোন কোন বিষয়ে খোঁজ নিয়ে বা মাথা ঘামিয়ে। পারিনি, বোধহয় একদিনও পারিনি আমি।

একদিন লিখলাম 'চরাচর' শব্দটা, আর একদিন 'সূচনায়', দুদিনই নিউজ এডিটর শব্দদুটো কেটে দিলেন। আর একদিন লিখলাম 'অস্তিত্ব' তারপর একদিন 'হাহাকার' আর 'নৈরাজ্য' আর 'অমীমাংসা', নিউজ এডিটরের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে ছাপা হতে পারল না একটাও। উল্টে একদিন সন্ধ্যায় আমাদের নো স্মোকিং জোন-এর বাইরে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তোমার শব্দ ব্যবহার নিয়ে একটু ভাবতে শুরু কর। এটা সাহিত্য করার জায়গা তো নয়, এটা খবরের কাগজ। সাহিত্য আর সাংবাদিকতা এক নয়। খবরের কাগজে আটপৌরে মুখের ভাষা না থাকলে অসুবিধা হয় পাঠকের।' আমি তো অবাক, কী আর বলব। মাথা নিচু করে শুনে গেলাম।

আমি যে কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম, এক একটা শব্দের ঠিকঠাক আর নতুন ব্যবহার নিয়ে কত ভাবনাই না ভেবেছি একসময়, সব আমাকে ভুলে যেতে হবে আর ভুলে গিয়েই লিখতে হবে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচশো থেকে এক হাজার শব্দ। আমি বাঁধা পড়ে গেলাম জীবনের কাছে, জীবিকার কাছে। এই-ই হয়তো নিযতি ছিল আমার। তবু চাকরি তো করতেই হবে, খাওযার ব্যবস্থা করতেই হবে, জেদ করে বেরিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে, ভাল লাগছে না বলে সব ছেড়ে দিযে আবার বাড়ি ফিরবই বা কোন মুখে? বইমেলায় যাই বছরের পর বছর, বইমেলা নিযে কপি লিখি, কত বন্ধু-বান্ধব, চেনা-অচেনা, নতুন-পুরনো মানুষের বই বেরয, আমরা একটা অক্ষরও লেখা হয় না। আর নিজের চেয়েও আমি ভেঙে যাই তোমার স্বপ্নের ক্রমমৃত্যু দেখতে দেখতে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে হ্যামলেটের সেই উচ্চারণ, 'হা ঈশ্বর! যদি না দুঃস্বপ্নে পীড়িত হতাম, আমি একটা বাদামের খোলার ভেতর আবদ্ধ থেকেও নিজেকে ভাবতে পারতাম অসীমের অধিপতি।'

যখন নিউজ ডেস্কে কাজ করতাম, কী আর লিখব তোমায়, রোজ পাঁচটা থেকে সাতটা কপি লিখতে হত। নিউজ এজেন্সির একগোছা ক্লিড পিন দিয়ে গেঁথে ওই দেড়শো, দু'শ, আড়াইশো শব্দের কপি লিখতে লিখতে আমার সব ভাবনা, চিন্তা, উপলব্ধির প্রকাশ ওই আড়াইশ শব্দের সীমায নিষ্ঠুরভাবে থমকে গেল। একদিন মাঝরাতে অফিসের গাড়িতে একা একা ফিরছি বাড়ির দিকে, রাতের কলকাতার এক অন্য কল্লোল আছে, সেই আবহে ছেদ টেনে দেয় বড় বড় বিজ্ঞাপনের দেওয়ালজোড়া ছবি ও বয়ান, সারাদিনের অজস্র রকম শব্দের স্রোত কখন যে উধাও হযে যায শহরটা থেকে, উৎসটাই যেন পেয়ে যায় লোপ, সেই নৈঃশব্দ্যে শহরটাকে নিজের মতো করে দেখা যায়, পাওয়া যায়, বিজ্ঞাপনের দিকেও আমি একা-ই তাকাচ্ছি, বিজ্ঞাপনগুলো এই রাতের গভীরেও যেন আমাই দৃষ্টির জন্য একটু নির্জন, একটু অনালোকিত, তবু আন্তরিক, এমন মনে হয়। ড্রাইভার নিজের সতর্কতায় গাড়ি চালাচ্ছে, আমিও আনমনা বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বড় কোনো উপলব্ধির কাছে পৌঁছতে চাইছি, অথচ পারছি না, পশ্চিমের আকাশটা খোলা পাওয়া যায় জওহরলাল নেহরু রোড থেকে, সেদিকে তাকিয়ে আমরা আচমকাই এক গভীর কান্না এল। আমি বুঝি কোনোদিন কোনো বড় কাজ করতে পারব না, বড় কোনো লেখা লিখতে শুধু নয়, ভাবতেও পারব না। ওই সর্বোচ্চ আড়াইশো শব্দের ঘটনাক্রমের ভেতর আটকা পড়ে যাচ্ছে আমার পৃথিবী,

আমার চিন্তা, আমার মুক্তি, আমার আমি। গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, শব্দদূষণের সবচেয়ে আক্রান্ত মোড়গুলোতেও, আমার কান্না ওই একটিমাত্র শব্দেই আড়াল খুঁজে পেয়েছিল সেই রাতের গভীরে।

তোমাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও লিখছি, আমার মনের সেই কথাটা। যাঁরা লেখক, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ লেখেন, পরিচিতি আছে ঢের, অথবা কবি, অজস্র লিখে চলেছেন, তাঁদের বৃত্তের বাইরে, অগোচরেই হয়তো থেকে যেতে পারেন আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠতম কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, যাঁরা কখনো একটা অক্ষরও লিখবেন না, একটি কবিতাও না, অথচ মনে মনে সারাজীবন অসংখ্য কবিতা বা কথাসাহিত্য রচনা করে যাবেন। নিজেকে আমি সেইসব মানুষের দলে রাখতে চাইছি না, কখনই। কিন্তু নিজের একটা লেখার কাছেও কাগজে-কলমে পৌঁছতে না পারার যন্ত্রণাটাই বা অস্বীকার করি কী করে?

একবার 'কোলাহল' শব্দটা লিখে কী সমস্যায় পড়েছিলাম, সে তো তোমায় বলেছি, সেই যে, কেন 'হৈ-হল্লা' না লিখে 'কোলাহল' লিখেছি, তার জন্য জবাবদিহি করার ব্যাপারটা। ভাবো একবার, সবচেয়ে বেশি শব্দ লেখা হয়, ছাপা হয়, পড়া এবং প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় বাংলায়, খবরের কাগজেই, প্রতিদিন। সেখানে যদি এভাবেই শব্দেরা বাতিল হয়, অবাঞ্ছিত হয়, আক্রান্তও, তবে আজ থেকে পঞ্চাশ-একশো বছর পরে কেমন দাঁড়াবে বাংলায় নিত্যব্যবহার্য শব্দের তালিকাটা? কত শব্দ অ-ব্যবহারে অচেনা, উধাও হয়ে যাবে? সে তো এক গভীর শব্দদারিদ্রের কাল। গ্রিকরা যাকে বলে 'লেক্সিপেনিয়া।' আমি অবশ্য তা নিয়েও চিন্তিত নই আদৌ। আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি, আমার জন্য তোমার অপেক্ষা, দুশ্চিন্তা নিয়েই ভাবি।

কতকাল পরে বলো চিঠি লিখছি তোমায়? টেলিফোন তো কেড়েই নিয়েছে চিঠি লেখার মন, কেড়ে নিয়েছে প্রয়োজনটাও। রাত বাড়লে যখন আমি তোমাদের বাড়ির নম্বরটা ডায়াল করি, নিশ্চিত জানি তুমিই ধরবে, ফোনের তার বেয়ে, বাতাসে ভেসে যেসব কথা আমাদের মধ্যে বলাবলি হয়, তুমি বলো, তার মধ্যে কতটুকু জীবন থাকে আমাদের, কতটুকুই বা লেনদেন, থাকে শুধু কিছু তথ্য আর কুশল-বিনিময়। আত্মগোপনের এ এক মহামাধ্যম। ফোন হচ্ছে, কথা হচ্ছে, যোগাযোগ হচ্ছে এক অদৃশ্যের ভেতর, কেউ কারুর সামান্য বা অসামান্য অভিব্যক্তিও টের পাচ্ছি না, যা কণ্ঠস্বরে আনা যায় না, থাকে শুধু চোখে, মুখে, রেখায়, সরলে, জটিলে। আগে একটা চিঠি একবারের বদলে কতবার পড়তাম, এক একটা লাইন বারবার পড়ার সেই সুখ, সেই দুঃখ, সেই তৃপ্তি এখন কোথায় পাব? তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ করতেই অন্য ফোন, অন্য কথা, অন্য প্রসঙ্গ, অন্য মানুষ। তোমার কথার রেশটাই যায় হারিয়ে, কিছুতেই তাকে খুঁজে পাই না আর! শব্দের স্মৃতি, উচ্চারণের, শ্রবণের, কতটুকু স্থায়ী হয়? তাহলে তো মানুষ বারবার শুনত না প্রিয় কোনো গানের ক্যাসেট, প্রিয় কোনো সংলাপ, নাটকের, উদ্বেল হত না একই উচ্চারণে, বারবার, আলাদা করে? আমার কান থেকে, স্মৃতি থেকে তোমার স্বরের অনুরণন আর অভিঘাত হারিয়ে যেতে কী সামান্য সময়ই না লাগে! চারপাশে এত কথা, ব্যস্ততা, এত শব্দ, আলোড়ন, উচাটন, যে হারিয়ে যায়

তোমার কথাগুলো, হারিয়ে যায় তোমার অপেক্ষা, বিবাদ, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, হারিয়ে যায় তোমার সঙ্গে সম্পর্কের উত্তাপ। যখন একা হই নৈঃশব্দ্যে, তখন আমার রোমন্থন, আমার পুনরুদ্ধার। এমনই, প্রতিদিন, প্রতিরাত।

ছোটবেলায় পিয়নের কড়ানাড়ার শব্দে উতলা হয়ে পড়া, একদিন দরজায় আওয়াজ না পেলে, অথবা সাইকেলের সেই পরিচিত ঘন্টির, কেমন অস্থির হয়ে পড়তাম, সেসব যে এত দ্রুত কঠিন স্মৃতির উপকরণ হয়ে যাবে, কে জানত? আমার এই চিঠি, সেই স্মৃতিরই এক অভিঘাত। সেই স্মৃতিরই এক বিপরীত-যাত্রা। কেমন লাগবে তোমার কাছে, তা আমি জানিনা। একটা ক্ষীণ আশা অবশ্যই আছে, যদি তুমিও লেখো একটা চিঠি, আমাকে। তোমার অনুভূতি, সংবেদন, উপলব্ধিগুলো একটু স্থায়ী চেহারায় যদি আবার, একবার আসে আমার কাছে। অনুভূতির এই চাঞ্চল্য, এই অস্থিরতা আমি যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না আর।

মাঝে মাঝে মনে হয়, ফিরে যাই নিজের শহরে, একটা স্কুলেও কি জুটবে না চাকরি আমার? তবে এই মহানগরের অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেয়ে যাব হয়তো, কিম্বা, ফিরে গিয়ে দেখতেও তো পারি আমাদের ওই অচঞ্চল, শান্ত, সমাহিতপ্রায় শহরটাও কেমন চঞ্চল আর অস্থির হয়ে গেছে এতদিনে। তখন কী করব? কোন মুক্তি কোথায় খুঁজব? আমি ব্যস্ততার নামে নৈরাজ্য চাই না, চিন্তায়, আমি বিপুলতা আর বৈচিত্র্যের নামে বহুতা আর বিশৃঙ্খলা চাই না চেতনায়। আমি নিরিবিলি চাই, অবকাশ চাই, তরঙ্গে আমার বড় ভয় এখন, আমি নিস্তরঙ্গ চাই, আমি তোমাকে চাই।

ট্রেনে অথবা গাড়িতে মাইলের পর মাইল যখন ঘুরি, যখন জনপদ থেকে শূন্য প্রান্তর ডিঙিয়ে খবরের ছবির কাছে পৌঁছে যাই, তখন তো দেখতে পাই মানুষ কেমন বেঁচে আছে জীবনের স্বাভাবিক স্রোতের ভেতর, দারিদ্র, অনাহার, ক্ষুধা, ক্লান্তি, অবসাদ, আনন্দ, বেদনা, মৃত্যু ও জন্মের ভেতর। ট্রেনে চেপে যখন স্টেশনের পর স্টেশন পার হই, জীবনের গতিময়তার কতই না দৃশ্য চোখে পড়ে, কলকাতার বাইরের কত শহর, গ্রাম, গঞ্জ, ভিড়ে নিরালায়, মানুষ বেঁচে থাকে, দূর থেকে মনে হয় সে জীবনে আবিলতা আছে, আলোড়ন আছে, তবে তাড়না, অস্থিরতা নেই কোনো, যেমন এই কলকাতায়।

যখন ধানবাদে কয়লাখনি দুর্ঘটনা হল, পরদিন ভোরের ট্রেনে আমি চলে গেলাম ধানবাদ, তার পরদিন কাগজে আমার নাম, ধানবাদ থেকে রিপোর্ট। তুমি অবাক হয়েছিলে, ভেবেছিলে এত কাছে যখন গেছি, আমি নিশ্চয়ই একবার দেখা করব তোমার সঙ্গে। কিন্তু বিশ্বাস করো, ধানবাদে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই কলকাতা থেকে আমায় তখনই ফিরতে বলা হল। যেন সবাই জানে, ধানবাদ যখন গিয়েছি, আমি আসানসোলে একবার নামবই। সে সুযোগ পেলাম না। এইসব রিপোর্টিংয়ে তবু নিজের চোখ, কান, নাক একটু দেখানো যায়, যদি আদৌ তা হয় অন্যদের থেকে আলাদা। চেনানো যায় নিজের কলমটাকেও, আরও অনেক কলমের আঁচড়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে। নাহলে তো ওই কলকাতার বহুতলে খুন, সই জাল করে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা, তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নতুন উদ্যোগ, বর্ষায় জল জমবে না

এমন পরিশ্রুতি দিয়ে মেয়র হননি বলে জানালেন সুব্রত, মন্ত্রী হওয়ার ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় মমতা, টালিনালার দুপাশে ঝুপড়ি উচ্ছেদের মতো কপিতে প্রতিটা দিন ছেয়ে থাকে। খবর, শুধু খবর ছাড়া যেন ওইসব ঘটনার কোনো প্রাণ, কোনো রক্তরস, কোনো মাংসের ঘ্রাণ, রক্তের অন্তর্গত কোনো বিস্ময়, কিছুই আনা যায় না কপিতে, না কোনো অনুরাগ, না কোনো নৃশংসতা, না কোনো ঘৃণা, না কোনো ভালবাসা, তবু পাতার পর পাতায় প্রতিদিন কত খবর, কত জায়গা জুড়ে, কত কাগজে রোজ বেরয়, বেরিয়েই যায়, যাবে, যতদিন না মানুষ অক্ষরের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছে অথবা অক্ষরকে অবাঞ্ছিত, অযোগ্য মনে করছে। সে তো অনেক দিনের কথা, তেমন দিনের কোনো চেহারা আমি কল্পনাও করতে পারি না, শুধু এক আশঙ্কা থেকে যায় চেতনায়, গাঢ় হয় তা কেবলই, যতদিন প্রাণহীন, অনুভূতিহীন শব্দ লিখে যাব অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে, ততদিন সেই আশঙ্কা ঘন হতে থাকবে। কী করে এমন শব্দ লিখে যাই বলতে পারো, যার ভেতর কোনো ব্যঞ্জনা আমি অন্তত তৈরি করতে পারছি না, অন্যের হাতে তৈরি হতেও দেখছি না। অথচ কত কোটি অক্ষর, কত লক্ষ শব্দ প্রতিরাত লেখা হচ্ছে, ছাপা হচ্ছে, পড়া হচ্ছে পরদিন। সেই ছোটবেলা থেকে অক্ষরের, শব্দের, বাক্যের, রচনার প্রতি আমার সমস্ত আসক্তি, স্বপ্ন, চর্চা, দুর্বলতা থেকে কিছুতেই আর এই যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছিল না। আমি ছেড়ে দিলাম খবরের কাগজ।

দৃশ্যমাধ্যমে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, না থাক, আমি তো আর দৃশ্যের ভেতর ঢুকে পড়ছি না, আমি তো খবর জোগাড় করতে জানি, খবরের কাছে পৌঁছতে জানি, খবরের ভেতর থেকে আরো খবর বের করে আনতে জানি, আমি টিভি চ্যানেলের চাকরিটা নিলাম। খবরের কাগজের চেয়ে টাকা অনেক বেশি, আর অক্ষরের সঙ্গে প্রতারণার গ্লানি থেকেও মুক্তি। আমাকে খবর আর খবরের ছবি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে, খবর লিখতেও হবে না, বলতেও হবেনা। আমি জানি, খবর পেলে তোমার বাবা কিছুতেই মেনে নেবেন না আমার টিভি চ্যানেলে যাওয়া, তিনি মুদ্রিত হরফের প্রতিই গভীর আস্থায় বাঁচেন। তাঁকে আমি কী করে বোঝাব, অক্ষরের, শব্দের প্রতি নিজের মর্যাদাটুকু টিকিয়ে রাখতেই আমি খবরের কাগজ ছেড়েছি। আমার প্রতিটি পরিচিত মানুষ জানে, আমি টাকা বেশি পাচ্ছি বলেই কাগজ ছেড়ে চ্যানেলে এসেছি। আমি কাউকেই বোঝাতে চাই না, আমি সত্যিই কেন এসেছি। টাকা অবশ্যই অনেক বেশি পাই, ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলার লোকও আছে, আমি শুধু ভিস্যুয়ালের সন্ধানে থাকি। ঘটনাস্থলে গিয়ে যেন একটু হলেও বেশি সময় ধরে তোলার মতো দৃশ্য যেন পেয়ে যায় আমাদের ক্যামেরা, এটুকুই থাকে আমার লক্ষ্য।

দৃশ্য, আরো দৃশ্য, আরো বেশি দৈর্ঘ্যের দৃশ্যের জন্য আমার ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। একটা নতুন চাকরির যা কিছু চ্যালেঞ্জ, তা মাথায় নিতে গিয়ে অক্ষরের জন্য আমার হাহাকার উধাও হয়ে গেল, কেবলই নতুন দৃশ্যের সন্ধান পেতে আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকতাম। খবরের মধ্যে যখন সাংবাদিক বা রিপোর্টার হিসেবে আমার নাম দেখানো বা উচ্চারণ হতে শুরু করল, তোমার কাছে তা নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসলেও আমার কাছে তা কেবলই নতুন একটা চাকরি ছাড়া কিছু নয়। আমার নাম টিভিতে

দেখানো শুরু হল অথবা বলা, আমারই জোগাড় করা তথ্যগুলো নানারকমভাবে সাজিয়ে পড়া হত খবর, কোথাও কোথাও আমার হাতে ধরা বুমটার ছবি তুমি দেখতে পেতে, আমার জামাটাও হয়তো, কিন্তু আর কিছুই দেখতে পেতে না, গলার আওয়াজ কখনো ক্ষীণ, কানে যেত তোমার। তার বেশি কিছু নয়। জীবনে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য কত মানুষকে কত কিছু বিসর্জন দিতে হয়, আমার তো শুধু ঠুনকো আত্মপরিচয়ের নির্মাণ।

কাঁধে ক্যামেরা হাতে আরেকজন সমসময় তৈরি, আমাকে শুধু স্পটে পৌঁছে আরো, আরো ভিস্যুয়াল আর বাইটসের সন্ধান করে যেতে হয়। এমনকিছুর, যা আর কেউ পায়নি, পাবে না। কোনো দুর্ঘটনা বা হত্যা, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে তো ভীষণ করে দরকার পড়ত অন্তত একটু হলেও অন্যসব চ্যানেল থেকে বেশি বাইটস, এক্সক্লুসিভ হলে তো কথাই নেই। বাইরে কোথাও গেলে, সেই যাওয়াটাকে জাস্টিফাই করার জন্য কিছু এমন ভিস্যুয়ালস খুঁজতেই হত যা আমাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে। আমি শুধু দৃশ্যের খোঁজ করে যাই, দৃশ্যেরাই আমার চেতনা জুড়ে থাকে, আরো আরো দৃশ্য, প্রাসঙ্গিক দৃশ্য, প্রামাণিক দৃশ্য। পাঠ্য থেকে দৃশ্যের সেই নতুন অন্বেষণে আমি ভুলেই গেলাম, আমি কখনো কবিতা লেখার কথা ভেবেছিলাম, কখনো তো নিশ্চিত জানতাম, গল্প-উপন্যাসও আমি লিখবই একদিন, জীবিকার সমস্যাটা একটু সামলে নিয়ে, তারপর। আমার পাঠের জগৎ যেন আচম্বিতে, অজান্তেই কখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল, আমি টেরও পেলাম না।

এত বড় চিঠি লিখছি, তোমার ধৈর্য থাকছে তো? ভেবে দেখো একবার, কতবার কতগুলো প্রসঙ্গ তোমাকে বারবার খুঁজে বার করে পড়ার জন্যই লিখেছি. আরো কিছুটা লিখব। এই চিঠি তুমি সকালে পড়বে, দুপুরে পড়বে, সন্ধ্যায় পড়বে, রাতের গভীরে পড়বে। পড়ার পর কী ভাববে আমি জানি না, তুমি ছাড়া এসব কথা আমি লিখতামই বা কাকে, বাবা-মাকে এসব কথা লেখা যায় না। বিশেষ করে বাবা তো সঙ্গে সঙ্গেই বলবেন, 'ফিরে আয় বাড়িতে। দরকার নেই কলকাতায় এভাবে কাজ করার।' কিন্তু ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই যে ওঠে না। কত কষ্ট যে করেছি, কাগজের প্রথম দিকে, তা আর জানে ক'জন? ওই কষ্টের পর আর কিছুকেই কষ্ট মনে হয় না। কলেজ থেকে বেরবার পর ইউনিভার্সিটির চত্বরের দিকে আর পা বাড়ালাম না, চলে এলাম কলকাতায়, সে কি শুধুই নেশায়, আচ্ছন্নতায়, খবরের কাগজে কাজ করার? বাড়ি থেকে অত কম বয়সে যারা বেরিয়ে পড়ে জীবনের পথে, তাদের কষ্টবোধ অনেক আগেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। আমিও দিয়েছি। বাড়িতে অত আরাম, দায়দায়িত্বের বালাইহীন একটা জীবন, নিজের জন্য আস্ত আর আলাদা একটা ঘর ছেড়ে কলকাতার মেসে একটামাত্র চৌকি, একটা ট্রাঙ্ক, আর একটা জামাকাপড় মেলার নিজস্ব দড়ির আয়োজনে বেঁচে থাকার ভেতর যে স্বপ্ন আর জেদ ছিল, তা যে যথার্থ গন্তব্যের তরে ছিল না, তা আমি এখন বুঝি। কিন্তু এই যে পাঠ্য আর দৃশ্যমাধম, লোকে বলে প্রিন্ট মিডিয়া আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া—এর শেষটুকু যে আমাকে দেখতেই হবে, অন্তত আমার নিজস্ব অনুভবে। এই জেদটাকেও তুমি আমার এক ধরনের ছেলেমানুষি

বলতেই পারো, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের রুচি আর জীবনধারা, বাক্‌রীতি ও অভ্যাসে এমন প্রভাব ফেলতে পারে যে টিভি, তার ভেতরের শূন্যতা আর আয়োজনের রহস্যটা অনুভব করার মধ্যেও এক ধরনের তৃপ্তি আছে। কী সেই তৃপ্তি, তুমি জানতে চাইলে আমি এখনই তা নির্দিষ্ট করে বলতে বা লিখতে পারব না। তবে টের পাই, কিছু একটা টের পাই আমি।

যেভাবে মেগাসিরিয়ালগুলো লেখা হয় অথবা লেখার কথা ভাবা হয় অথবা না লিখেই শ্যুটিং হয়, তা একটু একটু জানার পর সত্যিই ভেবে অবাক হই, এই যে এত লক্ষ লক্ষ পরিবারে এত এত মানুষ সিরিয়ালের সংলাপে, কাহিনীবিন্যাসে আপ্লুত হয়ে পড়ে, পরবর্তী নিয়ে চুলচেরা তর্কে, অনুমানে মাতে তার অন্তরালে যেন একটাই কারণ, এটা দৃশ্যমাধ্যম। নাহলে, অগভীরতার সঙ্গে এমন সহবাস বুঝি আর কিছুতেই সম্ভব হত না। ছাপা অক্ষরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আজও যত গভীর, তার চেয়েও যেন বেশি বিশ্বাস দৃশ্যমাধ্যমের প্রতি। চোখে যা দেখছি, তার ভেতর মিথ্যা, ফাঁকি, অগভীরতার চেয়ে বাস্তবের দিকটাই বড়, এই ভাবনাই মানুষকে টেনে রাখে টিভির ভেতর। তুমি কি কাউকে বোঝাতে পারবে, একটা সিরিয়ালের কাহিনীর গতিবিধি ঠিক করা হয় দর্শকের প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে করতে, একটা চরিত্রের ভূত-ভবিষ্যৎ রচনা করা হয় দর্শকরা তাকে কেমনভাবে চাইছে তার বিচার করে? কাহিনীকারকে কোনো পরীক্ষা দিতে হয় না, পরিচালকের নিজস্ব চিন্তাভাবনার কোনো কৃতিত্ব নেই, মেগা-সিরিয়ালের দল দখল করে নিচ্ছে মানুষের মন। এসবের পেটের ভেতর আছি বলেই জানি, মানুষের মনের গহনে ঠিক কী জিনিস এরা পৌঁছে দিতে চায়, আর নিজেদের অস্তিত্ব বর্ণময় করে তুলতে মানুষের মনকে এরা কেমনভাবে ব্যবহার করে।

কিন্তু আমার সমস্যা তো অন্য। কোথাও কেউ খুন হলে, কোনো দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে, মৃতের নিকটাত্মীয়ের কান্নার, বিলাপের শব্দ আমার কাছে বাইটস ছাড়া কিছু নয়। তাকে দিয়ে আরো কিছু কথা বলিয়ে নিতে পারলে সেই বাইটসের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। যখন কাগজে ছিলাম, খুন, জখম, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যার খবর ফোনেও নেওয়া যেত। অথবা থানার ও সি-র কাছ থেকে। অন্য কাগজের রিপোর্টারদের কাছ থেকে। সেখানে বিলাপের সত্য তুলে ধরার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কী হয়েছে, ক'জন মারা গেছে, কোথায় কেউ কেন আত্মঘাতী হয়েছে, সেই তথ্যের সঙ্গে পুলিসের বয়ান জুড়ে দিলেই কাজ শেষ। কিন্তু টিভি তা শুনবে কেন? তার তো দরকার ছবি, প্রমাণ। ছবিই তার অবলম্বন। ছবি না দেখাতে পারলে সেই চ্যানেলের দর্শক কমে যাবে, অন্য চ্যানেলের খবর শুনবে। কে জানে, এত প্রমাণ লাগে নাকি, খবরের? সেই ছোটবেলায় আমাদের মারফি রেডিওতে যখন বাংলাদেশের যুদ্ধের খবর শুনতাম, বড়দের পেছনে দাঁড়িয়ে, অথবা শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার খবর, অথবা ইন্দিরা গান্ধির ভোটে হেরে যাওয়ার খবর, কই কখনো তো অবিশ্বাস জাগেনি মনে। কারুর কি জেগেছে, জাগত? অথচ এখন খবরের সঙ্গে ছবি চাই, শব্দ চাই, তবে খবর বিশ্বাসযোগ্য হবে। মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে জানুয়ারির সকালে জঙ্গিরা হামলা চালানোর পর রাস্তায়, ফুটপাথে যে রক্ত পড়েছিল, সেই গড়ানো রক্তের স্রোত, পুলিস

এসে বালতি থেকে জল ঢেলে, ঝাঁটা দিয়ে সেই রক্ত ধুয়ে দিচ্ছে, এই ছবি না দেখালে কি দর্শকদের বিশ্বাস হত না যে জঙ্গিরা গুলিতে মেরে ফেলেছে পাঁচজনকে? ওই রক্তের ছবি, ওই রক্ত ধোওয়ার ছবি, বালতির শব্দ, ঝাঁটার ঘষটানির শব্দ আমায় তুলে আনতে হয়েছে। ভিস্যুয়ালস চাই যে!

রক্তমাখা মৃতদেহ, অঙ্গহানি ঘটেছে, চাদরে ঢাকা, খোলা রিক্সা ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে থানা থেকে মর্গের দিকে, প্লাস্টিকে বা চাদরে মোড়া সেই মৃতদেহের পা দুটি বেরিয়ে আছে, এমন ছবি না হলে কি বোঝানো যায় না খুন সত্যিই হয়েছিল কিনা, অথবা দুর্ঘটনায় মৃত্যু অথবা আত্মহত্যা? সেইসব ছবির কাছে আমাকে পৌঁছে যেতে হয়, ছবিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়। এখন তো মনে মনে ভাবি, আমার অক্ষর অনেক শান্তির ছিল, অনেক স্বস্তির, দৃশ্য এসে আমার সব অনুভূতির ওপর এ কেমন পাথরের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যার নাম জীবিকা, যার নাম আত্মপ্রতিষ্ঠা?

কেউ ফ্যানের সঙ্গে গামছা বেঁধে নিজেকে ঝুলিয়ে আত্মহননের দিকে গেলে, ওই ফ্যান, ওই ছাদ, ওই ঘরের ছবি দেখিয়েই কী আত্মহননের সত্য কোথাও প্রতিষ্ঠা করা যায়? হয়তো যায়। হয়তো দর্শকেরা এমন প্রমাণই চান। অথবা না চাইলেও তাকে এমন প্রামাণিকতার সঙ্গে অভ্যস্ত করে দেওয়া হচ্ছে তিলে তিলে। কে জানে, কোনটা সত্য। আর জানলেই বা কী? না জানলেও?

মাঝে মাঝেই দেখা হয় কাগজের সহকর্মীদের সঙ্গে, যারা এখন প্রাক্তন হয়ে গেছে আমার কাছে। ওরা ভাবে আমি কত ভাল আছি, ব্যস্ত আছি, দৌড়ঝাঁপে আছি। আমি তো জানি আমি কেমন আছি। সেই থাকাটা এমনকি তোমাকেও আমি জানাতে পারিনা ফোনে। তুমি জানতে চাইলে বারবার, আমি ভাল থাকার কথাই বলতে বলতে বুঝি, অভ্যাসে বলছি সব, বোধ থেকে আদৌ নয়। রোজ এমন বলা ভাল না। কেমন যেন মিথ্যেবাদী বলে মনে হয় নিজেকে। তা যদি না-ও হয়, অন্তত সত্যি কথা বলার প্রত্যয়টুকুর অভাব থেকেই যায় চলাফেরায়, কথা বলায়। ঠিক কেমন আছি জানাতে এই দীর্ঘ চিঠি তোমাকে লিখতে হচ্ছে, কত কতদিন পর। তবু, এই যে একনাগাড়ে এত শব্দ, পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছি,সে নিশ্চয়ই ওই লিখতে পারার অমল আনন্দে, যতই তা হোক না কেন জীবনের জটিল এক যন্ত্রণার আখ্যান। এত কথা তো ফোনে বলা যায় না, ইঙ্গিতটুকুও নয়। তাই লিখে ফেললাম এই চিঠি। তুমি অন্তত বহুদিন পর এত বড় চিঠি পড়ার আনন্দ পাবে, যতই তা হোকনা কেন জীবনের এক অচেনা যন্ত্রণার বৃত্তান্ত।

কাগজের বন্ধুদের দেখলে আমার করুণা করতে ইচ্ছে করে নিজেকেই। ওরা তো অন্তত শব্দ, বাক্য রচনা করতে পারছে, প্রতিদিন, অন্তত অভ্যাসটুকু তো থাকছে। ওদের সবার হয়তো অক্ষরের সঙ্গে বিরহ-মিলন নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই, কারুর কারুর তো আছেই। তারা অক্ষরকে, লিখনকে নিজের করে না পেলেও সঙ্গ ছেড়ে যায়নি। লিখনের সঙ্গেই জীবিকার গাঁটছড়া অক্ষত রেখেছে। যতই সে লিখন রক্তমাংসহীন, অনুভূতিহীন হোক না কেন। আমি পারিনি।

টিভিতে যখন খবর দেখায়, সাংবাদিকের নামও ভেসে ওঠে পর্দায়, অথবা খবরের

সঙ্গে বলে দেওয়া হয়। আমার নাম দেখে বা শুনে তোমার শুনতে ইচ্ছে করে আমার গলার আওয়াজ, নিদেনপক্ষে বুম হাতে আমার দাঁড়ানোর দৃশ্যটা দেখতে চাও তুমি পর্দায়। তোমার এমন চাওয়ার কোনো মানে নেই। বাইটসটাই বড় কথা, যাকে দিয়ে কথা বলানো হচ্ছে, সেই বড়। ওটা না পেলে তো খবরই হবে না। কাগজে থাকার সময় বলতাম 'কপি', এখন বলি 'স্টোরি'। কাগজে লেখা যেত, বিশেষ সূত্রের খবর। চ্যানেলে তেমন কিছু আশ্রয় নেই, যা আছে তা হল ছবি, ভিস্যুয়ালস। খবরের যা কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা, তা ওই ছবি দিয়েই। লুকিয়েও ছবি তুলতে গেছি কতবার। আমার যে ছবি চাই! ধরো, কোনো লকআপে বন্দিমৃত্যুর ঘটনা। পুলিস কিছু বলতে চাইছে না। আচমকা ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে পড়েছি থানায়। ওই যে খোলা ক্যামেরার সামনে ওসি কিছু বলতে অস্বীকার করছেন, হাত দিয়ে আড়াল করতে চাইছেন নিজেকে, ওটাই দাঁড় করিয়ে দেবে আমার স্টোরিটাকে। ওটাই বাইটস। এ কি কোনো খবর, যা শুধু শুনতে বা জানতে হয়? এ তো নিজেই নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজে বেড়ানো।

মাঝে মাঝে ভাবি, কী তুমি ভেবেছিলে আমাকে? আমার পরিচিত দিয়ে তুমি রাজি করাবে বাড়ির লোককে, কম মাইনে, অনিশ্চিত পেশার ঝুঁকিটাকে সামাল দেবে? দেখো, সেই পরিচয় আমার তৈরিই হল না। যেখানে তেমন পরিচয় তৈরি হতে পারত, সেই কাগজের অফিস আমায় ছাড়তে হল অক্ষরের প্রতি ভালবাসায়, সম্মানবোধে। ছোটবেলায় পড়া অবন ঠাকুরের 'শকুন্তলা' কাহিনীতে দুর্বাসা মুনির সেই অভিশাপের কথা মনে আছে? 'যার জন্য তুমি আমায় উপেক্ষা করলে, সেই একদিন তোমায় চিনতে পারবে না!'— রাজা দুষ্মন্তের প্রতি বনকিশোরী শকুন্তলার অনুরাগ আর ব্যস্ততা দেখে এই তো ছিল দুর্বাসা মুনির অভিশাপের বয়ান। অনুভূতিহীন, অর্থহীন, নিষ্প্রাণ ওই অক্ষরগুলোর অভিশাপও বোধহয় আমার দিকে এভাবেই ধেয়ে এসেছিল। আমি তো নিজেকে ভালবেসেছিলাম, যা তুমিই শিখিয়েছিলে। নিজেকে তেমন করে ভালবাসতে না পারলে যে তোমার কাছে বা কারুর কাছে যাওয়া যায় না, অন্যের ভালবাসা পাওয়ার উপযুক্ত ওয়ে ওঠা যায় না, একথা তোমার কাছেই শেখা। এই শিক্ষার বিপরীত নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে বিস্তর তর্ক করেছি, আজ আর সেই সব প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। নিজের প্রতি সেই ভালবাসার অমর্যাদা হচ্ছিল কাগজের চাকরিটায়, অক্ষরের প্রতি আমার অধিকার বোধটাই গিয়েছিল হারিয়ে। আমি টিভিতে গিয়েও শান্তিতে নেই, ভাল নেই। অনধিকার যেন আরো তীব্রতায় চেপে বসেছে আমার চেতনায়। দুর্বাসা মুনির অভিশাপটাই মনে পড়ে শুধু। হয়তো ওটাও আমার মতো দুর্বলের যুক্তি।

কতদিন আসানসোলে যাই না, তোমাদের বাড়ির ছাদে বসে পাশের পুকুরটায় শ্রাবণের বিকেলে চেয়ে থাকার স্মৃতি নিয়ে ঘুরে বেড়াই কলকাতা শহরে। আমার হারানো অক্ষরের খোঁজে, আমার অনুভূতিগুলি প্রকাশের ভাষা খুঁজে বেড়াই। তোমাকে খুঁজে বেড়াই। এক আশ্চর্য অস্বাভাবিকে দিনগুলি, রাতগুলি কাটাই। যেমন তুমি এক চূড়ান্ত অস্বাভাবিকে কাগজের খবরের ভেতর খুঁজতে আমাকে, আমার শব্দকে। টিভির

খবরের ভয়েস ওভারেও যদি আমার চেনা শব্দ খোঁজো, অথবা বুম হতে দাঁড়ানো সাংবাদিকের শরীরের দৃশ্যমান অংশে আমার শরীর, তাকে কি বলা যাবে না অস্বাভাবিক ?

আমি শব্দের খোঁজে বাঁচতে বাঁচতে হয়তো একদিন ভুলেই যাব ঠিক কোন শব্দটা ছিল আমার নিজের একান্ত। হয়তো অন্য সব খোঁজ এসে একদিন ভুলিয়ে দেবে আমার আজ পর্যন্ত অক্ষত খোঁজ। সেদিন আমি কোন পরিচয়ে যাব তোমার কাছে ? ধরব তোমার হাত ? সেদিনও তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবেই, এই প্রত্যয় আমার টলে গেছে। কলকাতায় তোমার মাসির বাড়ি। একবার আসতেও ত পারো বেড়াতে। তাহলে অন্তত এই নিষ্ঠুর মহানগরীতে, আমাদের কথাবার্তাগুলো কোথাও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কিনা জানা যেত। এখনও আমাদের নিজেদের মধ্যে বলাবলির কত কথা জমা হয়ে আছে, আদৌ আছে কিনা, জানা যেত সেকথাও। আমি যে ঠিক সেই আমিটাই আছি, বদলাতে বদলাতে, বা কতটুকু, সেই জানাটাও তো কম জরুরি নয়, তোমার-আমার দুজনের কাছে। কলকাতার জীবন, জীবিকা মানুষকে কত বদলে দেয়, তার চিন্তা, তার দৃষ্টি, তার ভাবনা, তার কথাবার্তা, তার শব্দ ব্যবহার, তার চাহনি, তার ছোঁয়া, তা কি আমি নিজেও জানতাম এতদিন ? আমার ভেতর সেই বদলটা তুমি ছাড়া আর কার চোখেই বা পড়বে কোনোদিন ? কত নতুন শব্দ বলি এখন, পুরনো শব্দগুলোও কি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ব্যবহার করার তীক্ষ্ণতার অবশেষ নিয়ে আজো আছে আমার ভেতরে ?

বদলের এই ধীর, নিশ্চিত এক দ্রুতির ভেতর আমি এখন নিজেই জানি না ঠিক কোথায় গেলে, কী পেলে, আমার ফের নিজেকে খুঁজে পাওয়া যাবে। সারাক্ষণ এক হাহাকারের ভেতর, আত্মবিলোপের ভেতর এমন বাঁচার হাত থেকে নিস্তার চাইছি দেহে-মনে। কোথায় এই নিস্তার, জানি না। আমি কি আবার ফিরে যাব খবরেব কাগজে, সেই শব্দের সান্নিধ্যে ? আমি কি শব্দের প্রতি আমার টানকে অ-নাগরিক দুর্বলতা ভেবে ঝেড়ে ফেলে দেব সব হাহাকার ? আমি কি এই বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে অন্য কোনো চাকরি খুঁজব, যেখানে এই অদ্ভুত লাঞ্ছনা, অনুভূতির, আর কঠিন আত্মগোপনের হাত থেকে অন্তত বাঁচা যাবে ? যদি যাই, তবে শব্দেরা কি আমার জীবনে পুরনো মহিমায় হাজির হবে ? যদি হয়, আমি কি তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারব তখন ? বর্ণপরিচয় থেকে যদি ভাবি, যা কিছু দিয়ে চিনেছি এই পৃথিবীকে, বর্ণমালাই তার ভেতর আমার সবচেয়ে স্বস্তির অবলম্বন। এই চিঠি পড়ে আরো একবার তুমি তা বুঝবে নিশ্চিত। কিন্তু কীভাবে আমি নিজের চাওয়াটা সাজাব, তাই যে বুঝতে পারছি না। এক ভয়ানক বিভ্রান্তির ভেতর এই চিঠি, তোমার কাছে, সেই বিভ্রান্তিটুকু চেনাতে, জানাতে। এমন হাহাকার নিয়ে কখনো যাইনি তোমার কাছে, লিখিনি তোমায়।

বড় একা আর অস্থির বেঁচে আছি। কাঁপছে সারা শরীর, মন। শুকিয়ে আসছে ঠোঁট, আঙুলগুলো কোনো কঠিন কোমলতার জন্য কাতর হয়ে আছে। তোমার চেয়ে আছি বসে, আছি বসে পথের ধারে।—ভাল থেকো। ভালবাসা। অপেক্ষা। □

দেশ নেই

প্র ফু ল্ল রা য়

এবড়োখেবড়ো, উঁচু একটা টিলার মাথার পাশাপাশি বসে আছে তিনজন আসাদ, জহুরা আর জরিনা। সামনে আরবসাগর। সেখানে জেলেদের অগুনতি মোটরবোট ভেসে বেড়াচ্ছে। নানা রঙের পালতোলা নৌকাও প্রচুর। আর আছে ঝাঁকে ঝাঁকে সি-গাল। সাগর পাখিগুলোর নজর সারাক্ষণ জলের দিকে মাছ চোখে পড়লেই ছোঁ মেরে ধারাল ঠোঁট দিয়ে গেঁথে তুলে আনছে। পলকে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েই শিকারের খোঁজে আবার নতুন উদ্যমে সমুদ্রে হানা দিচ্ছে। টিলার নিচের দিকের পাথরে বিপুল আক্রোশে একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

অনেক দূরে আকাশ যেখানে আধখানা বৃত্তের আকারে দিগন্ত ছুঁয়েছে, সূর্যটা রক্তবর্ণ গোলক হয়ে সেখানে আটকে আছে। সন্ধে নামতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। এই মুম্বাই শহরে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দু'টোই হয় বেশি দেরিতে।

টিলার পেছন দিকে তেলের মতো মসৃণ রাস্তা। তার দুধারে লাইন দিয়ে নারকেল গাছ। তারপর মাঝারি হাইটের একটা পাহাড়। পাহাড়টার গায়ে বিশাল বিশাল কম্পাউন্ডওলা বাংলোগুলো ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। আর রয়েছে অসংখ্য হাই-রাইজ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুডের স্টল। বাঁদিকে কোনাকুনি মাউন্ট মেরি চার্চ, যার চুড়োর ধবধবে ক্রস আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সব মিলিয়ে আশ্চর্য এক খোয়াবনামা।

এই জায়গাটার নাম ব্যান্ড স্ট্যান্ড।

এবার আসাদদের দিকে তাকানো যেতে পারে। আসাদের বয়স পঁয়ত্রিশ। শিরা বার-করা হাত-পা, দুই হাতের চেটোয় ঝামার মতো কড়া। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আঙুলগুলো গাঁট পাকানো এবং থ্যাবড়া। দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে যে পেটের দানা জোটাতে হয়, সর্বাঙ্গে তার ছাপ স্পষ্ট।

এই মুহূর্তে আসাদের গায় পরিপাটি সাজপোশাক। ইস্তিরি-করা চাপা পাজামা আর লম্বা ঝুলের ডোরাকাটা সবুজ ফুলশার্ট। মুখ পরিষ্কার কামানো, মাথায় টেরিকাটা ফাঁপানো চুল।

জহুরার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। রূপসী না হলেও দেখতে মোটামুটি ভাল। বেশ স্বাস্থ্যবতী। কপালে, গালে এবং থুতনিতে বসন্তের অস্পষ্ট দাগ। সুর্মা-টানা বড় বড় চোখে লাজুক চাউনি। পরনে রঙিন সালোয়ার-কামিজ। নাকে লাল পাথর বসানো নাকফুল, হাতে গোছা গোছা কাচের চুড়ি, গলায় চাঁদির হার।

জহুরার ছোট বোন জরিনা। তার বয়স আঠাশ-উনিশ। দেখেই বোঝা যায়, ভীষণ

চঞ্চল আর ছটফটে। বেশ সুশ্রী। বড় বোনের তুলনায় অনেক ফর্সাও। লম্বাটে ভরাট মুখ। ঘন চুল দুই বেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রেখেছে। তারও পরনে জংলা ছিটের সালোয়ার-কামিজ। মেয়েটার ভেতর একটা অদৃশ্য হাসির ফোয়ারা রয়েছে, সেটা সারাক্ষণ উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

জরিনা বসেছে জহুরা আর আসাদের মাঝখানে। অনবরত কলকল করে চলেছে সে। কথাও বলতে পারে মেয়েটা! সেই সঙ্গে সমানে হাসি।

জহুরারা থাকে মুম্বাই শহরের এক মাথায়—কটন গ্রিন এলাকায়, সিকি কিলোমিটার লম্বা ব্যারাকের মতো 'চৌল'-এর একটা কামরায়। আসাদ অনেক বছর থেকেছে এই শহরেরই মাহিম ক্রিকের ধারে একটা ঝোপড়পট্টিতে। দিনকয়েক হল বান্দ্রা ইস্টের ধারাভি বস্তিতে নগদ দশ হাজার টাকা পাগড়ি দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে সে। এশিয়ার সবচেয়ে বড় বস্তি হিসেবে ধারাভির দুনিয়াজোড়া নাম। নরকের চাইতেও জঘন্য ঝোপড়পট্টিতে তো আর নতুন বিবিকে এনে তোলা যায় না। আর কয়েকদিন বাদেই জহুরার সঙ্গে তার শাদি।

জহুরাদের দেশ ছিল বিহারের সাহারসায়। আসাদের বাড়ি ছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে, যার এখনকার নাম বাংলাদেশ। পিতৃভূমি তাদের যেখানেই থাক, মুম্বাই-ই তাদের আসল স্বদেশ। বহু বছর তারা এখানে আছে। এই শহরের গভীর স্তর পর্যন্ত তাদের শিকড় ছড়িয়ে গেছে। মুম্বাই ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

এই যে তিনজন এখন আরবসাগরের গায়ে ব্যান্ড স্ট্যান্ডের টিলাটির মাথায় বসে আছে, সেটা অকারণে নয়। দুনিয়ায় কেউ নেই আসাদের। মা-বাপ কবেই মরে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের কথায় তো ঘর-সংসার পাতা যায় না। তার জন্য কত কিছু দরকার। সে সব কেনাকাটার জন্য জহুরার আব্বাজান নিয়ামত আলিকে রাজি করিয়ে দুই বোনকে নিয়ে এসেছে সে। ওরা, বিশেষ করে জহুরা নতুন সংসারের জন্য বাসনকোসন, স্টোভ, বেলুন-চাকি এবং অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র পছন্দ করে কিনে নেবে। তারপর ওদের কটন গ্রিনে পৌঁছে দিয়ে আসবে আসাদ।

কিন্তু সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে, সেটা হাতছাড়া করেনি সে। ভাবী বিবি এবং শালীকে নিয়ে সরাসরি বাজারে চলে যায়নি। সে ঠিক করেছে, সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়েটেড়িয়ে কোনো উদিপি হোটেলে দু'জনকে খাইয়ে লিঙ্কিং রোডের মার্কেটে যাবে।

পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে কোনোদিন যুবতী মেয়েদের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়নি আসাদের। আসলে বেঁচে থাকার জন্য তাকে উদয়াস্ত এতই খাটতে হয়েছে যে, অন্য কোনো দিকে তাকাবার ফুরসত হয়নি। অথচ সারাদিন একটানা খাটুনির পর ঝোপড়পট্টির ময়লা তেলচিটে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কতবার ভেবেছে, তার শাদি হবে, একটি মনের মতো তরুণী এসে তার সুখের সংসার গড়ে তুলবে, আদরে সোহাগে সেবায় যত্নে তাকে বিভোর করে রাখবে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই তো বিয়ে হয় না। তার জন্য পয়সা চাই। কত বছর ধরে ইচ্ছাপূরণের জন্য একটি একটি করে টাকা জমিয়ে

আসছে আসাদ। এখন তাঁর সঞ্চয় প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার। তার থেকে দশ হাজার পাগড়ি দিয়ে ঘর নিয়েছে। বাকি টাকাটা বিয়েতে খরচ করবে।

জহুরা মাত্র সাত হাত দূরে বসে আছে। এই কাম্য নারীটি কয়েকদিনের মধ্যে তার একান্ত নিজস্ব হয়ে যাবে। সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

জরিনা একটানা বকে চলেছে, 'আসাদভাই, বংগালিদের সঙ্গে আমাদের এই পয়লা রিস্তেদারি হচ্ছে, তা কি জান?' মুম্বাইতে একটা ভাষা চালু আছে, সেটা হিন্দি, উর্দু এবং মারাঠির মিশ্রণ। বেশির ভাগ মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলে। জরিনাও বলল।

আসাদ বলে, 'জানি। তোমার আব্বু আর আম্মিও সেদিন বলেছিল।'

জরিনা বলে, 'আমার বহিন চাঁদকা টুকরো। এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে।'

আসাদ তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়, 'হাঁ হাঁ, জরুর।' জবাব দিতে দিতে আড়ে আড়ে জহুরার দিকে তাকায়। দেখে, একজোড়া লাজুক কালো চোখ তাকে লক্ষ করছে। চোখাচোখি হতেই জহুরার মুখে রক্তাভা ছড়িয়ে যায়। দ্রুত চোখ নামিয়ে নেয় সে।

জরিনা বলে, 'আমার বহিনকে মাথায় করে রেখো।'

আসাদ মজার গলায় বলে, 'জরুর। চাঁদকা টুকরার বহিন তো হীরেকা টুকরা। তাকেও মাথায় করে রাখব।'

কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগে জরিনার। তারপর চোখ কুঁচকে, মুখ ভেংচে বলে ওঠে, 'ই-হি-হি-হি, আমি তোমার মাথায় চড়তে যাব কেন? আমাকে অন্য আদমি চড়াবে।'

'সেই আদমিটাকে তোমার আব্বু কি খুঁজে পেয়েছে?'

'একনও পায়নি, লেকিন পাবে তো। তামাম জিন্দেগী আমি বাপের ঘরে পড়ে থাকব নাকি?'

আসাদ ঠোঁট টিপে, হেসে হেসে বলে, 'যিতনা রোজ কেউ না জুটছে, আমার মাথাতেই থাক না।'

জরিনা বলে, 'শখ কত! দুই জেনানাকে চড়াবার মতো তাগদ তোমার আছে?'

'চড়েই দেখ, আছে কিনা?'

'মাজাক ছাড়ো। একটা কথা ধ্যান দিয়ে শোন—'

'বল।'

জরিনা বলে, 'আমার বহিনকে ইজ্জৎ দিও। সে তোমার ঘর রোশনি করে রাখবে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ—রাখবে।

'আউর এক বাত—'

'কী?'

জরিনার গলা এবার ভারি হয়ে আসে,'বহিন অনেক দুখ পেয়েছে। তাকে আর কষ্ট দিও না।'

নিজের অজান্তেই আসাদের দুই চোখ জহুরার দিকে চলে যায়। খানিক আগেও

তাকে দারুণ হাসিখুশি আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ভেতর থেকে অপার আনন্দের ঝলক উঠে এসে তার চোখেমুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন তাকে খুব ম্লান দেখাচ্ছে। কেউ যেন মুহূর্তে তার সমস্তটুকু খুশি জীবনের সব রোশনাই শুষে নিয়েছে।

জরিনা যে ইঙ্গিত দিয়েছে, তা বুঝতে না পারার কারণ নেই। নিয়ামত আলি কোনোরকম লুকোছাপা করেনি। স্পষ্ট করে আসাদকে জানিয়ে দিয়েছে, আগে একবার শাদি হয়েছিল জহুরার। কিন্তু সে বিয়েটা আদৌ সুখের হয়নি। তার আগের স্বামী জাভেদ খান মুম্বাই পোর্টে কাজ করত। মাইনে বেশ ভালই। কিন্তু লোকটা মার্কামারা বদমাশ। মাতাল, দুশ্চরিত্র, বদমেজাজি। পেটে ঠাররা (এক ধরনের উগ্র দিশি মদ) পড়লে জাভেদের ওপর খোদ শয়তান ভর করত। মেয়েমানুষ নিয়ে তার কত যে কুকীর্তি তার ঠিক নেই। জহুরা এ নিয়ে কিছু বললে মারতে মারতে তাকে বেহুঁশ করে ফেলত।

এরকম একটা জঘন্য খুনে ধরনের লোকের সঙ্গে সারাজীবন কাটানো অসম্ভব। স্বাভাবিক নিয়মেই শাদিটা কাটান-ছাড়ান হয়ে গিয়েছিল। তালাকের পর নিয়ামত বড় মেয়েকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। শুধু তাই না, তার নিকার জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তার এবং তার বিবির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। দু'টো মাত্র মেয়ে, ছেলে নেই। তাদের ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে মেয়েদের কী হবে? এই সমাজে অরক্ষিত যুবতীদের হাজারটা বিপদ। নিয়ামত ঠিক করে ফেলেছিল, যেভাবেই হোক, আগে জহুরার গতি করবে, তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জরিনার শাদি দেবে। ওপরওয়ালার মেহেরবানিতে শেষ পর্যন্ত আসাদের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে। নিয়ামত আসাদের দুই হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে বলেছে, জহুরা বড় শান্ত, বড় নম্র, তার চাহিদা কম, স্বভাবটা মধুর। আসাদ যেন তাকে দেখে।

ঠিক একই কথা বলল জরিনা। আসাদ গাঢ় গলায় বলে, 'চিন্তা করো না জরিনা। আমার দিক থেকে তোমার বহিন কোনোদিন কষ্ট পাবে না।'

জরিনার ওপাশে একজোড়া কৃতজ্ঞ চোখে আলো ফুটে ওঠে।

সূর্য যখন আরবসাগরে আধাআধি নেমে গেছে সেই সময় জরিনা বলে, 'এবার উঠতে হবে আসাদভাই। ফিরতে দেরি হলে আব্বু খুব ভাববে।'

আসাদ বলল, 'হাঁ হাঁ, চল—'

টিলা থেকে নেমে নিচের রাস্তায় চলে এল তারা। তারপর একটা উদিপি রেস্তোরাঁয় রায়া দোসা, উপমা, আর কফি খেয়ে অটো ধরে সোজা লিঙ্কি রোডে। অনেকটা এলাকা জুড়ে এখানে বিশাল মার্কেট। ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে নতুন সংসারের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনে ট্যাক্সির মাথায় চাপিয়ে এবার কটন গ্রিন। দুই বোনকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই ধারাভি ফিরে আসবে সে।

লিঙ্কি রোড থেকে বান্দ্রা পেরিয়ে মাহিমের দিকে যেতে যেতে আসাদ জারনাকে বলল, 'বহিনের জন্যে কেমন ঘর ভাড়া নিয়েছি, এক নজর দেখে যাও না—' জরিনা উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে তার একান্ত ইচ্ছা, কোথায় সংসার পাতবে জহুরা, আগেই তা নিজের চোখে দেখে যাক।

কেনাকাটা সারতে সারতে রাত হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভেপার ল্যাম্পগুলো তো বটেই, দু'ধারের আকাশছোঁয়া হাইরাইজগুলোতে এবং সারি সারি শপিং আর্কেডে নিওন আলো জ্বলে উঠেছে। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, নানা রঙের চোখধাঁধানো রোশনাই।

জরিনা ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'না না আসাদভাই, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। পন্দ্র রোজ পরেই তো শাদি। তারপর কত আসা যাবে।'

আসাদ আর কিছু বলল না। কটন গ্রিনে জহুরাদের নামিয়ে দিয়ে ধারাভিতে যখন পৌঁছল, দশটা বেজে গেছে।

বস্তিটা প্রায় দু-আড়াই কিলোমিটার জুড়ে। টিন, টালি আর অ্যাসবেস্টসের ছাউনি মাথায় নিয়ে চাপ-বাঁধা ঘরের পর ঘর। সুড়ঙ্গের মতো অসংখ্যা গলি সাপের মতো হাজারটা পাক খেয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে।

বস্তিটায় ঢোকার কত যে মুখ তার গোনাগুনতি নেই। আসাদের ঘরে যেতে হলে দক্ষিণ দিকের একটা গলি দিয়ে ঢুকতে হয়। গলিটা এত সরু যে ট্যাক্সি যাওয়ার জায়গা নেই। অগত্যা বস্তির বাইরের চওড়া রাস্তায় গাড়িটা থামাতে হয়।

হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান প্রিদু, হেন জাত নেই যা ধারাভিতে পাওয়া যাবে না। বাঙালি বিহারি শিখ গোয়াঞ্জি তালিম অন্ধ্রি থেকে শুরু করে ওড়িয়া সিন্ধি গুজরাটি— সারা ভারতবর্ষ এখানে দলা পাকিয়ে আছে। বলা যায়, জায়গাটা ছোটখাট একটা ইন্ডিয়া।

নিরীহ, সাতেপাঁচে থাকে না, খেটে-খাওয়া অজস্র মানুষ যেমন এখানে আছে, তেমনি রয়েছে খুনি, বুটলেগার, চোরাই চালানদারদের বিশাল এক বাহিনী। 'সুপারি' অর্থাৎ টাকা নিয়ে খুন করাটা এদের অনেকের কাছে জল ভাত। খবরের কাগজে যাদের 'কনট্রাকট কিলার' বলে, এরা হল তাই। ছুরি-ছোরা, বেআইনি দিশি বন্দুক থেকে এ কে ফর্টিসেভেন রাইফেল পর্যন্ত এখানে মজুত রয়েছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে ধারাভি হল হাজার রকম ক্রাইমের মেটার্নিটি হোম। তবে একটা অঘোষিত নিয়ম চালু আছে, ধারাভির ক্রিমিনালরা এখানকার সাধারণ ভাল মানুষজনের গায়ে একটা আঙুল পর্যন্ত ঠেকায় না। এই আচরণবিধি মেনে চলা হয় বলে জঘন্য অপরাধীরে সঙ্গে নির্বিবাদী লোকজনের সহাবস্থানটা বহুকাল ধরে চলে আসছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল আসাদ। মালপত্র যখন নামাতে যাবে, সেই সময় রাস্তার ওধারের তেরপলের ছাউনিওলা চায়ের দোকান থেকে চলে আসে রজিবুল হক। লোকটা আধবুড়ো, গাল ভাঙা, মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখের কোলে কালির পোঁচ। পরনে আধময়লা, চাপা পাজামা আর লম্বা ঝুলের সস্তা ছিটের ফুলশার্ট, পায়ে পুরনো কোলাপুরি চটি।

রজিবুল আর আসাদ একই বিল্ডারের কাছে কাজ করে। রজিবুল ইউ পি'র আদি বাসিন্দা, আঠার বছর বয়সে বোম্বাইতে (এখনকার মুম্বাই) চলে এসেছিল। তারপর থেকে এই শহরই তার ঘরবাড়ি।

রজিবুলের কেউ নেই দুনিয়ায়। শাদি একটা সে করেছিল, দু'টো বাচ্চাও হয়েছিল,

মন মরে মৌত হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে আর একটা সাদি সে নিশ্চয়ই করতে পারত কিন্তু বিবি-বাচ্চাদের মৌতের পর ঘর-সংসার থেকে তার মন উঠে গেছে। রজ্জিবুল ধারাভিতেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে বেশ কয়েক বছর। সে-ই এখানে আসাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

রজ্জিবুল খানিকটা দূরে আসাদকে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তোর জন্যে সেই সামনে চায়কা দুকানে বসে আছি।' সে জানে আজ বিয়ের কেনাকাটা করতে গেছে আসাদ। ফিরতে তার রাত হবে।

রজ্জিবুলের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে আসাদ, 'কী হযেছে চাচা?' সে রজ্জিবুলকে চাচা বলে। লোকটা তার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

'বহুত মুসিবৎ।'

'মতলব?'

'পুলিশ তোর তালাশে মাহিমের ঝোপড়পট্টিতে গিযেছিল। সেখান থেকে ঠিকানা জোগাড় করে ধারাভি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

আসাদ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সৎ। চুরি জোচ্চুরি ফেরেববাজি, কোনোরকম নোংরা কাজে সে নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে রোজগার করে। পুলিশ তার খোঁজ করছে, এটা তার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক খবর। এমন কোনো গর্হিত অপরাধ সে করেনি যাতে ওরা তার পেছনে লাগতে পারে। আসাদে শ্বাস আটকে আসেছ। কাঁপা গলায় সে বলে, 'কী কসুর আমার? কেন আমাকে তালাশ করছে?'

আসাদের কানে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে রজ্জিবুল বলে, 'তুই, ইন্ডিয়ার লোক না, বাংলাদেশ থেকে এসেছিস উসি লিয়ে—' দম বন্ধ হয়ে আসে আসাদের। ভযে ভয়ে সে বলে, 'লেকেন চাচা—'

'কি?'

'আমি তো সেই পাঁচ বছর বয়েসে এখানে এসেছি। এখন আমার পঁয়ত্রিশ চলছে। তিরিশ সাল্ আমি মুম্বাইতে আছি। তোমরা তো সব জানো—'

রজ্জিবুল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বিষণ্ণ মুখে বলে, 'আমি জানলে কী হবে? পুলিশ মনে করছে তুই ঘুসপৈঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)।'

একটু চুপচাপ।

তারপর আসাদ জিজ্ঞেস করে, 'বাংলাদেশ থেকে আরো অনেকেই এসেছে। তাদেরও কি খুঁজছে?'

রজ্জিবুল বলে, 'সেই রকমই শুনছি।'

'কি করতে চায় ওরা?'

'ও তো মালুম নেহি। তব্—'

'তব্ কি?'

রজ্জিবুল জানায়, ওদের মতলব ভাল নয়, নিশ্চই কোনোরকম দুরভিসন্ধি রয়েছে।

আসাদ বলল, 'এখন তুমি আমাকে কি করতে বল চাচা?

রজ্জিবুল বলে, 'পুলিশের নাক হল কুত্তার নাক। একবার যখন গন্ধ পেয়েছে,

আবার তোর খোঁজে এখানে এসে হাজির হবে।'

ওদিকে ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। সে তাড়া লাগায়, 'মিয়াসাব, আপনার সামান নামিয়ে কেরায়া মিটিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়াতে পারব না।'

আসাদ পুলিসের নাম শুনে এতটাই তটস্থ হয়ে উঠেছে যে, তার মাথা কাজ করছিল না। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে কী করতে বল চাচা?

একটু চিন্তা করে রজিবুল আসাদকে মালপত্র নামিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিতে বলে। তক্ষুণি তাই করে আসাদ। তারপর জানতে চায়, 'এবার?'

রজিবুল বলল, 'তুই এখন ক'রোজ অন্য কোথায় গিয়ে থাক। তারপর হালচাল ভাল বুঝলে খবর দেব। তখন চলে আসিস।'

'কোথায় থাকব?'

ঘাটকোপারে তোদের দেশের কিছু লোকজান থাকে। তাদের কাছে চলে যা।'

বিয়ের জন্য যে জিনিসপত্র কিনেছে সেগুলো দেখিয়ে আসাদ জিজ্ঞেস করে, এগুলোর কি হবে?'

'আমার ঘরে এখন রেখে দিচ্ছি। পরে নিস।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর আসাদ বলে, 'চাচা, তুমি তো আমার সব কথা জানো, পন্দ্র রোজ বাদে—' বলতে বলতে চুপ করে যায। তার গলার স্বর বিষাদ-ভরা, করুণ। চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ।

আসাদ যা বলতে চেয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি রজিবুলের। সে বলে, 'পন্দ্র রোজ বাদ তোর শাদি তো?'

'হাঁ—আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ।

আসাদের বিয়ের ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সবই জানে রজিবুল। শাদির তারিখ পাকা করতে যে ক'জন কটন গ্রিনে তার সঙ্গে জহুরা-জরিনার আব্বাজান নিয়ামত আলির চৌলে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে রজিবুলও ছিল। নিয়ামত আলিকে সে খুব ভাল করেই চেনে।

রজিবুল বলল, 'দু'চার রোজ দ্যাখ। যদি মনে হয় পুলিশ হাঙ্গামা করতে পারে, নিয়ামত মিয়ার সঙ্গে দেখা করে সব জানিয়ে শাদির তারিখ কয়েক রোজ পিছিয়ে দিবি।'

স্বপ্নপূরণের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল আসাদ। সেটা যে এভাবে ধাক্কা খাবে, ভাবতে পারো সে। অপার নৈরাশ্য তাকে চারপাশ থেকে যেন ঘিরে ধরে। উত্তর না দিয়ে মুখ নামিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

রজিবুল কী ভেবে এবার বলে, 'ঠিক আছে, তোকে যেতে হবে না। আমিই এক সময় গিয়ে নিয়ামত মিয়াকে জানিয়ে আসব।'

ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়ে দেয় আসাদ। ধাক্কাটা তার মনেই শুধু লাগেনি, সে জানে, বিয়ের তারিখ পিছোবার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও নিশ্চয়ই ভেঙে

পড়বে। এই বিয়েটা ঘিরে জহুরাও তো কম স্বপ্ন দেখেনি।

বিমর্ষ মুখে আসাদ বলে, 'একা তুমি এত সামান নিয়ে যেতে পারবে না। চল, দু'জনে ধরাধরি করে তোমার ঘরে পৌঁছে দিই। তারপর আমি ঘাটকোপার চলে যাব।'

কী একটু ভেবে রজিবুল বলে, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। মালুম হচ্ছে, আজ আর পুলিশ এখানে আসবে না। রাতটা তোর কামরাতেই থেকে যা। কাল সুবে সুবে উঠে একসাথ কাজে চলে যাব। সেখান থেকে সোজা ঘাটকোপার চলে যাস।'

'ঠিক হ্যায়।'

মালপত্র কাঁধে এবং মাথায় চাপিয়ে দু'জনে ধারাভি বস্তির ভেতর ঢুকে যায়।

সারারাত আতঙ্কে ভাল ঘুম হয না আসাদের। পুলিশ কেন তার খোঁজ করছে আকাশপাতাল তোলপাড় করেও সে ভেবে পায় না। কত রকম চিন্তা যে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কেউ কি ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসি দিতে চাইছে? পুলিশের কাছে এমন কিছু লাগিয়েছে যাতে সে বিপদে পড়ে যায়। কিন্তু তার এ জাতীয় মারাত্মক শত্রুতা কে করতে পারে? সে তো কখনও কারো কোনো ক্ষতি করেনি।

কিছুদিন ধরে আবছাভাবে একটা গুজব হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নাকি হন্যে হয়ে কাদের খুঁজছে। ব্যাপারটা নিয়ে আসাদ আদৌ মাথা ঘামাযনি। কেনই বা ঘামাবে? পুলিশ যাদের তল্লাশ করে সে অন্তত সেই দলে পড়ে না, এমন একটা নিশ্চিত ধারণা ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে বলে মুম্বাইতে সকাল হয় অনেক দেরিতে। আসাদ যখন বিছানা ছেড়ে উঠল, তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি, চারদিকে আবছা অন্ধকার।

ভোর হতে না হতেই রাস্তার কলগুলোতে লম্বা লাইন পড়ে যায়। দু'টো বড় প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে আসাদ যখন একটা কলের কাছে পৌঁছুল, তখন সামনে কুড়ি-বাইশ জন দাঁড়িয়ে আছে।

বালতিতে জল ভরে মুখ ধুয়ে চান সারতে সারতে রোদ উঠে গেল। নিজের কামরায় এসে ভেজা জামাপ্যান্ট পালটে শুকনো পোশাক পরে একটা বড় কাপড়ের ব্যাগে বাড়তি ক'টা শার্ট আর ফুলপ্যান্ট ভরে নেয় আসাদ। কতদিন ঘাটকোপারে থাকতে হবে কে জানে! কাল বিয়ের কেনাকাটা করার পর যে টাকাটা বেঁচেছে তাও সঙ্গে নিল। তারপর ঘরে যখন তালা লাগাতে যাবে, রজিবুল এসে হাজির। এর মধ্যে তারও চানটান সারা হয়ে গেছে। তারা একই লেবার কন্ট্রাক্টরের কাছে কাজ করে।

অন্যদিন রোদ ওঠার আগে ঘুম ভাঙে না আসাদের। ধারাভিতে আসার পর, কিংবা তারও আগে যখন সে মাহিমের ঝোপড়পট্টিতে থাক, রজিবুলকে গিয়ে ডেকে তুলতে হত। আজ আসাদকে চানটান সেরে ফিটফাট দেখে খুশিই হল সে। বলল, 'বহুত আচ্ছা। আজ আর তোকে ডাকতে হয়নি। বিলকুল রেডি—' মাঝে মাঝে দু'একটা ইংরেজিও বলে সে। এই মুম্বাই শহরে, যেখানে সারা ইন্ডিয়ার তো বটেই, অন্য বহু দেশের, বহু জাতের মানুষের বাস। ইংরেজি জবানটা এখানে ভালই চালু রয়েছে।

আসাদ উত্তর দিল না। নিঃশব্দে ঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটা রজিবুলকে দিতে দিতে

বলল, 'পুলিশের ঝামেলা যতদিন না মিটছে, এটা তোমার কাছে রাখো।'

কী বলতে গিয়ে আসাদের মুখের ওপর নজরটা আটকে যায় রজ্জিবুলের। চানটান করার পরও তার চোখের তলায় কালির ছোপ থেকে গেছে। চোখের সাদা অংশটা লালচে। সারা মুখে কেমন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।

রজ্জিবুল জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, রাতে ঘুম হয়নি?'

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ, 'না। চোখ বুজে এলেই ঘুমটা বার বার ভেঙে যাচ্ছিল।'

রজ্জিবুল তার পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলল, 'পুলিশ তোকে ঢুঁড়ছে শুনে ঘাবড়ে গেছিস, না?'

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ।

রজ্জিবুল বলে, 'অত ডরাবার কিছু নেই। সব কুছ ঠিক হো যায়েগা। এখন চল। আর দেরি করলে ট্রেনে অ্যায়সা ভিড় হবে যে উঠতে পারবি না। সাড়ে ন'টায় হাজিরা না দিলে তিওয়ারিজির বাচ্চার বহুৎ গুস্সা হবে।'

আসাদ উত্তর দেয় না।

তেওয়ারিজি হল লেবার কন্ট্রাক্টরের নজরদার। তার কাজ হল লেবাররা ঠিকমতো কাজ করছে, না ফাঁকি মারছে সে সব তদারক করা। লোকটার একেবারে গিধের নজর। তার চোখে ধুলো দিয়ে যে কাজে একটু ঢিলে দেবে, বা একটু বসে আয়েশ করে বিড়ি টানবে তার জো নেই। লোকটার মুখ একেবারে পচা নর্দমা, বাছা বাছা খিস্তি দিয়ে চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়বে। অন্য বিল্ডারদের চেয়ে মজুরিটা ওরা বেশিই দিয়ে থাকে। পয়সা যেমন দেয়, খুনপসিনা ঝরিয়ে তেমনই তা উশুলও করে নেয়।

রজ্জিবুল আর আসাদ পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে। ধারাভি বস্তির মুখ থেকে মিনিট তিনেক গেলে বড় রাস্তা। সেখান থেকে বাস ধরে প্রথমে বান্দ্রা স্টেশন। বান্দ্রা থেকে ট্রেনে আন্ধেরি।

বান্দ্রায় এসে ওরা ট্রেন ধরল, প্রচণ্ড ভিড় শুরু হয়ে গেছে। এই এক শহর যা সর্বক্ষণ ব্যস্ত, রাতের তিনটে ঘন্টা বাদ দিলে অনবরত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। টিকিট কেটে ঠেলেঠুলে লোকজনে-ঠাসা একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ে আসাদ আর রজ্জিবুল।

আন্ধেরি স্টেশনে নেমে আসাদরা বাস ধরল। ওদের যেতে হবে আন্ধেরি ইস্টের মহাখালিতে। সেখানে 'রামানি অ্যাসোসিয়েটস' নামে সিন্ধিদের নাম-করা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বিশাল একটা হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি করছে। সব মিলিয়ে চব্বিশটা সতের তলা হাই-রাইজ। এর মধ্যে থাকবে পার্ক, সুইমিং পুল, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, প্রিপারেটরি স্কুল থেকে হাইস্কুল, কমিউনিটি হল এবং বিনোদনের নানা ব্যবস্থা। পঁচিশ জন লেবার কন্ট্রাক্টরের প্রায় দু হাজার লেবার ওখানে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত কাজ করছে। সময় বাঁধা আছে, তিন বছরের ভেতর কমপ্লেক্স শেষ করে ফেলতে হবে।

কমপ্লেক্সের একেবারে শেষ দিকে যে বিল্ডিং দু'টো উঠছে, যেখানে কাজ করে আসাদরা। ন'টা পঁচিশে ওরা সাইটে পৌঁছে যায়। এর মধ্যে অসংখ্য লেবারার এসে গেছে। তাদের সুপারভাইজার বা নজরদার তিওয়ারিজি একটা প্রকাণ্ড চেয়ারে জ্যাম হয়ে বসে আছে। তার সামনে চৌকো টেবিলের ওপর হাজিরার মোটা খাতা খোলা রয়েছে।

লোকটার ওজন প্রায় দেড়শ কেজি, বাদামি রঙ গায়ের, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। গলা বলতে বিশেষ কিছু নেই। প্রকাণ্ড মাথাটা ঠেসে ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'মহাভারত' সিরিয়ালে ভীমের হাতে যে গদা থাকে তিওয়ারিজির হাত দু'টো সেইরকম। চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা, মাথার পেছন দিকে মোটা টিকির ডগায় লাল গোলাপ ফুল বাঁধা। থুতনির তলায় তিন থাক চর্বি। লালচে গোলাকার চোখের তারা দু'টো সর্বক্ষণ বাঁই বাঁই করে ঘুরচে। পরনে পাতলা ফিনফিনে মিলের ধুতি, যেটার কাছা পাকিয়ে পেছন দিকে গোঁজা। গায়ে জালি-কাটা গোলাপি গেঞ্জির ওপর সিল্কের হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। গলায় সোনার চেন, বাঁ হাতের কবজিতে চওড়া স্টিল ব্যান্ডের জবরদস্ত ঘড়ি। পায়ে পুরু চামড়ার চপ্পল।

লোকটার আদি বাড়ি বেনারসে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অল্প বয়স থেকে লেবারার খাটিয়ে খাটিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছে।

এই কমপ্লেক্সে তিওয়ারিজির তাঁবেতে আশি জন লেবাররা রয়েছে। প্রত্যেকের নামটাম সব তার মুখস্থ।

অন্য দিনের মতো লেবাররা এসে আজও তিওয়ারিজির সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আসাদরা লাইনের একেবারে পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

তিওয়ারিজি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। মুখ দেখে চটপট হাজিরা খাতায় লেবারারদের নামের পাশে টিক মারে। যার নামে টিক মারা হচ্ছে সে সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে সরে যাচ্ছে।

হাজিরার মার্কা লাগাতে বেশি সময় লাগে না। তারপর ভারি, কর্কশ গলায় তিওয়ারিজি হেঁকে ওঠে, 'কাম চালু কর দে—'

কাজ শুরু হয়ে যায়।

এখন কমপ্লেক্সের সবগুলো বিল্ডিংয়েই ঢালাইয়ের কাজ চলছে। কোনোটা পাঁচতলা, কোনোটা বা ছ'তলা পর্যন্ত উঠেছে। আজ আসাদদের দু'টো বিল্ডিংয়ে সাত তলার ঢালাই হবে।

গত কয়েক দিন ধরে ছ'তলার ওপর অগুনতি শাল কাঠের খুঁটির ওপর পুরো সাততলা জুড়ে মজবুত পাটাতন পেতে তার ওপর লোহার রডের ফ্রেম তৈরি করা হয়েছিল। এই ফ্রেমে সিমেন্ট বালি টালির মিশ্রণ ঢালা হবে।

রজিবুলের ডিউটি হল মিক্সার চালানো। প্রকাণ্ড কড়াইয়ের মতো স্টিলের কন্টেনারে স্টোন চিপস, বালি, জল আর সিমেন্ট ঢেলে ইলেকট্রিসিটিতে সেটা চালানো হয়। স্টোন চিপস-টিপসের মণ্ড তৈরি হলে সেগুলো কড়াইতে করে বিল্ডিংয়ের গায়ের ভারা বেয়ে ওপরে লোহার ফ্রেমে ঢেলে আসা হয়। আসাদ আরো অনেকের সঙ্গে এই কাজটাই করে।

শুধু ওদের দুই বিল্ডিংয়েই নয়, চারপাশের অন্য বিল্ডিংগুলোতেও ঢালাইয়ের তোড়জোড় চলছে।

একসময় পঞ্চাশ-ষাটটা মিক্সার চালু হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে একটানা ভীষণ আওয়াজে কানের পর্দা চৌচির হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

রজিবুল যে মিক্সারটা চালাচ্ছে তার সামনে কড়াই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আসাদ রফিক, ফকিরা, আমিনুল, মুজিব, ভানুপ্রসাদ, চতুরলাল, রবি, ভালুয়া এমনই অনেকে। স্টোন চিপসের মণ্ড তৈরি হলেই ওরা সেগুলো কড়াই বোঝাই করে ঢালতে নিয়ে যাবে।

আসাদের মতোই আটাশ কি তিরিশ বছর আগে রফিক, ফকিরা আর মুজিব তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের মা-বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। তারপর নানা ঘাটের জল খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত বম্বেতে (তখনও বম্বে মুম্বাই হয়নি)

রফিক, ফকিরা আর মুজিব থাকে মুলুন্দের কাছে রেল লাইনের ধারের ঝোপড়পট্টিতে।

রফিক এধারে ওধারে তাকিয়ে চাপা গলায় আসাদকে জিজ্ঞেস করল, 'একটা খবর শুনেছিস?'

আসাদ জানতে চায়, 'কী খবর?'

'পাকিস্তান থেকে যারা চলে এসেছিল তাদের নাকি পুলিশ তালাশ করছে।'

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে আসাদের। কাঁপা গলায় সে বলে, 'তোকে কে বললে?'

কয়েকজনের নাম করল রফিক। তারা অবশ্য বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরদের খাতায় নাম লেখায়নি। ওরা কেউ কাজ করে কাপড়ের কলে বা ছোটখাট প্লাস্টিকের কারখানায়, কেউ রাস্তায় চায়ের দোকানে বা হোটেলে, কেউ জুহু বিচে নারিয়েল পানি বেচে। থাকেও মুম্বাইয়ের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বেশির ভাগই ঝোপড়পট্টিতে। কেউ কেউ রাস্তার ফুটপাথে, সমুদ্রের ধারে কিংবা পার্কে। রফিক থাকে সিওন স্টেশনের কাছাকাছি একটা বস্তিতে।

আসাদ জিজ্ঞেস করে, 'পুলিশ ওদের কি বলেছে?'

স্টোন টিপসের মণ্ড তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অন্য লেবাররা সেগুলো কড়াইতে ভরে বিল্ডিংগুলোর দিকে যেতে শুরু করেছে।

ওদিকে নিজস্ব চেয়ারটিতে বসে শকুনের মতো চারদিকে লক্ষ রাখছে। তিওয়ারিজি। রফিক আর আসাদকে কথা বলতে দেখে খেপে ওঠে, 'এই কুত্তার বাচ্চারা, আভি ভি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গপ মারছিস! কাম চালু নেই হুয়া—কিয়া?'

আসাদরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারা জানে কাজে কারো গাফিলতি দেখলে মাথায় খুন চড়ে যায় তিওয়ারিজির। শুধু চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে খিস্তিখেউড় আর গালাগালিই নয়, দিনের শেষে মজুরি দেওয়ার সময় কিছু পয়সাও কেটে নেয়। বলে, 'শালে লোগ তোদের ফাইন করে দিলাম।'

রফিক সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে আসাদকে বলে, 'দুপুরে টিফিন খাবার সময় কথা হবে।

নইলে ওই গিন্ধড় গেটে মারবে, পুরা পয়সা দেবে না।' শশব্যস্তে তারা মিস্ত্রিরের কাছে চলে যায়। তারপর একটানা কাজ।

সাড়ে ন'টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পয়লা শিফট। তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট টিফিন। টিফিন শেষ হলে সাড়ে ছটা পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলার সময় সময় থাকে না। একনাগাড়ে ঢালাইয়ের মালমশলা বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

প্রথম শিফট শেষ হওয়ার পর ঘণ্টা বাজে।

আসাদরা হাতমুখ ধুয়ে নিজেদের কিছুটা সাফসুতরো করে নেয়। কাছাকাছি রাস্তার ধারে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় সারি সারি উদিপিদের সস্তা হোটেল। সেখানে ভাত চাপাটি পুরি ইডলি দোসা উপমা থেকে পাও-ভাজি পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। তাছাড়া গুজরাটি থালিও মেলে যাতে স্টেনলেস স্টিলের পরাতে ছোট-বড় নানা খোপে দেওয়া হয় খানিকটা ভাত, খান ছয়েক পুরি, ডাল, তিনচার রকমের সবজি, আচার এবং টক দই।

প্রতিটি হোটেলের সামনে বসে খাবার জন্য লম্বা লম্বা বেঞ্চ পাতা।

আসাদ, রফিক, ফকিরা এবং মুজিব একটা হোটেল থেকে গুজরাটি থালি কিনে মুখোমুখি বসে পড়ে।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে আসাদ রফিককে সেই আগের কথাটা জিজ্ঞেস করে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের লোকেদের খুঁজে বার করে পুলিশ কী বলছে?

রফিক বলে, 'তা বলতে পারব না। তবে তালাশ করছে, এটুকুই জানি।'

অন্য যে দু'জন বসে আছে, ফকিরা আর মুজিব—তারাও বলে, নানা জায়গায় পুলিশি হানার কথাটা তারাও শুনেছে।

ফকিরা বলল, 'কাল রাতে একটা দরকারে আমি গোরেগাঁওতে গিয়েছিলাম। সেখানে হামিদের সঙ্গে দেখা। ও বলল, পুলিশ ওদের ঝোপড়পট্টিতে গিয়েছিল।' হামিদ পাকিস্তান থেকে এসেছিল বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়। ওদের বাড়ি ছিল সিলেটে।

উদ্বিগ্ন মুখে আসাদ জানতে চায়, 'কেন হামিদের কাছে গিয়েছিল শুনলে?'

'হাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে ফকিরা।

'কী?'

'ওদের রেশন কার্ড দেখতে চেয়েছিল।'

'তারপর?'

'রেশন কার্ড দেখে চলে গেল। কোনো ঝামেলা করেনি।'

রফিক, ফকিরা একই জায়গায় থাকে। রফিক তাকে বলল 'হামিদের ওখানে পুলিশ গেছে, আমাকে বলিসনি তো?'

ফকিরা বলল, 'অনেক রাতে মুলুন্দ ফিরেছি। তখন তোরা ঘুমিয়ে পড়েছিস সকালে উঠে গোসল সেরে তোর সঙ্গেই ট্রেন ধরলাম। তখনও যে বলব, খেয়াল ছিল না।'

রুদ্ধশ্বাসে ফকিরাদের কথা শুনছিল আসাদ। বলল, 'পুলিশ রেশন কার্ড দেখতে চাইল কেন?'

ফকিরা বলল, 'জানি না।'

সবাইকে ভীষণ উৎকন্ঠিত দেখাচ্ছে। এতকাল বাদে পুলিশ কেন বেছে বেছে তিরিশ বছর আগের পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না।

আসাদ থালি থেকে ভাত কি পুরি তুলে খাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু কী খাচ্ছে, তার স্বাদ গন্ধ কিছুই টের পাচ্ছিল না। তার যে সঙ্গীরা কাছাকাছি বসে আছে তারা নানা জায়গায় পুলিশের হানার কথা শুনেছে কিন্তু ওদের কারো কাছে এখনও পুলিশ যায়নি, কিন্তু বিপদটা সরাসরি তার ঘাড়ের ওপরই এসে পড়েছে।

আসাদ একটু ভেবে বলল, 'আমি কিন্তু খুব মুস্কিলে পড়ে গেছি ভাই।' ফকিরা আর মুজিব চমকে ওঠে। মুজিব জিজ্ঞেস করে, 'কিসের মুস্কিল?'

কাল রাতে যা যা ঘটেছে, অর্থাৎ তার খোঁজে পুলিশের মাহিমরে ঝোপড়পট্টি থেকে ধারাভিতে যাওয়া পর্যন্ত সব বলে যায় আসাদ।

মুজিবরা হতচকিত। ফকিরা বলল, 'তোর না পনের দিন পর শাদি?'

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ, 'হাঁ, নয়া সংসারের জন্যে অনেক কেনাকাটাও করে ফেলেছি। কিন্তু খুব ডর লাগছে।'

উদিপি হোটেলের সামনে হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে।

খানিকক্ষণ বাদে আসাদকে ভরসা দেওয়ার জন্য ফকিরা বলে, 'কিসের ডর? ওই হামিদদের ওখানে পুলিশ গিয়েছিল, তাতে কি ওদের কিছু হয়েছে? তোরও কিছু হবে না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'রজিবুল চাচা আমাকে কয়েকদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে বলেছে। পুলিশের ঝঞ্ঝাটটা চুকে গেলে যেন ধারাভিতে ফিরে আসি।'

রজিবুলের মতো অভিজ্ঞ, বয়স্ক লোক যখন ধারাভিতে আপাতত থাকতে বারণ করছে, তখন সেটা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।

মুজিব জিজ্ঞেস করল, 'কী করবি তা হলে?'

'ঘাটকোপারে আমাদের গাঁয়ের দু'চারজন লোক থাকে। তাদের কাছে চলে যাব।'

'আজই?'

'হাঁ। ডিউটি খতম হওয়ার পর। ওখান থেকে আন্ধেরিতে যাওয়া-আসা করতে হবে। দু'বার করে ট্রেন আর বাস পাল্টাতে হবে। ভাড়াও পড়বে অনেক। কিন্তু কী আর করা যাবে!' আসাদের মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে ওঠে।

মুজিবের হঠাৎ কী মনে পড়ে যায়। চিন্তাগ্রস্তের মতো সে বলে, 'পনের দিন পর তোর শাদি ঠিক হয়ে আছে। তার কী হবে?' ওর বিয়ের খবরটা মুজিবরা অনেকেই জানে। সে তাদের আগাম দাওয়াতও করে রেখেছে। ভোজের রীতিমতো এলাহি বন্দোবস্তও করা হয়েছে—বিরিয়ানি, মিরচি-চিকেন, রসগোল্লা আর ফিরনি। বিয়ের দিন সারারাত গানবাজনা হইহল্লা হবে। কিন্তু হাল যা দাঁড়িয়েছে, সব কিছু বরবাদ না হয়ে যায়!

আসাদ বলল, 'রজিবুল চাচা শাদির তারিখ পিছিয়ে দিতে বলেছে।'

মুজিব ভেবে বলল, 'সেই ভাল।' ফকিরাও মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয়।

ওধারে কনস্ট্রাকশনের 'সাইট' থেকে পরের শিফটের ঘণ্টা বেজে ওঠে। কখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে, আসাদরা টের পায়নি। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে, হোটেলের দাম চুকিয়ে ওরা 'সাইট'-এর দিকে ছোটে।

রজিবুল বলেছিল, বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দেবার খবরটা সে নিজেই নিয়ামত আলিকে দিয়ে আসবে। কিন্তু সাড়ে ছ'টায় ডিউটি শেষ হওয়ার পর মজুরি বুঝে নিয়ে আসাদকে বলল, 'আজই নিয়ামত মিয়ার সঙ্গে দেখা করব। তুইও আমার সঙ্গে চল—'

নিয়ামত আলিরা, বিশেষ করে জহুরা কত আশা নিয়ে শাদির তারিখটার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ব্যান্ড স্ট্যান্ডে সমুদ্রের ধারে টিলার মাথায় জহুরা আর জরিনার পাশে বসে কালকের বিকেলটা স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিল। তারা তিনজন ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে কত কেনাকাটা করল। একটা সুখের সংসার গড়ে তুলবে। আর আজ গিয়ে শাদির তারিখ পিছোবার কথা বললে জহুরার প্রতিক্রিয়া কী হবে, কতটা ভেঙে পড়বে সে, ভাবতেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় আসাদের। দ্বিধার সুরে সে বলে, 'আমার না গেলে চলে না চাচা?'

রজিবুল বলে, 'না। আমি একা গিয়ে বললে ওরা হয়তো মেনে নেবে। লেকেন তোর মুখ থেকে শুনলে বহুত ভরসা পাবে। ভাববে আচানক শাদিটা পিছিয়ে দেওয়ার পেছনে তোর বুরা কোনো মতলব নেই। পুলিশের কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে বলবি।'

লোক দিয়ে খবর পাঠানোর চেয়ে নিজে গিয়ে বলা যে অনেক বেশি জরুরি, এই দিকটা আগে তলিয়ে দেখেনি আসাদ। বলল, 'ঠিক আছে চাচা—'

আন্ধেরি থেকে ট্রেন ধরে ওরা প্রথমে আসে বান্দ্রায়। সেখান থেকে হারবার লাইনের গাড়িতে কটন গ্রিন। নিয়ামত আলিদের চৌল স্টেশন থেকে বাসে মিনিট পাঁচেকের পথ। হেঁটে গেলে কম করে পঁচিশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা। আন্ধেরি থেকে এতটা আসতে বাসে-ট্রেন প্রচুর ভাড়া লেগেছে। পয়সা বাঁচাবার জন্য ওরা হাঁটতে থাকে।

ব্যারাকের মতো যে দোতালা চৌলটায় নিয়ামত আলিরা থাকে, সেটার মাথায় টালির ছাউনি। একতলা দোতলা মিলিয়ে চৌলটায় কম করে শ'দুই কামরা। প্রতিটি কামরায় একটা করে ফ্যামিলি। ধারাভি বস্তির মতো এই চৌলটাও মিনি ইন্ডিয়া। সারা ভারতবর্ষের এমন কোনো প্রভিন্সের আর জাতের লোক নেই যাদের এখানে পাওয়া যাবে না।

নিয়ামত আলিরা থাকে দোতলার কোণের দিকে একটা কামরায়। সে কাজ করে কাছাকাছি একটা কটন মিলে।

নিয়ামত খানিক আগে থেকে ডিউটি শেষ করে ফিরে এসেছে।

রজিবুর আর আসাদকে দেখে দারুণ সাড়া পড়ে গেল।

যথেষ্ট খাতিরদারি করে তাদের বসানো হল। নিয়ামত আলি আর জরিনা তাদের কাছাকছি ঘন হয়ে বসে। নিয়ামতের বিবি রুকসানা ভাবী দামাদ এবং তার মাতব্বর অভিভাবক রজিবুলের জন্য নমকিন, লাড্ডু, গুলাবজামুন আর চা নিয়ে এসে ওদের সামনে সাজিয়ে দিয়ে খানিক দূরে গিয়ে বসল। জহুরা অবশ্য ধারেকাছে নেই। তবে কামরার পেছন দিকে যে দরজাটা রয়েছে তার ওপাশে ছোট্ট রান্নাঘর। দরজার পাল্লার আড়ালে একজোড়া সলজ্জ কালো চোখ বার বার নজরে পড়ছিল আসাদের।

হঠাৎ আসাদরা না জানিয়ে এসে পড়ায় নিয়ামতরা যতটা খুশি, তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক। নিয়ামত আর রুকসানা বিবির হয়তো মনে হল, পনের দিন পরেই শাদি, কালও জহুরার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে আসাদ, তবু ভাবী জামাই বোধহয় তাদের মেয়েকে রোজ না দেখে থাকতে পারছে না। না, এই শাদিটা সুখেরই হবে জহুরার। আগের মতো ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

নিয়ামত জিজ্ঞেস করে, 'আচানক কী মনে করে রজিবুল ভাই?'

রজিবুল বলে, 'একটা খবর আছে।'

'আগে চা-পানি খাও, তারপর শোনা যাবে।

'না। আগেই শোন।'

নিয়ামত কিছুতেই শুনবে না। খাওয়ার জন্য সে প্রায় কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। কিন্তু রজিবুলদের খাওয়ার ইচ্ছা একেবারেই নেই। কিন্তু নিয়ামত এবং রুকসানা এমনই নাছোড়বান্দা যে একটু-আধটু মুখে তুলতেই হয়।

খাওয়া শেষ হলে নিয়ামত বলে, 'এবার খবরটা শোনা যাক।'

রজিবুল গলা খাঁকরে পরিষ্কার করে নেয়। তারপর বিমর্ষ মুখে বলে, 'শুনলে তোমাদের খারাপ লাগবে।'

'মতলব?' নিয়ামতরা সবাই চমকে ওঠে।

রজিবুল মুখ নিচু করে বলে, 'আসাদ আর জহুরার শাদির তারিখটা পিছিয়ে দিতে হবে।'

কামরার ভেতর যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, মুহূর্তে তা স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয়, ক'টা কাঠের পুতুল নিশ্চল বসে আছে।

অনেকক্ষণ পর ব্যাকুলভাবে নিয়ামত জিজ্ঞেস করে, 'পুরা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, মহল্লার লোকজন সবাই জেনে গেছে। এখন কী করে শাদি পিছাব? লোকজন পুছলে কী বলব? আমার ইজ্জতকা সওয়াল রজিবুল ভাই—'

রজিবুল বলে, 'বুঝতে পারছি। লেকেন এ ছাড়া এখন আর উপায় নেই।'

রজিবুলের দুই হাত জড়িয়ে ধরে নিয়ামত জিজ্ঞেস করে, 'কেন উপায় নেই? কী হয়েছে?' তার গলায় আরো বেশি করে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

রজিবুল আসাদকে বলে, 'তুই বল—'

আসাদ পুলিশের ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়।

আর্তস্বরে নিয়ামত জিজ্ঞেস করে, 'পুলিশ তোমার পেছনে লেগেছে কেন? ক্যা কসুর তুমহারা?'

আসাদ জানায়, জীবনে কোনো অন্যায় সে করেনি, কারো ক্ষতি তো নয়ই।

'তাহলে তোমাকে পুলিশ ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে কেন?'

আসাদ চমকে ওঠে। পুলিশের ব্যাপারে নিয়ামতের মনে কি অন্য কোনো রকম সন্দেহ দেখা দিয়েছে? সে লক্ষ করে, জরিনার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। আর ওড়নার প্রান্ত মুখে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রুকসানা। আসাদের কলিজায় প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে যখন সে দেখতে পায় রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে লাজুক একজোড়া কালো চোখ সরে গেছে।

দু হাতে মুখ ঢেকে জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে আসাদ বলে, 'আমি জানি না, জানি না, না। আমি জীবনে কোনো খারাপ কাজ কখনও করিনি।'

রজ্জিবুল বলে, 'আমি আসাদকে কম বয়েস থেকে চিনি। ওর মতো ভাল ছেলে হয় না।'

মুহ্যমানের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকে নিয়ামত। তারপর বলে, 'চৌলের পড়োশি আর আমার রিস্তেদারদের এখন আমি কী বলব?'

এরকম একটা প্রশ্ন যে নিয়ামত করতে পারে সেটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল রজ্জিবুল। বলব, 'বলবে, আচানক কিছু অসুবিধা হয়েছে, তাই তারিখ পিছোতে হচ্ছে। মানুষের জিন্দেগিতে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে আগে থেকে তার হদিস পাওয়া যায় না। সব কিছুর জন্য তৈরি থাকতে হয়।'

এ-জাতীয় দার্শনিক কথাবার্তায় খুব একটা যে সান্ত্বনা পেল নিয়ামত তা মনে হয় না। হতাশার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'শাদিটার জন্যে কতদিন দেরি করতে হবে?'

'ফিকর মাত কর। বেশিদিন নয়, পাঁচ-সাত রোজের ভেতর তোমাকে জানিয়ে দেব।' বলে ভরসা দেওয়ার ভঙ্গিতে নিয়ামতের কাঁধে হাত রাখে রজ্জিবুল।

রজ্জিবুলের ছোঁয়ায় কতটা আশ্বস্ত হয়, নিয়ামতই জানে। সংশয় এবং হতাশার শেষ প্রান্ত থেকে যেন ঝাপসা গলায় বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

'আমরা তাহলে আজ চলি—'

নিয়ামত ওদের দু'জনকে খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে যায়। স্টেশনে এসে রজ্জিবুল বান্দ্রার ট্রেন ধরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আসাদেরও ট্রেন আসে। সে যাবে ঘাটকোপার।

ঘাটকোপারে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে যে ঝোপড়পট্টি, সেখানে বিবি-বাচ্চা নিয়ে থাকে আইনুল, জব্বর আর কলিমুদ্দিন। আসাদদের সঙ্গে ওরাও একদিন তাদের আব্বা-আম্মাদের সঙ্গে এই শহরে চলে এসেছিল। আসাদদের মতো ওদের মা-বাপও অনেক আগেই মরে গেছে। বড় হয়ে বিয়েটিয়ে করে এখানেই আইনুলরা ঘর-সংসার পেতে বসেছে। ওদের কেউ রাস্তার ধারের ছোটখাট হোটেলে বর্তন ধোয়ার কাজ করে, কেউ ফেরিওলা, কেউ দুপুরে খাবার সময় অফিসে অফিসে লাঞ্চের ডাব্বা পৌঁছে দেয়।

আসাদের কথা শুনে আইনুলদের রীতিমতো চিন্তিত দেখায়। কলিমুদ্দিন জানাল, পুলিশ যে নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে, এরকম কানাঘুষো তারাও শুনেছে। তবে তাদের

ঘাটকোপারে এখনও কেউ আসেনি।

কলিমুদ্দিনরা মানুষ ভাল। আসাদকে তারা ফিরিয়ে দিল না। তাদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ঠিক হল, যতদিন না পুলিশের হাঙ্গামাটা চুকে যাচ্ছে, এখানে থেকেই আন্ধেরির বিল্ডিং সাইটে যাতায়াত করবে আসাদ। পুলিশ যদি ফের ধারাভিতে আসে, সে খবর রজ্জিবুলের কাছেই পাওয়া যাবে।

দিন ছয়েক ঘাটকোপার থেকে ডিউটিতে গেল আসাদ। সাইটে পৌঁছেই রোজ তার প্রথম কাজ হল, রজ্জিবুলকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করা, 'চাচা, ওরা কি আর এসেছিল ?'

রজ্জিবুল আস্তে মাথা নাড়ে, 'না।'

ছ'দিন কেটে যাওয়ার পর উৎকণ্ঠা যখন অনেক কমে গেছে, শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে এসেছে, আসাদ বলে, 'তোমার কী মনে হয়, পুলিশ আর আসবে ?

রজ্জিবুল কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দেয়, 'এ ক'দিন যখন আসেনি, তখন মালুম হচ্ছে আর আসতে না-ও পারে।'

'ঘাটকোপার থেকে এত দূরে রোজ আসতে কষ্ট হয়, তা ছাড়া গাড়ি ভাড়াতে অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। ধারাভিতে ফিরে আসব কি ? তুমি কী বল ?'

'এখনই আসিস না। আর ক'রোজ দ্যাখ—'

অর্থাৎ পুলিশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে চাইছে রজ্জিবুল। ওদের বিশ্বাস নেই। এ ক'দিন আসেনি বলে যে আর আসবে না, বা আসাদের চিন্তটা মাথা থেকে ওরা বার করে দিয়েছে, জোর দিয়ে তা বলা যায় না। আরো কয়েকটা দিন গেলে বোঝা যাবে, আসাদের ব্যাপারে তারা সত্যিই হাত ধুয়ে ফেলেছে। কাজেই খুব সাবধানে এগোতে হবে।

আসাদ মাথা হেলিয়ে বলে, 'আচ্ছা—' কী কারণে রজ্জিবুল তাকে আপাতত আরো কিছুদিন ঘাটকোপারে থাকতে বলছে, তা বুঝতে পারছে সে।

এই ছ'দিনে নিয়ামত আলি তিনবার আন্ধেরিতে সাইটে এসে খোঁজখবর নিয়ে গেছে। যার মাথায় মেয়ের শাদির চিন্তা সে কি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে ? পুলিশের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিয়েছে। তার মতো করে নিয়ামত ধরে নিয়েছে, আসাদ এখন বিপদমুক্ত। অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে সে রজ্জিবুলকে বলেছে, 'তাহলে এই মাসেই আর একটা দিন দেখে শাদির বন্দোবস্ত করে ফেলি ?'

আসাদের মতো নিয়ামত আলিকে তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছে রজ্জিবুল। বলেছে, 'আর কয়েকটা রোজ সবুর কর।' পুলিশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বহুদর্শী মানুষটার সংশয় এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

চিন্তিতভাবে নিয়ামত জিজ্ঞেস করেছে, 'ক'রোজ ?

একটু ভেবে রজ্জিবুল বলেছে, 'দশ-বার রোজ।'

আরো দশ-বার দিনের মধ্যে যখন কিছুই ঘটল না, তখন ধরেই নেওয়া হল, সমস্যা কেটে গেছে। পুলিশ হয়তো উড়ো কোনো খবর পেয়ে আসাদের খোঁজে ছুটে

এসেছিল। যখন বুঝেছে, সে কোনো অন্যায় করেনি, তাকে সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ নেই, তখন তার পেছনে ধাওয়া করা ছেড়ে দিয়েছে।

নিশ্চিন্তে রজ্জিবুল বলেছে, 'ঝামেলা কেটে গেছে। এবার তুই ধারাভিতে ফিরে আয়।'

মাথার ওপর যে প্রচণ্ড দুর্ভাবনা এতদিন পাহাড়ের মতো চেপে বসেছিল, সেটা সরে যাওয়ায় এখন আসাদ খুব হালকা বোধ করছে। প্রায় একটা মাস কী মারাত্মক উৎকণ্ঠায় যে তার কেটেছে! দিবারাত্রি তীব্র আতঙ্ক তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াত। এখন শাদির কথা ছাড়া অন্য কিছুই ভাববে না। রজ্জিবুলের সঙ্গে পরামর্শ করে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলবে। জহুরাকে ঘিরে তার সেই পুরনো, পরমাশ্চর্য স্বপ্নটা ফিরে আসছে। নিয়ামত আলিকেও জানিয়ে দিতে হবে, সে যেন নতুন করে বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দেয়। এবার আর কোনোবকম বিঘ্ন ঘটবে না।

রজ্জিবুলের কথামতো ধারাভিতে ফিরে এসেছে আসাদ। আন্ধেরিতে ডিউটি দিয়ে ফিরে আসার পর ঘর সাফসুতরো করেছে। নতুন বিবির জন্য দরজির দোকানে পর্দা বানাতে দিয়েছে। যে যখন একা ছিল, তখন দরজা-জানলায় কিছু থাকত না, সব হা-হা করত। কিন্তু বিবি এলে ঘর তো আর বে-আব্রু রাখা যায় না।

শোয়ার জন্য তার একটা পুরনো, তিন পা-ওলা তক্তাপোষ আছে। সেটার চতুর্থ পায়াটির জন্য ইট সাজিয়ে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নিত। ওটাকে দু-একদিনের ভেতর বিদায় করবে সে। দাদার মার্কেটে সস্তা আসবাবের দোকানে খাট দেখে এসেছে। সেটা কিনে নিয়ে আসবে। জহুরার আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা নিজের সাধ্যমতো করে ফেলবে আসাদ। এর জন্য কিছু ধারটার করতে হলেও করবে।

কিন্তু স্বপ্নের অনেক কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত তা পূরণ হল না।

ধারাভিতে আসার দু'দিন পর আন্ধেরি থেকে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল আসাদ। গেল একমাসে একটা ফ্লোর ঢালাই হওয়ার পর তক্তা খুলে তার ওপরের ফ্লোরটা ঢালাইয়ের কাজ চলছে। সারাদিন খাটুনির পর শরীর ভেঙে আসছিল তার। ভেবেছিল, কিছুক্ষণ জিরিয়ে স্নানটান সেরে রাস্তার দোকান থেকে চা খেয়ে আসবে।

এখন প্রায় আটটার মতো বাজে। দূরে বান্দার বিশাল ওভারব্রিজ থেকে শুরু করে বাঁদিকে মাহিম চার্চ, সামনে অনেক দূরে সমুদ্রের খাঁড়ির ওধারে অগুনতি হাইরাইজ-গুলোতে শুধু আলো আর আলো। রাস্তায় রাস্তায় সোডিয়াম ভেপারের রোশনাইতে সব মায়াবী স্বপ্নের মতো মনে হয়।

চোখ বুজে এসেছিল আসাদের। হঠাৎ কয়েক জোড়া বুটের ভারি আওয়াজ কানে আসে, তারপর জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে কর্কশ গলা শোনা যায়, 'দরওয়াজা খোল—দরওয়াজা খোল—'

মুহূর্তে চটকা ভেঙে যায় আসাদের। ধড়মড় করে বিছানা থেকে নেমে এসে দরজা খুলতেই দেখা যায় পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টর আর চারজন কনস্টেবল মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে আছে। কনস্টেবলদের হাতে রাইফেল।

পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আসাদুল মিঁয়া?'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল আসাদের। না, এত করেও পুলিশকে এড়ানো গেল না। শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক তারা এসে হাজির হয়েছে। বেশির ভাগ মারাঠি পুলিশের চেহারায় নিরেট ভাবলেশহীনতা থাকে। তাদের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল আসাদের। কোনোরকমে বলতে পারল, 'জি, সাব।'

অফিসার বলল, 'দো রোজ তোমাকে ঢুঁড়ে গেছি। কী মনে করেছ, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই মুম্বাই শহরে লুকিয়ে থাকতে পারবে?'

দম-আটকানো গলায় আসাদ বলে, 'নেহি সাব, আমি আমার দোস্তদের কাছে গিয়েছিলাম। ক'রোজ সেখানে থাকতে হয়েছে। মেহেরবানি করে যদি বলেন, কেন আমাকে খুঁজছিলেন—'

'আমাদের কাছে খবর আছে, তুমি ইন্ডিয়ার লোক না। বাংলাদেশের ঘুসপেঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)।'

এদিকে পুলিশের আসার খবর পেয়ে রজিবুল ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে। শুধু সে-ই না, ধারাভি বস্তির আরো অনেকে। আসাদের ঘরের সামনে রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। সবার চোখেমুখে প্রবল উদ্বেগ।

হাতজোড় করে আসাদ বলে, 'নেহি সাব, নেহি—' রজিবুল ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে কাতর গলায় বলে, 'সাব, আসাদ আচ্ছা লেড়কা। তিশ সাল ইন্ডিয়ায় আছে। ও এখানকার আদমি।'

অফিসার কড়া চোখে রজিবুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?'

'অ্যায়সা কোঈ রিস্তেদারি নেহি। তবে ও আমার ছেলের মতো। আমাকে চাচা বলে।'

মুখ ফিরিয়ে আবার আসাদের দিকে তাকায় অফিসার, তোমার ওই চাচা বলল, ত্রিশ বছর ইন্ডিয়ায় আছ, তার আগে কোথায় ছিলে? সচ সচ কহোগে।'

আসাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে জানায়, পাঁচ বছর বয়সে সে মা-বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। তারপর থেকে এটাই তার দেশ।

অফিসার প্রচণ্ড জোরে ধমক লাগায়। 'ঝুট। তুমি হালফিল ইন্ডিয়ায় এসেছ।'

রজিবুল প্রায় মরিয়া হয়ে এবার বলে, 'নেহি সাব। আসাদ বচপন থেকেই এখানে আছে।'

অফিসার হুমকে ওঠে, 'তুমি একটা কথাও আর বলবে না। বিলকুল চুপ।' বলে ফের আসাদকে বলে, 'তুমি যে ত্রিশ বছর এখানে আছ, সেটা ঠিক কিনা কী করে বুঝব?

আসাদ বলে,'আমি ধারাভিতে এক-দেড় মাহিনা হল এসেছি। এর আগে যেখানে যেখানে থাকতাম, সেই সব জায়গার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে বলবে। তাছাড়া আমি অনেক জায়গায় বহুৎ আদমির সঙ্গে কাজ করেছি। তারাও বলবে।'

'ওসব শুনতে চাই না। রেশন কার্ড আছে?'

'নেহি সাব।'

'আর কী পরিচয়পত্র আছে যা থেকে জানা যাবে তুমি ইন্ডিয়ার লোক?'

কিছুদিন ধরে আসাদ শুনে আসছে, অনেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুলিশ রেশন কার্ডের খোঁজ করছে। তার কারণটা এতদিনে জানা গেল। আসাদের বয়স যখন পনের ষোল, তখন তার মা-বাপ মারা যায়। তারপর থেকে অনেকদিন এটা সেটা করে, অর্থাৎ নানা উঞ্ছবৃত্তিতে পেটের দানা জোগাড় করেছে সে। এই ক'বছর হল রিয়েল এস্টেটের লেবার কন্ট্রাক্টরদের কাছে কাজ নিয়েছে। যখন যেখানে মাথা গোঁজার জায়গা জুটেছে, সেখানে শুয়ে পড়েছে। কতকাল যে তার স্থায়ী কোনো ঠিকানা ছিল না! ঠিকানা না থাকলে রেশন কার্ডটা হবে কী করে? তাছাড়া ওটা যে খুবই জরুরি সেটা কখনও সে ভাবেনি। দিন কেটে যাচ্ছিল, তাতেই আসাদ খুশি।

কিন্তু একটা রেশন কার্ড বা অন্য পরিচয়পত্রের জন্য একদিন যে তাকে বিপদে পড়তে হবে, কে জানত? সেটা না থাকায় প্রায় সারা জীবনটা আসাদ যে-দেশে কাটিয়ে দিল, এখন দেখা যাচ্ছে সে সেখানকার কেউ নয়।

অদ্ভুত এক ভয়ে মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল আসাদের। সে বলল, 'সাব—সাব—' এটুকু বলার পর তার গলা বুজে গেল।

অফিসার এবার জিজ্ঞেস করল, 'বলছ তো, অনেক সাল এখানে আছ। ভোট দিয়েছ কখনও?।

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ, 'না।'

'ভোটের জন্য ফোটো তোলা হয়েছিল, তা জানো?

'শুনেছিলাম।'

'তোমার ফোটো তুলিয়েছিলে?'

'না, সাব। ঝোপড়পট্টিতে থাকতাম। কেউ আমাকে ফোটো তোলার কথা বলেনি।'

এতক্ষণ মাঝে মধ্যে ধমক ধামাক দিলেও মোটামুটি ভালভাবেই কথা বলছিল অফিসার। এবার তার মেজাজটা হঠাৎ ভীষণ উগ্র হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে 'শালে ঘুসপেঠিয়া। রেশন কার্ড নেই, ফোটো আইডেনটিটি কার্ড নেই—বলে কিনা ইন্ডিয়ান! চল থানায়—'

অফিসারের দুপা জড়িয়ে ধরে আসাদ বলে। 'বিশ্বাস করুন সাব, পাঁচ সাল যখন বয়েস, চলে এসেছি। ইন্ডিয়াই আমার দেশ।'

রজিবুল সন্ত্রস্তভাবে বলে, 'সাব, আসাদের রেশন কার্ড হয়নি। ওর ভুল হয়ে গেছে। লেকিন ও সচমুচ তিশ সাল এখানে আছে—'

অফিসার দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে ওঠে, 'তোকে চুপ করে থাকতে বলেছিলাম না? কুত্তা কাঁহিকা, ওর হয়ে দালালি করছ!'

'না সাব, যা সচ তাই বলছি। ওর ওপর মেহেরবানি করুন। ক'রোজ বাদে ওর শাদি ঠিক হয়ে আছে—'

রজিবুলের কাকুতিমিনতি কানেই তোলে না অফিসার। কনস্টেবলের উদ্দেশে বলে,

'আসাদুল মিয়াকে নিয়ে এস—'

শুধু আসাদই নয়, থানায় আরো অনেক পরিচয়পত্রহীন ঘুসপেঠিয়াকে ধরে এনে আটকে রাখা হয়েছে। আসাদ তাদের অনেককে চেনে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ওরাও বহুকাল আগে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। তাদের কেন এত বছর বাদে পুলিশ ধরে এনেছে, কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই ভীষণ উৎকণ্ঠিত।

পরদিন সন্ধ্যায় রজ্জিবুল নিয়ামত আলিকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। নিয়ামত একেবারে ভেঙে পড়েছে। দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে সে ঝাপসা গলায় সামনে বলে যাচ্ছে, 'কী হবে আমার লেড়কিটার?'

রজ্জিবুলের এমনিতে ভীষণ মনের জোর। সহজে সে হতাশ হয়ে পড়ে না, কিন্তু আজ দেখে মনে হল, তার বয়স হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। চোখের কোলে কালি, গাল বসে গেছে। খুবই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে প্রবল হতাশার সুরে রজ্জিবুল আসাদকে বলল, 'তোর জন্যে কিছুই করতে পারলাম না রে।' জানায় আজ সে ডিউটি দিতে আন্ধেরিতে যায়নি। সকালে উঠেই চলে গিয়েছিল কটন গ্রিনে নিয়ামত আলির চৌলে। আসাদের খবরটা দিয়ে তাকে সঙ্গে করে বহু লোকের সঙ্গে দেখা করেছে, যদি আসাদের নামে একটা রেশন কার্ড বার করা হয়। পরিচয়পত্রের জোরে সে তাহলে ইন্ডিয়ায় থেকে যেতে পারবে। কিন্তু তারা খুবই তুচ্ছ, পোকামাকড়েরও অধম। কেউ রজ্জিবুলদের কথায় কান দেয়নি। উলটে তাদের সন্দেহ, রেশন কার্ডের জন্য যখন এত ধরাধরি করছে নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো গলদ আছে। তারা রজ্জিবুলদের রাস্তার কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে।

দিনতিনেক পর থানায় যাদের ধরে আনা হযেছিল, তাদের ট্রেনে তুলে পুলিশের একটা দল পশ্চিম বর্ডারে নিয়ে আসে। বর্ডার পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'এরা ঘুসপেঠিয়া, ইন্ডিয়ায় বেআইনি ঢুকে পড়েছে। ওদের বাংলাদেশে ঢুকিযে দিন।'

কোথায় কত দূরে পড়ে রইল মুম্বাই শহর! আসাদ যেন আচমকা পরিচিত পৃথিবী থেকে অন্য এক অজানা গ্রহে চলে এসেছে। বার বার একজোড়া লাজুক কালো চোখ তার সামনে ভেসে উঠছিল। নাঃ, জহুরার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হবে না। বুকের ভেতরটা তার চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

বর্ডার-পুলিশ আসাদদের সীমানা পার করে ওধারে ঠেলে দেয়, কিন্তু এদিকেও সীমান্তবাহিনী রয়েছে। তার এতগুলো মানুষকে ঢুকতে দেখে জেরা শুরু করে। তার সঙ্গীরা কে কী বলছে, কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না আসাদ। একজন অফিসারের প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, মা-বাবার মুখে শুনেছে, তাদের আদি বাড়ি ছিল মুন্সিগঞ্জের কাছাকছি একটা গ্রামে।

অফিসার জিজ্ঞেস করে, 'গ্রামের নাম কী?'

আসাদ বলে, 'মনে নেই। খুব ছোটবেলায় গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।'

'গ্রামে তোমার কে কে আছে?'

'জানি না সাব।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন করে অফিসার। কিন্তু কোনোটারই সঠিক, সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না। তাছাড়া যে বাংলা ভাষাটা আসাদ বলছে তাতে যথেষ্ট গোলমাল। তার কথায় হিন্দি, উর্দু আর মারাঠি মেশানো অদ্ভুত একটা টান।

অফিসার তার সহকর্মীদের সঙ্গে চাপা গলায় কী পরামর্শ করে আসাদকে বলে, 'তুমি এদেশের লোক নও। ইন্ডিযায চলে যাও।'

'কিন্তু সাব—'

আসাদের কোনো কথাই শোনা হয় না। তাকে এবং তার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের ইন্ডিয়ার দিকে ঠেলে দেওয়া হয। সে জানে, আবার তাকে ওধার থেকে এধারে পাঠানো হবে।

তার যখন জন্ম হয়, সে ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। তারপর তিরিশ বছর ধরে ভারতীয। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে গেছে। এতকাল বাদে দেখা যাচ্ছে সে ভারতীয়ও নয়, বাংলাদেশিও না। তার কোনো দেশ নেই।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বর্ডারের দিকে এগোতে থাকে আসাদ। □

জীবিত

অ ভি জি ৎ ত র ফ দা র

দাঁড়া তো দেখি! উঠে দাঁড়া একবার।

দাঁড়ালেন সত্যব্রত। বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

—এখানে নয়, ওই রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়া।

বিকেলের রোদ ঘাসের ওপর শুয়ে। এগিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। ছায়া পড়ল লম্বা। পৌঁছে গেল অনাদি-সুবোধ-শক্তি অবধি।

অনাদি একগাল হাসল—আয়। এত ভালো ছায়া পড়েছে তোর, এত ঘন আর নিকষ কালো, তুই না বেঁচে পারিস?

সত্যব্রত কিছুই বুঝতে পারলেন না।

সুবোধ বলল, বেশ, ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে যাক। যা, পুকুরে গিয়ে পা-দুটো ডুবিয়ে আয়।

শীতের বিকেল। একটু কোল্ড অ্যালার্জি আছে সত্যব্রতর। জলে পা ভিজিয়ে শেষকালে হেঁচে মরবেন নাকি! ইতস্তত করছেন, শক্তি ভরসা দিল। যা না, অত চিন্তার কী আছে?

জুতো খুললেন। মোজাও। তারপর গুটিগুটি খেলার মাঠের পেছনে বাঁধানো ঘাটে গিয়ে দু-পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে এলেন।

পেছন পেছন তিনজনেই এসেছিল। ভিজে পায়ে শানবাঁধানো ঘাটে উঠে আসতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, হাঁট, হেঁটে দেখা একবার।

গুনে গুনে চার স্টেপ হাঁটলেন সত্যব্রত। ভিজে পা থেকে জল-ছাপ পড়ল সিমেন্টে। শার্লক হোম্‌স-এর মতো সেই দাগের তিন ইঞ্চি দূরত্বে চোখ নিয়ে গেল সুবোধ। মন দিয়ে কী দেখল, তারপর উঠে দাঁড়াল, মুখে বিজয়ীর হাসি।

—পাস।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন সত্যব্রত। ছত্রিশ বছরের শিক্ষকজীবনে বহু পরীক্ষা নিয়েছেন। বন্ধুদের কাছে এইভাবে পরীক্ষা দিতে হবে কখনও ভাবেননি।

—বুঝতে পারলি না তো? দুটো পরীক্ষাতেই পাস করে গেলি, উইথ ফ্লাইং কালারস।

—কীসের পরীক্ষা?

অনাদি বলল, প্রথম পরীক্ষা, ছায়া পড়ে কি না। যারা বেঁচে নেই তারা নিজেরাই তো ছায়া, তাদের আবার ছায়া পড়বে কী করে?

—আর পায়ের ছাপ, সুবোধ বলল, ওটাই ফাইনাল টেস্ট। ভূতেদের পায়ের ছাপ উল্টো উল্টো। তোর পায়ের ছাপ যে কোনও জীবিত মানুষের মতো, সোজা।

অতএব, তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল, আমরা তিনজন বিচারক, সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করছি, সত্যব্রত রায়, সন অব লেট পুণ্যব্রত রায় — জীবিত।

বলেই হাসতে লাগল তিন বন্ধু।

পিত্তি জ্বলে গেল সত্যব্রতর। এই ব্যাপার। এতক্ষণ মশকরা হচ্ছিল? রেগেমেগে বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন।

দেরিই হয়ে গেল আজ ফিরতে। শক্তি আর সুবোধ উল্টোদিকে থাকে, মাঠ থেকেই রাস্তা আলাদা হয়েছিল। অনাদি এল বটতলা অবধি। তারপর থেকে একা। কৃষ্ণপক্ষ। সূর্য ডুবে যেতেই অন্ধকার নেমে এল ঝুপ করে। ঠান্ডাটাও যেন বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে এল। ঝিঁঝির ডাক। রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরবেন এবার, টর্চটা জ্বেলে নিলেন।

রিটায়ার করে ক-দিন মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। হঠাৎ লোডশেডিং হলে যেমন হয়। সব অন্ধকার। চোখ সয়ে গেলে একটু একটু করে সব নজরে আসে। ক'মাসে রিটায়ার্ড লাইফটাও মানিযে নিযেছেন। শক্তি-সুবোধরা আছে; বত্রিশ বছর জীবনেব সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাযা; সমাপ্তি, ছোটো মেয়ে, ফাইনাল ইযার এম এ, লম্বা ছুটিতে হোস্টেল থেকে বাড়ি আসে; আর আছে ছাত্র-ছাত্রীবা। টিউশনি করেননি, বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওদের জন্যে দরজা খোলাই ছিল। সে দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন হয়নি।

প্রেশারটা সামান্য বেড়েছে, সকালে একখানা বড়ি গেলায মাযা জোর করে। তাছাড়া সবকিছুই একদম ঠিকঠাক। তিন মাইল একদমে যেতে পারেন, আধসের মাংস একপাতে খেযেও ঢেঁকুর তুলতে হয় না, কাগজ পড়তে চশমা একখানা লাগে বটে, কিন্তু এই যে ভরসন্ধেয় অন্ধকারে বাড়ি ফিরছেন, কোথাও ঠোকা-টোকা খেতে হয় না তো! দাঁত একখানাই নড়ছে কষের, একষট্টিতে যে-কটা চুল পাকার কথা তার চেয়ে একটাও বেশি পাকেনি। সপ্তাহে অন্তত এক দিন রাত্তিরে মায়াকে জ্বালাতন করেন, শরীরের অন্য দিকটার স্বাস্থ্যও অটুট।

অবশ্য ডিপ্রেশন সামান্য হয়েছিল। মনীশ-রতীশ, দুই সন্তানই কৃতী, মনীশ পুনে, রতীশ ফিলাডেলফিয়া। দুজনেই নিয়মিত টাকা পাঠায়। সত্যব্রত নেবেন না, তাই টাকা আসে মায়ার নামে। কিন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ, আর ছেলেদের পাঠানো টাকা, দুয়ের তফাত বুঝতে বয়েসটা একষট্টি বছর পার করতে হয় না। তাছাড়া সমাপ্তির হোস্টেল — বইপত্র-পরীক্ষার ফি। বেশি বয়সের সন্তান, সাধ করে পৃথিবীতে যখন এনেছেন, দায়টা তাঁরই ওপর বর্তায়।

সমরেশ, এইট্টি টু-এর ব্যাচ, এখন ডি আই অফিসে আছে, সত্যব্রত জানতেন না। দেখতে পেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে এসে প্রণাম করল। তারপর সত্যব্রতকে আর মাথা ঘামাতে হয়নি। বাড়িতে যেদিন চিঠিটা পৌঁছুল, বন্ধুরা দেখে অবাক,—বলিস কি? এক বছর পুরোতে না পুরোতেই পেনশন? তুই কি গিনেস বুকে নাম তুলবি নাকি রে সত্য?

মনটা হালকা হয়ে গিয়েছিল, ফুরফুরে। চিন্তামুক্তি। ন্যাকড়া বাঁধান একটা কাগজ। লাইফ সার্টিফিকেট। সত্যব্রত রায়, রিটায়ার্ড হেডমাস্টার নারাণপুর হাইস্কুল, তিনি যে এখনও জীবিত, তার প্রমাণ চাই।

সবাই অবশ্য অভয় দিয়েছে। চিন্তার কিছু নেই, নিছকই নিয়মরক্ষা। ট্রেজারি অফিসে একবার কষ্ট করে হাজিরা দিতে হবে। অফিসার, জিজ্ঞেস করতে হয় তাই, জানতে চাইবেন, আপনিই সত্যব্রত রায়? একবার ঘাড় নেড়ে দিলেই ব্যস, এক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। সরকারি পয়সা গড়গড় করে আসতে থাকবে।

চেনা-জানার মধ্যে অনন্ত গোঁসাই, হরিমতী ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই, গিয়ে সইসাবুদ করে টাকা পেতেও শুরু করেছে। সবই ঠিক আছে, তবু কেমন ভয় ভয় করছে সত্যব্রতর। ইন্টারভিউ? এই বয়সে? চিরটাকাল পরীক্ষা নিয়েই এসেছেন। পরীক্ষা দিতে গিয়ে বেফাঁস যদি কিছু বলে ফেলেন। ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তালু ঘেমে জিভ শুকিয়ে একসা।

ভাবনাটা নিজের ভেতর চেপে রেখেছিলেন। আজ আর থাকতে না পেরে বিকেলের আড্ডায় বন্ধুদের বলে ফেলেছিলেন। ওরা কি আজকের বন্ধু? বলে হালকা লেগেছিল, ভেবেছিলেন বন্ধুরা অভয় দেবে। তা দিয়েছে। কিন্তু ওই যে পরীক্ষা নেওয়া! প্রথমে সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন, যা বলেছে করে গেছেন। শেষকালে হাসি দেখেই বুঝতে পেরেছেন। সব মশকরা।

তবু এখন, এই একলা হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, চিন্তার ভারটা সত্যিই অনেকখানি নেমে গেছে মাথা থেকে।

বাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। চলন্ত গাড়িতে ঘুমের এই দোষ, গাড়ি থামল, ঘুমও গেল চটকে। বাইরে তাকিয়েই মন ভালো হয়ে গেল। কচি ডাবের মতো একটা সকাল এক্ষুণি কে যেন দায়ের এককোপে কেটে জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে। লোভে পড়ে গেলেন। গুটিগুটি বাস থেকে নেমে রোদে গিয়ে দাঁড়াতেই শীতটাও যেন পেঁয়াজের কোয়ার মতো গা থেকে খসে পড়তে লাগল।

আসলে ওটা শীত ছিল না, ভয়, এখন বুঝতে পারছেন। রাত্তিরে কতবার যে উঠেছেন, জল খেয়েছেন, বাথরুমে গেছেন, আর ঘড়ি দেখেছেন। এপাশ-ওপাশ করতে করতে ভেবে গেছেন, কী জিজ্ঞেস করবে? কেমন মানুষ হবে? যদি অপমানিত বোধ করেন? যদি গুলিয়ে ফেলেন?

এই করতে করতেই রাত পুরিয়ে ভোর। গরম জলে স্নান করে ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর সোয়েটার-শাল জড়িয়েও শীতটা যেন কাটছিল না। বেরুনোর সময় মায়া মাফলারটাও দিয়ে দিল জোর করে; বলল, বাসের জানলা তুলে বোসো কান-গলা ঢেকে। বাইরে পা দিয়ে পেছনে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মায়ার দিকে চেয়ে সত্যব্রতর ইচ্ছা তীব্র হল, ফিরে যান, কাজ নেই গিয়ে।

বাসে উঠে ঢেকে-ঢুকে বসে সত্যব্রত কিন্তু সাহস পেয়ে গেলেন। হঠাৎই মনে হল, কী এমন জলে পড়ে আছেন যে ভয় পেতে হবে? উল্টোপাল্টা জিজ্ঞেস করলে সটান উঠে চলে আসবেন, রইল তোমাদের পেনশন। রাতের জাগরণ, বাসের দুলুনি, আর

নিয়ে পাওয়া সাহস, তিনে মিলে একসময় সত্যব্রতর চোখের পাতা বন্ধ করে দিল। বাস থামতে ঘুম ভেঙে গেল।

চা-ফুলুরি-বেগুনি-আলুর চপ, ফুলকপি-সজনে ডাঁটা মুলো, এবং ছড়ানো-ছিটানো মানুষ। জায়গার নাম বারো মাইল। এখান থেকে সদর বারো মাইল, তাই সহজ নাম। গঞ্জ এলাকা, শনি-মঙ্গল হাট, কাছেই মালক্ষ্মী হ্যাচারি, কলকাতায় মাল চালান যায়।

ড্রাইভারের চা-খাওয়া শেষ। তার অর্থ বাস ছাড়ার সময় হয়েছে। কন্ডাক্টর হেঁকে প্যাসেঞ্জার তুলছে, সত্যব্রত ভিড় হবার আগেই বাসে উঠে পড়লেন। ভেতরে ঢুকেই চোখ আটকে গেল।

—কী ভাই আপনারা নামলেন না? বলেই ফেললেন শেষ পর্যন্ত।

উস্কোখুস্কো চুল, না ঘুমনো লালচে চোখ, তিন দিনের খরখরে দাড়ি, তিরিশের আশপাশে দুজনকে এদিককার মনে হয় না। তবু বাইরে অমন চমৎকার রোদ্দুর, দুজনে যেন পাহারা দেবার জন্যে বাস আগলে বসে রইল। গ্রামের মানুষ সত্যব্রত, না বলে পারলেন না।

আধখানা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দুজনে তাকিয়ে রইল সত্যব্রতর দিকে, জবাব দিল না। অপ্রস্তুত হয়ে নিজের সিট খুঁজে বসে পড়লেন সত্যব্রত।

ঘুম ভেঙে গেছে সবার। বাস চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাসের বাঁদিকে মেয়েরা বসেছে যে পাশটায়, জানলা গলে রোদ আসছে। হাওয়াতে শীতের কামড় এখন অনেক কম, জানলার পাল্লা নামিয়ে দিলেন সত্যব্রত।

এখান থেকে রাস্তার দুপাশে জঙ্গল। শাল-শিশু-অশ্বত্থ-জারুল। ক্যানেলের দুধারে সামাজিক বনসৃজন—বাবলা, ইউক্যালিপটাস। কোনও কোনও জায়গায় ঘন গাছের মাথা টপকে রোদ পৌঁছচ্ছে না, রাস্তা ছায়ায় ঢাকা।

আবার ভাবনাটা ফিরে আসছিল। সেই এক ভাবনা। না এলেই ভালো হত। কী দরকার ছিল শুধু শুধু— ?

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, বাসটা জোরে ব্রেক কষতেই ঠকাশ করে মাথাটা ঠুকে গেল সামনের সিটে। অনেকে ছিটকে পড়েছে সিট থেকে। বাস দাঁড়িয়ে গেছে। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ বকতে শুরু করেছে ড্রাইভারকে। ড্রাইভার কোনও জবাব দিচ্ছে না।

হঠাৎ সবার কথা বন্ধ হয়ে গেল। সামনের গেট খুলে উঠে এসেছে চারজন। মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা, হাতে যে জিনিসটা ধরা, ছবিতে বহুবার দেখেছেন, চিনতে অসুবিধা হল না।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাসের ভেতর বসে থাকা সেই দুজনের একজন উঠে দাঁড়াল। অন্যজন লুকোতে গেল সিটের আড়ালে। ছুটে এল ওরা। কপালে নল ঠেকিয়ে বলল, ঝামেলা বাড়াস না, নেমে আয়। তারপর ধাক্কা দিতে দিতে দুজনকে নামিয়ে নিয়ে গেল।

পাশ থেকে একজন ফিসফিস করল, মোটরবাইক আড়াআড়ি দাঁড় করানো রাস্তায়। ততক্ষণে ছেলে দুটোকে রাস্তার ধারে এনে ফেলেছে ওরা। বাসের যেদিকে

সত্যব্রতরা বসে আছেন সেই দিকে, কয়েক হাত দূরেই ঘটে যাচ্ছে সমস্ত। ঘিরে ফেলেছে ওদের। রাস্তার ধার থেকে জঙ্গল গড়িয়ে গেছে পশ্চিমে। তারই মধ্যে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুজনকে। ছটফট করছে, হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইছে ওরা। শক্ত করে ধরে আছে পিছন থেকে। একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন বলতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের কেউ ছুটে গিয়ে লাথি কষাল পেটে। বসে পড়ল ছেলেটা, বমি করতে লাগল। সেই সুযোগে হাত ছাড়িয়ে পালাতে গেল অন্যজন।

ওরা আর দেরি করল না।

ছুটছিল যে, প্রথম গুলিটা তার পিঠে লাগল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, উঠতে গেল, আবার গুলি। ততক্ষণে অন্যজনের কপালে নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিয়েছে আর একজন। বড়ো বড়ো গাছের নীচে অন্ধকার, ঝোপঝাড়ের ভেতরে কোথাও পড়ে আছে দুটো শরীর, দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চিত হবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে আরও কয়েকটা গুলি ভরে দিল ওরা। তারপর হাত মুছতে মুছতে রাস্তায় উঠে দাঁড় করানো মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে উধাও হয়ে গেল দূরে।

পাঁচ মিনিট কি আরও কম সময়। একটাও গাড়ি এর মধ্যে যায়নি সামনে থেকে পিছনে বা উল্টোদিকে। এই রাস্তায় এই সময় যান চলাচল এমনিই কম। রাস্তা ফাঁকা। পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে রাস্তায়, পাখি ডাকছে। আকাশ তেমনি নীল, বয়ে আসছে ঝিরঝিরে হাওয়া।

বাসের ভেতর সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে বসেছিল। মোটর সাইকেলের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই সকলে ধড়মড় করে উঠে বসল। একজন তেড়ে গেল ড্রাইভারের দিকে—দেখছ কি হাবার মতো? রাস্তা ফাঁকা, জলদি চালাও।

বাসটাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ গর্জে উঠল, তারপর ছুটতে শুরু করল পাগলের মতো! চলে যেতে যেতে অন্য সকলের সঙ্গে সত্যব্রতও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, গাছের নীচে অন্ধকার, কোথাও এতটুকু আলোড়ন নেই, কোনও আর্তনাদও ভেসে আসছে না। পড়ে আছে দুটো অচেনা মানুষ, মানুষ নয় এখন লাশ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক, যে রক্তে এখনও জীবনের উত্তাপ। শেষটুকু দেখা যাচ্ছে না, অথচ সকলেই দেখতে পাচ্ছিল পরিষ্কার।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাস যখন শহরে ঢুকল, তখনও সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক। একটা পাক খেয়ে বাসটা স্ট্যান্ডে ঢুকতেই নামবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যেন এখনও তাড়া করছে রুমালে মুখ ঢাকা ঘাতক। যেন এখনই না নেমে গেলে প্রত্যেকের ঘটে যাবে ওইরকমই ভয়ংকর কিছু। ত্রস্ত একদল মানুষ এতটুকু সময় নষ্ট না করে বাস থেকে নেমে দ্রুত ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। বসে রইলেন সত্যব্রত, একা।

বাস থামিয়েই নেমে গেছে ড্রাইভার। কন্ডাক্টর টিকিট, কাঁধের ব্যাগ রাখবার জন্যে বাসের কেবিনে ঢুকেছিল, সত্যব্রতকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল—বাস আর যাবে না, নেমে পড়ুন।

সত্যব্রত যেন ঘোর থেকে উঠলেন—এই যাই, বলে উঠে দাঁড়াতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন।

—শরীর খারাপ লাগছে? ধরব? ছেলেটা এগিয়ে এল।

—না না, ঠিক আছে, বলে চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালেন সত্যব্রত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পায়ে সামান্য জোর এল, আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগোলেন। বাস থেকে নেমে মনে হল আর পারবেন না, দুখানা পায়ে যেন পাথর বাঁধা, এখনই বসা দরকার। সামনেই মিষ্টির দোকান, কয়েকটা চেয়ার পাতা, তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন।

বসলেন, কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। বেশ গরম লাগছে। একে একে মাফলার, শাল, সোয়েটার সব খুলে পাশে রাখলেন। তবু গরমটা যেন কাটছে না। ঘাম হচ্ছে অল্প অল্প, ফ্যানটা চালিয়ে দিতে বলবেন?

হাতের ইশারায় টেবিল মুছছিল যে ছেলেটা তাকে ডাকলেন। এক গ্লাস জল দিতে বললেন।

জল নিয়ে অন্য আর একজন এল, মাঝবয়সি। টেবিলে গ্লাস নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, বলুন, স্যার, কী দেব?

মাথা তুললেন সত্যব্রত। ঠিকই তো! বসতে জায়গা দিয়েছে, জল চাইতে জল এনে দিয়েছে, এখন কিছু না খেলেই যে নয়!

পেটটা বোঝাই. যেন গলার কাছে আটকে আছে সব; ভেবেচিন্তে একভাঁড় দই দিতে বললেন। তারপর গলা তুলে বললেন, ফ্রিজের নয়, বাইরে থেকে দেবেন। বাইরে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল।

আচ্ছা, ছেলে দুটো কি বেঁচে ছিল তখনও?

হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেল সত্যব্রতর।

এমনও তো হতে পারে, শরীরে প্রাণ ছিল। বাসে তুলে তাড়াতাড়ি শহরে এনে ফেললে, তখন তখনই হাসপাতালে ভর্তি করলে, বেঁচেও যেতে পারত ওরা।

অসম্ভব! নিজেকে বোঝান সত্যব্রত। অত কাছ থেকে অতগুলো গুলি, কেউ বাঁচে? তার ওপর বারো মাইল রাস্তা, কম করেও আধঘণ্টা, শরীরের সব রক্ত রাস্তাতেই ঝরে যেত। আর হাসপাতালে? রক্ত জোগাড়, ভর্তি, অপারেশন কম করেও তিন-চার ঘণ্টার ধাক্কা; না, কোনওভাবেই ওদের বাঁচানো সম্ভব ছিল না।

দই দিয়ে গেল লোকটা। বলল ফ্রিজের নয়, তবু কী ঠান্ডা! থাক গরম হোক, একটু একটু করে গলিয়ে গলিয়ে খাবেন।

দই থেকে চোখ সরাতেই ছেলে দুটো ফিরে এল। হ্যাঁ, ওরা মরতই। তুলে আনলেও মরত। নিজেরা তো মরতই, বিপদে ফেলে দিত বাসের সমস্ত যাত্রীকে। থানা-পুলিশ-জিজ্ঞাসাবাদ। দিনের সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যেত। অতএব সেইমুহূর্তে যা করা উচিত ছিল তা-ই করা হয়েছে, ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে চলে আসা। এতে কোনও অন্যায় নেই।

কিন্তু তার আগে? যখন প্রাণ ছিল ছেলে দুটোর শরীরে? শরীর ঝাঁঝরা করে গুলি ঢোকেনি? কিংবা আরও আগে, বাস থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যখন, সকলের চোখের সামনে?

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল আবার। ভাঁড়টা টেনে নিয়ে খেতে গিয়েও

আবার সরিয়ে রাখলেন।

ছেলে দুটো কি কিছু আন্দাজ করেছিল? বাস থেকে একবারও নামেনি, কথাও বলেনি কারও সঙ্গে। বসেছিল চুপচাপ, কেমন যেন সন্ত্রস্ত। ওরা কারা? কোথা থেকে এসেছিল?

—খাচ্ছেন না স্যার? দই খারাপ। কিছু পড়েছে? পাল্টে দেব?

মালিক নিজেই উঠে এসেছে, ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছে, গলায় আত্মীয়তা। বিব্রত হলেন সত্যব্রত। বললেন না, না, ঠিক আছে, চমৎকার দই। আর একগ্লাস জল দিতে বলবেন ভাই?

জল নামিয়ে মালিক আবার কাউন্টারে গিয়ে বসল, ঢকঢক করে গ্লাসের জল সবটুকু ভেতরে ঢেলে শান্তি হল। কাঠের চামচে সামান্য দই ভেঙে মুখে দিলেন।

ঠিক কতজন ছিল ওরা? চারজন ভেতরে এসেছিল। বাইরে দাঁড়িয়েছিল আরও জনা তিনেক। সব মিলিয়ে সাত-আটজনের বেশি হবে না। আর ভেতরে কতজন ছিলেন তাঁরা?

দইটা কি টক? গলার কাছে টকটক জল উঠে এল খানিকটা। পেটের ওপর দিকটা মুচড়ে উঠল।

জনা চল্লিশ প্যাসেঞ্জার, ড্রাইভার, হেলপার, কনডাক্টর, ড্রাইভারের কেবিনেও দু-তিনজন বসেছিল নিশ্চয়। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশজন। পারা যেত না? পঞ্চাশজন তাড়া করলে পারত ওরা? ওই তো রোগা হাড়জিরজিরে চেহারা। সত্যব্রত যে সত্যব্রত, এই একষট্টি বছরেও যে কোনও একটাকে জাপটে ধরলে সাধ্য ছিল ছাড়িয়ে পালায়?

গলার টক জলটা এক চামচ দইয়ে নামিযে দিতে দিতে জোরগলায় সত্যব্রত নিজেকে বললেন, কোনও মতেই সম্ভব ছিল না। সাতজন বনাম পঞ্চাশজন। এই হিসাবটাই ভুল। শুধু সাতজন নয়, সশস্ত্র সাতজন। ওদের শক্তি যন্ত্রে। এক-একটা অস্ত্র পাঁচ-ছজনের মহড়া নিয়ে নিত। কতজন মারা গেছে?—দু'জন। রুখে দাঁড়াতে গেলে বিশটা লাশ পড়ে থাকত ওইখানে। বাসের প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার এই সহজ সত্যটা বুঝতে পেরেছিল। কেউ কোনও প্রতিবাদ করেনি। কেউ ঝুঁকি নিতে যায়নি। অপেক্ষা করেছে। সমস্ত ঘটে গেলে যত দ্রুত সম্ভব জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে। এতে কোনও অন্যায় নেই।

বমিটা উঠেই এল শেষ পর্যন্ত। ছুটে বাইরে গেলেন। লাগোয়া কাঁচা নর্দমা, ধারে বসে ওয়াক ওয়াক করে খানিকটা ছানা-কাটা জল তুললেন। মালিক ছুটে এল। পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, শরীর খারাপ লাগছে? শোবেন একটু।

সত্যব্রত কথা বলতে পারছিলেন না। দরদর করে ঘাম হচ্ছিল। শালটা ভেতরেই খুলে এসেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে জামা-গেঞ্জি সব খুলে ফেললেই ভালো হয়।

মালিক হাঁকডাক করে কয়েকটা টেবিল জড়ো করে ফেলল। ধরাধরি করে টেবিলে শোয়ানো হল তাঁকে। হাত-পাখা নিয়ে মাথায় হাওয়া করতে এল একজন। মালিক পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কোনও চিন্তা নেই। পেট গরম হয়েছিল, সব বেরিয়ে

গেছে। এবার দেহটা সুস্থির হবে। একটু জিরিয়ে নিন, ঘোলের শরবত করে রাখছি, খেলেই শরীর ঠান্ডা হবে।

ঘোরের মধ্যেও, শরীরময় এক অস্থির দাপাদাপি সামলাতে সামলাতে এক অদ্ভুত চিন্তা আচ্ছন্ন করে সত্যব্রতকে। মিষ্টির দোকানের মালিকের দিকে তাকান। কালো সাদামাঠা চেহারা, কাঁচাপাকা গোঁফ, মধ্যবয়সি মানুষটার চওড়া কপাল গিয়ে শেষ হয়েছে বিরলকেশ বেঢপ একটা মাথায়। কিন্তু কপালের নীচেই রয়েছে একজোড়া চোখ, সেই চোখে অপরিচিত একটা মানুষের জন্য টলটল করছে সহানুভূতি। সত্যব্রতর মনে হয় হঠাৎই, এই লোকটা যদি বাসে তাদের সহযাত্রী হত, সেও কি একই রকম ব্যবহার করত? প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া আর পঞ্চাশজনের মতো পালিয়ে আসত? নাকি বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলত, খবরদার, আমাকে না মেরে কেউ ওদের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

কী যেন হতে থাকে ভেতরে। ছবির মতো দেখতে পান, ক্লাসে পড়াচ্ছেন সত্যব্রত, সামনে চল্লিশটা নিষ্পাপ শিশু। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে সবাই। সত্যব্রত বলে চলেছেন, একটি জীবকোষ-প্রোটোপ্লাজম—তার গমন-চলন-বংশবৃদ্ধিই শুধু জীবনের লক্ষণ হতে পারে না। জীবনের লক্ষণ প্রতিবাদ। জীবিত প্রাণী মাত্রেই প্রতিবাদ করে। আর মানুষই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রাণী।

এক দিন নয়, বছরের পর বছর একই কথা আউড়ে গেছেন সত্যব্রত। মাথা নামিয়ে শুনে গেছে ছাত্রছাত্রীরা, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নুয়ে পড়েছে।

সত্যব্রতও কি পারতেন না ছেলে দুটোকে আড়াল করে উঠে দাঁড়াতে? বলতে, আগে আমাকে মারো। এমন তো হতেও পারত, তাঁকে দেখেই বাসের অন্য সমস্ত যাত্রীও উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা সমবেত গর্জন। ভয় পেয়ে যাচ্ছে ওরা। পিছিয়ে যাচ্ছে। নেমে যাচ্ছে ওরা। নেমে যাচ্ছে বাস থেকে। বাইকের গর্জন—মিলিয়ে গেল দূরে। কাজ সমাপ্ত রেখেই ফিরে গেল ওরা।

আর যদি তা না-ই হত? সকলে যদি বসেই থাকত স্থাণু হয়ে, কী এমন ইতরবিশেষ হত? একটা বেশি গুলি খরচ হত। ছেলে দুটোর পাশে তিনিও না হয় শুয়ে থাকতেন ঘাসের বিছানায়। একষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু, কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হত তাতে?

সত্যব্রত পারেননি। বদ্ধ ঘরে বসে বাণী বিতরণ করেছেন। কিন্তু প্রয়োজন যখন হয়েছে, নিজের প্রাণ খাঁচায় আগলে পালিয়ে গেছেন সত্যব্রত, আর সেই জন্যেই দু-দুটো তাজা প্রাণকে উপড়ে ফেলে সবার সামনে দিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে গেছে ঘাতকের দল।

এবং বেঁচে আছেন সত্যব্রত এখনও।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পড়লেন সত্যব্রত। ওপরে তাকালেন। অতখানি? অতগুলো সিঁড়ি? পারবেন?

হাঁটু দুটো নড়বড় করছে, বুকের ভেতরে হাতুড়ির আওয়াজ, বমি ভাবটা এখনও যায়নি। ফিরে যাবেন?

এত দূর এসে? এত কিছুর পরেও? ঘড়ি দেখলেন. সাড়ে এগারোটা। বেলা হয়ে যাচ্ছে। এরপর অফিসার বেরিয়ে গেলে আর ধরা যাবে না। দিনটাই নষ্ট।

কোনওরকমে রেলিং ধরে ধরে দোতলায় উঠলেন, দেয়াল ধরে খানিকক্ষণ দম নিলেন। সামনের বেঞ্চিতে বসে একজন বিড়ি টানছিল। তাঁকে দেখে দয়া হল বোধহয়, সরে গিয়ে জায়গা দিল। পাশে বসে খানিকক্ষণ বাদে দম ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন। মুখ থেকে বিড়ি নামিয়ে জবাব দিল, ওই যে বারান্দার শেষে সবুজ পর্দা, ওই ঘর। যান না, যান। স্যার লোক ভালো, কিচ্ছু বলবে না।

ভরসা পেয়ে পায়ে জোর এল খানিক। গুটিগুটি এগোলেন। পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন। প্যান্টশার্ট, হাতকাটা সোয়েটার, চশমা, ফরসা গালে সবুজ আভা, চল্লিশের কোঠায় মানুষটার চোখ হাতের ফাইলে। এক পা ভেতরে ঢুকলেন, পায়ের আওয়াজে চোখ উঠল, দৃষ্টি স্নিগ্ধ।

সত্যব্রত কথা পাড়লেন—একটু দরকারে এসেছিলাম।

—বলুন।

—একটা লাইফ সার্টিফিকেট....পেনশনের ব্যাপারে।

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলেন অফিসার, পড়তে লাগলেন। সত্যব্রতও, যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, বসে পড়লেন সামনের চেয়ারে।

পড়তে কি বেশি সময় নিচ্ছেন অফিসার? ঘরটায় একখানাও জানলা নেই কেন? ফ্যানটাও চলছে না। কষ্টটা আবার ফিরে আসছে শরীরে।

পড়া হয়ে গেছে। অফিসার সোজা তাকালেন সত্যব্রতর দিকে—আপনার?

যেন জবাব দিতেও ভুলে গেছেন, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন সত্যব্রত।

অফিসার একটু বিরক্তই হলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই তো সত্যব্রত রায়, রিটায়ার্ড হেডমাস্টার নারাণপুর হাইস্কুল? আপনি বেঁচে আছেন, সেটারই তো কাগজ এটা?

প্রশ্নটা কি অফিসারই করেছিলেন?

দীর্ঘশ্বাসের মতো, ঝোড়ো হাওয়ার মতো, একটাই প্রশ্ন যেন ঘুরতে ঘুরতে পাক খেতে খেতে সত্যব্রতর ভেতরে একটার পর একটা দরজা খুলতে খুলতে আর বন্ধ করতে করতে বয়ে যেতে থাকল।

জবাব দিতে গেলেন, স্বর ফুটল না। তৃষ্ণা। হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটা ধরতে গেলেন, হাত পৌঁছুল না। কাত হয়ে চেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন সত্যব্রত।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল অফিসের সমস্ত মানুষ। নিস্পন্দ সত্যব্রতর দিকে তাকিয়ে সকলেই নীরবতা পালন করছিল।

স্তব্ধতা ভাঙলেন অফিসার নিজেই।

—আশ্চর্য মানুষের জীবন। ভদ্রলোক এলেন, বসলেন, কথা বললেন। পেনশনের কাগজ এগিয়ে দিলেন। .....জলজ্যান্ত একটা মানুষ!.....কে বলবে?.....একটু আগেও বেঁচে ছিল, আর এখন দেখো....। □

জন্মদিন

ম হা শ্বে তা দে বী

দীপ্ত অলিভ পায়নি জেনে অদিতি ভীষণ রেগে গিয়েছিল। অঙ্কুরের জন্মদিন বলে কথা। দীপ্ত তার একমাত্র ছেলের দশ বছরের জন্মদিনে অলিভ আনতে পারল না, অদিতি বেইজ্জৎ হয়ে গেল যাকে বলে।

—কিছু করা যাবে না, সর্বনাশ হয়ে গেল।

দীপ্ত বলল, সর্বনাশ?

—বাকি থাকল কী?

—বাজারে জলপাই কোথায়?

—সে আমি জানি না।

—জলপাই দিয়ে তো চাটনি বানাতে বাপু। আমসত্ত আর আঙুর, নয় আমসত্ত আর খেজুর....

অদিতির মুখ আপনারা দেখেননি, ওর চুল দেখেছেন দূরদর্শনে। হ্যাঁ, একটি তত-বিখ্যাত নয় শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে দেখেছেন ওর পিঠ ছাপানো চুল, দেখেছেন ওর চুলে কত রকমের খোঁপা। মুখ ও দেখায় না, কেননা, মুখ তত সুবিধের নয়।

সেই চুল ঝাপটে অদিতি ঝামরে উঠল।

—চাটনি আর চাটনি। জানো তো, শুধু চাটনি আর পায়েস আর মাছের কালিয়া।

—না অদিতি। মা অত কিছু পারতেন না, তবে জন্মদিনে ছেলেমেয়েদের একটু পায়েস করে দিতেন।

—জন্মদিনই করতেন না?

—বাবা পেতেন পাঁচশো আশি, আমরা ছিলাম পাঁচজন, ঘটা করে জন্মদিন কে করবে?

—তোমার মুখে এককথা।

সত্যি, দীপ্তর লজ্জাও নেই। বেশ তো, তোমরা গরিব ছিলে, থাকতে বাদুড়বাগানে ঠাকুরদার বাড়িতে তোমাদের ভাগে পাওয়া দুটো ঘরে, একখানা লেপে তিন ভাই শুতে। সে কথা বার বার বলার দরকার কী? মামারা পড়িয়েছিলেন বলে তিন ভাই কৃতী তো হয়েছ। বড়ো কাজও করো, ফ্ল্যাটও কিনেছ, ছেলেকে দামি স্কুলে পড়াচ্ছ, পাহাড়ে হস্টেলে রেখেছ, কী করছ না?

—ছেলেটারও কপাল, ছুটির সময়ে জন্মদিন পড়ে

—কপালখানা মন্দ কী?

—তুমি বুঝবে না, শুধু একশোটা অলিভ....

—আবার অলিভ!

অদিতি রাগে ক্ষোভে মরে গেল যেন।

—ওর বন্ধুরা তো আসবে তিনজন। আসলে ওর মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাইবোনেরা আসবে না?

—আসুক না, প্রতিবারই তো আসে।

—ওর মামি, মাসিরা, পিসিরাও তো আসবে।

—সেও তো বরাবর আসে সবাই।

—ওঃ, তোমাকে বোঝানো....

—বেশ, বসলাম চেপে। বোঝাও আমাকে।

অদিতি হিসহিসিয়ে বলল, প্রত্যেকের ছেলেমেয়ের জন্মদিনে আমরা যাই, আমরা খাই। এ নিয়ে কীরকম টেনশান চলে জানো? প্রত্যেকে প্রতি বছর নতুন নতুন মেনু করে....

—তুমিও তো জয়াদির রান্নার ক্লাস করছ। তুমিও নতুন কিছু করে দেখিয়ে দাও।

অদিতির চোখে জল নামল!

—নতুন কিছু করার নেই। চিংড়ির চিজ্‌কারি? মাংসের স্প্যানিশ পোলাও? কাঁচা আমের পায়েস? সব ওরা করে ফেলেছে। গতবার কমলালেবু দিয়ে মাংস রাঁধলাম, তোমার ছোটোবোনটি তো কম নয়, বলল, গতবার দিদি এটা করেছিল না বউদি?

দীপ্ত হতাশ হয়ে বলল, ওরা তো ভাত-রুটিও করে। ওরা করে বলে তুমি ভাত-রুটি করবে না?

—ওঃ! অলিভের পোলাও আর অলিভ-চিকেন, এ দুটোই ওরা জানে না। জয়াদির কাছ থেকে লিখে আনলাম কেন? একেবারে নতুন রেসিপি।

—রক্ষে করো অদিতি, জলপাই দিয়ে মুরগি!

—দেখো, রঙিন ফটোটা দেখো, কী দেখতে!

—একটা কথা বলব?

—কী আর বলবে!

—তবু বলি।

—কী?

—ভাত, মুগের ডাল, ভাজা, মাছ, মাংস, পায়েস—একেবারে দেশি রান্না করো তো। কেউ করে না, অবাক হয়ে যাবে, খুশি হয়ে খাবে।

—অসম্ভব।

—অত দামি রুই মাছটা দিয়ে কী করবে?

মটরশুঁটি দিয়ে রোস্ট!

—কেন, ওটা কি তাতার খুব প্রিয়?

—তাতা? তোমার ছেলে তো জানে শুধু মাংস খেতে। তাতার জন্যে ভাবছিই না।

—সে যা ভালোবাসে তাই করো।

—বড়োরা আসছে যে! আমার একটা প্রেস্টিজ নেই?

—একবছর জলপাই! আগামী বছর কী করবে?

অদিতি সগর্বে বলল, জয়াদিকে অত টাকা দিয়ে রান্না শিখছি কেন? উনি বিদেশ থেকে সবচে' নতুন বই ম্যাগাজিন আনান। ওঁর কাছে শিখে তবে না সুমতি প্যাটেল বাড়িতে রান্নার ক্লাস খুলল। চার হাজার টাকা রোজগার করছে।

দীপ্ত বলতে পারত, ছবি আঁকা, ইকেবানা, কনে সাজানো, কত ক্লাসই তো করলে। কোনটায় তুমি লেগে থেকেছ?

বলতে পারত। বললেই ঝগড়া হত। তাই ও বলল, তাতা কোথায়? তাকেই তো দেখছি না।

—ভি সি আর দেখছে।

—বেশ, বেশ! হয় ভি সি আর নয় কমিকস, নয় ইলেকট্রনিক গেমস!

—সবাই করে, ওর বন্ধুরা। করবে না কেন? ওর বাবা তো গরিব নয়, আর ওর মা ওর মন বোঝে।

—হ্যাঁ....তাই ঠিক। কোথায় চললে?

নিউ মার্কেট। অলিভ আনব।

হ্যাঁ, জলপাই এল, জয়াদির কাছে শেখা রান্নাও হল। বাড়িতে টুনি বালবের মালা, মস্ত কেক, তাতার বন্ধুদের জন্যে দামি উপহার, কিছুই বাদ থাকল না।

আর কাজ করতে গেলেই অদিতির মেজাজ থাকে তুঙ্গে। দীপ্ত জানে, দুজন কাজের লোক নিয়েও অদিতি কিছুতে সামলাতে পারে না কিছু।

তাতা বলল, মামি ইজ হলারিং।

—না রে, যুদ্ধ করছে।

—উইথ হুম?

—নিজের সঙ্গে।

বিশুর মা আর কাজলি খাবি খাচ্ছিল। গার্লিক গ্রেট করো, লেমন স্কুইজ করো, কড়াই চাপাও, এরকম সব হুকুমের বান ডাকছিল। বিশুর মা আদা বাটতে বাটতে বলল, অ কাজলি! এ যে একটা বিয়েবাড়ির যজ্ঞি।

কাজলি বলল, করবে না কেন? থাকলেই করে।

—হাত তুলে এট্টা সামগ্গিরি দেয় না কখনো।

—যাদের থাকে, তারা দেয়?

বিশুর মা অত মুখ করতে পারে না। চুপ করে গেল।

—তুমিও যেমন বোকা, মাসি।

কাজলি বোকা নয়। চাল-ডাল-মাছ-মাংস-সাবান যা পারে তাই চুরি করে। বিশুর মা সাহস পায় না।

—আমার ভয় করে যে! কিচু করিনি তাতেই বিশ্বনাথের দোর রে একা বিশু রয়েচে, পাঁচটা ছেলেমেয়ে গেল, সোয়ামি গেল, পাপ করে দেবতার মর্জ্যি লাগবে না?

কাজলি এক স্বামীর দ্বারা দু-বার পরিত্যক্তা হওয়ার পর বর্তমানে মরিয়া।

সে হি হি করে হেসে বলল, আমি দেবতার ভয় করি না। টিভি-তে সেই মেয়েটার ফিলিম দেখোনি? আমিও ওর মতো ভেগে যাব।

—লতিফের সঙ্গো?

—নিচ্চয়। ডাইভারি করে, বে করবে।

—বাড়িতে মানবে?

—বাড়ি যাচ্চে কে? আমরা তো বেলেঘাটায় থাকব।

বিশুর মা চুপ করে গেল। কাজ আজকে পাহাড়প্রমাণ। সব সেরে বাড়ি ফিরতে সন্ধে গড়াবে। বউদিকে কেমন করে কথাটা বলা যায়, কখন-বা বলবে?

—বউদিকে বলেচো মাসি?

—কাল যেমন ম্যাজাকটা নরম ছিল, তাতে বলিছিলাম, সেও বলল, 'বেশ তো।' আজ সকাল হতেই ম্যাজাক গরম, কাপগুলো ভাঙল কেমন! কে বলবে?

—নতুন কাপড়টা পরবে তো?

—থাম দিকি তুই। ঘরে বিশু রয়েছে। সকালে তো হয় নে আমার। রাতে দুটো রাঁদি, সকালে পান্তা খায়, দুপুরে মুড়ি। না গেলে ও খাবে কী? খোঁড়া ছেলে টলমল করে। 'রেঁদে নে' বলতে ভস্‌সা হয় নে...

—পা সারচে?

—ওষুদ মালিশ করচি, ঠাকুরের বেলপাতা মাদুলি করে দিইচি, লাঠি বিনে চলতে পারে নে, তবে একটু যেন ভালো।

—কোথা য্যানো মানসা করেচো?

—ওই নিমড়ে—বিশ্বনাথতলায়।

—নিয়ম পালনা পারচো?

—একনো তো পারচি।

কাজলি বলল, দ্যাকো! ভালো হলেই ভালো।

আর অদিতি চেঁচিয়ে বলল, বিশুর মা! চারটে ডিম ফাটিয়ে দাও, টোম্যাটো বেটেছ?

—এই যে দিচ্ছি!

—ইশ্‌! তিনটে বেজে গেল!

অদিতি দুপুরে খেল না। কাজলি খেয়ে উঠল সাড়ে চারটেয়। আর বিশুর মা কিছু একটা বলল, অদিতির কানে গেল না। দরজা বন্ধ করে ও শাড়ি বাছছিল।

বিশুর মা কাজলিকে বলল, বললাম তো জবাব করল না। একোন না গেলে ট্রেন পাবুনি। বেস্তর দেরি হবে মা। সব্বস্ব কাজ সেরে রেকিচি।

—যাও না তুমি। আমি বলে দোব।

বিকেলে অদিতির ছোটোবোনের কাজের লোক চলে এল। রূপা খুবই চটপটে, ঝকঝকে। বিশুর মাকে না দেখে অদিতি খেপে উঠেছিল, রূপা ওর হাতে জিন ও লাইম ধরিয়ে দিতেই রাগ নেমে গেল। রূপা ও কাজলি নতুন কাপড়ে, খোঁপায় ঝলমলে। বিশুর মা চলে গেছে বলে অদিতির স্বস্তিই হল। বিশুর মা দেখতে বিশ্রী,

এতটুকু স্মার্ট নয়, অতিথিদের সামনে দেখানোর মতো নয়।

এ বাড়ির দারোয়ানের ভাইকে দীপ্ত একটা কাজ করে দেবে। ফলে সে ছেলেটিও অদিতির কাছে ডিউটি দেয়।

সন্ধ্যাটা ওরাই সামলে দেবে।

তবু অদিতি দীপ্তকে বলল, বিশুর মা-র কোনো সেন্টিমেন্ট নেই। ছেলেটার জন্মদিন, আজ তো থাকতে পারত।

দীপ্ত বলল, কোথা থেকে যেন আসে?

—জানি না। মনে থাকে না।

—বাড়িতে বোধ হয় কেউ আছে...

—হ্যাঁ, ওর ছেলে।

—আর কেউ আছে? কত বড়ো ছেলে?

—দেখো দীপ্ত! কাজের লোকের সঙ্গে আমি কামারাদোরি করি না, কোনো খবরও রাখি না।

—যাক গে, রূপা এসে গেছে, বিজয়ও আসছে। রান্না-বান্না তো করে ফেলেছ।

—মাছ, মাংস, পোলাও! জয়াদির কেটারার আনছে রাধাবল্লভী, ডাল, মাছের ফ্রাই আর আইসক্রিম।

—তুমি তৈরি হয়ে নাও।

—হ্যাঁ। তাতার প্রেজেন্টটা?

—তখনই খোলা যাবে।

—বিশুর মা কাপড়টাও রেখে গেছে।

কাজলি মনে মনে বলল, ভিড়ে চ্যাপটা হয়ে সোনারপুর যাবে, নতুন কাপড় নিতে পারে? মুখে বলল, বউদি ফুল এসে গেছে।

—ফুল? লাভলি। অদিতি নেচে চলে গেল।

জন্মদিনটা খুব, খুব জমেছিল।

অলিভ-পোলাও আর অলিভ চিকেন খেয়ে সবাই মুগ্ধ। অদিতির দাদা বলল, তুই একটা জিনিয়াস।

বউদি বলল, আগামী বছর কী করবে ভাই?

—দেখি!

সব মিটেছিল অনেক রাতে। সকালে উঠতেও দেরি হয় অদিতির। বেলা দশটা বাজতে তবে ওর খেয়াল হয় যে বিশুর মা কাজে আসেনি।

—দেখেছ, আস্পর্ধা দেখেছ? এত বাসন, এত ওয়াশিং, তার মধ্যে এরকম...

কাজলি অবশ্য বলেছিল, মাসি পরশুও বলেছিল, আপনি 'হ্যাঁ' বললেন। কালকেও বলেছিল—

—হোয়াট?

বলে অদিতি চেঁচাতে থাকে। কাজ, এত কাজ, কী বেইমান মেয়েছেলে তাই দেখো!

দীপ্ত সুট করে চা খেয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু অদিতির মেজাজ দেখে ও বিজয়ের কাছে গেল। বিজয় আর কাজলিকে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে দীপ্তই সব কাজ করাল। অদিতি ভীষণ রেগে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দীপ্ত তাতাকে নিয়ে গেল লাঞ্চ খাওয়াতে। না, অদিতি দিন-দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। কাজলি আর বিশুর মা তো সেদিন এসেছে, মাস তিনেক হল। কাজের লোক অদিতি রাখতেই পারে না। বিশুর মা লোকটা নিরীহ, খাটেও খুব।

—তোর মা-র মেজাজ, বুঝলি তাতা.... .

—অ-ফুল।

—কাজের লোকদের.....

—উই শুড লাভ দেম, ফাদার বলেছেন।

—লাভ ?

—ইয়েস। দে আর হরিজনস অ্যান্ড গান্ধী লাভড দেম, আন্ড উই ট্যু শুড!

দীপ্ত গলে গেল! না, স্কুলের নাম সার্থক। তাতা কী চমৎকার বুঝিয়ে দিল।

—আমরা যদি কাজগুলো করি....

—উই শুডনট। আমার ফ্রেন্ডস করে না।

দীপ্ত চুপসে গেল।

—নে, আইসক্রিমটা খা।

তার পরদিন সকালে বিশুর মা এল।

অদিতিই চেঁচাতে শুরু করেছিল, দীপ্ত বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা অচেনা গলার চিৎকারে ও বেরিয়ে আসে। বিশুর মা-র গলাই ও শোনেনি কখনো, সেই বিশুর মা চেঁচাচ্ছে।

—কেন আসিনি তা তুমি জানতেনি ?

—নো-ও-ও-ও !

—এই দেখো দাদাবাবু, পরশু পইপই করে বলে গেছি যে আমি রোববার আসবানি।

—কিন্তু, কেন ?

বিশুর মা সতেজে বলল, আমার বিশুর জন্মদিন ছিল যে! আমি উনোন ঝাড়ব, নতুন মেটে হাঁড়িতে রেঁদে দেবো, আমার খোঁড়া ছেলের জন্যি মানসা করিচি, সব বলিচি।

—ও...তোমার ছেলে খোঁড়া ?

—জন্ম হতে এটা পা দুব্বল। টেনে টেনে চলে। বউদিকে সকল কতা বলে কাজে ঢুকিচি।

—কী বলেছ আমাকে।

—সগল কতা। হেতো ভাত খাবুনি, নিত্য বিকেলের টেনে ঘরে যাব, কি বলিনি ?

দীপ্ত আস্তে বলল, তোমার ঘর কোথা ?

—সোনারপুরে নেমে আদ ঘন্টা হাঁটিতে হয়।

—শুধু ছেলে বাড়িতে থাকে ?

—আর কে আছে?

—কত বড়ো ছেলে?

—তাতার বইসি হবে। খাওয়ানি, মাকানি, চ্যায়রা তেমন বাড়ে নে ওর।

অদিতি বোঝে যে দীপ্ত খুব লজ্জিত হয়েছে।

ও হিংস্র রাগে বলে, জন্মদিন আবার কি? তুমি কী পার্টি দিচ্ছিলে?

বিশুর মা ঈষৎ হাসে।

পার্টি দোব কেন? নতুন একটা প্যান কিনে দি, নতুন হাঁড়িতে রাঁদি, সকালা পুজো দি। দীপ্ত বলে, ইশ্! কাল এত খাবার ছিল!

বিশুর মা মাথা নাড়ে।

—এখেনে তো আমি চা অবদি খাই না। মুড়ি বেঁদে আনি তাই খাই। হেতা সব মদে-মুরগিতে ছোঁয়ানেপা, সে খাবার আমি বিশুকে দিতে পারি? দেবতাব দোর ধরা ছেলে, স—ব মানতে হয়।

অদিতি যেন চড় খায়।

—ছোঁয়ালেপা মানে? এসব খাবার, খারাপ?

—খারাপ কেন? খারাপ খেলে তোমাদের অত কান্তি হয়? কিন্তুক আমাকে তো মান্‌সা মানতে হবে।

—জন্মদিন বলে কাজ কামাই করে...

—খুব অন্যাই। আমাদের ছেলে যে! তা পন্নাম হই বউদি, আমার পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দাও, আমি যাই।

—এখন পাবে না, মাসের শেষে পাবে।

—বটে?

বিশুর মা এবার চেঁচাতে শুরু করে। দীপ্ত আর অদিতি ভয় পেয়ে যায়। প্রতিবেশী, চারদিকে প্রতিবেশী।

—চুপ করো বিশুর মা; আমি টাকা দিচ্ছি।

—চুপ করব ক্যানে? তো মাগীর ছেলের জন্মদিনে ঝা করলি গতরে খেটে তুলে দিয়ে দিচি। আমার শিবরাত্তির সলতে খোঁড়াছেলেটার জন্মদিন ওর ষোলো বচর অবদি মান্‌সা। সেটি কত্তে বলে ছুটি নিলাম....

—আমি শুনিনি বিশুর মা....

—শুনবে কমনে? একন মদের ঘোরে, তকন ট্যাবলেটের ঘোরে, সোয়ামি মাগের ভেড়ো, দেকেও দেকে না। আমার সোয়ামি হলে...., আমার ছেলের জন্মদিনটা এতবড়ো অপরাদ হয়ে গেল?

সবাই শুনতে থাকে চারপাশে। টাকা গুনে-গেঁথে নেয় বিশুর মা। যাবার কালে বলে যায়, সবাই বলিচিল বউটা পাজি, লোক পায়নে আর। তবুও বিশুর মুখ চেয়ে ...আমাদের চেনাজানা লোকেরাই তো আসে, দেকব কেমন করে লোক পাও এবারের.....

তাতা এবার ইলেকট্রনিক ট্রেনটি চালিয়ে দেয় ঘরে।

শব্দটা ভীষণ কানে বাজে দীপুর।

কোনোমতে দরজাটা বন্ধ করে ও।

ট্যাবলেট, একটা ট্যাবলেট, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তাতা ওদের দিকে ওরকম চোখে তাকিয়ে আছে কেন? যেন এই প্রথম ওদের দেখছে! □

হরিয়াল-হরিয়াল

সো হ্রা ব হো সে ন

হাট থেকে ফিরে এসে লোকটা, পেখুড়ে ইয়ার আলি সাহাজী, প্রথমে অবিক্রিত পাখিগুলোকে ঝাঁকের মধ্যে ছেড়ে দেয়। ঝাঁক মানে একটা বড়ো খাঁচায বন্দী পাখির দঙ্গল। পাখিগুলো মৌন ভেঙে একটু হুল্লোড় করে নেয়। যারা ঝিমিযে ছিল চনমনে হয়ে ওঠে। ইয়ার চোখ মটকে দেখে। হাসে পাখিদের চঞ্চল তরঙ্গে। ফের ভিজে ছোলা, কিছু চাল, কিছু ভাত বাটিতে বাটিতে খেতে দেয। তারপর নজর করে তার বর্তমান সমৃদ্ধির মূল—হরিয়াল ঘুঘুটার ওপর। বিচিত্র নকশীদার, তেলতেলে দেহের, হরিয়ালটিকে ইযার আলি ভেন্ন খাঁচায রাখে। খাঁচাটাও নকশীদার। ওপরে ঝালর দেওযা কাপড়ের কারুকাজে খাঁচাটা ঢাকা। নীচেব দিকে ইযার ঝুলিযে দিযেছে কযেকটি ছোট্ট ছোট্ট ঘন্টা। মধুর সুরে টুং টাং করে বাজে। শুনতে ভালো লাগে ইযারের। এবার সে পাখিটার পরিচর্যায় মাতে। খাঁচার দরজা খুলে বাইরে আনে। বালতির জলে স্নান করায়। ঠোঁটে চুমু খায়। ফের খাঁচায় ভরে তাকে খেতে দেয। তখন তরঙ্গাময় হাসির ঠোঁটে তার আসমানের পরীরা নাচে। চোখে নামে কামনার মায়া। সে কামুক নজরে পাখিটাকে দেখতে থাকে। অবশ-অবশ লাগে যেন সারাটা অঙ্গ। হঠাৎ সেই আবেশ ভেঙে যায় একটি নারী-কন্ঠের ঝলকে

—পোড়া কপাল আমার। যেদি ওইবাম হরিযাল হযে জন্মাতি পারতুম। —বউ মারুফা অনেক সময় ধরে স্বামীর পাখি-যত্নের দিকে লক্ষ করে একটু কাঁটা বিঁধিযেই রা ছাড়ল।

—ক্যানো? কীসির লালোচ তোর, হ্যারা? —ইয়ার আলিও পালটা মশকরা করে ওঠে।

—বোঝো না?—বউ ওম-মাখা ঠোঁটে ভেন্ন এক জগতের দিকে ইঙ্গিত করে।

—নাহ্! —ইয়ার না-বোঝার ভান কবে মিচকে হাসে।

—সরে এসো, বুঝগে দিচ্ছি।

—দে তেবে!—খাঁচা ছেড়ে এক ঝটকায় একেবারে বউয়ের গাযে গা লাগীয়ে দাঁড়ায ইয়ার—বল কীসির লালোচ তোর?

—ওইরাম মহব্বত পাবার।

—মহব্বত তো করিঁ তোরে!

—ওই পাখিডার চেয়েও! —বউয়ের ঠোঁটে ঝরে ছদ্ম-অভিমান।

—হ্যাঁ।

—না। তুমি মিথ্যে বলতোছো।

বউ অভিমানে জেদি হয়। ছদ্ম-অভিমান রাজবেশ পরে নেয়। ঠোঁটের কোণে রক্ত ছড়ায়। স্বামীর গায়ে যৌবনের ঠেনা মারে। নাল ফুলের বাঁকানো পাপড়ির মতন ঠোঁট খুলে বলে—'পাখিডাই দেখতিছি তোমার এক লম্বর বউ, আর আমি তার সতীন!' কথাটা ইয়ারের বুকে ধাক্কা মারে। সে এবার মারুফার মুখে পূর্ণ নজর ফেলে। এক লহমায় বুঝে নেয় রঙ্গের সর মুছে গিয়ে সত্যি সত্যিই এখন মহব্বত-উপোসি মেঘ জমেছে বউয়ের মুখে। সে তাই জলদি বলে ওঠে·

—হেই মারুফা, ছেলেমানুষ নাকিন তুই? পাখি পাখি তুই তুই। দু'জোনার মধ্যি ফারাক অনেক!

—সত্যি বলতোছো?

—হ্যাঁ।

—আমার গা-ছুঁয়ে বলোদিনি!

—এই তোর গা ছুঁযে বলতিছি। শোন, ও পাখি আমার ব্যওসার লক্ষ্মী। হাটে-ঘাটে য্যাখন হুস করে হাত ফসকে কোনো পাখি উড়ে পেলগে যায, তারে ফের ধরে আনার জন্যি ওরে কাজে লাগাই। হরিযাল তারে ধরে আনে।

—মানে?

—মানে ধর...এই আজগের কথাডাই ধর না। মেটের হাটে গোটা দুই খয়রা পাখি বেচতিছি। খদ্দের উল্টে-পেল্টে দেখতেছে। দরাদরি করতেছে। অমনি ফস করে এট্টা উড়ে পালালে। খদ্দেরের গালে তো একগাল মাছি!

—উড়ে পালালে? তারপর? দামডা আদাই কোরেছো তো তার কাছ থে?

—ধ্যাস্, শোন্ না! তা আমি ত্যাখন হেসতিছি!

—হেসতোছো?

—হ্যাঁ হেসতিছি। আমি তো জানি ও পাখি ফেব ফিরে আসপে। আলেও।

—ফিরে আলে? কেঙ্করে? —বউ গাঢ আগ্রহে জানতে চায।

—এডাই মজা। হরিয়ালডারে যত্ন-আত্তি কী সাধে করি? দুম করে খাঁচা খুলে ওডারে উড়গে দিলুম। ঘুঘুডা, ওই রূপ-যৌবন লে আকাশে ওড়লে। ব্যস, চোখের পলক পড়লে কী পড়লে না খযড়া পাখিডারে সুঙ্গো লে হরিয়াল ফিরে এসে বসলে আমার কাঁধে।

—সত্যি বলতোছো তো হ্যাগা?

—সত্যি না তা কী মিথ্যে? ওই রূপ-চ্যায়রা দেখে কেউ ফিরে যাতি পারে নাকিন?

বউ মারুফার বাক রোহিত। সে বোবা মেরে গেছে। স্থির নজরে খাঁচা-বন্দী হরিয়ালটাকে দেখছে। মাত্তর মাস-ছযেক হল ইয়ার পাখিটাকে ধরেছে। পায়রামারির মাঠ থেকে। ধরে অব্দি ওর প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিয়েছে। দিয়েছে দিয়েছে মারুফা কেয়ার করেনি। বরং হিংসে করেছে। কেন, কী তা অত ভাবেনি। এখন পাখিটার গুণ-বাখানি শুনে সেও তার মায়ায় পড়ে গেল। বলল:

—পাখিডার যে এত গুণ তা বুঝলে কেন্তকরে ?

—ও আমি বুঝদি পারি ! —ইয়ার রহস্য বাড়ায়।

—কেন্তকরে সেডা বলো না !

—বলবো ?

—বলো।

—না। তুইও চেষ্টা কর, তুইও বুঝদি পারবি।

—না তুমি বলো।

—বেশ তেবে নিশেষ টান।

—ক্যানো ?

—টান, দ্যাখ্ পাখিডার গা দে কীরাম ম-ম করা গোন্ধো পাবি দ্যাখ।

—কই পাচ্ছিনে তো। —মারুফা দুনাকে শ্বাস টানে—কই তোমাব গোন্ধো ?

—পাচ্ছিস নে ?

—না।

—যোবতী নারীর ম-ম গোন্ধো পাচ্ছিস নে ?

—না।

—না পাস না পা। শোন, ওই গোন্ধোডাই চোমকের মতোন অন্য পাখিডা, মানে যে পাখি এটটাবার অন্তত ওর সঙ্গাতে থেকেছে তারে টেনে আনে। এর গা-র গোন্ধো যাদু গোন্ধো।

—সে না'য বুঝলুম। কিন্তুক তুমি এ বিদ্যে শিখলে কেন্তকরে ?

—ওই গোন্ধো শুঁকে।

—শুধু গোন্ধো শুঁকে ?

—না। আরু সপ সযাল আছে। বাপ-পিতেমোর সযাল। আমি তেবু পাখিমারা ছাড়া ভেন্ন পেশাও ধারণ করি। কিন্তুক বাপটা ছেল ওস্তাদ পেখুড়ে। তা পাখি উড়গে পাখি বশ করারি কৌশল আমি বাপের কাছথেই শিখিছি।

—সে জোনাও জেনতো এ বিদ্যে ?

—জেনতো মানে ? এ-বিদ্যে খরচ করে সে জোনা জেবনডাও চালাতো। এটুস ভালো করে শোঁকদিনি তুই। দ্যাখ তুইও গোন্ধো পাবি !

—না পাচ্ছি নে।—মারুফা ফের শ্বাস টেনে মাথা টেনে নেড়েছিল।

—তেবে আর তোর পাতি হবে না। ও গোন্ধো সবাই পায় না। —বুকের গভীর থেকে তীব্র বোধময় কথা বের করে ইয়ার এবার মাটিতে ফেরে—তুই ওঠ। বেলা ডুবে এয়েছে। ভাত দে, বিলি বেরোবো। কথা থামিযে ইয়ার আলি তার দৈনন্দিন কাজে নামার উদ্যোগ নেয়। সে পাখি-মারা। আশ্বিনের শেবাশিবি থেকে মাস পাঁচ-ছয় এই-ই তার পেশা। বিলকে বিল ঘুরে বেড়ায়। জাল-ঘন্টা-মশাল নিয়ে মেতে থাকে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে হাজির হয় ধু-ধু শূন্য মাঠে। মশাল জ্বালে। ছোটোছেলেটার হাতে থাকে একটা কাঁসার থালা। ওটাই একটা কাঠের ডাং দিয়ে সে পেটাতে থাকে। উলটোদিকে লগার মাথায় বাঁধা আয়তাকার জাল নিয়ে তৈরি থাকে ইয়ার। ঘন্টায় তাড়া খেয়ে মশালের

আগুনের দিকে ছুটে আসা পাখিরা তখন অনায়াসে জালবন্দী হয়ে পড়ে। ইয়ার বিশ্বাস করে—পাখি ধরায় বরকত আছে। হালি-হালি সরকার পাখিমারা বে-আইনী করলেও, ইয়ার ওসব ভ্রূক্ষেপ করে না—'সরকার তো আর সন্ধ্যে বেলা মাঠে এসে বসে থাকবে না!'

পাখি ধরার মরসুমে ইয়ার সরেস থাকে বেশ। এসময় তার দিন-রাত্তির চক্রে চক্রে এগিয়ে যায়। রাতে পাখি ধরে। বিচিত্র সব পাখি। খয়রা, বাটাং, কাদাখোঁচা, কাঁক, বক, শামুকখোল, পানকৌড়ি, হাঁসপাখি কতসব নরম নরম পাখি। মাঝরাতে বাড়ি আসে। বড়ো খাঁচায় তাদের বন্দী করে। হাটে যায়। তবে অন্য পেখুড়েদের মতো সকালে গোলাবাড়ির পাখি-হাটে সে যায় না। সে দুপুর দুপুর নানান হাটে বেরিয়ে পড়ে। পাখি বেচে। এতে লাভ বেশি। এভাবেই তিন মেয়ে, দু'ছেলে সমেত নিজেদের সাতজনের সংসারের হাল ইয়ার নিজ হাতেই ধরে রেখেছে। এতে খাটা-খাটনি বহুত। অবশ্যি বড়োছেলেটা ইদানীং রাজনীতিতে মাথা গলিয়ে দু'পয়সা ঘরে আনতে শুরু করেছে। তাতে খানিকটা আশান পায় ইয়ার।

তবুও একমুহূর্ত ইয়ার অলস বসে থাকে না। গতরে না হোক বিল-বাঁওড়ের চক্কর সদাসর্বদা তার মাথায় পাক মেরে বেড়ায়। সেই সয়ালে এখন ফের সে তাড়া দেয়—'হেই মারুফা ওঠ্। ভাত বাড়। সকাল সকাল না গেলি, অন্য পেখুড়েরা বিল দখল কল্লে লেবে যে!' মারুফা ওঠে। থালা সাজিয়ে স্বামীকে খেতে দেয়।

হাটে হাটে দেশে দেশে ইয়ার আলির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা সবাই খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলেই মনে করছে। এখন হাটে গেলে তাকে ঘিরে ধরে কৌতূহলী জনতা। পাখি কেনা যেমন-তেমন সবাই হরিয়াল উড়িয়ে পাখি ফিরিয়ে আনার খেল দেখার বায়না ধরে। হরিয়ালের খাঁচাটার দিকে লোভাতুর নজরে চায়। কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে খাঁচাটার গায় হাত বোলায়। বাবু-কসম-মার্কা কেউ কেউ আলগোছে জিজ্ঞাসা করে:

—হরিয়ালডা ব্যাচপা নাকিন ব্যাপারী ভাই?

—নাহ্! —চেষ্টাকৃত উদাসীনতায ইয়ার উত্তর দেয়।

—ভালো দাম দিতুম!

—দাম দে কি সপ পাবা যায়?

—তা যায় না। তেবু যেদি ব্যাচো...!

—বেচলি তোমারে আগে খবর দোবো, বুয়োছো ভায়রাভাই!

এইভাবে খানিকটা রঙ্গ খানিকটা বিদ্রূপের মিশেলে বাক্য হেনে ঘ্যাচ করে ইয়ার কথার ব্রেক চেপে দেয়। কেউ কেউ হেসে ওঠে। বাবু-কসম-মার্কা যুবক নীরবে সটকে পড়ে। ইয়ার খরিদ্দারের সঙ্গে দরদামে মগ্ন হয়। বেচাকেনা করে। ফের বাড়ি ফেরে। বিকেল বিকেল বাড়ি ফিরলে ফের পাড়ার লোকরা তাকে ঘিরে ধরে। বিশেষ করে ছেলেপিলের দল আর বউ-ঝিরা। ঘিরে ধরে কিন্তু প্রথম প্রথম কোনো কথা বলে না। হরিয়ালটার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। ইয়ার আলির কাজকম্ম দেখে। পাখিদের খোরাকি দেওয়া দেখে। হরিয়ালটার গোসল করানো দেখে। ফের হরিয়াল-কোলে ইয়ার

আলির গুণগুণ গান গাওয়া দেখে। শোনেও। তারপর একসময় মওকা বুঝে প্রস্তাব দেয়:

—খেলাডা এটটুস দ্যাখাও না ইয়ার ভাই!

—নাহ্।

—এটটুস দ্যাখাও! আমরা কখনো দেখিনি! দ্যাখাও এটটুস।

—না।

—ক্যানো?

—দ্যাখাও না—আমার মজ্জি!

—বাব্বা, এত দেমাক!—কেউ কেউ তাতিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়!

—বেশ তাই! দেমাক ভাবলি দেমাক!

পড়শিদের সঙ্গে স্বামীর কথোপকথনের এমন মুহূর্তে মারুফা হাজির হয়। দরজার আড়াল থেকে সে এতসময় সব দেখছিল। এখন হাসতে হাসতে স্বামীর পাশটাতে বসে। বলে—'ডেমাকই তো। অ্যাতো করে সব্বাই ধরেছে। দেখাও না তোমার যাদু বিদ্যেডা! আমিও তো কখখোনো দেখিনি!' এবার ইয়ার নরম হয়। ধাঁই করে উঠে পড়ে। বড়ো খাঁচার ভেতর থেকে ধরে আনে একটা হাঁসপাখি। ফস করে উড়িয়ে দেয়। পাখিটা বাতাস কাটতে কাটতে ওপরে ওঠে। অনেক ওপরে। সবার নজর যখন সেদিকে তখন ইয়ার হরিয়ালটাকে হাতে নেয়। বুকে চেপে ধরে। ফের ঠোঁটে চুমু দেয়। তারপর তাকেও ছুঁড়ে দেয় আকাশে। হরিযাল সাঁই-সাঁই ছোটে। সবার নজর এখন উর্ধ্বমুখী। সবাই হরিযালটাকে দেখছে! হাঁসপাখিটাকে দেখছে। উড়তে উড়তে দুটো বিন্দু হয়ে গেছে পাখিদুটো। সবাই দুটো বিন্দুর দাবা-ওলা দেখছে আকাশে। বিন্দু দুটো ওপর-নীচে আড়াআড়ি গোঁত্তা খাচ্ছে। একটা সময় পাখি দুটো সবার নজরের আড়ালেই চলে যায়। দেখা যায় না। কেউ দেখতে পায় না। অনেকক্ষণ। ব্যাপার দেখে মারুফা উদ্বিগ্ন হয়:

—হ্যাগা মিলগে গ্যালো যে!

—যাক।

—যেদি না ফেরে!

—ফেরবে। এটটু খেলতি দে। যৈবনবতী গোম্ধোডা ছাড়তি দে।

ইয়ারের নজর আকাশে। দেখাদেখি অন্যরাও আকাশমুখো হয়। এবং অবাক নজরে দেখে ফের দুটো বিন্দু স্পষ্ট হচ্ছে। এবার তারা পাশাপাশি। ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। বিন্দু থেকে মার্বেল, মার্বেল থেকে বল, বল থেকে লম্বা একটা পেনসিল, ফের পেনসিলদুটো হরিয়াল আর হাঁসপাখি হয়ে ইয়ারের কাঁধে ফিরে আসে। খুশিতে ভরে যায় সবার চোখ। ছেলেপিলে বউ-ঝিরা হাততালি দেয়। আনন্দের ঢেউ তুলে ওরা চলেও যায়। তখন স্বামী-স্ত্রী চোখোচোখি তাকায়। দুই নজরের সম্মিলিত প্রথমে মায়া সৃষ্টি হয়। মহব্বতের মায়া। তারপর সময় গেলে মায়ার রং ফিকে হয়ে যায়। ফের মারুফার চোখে উদ্বেগের জন্ম হয়। সে বলে:

—শুধু পাখি নে পড়ে থাকলি চলবে?

—ক্যানোরে হ্যারা? —ইয়ার জানতে চায়—কী হয়েছে?

—বড়োছেলেটার সম্বন্ধে ভাবা-ভাবনা করলে কিছু?

—তা তো করতিছি!

—কই করতোছো? ওতো যে কে সেই চলতেছে, ফের রাজনীতি লে মাতামাতি করতেছে।

—হুঁ এডা চিন্তার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এট্টা ব্রেক মারা দরকার।

—কবে মারবা? শুনতিছি নেতার ডান হাত হয়েছে। মোস্তানি করতেছে। এখনও সময় আছে। নড়ে-চড়ে বোসো। কিছু এট্টা করো।

—করবো। এবার আসল বিদ্যেডাই ঝাড়বো ওর ওপর।

—কবে? কবে ঝাড়বা? এতো কান্ডোর পরও তো তোমার সাড় দেখতিছি নে। এই সেদিন ওর বেপক্ষির পার্টি এসে বাড়ি চড়াও হলে। ভাঙচুর করলে। বাধা দিতে গে আমি মার খালুম। সেসপে হুঁশ আছে তোংগা বাপ-ব্যাটায়?

—হুঁশ নিকো?—ইয়ার একটু উত্তেজিত জিজ্ঞাসা করে।

—কনে আছে? থাকলি ওরে থেবড়ে-থুবড়ে লে বাড়ি ফিরগে এনতে।

—বেশ মানলুম তোর কথা। কিন্তুক তুই তো মা। তুই তো বারণ করলি পারিস।

—আমার কথা সে পাছাদেও পৌঁছে না।

—বলিছিস কখনও?

—বলিছি। বলে পাল্ডা শুনতি হচ্ছে। বলেছে—'তোংগা জামানা শেষ, আমি ওরাম মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতি পারবো না। আমার ভেন্ন ভাও।'

—কী বলে শুনি!

—বলে, জানের রিস্কি না লিলি আয়-উন্নতি হয় না এখন।

—হুঁ! বেশ বেড়েছে দেখতিছি!

—তুমি এট্টুস বারণ করো! —মারুফা কন্ঠ পাল্টিয়ে স্বরে মায়া আনে—রাজনীতি এখোন ভারী বেপদ! তার ওপর ও ওইরাম হোঁকাকাটা। তুমি দ্যাখো এট্টু! ও বোধায় আর ফেরবে না!

—ফেরবে। ও তো ও ওর বাপ ফেরবে! —ইয়ার এবার জেদি হয়ে ওঠে।

—কেঙ্করে। শুধু মুখ চালালি হবে?

—ফেরবে খুপ সহজে।

—মানে?

—বললুম তো এবার আসল বিদ্যেডা ঝাড়বো ওর ওপর। এই হরিয়াল যেরাম করে অন্য পাখিগা ফিরগে ল্যাসে সেইরাম করে ওরে ঘরে আনবো।

—মানে? কেঙ্করে?

—এট্টার পেছনে আর এট্টা উড়গে দে।

—বুঝলুম না। ও কি পাখি নাকিন? ভেদডা ভেঙে বলো না!

—পাখি, আবার পাখি না। ওর পেছনে আমি মানুষ লিল্গে দোবো।

—মানে?

—মানে ছোটোডারেও ওপথে ঠেলে দোবো। ও হরিয়াল হয়ে বড়োডারে ফিরগে আনবে।

—তুমি হরিয়াল লেই থাকো। ওসপ আবার হয় নাকিন মানুষির ক্ষেত্রে!

—ক্যানো হবে না? হবে। হোতিই হবে। আমার বংশে তিনপুরুষির খবে রয়েছে।

—খবে?

—হ্যাঁ খবে। আমার বংশে তিনপুরুষির বর আছে। পাখিগা কাছ থে আমরা তিনপুরুষি তিনবার মহা উপগার পাবো। মানে য্যাখন আমারগা জীবন-মরণের কোচ্চেন দেখা দেবে ত্যাখন এই বিদ্যে খেটকে আমরা পার পাবো।

—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। পেথমে আমার বাপ এই বিদ্যে খেটকেছে। তারপর আমি। দুজনাই ফল পেইছি।

—সত্যি?

—সত্যি না তা কী? শোন্ তেবে!

কথা থামিয়ে ইয়ার আলি এক অলৌকিক গল্পের জগতে চলে যায়। ঢুকে যায় তার বাপের বৃত্তান্তে। একটা ঘোরের মধ্য থেকে সে বলে যেতে থাকে—'এ বেত্তান্ত আমার দু-ফুবুর বেত্তান্ত। বুইলি, বড়ো ফুবু সাবালোক হয়ে পূব পাড়ার হেদায়েতের সুঙ্গে ভাবলাব করেলো। হেদায়েতের নামে সারা তল্লাট ত্যাখন থরহরি কাঁপে। ডাকসাইটে মোস্তান ছেল সে। সে সপ মেলাই বছর আগেগার কেচ্ছা। তার ফেরে নেতা—এম এল এ-র সুঙ্গে ছেল তার দোস্তি। ফলে তারে ঘাটানে অতোডা সহজ ছেলে না। বড়ো ফুবুর কী কান্ড তার সুঙ্গেই লটঘট বেধগে বসলে। মেয়েরে লে দাদা পড়ে গেল বেপদে। অমন পাষাণ-ডাকাতির হাতেই বা মেয়েরে তুলে দেয কী করে? তাই শুরু হল বড়ো ফুবুর ওপর অত্যেচার। মারধর। মার বলে মার, গোন্দোরূপ মার চালাতি লাগলে দাদা। কিন্তুক কিছুতিই কিছু হয না। শেষটায় এগগে আলে বাপ। পাখ-পাখালির সুঙ্গে ত্যাখন বাপের দহরম-মহরম। সেই সয়ালে ত্যাতোদিনি বাপের হাতে এসে গেছে এই লক্ষ্মী হরিয়ালের মতন সাদা-ধবল আর ঘি-রংয়ের নকশীদার এট্টা পায়রা। বার্শি সেই পায়রা দে হারানে পাখি সপ খুঁজে এনতো। তা বাপ এই বিদ্যে বড়ো ফুবু আর হেদায়েতের ওপর খাটালে। কী করলে, না ছোটো ফুবুরি এগগে দেলে। উড়গে দেলে হেদায়েতের দিকি। ছোটো ফুবু ত্যাখন যৈবনবতী হবার গোন্ধে সারা গ্রামে ম-ম ছড়াচ্ছে। তা শিখকে-পড়গে বাপ ছোটো ফুবুরি যেভাবে উড়গে দেলে, ছোটো ফুবু সেভাবেই ওড়লে। ব্যাস, বেধে গেল ধুন্ধুমার। দুই বুনির লাটা-ঝামটা শুরু হলে। আর হেদায়েত পড়লে বিপদে। কারে ছেড়ে কারে ধরে। এরে ধরে তা ও পেছনে কল করে, ওরে ধরে তো এ সামনে কাঠি করে। হেদায়েত পেথমে খুব সাবধানে ছলকল করে আড়ালে-আড়ালে দুফুবুর সুঙ্গি মিলমিশ করতো। কিন্তুক হেদায়েতের মতন লোক এরাম লুকোছাপা করে কদ্দিন চলবে? চললে নাও বেশিদিন। দূর করে একদিন দুজনার সঙ্গ ছেড়ে দেলে। দে ভেন্ন ফুলি বসলে। ত্যাখন দুই ফুবু আমার পিঠোপিঠি ফিরে আলে।'—স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে পায়রা দিয়ে পাখি ধরার সয়ালে মানুষ দিয়ে মানুষ ফেরানোর কাহিনি বলে গেছিল। শেষে মাবুকাকে প্রশ্ন করেছিল:

—বুইলি কিছু?

—বুইছি। ফের তোমার বেত্তান্তখানা বলোদিনি শুনি।

—শুনবি?—ইয়ারের মুখে হালকা হাসির স্বর জমে।

—শোনবো।

—তেবে শোন, আমি এ বিদ্যে খেটকুলুম তোর ওপর।

—আমার ওপর?—মারুফা বিস্মিত হয়—ক্যানো? কখন?

—বের সোমায়। তোর ওপর, আবার তোর ওপর না। তোরে বে করার জন্যি আমি ত্যাখন পাগল। কী রূপ-চ্যায়রা ছেল তোর! শুধু আমি ক্যানো, আমারগা গেরামের ছোটোকালোও উঠে পড়ে লেগেলো তোরে ঘরে তোলবে বলে। সত্যি বলতি কী তোরে দখল লোবার দোড়োদোড়োতি ওইতিই এগ্গে ছেল। আমি হেরে ভূত হয়ে যাচ্ছিলুম। মনের মধ্যি ত্যাখন আগুন। ছটফট করতি করতি বাপের বিদ্যে খাটালুম ছোটো-কালোর ওপর। ওরে ফিরগে আনলুম তোর পথথে। পথের কাঁটা তুলে তোরে ঘরে আনলুম।

—এতোডা কান্ড তুমি ঘটকিলে?—মারুফা হেসে হেসে বলে —তালি তো বিদ্যেডারে গড় করতি হয়।

—হ্যাঁ। তিনিগ্ দুটো লোবা হয়ে গেছে। এবার বড়ো খোকার ওপর উড়ো দেওড় করবো।

—খাটপে তো?

—খাটপে। নিশ্চিত খাটপে। তেবে আমার হাতে কাজ হবে না। তিনপুরুষির হিসাব ধরলি এবার ছোটোখোকার পালা দাঁড়ায়। বুইলি?

—হুঁ!

—হুঁ কী? ভেদ বুইলি তো?

—বুইছি। বড়ো খোকারে ফেরাতি ছোটোডারেও রাজনীতির গভেভ উড়গে দিতি হবে। তাই তো?

—ঠিক ধরিছিস!

—দ্যাখো যা ভালো বোঝ তাই করো। দেওড় করো আর বিদ্যে ঝাড়ো ছেলেডারে ফেরাও! তারপর ইয়ার শুরু করেছিল তার বিদ্যের ওস্তাদি। পাখি মারার কাজ থেকে ছাড়ান করে ছোটোছেলেটাকেও উড়িয়ে দিয়েছিল। ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়েও দিয়েছিল। দাঁতে-নখে-ঠোঁটে দিয়েছিল যাদুবিদ্যার ছোঁয়া। বলেছিল —'হরিয়ালডার মতোন ঠিক ঠিক ডিউটি পালন করিস বাপ। তোর ঠোঁটে আছে মেহেন্দি চোমক, থাবায় আছে ধারালো ছুরি, নখে আছে শানানে কোঁচের ছাটরা-ছররা ধার। তুই আমার শিকারী হরিয়াল। যা উড়ে যা। গোখো ছড়া। বড়ডারে ফিরগে ল্যায়।'

ছোটোছেলে ভাইয়ের সয়াল নিলে ইয়ার ফের মশাল, কাঁসার থালা-ঘন্টা, জালতিতে মন দিয়েছিল। ব্যস্ত হয়েছিল বিল-বাঁওড়ে। ফি-রোজ শুরু করেছিল পাখি ধরা। হরেক কিসিমের পাখি। নিয়ম করে এ বিলে যায়, ও বিলে যায়। মাথার ভেতর হরিয়ালের চক্কর। মাথায় ভেতর বড়োছেলে—ছোটোছেলের ওড়াউড়ি। ছোটোছেলের

দেহ এখন হরিয়াল। সে গন্ধ ছড়াচ্ছে। ম-ম। তাতে বড়োছেলে বিরক্ত হচ্ছে। এটা আশার কথা। বিদ্যেটা ঠিক ঠিক জায়গায় কাজ করা শুরু করেছে। ইয়ার এক বিল থেকে আর একে আড়কা মারতে মারতে ফুরফুরে হয়। কিন্তু হঠাৎই একদিন তার সেই ফুরফুরে মেজাজের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ায় কিছু ষণ্ড। রাজনীতির ষণ্ড। বিলের আঁধারে তারা সাইরেন বাজায়। তার পথ আটকায়। বলে:

—কড়া কথা ছেল ইয়ারচা !

—কী কথা ?—ইয়ার স্বাভাবিক জানতে চেয়েছিল।

—ব্যাঙের মাথা। —ষণ্ডদের সর্দার তামাশা করে।

—মানে ?

—মানেডা সোদা। ছেলেরে সাবধান করো। নালি বিলা করে দোবো।

—মানে ?—ইয়ার এবার গেঙড়িযে ওঠে।

—আর মানে শুনতি চাও ? এই মানেডা তোরা চাচারে ভালো করে শুনগে দে দিনি !

একটা ষণ্ড একথা বলামাত্রই অন্য দুটো ষণ্ডর মুখে খই ফুটতে শুরু করে। দুজনে নাটকে মাতে—গীতিনাট্য। একে বলে অন্যে রা দেয়·

—এট্টা কতা !

—কী কতা ?

—ছেলের মাথা !

—কী ছেলে ?

—গুন্ডা ছেলে।

—কী গুন্ডা ?

—রঙিল পান্ডা !

—কী রঙিল ?

—বোমাবাজি রঙিল।

—কী বোমা ?

—দানা বোমা !

—কোন্ দানা ?

—রাজনীতির খানা।

—কীরাম খানা ?

—বাড়-বাড়ন্তি মানা।

—কীসির বাড় ?

—তেলের বাড়।

—কী তেল ?

—খতম খেল্।

আর দাঁড়ায়নি ষণ্ডগুলো। ঝুঝকো আঁধারের মধ্যে মিলিয়ে গেছিল। যাওয়ার আগে বলে গেছিল কোরাসে—'বুইলে তো চাচা, খেল খতমের কতাখান বলতিছি।' সেদিন আর মাঠে মন রাখতে পারেনি ইয়ার। কেমন যেন একটা অশুভ বার্তা তার মাথায়

মুগুর মারছিল!

ফের আস্তে আস্তে সব ভুলে যায় ইয়ার। সবকিছুকে বুকের গহীনে চালান করে পাখ্-পাখালিতে মন দেয়। পাখি ধরে। খাঁচায় পোরে। দুপুর দুপুর হাটে যায়। হাটে যায়—হাত ফসকে পাখি উড়ে গেলে হরিয়ালটাকে পিছু পাঠায়। হারানো পাখি ফিরে পায়। হাট-ফেরতা বাড়ি এসে হরিয়ালটাকে গোসল করায়। তখন তার পাশ ঘেঁষে বসে মারুফা:

—আমার মনডা কিত্তুক ভালোবেসতেছে না!

—ক্যানো?

—ছেলে দুটো ফেরবে তো?

—ফেরবে। —মাঠের হুমকি ফের চিনচিন করে বাজলেও তাকে ইয়ার হজম করে ফেলে। বলে—নিশ্চয়ই ফেরবে।

—ফেরবে তো সুপথে?

—তোর সন্দ হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—ক্যানো?

—দিনকাল খারাপ। রাজনীতি এখোন সব্বখাগি। ছেলে দুটোরে পায় খেলাচ্ছে! জিবি লিতি কত্‌খুন?

—খেলাক খেলাক। তাতি কিছু ফাযদা করতি পারবে না। ওরা ফেরবে।

—কই ফিরতেছে?

—ফিরতেছে তো। আগের থে কি এটটু বেশি-বেশি, মানে ঘোনো-ঘোনো বড়ো খোকা বাড়ি ফিরতেছে না?

—তা অবশ্যি ঠিক। তার ফেরে সেদিন ছোটোখোকা বলতেলো, বড়োখোকা নাকিন এখোন প্রাই-প্রাই তোমার-আমার খবর ল্যায়।

—তেবে? ফেরার এই শুরু। এবার ফাইনাল ফেরা ফেরবে।

ইয়ার তারপর কথা থামিয়ে বউয়ের হাতে বাড়া ভাতের থালাতে মন দেয়। গপাগপ খায়। মশাল-ঘন্টা হাতে নেয়। মনে মনে নতুন বিলের সন্ধান করে। সয়াল খোঁজে। বউরে বুকে টেনে নেয়। বলে—'অতো ভাবিস নে। আমার এ বিদ্যে মহাযাদু। এ বিদ্যেয় সবাই ঘায়েল হয়। হোতি বাধ্য।' ফের বউরে সোহাগ করে। বউয়ের হাতে হাত রাখে। বউয়ের হাতে হরিয়ালডারে তুলে দেয়। বলে—'নে এরে এটটুস আদর কর। মনডা ভালো হব্যানি।' তারপর বাতাস কেটে বেরিয়ে পড়ে। নতুন মাঠের সয়াল ধরে।

সেদিন সে টঁ মারতে মারতে হাজির হয় গৌরীভোজের মাঠে। মাঠে পা দিয়েই বুঝতে পারে—এ মাঠে সোনা আছে। পাখির রাজ্য এ মাঠ। ইয়ার দেরি করে না। মশাল জ্বালে। জাল পাতে। ঘন্টা বাজায়। ঝপাঝপ পাখি ধরে। আধঘন্টাটাক হয়েছে কী হয়নি—খানকুড়ি পাখি তার খাঁচা-বন্দী হয়ে যায়। খুশিতে থাবা গ্যাঁদা ফুলের মতন ফুটে ওঠে ইয়ারের বুক। আরও পাখির নেশায় সে মাঠের দিক পরিবর্তন করে। আর

সেখানে জাল পাততে গিয়েই সামনে আজদেহ বিপদ দেখে সে। দেখে সন্ধ্যার পাতলা আঁধারে একটা দোনলা বন্দুক উঁচিয়ে তার কপালে ধরেছে সেই আজদেহ। সঙ্গে দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে খর শীৎকার:

—মাথার খুলি উড়িয়ে দেব একদম।

—কে-কেডা? ক্যা-ক্যা-ক্যানো?—ভয়ার্ত ইয়ার তোতলায়। মশাল-ঘন্টা খসে পড়ে।

—জানো না?

—না। আমার কী অন্যায়।—ইয়ার খানিকটা ধাতস্থ জিজ্ঞাসা রাখে।

—পাখি-মারা বে-আইনি তা জানো না।

—জানি।

—তবে ধরছ কেন?

—গরিপ মানুষ। এডাই আমার রুটি-রুজি, তাই!

—ওসব বুঝিনে। এমাঠে ওসব চলবে না। এরা প্রকৃতি। এরা প্রাণ। এরা সুন্দর। এরা ফুল। এরা গান গায়। এরা বন্ধু। আর তুমি জল্লাদ। খুনী। পাখি মারো।

—আর হবে না ছার। —অবস্থা কোতিক দেখে ইয়ার নত হয়।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ ছার। আমি এক্ষুনিই গেবরযাচ্ছি।

—যাও!

—যাচ্ছি ছার,—ইযার দু-পা এগোয়।

—দাঁড়াও। —ফের দাঁতের ওপর দাঁত রাখা চেরা গলা —যে ক-টা ধরেছ ছেড়ে দাও!

—ছেড়ে দোবো?

—হ্যাঁ।

—কষ্ট করে ধরা ছার।.

—ছাড়ো বলছি। নইলে.... !

বাজ ফেল্গা গলায় লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দোনলা বন্দুকে উড়ো দেওড় হয়। খারা-বন্দী পাখিগুলো ঝটপট করে ওঠে। ঠক ঠক করে কেঁপে ওঠে ইয়ার। বুকের ভেতর চড়াই পাখির কাঁপন। এবার লোকটাকে চিনতে পারে সে। লোকটা পাখি-বন্ধু। খুব নামডাকয়ালা লোক। অন্য পেখুড়েদের মুখে এনার কথা শুনেছে ইয়ার। পেখুড়েদের যম ইনি। মনে মনে আওড়ায় ইয়ার—'শালা পড়বি তো একেবারে যমের মুখি!' কিছুটা সময় নীরব কাটে। ফের লোকটা হাঁকার দেয়—'কী হল? ছাড়। ছেড়ে দে পাখিগুলোকে!' কপাললেখন পড়ে নিয়েছে ইয়ার। তাই আর দেরি করে না। এক-এক করে কুড়িটা পাখি ছেড়ে দেয়। তারপর মাথা নিচু করে বিল ছাড়ে সে।

মনটা দমে যায়। কলিকালের ওপর রাগ হয়। লোকটাকে গালাগালি করে মনে মনে—'উহুঁ! শালো পাখি-বন্ধু মেরগেছে! পোঙায় রস থাকলি ওরাম বন্ধু শালো আমি একশ হাজার বার হোতি পারি, বুইলে!' হাঁটতে হাঁটতে একবার ভেন্ন মাঠে যাওয়ার কথা ভাবে। পরক্ষণে সে ভাবনা বাতিল করে। সটান বাড়ি ফিরে আসে। শূন্য

হাতে—শূন্য খাঁচায়। ফের অবাক হয়। দেখে—ঘর-দোর সব অন্ধকার। বাতি জ্বলেনি। ইয়ারের প্রাণটা কেঁপে ওঠে—'কোনো বেপত্তি ঘটিনি তো?' জাল-মশাল-ঘন্টা সব উঠোনে রেখে সে দ্রুত ঘরে ওঠে। মারুফা বসে আছে চুপচাপ। ইয়ার জিজ্ঞাসা করে:

—কীরা বউ? কী হয়েছে?

—তোমার যাদু মিথ্যে হয়ে গেছে!—মারুফার গলায় কান্না চলকে ওঠে।

—মানে?

—তোমার সাধের হরিয়াল একলা ঘরে ফিরে এয়েছে।

—মানে?

মারুফা কোনো উত্তর দেয় না। পাশে বসে থাকা ছোটোছেলের দিকে ইশারা করে। ইয়ার তার সামনে দাঁড়ায়—'কী হযেছে রে ছোটোখোকা?' ছোটখোকা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দেয় না। যেন বোবা। ইয়ার এবার তাকে ধরে নাকড়া-ঝাকড়া দেয়—'বড়ো খোকা কই? বাড়ি আসিনি ক্যানো সে?'

—আর আসপে না বাপ। —ছোটোছেলে ফিসফিস করে উত্তর দেয়।

—মানে?

—আজ সন্ধ্যেয় পণ্চাৎ-মেম্বার খুন হয়েছে। ভাইগা দলের কাজ। তাই এলাকা·ছেড়ে গেছে। এলাকায় থাকলি বাঁচতি পারবে না।

ইয়ারের সারা দেহ শিথিল হয়ে আসে। ধ্বস নামে তার মনে। দেহটা ঠান্ডা হয়ে ওঠে। বসে পড়ে দাওয়ার ওপর। বুকের মধ্যে তীব্র কাঁপন। বুকের মধ্যে তাড়া খাওয়া, হাত ফসকে উড়ে যাওয়া বড়োছেলে। তার পাশে বন্দুকয়লা পাখিবন্ধু—তাঁর দাঁতের শীৎকার। ইয়ার দেখতে পায় তার থাবার মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটার পর একটা পাখি ছেড়ে দিচ্ছে সে। ইয়ার কাতরিয়ে ওঠে:

—বাপের পায়রা, আমার হরিয়াল?

—সপ মিথ্যে হয়ে গেছে!—পাশ থেকে মারুফা জবাব কাটে।

—ওরা যে হারানে মানিক খুঁজে আনে!

—কলিকালে ওরা নিগোন্ধে হয়ে গেছে!

—আমার বড়োখোকা?

—উড়তি উড়তি কল্‌জেয় আঘাত খেয়ে লাট খেয়ে পড়বে।

—আমার বড়োখোকা?

—কোনোদিন বাড়ি ফেরবে না।

—আমার হরিয়াল?

—মিথ্যে!

ইয়ার কথা বন্ধ করে। মাটি খামচায়। মুখে গোঙানির শব্দ ওঠে। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে যায়। সাধের খাঁচাটা আনে। এক হ্যাঁচকায় নকশীদার আচ্ছাদনটাকে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর দরজাটা খুলে দেয়। হরিয়ালটাকে বাইরে আনে। আকাশে উড়িয়ে দেয়। পাখিটা উড়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে। তার ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়। ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। চাপ চাপ নৈঃশব্দ নামে। তারপর সেই শব্দ রাত্রি একসময় কালা কালা হয়ে যায়। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে ইয়ার। □

দ্বিতীয় জন্ম

স ত্য প্রি য় ঘো ষ

আজ একটা বিয়ে হবে।

কন্যার নাম এতিমা। কন্যার ওলি অর্থাৎ কন্যাকর্তা বরদা উকিল। জন্মগত নাম বরদাপ্রসন্ন ঘোষ। ম্যাটরিক থেকে বি এ ডিগ্রির সারটিফিকেটেও সেই নাম। আইনের বই পড়তে পড়তেই জাতিগত চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ১৯৩০ সালে বরিশালের কায়স্থ সম্মেলনে সারগর্ভ ভাষণ শুনে বংশমর্যাদাসচেতন হয়ে যখন তিনি স্থিরনিশ্চয় হলেন তিনি শূদ্র নন, দেবমানববন্দিত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, তখন মিথ্যা শূদ্রত্ব পরিহারের জন্য যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ পইতা ধারণ করে আইনমতে যখন তিনি ক্ষত্রিয় হলেন তখন তাঁর সেই দ্বিতীয় জন্মে নাম হল শ্রীবরদাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম। সেই মর্মে এফিডেভিট করে ওই নামটি আইনসিদ্ধ করে নিতেও তিনি কালবিলম্ব করেননি এবং বরিশালের মুনসেফ কোর্টের ওকালতনামায় তিনি সেই নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারপর থেকে কীর্তনখোলা নদী দিয়ে কত জল বয়ে গেল এবং তাঁকে কতবার গৃহত্যাগ করতে হল তাঁর কুলীনবংশের এক-একটা বেমক্কা বিয়ের ধাক্কায় তার হিসেব নেই। দুই দাদা এক বোন এবং নিজের বিয়েতে কৌলীন্য মার খায়নি, প্রথম ভঙ্গাটা ঘটাল ছোটো এক ভাই মৌলিক বংশের মেয়েকে ঘরে এনে, সঙ্গে সঙ্গে বরদা ঘোষ বর্মের গৃহত্যাগ, পুত্রকন্যাকলত্রকে শ্বশুরবাড়িতে পার করে নিজে গিয়ে উঠলেন নৈকষ্যকুলীন এক বন্ধুগৃহে। তারপর বুড়ীগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-মেঘনার দাপটে কীর্তনখোলাও যখন মাতোয়ারা হল নারায়ে তকবির, আল্লা-হু-আকবরে, তখন ভাঙাচোরা বংশমর্যাদাসমেত বংশের অনেককে নিয়ে প্রায় একবস্ত্রে তাঁকে পালিয়ে আসতে হল হুগলি নদীর পূর্বতীরস্থ কুষ্টীপাকে। পৈতৃক ভিটেমাটি জোতজমাসম্পত্তি সব গেলেও তখনও তিনি বর্ম, কিন্তু তা ভেদ করে দিতে লাগল তাঁর বংশের এক-এক কুলাঙ্গার এক-একটা বিয়েতে আর তাঁকে বারে-বারেই গৃহত্যাগ করতে হল চিত্রগুপ্তের খাতায় বংশগৌরবটি টিকিয়ে রাখার জন্য। বারে-বারেই গৃহত্যাগ অর্থ, একবার ত্যাগ করে বউছেলেমেয়ের উপর প্রথমে তম্বিহম্বি শেষে নানারকম সিন ক্রিয়েট করে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হচ্ছিল। অবশেষে যখন একমাত্র পুত্রও জাত এবং জাতিগত অনাচারের নরক থেকে তাঁকে উদ্ধার করার পরিবর্তে এক যবনকন্যাকে মহা আড়ম্বরে ঘরে এনে তুলল তখন বরদা ঘোষ বর্ম চিরতরে গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পুঁজিপাটাহীন সত্তরবছর বয়সের এই গোঁয়ারগোবিন্দের তখন ঠাঁই মিলে ছিল পূর্বকলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলের ময়লাখালের পাশে বিবিবাগান বস্তির যে উকিল বন্ধুটির গৃহে, ভাগ্যচক্রে তিনিও এক খ্রীস্টান। তারপর সেই ময়লাখালের এন্তা জঞ্জাল অন্নজানের জারকপ্রক্রিয়ায় সেচের জলের

মিশ্রসারে রূপান্তরিত হয়ে যেমন সবুজ শাকসবজি এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ মৎস্যচাষের উপকরণ হয়েছে, তেমনি বরদা উকিলের বর্মকৃপাণে রক্ষিত ক্ষাত্রমহিমাদীপ্ত যজ্ঞোপবীত ওই ময়লাখালেই জানপ্রাণমানরক্ষার তাগিদে কাণ্ডজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়ে বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং দু-চার বছরের মধ্যেই তিনি কেমন করে নব্য দ্বিতীয় জন্মে আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনে সেরেফ বরদা উকিলে পরিণত হলেন, কেমন করে যে ট্যাংরা অঞ্চলের চামারপট্টি থেকে শুরু করে রেললাইন আর ময়লাখাল আমোদিত ধোবিয়াতলা বস্তি-বিবিবাগান-মতিঝিল-খটিকপাড়া-মীর মেহের আলি লেন ইত্যাদি অঞ্চলের ঝুপড়িবাসী থেকে শুরু করে চালাঘর এবং ছোটো ছোটো পাকাবাড়ির সাত-আট হাজার জাতধর্মখোয়ানো বাসিন্দার উকিলদাদুতে পরিণত হলেন, সে এক অন্য মহাভারত।

কন্যাকর্তার গৌরচন্দ্রিকাতেই যদি এতটা হল তাহলে স্বয়ং কন্যার হকিকতটাও একবার খতিয়ে দেখতে হয়। কুলজি ধরা পড়ে ওর নামকরণেই। এতিমা! তাহলে কি কোনো এতিমখানা অর্থাৎ সাধুবাংলায় যাকে বলে অনাথাশ্রম ছিল ওর জন্মস্থান? ট্যাংরার কিলখানা যেখানে প্রতিদিন শত শত খাসি, মোষ আর গরু-বলদ জবাই করা হয় সেটা কি তাহলে কোনো এতিমখানা? ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার আগুনের মধ্যে ওর আবির্ভাব। লেবার রুম বলো আঁতুরঘর বলো, ব্যবস্থাটি মন্দ ছিল না, লোহার ফটক লাগানো তিন শেডওয়ালা ছয়টি চেম্বারে দেড়শো ফুট বর্গক্ষেত্রে কাতারে কাতারে মানুষ নাকি সেঁদিয়েছিল তাতে, তারই মধ্যে একটা ঘেরা টোপে ইন্তেজাম ভালো হয়েছিল মেহের আলি লেনের পাকাঘরের বাসিন্দা রোকেয়া কোমের জন্য, তার জন্মলগ্নের নিশুতি রাতে যত আগুন জ্বলুক না আর যত বোমাই ফাটুক না বিবিবাগান, মতিঝিল, মেহের আলি লেনের বিস্তীর্ণ এলাকায়, মাতৃজঠর থেকে ওকে টেনে হিঁচড়ে বের করতে দাঙ্গাদুর্গতদের মধ্যে পেশাদার এক দাইমাও জুটে গিয়েছিল। হলই বা সে জাত নমশূদ্র, তার ডাকে জম্বুলা রাক্ষসী এসেছিল গোদাবরী তীর থেকে — নাকি জাতিগত কারণে ময়নমনসিংহের কংসনদীর কূল থেকে একদঙ্গল কালো জিন, সে কি বলা যায়! জন্মলগ্নে ওর ডান কানে আজান আর বাম কানে একামত শোনানোর লোকেরও অভাব ছিল না, কিলখানাটি তখন হাজার ছয়েক পলাতক প্রাণীতে যে সাপরতাইল! হলে হবে কী, শেষ রক্ষা হয়নি। কিলখানায় মধু পাওয়া যাবে কোথায় যে বিসমিল্লাহ বলে নবজাতকের মুখে কেউ এককোঁটা ঢেলে দেবে। বুঝি এই কারণেই আমাদের এতিমার বুলি ফোটার পর মুখ থেকে বাক্য ঝরে প্রচুর কিন্তু যেন মধু ঝরে না। দাঙ্গার আগুন নিভবার পর কত লোক ফিরে গেল তাদের বিধ্বস্ত আস্তানায় নতুন করে মাথা গোঁজার উপায় খুঁজতে, কিন্তু এতিমার আব্বাকে তো খুঁজেই পাওয়া গেল না আর। রোকেয়া কোম তার মরদ প্লাস্টিক কারখানার মিস্ত্রি কামরুদ্দীনকে ফিরে পাবার জন্য ধোবিয়াতলার মাজার শরীফে আর পীরের দরগায় বছরভর কত হত্যে দিয়েছে। মাটির ঘোড়া রেখে মানত মেনেছে আগরবাত্তি জ্বেলেছে, কিন্তু মানুষটা ফিরল না বলে রোকেয়ারও ইন্তেকাল ঘটে গেল। এতিমা কিন্তু সেরেফ কলজের জোরেই ধোবিয়াতলার মুসলিম ক্যাম্পে দিব্যি বেড়ে উঠতে লাগল, শুকনো মাটিতে পড়লেও

কই মাছ যেমন কানকোর কেরামতিতেই চলে ফিরে বেড়ায়। আগুনে পোড়া পরিবারগুলিকে নতুন আস্তানা গড়ে দিয়েছিল সরকার, চারটে খুঁটি-চারটে বাঁশ আর দুটো পলিথিন শিটে দিব্যি ঝুপড়ি। তার মধ্যে আটচল্লিশটি মুসলিম পরিবার, এতিমাকে সেখানে লালনপালনের জোরালো ব্যবস্থা ছিল। থাকবে না কেন, হাদিস শরীফে কী বলা আছে? এতিমদের যে অন্ন দেবে না তাকে তো দোজখের আগুন গিলতে হবে, এতিমের মাল কেউ হাতাবে তো জাহান্নমের দমবন্ধ ধোঁয়া দুর্গন্ধি পুরীষ আর ভীষণ ঠাণ্ডায় কয়েদ থাকতে হবে অনন্তকাল। এতিমা তাই লকলকে পুঁইডাঁটাটির মতোই দিব্যি বেড়ে উঠেছে। তার ইমান গড়ে তোলার জন্য মৌলবীর কাছে তাকে মসজিদে কলেমা পড়ানো হয়েছে আবার ফ্রি মাদ্রাসায় সে প্রথমে কলমের সাহায্যে জ্ঞানও পেয়েছে খোদার ভাষা আরবিতে, পরে গান্ধী শিক্ষাসদনে সে মাতৃভাষা বাংলাও শিখে নিয়েছিল। এবং অবাক কাণ্ড আমাদের এতিমা সেখানেই আটকে থাকেনি। পয়গম্বর বলেছেন জ্ঞানার্জনের জন্য চীনদেশেও যাও তাই মসজিদের ইমামসাহেবের উৎসাহে একমাত্র সেই ধোবিয়াতলার চৌহদ্দির মধ্যে আটকে থাকেনি, বড়ো রাস্তা পার হয়ে মথুর বাবু লেনে চীনা কবরখানার পাশে গিয়ে ভরতি হয় করপোরেশনের বাংলা ইস্কুলে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তল্লাটের হাজার ছয়েক মানুষের মধ্যে একমাত্র আমাদের এতিমাই এরপর কেমন করে কলকাতার এক সিনিয়র হাইমাদ্রাসা থেকে আলেম অর্থাৎ মাধ্যমিক পাস করে ফেলল সে এক আরব্য উপন্যাস।

ইত্যবসরে এতিমার বিশ বছর পার। ইমামসাহেব এর মধ্যে ওর বিয়ের চেষ্টা করেননি এমন নয় কিন্তু এতিমার যা উঁচু নজর! যে ক-টি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তারা নাকি ছিল সকলেই অশ্বজাতীয়, আকৃতিতে বলিষ্ঠ বটে কিন্তু চরিত্রে জঘন্য। এতিমার নজর যে সচ্চরিত্র শান্তিপ্রিয় শশকজাতীয় পুরুষের দিকে, দুর্যোগের মধ্য জন্ম হলেও আমাদের এতিমা যে পদ্মিনী রমণী। অতএব তার সার কথা : আমার বিয়ে সাদির দরকার নেই, আমি আরও পড়ব। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছিলেন উকিলদাদু। আলেম হওয়া সত্ত্বেও এতিমা ফাজিল কোর্সে ভরতি হতে না পেরে যখন ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন সে উকিলদাদুর পাল্লায় পড়েই চলে যায় কলকাতার এক মর্নিং কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পড়তে। সেখান থেকে প্রথম বিভাগে পাস করে সে এখন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ. পরীক্ষার তৃতীয় বর্ষে।

এমন সময়ে (পাক্কা দু-বছর মনের বোঝাপড়ায় রাজযোটক হবার পর, আটাশ বছর বয়সে) তার বিয়ের ফুল ফুটল।

তার দুলহা উকিলদাদুর অগুনতি নাতির সেরা এক রত্ন, নামটি তার কৃষ্ণমহম্মদ। ওই নাম দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রথম সন্তানটিকে পরাধীন ভারতে কয়েক মাসের বেশি বাঁচাতে পারেননি তা জানা সত্ত্বেও এক বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী হরনাথ চক্রবর্তী ওই নামেই তাঁর ছোট ছেলেটিকে দিব্যি ডাগর করে ফেলেছেন। ওর জন্মলগ্নেও ছিল এক দাঙ্গা, ১৯৬১ সালে জব্বলপুরে লেগে গেল হিন্দু-মুসলমানে ধুন্ধুমার, মধ্যপ্রদেশের সেই আগুনে তেতে উঠেছিল কলকাতাও, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর জল ঢেলে সেবার বাঙালিরা অল্পেই রক্ষা পেয়েছিল এবং কমরেড হরনাথ চক্রবর্তী

নবজাত পুত্রের নামকরণে তার সঙ্গে নজরুলী ঐতিহ্য যুক্ত করলেন। আমাদের আজকের বিয়ের সেই পাত্র অধ্যাপক কৃষ্ণমহম্মদ চক্রবর্তী ট্যাংরা হাউজিং এস্টেট থেকে রিকশা চেপে বিয়ে করতে এসেছে ধোবিয়াতলায়। ইমামসাহেবের গৃহে সেজেগুজে বসে আছে তার দুলহিন। বিয়ে হবে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে। ট্যাকসি করে ওরা যাবে সেখানে। ফিরে এসে মজলিস বসবে মীর মেহের আলি লেনের ক্লাবঘরের চত্বরে, উকিলদাদু তার নামকরণ করেছেন ভারততীর্থ। নব্য দ্বিতীয় জন্মে বরদা উকিলের কবিত্বও কত!

বিয়েটার মধ্যে অবশ্য কবিত্ব বা নাটকীয়তা কিছুই নেই। আজকাল এরকম অসবর্ণ বিবাহ হামেশাই হচ্ছে। পাত্র হিন্দু ব্রাহ্মণ, পাত্রী মুসলিম এতে আজকাল আর কেউ চমকায় না। শুধু এটুকু জানতে চায় বিয়ের দরুন পাত্রী হিন্দু হবে, না পাত্র মুসলিম হবে। বিয়ের পর কার কী পালটাবে — এতিমা কি চক্রবর্তী হবে, নাকি কৃষ্ণমহম্মদ হবে হক। বিয়েটা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী আইনসিদ্ধ হবার পর ইসলামী শরাশরিয়ত মোতাবেক মৌলবী ডেকে বিবাহের খোৎবা পাঠ করে মোনাজাত করা হবে, নাকি কুশণ্ডিকার জন্য অগ্নিসংস্কার করে লাজহোম এবং বর-কনেকে সপ্তপদী গমন করানো হবে — এটুকু ঠিকই জানতে চায়।

মাস দেড়েক আগে বিয়েটা আইনসিদ্ধ করার জন্য ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নোটিস দেবার সময় ধোবিয়াতলার মাজার শরীফে বাঁধানো বটগাছটির তলায় বসে পাত্রের পিতা হরনাথ চক্রবর্তী, পাত্রীর ওলি বরদা উকিল এবং মসজিদের ইমামসাহেব এ-সবেরই ফয়সালা করতে বসেছিলেন। তর্ক উঠেছিল এ বিয়েতে ধানদূর্বা-সিঁদুর দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে বর-কনে বরণ করা হবে, নাকি মহাফিল বসিয়ে দেনমোহর বেঁধে ওলি-উকিলসাক্ষী মেনে ইজাব-কবুল করিয়ে নেকাহ করানো হবে। এ নিয়ে এঁরা বেশি কথা চালাচালি করতে পারেননি কারণ খোদ পাত্র-পাত্রীও এঁদের সামনেই বসে অনবরত শাসিয়ে যাচ্ছিল এসব নিয়ে কোড়বাই করলে তারা দুজনই গির্জায় গিয়ে বাইবেল হাতে নিয়ে খ্রীস্টান হয়ে যাবে। এবং সে-ব্যাপারে ওদের উসকাচ্ছিলেন বিবিবাগানের আর এক বারোয়ারি দাদু ইমানুয়েল বিশ্বাস যাঁর আশ্রয়ে থেকেই বরদাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম প্রায় আট হাজার জাতখোয়ানো মানুষের উকিলদাদুতে পরিণত হয়ে জাতের নামে জলাঞ্জলি দিতে পেরেছিলেন। তিনিও উকিল, কিন্তু গোটা তল্লাটে তিনি মোটাদাদু নামে পরিচিত। মোটাদাদুর ধ্যানজ্ঞান হল মানুষকে খ্রীস্টান করা কিন্তু দুঃখের বিষয় দশ বছরের চেষ্টাতেও তিনি তাঁর আশ্রিত এবং পরম বন্ধু বরদাপ্রসন্নকেও আজও পর্যন্ত খ্রীস্টান বানাতে পারলেন না। 'তুই আমারে খেস্টান বানাবি কি, হেয়ার আগেই আমি তোরে হিন্দু বানামু'— এই চ্যালেঞ্জটি বরদা উকিল দিয়ে রেখেছেন বন্ধু ইমানুয়েল বিশ্বাসকে। হিন্দু-মুসলমানের এই দড়ি টানাটানিতে পাছে শেষে উড়নদাস একটা খ্রীস্টান জিতে যায় সেই ভয়ে ঠিক হয়েছিল বিয়েটা রেজিস্ট্রি হবার পর পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষের ধর্মীয় ব্যাপারটা উহ্য রেখে শুধু একটু গানজিন হবে, একটু মিষ্টিমুখ করানো হবে ক্লাবের সামনে চেয়ার পেতে বসে। জনাপঞ্চাশেক আত্মীয়বন্ধুকে বলা হবে। এতিমার এক বন্ধু নজরুলের গজল গাইবে, কৃষ্ণমহম্মদের বোন আন্তর্জাতিক গাইবে

আর দু-তিনটে বন্ধু গাইবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান। রীতিমতো একটা ফাংশান করা হবে। প্রোগ্রামটা করে দিয়েছে স্বয়ং এতিমা, এ নিয়ে কৃষ্ণ কিছু অদলবদল করতে চেয়েছিল বলে এতিমা বহুলোক সামনে ছিল বলে ওকে তখনকার মতো রেহাই দিয়েছিল বটে তবে তার স্থির শীতল চাহনি দেখে কৃষ্ণ বুঝে গিয়েছিল এটা আপাতত তোলা থাকল, যথাসময়ে এর শাস্তি তাকে পেতে হবে।

এ প্রসঙ্গো প্রকাশ থাকে যে এতিমা নরনারীর সমানাধিকারে বিশ্বাসী নয়। কৃষ্ণকে সে বলেই দিয়েছে : অর্ধনারীশ্বর-টারিশ্বর আমি মানি না, ও তো হিন্দু কনসেপশন। সংস্কৃত দিয়ে আমাকে চিতপটাং করতে পারবে না। এনাফ অব ইট। বিয়ের পরও আমি হিঁদু হব না, তাই বলে তোমাকেও মুসলিম হতে দিচ্ছিনে। আমরা যে যা আছি থাকব। বিয়ের পর তোমার নামে যেমন তুমি হক বসাবে না, আমিও চক্রবর্তী লিখতে যাচ্ছি না। তুমি যেমন কৃষ্ণমহম্মদ চক্রবর্তী থেকে যাচ্ছ আমিও তেমনি এতিমা হকই থাকব বুঝলে হাঁদু?

ছাত্রী এতিমা আড়ালে তার শিক্ষককে হাঁদু বলে ডাকতে শুরু করেছে তাদের মধ্যে হামদর্দি হয়ে যাবার পরেই, তাই বলে কৃষ্ণ নিজেকে হাঁদা বলে মনে করে না। শব্দটা হিন্দু শব্দের অর্ধতৎসম রূপ কি না এ প্রশ্ন তোলায় বেচারা এতিমার হাতে একখানা রামচিমটি খেয়েছে। বিয়ের পর এতিমা পাছে তাকে হাঁদুই বানিয়ে ফেলে সেই কারণেই সে এতিমাকে অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বটা বোঝাতে চেয়েছিল, বলতে চেয়েচিল বর্তমান দুনিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর পাল্লা সমান সমান, কেউ কাউকে দাবিয়ে রাখবে এটা আর চলবে না।

চলবে। এতিমা অমোঘ কণ্ঠে রায় দিয়েছিল, বিয়ের পর ঘরে আমি সেভেনটি ফাইব তুমি টোয়েন্টি ফাইব, আর বাইরে জাস্ট দ্য রিভার্স। সর্বদা মনে রাখবে। নয়তো পিটি খাবে।

এই মারপিট ব্যাপারটা নিয়েও দুজনের মধ্যে একেবারেই বনিবনা নেই। এতিমা যেমন মারকুটে কৃষ্ণ তেমনই শান্তিপ্রিয়। একেবারেই শশকতুল্য। এতিমার হাতে অনবরত কলসীর কানা খাওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ তাকে এখনও প্রেম দিযে যাচ্ছে। তবে সে যে পুরোই চৈতন্য বা গান্ধী নয় সেটা কৃষ্ণ এতিমাকে স্মরণে রাখতে বলেছে। বলেছে, বেশি ডাভাবাজি করলে তোমাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। এতে এতিমা চোখ ছোটো এবং ঠোঁট সরু করে কৃষ্ণের থুতনিটা ধরে নেড়ে দিয়েছিল।

এই যে ওরা দুজনে দুরকম এ নিয়ে উকিলদাদুর খুব চিন্তা। অনেকদিন তিনি দুজনকে নিজের দুপাশে বসিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন শান্তিপূর্ণ জীবনের মহিমা। নিজের জীবনের দৃষ্টান্তই তিনি দিয়ে থাকেন। সারাজীবন তিনি কোনো কিছুর সঙ্গো আপস করতে পারলেন না বলে বউ-ছেলে-মেয়ের ভরা সংসার থেকে ছিটকে গেছেন, বুড়ো বয়সে তাঁকে কাটাতে হচ্ছে বন্ধুগৃহে (কথাটা অর্ধসত্য কারণ ছেলে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে বহুবার এসেছে, তিনিই আর যাননি কারণ ট্যাংরার এরা সকলেই তাঁকে সত্যিই দাদু বলে মানে)। কৃষ্ণকে তিনি ওকালতি বুদ্ধিতে চাঙা করতে চেয়েছেন এই বলে : কেষ্ট রে, তুই এত সাবমিসিভ ক্যান। একটু ফোঁসফাস করিস, নাইলে সামলাইতে পারবি না। শাদির পয়লা রাত্তিরেই বিলাইয়ের কল্লাডারে কাটোনের হিস্ট্রিটা

জানো তো? দেরি করলে মরবি।

ওটা হিস্ট্রি না দাদু মিথ। ইতিহাসের অধ্যাপক কৃষ্ণমহম্মদ চক্রবর্তী বিজ্ঞের মতো বলেছিল, ওসব এখন অচল।

তোর নসিবে দুঃখ আছে — বলেছিলেন বরদা উকিল।

কৃষ্ণের জীবনটা নিরাপদে রাখবার বাসনায় এরপর বরদা উকিল চেষ্টা চালিয়েছিলেন এতিমাকে একটু শান্তশিষ্ট করবার। একদিন নিজের চেরা বাঁশের মতো গলাটাকে যথাসম্ভব কোমল করে বোঝাচ্ছিলেন, মনু, তুই মাইয়া ভালোই, তয় একটা কথা। তোর যে এত হাত চলে এইটা তোর দোষ না, তুই তো আসলে মোছলমান, মাইরপিটটা তোর রক্তে আছে। তোর উচিত বুদ্ধি দিয়া তোর এই ইন্দ্রিয়ডারে এট্টু দমন করা। আমার অবস্থাখান দ্যাখ, আমি ক্রোধ রিপুটারে দমন করতে পারি নাই বলইয়া সংসার আমারে লাইথাইয়া ফালাইয়া দিছে। ক্রোধের কুফল যখন বোঝলাম, তখনে টু লেইট! তোরা আমার জীবন দেইখ্যা শিখবি। হেই লইগ্যাই তো আমি এই পচা খালের পাশে পড়ইয়া রইছি। ভুল করিস না রে মনু, পচা খালে পড়বি।

যে খালেই পড়ি — এতিমা দাদুর পিঠে কিল মেরে মেরে বাত কমানোর দাওয়াই দিতে দিতে বলেছিল, তোমার আহ্লাদী নাতিটাকে নিয়েই পড়ব। ছেড়ে দেব ভেবেছ নাকি!

আর কেষ্ট যদি তোরে ছাড়ইয়া দেয়? — দাদু ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

সে চেষ্টাও করতে পারে। হিন্দু তো!

হিন্দু রে তোর বিশ্বাস নাই? — দাদু হতভম্ব।

হরগিজ নহি — এতিমার সাফ জবাব, মুখে এক মনেঅন্য। ইকোয়াল টু হিন্দুত্ব।

আর মোছলমানত্বের ইকোয়েশনটা কী।

মুখে পেটো হাতে পিট্টি। যা হবে ফটাফট। সামনাসামনি।

থাউক, দরকার নাই।

এতিমা কিল থামিয়ে ভুরুতে প্রশ্নচিহ্ন আঁকতেই দাদু খুবই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, কেষ্টার লগে তোর শাদি হইয়া দরকার নাই। রন্ধ্রগত শনি!

তোমাদের শনি-ফনি আমার হাতে অ্যায়সা ঝাড় খাবে আমাদের পেছনে লাগতে এলে — বলে এতিমা রাগ করে উকিলদাদুকেই একটা রামচিমটি লাগিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল কেষ্টকে সে রেহাই দেবে না।

ফলে বরদা উকিলকে এগোতেই হয়েছে, এই বিষম বিবাহের বিধিব্যবস্থায়। তাঁরই তো দায়। তিনিই এতিমার ওলি। তাঁকে যেতে হয়েছে, ধোবিয়াতলা মসজিদের ইমামসাহেবের কাছে হিন্দুর সঙ্গে বিবাহে তল্লাটের মুসলিম সমাজের ছাড়পত্র আদায় করতে। যেতে হয়েছে ট্যাংরা হাউজিং এস্টেটে কৃষ্ণের বাবা হরনাথ চক্রবর্তীর কাছে অনাথা এতিমাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করবার জন্য। আসলে এ নিয়ে কোনো পক্ষ থেকেই কোনো বাধা আসেনি। কারণ বিয়ের পাত্র-পাত্রীই সবাইকে বুঝতে দিয়েছে তারা বিয়ে করছেই। কোনো বাধা সৃষ্টি না হবার পক্ষে আরেকটি কারণ হল ধোবিয়াতলা মুসলিম ক্যাম্প এলাকার অদ্ভুত ইতিহাস।

ব্রিটিশের উশকানো কোনো দাঙ্গায় নয়, কিন্তু তাদেরই রোপণ করা বিষবৃক্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষক্রিয়া ১৯৬৪ সালের গোড়ায় ফের পৈশাচিক মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল। তার দিন কয়েক আগে কাশ্মীরে শ্রীনগরের হজরত বাল মসজিদে রক্ষিত পয়গম্বর মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি যায়, চরম উত্তেজনার মধ্যে আট-ন দিন বাদেই চুলের বাক্সটির উদ্ধারও হয় কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের খুলনা আর যশোরে ওই নিয়েই শুরু হয়েছিল হিন্দুনিধন, লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রাণ নিয়ে এবং অগণিত নারী ধর্ষিত ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে আসতে থাকে পশ্চিমবঙ্গে। প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের উপর মার শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ সমেত ভারতের যে ক-টি জায়গায় সেগুলির মধ্যে কলকাতাও রেহাই পায়নি।

পূর্বকলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বহু মানুষ তখন পালিয়ে এসে জান বাঁচিয়েছিল ট্যাংরার কিলখানায় যেখানে জবাই হয় খাসি আর গোরুবলদমোষ।

দাঙ্গার আগুন যখন নিভল তখন আশ্রিতদের অনেকেরই ফিরে যাওয়ার মতো কোনো আস্তানার আর অস্তিত্বই ছিল না। পুড়ে ছাই সব। সরকার তখন বানিয়ে দিয়েছিল কিছু ঝুপড়ি যার নাম দাঁড়িয়ে যায় মুসলিম রিলিফ ক্যাম্প। ক্যানাল সাউথ রোডের পচা খাল দিয়ে জল না সরলেও ওই ঘটনার পর থেকে অজস্র ভেসে-যাওয়া মানুষ এসে জমেছে এই ক্যাম্পের চারপাশে— যদিও তাদের সকলেই মুসলিম নয়। দুই দশকের বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজতে একসঙ্গে জমাট বেঁধে গিয়ে এরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেখান পেটের দায়ে এদের ধর্মীয় ঝান্ডার ডান্ডাটা খসে গেছে। খসেছে এমনভাবে যে ওখানকার মাজার শরীফ, মাদ্রাসা, ভাদ্র মাসে পীরবাবার উরস আর মজলিস, কার্তিক মাসে কালীপূজা, শিবমন্দির, গান্ধী শিক্ষাসদন, ক্লাবঘর ইত্যাদি সবকিছুই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত তত্ত্বাবধানে চলে। পেটের দায় ওদের এক করে দিয়েছে, ধর্মের দায় থেকে যেন ওরা বেঁচেই গেছে। এমনই পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এতিমার মতো একটি মেয়েকে।

কৃষ্ণর মতো একটি ছেলে তৈরি হয়েছে ভিন্ন পরিবেশে। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী হরনাথ চক্রবর্তীর স্বপ্নের ফসল তাঁর এই ছেলেটি। ধর্ম ব্যাপারটা ওর পায়ে শ্যাওলা হয়ে অতলে তলিয়ে দেবার ফাঁদ হয়ে দেখা দেয়নি। তাই কৃষ্ণর কাছে এতিমা শুধু এতিমা। তবে কিনা ও মারকুটে নাহলে ভালো হত। তা কী আর করা যাবে, চাঁদেও কলঙ্ক আছে।

তো আজ সেই বিয়ে ওদের হয়ে গেল।

আজ বুধবার, ১৯৯২ সালের ৯ ডিসেম্বর।

দুখানা ট্যাক্সি লেগেছে বর-কনেকে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন অফিসে যেতে-আসতে। আইনের বুলি আউড়ে সইসাবুদের মেলবন্ধনে 'ক' মিনিটই বা লাগল দুটি মানুষকে এক ভাগ্যসূত্রে বেঁধে দিতে। এখন বলো হে এরা কে হিন্দু কে মুসলিম। ফিরে আসার সময় ট্যাক্সির মধ্যে বর-কনের কান ধরে প্রশ্নটা করেছিলেন মোটাদাদু, এখন বল দেখি কে কোনটা ভাঙবি। এমনি হাসি-মশকরা কম হয়নি এ বিয়েতে। তবু উকিলদাদুর মুখটা গোমড়া কেননা দেড় হাজার টাকা দিয়ে বেনারসী কিনে দেওয়া সত্ত্বেও এতিমা সেটি

পারেনি। বরদা উকিল নিজের চারটি মেয়ের কারুরই জন্য কোনোরকম কেনাকাটা, করেননি, মনের সেই দুঃখ মেটাতে চেয়েছিলেন এই কুড়িয়ে-পাওয়া নাতনিটিকে সাজিয়ে। কিন্তু যেমন এতিমা তেমনি কৃষ্ণ। সাজগোজ দেখলে কে বুঝবে এরা বিয়ে করতে এসেছে। বরং ওদের বন্ধুরা কেমন চটকদার পোশাকে এসেছে। মোটাদাদুও সেজেছেন কম না। বন্ধু বরদার গায়েও যে দামি শালটা, সেও তো তাঁরই।

কিন্তু ফিরে আসার সময় শান্তিমিছিল আর সম্প্রীতির স্লোগান শুনতে শুনতে সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেছে। বুঝেছে সবাই জল বহুদূর গড়িয়েছে।

তবু বর-কনের জেদেই গানের অনুষ্ঠান বাতিল হয়নি। পঞ্চাশখানা ভেনেস্তা চেয়ার পাতা হয়েছে ক্লাবঘরটির কাছে। বর-কনেই ঘুরে ঘুরে তদারক করছে গানবাজনার। বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের উকিলদাদু বসে আছেন ক্লাবের মধ্যে একটি চেয়ারে, তাঁর থমথমে মুখটার কাছে মোটাদাদু নিজেই নিজের কপালে অডিকোলন ঘষতে ঘষতে আশ্বাস দিচ্ছেন, আরে এত চিন্তার কী আছে, এখানে কেউ কিছু করবে না। মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরিচে হাবিজাবি হয়েছে, ওরা তো ওইরকমই। ভীষণ কম্যুনাল। এখানে তো ওইসব নেই। জানিস তো তুই। চিন্তা করা তোর একটা রোগ।

দাঙ্গার ভয়ে সরকার রাজ্য জুড়ে বন্‌ধ ডেকে দিয়েছিল সোমবার। মঙ্গলবার বন্‌ধ গেল দেশ জুড়ে। সেই সঙ্গে লাগাতার কারফিউ। রাস্তায় কাউকে দেখামাত্র গুলির হুমকি, রাস্তায় রাস্তায় আধা-সামরিক বাহিনীর টহল। কলকাতার গার্ডেনরিচ মেটিয়াবুরুজে সোমবার সকাল থেকেই বস্তিতে বস্তিতে আগুন, বেছে বেছে দোকানপাট ভাঙচুর আর লুঠপাট, বোমাবাজি গুলিগোলা আর কাঁদানে গ্যাস, সেই মওকায় পুরনো শত্রুতার শোধ তুলতে যত্রতত্র গোষ্ঠীসংঘর্ষ আর খুনোখুনি এবং সবকিছু ছাপিয়ে মৌলবাদী বোতলের ছিপি খুলে গুজব দৈত্যের নখদন্তবিস্তারে গোটা মহানগরীর আতঙ্কিত পরিস্থিতির মধ্যে বেচারি এতিমা আর কৃষ্ণের বিয়েটা বানচাল হবারই উপক্রম হয়েছিল। বুধবার সকালেই অবশ্য কারফিউ শিথিলের খবর মিলেছে। মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরিচ বাদে মহানগরীর অন্যত্র সকাল ছ-টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত কারফিউ থাকবে না। বাস ট্রেনও চলবে আবার।

বিয়ের তারিখটা ঠিক হয়েছিল ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় মসজিদ ভাঙার মাসখানেক আগে। বরদা উকিল পরিস্থিতি বুঝে বিয়েটা পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বর-কনেই যে বেঁকে বসল। ওদের বক্তব্য সব কিছু বন্ধ করে দাও বিয়েটা বাদে। আমরা আর আলাদা থাকব না। তখন ঠিক হল অযোধ্যার বাবরি মসজিদ আর রামলালাকে ঘিরে তাণ্ডব শুরু হলে ওরা রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়েই বিয়েটা সেরে আসবে, প্রীতিসম্মেলন পরে হবে। কিন্তু রবিবার সন্ধে থেকেই শোনা গেল অযোধ্যায় মসজিদ ধূলিসাৎ। আর যাবে কোথায়, মৌলবাদী জতুগৃহের সে-আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, ভারতে পাকিস্তানে বাংলাদেশে, মন্দির-মসজিদ আক্রমণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এমনি পরিস্থিতিতে কি গানবাজনা জমে! জরদুপুরে কি জলসা হয়! বিকেল তিনটেয় একটু মিষ্টিমুখ আর চা, তারপর দু-চারটে গান। ভাঙা হাটে! অথচ এখানে তো কোনো হুজ্জুতই নেই। হিন্দুমুসলিম ভাই-ভাই। এখানে তো আর কোনোদিন কেউ

কারো গায়ে হাত দেবে না ঘর পোড়াবে না মন্দির-মসজিদ ভাঙবে না। এই ধোবিয়াতলায় এখন হাজার পাঁচেক মানুষ। তাদের মধ্যে হিন্দু শ-পাঁচেক, খ্রীস্টান জনা পঞ্চাশেক, বাদবাকি মুসলিম। তো রববারের অযোধ্যাকাণ্ডের ধাক্কায় ওদেরও চক্ষুস্থির হয়নি এমন নয়, কিন্তু ওরা তো ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়েছে। কালো পতাকা অবশ্য কয়েক জায়গায় তুলতেই হয়েছে মসজিদ ভাঙার শোকে, শোকমিছিল তল্লাটের মধ্যে ঘুরছে গণতন্ত্রকে দুয়ো দিয়ে। ব্যস, এর চেয়ে বেশি কিছু তো এখানে হবে না। আমরা এখানে ভাই-ভাই। এখানে রামও আছে রহিমও আছে। ইমান আছে, ইনসাফও আছে। এখানে ভয়টা কীসের। করোনা তোমরা জলসা আর মিষ্টিমুখ, ওছাড়া আবার বিয়ে কী! তবে হ্যাঁ, এসব জমত সন্ধের পর। কিন্তু সন্ধের পর এখন তো এদেশে কালো জিন আসতে পারে, আকাশ থেকে নেমে আসতে পারে শয়তানের ধুঁয়াধার। তবে আল্লাহ তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন পাক মাটি দিয়ে একবিন্দু নাপাক পানি থেকে। শয়তানের হাতে মরতে তারা দুনিয়ায় আসেনি। গাও তোমরা গাও। নজরুল গাও রবিঠাকুর গাও আনন্দ করে নাও। তবে আজ তোমরা রাত্রে আলাদা থাকবে। এটুকু মেনে চলতে হবে। কাল রাত্রে একত্র হবে। ফুলশয্যা হবে। নবদম্পতির সুখশান্তির জন্য দুনিয়ার লোক মোনাজাত করবে।

নিমন্ত্রিতরা অনেকেই আসেনি। বরদা উকিলের ছেলেমেয়েরা সেধে নিমন্ত্রণ নিয়েছিল তারাও আসেনি, দূরে দূরে থাকে তো, এই পরিস্থিতিতে ঘর থেকেই বেরোতে পারেনি হয়তো। যারা এসেছিল তারাও চারটে বাজার আগেই যে যার আস্তানায় পালিয়ে গেছে।

আর বর-কনে? রাত্রে তারা আজ একত্র না থাকতে রাজি হয়েছে। এতিমা থাকবে ইমামসাহেবের গৃহে, কৃষ্ণ মোটাদাদু-উকিলদাদুর বাড়িতে। কিন্তু দুজনেই ঠিক করেছে কারফিউর মধ্যেই বিবিবাগানে আজ সন্ধ্যায় যে মিটিং বসবে রাজনীতির পার্টিকর্মীদের সেখানে দুজনেই যাবে। পার্টির কাজ ওরা দুজনেই করে, সুতরাং এটা ঠেকানো যায়নি।

পার্টিমিটিং হলেও ওদের নিয়েই আসর বেশ জমে উঠেছিল। বন্ধুরা কত ছবিও তুলে ফেলল ওদের। গানটানও হল। থানার দারোগা এসে ধমকি দেওয়াতে অবশ্য ওদের রাস্তা থেকে উঠে আসতে হয়েছে একটা বাড়ির দাওয়ায়।

আজই বিয়ে হয়েছে বলে বর-কনেকে দেখবার জন্য আশেপাশের ঝুপড়িগুলি থেকে ওদের দেখবার জন্যও লোক জমেছিল কম না। মন্দির-মসজিদের লড়াইতে দেশ জুড়ে যে আতঙ্কের ছায়া সকলের মনের মধ্যে জুড়ে বসেছে, ওদের চোখের সামনে দেখে যেন সেটা কাটিয়ে ওঠা যায়। বর হিন্দু ঘরের ছেলে, কী সুন্দর দেখতে, কত বিদ্বান, কলেজে পড়ায়, সে কিনা বিয়ে করল এতিমার মতো অনাথা এক মুসলিম মেয়েকে। ভালোবাসার বিয়ে। ভালবাসা যদি এত ভালো তবে মানুষ খামোকা খুনোখুনি করে কেন। বিবিবাগানের মুসলিম মেয়েরা এতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে এইসব বলাবলি করতে করতে কত স্বপ্নই দেখল!

এতিমার মুখে আজ খই ফুটছে। চুপচাপ থাকার মেয়ে সে কোনোদিনই নয়, তবু আজ যেন এতিমা হাওয়ায় ভাসছে! এ পাড়ার মস্তানদের মধ্যে বদ রক্ত যাদের গায়ে

বেশি তাদের জনে জনে ও জেরা করছে, কী রে, কী মতলব ভাঁজছিস মনে মনে, অ্যাকশন-ট্যাকশন করে বসবি না তো? মালমসল্লা সব বের করে ফেলবি না তো!

সাইকেল ভ্যানচালক হাসিমভাই বলল, তোর সাদিটা যদি না হত তবে একটু দেখে নিতাম রে কার গায়ে কত খুন। প্লাস্টিক কারখানায় গালাই করে মহম্মদ ইউসুফ, কথায় কথায় সে কোরান হাদিস কোট করতে পারে, সে বলে, কে কী আগ কাঁহাসে আনবে, ওদের আগ দোজখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগের বেশি বৈ নয়! আর মীর মেহের আলি লেনে সাট্টার পেন্সিলার এবং চুন্নুর ঠেকের ওস্তাদ কানা খলসে টাকরায় শব্দ করে বলল, বিলা ছলাস না বে এতমা, আজ তু মালাজোড়া করলি, আজ হামার তল্লাটে কোঈ আনসান গুণ্ডাগন্দি করল তো হম উসকো ঠোঙা পরিয়ে দেবে। সব স্লা ঠল্লা (পুলিশ অফিসার) এই হমার টিন মেঁ (পকেটে) ইয়ার!

তোকে কে টিনে পোরে তার ঠিক নেই, তাই না গোৎমাভাই—চোখে ঝিলিক মেরে বলল এতিমা। গোৎমাভাই ও তল্লাটের পার্টির জোনাল কমিটির মেম্বার, ওর পকেটে সর্বদা লমপো অর্থাৎ পিস্তল মজুত, ওর কথাই এখানে আইন। ওর আসল নাম গৌতম ভুঁইয়া। রাইটার্সে মন্ত্রীদের ঘরে ঢুকতে কমরেড গোৎমার স্লিপ পাঠাতে হয় না। তো সেই গোৎমাভাই, তার ডান হাত বাঁ হাত শীতল দাস আর বংশী মাহাতো মুখে কুলুপ এঁটে আছে কেন সেটা ভালো না লাগায় এতিমা ওদের দিকে তাকিয়ে প্রথমে খুব একচোট হাসল, শেষে আহ্লাদি সুরে বলল, এসব ঝামেলাটামেলা আমরা বুঝি না গোৎমাভাই, জমির পাট্টা পাট্টা করে ক্যাম্পের সব্বাই তো উথাম-আথাম করে হাড় জ্বালিয়ে দিলে আমার — এবার ফয়সালা করে দাও। কী গো, মুখ খুলছ না কেন। এবার আমাকে সঙ্গো নে যাবে, আমি এমন হিহিহি মুখ ছোটাব না, হোসপাইপের মতো, ভিজিয়ে একেবারে জাব্বাজোব্বা করে দেব তোমার মিনিস্টারকে। বলে এতিমা নিজেই হেসে কুটিপাটি।

ওর হাসিটাকে জোরদার করতে সেখানে আরও কয়েকটি প্রাণীকে উৎসাহিত দেখা গেলেও যাদের মুখে হাসি দেখলে ওদের এতটা হাসতে হত না তারা কিন্তু চড়ুকে হাসিতে ওদের দুর্ভাবনা বাড়িয়ে দিল। দুভার্বনা এইজন্যে যে গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজে দুদিন ধরে যে অগ্নিকাণ্ডের কথা ওদের কানে এসেছে তাতে ওদের সন্দেহ এ তো দাঙ্গার আগুন নয়, এ যে বাড়িওয়ালাদের আগুন। ওই যে একটা শব্দ এখন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়—প্রোমোটার কর্তীর মতো এদেশের সর্বত্র এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, গগনবিহারী, সুধাধবলিত অ্যাপার্টমেন্টের স্বর্ণচ্ছটা বিকিরণের জন্য বস্তি-হাটবাজার-দোকানপাট সব আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। সেই আগুন এখানেও না আসে!

এখানে মানে ধোবিয়াতলা মুসলিম ক্যাম্পে। ওরা যে ঘরপোড়া গরু! সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেয়েছে গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজের গত দুদিনের আগুনে এখানেও 'ওরা' হাত বাড়াবে না তো? ধোবিয়াতলার পনের বিঘে জমির ওপর ওদের যে নজর পড়েছে সে কি আর ওরা টের পেয়ে যায়নি! তলে তলে ওরা সরকারি হাতগুলিকেও উলটে দেয়নি তো? নতুবা এত গড়িমসি কেন? এ জমি তো এখন সরকারি খাসতালুক। আদালতের

ডিক্রি করেই বেরিয়ে গেছে এখান থেকে ওই মানুষগুলিকে আর উচ্ছেদ করা চলবে না। এখান থেকে হটাবে তো অন্য কোথাও পাকা ঠিকানার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমরা রাস্তার কুকুর নই। তোমরাই আমাদের এখানে বসিয়েছ ৬৪-র দাঙ্গার পর। তোমরা আমাদের ভোট নিয়েছ। তা ভোট আমরা দেব। আমাদের হাতে জমির পাট্টা দাও আমরা তোমাদের রাজা করে রাখব। আর টালবাহানা কোরো না বাপ। চারদিকে শেয়ালশকুনরা বলে বেড়াচ্ছে এ জমির দর নাকি এখন তিন কোটি টাকা। গাড়ি চেপে 'ওরা' নাকি এ জমি দেখেও গেছে। আমাদের নাকি তোমরা ভাগাড়ে ফেলবার তাল করেছ? না বাবু, এখন আর এসব চলবে না। আমরা নড়ব না এখান থেকে। আমরা এখানে তিরিশ বচ্ছর ধরে আছি। এ জমিতে আমাদের হক আছে। আর হোক না ঝুপড়ি-বাগাচি সেই আমাদের বাড়িঘর। আমরা এ মাটি ছাড়ব না বাবু। বহুতল বাড়ির লোভে আমাদের ঘরে তোমরা আগুন দিও না। আর কেই বা দেবে—আমরা মুসলিম নই, হিন্দু নই, খ্রীস্টান নই, আমরা এখানে সবাই ভাই-বহিন। এর নাম ধোবিয়াতলা, এখানে আমি খাব তো তুমি ভুখা থাকবে না। আমরা এখানে এক পরিবার। এখানে কেউ আগুন দেবে না।

যাও জামাইদাদা, এখন তুমি ঘরে যাও। আজ তোমার সাদির রাত। সোহাগ রাত। তুমি আমাদের মেয়েকে উদ্ধার করেছ। ইজাব-কবুল হয়ে গেল এক মজলিসেই। আল্লাহ্-পাক তোমাদের দোয়া করবেন। তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের নজর থাকবে। বিছমিল্লাহির রাহমানির রহিম— সমস্ত প্রশংসার মালিক সেই মহান্ আল্লাহ্। আর তাঁর প্রেরিত রসুলের উদ্দেশে হাজার সালাম। হে রসুল, মোমেনদের এই সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

ইমামের বিবিসাহেবা রসিদাবিবির কাছে কৃষ্ণ আর এতিমা দুজনেই জবর বকুনি খেল আজ এই হুজ্জোতির মধ্যে কারফিউ সত্ত্বেও এত রাত অব্দি এইসব করে বেড়ানোর জন্য। ঠিক কথা এখানে কোনো গোলমাল নেই, এখানে ওসব হবেই বা কেন, তবু তোমাদের আজ সাদির রাত, আজ তোমরা যে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ, শরিয়তি নির্দেশে এটা বেদআৎ। তোমাদের হিন্দুমতে এসব চলে কি না তা আমি উকিলদাদুকে পুছ করব। আমি জানি এসব চলে না। এখন যাও, চুপচাপ ঘরে গিয়ে নাস্তাপানি করে নিদ যাও, কাল সকাল হোক, তারপর ফের লেকচার দিয়ো।

এইসব বকুনি শুনতে শুনতে কৃষ্ণ এতিমার একটা চোরাকিল খেয়ে রাত নটা নাগাদ তার আস্তানা মোটাদাদু আর উকিলদাদুর বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়ার আগে সেখানেও প্রচুর শাস্ত্রীয় উপদেশ এবং গালাগালি শুনল।

আগুনের ছোঁয়া লাগল ঘণ্টাখানেক বাদেই। শুরু হল বোমাবাজি দিয়ে, সঙ্গে নরকের চিৎকার। দশ দিক থেকে যেন কালো জিনেরা ঢেকে ফেলল গোটা চত্বরটাকে। বৈশালী সিনেমাটার দিক থেকে শুরু হয়েছে এই প্রেতনৃত্য। অন্য অনেকের সঙ্গে এতিমাও ছুটে গিয়ে দেখছিল সেই দৃশ্য পুকুরধারে মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে। জাগ্রত পীরের মাজার। সৈয়দ জালালুদ্দিন শাহ কাদিরী এবং দাতা মিস্কিন আলি কাদরীর মাজার। এখানে রাখা আছে পবিত্র কোরান শরীফ। করুণাময় খোদাওয়ান্দ করিম

মানুষকে হেদায়েত্ত করবার জন্য কত নবী পয়গম্বর গওস-কুতুবদের পাঠিয়ে দুনিয়ার প্রতি এহসান করেছেন। যারা তাঁর হুকুম মেনে চলবে তাদের জন্য ইন্তেজাম আছে আটটি বেহেশত, আর যারা হুকুম বরবাদ করবে তাদের জন্য সাতটি দোজখ— সেখানে আছে ভীষণ আগুন আর খুন শুকিয়ে নেওয়া ঠান্ডা। কারা ছুঁড়ছে এত বোমা, কাদের ওই শাসানি? সব তো শান্ত ছিল, তবে? একটু আগেও তো পুলিস এসে বলে গেল যে যার ঘরে যাও। বোমাবাজিতে গোটা তল্লাটটা যে জাহান্নম বানিয়ে দিল!

এতিমা তখনই ছুটে যেতে চেয়েছিল বিবিবাগানে। কৃষ্ণ যে সেখানে। সেখানেও কিছু হচ্ছে কিনা কে জানে। কিন্তু মেয়েরা তাকে জাপটে ধরে রেখেছে। এই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যাবি তুই? তোর দুলহাকে রক্ষা করবার মতো লোক কি সেখানে নেই? এখন শান্ত থাক। তবে লড়তে হবে যদি কেউ আসে। ছেলেরা তো আছে। তারাও জবাব দিচ্ছে কিছু। তাতে মনে হয় কাজ হচ্ছে। ওদিকের বোমাবাজি কমছে। তবু আতঙ্ক কমছে না। শীতের কামড়টাও আজ খুব। হেমন্তের শেষ, কিন্তু আজ যেন মাঘ মাসের শীত। ভয়ে সবাই অস্থির হয়ে পড়েছে। সবাই বলেছিল এখানে কিছু হবে না। এটা গার্ডেনরিচ নয় মেটিয়াবুরুজ নয়, এখানে আমরা কোনো দাঙ্গা হতে দেব না। কিন্তু তাহলে এসব কী হচ্ছে। পুলিস কোথায় মিলিটারি কী করছে পার্টির ক্যাডাররা আছে তো।

নরক গুলজার বিবিবাগানকে ঘিরেও তখন হচ্ছে। ময়লা খালের দিক থেকে দৈত্যদানোর অট্টরোল ছুটে আসছে অন্ধকার ছিঁড়েফুঁড়ে। তা শুনে কি কেউ কম্বলের তলায় গুটিসুটি হয়ে থাকতে পারে। হাতে লোহার ডাণ্ডা কাঠের লাঠি যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই রাস্তায় ছুটে গেছে। পটারি রোড আর রেললাইনের দিকে জড়ো হয়েছে যেন একদঙ্গল কালো জিন। এগিয়ে আসছে তারা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। খুচরো সকেট বোমার মাঝে মাঝে শিরদাঁড়া কাঁপিয়ে দেওয়া মলোটভ ককটেলও ফাটছে। এ তো রীতিমতো যুদ্ধঘোষণা! তা মালমসলা লাড্ডু চাককা আমাদেরও কিছু আছে বইকি! রাখতে হয়! বিবিবাগানের মরদরা তো দাঁড়িয়ে মার খাবে না। লড়াই চাও তো জান কবুল। কিন্তু আক্রমণে আসছে কারা? শীতল দাস আর বংশী মাহাতোর হাঁক শুনতে পাই যেন! ওরা যে একটু আগেই মিটিং করে গেল আমাদের সঙ্গে। তখন কি তাহলে দেখতে এসেছিল আমরা সেজে আছি কি না। আরে বেইমান, এই তোদের রিস্তা!

সুতরাং বেঙ্গল পটারির দিকে থেকে ছোঁড়া পেটো ডিমা গেনডার জবাবে বিবিবাগান থেকে গেল কিছু লাড্ডু-চাক্কা, কিছু গুলগুলিয়া কদমা! বুঝে নাও। তৈরি আছি আমরা। খেটখেলগুলি একটু আগেও ধমকি দিতে এসেছিল কারফিউর মধ্যে আমরা রাস্তায় মিটিং করছি কেন, তো এখন তোরা গেলি কোথায়? শালা গোরমেন্ট টুপি, তোরা কি কণ্ডে আচিস! খোচর শালা!

কৃষ্ণমহম্মদকে নিয়ে তখন উকিলদাদু আর মোটাদাদুর চেঁচামেচি তুঙ্গে। কৃষ্ণ ছুটে যেতে চেয়েছিল রাস্তায় পরিস্থিতিটা বুঝতে। এতিমার স্বভাব সে জানে, সে যদি বেরিয়ে পড়ে থাকে তাহলে কৃষ্ণের তো উচিত ওকে আগলানো। ওকে রক্ষা করা এখন তো তার নৈতিক কর্তব্য। এখানে আক্রমণ করতে এল কারা? হিন্দুরা? আত্মরক্ষার জন্য আমি কি বলব আমরা হিন্দু?

প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনার মধ্যে ধর্মীয় আচরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার আজন্মলালিত আদর্শ হঠাৎ আজ এমন করে টাল খেয়ে যাচ্ছে কেন এ প্রশ্ন তখন কৃষ্ণকে কে করে! আত্মরক্ষার নিরুপায় তাগিদে কৃষ্ণ তখন কত কী ভাবছে নিমেষের মধ্যে। যারা আসছে তারা যদি আমার চেনা হয় তাহলে বিপদ বেশি কি কম? হিন্দু হয়েও আমি হিন্দু না এরকম একটা ঠাট্টা ওরা কেউ কেউ আমাকে করে, বিশেষ করে কুষ্টিয়া এস্টেটের অনেক বন্ধু। অবাধে গুণ্ডামি আর নষ্টামি করার জন্যই পার্টির ভেক নিয়েছে এমন কয়েকটা মুখ এখন কৃষ্ণের মনের মধ্যে ক্রমশ অতিকায় আয়তন নিচ্ছে — ওরা দিন কয়েক ধরেই কীসব মতলব ভাঁজছিল, রবিবারের ঘটনার পর থেকেই ওদের কিছু উলটোপালটা কথা শুনে কৃষ্ণ তার নিজের পার্টির তরফ থেকে ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিল। ওদের ট্যারা কথা, চোখ আর ভাবভঙ্গিতে তখনই কৃষ্ণের মনে খটকা লেগেছিল। সেই ওরাই নাকি আসছে? এই অ্যাকশন কি ওদেরই? সবাই জানে ওদের হাতে মালমশলা অনেক আছে। এবং ওরা মানুষখেকো। ওদের কোকেন আর হেরোইনের ঠেক ভাঙতে চেয়েছিলাম বলে ওরা আমার লাশ ফেলতে চেয়েছিল। এতিমা ওদের একটাকে একদিন দাবড়ি দিয়েছিল বলে ওরা বলেছিল, টোকা ঝাড়নি তোলা থাকল তোর, টাইম আসবে! সেই টাইম কি ওদের এমনি করেই এল আজ।

বিয়ের রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বেরুনোর পর কৃষ্ণের মা পুত্র ও পুত্রবধূ দুজনেরই মণিবন্ধে লাল-হলুদে ছোপানো মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিয়েছিলেন ওদের সমস্ত হাসাহাসি অগ্রাহ্য করে, তারপর এতিমার হাতে সোনার বাঁধানো নোয়া পরিয়ে দিয়ে একটি রুপার কাজললতা ধরিয়েছিলেন আর কৃষ্ণের হাতে দিয়েছিলেন রুপার একটি জাঁতি। চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, খেস্টানী বিয়ে হলেও রীতিনীতি ষোলোআনা জলাঞ্জলি দেওয়া চলে না, ফুলশয্যা না হওয়া পর্যন্ত এসব ওদের ধারণ করে রাখতে হবে। হঠাৎ কৃষ্ণ পকেটে হাত দিয়ে জাঁতিটি হাতে পেল। ডান হাতে মায়ের বেঁধে দেওয়া রক্ষাবন্ধনটিও অন্ধকারের মধ্যে একবার স্পর্শ করল। চিরকালই কৃষ্ণ বড়ো ভাবপ্রবণ, এইমুহূর্তে তার ইচ্ছে হচ্ছে এতিমাকে কাছে পেতে, ওকে চটানোর জন্য বলতে ইচ্ছে করছে, এতিমা, তোমার বাঁ হাতে এটা কী বাঁধা? তাহলে কি তুমি এখন হিন্দু, তবে এসো তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিই!

কোত্থেকে হঠাৎ উদয় হল পুলিসবাহিনীর। তিনটে জিপ থেকে বন্দুক আর রাইফেল নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে আর হুংকার ছাড়ছে। হট যাও, সব হট যাও। ডিসপার্স! রঙ কোম্পানির সামনে জটলা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাল, তারপর ধেয়ে গেল রেললাইনের দিকে।

চল এবার ঘরে চল। উকিলদাদু আর মোটাদাদু টানাটানি করে কৃষ্ণকে ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন। নে এখন ঘুমো, আর তো কোন হল্লাটল্লা নেই, পুলিসের গুলি আর দুটো একটা বোমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বটে, তাতে কী হল, পুলিস তো এসে গেছে, এটা গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ নয়, আমরা এখানে কাউকে দাঙ্গাটাঙ্গা করতে দেবে না। আমরা সেকিউলার, আমরা ধর্মকে গুলে নেশার পিল বানাইনি।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই অবশ্য দুজনের দেখা হয়ে গেল। কেই-বা-ঘুমিয়েছে ওই আতঙ্কের মধ্যে, এত ঠান্ডা সকাল, তারই মধ্যে খেটে খাওয়া এই মানুষগুলো বেরিয়ে পড়েছে আজ যদি রুজিরোজগার হয়, পর পর তিন দিন হয়ত খালি গেছে, আধপেটা খেয়ে চালাতে হল পুরো তিনটে দিন। দুটি মেয়ে বন্ধু সঙ্গে করে এতিমা প্রায় ছুটেই আসছিল বিবিবাগানের দিকে। কৃষ্ণ এসে সামনে দাঁড়াতেই সকলের কী হাসি — কে বলবে তখন কাল রাত থেকে এখানে আতঙ্ক।

একটি মেয়ে বলল, কেষ্টদা বউভাতে নেমন্তন্ন পাবো তো?

অন্য মেয়েটি বলল, আমরা কিন্তু দশজন!

দেখতে দেখতে ওদের নিয়ে যেখানে ভিড় জমে গেল। বর-কনে দেখছে সবাই। সংসারের সেরা দৃশ্য।

রাতের বোমাবাজি কারা করল কেন করল আবার করবে কি না এইসব কথা তখন সকলের আতঙ্কিত মুখে। শোনা যাচ্ছে ওরা আগুন লাগাতেও এসেছিল, পুলিস এসে যাওয়াতে রক্ষা। কিন্তু রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়? মেটিয়াবুরুজ-গাডের্নরিচে নাকি তাও হয়েছে লোকে বলাবলি করছে যে? কেষ্টভাই, তুমি তো হিন্দু, ইমানদার আদমি, খানদানি ঘর, সরকারি পার্টির বড় নেতার সঙ্গে তোমার দোস্তি, এখানে হিন্দু-মুসলিম এককাট্টা, রামরহিম, এখানে কোনো হুজ্জতি হবে না তো?

ওদের খুঁজতে ততক্ষণে সেখানে এসে গেছেন উকিলদাদু-মোটাদাদু, ইমামসাহেব এবং রসিদাবিবি। সকলেরই ইচ্ছে ওদের এখানে আর না রাখা, ওরা সকাল-সকালই চলে যাক কুষ্টিয়া হাউজিং এস্টেটে, কৃষ্ণের বাবা তিনখানা রিকশা নিয়ে ওদের নিতে এসে গেছেন, তিনি বসে আছেন বিবিবাগানে। রসিদাবিবি এতিমাকে টেনে নিয়ে গেলেন সাজিয়ে দেবেন বলে, মেয়ে আজ শ্বশুরবাড়ি যাবে। তুমি এতিমা, এতদিন তোমাকে আগলে রেখেছি, আমাদের ঘরে তুমি আল্লাহ্‌র আমানত হয়ে এতদিন থাকলে, এবার এসো তোমাকে সাজিয়ে দিই। এবার সেজেগুজে যাও বরের ঘরে, আল্লাহ্‌তালা তোমাদের দোয়া করুন। আউজিবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্, আউজিবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্ — রসিদাবিবি মন্ত্র জপতে লাগলেন।

অগত্যা কৃষ্ণকেও যেতে হল বরের সাজে সেজে নিতে মোটাদাদুর বাড়িতে।

একটু সাজতে হবেই মামসাহেবকেও, তিনি স্বয়ং এতিমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন ওর শ্বশুরবাড়িতে। মোটাদাদুকে তিনি বলে দিলেন একটা রিকশা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে তাঁর বাড়িতে। এতিমা আজ হেঁটে যাবে না।

কিন্তু কালো জিনেরাও তখন সাজছিল।

সকাল সাড়ে ছ-টা নাগাদ তারা ফের চড়াও হল ওই তল্লাটে। এবারে সাঁড়াশি আক্রমণ। তিনদিক থেকে একসঙ্গে। বিদ্যুৎ গতিতে। চামারপট্টি আর সিনেমাটার দিক থেকে পুকুর পেরিয়ে ওরা মাজার শরিফের দিকে এগিয়ে এল পেটো ছুঁড়তে ছুঁড়তে। খন্তা-শাবল দিয়ে ওরা মাজারের তোরণ ভাঙল পিটিয়ে, কিংখাব-ঢাকা সমাধির একাংশ গুঁড়িয়ে দিল কয়েক মিনিটেই। দাঙ্গাবাজদের মধ্যে পুলিসের পোশাকে ওরা কারা? হাতে তো রাইফেলও আছে।

রাম-রহিমের তল্লাট! এতিমা-কৃষ্ণমহম্মদের আশনাই! কই, আসমান থেকে ফেরেশতারা নেমে তো এল না এদের রক্ষা করতে — এখানকার এই মানুষগুলি তো খাঁটি মোমেন হয়েই থাকতে চেয়েছিল?

আগুনের পিণ্ড এসে পড়ছে ধোবিয়াতলা বস্তির ঝুপড়িগুলিতে, ওরা কি সবাইকে পুড়িয়ে মারতে চায়? আর্ত চিৎকারে অসহায় মানুষগুলো তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে আশ্রয়ের জন্য ছুটেছে সেই কিলখানার উদ্দেশ্যে যেখানে নিত্য পশুবলি হয়। পশুর অধম খুনি আর লুটেরার দল যখন ধোবিয়াতলা, মীর মেহের আলি লেন, মতিঝিল আর বিবিবাগান বস্তির ঝুপড়ি বা বাড়িগুলিতে বেছে বেছে আগুন লাগানোতে আর লুঠতরাজে মত্ত, তখন ওই অঞ্চলগুলির মানুষগুলো ভীত পশুর মতোই ছুটছে কোলে-কাঁখে শিশুসন্তান নিয়ে। কিলখানার লোহার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারলেই রক্ষা পাওয়া যাবে। এটাই সকলের ভরসা। ভয় পাওয়ানো রাতের অন্ধকারের মধ্যে নয়, ভয় তাড়ানো সকালবেলার আলোর ভরসায় এরা এখন ছুটছে পশুবধ্যভূমিতে— কেননা সেখানে মানুষ বধের নিয়ম নেই।

এমন নয় যে সকলেই পালাতে পারল। রুগ্ন অথর্ব বিকলাঙ্গরা অনেকেই পড়ে রইল যে যেখানে ছিল। তারা প্রায় কেউই মারাও পড়ল না। তবে অনেকেই চুপচাপ দেখল পাইপগান, চপার আর পিস্তল হাতে চেনা চেনা সব মুখ ঘর থেকে ভালো ভালো জিনিসগুলি টেনে টেনে বের করে নিয়ে গিয়ে ভ্যানে তুলছে।

এমন কী মূল্যবান বস্তু এই বস্তির ঘরে আর ঝুপড়িগুলিতে ছিল যা লুঠ করতে এত কাণ্ড করতে হয়! তা ছিল বইকি। বস্তা বস্তা কাঁচা চামড়া, ওক গাছের ছাল, হাতসাফাই-করা গাদা গাদা রংয়ের টিন, সুটকেস, ব্যাগ, হরেকরকম রাসায়নিক, টায়ার-হোস-বেল্ট ইত্যাদি বানানোর রবার, নাইলনের দড়ির গুঁড়ো আর হালপাত্তি, স্টেশনারি দোকানের হরেকরকম মালমসলা, প্লাস্টিকের জার, সাইকেল, ইলেকট্রিক পাখা, মোটরের কলকব্জা, তিনটে ক্যারামবোর্ড (যা ভাড়া দিয়ে দুলারি বেওয়ার দুপয়সা হত), বস্তা বস্তু পুরনো ব্যাটারি, রাজমিস্ত্রি আর ঘরামির যন্ত্রপাতি, গাদাগাদা হাওয়াই চটির স্ট্র্যাপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাইকেলভ্যান আর রিকশা বোঝাই করে করে ওরা হেলেদুলে সবকিছু নিয়ে গেল।

কালো জিনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আলিমহম্মদ ঘরের দরজার মুখে ঝুলিয়ে রাখে ধানের শিষ আর ভিতরের দেয়ালে বাঁধানো নেতাজীর ছবি—সেগুলি অক্ষতভাবেই ঝুলতে থাকল কিন্তু ওরা ঘর থেকে নিয়ে চলে গেল বড়বাজার থেকে নিয়ে আসা ওর পাঁচ বস্তা প্লাস্টিকের টুকিটাকি। মাদ্রাসা বোর্ড থেকে আলেম পাস করা ধোবিয়াতলার বালবাচ্চাদের কোরান আর হাদিসের সুরা আর পারা শেখানোর জন্য কত সম্মান মুসনারা খাতুনের, তাকেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হল তিনটে বাচ্চার ডানা ধরে, অথর্ব নানীটা চেঁচাতে লাগল তাকে ফেলে যাচ্ছে বলে, কিন্তু বেচারি মুসনারার তখন একমাত্র অবলম্বন নিরুপায়ের শেষ ভরসা সেই আরবী এসেমটি, সেটিই সে বারবার উচ্চারণ করতে লাগল : আউজুবিল্লাহি মিন্নাশ্-শায়তোয়ানির-রাজীম, বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম... শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিতে

চলেছি নানী। নানী গো, আল্লাহর নাম নাও, আল্লাহু-আকবর! আল্লাহু-আকবর! আল্লাহু-আকবর!

কিলখানার লোহার গেট খোলা আছে গত রাত থেকেই। গভীর রাত থেকেই আর্ত মানুষের দল আসতে শুরু করেছিল সেখানে। ভোরবেলা কিলখানার বিস্তীর্ণ ছাদে পচা খাদ্যের পাশে অগুনতি শকুনের পাল যখন পাখা নামিয়ে প্রাত্যহিক শিকারের জন্য তৈরি হচ্ছিল তখন সহসা হাজার হাজার মানুষের উচ্চণ্ড চিৎকার আর দৌড়ে তাদের অখণ্ড গাম্ভীর্য টাল খেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাঁ-চ্যাঁ চিৎকারে মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কিছু তাজা খাদ্যের সম্ভাবনায় গোটা তল্লাট জুড়ে তাদের সে কী পাখসাট!

তৃতীয় বিশ্বের চূড়ান্ত জাগরণের জন্য আজকাল কতরকম দৌড় হয়, সম্প্রীতির হদ্দমুদ্দের জন্য মৈত্রী পদযাত্রা আর হাতে হাতে ধরি ধরি মানবশৃঙ্খল হয়, সপ্তম সুরে গান গেয়ে গেয়ে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি সংহতি আর শান্তিমিছিল হয়, দুশমন আর ঠান্ডা লড়াই ঠেকাতে এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে হুইসিল বাজিয়ে সমঝোতা এক্সপ্রেস ছুটে চলে হু হু করে, তা পশুবধ্যভূমি ওই কিলখানার শেডগুলির মধ্যে সেঁধানোর জন্য শীতল এই হেমন্তপ্রভাতে অগণিত আবালবৃদ্ধবনিতার এ কীসের দৌড়!

দৌড়ে আসতে হয়েছে আমাদের এতিমাকে। আলুথালু অসমাপ্ত দুলহনের সাজে। যদি সে ইতিমধ্যে হিন্দু হয়ে গিয়ে থাকে তবে আজ তার বাসি বিয়ে। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে তার বিয়ে হলেও শাশুড়ীর ধরানো কাজললতাটি এখনও তার হাতে রয়ে গেছে এবং বাম মণিবন্ধে মঙ্গলসূত্র। প্রাণ নিয়ে পালানোর সময় এখন এটিই নাকি তার রক্ষাকবচ!

বাসি বিয়ে তো বর কই? এত লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এর মধ্যে স্নানেরই বা কী ব্যবস্থা! উলু দিয়ে এখন কে বা ওকে ঘরে তোলে, কে বা মাথায় ফুলেল তেল মাখিয়ে দেয়!

ওদিকে যে তখন নিউট্যাংরার গোটা তল্লাট জুড়ে কুশণ্ডিকা শুরু হয়ে গেছে! কিলখানার চাতাল থেকেই চারদিকেই দেখা যাচ্ছে আগুনের লকলকে শিখা, এঁকেবেঁকে ধোঁয়া উঠছে যেন এক দজ্জাল কালনাগিনী! হা-আ-আ আর্তনাদে দশদিগন্ত কাঁপিয়ে সে কী আর্তরোল! কার ঘর পুড়ছে? ও কার ঘর পুড়ছে? হাভাতে হাঘরে মানুষগুলোর ঘর পুড়ে যাবার সে কী বুকচাপড়ানো শোক!

আগুন দেখে এতিমা ভয় পাবে কেন, এমনই আগুনের মধ্যে এই কিলখানাতেই যে তার জন্ম। পাক মাটি দিয়ে নয়, নিজের পাঁজরা থেকেও না, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় ছেড়ে দিয়েছেন অগ্নিশিখা থেকে। তবে কি সে মানুষ না, সে কি আসলে একটা জিন! অপেক্ষা কর সেদিনের জন্য যেদিন আকাশ থেকে নেমে আসবে ভয়াবহ ধূম্রজাল। আজ কি তবে সেই দিন?

তা কেন, ওই তো লাল আলো জ্বেলে হুটার বাজিয়ে ছুটে আসছে দমকল। পিছু পিছু কার্বাইন উঁচিয়ে আধাসামরিক কনভয়। তাহলে? আল্লার ফজলে এখনই তো সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরাই তো ফেরেশ্তা। ওরা কোনো হীন প্রবৃত্তির অধীন নয়। ডাক

পাওয়া মাত্র ওরা আল্লাহ্‌তালার এবাদত বন্দেগী করে। ওই তো যাচ্ছে সব, আগুন একুনি নিভে যাবে। আল্লহ্ পাকের মেহেরবানিতে আমার সহায়সম্বলটুক পুড়বে না।

কিলখানার শত শত মানুষের মধ্যে এতিমা তখন আঁতিপাতি করে খুঁজছে কৃষ্ণকে, তার দুলহাকে। বিবিবাগান থেকেও তো কত লোক এসেছে। কিন্তু কোথায় সে? কৃষ্ণ কি তবে আমাকে খুজতে ধোবিয়াতলার আগুনের মধ্যেই পড়ল গিয়ে? কেন আমি ওর জন্য সেখানেই অপেক্ষা করলাম না। আমি কি তবে আবার সেখানেই চলে যাব?

তখন সব মানুষই যে যার নিজের জান আর আপনজন নিয়ে ব্যস্ত। হাতে করে যে যেটুকু বাঁচিয়ে আনতে পেরেছে সেটা কোথায় রাখলে খোয়া যাবে না, জায়গা দখলের সেই কামড়াকামড়ির মধ্যেও এতিমাকে জবরদস্তি আগলে রাখার মতো লোকও জুটে গেল মেলা। কেউ তারা ওকে আবার ওই আগুন আর গুলিগোলার মধ্যে যেতে দেবে না। ইতিমধ্যে সেখানে রাষ্ট্রও হয়ে গেছে দাঙ্গাবাজরা আগুন দেওয়া ছাড়াও আকছার মানুষ মারছে। এবং কে কত লাশ পড়ে যেতে দেখেছে তার হুবুহু বিবরণ দিয়ে অবস্থাটা লোমহর্ষক করে তুলছে। সবাই বলছে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে গোটা ট্যাংরা অঞ্চল — ধোবিয়াতলা পঞ্চাননতলা বিবিবাগান বারোনম্বর বস্তি মুনশীমহল্লা মতিঝিল মীর মেহের আলি লেন। পচাখালের দুদিকের বস্তির সব বাড়ি আর ঝুপড়ি নাকি পুড়ছে। মানুষ নাকি পালাচ্ছে যে যেদিক পারে রেললাইন ধরে।

সে এক বীভৎস পরিস্থিতি। কিলখানার তিনটে শেডে তখন মানুষে মানুষে ছয়লাপ। আর তিলধারণের স্থান নেই তবু বানের জলের মতো তখনও তারই মধ্যে আছড়ে পড়ছে মানুষ। তারই মধ্যে কামড়াকামড়ি করছে কে কোথায় প্রথম দখল নিয়েছিল। তারই মধ্যে অসহায় মানুষগুলির মলমূত্র ত্যাগ এবং বমি কসাইখানাটার বছরখানেক ধরে জমে থাকা জমাটবাঁধা পশুরক্ত, গরুর পেটের চারা আর পচা গোবরের ভাঁইয়ের পরিবেশটিতে আরও বেশি দূষণ ঘটাতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। এবং তখন কিলখানার চত্বরে বিশাল জলের ট্যাংকে একফোঁটা জলও ছিল না।

অথচ তারই মধ্যে প্রায় সবাই সবাইকে অভয় দিয়ে চলেছে। বাচ্চা ছেলে চেঁচাচ্ছে: মেরে ফেলবে মা, আগুনে পুড়িয়ে মারবে—তো মা হাত নেড়ে নেড়ে বলছে: না রে সোনা, কেউ মারবে না, আমি আছি তো, ভয় কিরে...

হ্যাঁ, কৃষ্ণমহম্মদ জান কবুল করে তখন ছুটে গিয়েছিল ধোবিয়াতলাতেই। কেননা সদ্য বিয়ে করা তার বউটা যে তখন সেখানেই। আর সকলের মতো প্রাণের দায়ে সে কিলখানায় বা বেলেঘাটা মেন রোডের দিকে বা বন্ধ হয়ে যাওয়া বেঙ্গল পটারি কারখানার উদ্দেশে ছোটেনি। তখন তার প্রথম এবং একমাত্র চিন্তা এতিমা। সে যেন না বিপদে পড়ে।

যন্ত্রণা বেড়েছে তার অশীতিপর দুই বৃদ্ধকে নিয়ে। বাবা সজ্ঞা ধরেছেন সেটা ঠিক আছে প্রয়োজনে তিনি ছুটতে পারবেন, কিন্তু উকিলদাদু যে আজকাল ভালো করে হাঁটতেই পারেন না, মোটাদাদুও প্রায় তাই। উকিলদাদুকে নিরস্ত করাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি কিছুতেই কেষ্টকে তাঁর কাছছাড়া করবেন না। তিনটি রিকশা ছিল, তিন রিকশাওয়ালাই কৃষ্ণের বাবা হরনাথ চক্রবর্তীর বিশেষ অনুগত। গোলমাল

লেগে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা চেয়েছিল এই চারজনকে নিয়ে পালিয়ে যেতে কুষ্টিয়া হাউজিং-এ। তিনজনই ওরা মুসলিম, কিন্তু হরনাথ এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রিয় কমরেডদাদা, তিনি সঙ্গে থাকলে তো বুকে বল বাড়ে। তাই বলে রিকশা দিয়ে এ অবস্থায় ধোবিয়াতলা যাওয়া যাবে না, ওদিকে যে অত আগুন। বিবিবাগানও আক্রান্ত, তবু এখনও হাউজিং-এর দিকে পালিয়ে যাওয়া যায়। ভয়ংকর বিভ্রান্তির মধ্যে হরনাথ ওদের কিলখানার দিকেই যেতে বললেন। নাছোড়বান্দা কৃষ্ণের পিছু পিছু তাঁরা চললেন ধোবিয়াতলা।

ছ-সাত মিনিটের পথ মাত্র, কিন্তু দাঙ্গা আর লুঠেরাবাহিনীর সাঁড়াশি-আক্রমণ এড়িয়ে দুই বৃদ্ধকে সামলে সামলে হরনাথ আর কৃষ্ণকে মসজিদের ইমামসাহেবের বাড়ির দিকে যেতে হচ্ছিল যথেষ্ট ঘুর পথে। গলিগুলির অধিকাংশ ঘরই তখন জ্বলছে, লুঠপাট চলছে অবাধে। এদের মধ্যে চেনা মুখগুলি এঁদের দেখে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, টিটকিরি দিচ্ছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণকে লক্ষ করেই। দুই বৃদ্ধের অনবরত শাসানিতে কৃষ্ণ মুখ বুজেই ছিল, পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে বুঝে হরনাথও এদের নিবৃত্ত করার আদৌ কোনো চেষ্টা করছিলেন না।

কিন্তু বহু কষ্টে ইমামসাহেবের বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন তা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। মসজিদটি ফাঁকা, মাদ্রাসা পুড়ছে এবং মাজারশরীফটির একটি তোরণ ভেঙে ফেলার পর খোদ মাজারের উপর তখন বিশ-পঁচিশটা গুণ্ডা প্রবল বিক্রমে শাবল আর খন্তা চালাচ্ছে। বিনা বাধায় সব চলছে, খিদমদগারেরা সব পলাতক। মাদ্রাসার আলেমরা, মাজারশরীফের খাদেম এবং মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন-মোক্তাদীর দল কেউ কোথাও নেই।

এমনই পরিস্থিতির মধ্যে কৃষ্ণমহম্মদই প্রথম মানুষ, প্রথম ইমানদার আদমি যে ছুটে গিয়ে একটা গুণ্ডার হাত থেকে শাবল কেড়ে নেবার চেষ্টা করল।

হঠাৎ তিন হিন্দু এবং এক খ্রীস্টান এসে মাজার ভাঙতে বাধা দিচ্ছে এ কারণে নয়, এ অঞ্চলে হরনাথ তো বটেই, উকিলদাদু এবং মোটাদাদুও এতটাই পরিচিত যে গুণ্ডাগুলি বেশ থমকেই গেল। কিন্তু কৃষ্ণ যার হাত চেপে ধরল সে ঝটকা দিয়ে কৃষ্ণকে সরিয়ে দিয়ে অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে শাবলটা দিয়েই একটা বাড়ি মারল কৃষ্ণের পায়ে। কৃষ্ণের লুটিয়ে পড়া দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন উকিলদাদু। শাবলের দ্বিতীয় ঘাটির লক্ষ্যস্থল ছিল কৃষ্ণের মাথা, কিন্তু তা পড়ল গিয়ে একাশি বছর বয়সের বৃদ্ধ বরদা উকিলের মাথায় এবং রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে।

হঠাৎ এমনি রক্তপাতে কী যে হল গুণ্ডাগুলির, তারা রণে ভঙ্গ দিল। ডোরাকাটা কুৎসিত হায়েনার মতো চিৎকার করতে করতে তারা চামারপট্টির দিকে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেল। পুলিস এল। অ্যাম্বুলেন্সও এল। তবে একটু দেরিতে। ততক্ষণে উকিলদাদুর সমস্ত অশান্তির উপশম ঘটে গেছে। বংশমর্যাদার ক্ষাত্রমহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য একদা যিনি যাবতীয় ম্লেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, আজ তথাকথিত এক ম্লেচ্ছ কবরের মর্যাদারক্ষার প্রশ্নে আপন দেহের রক্ততর্পণে হিন্দুসমাজের সিন্ধুসমান পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই মানুষটি এমনিভাবেই করে গেলেন।

শহরটা প্লাবিত হয়ে খিলখানার পৌঁছলোর স্রোতে সঙ্গে শুধু এতিমাই নয়, মসজিদের ইমামসাহেব এবং তাঁর পরিবারবর্গ সমেত অজস্র মানুষ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বোমাবাজি এবং আগুনের মধ্যেই ফের ছুটল ধোবিয়াতলার মাজারশরীফে। কিন্তু ততক্ষণে পুলিস এবং অ্যাম্বুলেন্স মৃত উকিলদাদু এবং আহত কৃষ্ণকে নিয়ে চলে গেছে কোনো হাসপাতালে, সঙ্গে গেছেন মোক্তারদাদু ইম্মানুয়েল বিশ্বাস এবং হরনাথ চক্রবর্তী।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর এতিমার মা রোকেয়া মর্গে তার মরদকে আর খুঁজে পায়নি, এতিমার কিন্তু জোর বরাত, পুলিসের গাড়ি তাকে সেদিনই পৌঁছে দিল তার দুলহার কাছে, হাসপাতালে।

মহাশান্তিতে তখন এতিমার বিবাহের ওলি উকিলদাদু শুয়ে আছেন হাসপাতালের মর্গে। □

বব ডিলান, চিনুভাই প্যাটেল অথবা একটি দুপুর থেকে বিকেল

শুভময় মণ্ডল

করেছ?

—হুঁ।

ক্ষণিক থেমে থাকে ভাস্বত। তারপর বলে, ওই 'হুঁ'-টার কোনো অর্থ বোঝা যাচ্ছে না অন্তু।

— যাচ্ছে না! ক্যানভাস থেকে চোখ না-তুলেই বলে অনন্তা।

ইজেলে দাঁড় করানো ক্যানভাসের সামনে অনন্তা। তার দোতালার এই ঘরে উঠে এসেছিল ভাস্বত। ক্যানভাসের সামনে অনন্তা, অনন্তার পিছনে খানিক দূরে ভাস্বত, এই প্রায় সরলরেখায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই ভাস্বত প্রশ্নটা করে অনন্তা কী আঁকছে সেদিকে তেমন খেয়াল না-করেই। ভাস্বতর প্রশ্নের সাড়ায় অনন্তা একটা শব্দ করেছিল, 'সেই 'হুঁ', সেই বুদবুদের মতো গহন থেকে ভেসে-ওঠা শব্দটি আর একটি পালটা প্রশ্ন, নাকি কোনো অভ্যর্থক উত্তর, তা বোঝা যাচ্ছিল না। যে-মতো ডানার তলায়, বুক-পেটের নরম পালকের তলায় শাবকগুলি ঢেকে ঘুমিয়ে পড়া পাখি রাতের গহনে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ডেকে ওঠে খণ্ডবাক্যে, সেই ভাঙা ধ্বনির কোনো অর্থ বোঝা যায় না।

—করেছ? আবার প্রশ্নটা করে ভাস্বত। এবারের ভঙ্গিটা আরও অস্থির।

— স্নান করেছ?

— কী?

—স্নান। স্নান। পরপর দুবার বলে অনন্তা। যেন সেই সময়ে ক্যানভাসে তার তুলির কোনো জোরালো মোচড়ের ঘাত উচ্চারণে অতিরিক্ত ভার আনে। ঝাঁকুনি আনে।

— এটা কী হচ্ছে অন্তু, তুই আমার প্রশ্নটার উত্তর তো দিলিই না, উপরন্তু পালটা প্রশ্ন করে যাচ্ছিস।

—বাহ্, করব না! ভরা দুপুরে কারও বাড়িতে এসেছিস, স্নান করেছিস কিনা, খেয়েছিস কিনা জিজ্ঞাসা করব না?

—ওগুলো কোনোটাই না-করে এলে তোমার কি খুব অসুবিধা হবে? ভাস্বত পালটা প্রশ্ন করে।

—অসুবিধা না-হলেও অস্বস্তি তো হবে।

—বেশ, বেশিক্ষণ তোমার অস্বস্তি বাড়াব না। এখন বলো, আমার কাজটা করেছ? কথাটা বলেই ভাস্বত উঠে দাঁড়ায়। কয়েকমুহূর্ত আগেই সে বসার সুযোগ করে নিয়েছিল

অনন্তার সেই ঘরে। ঝটিতি উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই তার ক্রোধ যেন নাঙা তালোয়ারের মতো ফলা খুলে দাঁড়ায়।

— বব ডিলান? অনন্তা জিজ্ঞাসা করে।

— বব ডিলান।

এতক্ষণ পরে ক্যানভাস থেকে ঘুরে দাঁড়ানো অনন্তা। ফলত সে আর ভাস্বত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যেন এতক্ষণে মুখোমুখি দাঁড়ানোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে সেই মেয়ে। তারপর বলে, কী হবে?

যেন একটা রোমশ নৈঃশব্দ দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাচালের মতো মাটিতে নখ ঘষছিল।

অনন্তাই আবার বলে, নৈঃশব্দকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলে, কী হবে গানটার অনুবাদ করে। তুম টিউনে ফেলে গাইবে তো! গেয়ো না ভাস্বত। ডিলানের ওই গানটার কোনো মানে নেই। গাস্ না। কোনো মানে নেই।

অনন্তা দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তার শেষ দিককার উচ্চারণগুলো, ভিজে গিয়েছিল। সে দু-হাতে মুখ ঢাকা দেয়। ফুঁপিয়ে ওঠে। পাশের চৌকিটাতে বসে পড়ে।

ভরা জ্যৈষ্ঠের দুপুরের উপক্রমণিকা পার হয়ে গেছে কখন। রোদ্দুর ফুলকি ছড়াচ্ছিল চরাচরে। অনন্তার ভিজে চুলের গন্ধ পেয়েছিল ভাস্বত। দোতলার সেই ঘরে, শুধু সেই ঘরটিতে, সেই ভিজে গন্ধ তাপদাহকে আঁচলের হাওয়ায়-হাওয়ায় শান্ত করে ঘুম পাড়াতে চাইছিল। এতক্ষণ ছবিটাকে দেখতে পায়নি ভাস্বত। কখনও ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কখনও ভাস্বতর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছবিটা যেন আড়াল করেছিল, ছবির জননী। অনন্তা চৌকিতে বসে পড়তে ছবিটা পুরোটা দেখতে পায় ভাস্বত। দেখতে থাকে। ততক্ষণে দুয়ারমুখী কোনোজন বেশ কয়েক পা পথ পার হয়ে গেছে সেই দুপুরে। খোলা তাপ থেকে গৃহস্থলির ছায়ার দিকে। তেল-জল-নাওয়া, বাড়া ভাতের দিকে।

অনন্তা আবার উঠে দাঁড়ায়। বলে, বাড়ি যাও, আমার ছবিটা শেষ করতে হবে। যেন প্রায় শুকিয়ে আসা শাড়ির মতো রোদ্দুরে দুলছে তার স্বর। ভিজে যাওয়ার আভাস এখনও বোঝা যায়।

বাতাস একঝলক আসে সেই ঘরে। অন্তু এখন আবার ক্যানভাসের মুখোমুখিই। তার খোলা চুলের ওপারে ছবিটা আর একবার টের পায় ভাস্বত। যেন ঝাউবনের ওপারে দেখা সমুদ্রতট, সমুদ্র। ভাস্বত বোঝে, কেমন ঘুম আসছে শরীরে। আশাভ্রষ্ট হলে যে-রকম বিমূঢ় ঘুম শরীর ছাইতে চায়। ঝাউ বনে শুয়ে আছে সে বালির ওপর। চোখ বুজে আসছে। পিঠের তলায় গরম বালি। ঝাউ বনের কত ওপারে ভেজা সমুদ্রতট। তারপর ঢেউয়ের শীতল পাপড়িগুলো।

ভাস্বত পথে বার হওয়ার জন্যে নীচে নামার দরজার দিকে যায়।

— সতো। অনন্তা ডাকে, চলে যাচ্ছিস?

— হ্যাঁ।

— একটা কবিতা পেলাম। গাইবি?

ভাস্বত-র উত্তর দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই জন্মাচ্ছিল না। অন্য কবিতার কথা বলায়

বিরক্তিই ঝাপটা দিল মনে। এখন সে আর অনন্তা আবার মুখোমুখি। ছবিটা ঢাকা পড়ে গেছে অনন্তার আড়ালে।

"ঘুমিয়ে ছিল যে আগ্নেয়গিরি... জেগেছে আবার আজ
আগুনে পুড়িয়েছে মিঞায়েছে পাছা, দেখেছি তাদের ন্যাংটো নাচ
আমাদের নেতিয়ে পড়া পুরুষাঙ্গ জেগেছে আবার আজ
আমরা ফাটিয়ে দিয়েছি বিবিদের যোনিদ্বার, ফাটিয়ে করেছি ফাঁক।"

ভাস্বতর মনে হয় দু-পা ছুটে গিয়ে থাপ্পড় কষায় অনন্তার গালে। এসব কী বলছে অনন্তা। গতকাল সন্ধেতে ওকে বব ডিলানের একটা লিরিক ট্রান্সলেট করতে দিয়ে গিয়েছিল ভাস্বত। সারারাত ডিলানের টিউনটা ডানা ঝাপটিয়েছে মনে। চাকরির জন্য পরীক্ষার পড়ায় কিছুতেই মন বসছিল না সকাল থেকে। দেওয়াল থেকে গিটারটা নামিয়ে কয়েকবার টিউনটা বাজিয়েছে। শেষমেষ ছুটেই এসেছে অনন্তার কাছে অনুবাদটা হল কি না শুনতে। হল কি হল না, তা জানাবার নাম নেই, তখন থেকে হেঁয়ালি করেই যাচ্ছে। এখন দেখ কতকগুলো ন্যাস্টি, ওবসিন লাইনস চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে। বলছে নাকি কবিতা। ভাস্বত উত্তর দেওয়ার ভাষাই খুঁজে পায় না।

অবশ্য উত্তর দেওয়ার মতো খুব একটা অবসরও পায় না। ভাস্বতর বেবাক থাকার সুযোগ নিয়ে অনন্তা বলে ওঠে, কী রে গাইবি নাকি, খুব কম গুরুত্বপূর্ণ লোকের লেখা নয় কিন্তু!

বিমূঢ়তা, বিস্ময়, ক্রোধ, ঘৃণা, অসহায় বিরক্তি সব নিয়েই নিরেট তাকিয়ে থাকে ভাস্বত অন্তুর মুখের দিকে। তার খর দৃষ্টিরেখায় ওগুলোর কোনটা কোন অনুপাতে মিশে ছিল, বোঝা যায় না। সে নিজে তো জানেই না।

— কী রে গাইবি? আশ্চর্য একটা কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলছে অনন্তা। ঈষৎ শান তার প্রতি শব্দে। তোর দেওয়া লিরিকটা বব ডিলানের, আর এটা চিনুভাই প্যাটেলের লেখা। এটাও গত রাতে পেয়েছি, তুই চলে যাওয়ার কিছু পরে। ভালো ট্রানস্লেট করেছি বল! অন্তু খানিকটা বাড়তি দ্রুততায় বলে যায়। কর্তৃত্বের মধ্যেও ভিতরে-ভিতরে কোথায় যেন ভাঙছে অনন্তা।

—চিনুভাই প্যাটেল! কে? ভাস্বত আচ্ছন্নের মতো বলে।

—বললুম যে, কম গুরুত্বপূর্ণ কেউ না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুজরাট প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক। ওরা আবার প্রদেশ বলে কিনা জানি না। মণ্ডল না কীসব বলে যেন।

—তো!

—তো আবার কী? তুই গাইবি আবার দ্রুত বলার চেষ্টা করছে অনন্তা। যেন তার স্নায়ুর ভাঙনকে সে বাঁধনে চাইছে তির্যক কর্তৃত্বের আড়ালে। তুই তো গানের জন্যে গাইবি। অন্য কিছু নিয়ে তো তোর মাথাব্যাথা নেই। তো বব ডিলান আর চিনুভাই প্যাটেলে তফাতটা কী?

—অন্তু, অন্তু! সংযত হও। অনন্তার স্নায়বিক ভাঙনের আভাসে, নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ পায় ভাস্বত এবং অন্তুকে রুখে দিতে বলে।

—গানের শুরুতে একটা প্রিলিউডও আছে, শুনবি? অন্তু আরও দ্রুততায় বলে যাচ্ছে,

'আমরা ওদের কেটে ফেলব, ওদের রক্তনদী বইবে। যেভাবে বাবরি মসজিদ ভেঙেছি ঠিক সেইভাবে মুসলমানদের মেরে ফেলব।' গেয়ে ফ্যাল সতো, তোর তো আর গানের অর্থের প্রতি কোনো কমিটমেন্ট নেই, গান হলেই হল।

—হেল, হেল উইথ ইওর কমিটমেন্ট। তোর বাড়িতে এসেছি...। এবার যেন ভাস্বতও হাঁফাতে থাকে। তোর বাড়িতে এসেছি সেই সুযোগে অনেক অপমান করেছিস। এবার থাম। থাম।

—চেঁচাচ্ছিস কেন? ওই লোকটা, ওই চিনুভাই প্যাটেল, ওঁরও একটা কমিটমেন্ট আছে। একটা লিফলেট ছড়িয়েছে, লিফলেটের শেষে ওইসব লাইনস। ইয়েস, কবিতার মতো করে লাইন্‌স। ওরও একটা কমিটমেন্ট আছে। দোস গুনস। দোস মার্ডারার্স। দোস ব্লাডি হিন্দুত্ব। এদের প্রতি কমিটমেন্ট। অ্যান্ড স্ট্রং কমিটমেন্ট। অনন্তা যেন চিৎকারের বিস্ফোরণে ভেঙে পড়বে। তোর কি কমিটমেন্ট আছে বল? কীসের প্রতি, কাদের প্রতি!

দুপুরে যেটুকু বাতাস ছিল, তা কখন, কোথায় চলে গেছে। বাতাসহীন জ্যৈষ্ঠ রোদ-পোড়া বালির মতো জড়িয়ে আছে প্রহরের পটে। এখনও এখানে পাখি আসে, কলকাতা থেকে মাইল বিশেক দূরের এই মফস্‌সলে। মফস্‌সল পার হলেই যে মাঠ বিল-গাঁ, সেখান থেকেই আসে। কোনো নিরীহ পারিবারিক গাছে এসে বসে। দুপুরের শূন্যতার জমিতে তাদের কোনো এক জনের হঠাৎ ডাক গাঢ় রংয়ের বুটির মতো, যে বুটি দুপুরের ঝলসানো হলুদ বুনোটকেই যেন আরও স্পষ্ট করে। ইজেলের পাশের চৌকিতেই কখন বসে পড়েছিল অনন্তা। চৌকির দেওয়াল প্রান্তে ছড়ানো-ছিটানো তার বইপত্র। ছাড়া-চুল নেমে এসে অন্তুর মুখের ডান দিক আড়াল করেছিল। দুই হাতের তলে ধরা অন্তুর মুখ। যেন সাবেকি কোনো জলচৌকিতে ধরা আছে খোলা পুঁথি। পুঁথির পাতায় বিষাদের সনাতন বর্ণমালা। ইজেলের ওপর ক্যানভ্যাসে একটা সমুদ্রতট। ভাস্বত তেমন দাঁড়িয়েই ছিল। প্রবল শব্দপাতের পর সেই মূক মুহূর্ত সমষ্টিতে।

—সরি।

একখণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছে বোধহয় দুপুরের আকাশ পাড়ি দিয়ে।

—সরি, সরি ভাস্বত। অনন্তা আবার বলে ওঠে। সরি, সতো।

কলঙ্ক নরম ছায়ার সর ভেসে যাচ্ছে তপ্ত মাটির ওপর দিয়ে। মাটি ঘর বসত পথ।

—সো সরি, আমার এমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা উচিত হয়নি।

সমুদ্রতটে একটা ছায়ার আভাস রয়েছে। সবুজ, সবুজ ছায়া। ভাস্বত ছবিটাই দেখছিল যা এই দুপুরে এতক্ষণ সে দেখেনি।

—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে, বোসো। বোসো না।

ভাস্বত ভাবে এদের সেই এক লব্জ—কমিটমেন্ট, দায়বদ্ধতা! দায়বদ্ধতা শব্দটা আবার ভুল নয়তো! অন্তু আবার শব্দের ব্যকরণ নিয়ে যা খুঁতখুঁতে। আচ্ছা, ওই একই শব্দ, একই ধরনের শব্দ বারবার বললে লোকে শোনে! ছবিটা ভালো এঁকেছে। ভারী ভালো। ভাস্বত বসে।

—কাল রাতে তুমি চলে যাওয়ার পরপরই বইপত্র, ডকুমেন্টগুলো হঠাৎ হাতে এল।

তুমি তো আটটা নাগাদ গেলে।

তট পার হলেই সমুদ্র। অনন্ত সমুদ্র। নীল রংয়ের প্রতি ডকুমেন্টগুলো হঠাৎ হাতে এল। তুমি তো আটটা নাগাদ গেলে।

তট পার হলেই সমুদ্র। অনন্ত সমুদ্র। নীল রংয়ের প্রতি অন্তুর আলাদা ঝোঁক। আছে। নীল, নীল সমুদ্র। কোথাও গিয়ে আকাশ আর সমুদ্র শুয়েছে পরস্পরে।

—লিরিকটাই পড়ছিলাম। তোমার দেওয়া বব ডিলান। ন-টা নাগাদ কাকু এসেছিল। আমি ওপরেই ছিলাম। গলা পেয়ে নীচে গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। হাতে ওই ডকুমেন্টগুলো। প্রায় জোর করেই নিলাম।

নীলেই অনন্ত। নীলের মধ্যে পারাপারহীন অনন্ত। তটে এসে ঢেউয়ের পাপড়িগুলো ফুল্ল হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে ভাস্বত দেখে অনন্তা অভ্যস্ত হাতে এতক্ষণ খোলাচুল বেঁধে নিচ্ছে কয়েকটি গ্রন্থিতে। এতক্ষণে চুল তার শুকিয়ে গিয়েছে বোধ হয়।

—তোমার দেওয়া লিরিকটাতেই ছিলাম। প্রথম স্ট্যাঞ্জাটা করেও ছিলাম। তারপরই ওইগুলোতে চোখ রাখলাম। ডকুমেন্টগুলোতে। ভাস্বত জানো, বাচ্চাগুলো কাঁদছিল, খুব কাঁদছিল। খিদেতে, শোকে, না না শোক কেন আতঙ্কে, ভয়ংকর আতঙ্কে।

সমুদ্রতটের কিছুটাতে ঝাঁঝালো বালি। কিছুটাতে ছায়া। ক্যানভাসের ডান প্রান্ত জুড়ে ঝাঁঝালো বালির রং। অনন্তার চৌকির দেওয়াল কিনারায় গুজরাট-ডকুমেন্টগুলো শুয়ে আছে। একপলক দেখেছিল ভাস্বত।

—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া তেষ্টায়, আতঙ্কে এক ঝাঁকবাচ্চা কাঁদছিল। ওরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। বাচ্চাগুলোকে, বাচ্চার মা-দাদিদের ঘিরে ধরে গেরুয়া ফেট্টিওয়ালারা হ্যা-হ্যা করে হাসছিল। গেরুয়াদের মধ্যে কজন এগিয়ে আসে।

সেই বালির দিকে তাকালে যেন তৃষ্ণা পায়। ক্যানভাসের বাঁদিকে বড়ো অংশ জুড়ে ছায়া। ছায়া দুলছে। সবুজ সবুজ ছায়া।

—এগিয়ে এসে প্রত্যেকটা বাচ্চার ঘাড় ধরে হাঁ-করিয়ে হাঁ-এর মধ্যে পেট্রল ঢেলে দেয়। কোনো বাচ্চা তো হাঁ-করেই কাঁদছিল। হাঁ-এর মধ্যে পেট্রল।

—ছায়াটা কী জিয়ন্ত হয়ে উঠেছে যেন। কী জিয়ন্ত ছায়া দিয়েছে অন্তু। সবুজ ছায়া। ঝাউবন। ঝাউবীথির ছায়া এঁকেছে অনন্তা! ক্যানভাসের মধ্যে ঝাউবীথি কোথাও নেই। তবু বালির ওপর ছায়ার নরম কালোতে ঝাউবনের আভাস। দারুণ, দারুণ করে ভেবেছে অন্তু।

—পেট্রলে বাচ্চাগুলোর হাঁ-ভরতি মশালের ছোট্ট ছোঁয়া! ব্যাস! ভাব, ভাব সত্যে! অনন্তা আচ্ছন্ন উন্মাদের মতো দ্রুত, দ্রুত হাঁফানোর মতো বলে যাচ্ছে ভাব সত্যে, ভাব বাচ্চাগুলো ক্ষুধার্ত হাঁ-এ, তেষ্টা পাওয়া হাঁ-এ দাউ-দাউ করে জ্বলছে গেরুয়া ওয়ালাদের আগুন। হা, হা-রে ভারতবর্ষ।

সেই ছায়ায় পড়ে আছে এক গাঙচিল। নিবিড় সবুজ ছায়ায় শুয়ে আছে গাঙচিল। ক্যানভাসের বাঁ-দিকের কোণের অঞ্চলে।

—গ্রামের নামটা কী যেন বেশ, হ্যাঁ রাধিকাপুর। বাচ্চাটার নাম আসিফ।

অনন্তা যেন চিৎকার করা কান্না থেকে ফিরে এসে গোঙানির স্বরে বলে যাচ্ছে, চার

বছরের আসিফ। ওদের আগুনে প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল আসিফের। আগুনে পুড়ে ছটফট করতে করতে ক-দিন পরে মরে গেল বাচ্চাটা।

মরে আছে না জেগে আছে গাঙচিলটা। ভাস্বত ভাবছে। কী বিশাল চোখ। কী বিশাল, গভীর চোখ এঁকেছে অন্তু! চোখ!

—*দ্য হিন্দু*-তে বাচ্চাটার একটা ছবি বেরিয়েছিল। আসিফের। প্রায় পুরোটা ব্যান্ডেজ জড়ানো একটা মুখ। শুধু মুখ। পুরোটাই প্রায় ব্যান্ডেজ জড়ানো। শুধু জেগে আছে চোখ দুটো। কী সুন্দর, বড়ো-বড়ো দুটো চোখ। যেন সব দেখছে! কী সচেতন, কী ভীষণ জেগে থাকা দুটো চোখ।

—তোমার ছবিটা অন্তু! তোর ছবিটা। ভাস্বত এতক্ষণ পরে কথা বলে। যেন পাতা খসে পড়ার শব্দে।

—তুমি এতক্ষণ পর ছবিটা দেখলে?

—দেখছিলাম। ক্যানভাসের খুব কাছে তখন চলে এসেছিল ভাস্বত। শুধু চোখ দুটোই দেখছিল সেই গাঙচিলের। আত্মস্থ স্বরে সে উত্তর দিয়েছিল অন্তুর কথার। অবশ্য তা উত্তর হল কী হল না খেয়াল করতে চায়নি সে।

—কাল রাতে সারারাত প্রায় ঘুমোতে পারিনি। ওই চোখ দুটো আমায়

ক্যানভাসের খুব কাছে চলে এসেছিল ভাস্বত। ফলত ক্যানভাসের পাশে চৌকিতে বসা অনন্তারও কাছাকাছি. ক্যানভাসে চোখ রেখেই সে বাঁ-হাত বাড়িয়ে অনন্তার মাথায় হাত রাখে। চেনা হাতে বেণীর বাঁধন খুলে দেয়। ছায়া গড়িয়ে নামল দুপুরে।

—And howmany seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand. সবুজ আর নরম কালোর সেই ছায়ায় গাঙচিলটাকে শুয়ে থাকতে দেখে ভাস্বত গুনগুন করে ওঠে।

—আর কত সাগর পার হবে ওই গাঙচিলেরই পাখা। বালিতে মুখ রেখেই যেন অনন্তা সুরটাতে শব্দের ছোটো নৌকোগুলো ভাসিয়ে দেয়। অনন্তার খোলা চুলে আঙুল চারিয়ে দিতে দিতে ভাস্বত-র মনে হয় যেন সে ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে। হাঁটতে-হাঁটতে তারই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে ভাস্বত বলে ওঠে, বব ডিলান, বব ডিলান।

অনন্তা বলে ঝাউবনের ওপার থেকেই, তুমি এতক্ষণ পরে দেখলে ভাস্বত!

অনন্তা ঝাউবনের ওপারে, বালির দিকেই মুখ রেখে। ভাস্বত ঝাউবনের মধ্যে বালিতে পা ডুবিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে আছে, সমুদ্রতটের দিকে। চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। তবু সমুদ্রতটের ছায়ায় শুয়ে থাকা গাঙচিলের দিকে তাকিয়ে। ছায়াটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে যেন। ক্রমশ আরো দীঘল। দুপুর কি কান্নায় আসছে?

—ছবিটা ভালো হয়েছে অন্তু।

—ভালো?

দুপুরের শেষ কিনারার রোদকে প্রায়শই খুব তেতো ঠেকে। তেতো আর ঝাঁঝালো।

—ভালো? আবার জিজ্ঞাসা করে অনন্তা। প্রথম জিজ্ঞাসাটা ছিল আচ্ছন্নের। পরেরটা প্রখর। তার মাথা থেকে ভাস্বতর হাতটা নামিয়ে দেয়। তা বোধহয় মাথাটা উঁচু করার

জন্যে। ভালো? কী ভালো? কীসের জন্যে ভালো? এসব বিষয়ে ভালো খারাপ শব্দগুলো নেই ভাস্বত। এই সময়ে ভালো-খারাপ শব্দ দুটো মরে গেছে। কী হবে ভালো বা খারাপ হয়ে। আমার তো মনে হয়, ছবি আরও নখর হতে পারে না কেন, ছবি গলা ফেড়ে চিৎকার করে গালমন্দ করতে পারে না কেন, ডুকরে কেঁদে উঠতে পারছে না কেন?

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে অন্তুর মুখের দিকে তাকায় ভাস্বত। পায়ের তলায় তপ্ত বালির ঝাঁঝ লাগে যেন। তার ঘুমের আবেশটা কেটে যায়। অন্তুর মুখটাকে একদৃষ্টি হয়ে পড়ে যায় সে। কীসব যেন বলতেও ইচ্ছে করে। সে-সব না বলে সে বলে, কিছুটা ঘুমিয়ে নাও অন্তু, কাল রাতে ঘুমোওনি তো।

—আসলে জানো সব মেয়েই মূলত মা, অনন্তা বলে। হঠাৎ নরম, নরম হয়ে বলে। মেঘ করেছে বোধহয়। সেই মেঘ ছায়া নামাচ্ছে দুপুর যখন কিনারায় এল।

অনন্তা আবার বলে, আজকের মিছিলটায় যাবে তুমি। যেন সকল ছায়ায় পরাগ মেখে নিয়েছে তার এই চকিত কথা।

—বাহ্, বেশ তো তুমি, মাতৃত্বের পরই মছিল জুড়ে দিলে! এ-কথা বলেই খানি গুনগুন করে নেয় ভাস্বত। তারপর বলে, তা মিছিল পেলে কোথায়! আমি তো জানতাম কনভেনশন।

—পৃথিবীর যা কিছু নরম, খুব নরম, শরীর দিয়ে আগলে রাখতে হয়, যা কিছু আদিতম, সুন্দর-সুন্দরতম তার জন্যেই মিছিল। পাড়ে বসে নদীতে পা ডুবিয়ে খেলতে-খেলতে যেন গাইতেও চাইছে অন্তু—

And how many roads must a man walk down
Before you can call him a man?

তোর বব ডিলান। যাবি মিছিলের সতো? মিছিল তো কর্মসূচিতে ছিলই। মিছিল করেই কনভেনশনে যাওয়া হবে। ময়দানে। যাবি সতো?

—অয়, সেই মুখস্থ করা শব্দগুলি বেরিয়ে এল, কর্মসূচি, কমিটমেন্ট, সংগঠন। ভাস্বত-র কথায় হেসে ফেলে অনন্তা।

—কনভেনশনের জন্যে ছবিটা এঁকেছে তো! তোমার জনতা বুঝবে ছবিটা?

—তুমি জানো না, মিছিলের মানুষের বোধ অনেক প্রখর। উচ্চারণ প্রখর, বোধ প্রখর। মিছিল পা-রাখলেই সেতারের তারের মতো টানটান হয়ে ওঠে সে। তখন আকাশ-ভরা মেঘের চাঁদোয়া। বলতে-বলতে জানালার কাছে আসে অনন্তা। আকাশ দেখে। আকাশ দেখতে-দেখতেই বলে, একা-মানুষ আর মিছিলের মানুষের মধ্যে অনেক ফারাক। একা সে হয়তো বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। মিছিলের মানুষ অনেক আগে বুঝে নেয়, অনেক গভীরে বুঝে নেয়।

—যেতে পারি, তোমার ছবিটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

—হোল্ড, হোল্ড সতো। করুণা কোরো না প্লিজ। এঁকেছি যখন নিয়ে যেতেও পারব ময়দান পর্যন্ত। ছবিটা ক্যানভাস থেকে নামায় সে।

—রেগে যেয়ো না প্লিজ। আমায় টেনো না এসবের মধ্যে। তুমি তো জানো এত

হইচই, আমার চিৎকার...

—আর কবে চিৎকার করবে? কবে চিৎকার করবেন ভাস্বত চৌধুরি? অনন্তা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। কলিজা নিংড়ে নিয়ে যেন সে এক-একটা শব্দ বলে উঠছে, একদল মানুষ একঝাঁক নারীকে ঘিরে ধরে ধর্ষণ করছে, শহরে গ্রামে, প্রায় ওই গোটা রাজ্য জুড়ে। যখন যে খুশি ধর্ষণ করছে, সমবেত ধর্ষণ। ধর্ষণের পর পেটাচ্ছে। যত খুশি পিটিয়ে উল্লাস পাচ্ছে। তারপর আগুনে ঠেসে ধরছে, আগুনে ছুঁড়ে দিচ্ছে। হিন্দু জনতা ধর্ষণ করতে চলেছে ব্যান্ড ব্যাগপাইপার বাজিয়ে, গেরুয়া ঝান্ডা উড়িয়ে, জয় শ্রীরাম উল্লাস ধ্বনি নিয়ে। যেন বরাত যাচ্ছে, বিবাহমিছিল। ধর্ষণ করতে এসেছে গেরুয়া হাফপ্যান্ট পরে, অথবা সংঘের খাকি হাফপ্যান্টের তলায় গেরুয়া আন্ডারউইয়ার। ধর্ষণ পবিত্র হয়ে উঠছে।

ইজেলের পিছনের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল এতক্ষণ। সেটা খুলে দেয় অনন্তা। সব-কটা জানালা এখন খোলা। দেখা যায় চারদিকের আকাশে মেঘ। মেঘকে যেন ঘরে ঢাকতে চাইছিল সে।

—ভাবো, ভাস্বত, আমায় যদি অমন করত। ঠিক অমনটা, আমায়।

জানালা থেকে বাইরের দিকে মুখ রেখে, মেঘের দিকে মুখ রেখে কথাগুলো বলেছিল অনন্তা। এবার সে ঘরের দিকে ফেরে, ভাস্বত-র দিকে, দ্রুত। বলে, কেন করবে না বলো, করতে তো পারেই সুযোগপেলে। সাভারকরের লেখায় ছিল মুসলমান আর খ্রিস্টানরা ভারতীয়ই না। মানুষই না। পরে হিন্দু পরিষদের সংবিধানে ওই তালিকায় যোগ হয়েছে কমিউনিস্টরা।

মেঘভরা আকাশ। ফলত গুমোট।

—কী ভাবছ, বক্তৃতা দিচ্ছি আমাদের যেমন স্বভাব।

রাস্তায় ঘন্টি বাজছে। বোধয় আইসক্রিমওয়ালার ঘন্টি।

—বক্তৃতার রিহার্সালও দিচ্ছি না আজকের কনভেনশনে বলব বলে। আজ আমার বলার বলা নয়।

অন্তু একবার শব্দের তফাত চিনিয়েছিল, কোনটা ধোসাওয়ালার তাওয়ার শব্দ, কোনটা আইসক্রিমওয়ালার ঘন্টি।

—বিশ্বাস করো, বক্তৃতা দিচ্ছি না। ধর্ষণের পর যোনি কেটে-খুঁচিয়ে কুচি-কুচি করেছে। লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়েছে। রাস্তায় মহল্লায় যেসব নারী-শরীর পাওয়া গেছে তাদের যোনিতে কিছু-না-কিছু গুঁজে দেওয়া। বক্তৃতা না, পড়ো পড়ো এগুলো। অনন্তা প্রায় পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ডকুমেন্টগুলো এনে ভাস্বত-র সামনে ফেলে।

—তোমার গানে দুটো লাইনস আছে না? And how many ears must one man have/Beore he can hear people cry? বল সত্যে, এখনও বধির থাকলে গানটা গাওয়ার অধিকার থাকে তোর! বলবি তো, বক্তৃতা দিচ্ছি। অন্তু ভাস্বত-র কাছে এসেছিল, দু-কাঁধ শক্ত হাতে ধরেছিল। অভিনাটকের প্রচলিত দৃশ্যের মতো দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকায়নি নিশ্চয়ই। তবে তার কথায় যে ঘাত ছিল, তাতে ভাস্বতর শরীরও কিছুটা কেঁপেছিল নিশ্চয়ই।

আর দু-কাঁধের ওপর শক্ত করে ধরা অন্তুর হাতের ওপর নিজের দু-হাত রাখে ভাস্বত, বলে, অন্তু আমি নির্বোধ নই!

—ওই মহিলাদের জায়গায় আমাকে ভাবো, ভাস্বত। যোনিতে অমন রড গোঁজা! এই হিন্দুগুলোর মতো কেউ বলতেই পারে, এক কা বদলা শও মে লেঙ্গে।

আরও ঝুঁকে এসেছে মেঘ। ফলত আরও মূক চারদিক। দ্রুত ঘন্টি বাজাচ্ছে আইসক্রিমওয়ালা। এই হিন্দুগুলোর মতো কেউ বলতেই পারে, এক কা বদলা শও মে লেঙ্গে।

আরও ঝুঁকে এসেছে মেঘ। ফলত আরও মূক চারদিক। দ্রুত ঘন্টি বাজাচ্ছে আইসক্রিমওয়ালা। দ্রুত, প্রায় বিপদঘন্টির মতো। বৃষ্টি আশঙ্কায়।

—একটা মেয়ে, ফুলের মতো, জীবনকে সে এখনও বুঝতেই শেখেনি, ওর মা মেদিনা মুস্তাফা বলেছে, ওরা এল, মেয়েটা ছিঁড়ে খেল, টোলার মধ্যে থেকে কেউ-কেউ বলব, 'খাবি খা, চিহ্ন রাখিস না, চিহ্ন রেখে যাবি নে'। ওরা কিরিচ দিয়ে কুচোল, পেট্রল ঢালল। মেদিনা মুস্তাফা বলেছে — আমি দেখলাম আগুন জ্বালানো হল, খানিক পরে ওরা যেতে শুরু করল। তারপর সব শান্ত।

পাখিরাও ডাকছিল না। ডাকছে না কেন, এমন গুমোট করে এলে বাসা আগলানোর জন্যে ফিরে যাওয়ার পথে কিছু পাখি তো ডাকে। অন্তু জানলার কাছে ফিরে গিয়েছিল কখন। আকাশই খুঁটিয়ে দেখছিল। ভাবছিল বৃষ্টি নামবে না তো, ঝড়! তাহলে মিছিলটা...। জানালা ধরেই দাঁড়িয়েছিল অন্তু। ডকুমেন্টগুলোর ওপর নিথর চোখ রেখে ভাস্বত। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসে। পরপর হাওয়ার দু-তিনটে ডানা জানালা দিয়ে দোতলার ঘরের ভিতর।

—চলো যাই। ভাস্বত বলে।

—সত্যি।

—চলো তোমার সঙ্গে আজ যাই।

পাখিরা হঠাৎ ডেকে ওঠে ক-জন। সে বোধহয় বাতাসের আশ্বাসে।

—চলো যাই। ছবিটা দাও আমার হাতে। তোমার মিছিল এগিয়ে যাবে। ছবিটা ঢাকবে কি দিয়ে?

বৈজয়ন্তীর মতো এখন আঁচল উড়ছে অনন্তার বাতাসের কথায়-কথায়। সে ছবিটা ঢাকছে পলিথিন পেপার দিয়ে। বাঁধছে।

—আমার গান, আমার গানের কী হবে অন্তু!

—ভবি ভোলে না। পাগল! অনন্তা হাসে। বলে, দু-পংক্তি তো ভেবে রেখেছি। চলো না, হাঁটতে-হাঁটতে বাকিটা পেয়ে যেতে পারি।

—তোমার মিছিলে?

—হুঁ।

—তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো? ভাস্বত বলে, আমায় ফেলে এগিয়ে যাবে না তো!

—যাহ্! বব ডিলান রয়েছেন না।

ওরা দ্রুত নেমে আসে। নীচের তলায় দুয়ার খুলে পথে নামে। তার পা তখন প্রায় দৌড় চাইছে। তোমার ঘরের জানালাগুলো কিন্তু খোলাই থেকে গেল অন্তু। মিছিল মূলত নদীর মতো। সেখানে মিশতে পারলে সে আপনিই টেনে নিয়ে যায়। দমকা বাতাসের সঙ্গে কণা-কণা বৃষ্টি এল। সত্যো, জানো পুরুষ জাতটার প্রতিই কেমন ঘৃণা হচ্ছিল, আতঙ্ক। তোমার হাত ধরে আবার মানুষী হয়ে উঠছি। মিহিন বৃষ্টিতে ভিজছে অলক, আঁচল, চোখের পাতা। জীবনানন্দ অন্তু! তখন বৃষ্টির চন্দন মাখছে মিছিল। কী? ভাস্বত আঁকড়ে ধরে আছে অনন্তার হাত। তোমার ওই মানুষী শব্দটা! উত্তরে অনন্তা শুধু হাসে চিকন বৃষ্টির মতো। পায়ের ছন্দে দাপুটে পয়ারে বাজছে স্লোগান। আশ্চর্য, ভাস্বত নয় অন্তুই প্রথম গুনগুন করে ওঠে, আর কত পথ একলা মানুষ হাঁটবে বলো একা? আর কতসাগর পার হবে ওই গাঙচিলেরই পাখা? ভাস্বত বলে এতো আমার গান, বব ডিলান—How many roads must a man walk down/Before you can call him a man? How many seas must a white dove sail/Before she sleeps in the sand? একটু জোরে হাঁটো অন্তু, তোমার ছবিটা মিছিলের সামনে নিয়ে যেতে হবে না! প্রতি পদবিক্ষেপে বব ডিলানকে নিজের আঁচলে পেতে চাইছে অন্তু, কত গোলাগুলি চিরবে আকাশ থেমে যাওয়ার আগে!/ সেই উত্তর বয় হাওয়া, বন্ধু আমার, তোমার অনুরাগে! মিছিলের সারা আকাশে ভাস্বত তখন জোয়ারি আনতে চাইছে How many times must the cannon balls fly / Before they've forever bann'd/The answer my friend is blowing in the wind.তুই বল সত্যো, এ-গান মিছিল ছাড়া গাওয়া যায়! স্লোগানে, গানে, যৌথিকের পদশব্দে মিছিলের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, যেমন গাঙচিলের ডাক, দাঁড়ের শব্দ মিশে যায় ঢেউয়ের নিজস্ব ভাষায়। এবার ভাস্বত আগে ধরে How many times must man look up/Before he can see the sky? Yes 'n' how many ears must one man have / Before he hear the people cry? সত্যো, তোর তো দুপুরে স্নানই হল না। খাওয়া না। খিদে পেয়েছে খুব না রে? মিছিল থামে না, সমুদ্রে না-পৌঁছলে। থামিস না অন্তু। পায়ে-পায়ে কথা আন, আমি টিউনটা ধরে আছি অন্তু শব্দ খুঁজছে, আর কতবার অন্ধকারে ঢাকবে বলো আকাশ!/ বধির কেন, শুনতে পাও না, আর্তনাদে ভার হয়েছে বাতাস! আর একটু চল, ময়দানে গিয়ে আগে তোকে খাওয়াব। পতাকায়, ছবিতে, পোস্টারে, মানুষে, মিছিলের নিজস্ব একটা শরীর থাকে। সমস্ত স্লোগান ছাপিয়েই যেন ভাস্বত গাইতে চাইছে How many deaths will it take till he knows / that too many people had died? পশ্চিমী শব্দগুলোর মাঝপথেই পুবালি শব্দগুলি বসিয়ে দেয় অন্তু, আর কত লোক মরলে বলো কলজে তোমার জাগে? চার মাত্রায় ধরেছ সত্যো? কণা কণা বৃষ্টির শেষে তখন হাওয়া! হ্যাঁ কাহারবা, লাওনি ঠেকা! কণা কণা বৃষ্টির শেষে তখন আশ্চর্য হলুদ আলো। পশ্চিমী আর পুবালি পংক্তিমালা তখন সঙ্গমে বইছে the answer my friend is blowing in the wind, সেই উত্তর বয় হাওয়া, বন্ধু আমার....। শালুর গন্ধে, কাঁচা রংয়ের গন্ধে, মানুষের গন্ধে, খিদের গন্ধে মিছিলের একটা নিজস্ব ঘ্রাণ আছে।

দুজন মানুষ দুপুর থেকে বিকেলের মাঝপথে এসে নিজেদের ভাষা, শরীর ও শরীরের ঘ্রাণ খুঁজে পাচ্ছে। □

হিন্দু

দি ব্যে ন্দু পা লি ত

প্রতিদিনের মতো আজও ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান সেরে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন মথুরনাথ। খালি পা, পরনে ধুতি, গায়ে নামাবলী, কপালে তিলক, হাতে তামার পাত্রে গঙ্গাজল। সুগৌর পায়ের পাতায় জল শুকিয়ে গেলেও মাটি লেগে আছে এখনও। মুখে অস্ফুট গীতার শ্লোক। প্রতিদিনের এই নৈষ্ঠিকতা শীতে বাতাসের ছোবল থেকে বাঁচায় তাঁকে, গ্রীষ্মে হয়ে ওঠে ক্লান্তিহর। নিতান্তই অসুস্থ না হয়ে পড়লে গত তিরিশ বছরে এই অভ্যাসে ছেদ পড়েনি কখনও।

দশ-বারো বছর আগে ভোরের স্নানযাত্রায় সঙ্গী পেতেন কাউকে কাউকে। তাঁদের কেউ মারা গেছেন, কেউ অথর্ব, কেউ বা রামপুর ছেড়ে চলে গেছেন অন্যত্র। শেষ সঙ্গী বানোয়ারিলাল মারা যাবার পর এখন তিনি একা। নতুন কেউ আসেনি। মথুরানাথ জানেন দিনকাল পাল্টে গেছে, আরো পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ। শুদ্ধাচার বিনষ্ট হবার মুখে। মানুষ এখন ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে, রাজনীতি করে ; কিন্তু ধার্মিকতা মানে না। এই যে এখন একা একাই গঙ্গাস্নান করতে যান তিনি—একাই স্পর্শ করেন প্রত্যূষের নদীজল, এসব সময়ে এক বিচিত্র উপলব্ধি স্পর্শ করে যায় তাঁকে। মনে হয় তিনি যেমন গঙ্গার, তেমনই প্রতি ভোরে গঙ্গাও অপেক্ষায় থাকেন তাঁর—তাঁকে সংস্পর্শ দেবার জন্যে থেমে থাকেন কিছুক্ষণ। তিনি যখন থাকবেন না তখন নদী অন্যমনস্ক হবে।

দশ-বারো বছর আগে অবশ্য নদী এতটা দূরে সরে যায়নি। তখন মাইল দুয়েক দূরে খঞ্জপুর ঘাটে গেলেই হতো। মূল স্রোত ক্রমশ বাঁক বদল করতে শুরু করায় চড়া পড়তে শুরু করে খঞ্জপুরে। নদী আর নদী থাকেনি। পাঁক, আগাছা আর সর্ষেগাছের মধ্যে দিয়ে ক্ষীণ যে জলধারা এখন বহে যায় তাতে পায়ের পাতা ভেজে না। সুতরাং যেতে হয় অনেকটা দূরের পীরপুর ঘাটে—গঙ্গা যেখানে আজও নদী, বেশ চওড়া, ও গভীর, সারাক্ষণ টলটল করে জলের গতিতে।

বাষট্টি বছরের মথুরানাথ পাণ্ডের এই খেয়াল পছন্দ করে না তাঁর বাড়ির লোকজন—স্ত্রী কৌশল্যা, মেয়ে বিন্দিয়া, ছেলে বিপিন এবং পুত্রবধূ নীতা। এমনকি কাজের লোক গয়ারাম, লছমিও। দিনকাল খারাপ। ইদানীং কোথাও তেমন কিছু না ঘটলেও গত দাঙ্গার পর থেকে একটা চাপা আশঙ্কা যে ছুঁয়ে থাকে রামপুর ও তার আশপাশের মানুষজনকে, কেউই একা হতে চায় না—সেটা কে না বোঝে!

মথুরানাথের ছেলে বিপিন আইন পাস করেছে পাটনা থেকে। প্র্যাকটিস করে পাটনা, রামপুর দুজায়গাতেই। ভোর রাতে উঠে বুড়ো বাপের গঙ্গাস্নানে যাওয়া নিয়ে মা কৌশল্যার অনুযোগ শুনে কিছুদিন আগে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টায় বলেছিল, 'বাবুজি,

সুবহ ঘর মে আস্নান করনেসে আপকা ধরম ঝুটা হো জায়গা কেয়া? বুঢ়াপে মে কুছ শোচ বিচার চিন্তা আনা চাহিয়ে। আখির হামলোগোঁ কী ওর ভি তো দেখিয়ে! মা কিতনা রোতী হ্যায়।'

শুনে হেসেছিলেন মথুরানাথ। যেমন হাসেন, স্বচ্ছন্দে।

'দেখো বেটা, মেরে লিয়ে চিন্তা নেহি করো। ধরমকা চিন্তা মনুষ্যকো অপনী অপনী হোতী হ্যায়। যেইসে তুমারা আঁখে দিখাতা হ্যায় ম্যয় তুমারা পিতা হুঁ—ঔর ম্যয় দেখতে হুঁ তুম মেরা পুত্র হো। ম্যায় হিন্দু হুঁ—অগর মেরা আত্মা শুধ রহে, বিশওয়াস টিকি রহে, তো মেরা কাজকাম ভি ঠিকই রহেগা। লাগাতার তিশ বাত্তিস সাল আস্নান মে গিয়া, লৌট ভি তো আয়া অবতক! কুছ অনিষ্ট তো নেহি হুয়া!'

'আপকা বাত সহি হ্যায়।' বিপিন বলেছিল, 'লেকিন অচানক কুছ হো যায় তো! অনিষ্ট আশমান সে হি ঝুঁকতা হ্যায়—'

'পরন্তু ইয়ে অনিষ্টকে বাত ভি নেহি হ্যায়। ছেলেকে এইভাবে আশ্বস্ত করে স্বভাববশত গীতা থেকে উচ্চারণ করেছিলেন মথুরানাথ, 'ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।' বেফিকির রহো।'

মথুরানাথের চাপে পড়ে একদা সংস্কৃতচর্চা করার সময় গীতা পড়েছিল বিপিন, সে জানে এই শ্লোকাংশের অর্থ কী। মথুরানাথ কর্মফলে বিশ্বাস করেন না, গার্হস্থ্য জীবনযাপন করলেও সন্ন্যাসীর শুভচারিতা তাঁর রক্তে—মোক্ষলাভের প্রত্যাশা নেই। জ্ঞান হবার পর থেকেই বিপিন দেখেছে মানুষটাকে ধার্মিক, ন্যায়-অন্যায় মানেন, শ্রদ্ধা করেন নিজের হিন্দুত্ব ও পৈতেকে। এ অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, অন্ত্যজ সব মানুষই চেনে তাঁকে, সম্মান করে। আগে যখন চারদিকে সব মানুষের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ছিল তখন বহু লোক আসত তার কাছে। ঘনিষ্ঠরা বসত, সরবত খেত, কথা শুনত তাঁর। এখন কানহাইয়ালালজি, দয়াচরণ মিশ্র, জানকীনাথ চৌধুরী এবং এমনই প্রবীণ দু-চারজন ছাড়া নিয়মিত আসেন না কেউ। নতুনদের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান, রুচির ব্যবধান, একটু-আধটু ভাবারও ব্যবধান। তবে সম্মানটা পান।

বাপকে নিয়ে বিপিনের চিন্তার কারণও ও-ই, বয়স। আগের মতো সবল, সমর্থ নেই। ঠিকঠাক অ্যাটাক না হলেও বছর তিনেক হার্টের অসুখে ভুগেছিলেন বেশ কিছুদিন। চিনচিনে ব্যথা হতো বুকে বাঁ হাতে। চিকিৎসা করাতে হয়েছিল পাটনায় নিয়ে গিয়ে। ডাক্তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে বললেও বেশি পরিশ্রম করতে মানা করেছিল। কে শোনে! রোজ ভোরে এই গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া এবং ফিরে আসাটাকে মথুরানাথ নিজে স্বাভাবিক মনে করলেও অন্যরা করে না। একা একা যাতায়াত, সাঁতার জানেন না—কোনোদিন হঠাৎ কিছু ঘটলে টেরই পাবে না কেউ। অন্য ধরনের ভয় ছাড়াও রাস্তাঘাট খারাপ, যখন বেরোন তখন ঘুটঘুট করে অন্ধকার। হোঁচট খেতে পারেন, বা পাটনা, মোকামা, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ থেকে আসা-যাওয়া করে যেসব লরি আর ট্রাক, অসাবধানে চাপাও পড়তে পারেন সেগুলোর কোনোটায়।

ওদের আশঙ্কায় ভুল নেই কোনো। কোতোয়ালিতে তাদের বাড়ি থেকে পীরপুর ঘাটের দূরত্ব কম নয়। এদিক-ওদিক পাঁচ ক্রোশ তো বটেই। এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে

কেউই পার হয় না আজকাল। দরকার পড়ে না। রামপুরের যে অংশটুকু শহর হতে হতেও পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি এখনও, তার একদিকে কোতোয়ালি থানা, রেলস্টেশন, হনুমান মন্দির, বাজার; অন্যদিকে পোস্টাপিস, হাসপাতাল, রামমন্দির আর কাছারি—মোটামুটি দেড়-দুমাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারও বসতি মাঝখানে যত ঘন আশপাশে তা নয়। রামপুরের ওপর দিয়ে বিহার স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস যায় এক দেড়-ঘন্টা অন্তর, শহরের মধ্যে সাইকেল চলে, সাইকেল রিকশা আছে বেশ কয়েকটা, মোটর আছে দু-চারজনের। আর বাহন বলতে ঘোড়ায় টানা এক্কা আর গোরুর গাড়ি। সেগুলি যাতায়াত করে রামপুরের আগের বসতি নাথচৌক থেকে পরের বসতি ছান্দেরি পর্যন্ত। বাকি পথের খবর রামপুরের মানুষ রাখে না। বছর দুয়েক আগে দাঙ্গার পর থেকে এটা হিন্দুদেরই জায়গা। আগে কংগ্রেসের দাপট ছিল, এখন বিধানসভা নির্বাচনে অধিকাংশ ভোট দেয় বি জে পি-কে। যে কয়েক ঘর মুসলমান অবশিষ্ট ছিল তারা আস্তে আস্তে সরে গেছে ছান্দেরির দিকে। ওদিক থেকেও কিছু হিন্দু চলে এসেছে এদিকে। নিতান্তই দায়ে না পড়লে এখন কেউই আর এদিক ওদিক করে না।

প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে এসে মথুরানাথ যখন বাড়ির কাছাকাছি তখন আর ভোর নেই, সূর্য উঠে গেছে, নরম রোদ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে চারদিকে। পথ হাঁটার পরিশ্রমে ঘাম ফুটেছে তাঁর কপালে। ঘাম অনুভব করছেন নামাবলীর নীচে, পিঠে ও বুকে। গরম পড়তে শুরু করেছে, দুপুরের দিকে ছোটোখাটো ধুলোর ঝড় বয় মাঝে মাঝে। এরপর বাড়িতে পৌঁছে দরজার শিকল নাড়লেই দরজা খুলবে। বেশিরভাগ দিনই ছুটে আসে মেয়ে বিন্দিয়া কিংবা পুত্রবধূ নীতা, যে সেদিন রজস্বলা নয়। গঙ্গাজলের পাত্রটি হাতে নিয়ে পৌঁছে দেয়, পুজোর ঘরে। নিঃশ্বাস সহজ করে তারপর উঠোনের টিউবওয়েলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন মথুরানাথ। অনুগত দয়ারাম জল পাম্প করলে সেই জলে পা ধোবেন তিনি, আচমন করবেন। গা থেকে নামাবলী খুলে পরিষ্কার গামছায় গা হাত পা মুছে চলে যাবেন পুজোর ঘরে। মিনিট দশেক চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবেন শ্বেত পাথরের রাম ও কৃষ্ণের মূর্তির সামনে। বেলপাতায় গঙ্গাজাল ও চন্দন নিয়ে ছিটোবেন তাঁদের পায়ের কাছে, দু-এক ফোঁটা জল মুখে ঠেকিয়ে উঠে পড়বেন। এখন তাঁর বারান্দার খাটিয়ায় গিয়ে বসবার সময়। পিতলের গ্লাসে ঠান্ডা দুধ নিয়ে আসবে কৌশল্যা। খাবেন। তারপরই ক্রমশ মিশে যাবেন গার্হস্থ্য জীবনে।

কিন্তু, প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় বাধা পড়ল আজ।

মথুরানাথ লক্ষ করলেন প্রায় তাঁদের বাড়ির কাছে বড়ো বটগাছটার সামনে জটলা করছে সাত-আটজন লোক। একজন দাঁড়িয়ে আছে সাইকেল নিয়ে। আর কিছু দেখবার আগেই দ্রুত এগিয়ে আসা সুলতানগঞ্জ-ছান্দেরি বাসের ধুলোয় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলো তাঁর। বাসটা চলে যেতে জটলার সামনে এসে থেমে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ পড়ল কপালে।

অল্প চওড়া পিচের রাস্তার পাশে ধুলোয় পড়ে আছে একটা উলঙ্গ লোক। দেখে মনে হয় মাঝবয়সি। কোমরে ময়লা ফিতের গিট বাঁধা; কিন্তু সেটার সঙ্গে জড়ানো পাজামাটা ছিঁড়ে খসে যেতে যেতে এমন আকার ধারণ করেছে যে শরীর আড়াল হয় না।

গায়ে জামার মতো একটা কিছু আছে বটে, কিন্তু সেটাও এমনই ছিন্ন যে, বাঁ হাতের ওপর দিকে একটা অংশ লটকে থেকে বাকিটা চলে গেছে লম্বালম্বি শুয়ে থাকা শরীরের নীচে। ছিন্ন কাপড় এবং নগ্ন শরীর, সমস্ত কাদা মাখা। যেন পাশের নর্দমায় শুয়ে ছিল বেহুঁশ হয়ে, সেখান থেকে তুলে এনে কেউ শুইয়ে দিয়ে গেছে রাস্তায়। এমনও হতে পারে লোকটা নিজেই যাচ্ছিল কোথাও—এগোতে পারেনি।

সেজন্য নয়। লোকটা চোখে পড়ছে অন্য কারণে। মুখের খানিকটা ও শরীরের কিছু অংশ বাদে তার গোটা শরীরে ঘা। মাথায়, গলায়, বুকে, হাতে কোমরে, তলপেটের নীচে, হাঁটু ও পায়ের পাতা, ঘা সর্বত্র। কোনোটা আকারে ছোটো, কোনোটা শুকোতে গিয়েও শুকোয়নি, কোনোটা চামড়া উঠে, পুঁজ জমে বেশ দগদগে। বিশেষত অণ্ডকোষ ও লিঙ্গের যা চেহারা, চোখ খুলে দেখা যায় না।

অভিজ্ঞ মথুরানাথ চোখ ফেরালেন না তবু। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেন লোকটার ডান চোখ পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও বাঁ চোখ সামান্য খোলা। এভাবে অচেতন শুয়ে থাকা সত্ত্বেও লোকটা যে মরে যায়নি তা বোঝা যায় তার গর্তে ঢোকা পেট, পাঁজরা বেরুনো বুক ও কণ্ঠনালীর ওঠানামা দেখে; মুখ ও গায়ের ঘায়ে মাছি বসলে হঠাৎ কখনও কেঁপে ওঠা দেখে।

মথুরানাথকে দেখে সেখানে জড়ো হওয়া লোকগুলির আলোচনা থেমে গিয়েছিল। পথ-চলতি আরও দু-একজন এসে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। সামান্য ঝুঁকে দেখা অবস্থা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। মথুরানাথ। এই রাস্তা দিয়েই ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন তিনি, তখন চোখে পড়েনি। তারপরেই তাঁর মনে হলো কৃষ্ণপক্ষ চলছে, যে-সময় তিনি গিয়েছিলেন তখন চারদিকে ঘন অন্ধকার, নিজেকেই হাঁটতে হয়েছিল সাবধানে। এমনও হতে পারে, দেহটা তখনও এইভাবে পড়েছিল এখানে।

আশপাশের লোকগুলির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে মথুরানাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কব সে গিরা হ্যায় ইহাঁ পর?'

'কেয়া মালুম, পণ্ডিতজি!' একজন বলল, 'হম তো ব্যস আভি-আভি দেখা!'

আর একজন বলল, 'বিচারা! করিব মরনে বালা হ্যায়!'

'এইসে মত্ বোলো, বাবুয়া!' দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন মথুরানাথ, 'শ্বাস ঠিক হ্যায়। জীবিত হ্যায়। আভি আসপাতাল মে লে যানা চাহিয়ে—বাঁচ যায় গা—'

তখন প্রায় সকলেই মাথা নাড়ল গুঞ্জন তুলে।

যে-যুবকটি সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার তার দিকে তাকালেন মথুরানাথ।

'কী নাম হে?'

'জি, গিরিধারি!'

'তো এইসে করো গিরধারি বাবুয়া, পুলিশ চৌকি মে যা কর বোলো এক বেহুঁস মরিজ গিরা হুয়া হ্যায় ইঁধর—জেরা আসপাতাল বন্দোবস্ত্ করে—'

'জি, মায় তো স্টিশন যায়েঙ্গো। ট্রেন পাকাড়না হ্যায়—'

'একহি তো রাস্তা—বাস খবরহি না দেনা হ্যায়! দো মিনিট কা বাত্! যাও বেটা, ফুর্তি সে যাও!'

সাইকেল নিয়ে গিরিধারী চলে যাবার পর খানিক অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মথুরানাথ। লোকটাকে দেখলেন আবার। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মাছির সংখ্যা। সাধারণ মাছির সঙ্গে একটা দুটো নীল ডুমো মাছিও চোখে পড়ল। ডান চোখের পাতায়, ঠোঁটের পাশে, বুক, হাত, পেট, অণ্ডকোষ—এখন তাদের বিচরণ সর্বত্র। মুহূর্তের জন্যে শরীরটা কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল আবার, ঠোঁট দুটো ফাঁক হতে হতেও হলো না। লোকটা কি পিপাসার্ত? কণ্ঠনালীর স্থিরতা দেখে সেরকম কিছু অনুমান করা গেল না।

গাঢ় নিঃশ্বাস পড়ল মথুরানাথের। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন যেন। হে রাম, হে কৃষ্ণ, মুমূর্ষুর এই নিয়তি সজীব মানুষকে দেখতে হয় কেন। চারদিকে এত মানুষের মধ্যে এই হতভাগ্যের কি কেউই নেই, যে ওর নিজের! এভাবে পড়ে থেকে কোন শান্তি পাবে! তারপর ভাবলেন, তাঁর নাম বললে চৌক থেকে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে পুলিশ, গোরুর গাড়ি বা মাল-টানা রিকশা যাতেই হোক তুলে, একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। আশা করা যাক হয় সুস্থ হবে, না হয় মৃত্যু গ্রহণ করবে ওকে। জীবন এর বাইরে চলে না।

এরপর বাড়িতে ফিরলেও মনটা বিমর্ষ হয়ে থাকল মথুরানাথের। অন্যদিন বাড়ি ফিরে যা যা করেন ও যেভাবে, আজও সেইসব সেইভাবে করলেও চিড় খেল একাগ্রতা। টিউবকলের সামনে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ গামছায় হাত পা মুছতে মুছতে দয়ারামকে বললেন, 'শুনো জি, রাস্তা মে বড়ে পেড় কে পাশ এক বেহুঁস আদমি গিরা হুয়া হ্যায়। পুলিশ চৌকিমে খবর ভেজা গিয়া আসপাতাল লে যানেকে লিয়ে। যাও, দেখো জেরা। অগর উসে পিয়াস লাগা হ্যায় তো হাল্‌কাসে এক দো বুন্দ্ পানি দে না মুমে। আভি আভি যানা।'

দয়ারাম মথুরানাথের অনুগত, কখনো অবাধ্য হয় না। তবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন জাত হ্যায়, মালিক?'

মথুরানাথ চলেই যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়ালেন। সামান্য বিরক্তি ফুটল কোমল মুখে। 'মরিজকে ভি জাত হোতা হ্যায় কেয়া! এক বেচারা মনুষ্য— উসে পানি পিলানা ধরম হ্যায়।'

খড়ম ঠুকতে ঠুকতে পুজোর ঘরের দিকে চলে গেলেন মথুরানাথ। ধ্যানস্থ হতে।

জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কৌতূহল আছে রামপুরের মানুষের, কিন্তু আগ্রহ নেই কোনো। সেই দাঙ্গার সময় চারদিনে দু-পক্ষ মিলিয়ে তেত্রিশটা লাশ পড়ার পর এবং আঠারোজন জখম হবার পর একটু ভয়-ভাবনা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তারপর আবার যে-কে-সেই। কলেরা কি ধরা-না-পড়া অন্য কোনো অসুখে কি ফোঁড়া ভগন্দর সেপটিক হয়ে, বা নিতান্তই বার্ধক্যজনিত রোগে নিয়মিত কিছু মানুষ না মরলে 'রাম নাম সত্ হ্যায়' ধ্বনি ভুলে যাবে লোকে, যেন সেইজন্যেই মানুষের মৃত্যু হয় এখানে। উদ্‌বেগহীন সহজে। জমি বা রাণ্ডি নিয়েও খুনোখুনি হয়, তবে কৃচিৎ। রামজি ভরোসা।

পুলিশ কাজে দম পায় না—চোরের চুরির বখরা নেয়, গা ডলায় পা টেপায় তাকে দিয়ে, জল তোলায় কুয়ো থেকে, কোড়বাই না করলে ছেড়ে দেয় দুদিন পরে। দাঙ্গার

প্রথম দুদিনেই খুন হয়েছিল উনত্রিশ জন, পাটনা থেকে রিজার্ভ পুলিশ এসে অবস্থা সামাল দিয়েছিল, সেই থেকে কাজ না করার ব্যাপারে তারা আরও নিশ্চিন্ত।

হাসপাতালও তেমনই। সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তারের সাইকেলের টায়ার পাংচার হলে সেটা না সারানো পর্যন্ত গালাগালি দেয় সরকারকে, তখন তার ও তার অ্যাসিস্ট্যান্টের ফুরসত হয় না রোগী দেখার। যে কুড়ি-বাইশটা বেড আছে সেগুলো রোগীর চিকিৎসার জন্যে যত না, তার চেয়ে বেশি শুয়ে থাকার জন্যে। ডাগদারবাবুর আত্মীয়স্বজন এলে এবং কোয়ার্টার্সে জায়গা অকুলান হলে হাসপাতালের দু-একটা বেড খালি করে শুতে পাঠানো হয় তাদের। ছোটোখাটো অসুখের চিকিৎসা হয় বটে, কিন্তু কেস একটু জটিল মনে হলেই চোখ বন্ধ করে চালান কেটে দেওয়া হয় ভাগলপুরে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে খাটিয়ায় বসে দুধ খেতে খেতে দয়ারামের খোঁজ করলেন মথুরানাথ। সে এসে খবর দিল লোকটার মুখে কয়েকফোঁটা জল সে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার বেশিটাই গড়িয়ে পড়েছে দু-ঠোঁটের পাশ দিয়ে। মুখে নেয়নি। বলল, গিরিধারী জানিয়ে গেছে পুলিশের আসতে দেরি হবে।

'কিঁউ?' চিন্তিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন মথুরানাথ।

'কেয়া মালুম, মালিক!' দয়ারাম বলল, 'এইসেহি বোলা। উয়ো হাবিলদার সাব কো বহুৎ টাট্টি হো রহ্যা হ্যায় কাল রাতসে। চৌকিমে পুলিশ কম হে।'

'হুঁ।' দু'পাশে দু'হাত ছড়ানো, কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকলেন মথুরানাথ। তারপর বললেন, 'কেয়া দেখা তুম? উয়ো জিন্দা হ্যায় না?'

'জি, মালিক। জিন্দা তো হ্যায়। এইসে লাগা কি মুণ্ডি ভি হিলায়া। ঔর—'

'ঔর কেয়া?'

'জি, উয়ো খৈনিবালা রঘুনাথ কহা, আপ ঘর আনেকে বাদ পিসাব ভি কিয়া। ঔর লোগ ভি কহা।'

দয়ারামের কথায় চিন্তা বাড়ল মথুরানাথের। মুখে জল নিল না, অথচ বলছে পেচ্ছাপ করেছে। সমস্তই লোকটার সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা প্রতিপন্ন করে। যেটা আরও ভয়ের, যে-ধরনের ঘায়ে সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে লোকটার, তার ওপর ক্রমাগত মাছি বসলে, রাস্তার ধুলো পড়লে রোগ আরও জাঁকবে। এসব শরীরের ভিতরের আরও বিষাক্ত কোনো অসুখের প্রভাব পড়বে কি না কে বলবে! দয়ারামের কথা শুনে মনে হলো বেশ কিছু লোক ভিড় করে আছে ওখানে। কী দেখছে ওরা—ওরকম ধুঁকতে ধুঁকতে কখন মরে যায় অপরিচিত মানুষটা! এভাবে কি মরতে দেওয়া যায় মানুষকে!

বিপিন নেই এখানে। মামলা লড়তে গেছে পাটনায়, আজকালের মধ্যেই ফেরার কথা। ও থাকলে পরামর্শ করে একটা উপায় বের করা যেত। তাহলে কি জানকীনাথ চৌধুরীকে খবর দেবেন? রামপুরের এম এল এ-র ঘনিষ্ঠ, জানকীনাথ ইচ্ছে করলেই একটা ব্যবস্তা করতে পারে। কিন্তু সে থাকে নাথচৌকের দিকে—বিকেলে যদিও নিজের গাড়ি চড়ে রোজই আসে এদিকে, ঢুঁ মেরে যায়, এখন অতটা দূরে কে খবর দেবে তাকে। দয়ারামকে দিয়ে খবর পাঠালেও জানকীনাথ যে বাড়িতেই থাকবে তার নিশ্চয়তা কী?

একটা অধৈর্য ভাব দেখা দিল মথুরানাথের মধ্যে। ঘাম এলো শরীরে। খাটিয়ার ওপর পড়ে থাকা হাতপাখাটা তুলে নাড়তে গিয়েও নাড়লেন না। হঠাৎ চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকলেন, 'বিন্দিয়া—ও বিন্দিয়া—

বিন্দিয়া স্নানঘরে। পিছনের বাগানে ভিজে কাপড় মেলতে গেছে নীতা। জাঁতায় কলাই পিষছে লছমি। বস্তা থেকে কুলোয় কলাই বের করতে করতে স্বামীর হাঁকডাক শুনে নিজেই বেরিয়ে এলো কৌশল্যা ?

'কেয়া বাত হ্যায় ? কুছ্ চাহিয়ে কেয়া ?'

দরজার পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে দেখতে দেখতে চিন্তাটা গুছিয়ে নিলেন মথুরানাথ।

'দুগো রুপেয়া জেরা লা দেও। দয়ারাম কো আসপাতাল ভেজনা হ্যায়—রিকশামে যায়গা—'

'আসপাতাল !'

'হাঁ। বাহার পেড়কে পাশ এক বেহুঁস মরিজ গিরা হুয়া হ্যায়। আখির কোই তো খয়াল করে গা !'

ঘটনাটা লছমির মুখে আগেই শুনেছে ওরা। স্বামীকে চেনে, সুতরাং কথা না বাড়িয়ে টাকা আনতে ভিতরে গেল কৌশল্যা।

দয়ারামকে হাসপাতালে খবর দিতে পাঠিয়ে ফতুয়া চড়িয়ে, কাঁধে গামছা নিয়ে নিজেও রাস্তায় বেরিয়ে এলেন মথুরানাথ।

অন্তত জন-কুড়ি বিভিন্ন লোক তখনো জড়ো হয়ে আছে ওখানে। তাদের মধ্যে দিয়ে ঝুঁকে, গনগনে রোদের মধ্যে সেই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সর্বাঙ্গে কম্পন অনুভব করলেন মথুরানাথ। সেই একই ভঙ্গি ; কিন্তু অসংখ্য মাছিতে ছেয়ে গেছে লোকটা। বিশেষত বুক ও অণ্ডকোষের দগাদগে জায়গাগুলো যেন মৌমাছির চাক, মাছিতে প্রায় ঢেকে ফেলেছে ক্ষতগুলো। জমে আছে, উড়ছে, আবার এসে বসছে। মাছি চোখের পাতায়, পাঁজরের খাঁজে খাঁজে, ঠোঁটের ওপর। ওরই মধ্যে চোখে পড়ল বুকের অল্প ওঠানামা। দেখতে দেখতে চোখের পাতা ভিজে এলো মথুরানাথের। ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই কাঁধের গামছাটা টেনে নিয়ে ব্যস্ত হলেন মাছি তাড়াতে।

গামছার হাওয়ার ঝাপটায় মাছিগুলো ওড়াউড়ি শুরু করতে ছোঁয়া বাঁচানোর ভয়ে তাড়াহুড়ো করে পিছিয়ে গেল লোকগুলো। মনে হলো আরাম পেয়ে লোকটা কেঁপে উঠল একটু। মাথাটাও কাত করল সামান্য।

মথুরানাথ উঠে দাঁড়াতে ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটি লোক মন্তব্য করল, 'অব তো ফিন আপকো গঙ্গা মে স্নানে পড়ে গা, পণ্ডিতজি !'

'কিঁউ !'

মথুরানাথকে বিরক্ত দেখে যে মন্তব্য করেছিল সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'দেখিয়ে না, অব পুরা মাছ্ছি তো আপহি কা বদন মে গিয়া ! রাম জানে কোন জাত !'

কথাটা ঠিকই। মথুরানাথ লক্ষ করলেন উড়ে যাওয়া মাছির অনেকগুলোই এখন এসে বসেছে তাঁর ফতুয়া ও ধুতিতে। আবার যাচ্ছে লোকটার গায়ে। কোনো জবাব না দিয়ে থমথমে মুখে বাড়ির দিকে এগোলেন তিনি।

হাসপাতালে পাঠিয়ে কাজ হয়নি। দয়ারাম ফিরে এসে বলল, 'ডাগদারবাবু আভি নহি আয়া, মালিক। ডেপটিবাবু ভিতর থা, ভেট নেহি হুয়া। উয়ো চৌকিদার কহা কি, আনেসে খবর দেগা—'

মথুরানাথ জবাব দিলেন না। মুখটা আরও একটু চিন্তিত হয়ে উঠল শুধু। নিঃশ্বাস পড়ল ঘন হয়ে।

এরপরেই একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মথুরানাথ। বাড়ির মেয়েদের ডাকলেন। গযারামের ঘরের পাশের ঘরটা খালি পড়ে আছে। ঘরটা ঝেঁটিযে দিক লছমি। খাটিয়া পাতুক। লোকটাকে রাস্তা থেকে ঘরে নিয়ে আসবেন তিনি।

মৃদু আপত্তি তুলল কৌশল্যা।

'শুনিয়ে জি, আপ ব্রাহ্মণ হ্যায—'

অন্যরকম দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মথুরানাথ।

'অগর মনুষ্যকে সেবা ব্রাহ্মণকে কাম নেহি হ্যায় তো আজ সে ম্যায শূদ্র বনেঙ্গো।'

এ কথায হকচকিযে গেল সকলে। মথুরানাথের এমন মূর্তি, এমন চোখমুখ কেউ দেখেনি আগে। যেটা আরো আশ্চর্যের, হঠাৎই এক ফোঁটা জল গড়িযে পড়ল তাঁর চোখের কোল বেযে। বিষণ্ণ হাতের উল্টোপিঠে সেটা মুছে নিযে তিনি উচ্চারণ কবলেন, 'হে বাম, হে কৃষ্ণ!'

নীতা কৌশল্যার পাশে গিযে দাঁড়াল। বিন্দিযা বলল, 'আপকা বিচার সহি হ্যায, বাবুজি। আখির উযো তো এক মরিজই হ্যায়। যাও দয়ারাম, বাবুজিকে সাথ যাও। ময ইধর বন্দোবস্ত্ করতি হুঁ।'

অনুগত দয়ারাম, দ্বিধা থাকলেও নিঃশব্দে অনুসরণ করল মথুরানাথকে।

রামপুরের মানুষ এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি আগে। ঘেয়ো, অচৈতন্য, জাতপাত না-জানা একটি রাস্তার মানুষকে বুকে কোলে করে বাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন মানুষ। তাঁদের একজন কি না মথুরানাথ!'

দৃশ্যটা দেখে কেউ ভয় পেল, কেউ নাক কোঁচকালো ঘৃণায়। সংখ্যায় অল্প হলেও, মাথাও নাড়ল কেউ কেউ। খবরটা চাউর হয়ে গেল চারদিকে।

লোকটাকে বাড়িতে এনে, খাটিয়ার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন মথুরানাথ। তিনি চিকিৎসক নন, কিন্তু শুশ্রূষা জানেন। ক্ষতস্থানগুলো সাবধানে মুছে বাটা চন্দনের প্রলেপ দিলেন সেখানে। জ্বরের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন; তারপর চামচে করে দুধ খাওয়ালেন যতটা পারেন। স্নেহের হাত বোলালেন মাথায়। লোকটার উলঙ্গ দেহের ওপর ঢাকা পড়ল পরিষ্কার চাদরের। নাকের কাছে হাত এনে অনুভব করলেন নিঃশ্বাস সহজ হয়েছে অনেকটা। তখন নিশ্চিন্ত হযে টিউবকলের জলে স্নান করতে গেলেন তিনি।

দুপুরে আর এক দফা ওষুধ আর দুধ খাইয়ে মনে হলো কিছুটা তেজ এসেছে লোকটার শরীরে। তখন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেলেন তিনি।

বিকেলে কানহাইয়ালালজি, জানকীনাথরা এসে সব দেখেশুনে মাথা নাড়ল। যে যাই বলুক, কাজটা ঠিকই করেছেন মথুরানাথ. রামপুরের পুলিশ আর হাসপাতাল নিয়ে কিছু

করা দরকার, বললেন জানকীনাথ। এমন অব্যবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। যাক, লোকটার জ্ঞান ফিরুক, তারপর তিনি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

বিপিন ফিরল সন্ধের পরে। মামলায় জিতে খুশি ; কিন্তু, মথুরানাথের কান্ড দেখে খুশি হয়েছে মনে হলো না। প্রায় ঠাট্টার গলায় বলল, 'ইয়ে তো করিব মহাত্মাজি কো কাম হো গিয়া! ইয়ে সন্দেশ রাষ্ট্রপতিকে পাস যানা চাহিয়ে—'

ছেলের মুখে এমন কথা আশা করেননি মথুরানাথ। ব্যথিত চিত্তে হাসলেন তিনি।

'তো তুম মেরা পুত্র নেহি হো!'

'আপ গলত সমঝ রহে হে, বাবুজি। ম্যায় আপহি কা পুত্র হুঁ। লেকিন রামপুরকে আম জনতা আপকা পুত্র নেহি হ্যায়। অগর হোতা তো পিছলে বালা দাঙ্গা নেহি হোতা।'

মথুরানাথ চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। আত্মবিশ্বাসে ঋজু গলায় বললেন, 'সায়দ—। লেকিন মেরা ধরম্ মুঝে হি পালন করনে হোগা।'

পরের দিন ভোরে যথারীতি গঙ্গাস্নানে গেলেন মথুরানাথ। ফিরেও এলেন।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গতকাল যেমন দেখেছিলেন তেমনি দেখলেন বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে বাড়ির সামনে। সকালের রোদ তখন উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। সেই আলোয়, দেখলেন, একটা মোটরও দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চেনা লাগল। কী ব্যাপার, বুঝলেন না। কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা চিন্তিত হয়ে ধীরে পায়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা কিছুই বলল না।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হলেন মথুরানাথ। জানকীনাথ কথা বলছেন বিপিন আর বিন্দিয়ার সঙ্গে। তাঁকে দেখেই ওরা চুপ করে গেল।

'কেয়া বাত হ্যায়! জানকীনাথজি আপ? ইতনা সুবহ্!'

গঙ্গাজলের পাত্রটি মথুরানাথের হাত থেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল বিন্দিয়া।

'জি। আনেহি পড়া।' জানকীনাথ তাকালেন বিপিনের দিকে, 'তুম বোলো, বিপিন। আপ বৈঠিয়ে না, পণ্ডিতজি।'

মথুরানাথ বসলেন না। সন্দেহের চোখে তাকালেন বিপিনের দিকে।

'বাবুজি—' ইতস্তত করে বলল বিপিন, 'উয়ো আদমিকো আভি হটানা হোগা ঘরসে—'

'কিঁউ!'

'কারণ, উয়ো মুসলমান হ্যায়।'

স্তম্ভিত চোখে বিপিনের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলেন মথুরানাথ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া উয়ো হোঁস মে আয়া হ্যায়?'

'জি নেহি।' জানকীনাথ বলল, 'লেকিন সারে ওর লোগ এইসে হি কহ রহা হ্যায়। উয়ো নাঙ্গা থা—বদনমে পহচান ভি থা—'

মথুরানাথের মুখে কথা ফুটল না।

'ইয়ে সচ্ হ্যায়, বাবুজি।' বিপিন বলল, 'কাল রাত দয়রাম বোলা থা হমকো—বেহুঁসি মে উয়ো মরিজ "হায় আল্লা" বোলা—'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সচেতন হলেন মথুরানাথ।

'ঠিক হ্যায় লেকিন—, উয়ো এক বেহুঁস মনুষ্য ভি তো হ্যায়। অভি আরাম হোনে দেও, ফির চলা যায়গা। মেরা ধরম এইসে হি কহতা হ্যায়।'

'আপকা ধরম আপহি কো রহনে দিজিয়ে, পণ্ডিতজি।' কঠিন গলায় এবার বলল জানকীনাথ, 'সিচুয়েশন কুছ খারাপ লাগতা হ্যায়। কেয়া আপ রামপুরকো নেহি জানতে হেঁ! কেয়া আপ চাহতে হেঁ কি ইধর হামলা শুরু হো যায়—ফির এক রায়ট লাগে?'

তখন স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

জানকীনাথ বলল, 'উয়ো মরিজকো বন্দোবস্ত্ ম্যয় হি করুঙ্গা। আপকো কোই হানি নেহি হোগা। আপ আরাম কিজিয়ে, পুজাপাঠ কিজিয়ে। ইয়ে ছোটিসি বাত হ্যায়।'

সম্ভবত তা-ই। সামান্য ঘটনা এটা। তবু বড়ো একটা নিঃশ্বাস সংবরণ করলেন মথুরানাথ। অদ্ভুত শারীরিক অস্বস্তিতে ঘোর লাগল তাঁর। কান গরম, জ্বালা করে উঠল চোখের কোণদুটো। নামাবলীর ভিতর দিয়ে পইতে স্পর্শ করে শিথিল ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন তিনি 'হে রাম! হে কৃষ্ণ!'

তার পরের ঘটনাগুলো ঘটল খুবই স্বাভাবিকভাবে। মথুরানাথ পা ধুলেন, গা মুছলেন, পুজোর ঘরে গেলেন, দুধও খেলেন। কোনো প্রশ্ন করলেন না কাউকে। যেন একটু আগেকার অভিজ্ঞতা ভুলে গেছেন তিনি, যেন প্রতিদিনের মতো আজও আরো একটা দিনমাত্র। রোদ আছে, হাওয়াও আছে; সবই প্রকৃতিস্থ। সামান্য গাম্ভীর্য আর অন্যমনস্কতা ছাড়া কোনো ভাবান্তর ঘটল না তাঁর।

কৌশল্যাকে চিন্তিত দেখে বিপিন বলল, 'বাবুজি আপনা ধরম্ পালন কিয়া, বাকি যো সব ঔর লোগ কিয়া। ব্যাস, এহি হো হুয়া! কেয়া বাবুজি ভি নেহি সমঝতে হেঁ ইয়ে সব!'

কৌশল্যা ভাবলেন, হয়তো। বিশেষ কোনো পরিবর্তন তো তিনি লক্ষ করছেন না মথুরানাথের মধ্যে।

পরদিন ভোরের অন্ধকারে প্রতিদিনের মতো গঙ্গাস্নানে বেরুলেন মথুরানাথ।

আর ফিরলেন না।

খবরটা রটনা হতে দেরি হলো না। বিপিন, দয়ারাম-সহ গোটা রামপুরের মথুরানাথের পরিচিত সব মানুষ ছুটল পীরপুর ঘাটের দিকে। দেখল একটু বা ঢেউয়ের আলোড়ন তুলে ধীর গতিতে বহে চলেছে গঙ্গা। গভীর টলটলে তার জলে তীরের মানুষের প্রতি কোনো মনস্কতা নেই।

কোথায় চলে গেলেন মথুরানাথ, কীভাবে গেলেন, কেউই জানতে পারল না তা। ক-দিন অপেক্ষা করার পরেও তাঁর দেহ ভেসে উঠল না কোথাও। তখন লোকে বলাবলি করল, প্রকৃত হিন্দু এই মানুষটির ধর্মাচরণে ভুল ছিল না এতটুকু। গঙ্গাই আশ্রয় দিয়েছে তাঁকে।

কথাটা মনে ধরেছিল জানকীনাথ ও রামপুরের অন্যান্য নামি মানুষের। নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে, এম এল এ-কে ধরে পীরপুরে ঘাটের নাম পাল্টে দিল তারা। ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলো বাঁধানো হলো নতুন করে। বড় বোর্ড পড়ল—'মথুরানাথ ঘাট'। তার নীচে ছোট কিন্তু স্পষ্ট অক্ষরে 'কেবল হিন্দুয়োঁ কে লিয়ে'। সংক্ষিপ্ত করার জন্যে কেউ কেউ অবশ্য এই ঘাটকে হিন্দুঘাট-ও বলত। □

মাননীয় সম্পাদক

রা ম কু মা র মু খো পা ধ্যা য়

সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু,

আপনার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে বিগত ১লা ভাদ্র ১৪০৯ (ইং ১৮ আগস্ট ২০০২) একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যার শিরোনাম 'কুৎসা রটাচ্ছে বিরোধীরা, পালটা জবাব আডবাণীর'। ওই সংবাদ অনুসারে দলের একটি রাজনৈতিক আলোচনা সভায় লালকৃষ্ণবাবু তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। আপনার অবগতির জন্য সংবাদের ওই বিশেষ অংশটি কেটে পাঠাচ্ছি।

ওরা হতাশ, তাই এখন ব্যক্তিগত আক্রমণের রাস্তায় নেমেছে।

বিরোধীরা আমার, রাম নাইক, নরেন্দ্র মোদী, প্রমোদ মহাজন,

অনন্ত কুমারের নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে, যা মনে হচ্ছে তাই বলছে।

লালকৃষ্ণবাবুকে চিনি, অন্য নামগুলি অচেনা। অবশ্য লালকৃষ্ণবাবুরও যে সব খবরও রাখতে পারি তাও না। শ্রীমান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের একটি ভাষণের কিছু অংশ ক-দিন আগে সংবাদপত্রে পড়ে জানতে পারি লালকৃষ্ণবাবু উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিছুদিন খবর পড়ার সময় পাইনি। আসলে এই বছর আমাদের জেলায় খরা চলছে। ধান রুয়া হয়েছে সিকি জমিতে। আমার বয়স আশি ছুঁইছুঁই, খাটার ক্ষমতা নাই। কিন্তু চিন্তার বয়স নাই। ফলে লালকৃষ্ণবাবুর উপ-প্রধানমন্ত্রী হবার সংবাদটি গোচরে আসেনি। তবে মানুষের ভাল হয়েছে শুনলে সুখ হয়। আমাদের গ্রামের মধুসূদন পাল বড়োদিঘি হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়েছে। শুনে ভালো লাগল। আগে টিউশনি করে চলত, পরে মাস্টারি পেল। সেই পয়সাতে দুটি বোনের বিয়ে দিল। ছোটোটির বিয়ে দিতে পারেনি। এখন আর বয়সও নাই। হেডমাস্টারিটি ক-বছর আগে পেলে ছোটটিরও বিয়ে হত। আজকাল বরপণ বড্ড বেড়ে গেছে। আগে শুধু ব্রাহ্মণ বাড়িতে পণ ছিল। এখন সব জাতের। আমার বিয়ের সময় কনেপণ দিতে হয়েছিল এগারো টাকা।

আপনার কাছে আমার অনুরোধ, সঙ্গের পত্রখানি লালকৃষ্ণবাবুর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষা বুঝবেন না। হিন্দিতে অনুবাদ করা দরকার। আমাদের এখানে হিন্দি-ভাষা জানা লোক নাই। রামপাল ভার্মা রাজগ্রাম ইশকুলের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তিনি বহুদিন আগে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। মিলিটারির লোকজনও আজকাল ইশকুলে আসে না। গ্রামে চাষি গুরুপদ ধাড়ার ছেলে দুটি মিলিটারিতে গেছে কিন্তু একটি এখন আসামে, অন্যটি পাঞ্জাবে। ছ-মাসের আগে কোনোটিরই দেশে ফেরার কথা নাই। তাই আপনার কাছে আর্জি পত্রখানি হিন্দিতে

অনুবাদ করে লালকৃষ্ণবাবুর হাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। আপনাদের যাতে ডাক-খরচ না-লাগে তাই টিকিট লাগানো একটি খাম পাঠালুম। ডাক-খরচ না-দিলে জিনিসপত্র ঠিকঠাক যায় না, আসেও না। এই বৎসরের পঞ্জিকাতে রিভালভার বিক্রির একটি খবর বেরিয়েছিল। হাজার টাকা দাম, বারোটি গুলি বিনা পয়সায়। বাঁদর থেকে হাতি সব রিভালভারের গুলির শব্দে পালাবে। লাইসেন্সের দরকার নেই। দিল্লির একটা কোম্পানি বানিয়েছে। আমাদের গ্রামের ভুবন দত্ত হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। ভুবনের ধানের জমিতে গত বছর হাতির পাল নেমে দক্ষযজ্ঞ ঘটিয়েছিল। কিন্তু ভুবনের রিভালবার আসেনি। ডাক খরচ না পাঠানোয় এই বিপত্তি। অবশ্য অন্য ব্যাপারও থাকতে পারে। রিভালভার-বন্দুক-কামান নিয়ে নানা কেলেংকারির কথা শুনি। কিছুদিন আগে মিলিটারি দপ্তরে কেনা-কাটা নিয়ে খুব লেখালেখি হয়েছে কাগজে। ক্যামেরা দিয়ে ঘুষ খাবার ছবি তুলেছে। বেশ কয়েক বছর আগে বোফর্স কামান নিয়ে এমনই হইচই হয়েছিল। আমরা অবশ্য আদার ব্যবসায়ী কামানের ব্যাপার জানা নেই। কামান বলতে দলমাদল দেখেছি। ওটি মদনমোহন ঠাকুর দেগেছিলেন বিষ্ণুপুরে। তবে কেউ-কেউ বলে 'দল' আর 'মাদল' নামে দুটি কামান ছিল। একটি নাকি লালবাঁধে ডুবে গিয়েছিল, সেটির আর হদিশ মেলেনি।

লালকৃষ্ণবাবুর বাসার ঠিকানাটি আমার কাছে নাই। গাঁয়ের দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করেছি, হদিশ মেলেনি। গাঁয়ের ফণিভূষণ খাঁ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছিল। ওর কাছেও গেছি। বলেছিল, তপনবাবুর কাছ থেকে এনে দেবে। তপনবাবু নাকি মন্ত্রী, দিল্লিতে যাতায়াত আছে। কিন্তু ফণি কিছু করে উঠতে পারেনি। শুনেছি, তপনবাবুর দপ্তর বদলে গেছে. এবং নতুন কাজটি তাঁর পছন্দ হয়নি। হয়তো সেই অভিমানে ঠিকানাটি দেননি। যাই হোক, আপনারা খবরের কাগজের লোক। সব খবরই আপনাদের কাছে থাকে। লালকৃষ্ণবাবুর ঠিকানাও নিশ্চয় আছে। তবে দেখবেন পত্রটি যেন বাসার ঠিকানায় যায়। কারণ অফিসে গেলে হাজার চিঠির ভেতর হারিয়ে যাবে। আজকাল আপিসের ফাইলও হারিয়ে যায় শুনি। আসলে কাজে মন নাই। আমার ছোটো ছেলেটির চাষে মন ছিলনি। টান ছিল যাত্রা-কীর্তনে। হাউসেদের এমন একটু হয়। কাঠ কাটতে গেলে কুড়োল হারায়, জমি উলটোতে গেলে কোদাল। তখন আমার পত্নীর পা দুটিতে জোর ছিল। কোদাল-কাস্তে খুঁজতে মাঠময় বুলে বেড়াত। একদিন আমি আর মতি ঠিক রাখতে পারিনি। বললুম, কোদাল খুঁজে এনে তবে ভাতে বসিস। ঘর থেকে পালিয়েও গেল। মামাঘর-মাসিঘর ঘুরে দিন পনেরো পরে ঘরে ফিরে এল। কে ভাত দেবে সারাবছর? তারপর থেকে ছেলেটা আর কিছু হারায়নি। এখন জমি উলটোতে ওর মতন গাঁয়ের একজনাও পারেনি। ওর বড়ো ছেলেটিও বেশ কাজের। দিনে দশকাহন ধান-আঁটির পালুই দেয়। তবে আজকাল চাষে আর তেমন খাটুনি নাই। ট্রাকটারে চাষ, ধান বওয়া, মেশিনে ধান ঝাড়া। বারো আনা কাজ কলে। ধান থেকে তিল-গম সবই ইঞ্জিনে ভাঙা। আগে বিড়ি ধরাতে খড়ের বেনা পাকানো হতে। এখন গ্যাস লাইটার। সুবিধে আছে। জল ঝড়ে নিভে যাবার ভয় নাই, দেশলাইয়ের মতন বর্ষায় মিইয়ে যায় না। তবে কতদিন সুবিধে থাকবে বলা মুশকিল। আপনাদের

কাগজেই দেখলুম পেট্রোল পাম্প, গ্যাস ও কেরোসিনের ডিলারশিপ বিতরণে অনিয়ম। তার মানে গাড়ি ভাড়া থেকে গ্যাসলাইটারের দামও চড়বে। তবে এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপে বিশেষ লাভ নাই। আমি লালকৃষ্ণবাবুকে আলাদা করে লিখছি। আপনাকে অনুরোধ পত্রখানি তাঁর হাতে পৌঁছানোর সুব্যবস্থা করবেন।

গ্রাম ও ডাকঘর : গেলিয়া
জেলা : বাঁকুড়া
পশ্চিমবঙ্গ
পিন ৭২২ ১৫৪

ভবদীয়
সহি
৩রা ভাদ্র ১৪০৯
ইং, ২০ আগস্ট ২০০২

মান্যবরেষু,

আপনি যে উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তা আমি সামান্য ক-দিন আগে জানতে পেরেছি শ্রীমান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের রেল-বিভাজন বিষয়ে একটি মন্তব্য থেকে। বাজপেয়ীমশাই, নীতীশবাবু এবং আপনার বিষয়ে শ্রীমান সুব্রত যে সব কথা বলেছিল, তা সুবিধের না। বুঝতেই পারছেন কম বয়সে রক্ত গরম। আমার এঁখন আশি ছুঁই-ছুঁই ফলে বছরে ন-মাস পায়ে হাতে সেঁক দিই। তবে আমি শ্রীমান সুব্রতকে একটি পত্র দিয়ে বুঝিয়ে বলেছি বড়োদের গালমন্দ করতে নাই। শুনেছি শ্রীমান পরে কথাগুলির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে। বোধহয় আমার চিঠিখানি পেয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

সত্যি কথা বলতে কী আমি রাম নাইক, নরেন্দ্র মোদী, প্রমোদ মহাজন, অনন্ত কুমার ইত্যাদি নামগুলি আগে শুনিনি। কাগজে বেঙ্কাইয়া নাইডু নামটিও এসেছে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে। এঁরা বোধহয় সব নতুন। তবে রাম নাইক আর নরেন্দ্র মোদীর সাদা চুল দেখে মনে হল বয়েস হয়েছে। অবশ্য চুলের রং আর গোছ দেখে বয়েসের হিসেব করা কঠিন। আমার পত্নীর চুলের রং আর গোছ যেন ঝিঙেশাল ধানের আঁটি আর ছোটো বউটির শনের দড়ি। আমার চুলগুলি চল্লিশে কাশফুল হয়ে গেসল, আমার দাদার এই নব্বইয়েও কালো ভ্রমর। চুলের চরিত্র বোঝা কঠিন। আপনার যে ছবিখানি কাগজে ছাপা হয়েছে তাতে দেখলুম মাথাটি ফাঁকা। দু-কানের উপরে এক ছটাক চুল আছে বটে কিন্তু রং উঠে গেছে। রংয়ে কিছু নাই কিন্তু ঘিলুর ঢাকনিটি না থাকলে নানা আপদ। 'হুঁ' বলতে মাথা গরম, হিমে আবার সর্দি। আমার বড়োছেলেটিরও একই অবস্থা। বলি গরমকালে ছাতা নিয়ে বেরতে আর শীতে মাফলার জড়াতে। কে শোনে কার কথা। চোখের সামনে থাকলে হয়ত চক্ষুলজ্জায় করে, দূরে গেলে নিজের মর্জিতে চলে। আমাদের গ্রামের ডাক্তার ছিল ভবতোষ মুখোপাধ্যায়, এল এম এফ। ক্যাম্পবেল সাহেবের কাছে শিক্ষা। ভবতোষ ডাক্তারের সারা বছরের সঙ্গী ছিল একটি ছাতা আর একখানি মাফলার। বলত সমস্ত রোগের গোড়া হচ্ছে হয় গরম নয় ঠান্ডা। রোদ থেকে বাঁচতে ছাতা, কালবোশেখি হয়ে ঠান্ডা পড়ে গেলে মাফলার। ডাক্তার মানুষ, নানা গাঁয়ে যেতে হত। তাই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কখনো ওদুটি জিনিস হাতছাড়া করেনি। আপনাকেও নানা জায়গায় যেতে হয়। উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়ে দায়দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। "না' বললে লোক শুনবেনি। সেখানে

গিয়ে দেখলেন জগাটি আছে তো ভজাটি নেই। দুপুরে খেতে বলে বিকেলে পাত পাড়বে। একবার বনমহোৎসবে পূরবী মুখুজ্যেকে গাছ লাগাতে ডেকেছে আমাদের গাঁয়ে, সে বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশ আগের কথা। গাছ লাগানো ছিল, গান-বাজনা হল, বক্তৃতা হল কিন্তু পাঁঠাটি আসেনি। বিনোদ রায় গেছে পাঁঠা খুঁজতে সকালবেলা, দুপুরেও ফেরে না। ওদিকে বিনোদ একটি পাত্রের খবর পেয়েছে। পাঁঠাটি কিনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সূর্যটি তখনও কাঁচা। ভাবল পাত্রটিকে কে কোন ফাঁকে বায়না করে দেয় কে জানে, একবার ঘুরে যাই। পাঁঠাটি নিয়ে পাত্রের ঘরে দু-চার কথা বলতে-বলতে পাড়াপড়শি দু-একজন এসে গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছেলের পিসি হাজির। ততক্ষণে বেলা দশ-আনা ছ-আনা। দে ছুট। ওদিকে পূরবী দেবী কাজ সেরে বসে আছে। রঙ্গ করে বলে পরেরবার মুড়ি বেঁধে আনবে। কথাটা মিথ্যে বলেনি। আমাদের গ্রামের নৃপেন দত্ত জেলার নেতা ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জেলে গেছে অনেকবার। নৃপেন দত্ত সভায় গেলে একটা থলেতে মুড়ি, গুড়, পেঁয়াজ আর দুটি কাঁচা লঙ্কা নিয়ে যেত। সভার শেষে এক ঘটি জল নিয়ে মুড়ি ভিজিয়ে খেত। বলত তোরা এবার পাঁঠা যত বড়ো করবি কর, আমি বসে রইলুম। কথাটি খারাপ বলেনি। ছাতা-মাফলারের সঙ্গে সেরখানেক মুড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া ভালো, পিত্তি পড়ার ভয় নাই। পিত্তি পড়তে-পড়তে পিত্তির থলিতে পাথর। তারপর ছুরি-কাঁচি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। ওই দিনেরই খবরের কাগজে চার মন্ত্রী আর এক নেতার পরিচয় মিলল। খবরটির মাথায় লেখা ছিল - অভিযুক্ত পঞ্চক, ত্রাতা আডবাণী। এমনিতে 'পঞ্চ' শব্দে কোনো অসুবিধা নাই। পঞ্চগব্য দই, ঘি, দুধ, গোময় ও গোমূত্র। পঞ্চ দেবতা হল গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা। পঞ্চ শস্য হল ধান, মুগ, তিল, যব আর সাদা সর্ষে। কিন্তু 'পঞ্চক' আলাদা। খবরের কাগজের লোকজনরা বুঝতে পারেনি। ছেলেছোকরাদের আজকাল পুরনো জিনিসে মন নাই। বরপণে কিংবা বোরোধানে একটা মোটরবাইক কিনে চক্কর মেরে বেড়ায়। 'পঞ্চক' হল গাঁয়ের পাঁচজনের হিতের জন্যে পালা। কাশীদাসী মহাভারতে আছে 'কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক। সেই জানিবে ইহা বকের অন্তক' তাহলে অভিযুক্ত পাঁচমন্ত্রী কেমন করে 'পঞ্চক' হবে? আমি কাগজের খবরটি নীচে দিলুম। আপনি পুরনো মানুষ বুঝবেন কেন ওই পাঁচজনা 'পঞ্চক' না।

রাম নাইক (পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী) : পেট্রোল পাম্প, গ্যাস ও কেরোসিনের ডিলারশিপ বিতরণে অনিয়ম, বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের সদস্যদের বিশেষ সুবিধা

নরেন্দ্র মোদী (গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী) : গোধরা-কাণ্ডের পরে গুজরাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন, কমিশনকে দাঙ্গাদুর্গতদের পুনর্বাসন এবং রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক খবর না দিয়ে রাজ্যে তাড়াতাড়ি ভোট করানোর চেষ্টা।

প্রমোদ মহাজন (সংসদীয় মন্ত্রী) : সাংবাদিক শিবানী ভাটনাগরের হত্যায় জড়িত।

অনন্তকুমার (নগরোন্নয়ন মন্ত্রী) আর এস এস-এর সদস্যদের দিল্লিতে অভিজাত এলাকায় জমি বিতরণ।

বেঙ্কাইয়া নাইডু (বিজেপি সভাপতি) : বেআইনিভাবে নিজের ও পরিবারের অন্যদের নামে জমি।

সমস্ত বিষয়গুলি পড়ে মনে হল যেখানে গণ্ডগোল বাধার সেখানেই বেধেছে। পেট্রোল, গ্যাস ও কেরোসিন হল আগুনের ভাণ্ডার। ডিজেল থাকলে ষোলোকলা পূর্ণ হত। আমাদের গাঁয়ের বাদল নন্দীর বড় ছেলের বউটিকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারল। আমাদের গাঁয়ে ডিজেল-কেরোসিনের টানাটানি, ওদিকে গুজরাতে নাকি গাঁয়ে গাঁয়ে পেট্রোল-ডিজেলের ছড়াছড়ি। গাঁয়ের কোথায়-কোথায় মিলবে তার ঠিকানাও আছে। কাজেই দাঙ্গার সময় এধারের কত মাল ওধার পাচার হয়েছে, তার খবর দরকার। বিরোধীরা কুৎসা রটালে কান দেবার দরকার নাই কিন্তু খবর দরকার। বিরোধীরা কুৎসা রটালে কান দেবার দরকার নাই কিন্তু নিজের কানদুটি খোলা রাখতে হবে। তা না হলে বড়োটি ঠকাবে মেজটিকে, সেজটি ছোটটিকে। হরিপদ মেদ্যার বয়েস এখন সত্তর-বাহাত্তর। ছেলে-পিলে নাতি-নাতনির যৌথ সংসার। হরিপদ গুরুনাম নিয়েছে বছর পাঁচেক আগে। এখন আপনার মতো সঙ্ঘ করে বেড়ায়। ওদিকে বড়ো ছেলেটি যৌথ সংসারের ধান বেচে বাস-রাস্তার ধারে চারকাঠা জমি কিনেছে। মেজটির কানে গেছে সে খবর কিন্তু মুখ খোলেনি। সে ওষুধ দোকানের টাকা সরিয়ে মাছের ডিম ফুটিয়েছে পালবাঁধে। সেজটি ঘাপটি মেরে বসে ছিল। বাবা একদিন ট্রাক্টারে চড়ে সঙ্ঘের নাম বিলোতে গেছে, ছেলে টিনের বাক্সের পাছাটি ফুটো করে সংসারের গয়নাগুলি সরিয়ে ফেলেছে। পরে ঘরের লোকের চোখে পড়েছে। সবাই ভেবেছে বাইরের চোর। পরে যাদুকামারের কাছে হরিপদ খোঁজ নিয়ে দেখে যন্ত্রটিও সেই বানিয়ে দিয়েছে. কিন্তু খবরটি সংসারের লোকজন জেনে গেলে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে। হরিপদ থানায় গিয়ে ডাইরি করে এলে মুসলমান পাড়ার তিনজনের নামে। ট্রাকটারে চড়ে গুরুনাম শোনাতে গিয়ে সংসারের চুরির খবরটি পাঁচজনাকে বলল। হরিপদর ছোটো ছেলেটি এখন চাষ থেকে মন তুলে শুয়োর ব্যবসা করছে।

আপনি আমার চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ তাই আপনাকে একটি পরামর্শ দিই। হরিপদর মতন আপনিও যেন ফাঁদে না পড়েন। আপনাদের দুজনেরই ধর্মে মতি তাই আমার চিন্তা। বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম করবেন এতে দোষের কিছু নাই কিন্তু ঠুঁটো জগন্নাথের মতো আপনি বসে রইলেন আর বাঁকা ঠকিয়ে দিল হেলোকে আর হেলা ঠকাল ল্যাদাকে-এটি ভালো না। হরিপদ ভক্তিমার্গে চলে যাচ্ছে দেখে হাটতলায় দাঁড় করিয়ে বলেছিলুম সে কথা। হরিপদ বলল কাম আর কামনা থেকে মন উঠে গেছে। পত্নীর সজ্জা ছেড়ে মাটিতে মাদুর পেতে শুচ্ছে। নিরামিষ খাচ্ছে। আট প্রহরে আটবার গুরুমন্ত্র যপ করছে। এরপর মাসে একবার করে গ্রামে গ্রামে শুধু নাম বিলোতে যাবে। বললুম জিনিসটি ভালো কিন্তু তার আগে বিষয়-সম্পত্তি ছেলেপিলেদের নামে নামে ভাগা ফেলে দাও। কথা শোনেনি। আসলে সংসারের নাড়িটি তখন গায়ে আটকে আছে। মাঝ থেকে ছোটছেলেটির কপালে বিশটি শুয়োর। তারা মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবে বড়ো হলে দাম হবে সে আশাতে ছোটটি বসে আছে। এখন হরিপদর কথাটি ভাবেন। গুরুনামে আর মন বসে? মাধব বোষ্টমের মতন নামজপ করেন। মাধবের ভাতের

চালের অভাব নাই। মানুষের দুয়ারে 'জয়রাধে' বলে দাঁড়ালে মানুষজন পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে এক পো চাল ঝুলিতে দেবে। আর মহোৎসবের খবর কানে গেলে পাঁচ গাঁয়ের লোক থালাতে চাল, ডাল, ঝিঙে, কুমড়োর সিদে নিয়ে সকালবেলায় হাজির তবে সংসারের নাড়িটি গায়ে লেগে থাকলে সংসার ধর্মটি মন দিয়ে করা ভালো। তখন কীর্তন করে বেড়ালে উলটো বিপদ। পুণ্যটি অন্যের, পাপটি আপনার। ধানের টাকা থেকে গয়নার থলে সবই হাওয়া। যেটি করবেন মন দিয়ে করুন। দু-নৌকোয় চড়ে বেশি দূর যেতে পারে কেউ? শ্রীমান সুব্রত আপনাকে 'শিয়াল' বলেছে। নিজেকে ভেবেছে বাঘ। যেই আপনি নিজের কাজে মন দেবেন, দেখবেন শিয়াল হয়েছে বাঘ, বাঘ হয়েছে শিয়াল। অবশ্য সংসার ছেড়ে দিলে যা শিয়াল তাই বাঘ। সবই তখন ভবনদীর ওপারের চিন্তা। যারা এপাশে আছে তাদের কেউ সরকারি জমি শালা-ভাগনাকে পাইয়ে দেবে, কেউ পাড়াপড়শি ভাই-বোনের জমির আল কেটে নিজের কাঁদির সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। তখন আপনার সবই মনে হবে খেলা।

তবে শিবানী মেয়েটি যে খুন হল এটি চিন্তার কথা। ক-বছর আগে আর একটি মেয়েকে কেটে বুটির উনোনে ফেলে দিয়েছিল। চিন্তার কথা। রাজনীতিতে খুনোখুনি হয়, কিন্তু মেয়েদের মারা ব্যাপারটি নতুন। রাজনীতি করতে গিয়ে আগে কত লোক ব্রহ্মচারী থেকে যেত। অবশ্য বিয়ে করা যে খারাপ, তাও না। বৈষ্ণব-মতে চললে একটি সাধন-সঙ্গিনী লাগে, অদ্বৈত মতে একক যাত্রা। যার যেটি পছন্দ। কোনোটিতেই গোলমাল নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'যত মত তত পথ'। কিন্তু মেয়েটিকে অন্তঃসত্ত্বা করে ছেড়ে পালাবে বললে ছাড়ান নাই। সত্যি মিথ্যের ব্যাপারটি আপনি দেখুন। কিন্তু দোষী হলে ছাড় দেবেন না। বাপ-জ্যাঠা বললেও ছাড়বেন না। শাস্তি দিলে শিক্ষা হবে। আমাদের গ্রামের নিত্যানন্দ পাত্রের পুত্রবধূর মৃত্যুতে ননদের হাত ছিল। গ্রামের মেয়েরা ননদটিকে পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল। আদালতের রায়ে আড়াই বছর জেল হল। তাঁতেই মনটির সংস্কার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অনিল উকিলের ছোকরা মুহুরিটিকে বিয়ে করে বাপের ঘরে এল। এখন শহরে থাকে। কোনো চিন্তা নাই। কল ঘোরালে জল, বোতাম টিপলে হাওয়া।

যাই হোক, আপনি পোড়-খাওয়া মানুষ সবই বুঝবেন। তবে বিরোধীরা কুৎসা রটাচ্ছে বলে উত্তেজিত হলে চলবে না। পক্ষের লোকেরা সুনাম করবে, বিপক্ষের লোকেরা দুর্নাম-এ তো সহজ কথা। 'সত্য' কথাটি কিন্তু পক্ষেও নাই বিপক্ষেও নাই। আপনার ধর্মে মতি আছে তাই বিষয়টি বুঝবেন। একটি গরু খয়েরি আর একটি কালো, দুধটি কিন্তু সাদা। আপনাকে দুধের ধাতটি দেখতে হবে, গরুর রংয়ে লাভ নাই। দুটি গরুই এক সের দুধ দেয় কিন্তু একটির খড়িমাটি গোলা অন্যটির বটের আঁঠা। গোরুর রং দেখে কিনে আনলে ডাহা ঠকবেন। না-বুঝলে পাইকের পাঁচশ টাকা পোয়া দরে খড়িমাটি দুধের গাইটি আপনাকে বেচে দেবে।

আর একটি কথা—রথে চড়বেন না। প্রত্যেকটি জীবনের এক-একটি যান আছে। বর-কনে পালকিতে চলে, পুলিশ জিপ-গাড়িতে, ডাকাত রণপায়ে, মন্ত্রীরা মটরগাড়িতে, দেবদেবীরা রথে। হরিপদ ট্রাকটারে চড়ে গুরুনাম বিলোতে যেত, গতমাসে মাজাটি

ভেঙে গেছে। ঠাকুর-দেবতার নাম বিলোতে হেঁটে যাওয়া ভাল। এমনিতেও হাঁটা ভালো জিনিস। আমি এত বয়সেও পাঁচ গাঁ হেঁটে চলে যাই। পা দুটির চর্চা হল, ভাড়াও বাঁচল। রিক্সাতে উঠলেই এখন পাঁচটাকা। দিনে পাঁচ কাঠা ধান রুইতে পারলে না হয় পাঁচ টাকা খরচ করতুম, সংসারের পয়সাতে গাড়িতে উঠব?

যাই হোক বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করবেন। উপ-প্রধানমন্ত্রীর অনেক দায়-দায়িত্ব। একটি সংসারের ভার মাথায় নিয়ে বুঝি দেশজোড়া অতগুলি পরিবারের ওজন কতখানি। শঙ্কর ডাক্তার বলেছে বেশি চিন্তা হলে চারটি দানা মুখে ফেলে দিতে। ওষুধটি হল ক্যালি-ফস ছ-এক্স। আপনিও পরীক্ষা করে দেকতে পারেন। আমি ভালো ফল পাচ্ছি।□

শুভানুধ্যায়ী
নঙ্গারচন্দ্র মেদ্যা

গ্রাম ও ডাকঘর : গেলিয়া
জেলা-বাঁকুড়া
পিন-৭২২১৫৪

স্বজন

দুলেন্দ্র ভৌমিক

আশ্বিনের আকাশ জুড়ে মেঘ জমে ছিল। গুমোট গরমে প্রাণ আই-ঢাই করছে সবার। ট্যাক্সিটা যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ কিঞ্চিৎ স্বস্তি ছিল কিন্তু যখনই থেমে যাচ্ছিল তখনই গুমোট গরমের ভ্যাপসা তাপটা টের পাচ্ছিলেন নবীনবাবু। ট্যাকসি চড়ার বিশেষ অভ্যাস নেই, কোনোকালে তেমন ছিলও না, কিন্তু আজ চড়তে হয়েছে। শখে নয়, প্রয়োজনে। মফস্বল স্কুলের শিক্ষক নবীন মুখার্জি ট্যাকসি চড়ার স্বচ্ছলতা কখনও অনুভব করেননি। কখনও-সখনও কলকাতায় এলে ট্রেন আর ট্রামই ছিল তার বরাবরের পছন্দ। কিন্তু আজ নাটাগড় থেকেই ট্যাক্সি করে ব্যারাকপুরে আসতে হল। গতকাল সন্ধের পর থেকেই অকস্মাৎ সব কেমন বদলে যেতে লাগল। অথচ বিকেল পর্যন্ত তিনি কিছুই টের পাননি। বুঝতেই পারেননি যে, একটা ভয়ংকর সর্বনাশ তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তখন রেডিয়োতে সন্ধ্যার খবর হচ্ছিল। ঘোষকের মোলায়েম কণ্ঠে কোনো দুঃসংবাদ ছিল না। খবরের শেষে আবহাওয়ার খবর বলতে গিয়ে বালেশ্বরে নিম্নচাপ আর দূর সমুদ্রে মৎস্যশিকারি মাঝিদের সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন শেষ হতে না হতেই বড়োছেলে সনৎ দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি এবং চোখের দৃষ্টির মধ্যে চোখে পড়ার মতো একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলেন নবীনবাবু। তিনি প্রথমে খালি চোখে পরে টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে তাকিয়েছিলেন বড়োছেলে সনতের দিকে। সনৎ তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। তার ঠোঁট কাঁপছে, মুখ তখনও ঘেমে যাচ্ছে। নবীনবাবু কিছু বুঝতে না পেরে প্রথমে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক পা এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু কাছে গিয়ে ছেলেকে কিছু বলবার আগেই সনৎ বাবাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠেছিল।

এরকম ঘটনা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল নবীনবাবুর কাছে। তিনি ভেবেছিলেন সনতের হয়তো শরীর খারাপ। ছেলেটা মাঝে-মাঝেই গ্যাসের ট্রাবলে ভোগে। একবার তো ওই গ্যাসের জন্যেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল রাত্রিবেলায়। হয়তো এবারও তেমনিই কোনো কষ্ট নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল সনৎ। কিন্তু ছেলের কান্না দেখে তিনি বিস্মিত এবং বিচলিত হয়ে পড়লেন। ছেলেকে নিয়ে দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে এসে সোফায় বসিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন? তোর কী হয়েছে?'

রান্নাঘর থেকে হেমলতা ত্রস্ত পায়ে বসবার ঘরে এসে ছেলের কান্না দেখে অবাক হয়ে গেছেন। কান্নার আওয়াজটা তিনি রান্নাঘর থেকে শুনতে পেয়েই চলে এসেছেন। এবার বসবার ঘরের দৃশ্যটা দেখে তিনি এতটাই অবাক হয়ে গেছেন যে, প্রথম কয়েক

সেকেন্ড তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

নবীনবাবু একবার স্ত্রী হেমলতার দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই ছেলেকে বললেন, 'কী হয়েছে?'

সনৎ মুখ তুলল না। বাবার কাঁধে মাথা রেখে ফোঁপানো গলায় বলল, 'দীপু নেই!'

বুকের মধ্যে বজ্রপাত হয়েছিল নবীনবাবুর। কথাটা কানে গেলেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। হেমলতা দরজার গোড়া থেকে অস্ফুটে চিৎকার করে ছুটে এসেছিলেন সনতের কাছে। সনতের মুখটা তুলে ধরে বলেছিলেন, 'কী বললি? কী বললি তুই? দীপুর কী হয়েছে?'

একই কথা একবার নয়, বার বার বলে গিয়েছিল সনৎ। শোনার কোনো ভুল ছিল না। আহত বিস্ময়ে নবীনবাবু শুধু বলেছিলেন, 'কেমন করে এসব ঘটল?'

সনৎ নিজেকে সামলে নিয়ে থমথমে গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'দুটো মিছিল মুখোমুখি হতেই সংঘর্ষ বাধে। দীপু ছিল আগে। বোমাটা উড়ে এসে ওর বুকে পড়ে। অন্যরা ছুটোছুটি করে পালাতে পেরেছে। কিন্তু দীপুর সে উপায় ছিল না। ও তখন রাস্তার উপরে পড়ে গিয়ে...

সনৎ কথা শেষ করতে পারল না। সোফার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হেমলতা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। নবীনবাবু কাঁদতে পারলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সনৎকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দীপু এখন কোথায়?'

সনৎ জবাব দিয়েছিল, সরকারি হাসপাতালে। মৃত্যু তো আগেই হয়ে গেছে। বডিটা আজ রাতে ওখানে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কাল সকালে পোস্টমর্টেম করতে পাঠাতে হবে। তারপর...

সনৎ কথা শেষ করার আগেই নবীনববাবু বললেন, 'জানি, তারপর ওর বডিতে ফুল-টুল দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। তেইশ বছরের একটা ছেলের সব শেষ হয়ে যাবে আগুনে আর গঙ্গার জলে।'

এসব খবর চাপা থাকে না, চাপা থাকেনি। অনেক রাত ধরে অনেকে এসেছেন। কেউ-কেউ চুপ করে বসে থেকেছেন। কেউ-কেউ মৃত্যুর বিবরণ শুনতে চেয়েছেন, কেউ-কেউ সান্ত্বনা দেবার নাম করে শোকটাকেই খুঁচিয়ে দিয়েছেন। নবীনবাবু কোনো কথা বলেননি। তেইশ বছরের একটা টগবগে ছেলে মরে গেলে তার কোনো সান্ত্বনা হয় না। তিনি সান্ত্বনা খুঁজতেও চেষ্টা করেননি। শোক নামক অদৃশ্য বস্তুটাকে এড়ানো কঠিন জেনেও তিনি নিজের মনকে অন্যদিকে সরাতে চেয়েছেন। কিন্তু বড়ো কঠিন সেই চেষ্টা। সমস্ত মন জুড়ে কেবল তারই ছবি, তারই কথা আর তারই চিন্তা ঘুরে-ফিরে আসে, সে আজ আর নেই। নবীনবাবু গতরাত্রেই বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু নয়, মৃত্যুর চাইতেও কঠিন হচ্ছে তার পরের মুহূর্তগুলো। বড়ো অসহ্য স্মৃতির এই পীড়ন। জীবনের সব স্মৃতিই মধুর নয়। কোনও কোনও স্মৃতি যেন আগুনের মতো নিঃশব্দে পুড়িয়ে চলে।

এখন ট্যাক্সি করে ব্যারাকপুরে মর্গে যেতে যেতে নবীনবাবু ভাবছিলেন, তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন, নাটাগড়ের বাড়ি থেকে ট্যাক্সি চেপে তাঁকে একদিন ব্যারাকপুর

মর্গে যেতে হবে ছেলের লাশ নেবার জন্য! এটাও কি এক ধরনের অভিশাপ? হেমলতা যে দিবারাত্র ঈশ্বরের সেবা করে যায়, সেও কি ভেবেছিল তার ঈশ্বর তাকে পুত্রশোক দেবার জন্যেই তৈরি হচ্ছেন?

দীপুর ভালো নাম দীপঙ্কর। মামার বাড়ি থেকে নামটা রাখা হয়েছিল। সনতের সঙ্গে মিলিয়ে একটা নাম খুঁজছিলেন নবীনবাবু। কিন্তু মামাদের নামটা এসে যেতেই তিনি আর আপত্তি করেননি। বি এ পাস করার পর দীপু চেয়েছিল এম এ পড়তে। নবীনবাবু বলেছিলেন, তুই অন্য লাইনে যা। কমপিউটার টেকনোলজিটা শিখতে পারলে ভবিষ্যৎ ভালো। ওটা সবে আসতে শুরু করেছে। কয়েক বছর পর দেখবি, এখানেও কমপিউটার যুগ শুরু হয়ে গেছে।

দীপু আপত্তি করেনি। কোর্সটা প্রায় শেষ করে এনেছিল কিন্তু একেবারে শেষ করার আগেই ওর জীবনের আয়ুটাই অকস্মাৎ ফুরিয়ে গেল। দীপু কখনও কারও কাছে গান শেখেনি, অথচ ওর গলায় সুর ছিল। ভারী ভালো গাইতে পারত। রবি ঠাকুরের গানের বিশেষ মেজাজটা ওর গলায় ছিল। ওর মধ্যে আরও অনেক কিছু ছিল যা বেঁচে থাকতে তেমন করে মনে পড়েনি, আজ চোখের আড়াল হতেই সেগুলো মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে।

ট্যাক্সিটা চিড়িয়ামোড় পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরল। নবীনবাবু আগে কখনও মর্গে আসেননি। মর্গ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নেমে মর্গের কাছাকাছি যেতেই তিনি টের পেতে লাগলেন সভ্যতা ও মানবিকতা বর্জিত এবং লাঞ্ছিত কোনো জায়গার নামই বোধহয় মর্গ। চারপাশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। কোঁতকা-কোঁতকা কুকুরগুলো বিনা বাধায় ঢুকে যাচ্ছে মড়াকাটা ঘরে। চারপাশে জাগ্রত নরকের মধ্যে শোকবিহ্বল নিরুপায় কিছু মানুষ।

বাবাকে দেখে সনৎ এগিয়ে এসে বলল 'আমরা তো অনেকেই ছিলাম। তুমি না এলেও পারতে।'

নবীনবাবু বললেন, 'না এলেও চলতো কিন্তু বাড়িতে থাকতে পারলাম না। দীপুকে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে হল।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ওরা কি খুব কাটা-ছেঁড়া করবে?'

সনৎ উত্তর দেবার আগে বাবার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে চাইল, বাবা এই মুহূর্তে কোন ধরনের উত্তর আশা করছেন। একটু ভেবে বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। শুধু নিয়মরক্ষা।'

নাকে রুমালচাপা দিয়ে অন্য ছেলেরা দূরে দূরে দাঁড়িয়েছিল। এখানে যত লোক সবাই কি দীপুর জন্যে?

কথাটা সনৎকে বলাতেই সনৎ বাবার ভুলটা ভাঙিয়ে দিয়ে বলল, 'না সনৎকে নিয়ে আরও সাতটা বডি এসেছে এখানে। সবার লোকজনই রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।'

নবীনবাবু চশমার ভিতর দিয়ে চোখ তুলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখলেন। তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন একটা ন্যাড়া গাছের নীচে। একটা ছেলে, দীপুরই বয়স হবে, দৌড়ে এসে একটা পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে

দিয়ে বলল, 'কাকাবাবু আপনি এখানে বসুন।'

নবীনবাবু ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, দীপুর সঙ্গে একে আগে কখনও দেখেছেন কিনা। হয়তো দেখে থাকবেন, হয়তো দীপুর সঙ্গে তাঁদের নাটাগড়ের বাড়িতেও এসে থাকবে, কিন্তু এখন আর কিছুই মনে পড়ছে না। শিমুল গাছের তলায় বসতে বসতে টের পেলেন ভ্যাপসা গরমটা আবার বাড়ছে। তিনি উদাস দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে থাকলেন। লুঙ্গিপরা খালি গা একটি ছেলে কাঁধে গামছা নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পান চিবুচ্ছে। তার হাতে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো। সেটা থেকে গম-গম করে হিন্দি গান বাজছে। মর্গের সামান্য দূরেই জনবসতি। ছেলেটা বোধহয় ওখানকার বাসিন্দা। ভট্‌ভট করে বাইকের শব্দ তুলে দুটো জোয়ান ছেলে এসে শিমুলতলার কাছটায় দাঁড়াল। বাইকে বসেই একজন জিজ্ঞেস করল 'আরে, আর কতক্ষণ রে! টেম্পো আনবো?'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোর ভিতর থেকে একজন বলল, 'সবে তো শালা ফোর্থ বডি চলছে। আমরা লাস্টে আছি।'

বাইকের ওপর থেকে ছেলেটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ডাক্তার গাড়ুর হাতে ফাইলেরিয়া আছে। এত শালা কাটাকাটির কী আছে। মায়ের ভোগে গেছে ব্যাস্‌; চিরকুট লিখে ছেড়ে দে।'

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার বাইক চালিয়ে ছেলে দুটো চলে গেল। নবীনবাবুর বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সনৎ বাবার অস্বস্তিটা বুঝতে পেরে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার এখানে থাকার দরকার নেই। তুমি অফিসঘরের বারান্দায় গিয়ে বসগে। ওখানে বেঞ্চি আছে।'

নবীনবাবু অফিসঘরের দিকে রওনা দিচ্ছিলেন। সনৎ বাবার ছাতাটা তুলে নিয়ে বাবার হাতে দিয়ে বলল, 'ছাতাটা ফেলে যাচ্ছিলে। এটা নাও।'

নবীনবাবু চলে আসতে আসতে দেখলেন একটা বাবলা গাছের নীচে উবু হয়ে এক বুড়ো বসে আছেন। মাথার চুল পেকে গেছে। থুত্‌নীর কাছেও পাকা দাড়ি। অল্প হাওয়ায় মাথার পাতলা চুলগুলো মৃদু-মৃদু উড়ছে। পরণে ডোরাকাটা লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া আর কাঁধে একটা গামছা। বৃদ্ধের চোখ মাটির দিকে নামানো। বৃদ্ধের সামনে দিয়ে আসতে আসতে তিনি শুনলেন, বৃদ্ধ কাতর গলায় জিজ্ঞেস করছেন, সিরাজরে তো ফালা-ফালা করে কোপাইছে, ডাক্তার আর ছুরি-কাঁচি দিয়ে কত কাইটবেরে? সূর্যি থাকতি থাকতি গোরে দিতি পারলে...

নবীনবাবু থেমে গেলেন। তাকালেন বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছেন। গামছা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে এক পা এগোলেন। নবীনবাবু তখনও তাকিয়ে। তিনিও দু-পা এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কে আছে? কার জন্যে এসেছেন?'

বৃদ্ধ নবীনবাবুকে দেখতে দেখতে উত্তর দিলেন, 'আমার ব্যাটা—একমাত্র ব্যাটা সিরাজুল।'

নবীনবাবু চোখ নামিয়ে নিলেন। বৃদ্ধের কথা বলার মধ্যে যেন একটা চাপা আর্তনাদ ছিল। সেই আর্তনাদটা তাঁর বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি আর দাঁড়ালেন

না। কিন্তু বৃদ্ধটিও উঠে এসেছেন তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে। পাশাপাশি চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার জন্যে'

নবীনবাবু উত্তর দিলেন, 'ছেলে।'

বৃদ্ধটি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'একসিডেন হয়েছিল বুঝি?'

নবীনবাবু চলতে চলতে বললেন, 'হ্যাঁ, তা একরকম অ্যাকসিডেন্টই বটে। মিছিল করে যাচ্ছিল। অন্যদলের লোকেরা মিছিলে বোমা মারে। তাতেই...'

বৃদ্ধটি ফতুয়ার পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি বার করেন। মুখ তোলবার আগে বলেন 'আপনার কাছে ম্যাচবাত্তি আছে নাকি?'

নবীনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না।'

বৃদ্ধটি বিড়িটা ফতুয়ার পকেটে রাখতে রাখতে বলেন, 'মণ্ডলপাড়ার নাম শুনেছেন? ওই কাঁকিনাড়া ইস্টিশান থেকে ভিত্রে অনেকখানি যেতে হয়। আমি ওইখানে থাকি। ছেলেডার বুদ্ধি-বিবেচনা মোটে ছেল না। খালি ঝান্ডা নিযে ঘুরতো আর খোয়াব দেখত। দু-চারবার শাসানী খেযেছিল, কিন্তু শোনেনি। আহাম্মকটা ভেইবেছিল দ্যাশটারে বইদলে দেবে। ওর বাপেদের মতো গরিব গুর্বোদের কষ্ট কমাবে। তা ব্যাটা কি পারল? যে বুকখানা ফুলাযে একদিন তেজ দেখাযে রুখে দাঁইড়েছিল তিন দিন পর ভোজালি দিয়ে কোপায়ে-কোপাযে সেই বুকখানা ফালা-ফালা করে দিল। বুকের খোয়াবটাও ফালা ফালা হয়ে শেষ হযে গেল।'

বোধহয় ছেলের রক্তাক্ত চেহারাটা মনে পড়ে গেল বৃদ্ধর। তিনি গামছা দিযে মুখ ঢেকে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলেন। নবীনবাবু সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বৃদ্ধের পিঠে হাত রেখে বলেন, 'চলুন অফিসঘরের বারান্দায় গিযে বসি।' অফিসঘরের বারান্দায় একটা বেঞ্চিতে দুজন পাশাপাশি বসলেন। আকাশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। সিরাজুলের বাপ একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একখান টেম্পো যদি কাঁকিনাড়া যায় তবে কত লাইগবে বলে আন্দাজ করেন?'

নবীনবাবু বললেন, 'বডি নিয়ে যেতে একটু বেশিই চাইবে। তবে কত লাগবে সেটা বলতে পারব না। আমার কোনো ধারণা নেই।'

বৃদ্ধটি এবার ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কদ্দূর যাবেন?'

নবীনবাবু বলেন, 'প্রথমে নাটাগড়ে যাব, ওখানে আমার বাড়ি। তারপর পানিহাটি শ্মশানঘাটে।'

বৃদ্ধটি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কীসে যাবেন? টেম্পো?'

নবীনবাবু কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লরিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছেলেরা একটা লরি এনেছে। ওতে করেই চলে যাবে।'

বৃদ্ধটিও এবার কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়ানো লরিটাকে বোধহয় দেখতে পেলেন। সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একখান লরির ভাড়া আরও বেশি, তাই না?'

নবীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'বোধহয়।'

এরপরেই দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। কারও কাছেই যেন বলবার মতো

আর কোনো কথা নেই। একটু পরে বেঞ্চি থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বৃদ্ধটি উঠে পড়ে বললেন, 'এসে গেছে! সিরাজ এসে গেছে।'

বৃদ্ধটি ছুটে গেলেন সামনের দিকে। জনা চারেক ছেলে একটা বাঁশের মাচায় করে সিরাজকে নিয়ে এসে ঘাসের ওপর রাখল। বৃদ্ধটি যেন হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লেন ওই মাচার সামনে. কাঁধের গামছা দিয়ে ছেলের মুখটা মোছালেন। ভ্যাপাসা গরমে নিজে ঘেমে যাচ্ছিলেন, তাই গামছা দিয়ে ছেলেকে হাওয়া করতে করতে বারান্দায় বসা নবীনবাবুর দিকে তাকালেন।

নবীনবাবু বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন সিরাজের কাছে। সিরাজের বৃদ্ধ বাপ নিজের ছেলেকে দেখিয়ে গর্ব করার মতো ভঙ্গিতে বললেন 'আমার ব্যাটা সিরাজ! দেখেছেন, ক্যামন তাগড়াই জোয়ান হয়ে উঠেছিল। ব্যাটা কখনও দিনমানে ঘুমোতো না, আজ ঘুমাচ্ছে। বড্ড গরম তো, তাই গামছা দিয়ে...'

নবীন মুখার্জি স্থির চোখে সিরাজের দিকে তাকিয়েছিলেন। সিরাজের বাবাকে তার ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। প্রবল শোক মানুষকে কখনও কখনও অপ্রকৃতিস্থ করে ফেলে। সিরাজের বাপকেও বুঝি তাই করেছে। বৃদ্ধ বাপ ছেলের চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিলেন, অকারণে বার-বার গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন আর গামছা নেড়ে-নেড়ে ছেলেকে হাওয়া করে যাচ্ছিলেন।

নবীনবাবু দেখলেন, খাটে করে সনৎরা দীপুর শব নিয়ে এগিয়ে আসছিল। কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছ থেকে লরিটাকে ব্যাক করে অফিস ঘরের কাছাকাছি আনার ব্যবস্থা হল। খাটশুদ্ধ দীপুকে তুলে দেওয়া হবে ওই লরিতে। সনৎরা এসে খাটটা বারান্দার সামনে নামাল। সনৎ বলল, 'একটু অপেক্ষা করতে হবে। ফুল কিনতে পাঠিয়েছি। ফুল এলে খাট লরিতে তুলে সাজাবো। ওরা একটা চাদরও কিনে আনবে লরির ওপর পাতার জন্য।'

সনতের নির্দেশ পেয়ে লরিটা পরিষ্কার করা হচ্ছিল। ওর মধ্যে কিছু ফুলের সাপড়ি, দড়ি, আর বরফগলা জল মিলে জায়গাটা অপরিচ্ছন্ন হয়েছিল। নবীনবাবু ছেলের শিয়রে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধটি এগিয়ে এসে দীপুকে দেখলেন। গামছা নেড়ে হাওয়া করতে করতে বললেন, 'কাচা-কাচা পেরাণগুলান চলে যায় আর বুড়ারা দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেখে। খোদার বিচার বড়ো আজব।'

বৃদ্ধের কথা শেষ হতেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। মাথার ওপর খোলা আকাশ। আগলহারা সেই আকাশ থেকে জল ঝরতে লাগল। নবীনবাবু ছাতাটা খুলে দীপুর মাথার ওপর ধরলেন। শরীরটা ভিজচে, ভিজুক, অন্তত মাথাটুকু বাঁচুক। ছেলেবেলায় কতদিন তো এইভাবেই ছেলের মাথা বাঁচিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন ছেলেকে।

ছেলের মাথার ওপর ছাতা ধরে তিনি উবু হয়ে বসলেন। তার চোখ গেল সিরাজের দিকে। বৃদ্ধ বাপ একখানা গামছা দিয়ে একবার ছেলের মুখ ঢাকছেন, একবার ঢেকে দিচ্ছেন বুক। কিন্তু বৃষ্টি আটকাতে পারছেন না। সিরাজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আড়াল করার নিষ্ফল চেষ্টায় ক্লান্ত বৃদ্ধ নিজের শরীর দিয়ে ছেলেকে ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নবীন মুখার্জির চোখের সামনে দৃশ্যটা ক্রমশ এতবড়ো হয়ে উঠল যে

তিনি এই শূণ্য মাঠের মধ্যে আর কোন দৃশ্য দেখতে পেলেন না, কোনো শব্দ তাঁর কানে এলো না, এমনকি কোনো ভাবনাও নয়। তিনি শুধু দেখলেন এক অসহায় শোকার্ত পিতা আর তার মৃত পুত্রকে। যে পিতা প্রকৃতির নিষ্করুণ বর্ষণ থেকে ছেলেকে আড়াল করার নিষ্ফল চেষ্টায় পরাজিত এবং ক্লান্ত হচ্ছে।

নবীন মুখার্জি উঠে পড়লেন। ছাতাটা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সিরাজের সামনে। সিরাজের মাথার ওপর ছাতাটা ধরে আড়াল করলেন তিনি। সিরাজের বৃদ্ধ বাপ বিস্ফারিত চোখে নবীনবাবুর দিকে তাকালেন। অস্ফুটে বললেন, 'আপনার ব্যাটা যে ভিজে যাচ্ছে?'

নবীন মুখার্জি বললেন, 'ছাতা একটা, ছেলে দুজন, একটু ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হবে।'

বৃদ্ধটি কোনো কথা বলতে পারলেন না। নবীন হাতের ইশারায় সনৎকে ডাকল। তারই কথায় বাঁশের মাচাটা এনে রাখা হল দীপুর খাটের পাশে। দৃশ্যটা বড্ড বে-মানান লাগছিল নবীনবাবুর কাছে। সনৎকে ফিসফিস করে বললেন, 'দীপুর খাটটা তো বেশ বড়ো কিনেছিস। ওতে দুজনের জায়গা হয় না? তাহলে একটা ছাতায়...'

বাবার অবাধ্য হতে শেখেনি সনৎ। সিরাজের বাপকে জিজ্ঞেস করে সিরাজকে তুলে এনে শুইয়ে দেওয়া হল দীপুর পাশে। দুটো মাথা এবার পাশাপাশি। এক ছাতায় দিব্যি হয়ে যায়। নবীনবাবু দুজনের মাথার ওপর ছাতা ধরে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধটি তাঁর গামছা দিয়ে দুজনের পা থেকে বৃষ্টির জল মুছে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'গোরে দেবার আগে গোসল করাতে হয়। খোদাই গোসল করায়ে দিচ্ছেন।'

বৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখ ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। মণ্ডল পাড়ার সেই বৃদ্ধটি গামছা দিয়ে কেবলই তাদের ব্যাটদের পা মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। আর নাটাগড়ের নবীন মুখার্জি বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য ছাতা হাতে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন।

আশ্বিনের আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে ঝরে গুমোট ভাবটা কাটিয়ে দিচ্ছিল। □

টাকার গাছ বাড়ছে

তৃ ণা ঞ্জ ন গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

এই কয়েক মুহূর্ত আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুরেশ্বর। ওই তো দেখা যাচ্ছে ওর মাথা। ওই যে গলির মোড়ে রাস্তার সঙ্গো সঙ্গোই ঘুরে গেল সুরেশ্বর। এখনও ঘরে ম ম করছে গন্ধটা। যেন কেউ ধূপ জ্বেলে দিয়েছে। সুগন্ধটাই যেন বাতাস হয়ে ভরে রয়েছে ঘরময়। সুরেশ্বর বেরিয়ে যাওয়ার পরেই গন্ধটা পেয়েছে নরেশ। আর তখনই মনে পড়েছে ঘর সুগন্ধে ভরে উঠবেই বা না কেন, কী খবরটাই না আজ নিয়ে এল সুরেশ্বর!

অন্য দিন এসময় মাকে রীতিমতো তাড়া দিতে থাকে নরেশ। কারখানায় যাওয়ার আগে স্নানে যায়। বাথরুম থেকেই চেঁচায় ভাত বাড়ো, ভাত বাড়ো, আজকাল খুব কড়াকড়ি চলছে, পাঁচটা মিনিটও দেরি করা যাবে না.....।

বাথরুমের লাগোয়া ঘরের বারান্দায় যে টুকরো রান্নাঘর সেখান থেকে কনকও চেঁচান, আঃ ভাত কি আমি চানের ঘরে দিয়ে আসব, বেরবি তবে তো.....

বাড়তে বলেছি, বাড়তে.....

কনক গম্ভীর স্বরে বলেন, বেড়ে বসে আছি.....

অথচ আজ সুরেশ্বর চলে যাওয়ার পরে নরেশ চৌকির ওপরে অলস ভঙ্গিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কনক কী একটা নেবেন বলে ঘরের ভিতরে এসেছিলেন। নরেশকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, কি রে টাইমকলে জল চলে গেল? লোকগুলোও আর আসার সময় পায় না, যত এই কাজে বেরনর মুখে....।

তারপর যেটা নিতে এসেছিলেন সেটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে নরেশকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, তাহলে যা কুয়োর জলে চান করে নে, কী আর করবি....

নরেশ বলল, আজ ভাবছি একটু নবাবপুরে যাব, তাছাড়া ছুটিও তো অনেকগুলো রয়ে গেছে....

ছেলের উত্তরে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না কনক। বললেন, সুরেশ্বর সাতসকালে এসে কী এত কথা বলে গেল......

নরেশ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল একবার, তারপর বলল, ও কিছু না......

এতক্ষণ ধরে বকবক করে গেল আর কিছুই নয়। আমি দেখেছি ওই লোকটা এলেই তুই কিরকম যেন, একটা অন্যরকম হয়ে যাস, কীরকম একটা আলস্য এসে যায় তোর মধ্যে নরু, ও তোকে কী বলেরে.....

নরেশ সরাসরি তাকায় মায়ের চোখে। মিটিমিটি হাসে। বলে, কী বলে জানি না, তবে আজ যা বলে গেল তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মা...। কথাগুলো বলেই তড়াক করে উঠে বসল চৌকির ওপরে। শরীরের আলস্য যেন মুহূর্তেই ঝরে গেল। বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন! যাও ভাত বাড়ো, আমি স্নানে যাচ্ছি....

কনক অবাক হয়ে বললেন, এই যে বললি কারখানায় যাবি না!

আঃ তারপরে বললাম না নবাবপুরে যাবো...তোমায় নিয়ে হয়েছে আর এক ঝামেলা.....

কনক জিভ কেটে বললেন, ও! তা যা, একবার ভালো করে দেখে আয় তো থাকা যাবে কিনা—

নরেশের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তেই পাল্টে যায়, থাকা যাবে মানে?

থাকা যাবে মানে বসবাস করা—

বসবাস! ওখানে ঘর কোথায় যে থাকবে!

কেন! তুই করবি—

আমি করব! নরেশ দাঁত বের করে হাসে। আঠেবো বছর ধরে লেদ কারখানায় কাজ করার পরে তোমার ছেলের সম্পত্তি কি জানো, প্রভিডেন্টফাণ্ডের পঁযত্রিশ হাজার টাকা, যদি বোনের বিয়ে বলি তবে পাবো পনেবো হাজার, বাড়ি বললে পঞ্চাশ, এই ধাব আবার মাইনে থেকে কাটবে, আর তখন পঁযতিবিশশো টাকার মাইনেটাকে কীরকম দেখতে হবে বুঝতে পারছো...

ওসব কথা রাখ, একটা বেড়া আর টালির চালের ঘর করতে পারবি না......

নরেশের চোখ মাযের দিকে আরও ঘন হল। ভেবেছিল তাব এত কথাব পরে মাযের কথাটা চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু দেখল তা পড়ল না। গম্ভীর স্বরে বলল, সে পারব কি পারব না অন্য কথা, হঠাৎ করে নবাবপুরে যাওযার ভূত চাপল কেন মাথায়...

ভূত চাপার কি হল, সারাদিন ছানার জলের গন্ধে টেঁকা যায না এ বাড়িতে, তুই তো সারাদিন কারখানায় থাকিস, রাতটা শুধু বাড়িতে, তাও তো নেশা করে ফিরিস, কী আর বুঝবি বল...

নরেশ মেঝের দিকে দৃষ্টি ঝুলিযে বলে, নেশা করি বলে কিছু লোক আমারও আছে মা, না হলে এ বাড়ি থেকে সদানন্দ ঘোষেরা অনেকদিন আগেই লাথি মেরে বের করে দিত আমাদের.....

এবার কনকের দৃষ্টিও মেঝের দিকে নেমে যায। বলেন, তা তো জানি, সে পথে হবে না বলেই তো এই পথ নিয়েছে...

নরেশ অবাক হযে জিজ্ঞেস করে কী পথ....

কনক বললেন, আজ তো কারখানায় যাসনি, একটু অপেক্ষা কর নিজের চোখেই দেখতে পাবি—

নরেশের হেঁয়ালি ভালো লাগে না। বলে আসল কথাটা বলো না—

কনক বললেন, সদানন্দবাবুদের মিষ্টি তৈরির কারখানা থেকে ড্রাম-ড্রাম ছানার জল

এই উঠোনের ধারে ফেলবে, নর্দমাটা তো মজে গেছে, সব ওপরে উঠে আসে, শুকোতে শুকোতে সেই বিকেল, সারাটা দুপুর গন্ধে টেঁকা যায় না.....

তা ওদের এদিকে না ফেলতে বললেই হল—

বললেই হল! তোকে আমি বলিনি কতদিন কারখানার ছেলেগুলোকে বলেছি, কাল কী বলল জানিস, এমনিতে তো উঠবে না এভাবেই তুলব....

নরেশ তড়াক করে চৌকির ওপর থেকে মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কনক হাত ধরে নিল নরেশের। কোথায় যাচ্ছিস! ঝগড়া করে কী করবি, এখানে থাকতে পারবি। কিন্তু পারবি ছানার জল ফেলা বন্ধ করতে। পারবি না। ওরা বলবে মিষ্টির কারখানা আছে ছানার জল পড়বেই। তাছাড়া আর কারুর তো অসুবিধা হচ্ছে না, পাশে তো কাউকে পাবি না......

নরেশ থমকে যায়। এই আটত্রিশেই বুকের লোমে পাক ধরেছে। উদলো বুক নিয়ে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ছানার জল চোখে দেখা যাচ্ছে না এখন। কিন্তু বাতাসে চাপা একটা পচাগন্ধ। গভীর করে নিঃশ্বাস নেয় নরেশ। আঙুল দিয়ে চেপে ধরে নাক। ফের নিঃশ্বাস নেয়। ঘুলিয়ে ওঠে গলার ভিতরটা। বেলগাছিয়ার দিক থেকে রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে এই রেল ইয়ার্ডের মুখে। এটাই পাড়ার শেষ। সদানন্দ ঘোষের চুনের গুদাম, মিষ্টির দোকানের কারখানা আর লম্বাটে অ্যাসবেস্টাসের চালের একটা ঘর নিয়ে এই বাড়ি। লম্বাটে ঘরটির সামনে সিমেন্ট বাঁধানো একটা উঠোন আছে। উঠোনের কোণে কুয়ো। ঘর লাগোয়া বাথরুম। তার পাশে লিকলিকে একটা নিমগাছ। আগে এই অংশে সদানন্দ ঘোষের গোডাউনের কেয়ারটেকার থাকত। পরে মিষ্টির দোকানের কারখানাটাকে এই বাড়িতে তুলে আনায় কেয়ারটেকার-এর প্রয়োজন রইল না। কারখানা ভরতি লোকজন। পাহারা দেওয়ায় অসুবিধাটা কোথায়। তাই এই অংশটা ফাঁকাই পড়েছিল। নরেশের মাঝে মাঝে মনে হত এই অংশটি ফাঁকা হয়েছিল তারা আসবে বলে। না হলে স্বপ্নের ছবিটার সঙ্গে কেন এমন হুবহু মিলে গেল এই বাড়ি! এই বাড়ি কেন, ফুটপাতেও যে সেদিন জায়গা হত না নরেশদের।

নরেশের বাবা কাজ করতেন শোভাবাজারের এক কাঠগোলায়। নরেশের বয়স তখন নয় কি দশ। তখন নরেশরা থাকত পাইকপাড়ায়। গাঙ্গুলীপাড়ায় ভাড়া থাকত। যেবার কুমার আশুতোষ স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছিল নরেশ, সেবার নরেশের বাবা মারা গেলেন আর জি কর-এ। প্রথম স্ট্রোকেই ইতি। তখন গাঙ্গুলীপাড়ার দোকানগুলো এক পা-এক পা করে এগিয়ে আসছে পাড়ার ভিতরে। প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির নীচেই দোকান। নরেশদের বাড়িওলা অনেকদিন ধরেই বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পরে কনককে ধরেছিলেন। যা এতদিন সম্ভব হচ্ছিল না। নীচের তলায় তারা যে ঘর দুটোতে ছিল সে দুটো ভেঙে দোকানঘর হবে। তবে নরেশদের থাকার কথাও তিনি ভেবেছেন। টালা পার্কের মুখে সদানন্দ ঘোষের মিষ্টির দোকান। বেলগাছিয়ায় রেল-ইয়ার্ডের কাছে একটা বাড়ি আছে ওনার। বেশ বড়ো ঘর। জল আছে। ভালোই থাকবেন, চোখের পাতা মুড়ে বলেছিলেন বাড়িওলা। ন্যাড়া মাথার নরেশ পাইকপাড়া থেকে রিকশায় মালপত্র চাপিয়ে

বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে মায়ের হাত ধরে এসে উঠেছিল।

এই নতুন বাড়িতে আসার পরে বেশ কয়েকটা পরিবর্তন তার জীবনে ঘটল এটা লক্ষ করেছিল নরেশ। এখানে বাজার সামনে নয়। রেশন দোকান পুরনো পাড়ায়। এখন অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হয়। সারাদিনের ক্লান্তিটাকে কাটিয়ে নেওয়ার জন্যে সামনের টালাপার্কও নেই। আগে বিকেলের ফুটবল সেরে পার্কের ঝিলে ঝাপুর ঝুপুর চান হত। পুরনো বন্ধুবান্ধবরাও কিরকম সব হারিয়ে গেল। একদিন রেশন দোকানে পুরনো পাড়ার সমীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল নরেশের। সমীর বলেছিল ধ্যুৎ তোদের কোনও ক্ষমতাই নেই, পাইকপাড়া ছেড়ে কেউ বেলগাছিয়া ব্রিজের নীচে যায়....

নরেশ বলে উঠেছিল, আমাদের না গিয়ে উপায় কী বল, বাড়িওলা দোকান করে যে টাকা সেলামি পাচ্ছে তার একভাগ টাকাও যে আমরা দিতে পারব না, বাবা যে কিছুই রেখে যায়নি....

সমীর বলল, তুই যাই বল অন্তত বেলগাছিয়া রোডের ওপরে তোদের থাকা উচিত ছিল....তোরা যেদিকটায় গেছিস না ওদিকটায় সব আজেবাজে খারাপ লোকেরা থাকে...

নরেশের ভিতরটা কীরকম কঁকিয়ে উঠেছিল। বলতে গিয়েছিল ওরকম ঘেন্না মাখান চোখে তাকাস না। তোর বাবা আই টি সি-র ম্যানেজার। মা রাইটার্স বিল্ডিংযে চাকরি করে। তুই স্কটিশ চার্চ-এ ফার্স্ট ইয়ার ইংলিশ অনার্সে ভরতি হযেছিস। রেসিং সাইকেলে রেশন দোকানে আসিস। তাও চাল নিস না। গম নিস না। শুধু চিনিটা নিয়ে যাস। আমি সব দেখি। আমার বাবা যদি স্ট্রোকে হঠাৎ করে মারা না যেত তাহলে তোর সঙ্গে আমার খুব একটা তফাত থাকত না রে সমীর, আমার দিকে ওরকম ছোটো চোখে তাকাস না.....

সেদিন পাইকপাড়া থেকে বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে ফিরে বাড়িটাকে আরও ভালো লেগেছিল নরেশের। পাড়ার শেষে যেন কিছুটা একাকী এই বাড়ি। পাশে নোংরার উঁচু ঢিপি। দূরে রেলইয়ার্ডে দু-একটা মালগাড়ি ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে চলে যায় দূরে। স্নিগ্ধতা, তারই সঙ্গে এক আড়াল যেন। এখন তো আড়ালেরই বড়ো দরকার।

সেই আড়ালটুকুও কিরকম যেন অনিশ্চিত, অস্থির হয়ে উঠেছে এই সাত-আট বছরে। আগে এই বাড়িতে শুধু চুনের গুদাম ছিল। মাঝে মধ্যে লরি আসত। বস্তা নামিয়ে বা উঠিয়ে চলে যেত। তারপর এল মিষ্টির দোকান। এখন নরেশ জানতে পেরেছে বাগবাজারের ওদিক থেকে একটা অ্যাসিড কারখানা উঠে আসতে চাইছে এই বাড়িতে। নরেশদের লম্বা ঘরটা তাদের পছন্দ হয়েছে। সদানন্দ ঘোষকে ভালো টাকা অ্যাডভান্স করবে কথাও দিয়েছে। প্রথম প্রথম জল আলো নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোল হত। মাঝে মাঝেই বন্ধ। কিন্তু এতদিনে নরেশ যে মানুষ হয়ে গেছে। পাইকপাড়ার শিশু নরেশ মণীন্দ্রচন্দ্র থেকে দুবার থ্রি ইউ ফেল করে লেদ কারখানার দক্ষ মেকানিক। পাইকপাড়ার দিকে আর-পা-ই ফেলে না। বেলগাছিয়ার বাংলা মদের দোকানে কারখানা ফেরতা একবার যাওয়া চাই। ওখানকার বিজন কামাল শিবুরাই এখন এলাকা কাঁপাচ্ছে। ওদের সঙ্গে কয়েকবার নরেশকে দেখার পরে জল-আলোর খেলাটা বন্ধ করেছে।

নরেশ ভেবেছিল হয়তো খেলাটা বরাবরের জন্যে থেমে গেল। কিন্তু এখন বাতাসে চাপ হয়ে বসে থাকা ছানার জলের গন্ধে ঘুলিয়ে উঠছে ভিতরটা। ওদের আর কত নালিশ জানাবে নরেশ। জল নিয়ে বলেছে। আলো নিয়ে বলেছে। দুবার ওরা এসেছিল। আবার নালিশ করলে তো ভাববে ওদের নরেশ পুলিশ স্টেশন মনে করে। এর মধ্যে বন্ধুত্ব আর রইল কোথায়। আর সদানন্দ ঘোষ হচ্ছে অদৃশ্য এক করাত। দেখা যায় না। অথচ আছে। নীরবে গাছের গোড়ায় ঘষে চলেছে করাতটা। গাছটাকে একদিন সে কেটে ফেলবেই।

এমনই সব ঘটনা সবে যখন ঘটতে শুরু করেছে, নবাবপুরে চার কাঠা এক ছটাক আট স্কোয়ার ফুট জমি কিনে ফেলেছিল নরেশ। ঘটনাটা যেন হঠাৎ-ই ঘটে গেল। নৈহাটির হালিশহরে গঙ্গার ধারে নরেশদের পৈতৃক ভিটে। ভালোবাসার বিয়ে বলে নরেশের বাবাকে চলে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। তারপর থেকেই এই শহরে। নরেশের জ্যাঠামশাই মারা যাওয়ার পরে সে বাড়িতে ছোটোকাকা একা। তিনি আর একা থাকতে পারছেন না। কনক বলেছিলেন তা আমরা গিয়ে থাকি না....

ছোটোকাকা বলেছিলেন, নরেশের কারখানা নিউব্যারাকপুরে, হালিশহর থেকে যাতায়াত করবে কী করে!

কনক বলেছিল, ও আর কীরকম চাকরি, সে নয় ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু চেষ্টা করবে....

ছোটোকাকা বলেছিলেন, তা নয় হল, কিন্তু তোমাদের ও বাড়িতে ঢোকাই কি করে বলতো, এতদিনের নিয়মটা আমিই ভাঙব!

নরেশ বুঝেছিল কাকার কাছে একাকীত্বের চেয়েও নিয়ম বড়ো। তাই সেই বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। মায়ের সই নিতে আর একবার ছোটোকাকা বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে এসেছিলেন। দিয়ে গিয়েছিলেন পনেরো হাজার টাকা। আট কাঠা জমি আর তিন ঘরের দোতলা বাড়ির দুভাগের এক ভাগ তাহলে হল পনেরো হাজার টাকা। নরেশ বুঝতে পেরেছিল বাড়ি বিক্রিতে কাকার আগ্রহের কারণ। কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছিল কনক কীরকম এক উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকে দেখছে, চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিল, এই টাকাটা নষ্ট করিস না, কাজে লাগাস। হো-হো করে হাসতে ইচ্ছে করছিল নরেশের। পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কী হয় মা! জানো সেদিন শ্যামবাজারের মোড়ে সমীরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বাইক কিনেছে। কত দাম জানো। বাইশ হাজার। পনেরো হাজার টাকা কি কাজে লাগাব। কতটা কাজ হবে আমাদের!

কারখানার কালীপদর বোনের বিয়েতে কন্যাযাত্রী হয়ে গিয়েছিল নবাবপুরে। কালীপদ থাকে মধ্যমগ্রামে। বোনের বিয়ে দিয়েছে বাদু রোডের নবাবপুরে। জায়গাটা ভালো লেগেছিল। আরও ভালো লেগেছিল জমির দর শুনে। পনেরো হাজার টাকায় কাঠা চারেক জমি হয়ে যাচ্ছে দেখে লাফিয়ে উঠেছিল ভিতরটা। নিজের জমি। পাইকপাড়ার সেই বাড়িওলার ওপর আর রাগ থাকবে না, সদানন্দ ঘোষের ফেলা ছানার জল আর কনকের নিঃশ্বাস ভারী করে তুলতে পারবে না, হালিশহরে তার পূর্বপুরুষের ভিটে বিক্রি হয়ে গেল, অতবড়ো সম্পত্তি থেকে মাত্র পনেরো হাজার টাকা

গেল—তার জন্যে যে দুঃখ সেটাও থাকবে না। বুকের ভিতরে ব্যথার যাবতীয় দাগ যেন মুছে দেবে চার কাঠার ওই সবুজ।

প্রথম প্রথম প্রতি রবিবার গুটিগুটি পায়ে কখন যেন নবাবপুরে পৌঁছে যেত নরেশ। ঠিক নবাবপুরে যাবে বলেই যে বাড়ি থেকে বেরত তা নয়। কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘোরার পরে যখন আর কিছুই ভালো লাগত না উঠে পড়ত নবাবপুরের বাসে। কোনোদিন সরাসরি চলে আসত। কোনোদিন সরাসরি বাস না পেয়ে চলে আসত মধ্যমগ্রাম মোড়ে। তারপর বাদু রোড ধরে হাতে টানা ভ্যানরিক্শায় উঠে বসত। চারপাশের আধা শহুরে আধা গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ভিতরটা কীরকম অদ্ভুত এক বৃষ্টিতে ভিজে যেত। এখন তার আর কোনও জ্বালা নেই। সদানন্দকে কীভাবে কজায় রাখা যায় তার জন্যে বিজন কামাল নরেশের সঙ্গে কতটা মিশবে, কতটা মদ খাবে তার হিসেব করতে হচ্ছে না এখন, অতবড়ো সম্পত্তি থেকে মাত্র পনেরো হাজার টাকা পেয়েছে তা নিয়ে এখন কোনও দুঃখ হচ্ছে না, এখন যেন নরেশের জীবনে একটা লক্ষ্য তৈরি হয়েছে, একটা দিশা পাওয়া হয়েছে যেন এতদিনে। ভ্যানরিক্শা থেকে নেমে কাঁকর বিছানো লাল রাস্তায় হেঁটে তার সেই চারকাঠা জমির ওপরে যখন পৌঁছত নরেশ তখন বৃষ্টির শেষে এক সোনালি রোদ যেন ভেসে উঠত তার ভিতরে। মায়ের মুখেই শুধু শুনেছে গঙ্গার ধারে হালিশহরে তাদের বিশাল ভিটে ছিল। ভালোবাসার বিয়ে বলে ঠাকুর্দার হুকুমে সে বাড়িতে একটি রাতের ঠাঁইও হয়নি কনকের। তার হাতে কাকা মাত্র পনেরোটা হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে কি নরেশ বানের জলে ভেসে গেল? তা তো গেল না। তার তো পায়ের নীচে জমি আছে। মাত্র চার কাঠা এক ছটাক ষোল স্কোয়্যার ফুট। দুটি মানুষের চারটে পা রাখার জন্যে আর কতোটাই বা দরকার।

যেদিন স্নানের সময় সদানন্দের চুন কারখানার লেবাররা ইচ্ছে করে টাইমকলের চাবি বন্ধ করে দিত, মুখে সাবান মাখা অবস্থায় বাইরের কুয়োর দিকে যেতে যেতে নরেশ কল্পনায় সদানন্দকে ঘুষি মারত, সেই সপ্তাহের রবিবার দিন সন্ধেবেলায় নবাবপুরের জমিতে এসে শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে নরেশ বাড়ির প্ল্যান আঁকত। এইখানে হবে ঘর। এই বাথরুম। এখানে টিউবয়েল। এখান কুয়ো। হ্যাঁ টিউবয়েল, কুয়ো দুটোই থাকবে। গরমে জলের লেবেল নেমে গেলে কুয়ো ব্যবহার করবে। কত জল চাই। পাতাল খুঁড়ে সব জল আমি তুলে আনব। আমার নবাবপুরের বাড়িতে এসে তুমি দেখে যেয়ো সদানন্দ ঘোষ।

সদানন্দের ওপরে সেই রাগ, সেই প্রতিজ্ঞা জমি থেকে কাঁকরের রাস্তা পেরিয়ে পিচ রাস্তায় উঠতে না উঠতেই মুছে গিয়েছিল এক আগন্তুকের উপস্থিতিতে। লোকটি যেন সেদিন নবাবপুরে আসা থেকেই পিছু নিয়েছিল নরেশের। পিচ রাস্তায় বটগাছের তলায় বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল নরেশ। লোকটি মৃদু হেসে বলল, কলকাতা থেকি আসতিচেন...

নরেশের খুব চেনা চেনা লাগল মুখটা। আসার সময় ভ্যানরিক্শায় ছিল কি? নাকি তার জমির সীমানায় আমবাগান পাহারা দেয় যে লোকটা সে। ঘাড় নেড়ে সে। ঘাড়

নেড়ে আমতা আমতা স্বরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ....

জমি দেখতি এসিচেন তো, আমার হাতি ভালো জমি আচে....

সেই প্রথম নরেশের ভিতরে আত্মবিশ্বাসপূর্ণ হাসি ভেসে উঠেছিল। তাই ঠোঁট খুলে কিছু বলেনি। শুধু মনে মনে বলেছিল অনেক কিছু আমার নেই মশাই, কিন্তু ওটা আমার জোগাড় করা হয়ে গেছে। তাই রহস্য করে বলেছিল জমি তো দেখতে এসেছি, কিন্তু নিতে পারব কি.....

পারবেন না ক্যান, জমি ভালো, দামও ভালো, তারপরে বলেছিল ওই যে আমবাগানের ধারির জমিগুলো, যেখানডায় ঘুরতিচিলেন, ওখানে ন্যান, ভালো জমি আচে, পাঁচ হাজার করি কাটা পাবেন নে....

কথাটা শুনে নরেশের ভিতরটা ফুটবলের মতো লাফিয়ে উঠেছিল। লোকটা যে জায়গার জমির কথা বলছে সেখানেই তো তার জমি। তার জমি বা তার জমির লাগোয়া কোনও প্লটের কথাই বলছে লোকটা। বছর দুয়েক হল তিন হাজার করে কাঠা কিনেছে। চার কাঠা জমির দাম বারো পড়েছিল। রেজিস্ট্রি, খরচা, দালালি দিয়ে লেগেছিল পনেরো হাজার। আর এখনই যদি বিক্রি করে তবে হাজার কুড়ির বেশি পাবে! এ তো বড়ো মজার বস্তু! খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত বাতাসের মধ্যে পড়ে রয়েছে। কোনও যত্ন আত্তির দরকার নেই। টাকাপয়সা খরচা নেই। দিব্যি বাড়ছে। একে জমি বলে কেন! একে তো বলা উচিত টাকার গাছ। সেদিন নবাবপুর থেকে বেলগাছিয়ায় ফেরার পথে সে ভুলে গিয়েছিল সেই বাড়ির প্ল্যানটিকে, যেটিকে নিজের জমির ওপর দাঁড়িয়ে শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি করেছিল। তার পরিবর্তে মনের ভিতরে জায়গা করে নিয়েছিল বিজন-কামাল-শিবুর মুখ। ফন্দিটা মনের ভিতরে ফরফর করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কি করে বন্ধুত্বটা ওদের সঙ্গে আরও গাঢ় করা যায়। কীভাবে ওদের দিয়ে জব্দ করা যায় সদানন্দ ঘোষকে। আর ব্যাপারটা পেরেও গিয়েছিল নরেশ। তাই যেন নবাবপুর আর ডাকল না তাকে।

অনেকদিন পরে আবার মনে পড়েছিল নবাবপুরকে। এবার জল নয়, আলো নরেশকে নবাবপুরের কথা মনে করিয়ে দিল। বেলগাছিয়ার বাড়িতে চুনের গোডাউনের পাশে মিষ্টি তৈরির কারখানা ততদিনে তুলে এনেছেন সদানন্দ ঘোষ। গরমের দিন। রাতে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চলে যায়। একদিন বিরক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে লক্ষ করল মিষ্টির কারখানায় আলো-পাখা সব ঠিক আছে। একটাই কানেকশান অথচ তাদের ঘরে কারেন্ট না থাকার কারণ! বাড়ির সদরের পাশে তিনটে মেন সুইচ। একটা গোডাউনের, একটা কারখানার, একটা ঘরের। ঘরেরটা নীচে নামানো। মিষ্টির কারখানার ছেলেদের জিজ্ঞেস করায় নরেশ জানতে পেরেছিল এটাও সদানন্দ ঘোষের নির্দেশ। কারখানায় নতুন ঠান্ডা মেশিন আনা হয়েছে। কারেন্ট টানছে খুব। লাইন যাতে না কেটে যায় তার জন্যে ঘরেরটাই নামাতে হবে! গোডাউনেরটা নামালে কী ক্ষতি হয়। ওখানে যে শুধু বস্তা আছে, এখানে যে মানুষ। সদানন্দ বলেছিলেন, ওই বস্তা ফাঁকা কি ভরা, যেভাবেই বিক্রি করি না কেন, দুটো পয়সা আসবে, আস্ত তোমাকে বিক্রি করলে যে একটা নয়াও পাবো না বাবা.....। রাগে কাঁপতে কাঁপতে আবার

নবাবপুরে ছুটেছিল নরেশ।

এবার আর শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ির প্ল্যান করেনি নরেশ। রীতিমতো বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে বাড়ির পরিকল্পনা করেছিল। বালি-সিমেন্ট-ইট-লোহার দোকান ঘুরে একটা হিসেব তৈরি করে। তারপর কারখানায় লোনের জন্যে দরখাস্ত দেয়। মাস ছয়েকের মাথায় লোনটা যখন হাতে আসবে আসবে করছে হিসেবটাকে একবার ঝালাতে গিয়েছিল। সাপ্লায়ার্স এবার যা হিসেব দিল নরেশ দেখল প্রায় সাত হাজার টাকা মতো বেশি হচ্ছে। কাঁধের ওপরে, পাহাড়ের মতো ধার চাপবে। অথচ সবুজের ওপর স্বপ্ন ফুটবে না। কারখানা থেকে দরখাস্তটাকে তুলে নিয়েছিল নরেশ। আর ডানাভাঙা চামচিকের মতো যখন বাদু রোডে উঠে এসেছিল সেই দুপুরে, দেখা হয়ে গিয়েছিল সেই আগন্তুকের সঙ্গে আবার। নরেশকে চিনতে পেরে একগাল হেসে এগিয়ে এসেছিল বটগাছের নীচে, বলেছিল, সেই তো ফের এলেন, আগি কিনতি হয়িচিলটা কি, আপনারে পাঁচ হাজার করি যে জমি বলিচিলাম, তা হয়িচে নয়....

সিমেন্টের দাম বেড়েছে, ইঁটের দাম বেড়েছে, বালির দাম বেড়েছে — সব ভুলে গেল নরেশ। শুধু মনের ভিতরে ভেসে উঠল তার মানে চার কাঠা আর সামান্য কিছু জমি বিক্রি করলে প্রায় ছত্রিশ-সাঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সে পাবে এখন! ভেবেছিল কোনোদিন পনেরো হাজারটা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে এত দূর চলে আসবে। সেদিন ফেরার পথে তৃপ্ত মনের গভীরে বেলগাছিয়ার বাড়ির আলো সমস্যাটা মেটানোর জন্যে সেই বিজন-কামাল-শিবু ত্রয়ীরই মুখ বার-বার ভেসে উঠেছিল। সেবারেও সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছিল নরেশ।

আর এইসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নরেশ হয়ে গেছে পাকা মদ্যপ। বিজন-কামাল-শিবুর সঙ্গে অন্য জায়গাতে গিয়ে রংবাজি করতে হয়েছে তাকে। এখন আর বিজন-কামাল-শিবু কেউ বলে না। বলে বিজন-কামাল-শিবু-নরেশ। তবুও কোনও খেদ নেই নরেশের। তার টাকার গাছ তো হুহু করে বাড়ছে। এতগুলো বছর পেরিয়ে তার চার কাঠা এখন দু-লাখ ছুঁই ছুঁই। আগে বছর বছর বাড়ত। এখন বাড়ে মাসে-মাসে। নবাবপুরের পিছনে সরকারি জমিতে নতুন শহর হচ্ছে। তার আলো এসে পড়েছে নবাবপুরের শরীরে। তাই এত বাড়বাড়ন্ত। আর আজ সকালে সুরেশ্বর মানে সেদিনের সেই আগন্তুক যে খবর দিয়ে গেল তাতে সমস্ত শরীরটা কাঁপছে ভিতরে ভিতরে। নবাবপুরের পিছনে যে নতুন শহর হচ্ছে তার শরীর ছুঁয়ে এক বিশাল রাস্তা যাচ্ছে এয়ারপোর্টের দিকে। রাস্তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। শেষ হলেই গাড়ি চলতে শুরু করবে। তখন কলকাতা উজিয়ে মানুষ আসবে এদিকে। এখনই জমি দুই পেরিয়ে আড়াই লাখের দিকে। আজ অনেকদিন পরে নবাবপুরের দিকে ফের চলেছে নরেশ। বাড়ি থেকে বেরোনর সময় অন্যান্যবারের মতো এবারেও মাথার ভিতরে একটা রাগ নিয়ে বেরিয়েছে নরেশ। ছানার জলের পচা গন্ধে কনক প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হালিশহরের বাড়িতে মাকে জায়গা করে দিতে পারেনি নরেশ। তখন সে মাতৃজঠরে। জন্মানর পরেও কি পেরেছে পাইকপাড়ার বাড়িতে মাকে স্থিতু করতে? পারেনি। আর এই দুর্গন্ধময় বাতাসের হাত থেকে মায়ের শেষ ক-টা দিন কে মুক্ত করে আনতে

পারবে না সে! নিশ্চয়ই পারবে। এবার তো আর জমির বুকে শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্ল্যান আঁকবে না সে, কোনোরকমে মাথা গোঁজার জন্যে এক কামরা বাড়ির এস্টিমেটও করবে না সে, এবার শুধু মাপতে যাবে টাকার গাছটা কত বড়ো হল, সুরেশ্বরকে বলেছে এবার সে জমি বিক্রি করবে, কিন্তু সে জানে এবারেও সে জমি বিক্রি করবে না, শুধু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে আর কতদিন ধরে রাখলে লাখ তিনেক মতো পাওয়া যাবে। তারপর সেই টাকাটা হাতে এলে টাকাটা হাতে এলে নরেশকে আর রোখে কে! নবাবপুরকে পিছনে ফেলে আরও ভিতরে চলে যাবে। নতুন শহরের মুখে ছোটো ছোটো ফ্ল্যাট হচ্ছে। ওদিকটা এখনও আধা গ্রাম। দু-আড়াই লাখে নিশ্চয়ই একটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। কিছু টাকা দিয়ে ঘর সাজাবে। একটা মপেড কিনবে। মপেডে করে কারখানায় যাবে। আর তাকে রোখে কে.....

দুই

সুরেশ্বরই ঠিক করে দিয়েছিল পার্টি। সাড়ে তিন বলেছিল নরেশ। শেষ পর্যন্ত তিন কুড়িতেই ঠিক হল। নরেশের ভাবতেই অবাক লাগছিল। যেন রূপকথার গল্প বাস্তব হয়ে ঘটে গেল তার জীবনে। মাত্র পনেরো হাজার টাকা চোদ্দ বছরে হল তিন লাখ কুড়ি হাজার। তাহলে এখন আর নরেশকে বুখবে কে? যে কোনও দিনই তো সদানন্দকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে তার স্বপ্নপুরীর উদ্দেশ্যে। সুরেশ্বরের ঠিক করে দেওয়া লোকের সঙ্গে নবাবপুরকে পেছনে ফেলে আরও ভেতর দিকে চলে এসেছিল নরেশ। নতুন শহরের মুখে ছোটো ছোটো ফ্ল্যাট হয়েছে অনেক। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তবে হয়ে যাবে যে কোনওদিন। শুধু বুকিংয়ের অপেক্ষা। প্লাস্টারহীন ঢালাই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠছিল নরেশ। ব্যাংকে তিন লাখ কুড়ি শুয়ে আছে। হাঁটাতে তো অন্য গতি আসবেই। দোতলায় উঠে এসে চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারল না নরেশ। তাদের বেলগাছিয়ার ঘর অ্যাসবেস্টাসের চালের হতে পারে, আলো-জল নিয়ে ঝামেলা লেগে থাকতে পারে, পচা গন্ধ ভরে থাকে বাতাস এটাও ঠিক। তবু যেন হাত-পা ছড়ানো যায়। এখানে সিলিং যেন নেমে এসে মাথায় ঠোক্কর মারছে। সঙ্গের লোকটিকে নরেশ বলল, না, না, এ চলবে না, এর থেকে বড়ো চাই—

লোকটি চোখ কপালে তুলে বলল, তাহলে তো সাড়ে চার, পাঁচের মতো পড়ে যাবে.....

নরেশ চোখ কপালে তুলে বলল, তাহলে এই ফ্ল্যাটের দাম কত....

তিন লাখ, রেজিস্ট্রি নিয়ে তিন পঁচিশ, তিন তিরিশ মতো পড়ে যাবে..

নরেশের দু-পায়ের হাঁটু যেন ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। আজ তো সে আর লেদ কারখানার ফেকলু নরেশ নয়। আজ তার নামে ব্যাংকে তিন লাখ কুড়ি হাজার শুয়ে আছে। তবুও ধরা যাচ্ছে না লক্ষ্যটাকে। এত বছর ধরে সদানন্দের সঙ্গে দাবা খেলা, নিজের জোর তৈরি করতে গিয়ে মদ্যপ হয়ে ওঠা, কনকের দীর্ঘশ্বাস—এতকিছুর বিনিময়েও হল না! সে হাঁ হয়ে বলল, বলছ কী!

লোকটা অবাক হয়ে বলল এতে এত অবাক হওয়ার কী হল! তিন হাজার করে যে জমি কিনেছিলেন তা বেচে পেলেন আশি হাজার, আর ফ্ল্যাটের দাম শুনে চোখ কপালে তুলছেন!

নরেশ হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু। নবাবপুরের থেকেও ভিতরে ঢুকে পড়েছে। পিছিয়েছে অনেকটা। তাও হল না। মাঝদুপুরে ভরন্ত আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়েও এক বিচিত্র দৃশ্য যেন দেখতে পেল নরেশ। ঠিক তারই মতো হুবহু দেখতে একটা মানুষ আপাদমস্তক টাকায় মুড়ে গেছে। অথচ তার পায়ের নীচে মাটি নেই। মাথার ওপরে আকাশ নেই। বিচিত্র অবস্থানে কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো ঝুলে আছে। □

বৃষ্টিকলরোলে

দে বে শ রা য়

তাঁর অফিসে যাবার বাসের হর্ন শুনে ললিত ফুকন ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে ওঠেন। ব্রিফকেসটা পাশের বেতের টেবিলের ওপর শোওয়ানো থাকে, তাঁর স্ত্রী দরজার দিকে মুখ করে বেতের চেয়ারে বসে থাকেন, কোনো-কোনো দিন স্বামী-স্ত্রী একটু কথা হয়, কোনো-কোনো দিন ললিতবাবু বেতের চেয়ারে ঘাড় হেলিয়ে দু-পাঁচ মিনিট গভীর ঘুমিয়ে নিতে পারেন। এটা ললিতবাবু শারীরিক বৈশিষ্ট্য—এরকম খুচরো পূর্ণ নিদ্রায় নিজের শরীরকে টাটকা করে তোলা। বাসটা থামাতে-থামাতে হর্ন দেয়। ললিতবাবু, ঘুমোলে চমকে, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললে ধীরে-ধীরে, ওঠেন, পর্দা ঠেলে বাইরের বারান্দায় এসে সিঁড়ি দিয়ে সামনে বিশ তিরিশ ফুট মাঠটা পেরোন। তারপর একটা গভীর খোলা নালার ওপর পাটাতনের ক্যালভার্ট, শাল কাঠের, পুরোনো, বৃষ্টিতে রোদে কালো হয়ে গেছে, একটু দোলেও, বাচ্চারা প্রথম-প্রথম পেরোতে ভয় পায়, নীচের নালায় বেশ স্রোতের সঙ্গে জল যায়।

ললিত ফুকনের বাড়িটা গৌহাটির সাবেকি কায়দায় তৈরি। টিনের চাল, ডাব ওয়াল, তার ভিতর ছোটো-ছোটো দরজা-জানলা বসানো। সামনে খুঁটির ওপর বারান্দার চাল। বাড়ির ভিতর দিকে অবিশ্যি পুরোনো বাড়ির অংশ ভেঙে ফেলে নতুন কায়দার বাড়ি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সামনেরটুকু ভাঙা ও বদলানো হয়নি বলে বাইরে থেকে ভিতরের সেই গড়নটা দেখা যায় না। কাজটা একবারে হয়ে যাবে এরকমই কথা ছিল কিন্তু ললিত ফুকন হঠাৎ কাজটা বন্ধ করে দেন। একটু মুচকি হেসে বলেন, 'টিনের চালত বৃষ্টির আওয়াজ না শুইনিলে ঘুম না আইত।' উনি যে-ধরনের নীরব শান্ত লোক, তাতে এই কথাটুকুতেই বোঝা গিয়েছিল—বাইরের অংশটা অন্তত এখন ভাঙা হবে না। আর উনি যে-রকম স্থির চিন্তার লোক, তাতে এটা তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব কারণ নাও হতে পারে যে বৃষ্টির শব্দে টিনের চালের নিচে ছাড়া তাঁর ঘুম হচ্ছিল না। তারপর থেকে বাড়িটা এই অসম্পূর্ণতাতেই সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ভিতরটা এখনকার যে কোনো শহরের বাড়ির মতো আর বাইরেটা একশ-দেড়শ বছর আগেকার গৌহাটির বাড়ির মতো যখন জল আর জন্তু-জানোয়ারের আতঙ্কে নীচে খুঁটো পুঁতে দেড়তলা সমান উঁচু করে কাঠের বেড়া-মেঝে আর টিনের চালের বাড়ির তৈরি হত। সেদিক থেকে ললিতবাবুর বাড়িটাও অত পুরোনো নয়। ততদিনে গৌহাটির বাড়ি তৈরিতে ইট-সিমেন্ট লেগে গেছে। ললিতবাবুর পুরোনো বাড়ির মেঝে তো সিমেন্টের, কাঠের নয়।

ললিতবাবু পর্দা ঠেলে, বারান্দা পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, সাঁকো পেরিয়ে, এমনকী রাস্তাটাও পেরিয়ে গিয়ে যখন বাসে ওঠেন, ললিতবাবুর স্ত্রী ততক্ষণ দরজার কাছে

দাঁড়িয়ে থাকেন। বিদায় জানাবার জন্যে তিনি বারান্দায় বেরোন না বা মাঠ পেরোন না, শুধুই চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন—বাসটা ছেড়ে দিলে দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

ললিতবাবুর বাড়িটা রাস্তার পুবে। উত্তর-দক্ষিণে রাস্তাও গেছে আর ওই খালের সাইজের জলনিকাশী নালাও গেছে। রাস্তার পশ্চিমে একটা ছোটো টিলামতো, তার মাথা থেকে বিপরীত ঢালে বাড়িঘর নেমে গেছে। একটা খুব বড়ো শিরীষ গাছ পুরো রাস্তাটাকে ছেয়ে সেই নালার ওপর ঝুঁকে। অফিসের বাসটা আসে উত্তর থেকে। সেটা দাঁড়ায় শিরীষ গাছের কাণ্ড ঘেঁষে যাতে বাঁ-দিকটা অন্য গাড়ির যাতায়াতের জন্যে খোলা থাকে। বর্ষার রাস্তাটি দিয়ে বৃষ্টির জল এত তোড়ে ওই নালীতে গিয়ে পড়ে যে রাস্তার নালীর দিকের অংশ ভেঙে গেছে। ললিতবাবুর অফিসের বাসটা বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়ালে পাশের ওইটুকু রাস্তা দিয়ে উত্তরগামী ও দক্ষিণগামী দুই সারি গাড়ি যেতে পারে না, একদিকের গাড়িকে একটু সরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তবে, কতক্ষণেরই-বা ব্যাপার—নীরব, শান্ত ও স্থির ললিতবাবুর বাড়ি থেকে বাসে এসে ওঠা। ললিতবাবু অবিশ্যি এক গতিতেই হাঁটেন।

সেদিন ললিতবাবুর অফিসের বাস আর ললিতবাবুর সাঁকোর মাঝখানে রাস্তাঘেঁষে এসে দাঁড়ায় একটা কালো কাচের সাদা অ্যামবাসাডার, ঠিক যখন ললিতবাবু সাঁকোটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন। তাঁকে দাঁড়াতে হয় গাড়িটা যাচ্ছে বলে, দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই গাড়ির, সাদা অ্যামবাসাডারের, পেছনের দরজা খুলে একজন নেমে আসে, বাঁ হাতে দরজাটা খোলা রেখেই। গাড়িটা পুরো থামেও না, ললিতবাবুকে ছেলেটি কিছু বলে, কী বলে না, ললিতবাবু মাথা নীচু করে প্রথমে ওঁর ব্রিফকেসটি সিটের ওপর রাখলেন, তারপর ডান পা-টা আগে ঢুকিয়ে গাড়ির ভিতর বসে পড়েন। উনি গতি বাড়ান না, অথচ অ্যামবাসাডার গাড়িটা যেন ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। ললিতবাবুর স্ত্রীর মনে হয় গাড়ির ভিতর থেকে যেন ললিতবাবু হাতও নাড়ালেন, আজ হয়তো গাড়িতেই যাচ্ছেন। গাড়িটা চলে গেল। ললিতবাবুর স্ত্রী দেখেন অফিসের বাসটা দাঁড়িয়ে, ঠিক সেই মুহূর্তেই হর্ন দিল, ললিতবাবুর স্ত্রী বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাতের মুদ্রায় বোঝাতে চান—ওই তো ওই গাড়িতে ললিতবাবু চলে গেলেন। বাসেরও কেউ-কেউ ললিতবাবুকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছে। মানে? দরজা খুলে দু-একজন সহকর্মী, সহযাত্রী নেমে আসেন, ড্রাইভার দরজা খোলা ও বন্ধ করার আওয়াজ তুলে মাটিতে লাফায়। ললিতবাবুর স্ত্রী সাঁকোর দিকে এগিয়ে আসেন।

'কিতা গেলেন?' কোথায় গেলেন ললিতবাবু?

'আরে এইত মোটর গাড়িটাত্ চড়ি—'

'মোটর গাড়িতাত্ ত?'

'এই যে আগাত্ গেইল, সাদা গাড়িখানা—'

'সাদা গাড়ি খান? খাইসে।'

ড্রাইভার ও সহকর্মী-সহযাত্রীরা লাফিয়ে বাসে ওঠেন। পরপর বাসের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হয়। বাস ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে যায়। ললিতবাবুর স্ত্রী 'আরে দেইখছনি তোমরা—' বলে চিৎকার করতে-করতে তাঁর বাড়ির ভিতর দিকে ছোটেন।

একদিকে অফিসের বাস ও সহকর্মীরা, আর অন্যদিকে বাড়ি ও স্ত্রী, তার ঠিক মাঝখান থেকে উলফারা আরও একজন পণবন্দী সংগ্রহ করে নিয়ে গেল। ললিত ফুকন সেই সুবাদে পরদিন সকাল থেকে কাগজের ও টিভির খবর হলেন। প্রত্যেকদিনই সরকার তাঁর সম্পর্কে ও অন্যান্য পণবন্দী সম্পর্কে বিবৃতি দিতে থাকলেন। তারপর ললিতবাবু সাধারণভাবে 'পণবন্দী', কথাটার মধ্যেই ঢুকে গেলেন, তাঁর সম্পর্কে আর আলাদা করে কিছু বলা বন্ধ হল।

সাঁকোটার শেষে এসেই ললিতবাবু দেখেছিলেন, উত্তর থেকে একটা গাড়ি একটু বেশি বেগে আসছিল। তিনি সাঁকোটা শেষ করে রাস্তা পার হওয়ার আগেই গাড়িটা এসে বাস আর তাঁর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। ললিতবাবু গাড়িটাকে পথ দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। এখানে কেউ গাড়ি বা বাস থেকে নামে না। ললিতবাবু দেখেন গাড়ির পেছনের দিক কাত করা আছে। যে-লোকটি নেমেছিল, সে ললিতবাবুকে বলে 'তাড়াতাড়ি ওঠেন, তাড়াতাড়ি ওঠেন।' ললিতবাবু কিছু ভাবতে পারেন না। তিনি ঘাড়টা নিচু করে রিভলবারের নলের দিকে কপালটা এগিয়ে দেন। কিন্তু গাড়ির ভিতরে ঢুকে বোঝেন তাঁকে বসতে হবে রিভলবারের নলটা পেরিয়ে, দুজনের মাঝখানে। তা হলে যে গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে গাড়িতে উঠতে বলল, সে কি আর গাড়িতে উঠল না, না কি সে সামনের সিটে চলে গেল। তার দিকে যে রিভলবার তাক করে ছিল সে তো সরেনি। তাহলে এদিকের, মানে ললিতবাবুর ডানদিকেও, একটা রিভলবার আছে। ললিতবাবু কোনোদিন রিভলবার দেখেননি, বন্দুক-রাইফেল এসব দেখেছেন। রিভলবার দেখেননি কিন্তু পুলিস অফিসারদের পেছনে রিভলবারের খাপ ঝুলতে দেখেছেন। সেই রিভলবারগুলো এখন খাপমুক্ত হয়ে তাঁকে দুদিক থেকে চেপে ধরল। সামনের সিটে যারা বসে তাদের কাছেও রিভলবার থাকতে পারে। আসলে, এদের প্রত্যেকের কাছেই রিভলবার, বোমা বা ওই-জাতীয় কিছু থাকার কথা। তা-ই যদি থেকে থাকে, তাহলে একটা অ্যামবাসাডার গাড়ির পক্ষে এ-গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র একটু বেশি থেকে যাচ্ছে না কি? এ গাড়িতে লোক আছে-

সেটা গুনে ফেলার আগেই একজন পাশ থেকে সম্মানের সঙ্গেই তাঁর চশমাটা খুলে নেয়, প্রায় চোখের ডাক্তারের মতো যত্নে, ধীরে। কিন্তু সেই খুলে নেওয়ার ভঙ্গির মধ্যে এমন নিশ্চয়তা ছিল যেন অনেক এক্স-রে, অনেক ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পর ললিতবাবু অপারেশন টেবিলে, ললিতবাবু নিজেই নিজের অপারেশনের জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও এখন সবটাই তাঁকে উপেক্ষা করে কিন্তু তাঁকে ঘিরে ঘটছে। ললিতবাবু তখন চশমাটা খুলে নেওয়া ঠেকাতে যান যখন তাঁর চোখের সামনেটা চশমার অভাবে ঝাপসা হয়ে আসে। তাতে তিনি চশমাটা ধরতেও পারেন বাঁ হাতের মুঠোয়। বাঁ দিকের লোকটি কি এখন রিভলবারটা রেখে দিয়েছে? নইলে সে ডানহাতে চশমার ওপর থেকে ললিতবাবু মুঠোটা শিথিল করে দেয় কী করে। ললিতবাবু যে চশমাটা একেবারে দুহাতে চেপে ধরেছিলেন, তা নয়। ফ্রেমের স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেলে চশমাটা নাক থেকে পিছলে নামলে যেমন অভ্যস্ততায় চশমাটাকে আবার নাকের ওপর তুলে দিতে হয় তেমন অভ্যস্ততাতেই তিনি নিজের চশমা ফিরিয়ে নিতে

চাইছিলেন। বরং যে-লোকটি তাঁর বাঁ হাতের দিক থেকে তার ডানহাত দিয়ে ললিতবাবুর বাঁ হাতটি চশমা থেকে খসিয়ে দেয়, সে-লোকটির স্পর্শ খুব ঠান্ডা ছিল, তার ভঙ্গিও নাটকীয় ছিল একটু। লোকটির বাঁ হাতে ললিতবাবুর চশমা, লোকটির ডান হাতে ললিতবাবুর হাত— তাহলে লোকটি কি রিভলবারটা রেখে দিয়েছে? খাপে না, পকেটে, না, সিটের ওপরে। সিটের ওপরেও রিভলবারটা রাখা হয়ে থাকতে পারে ভেবে ললিতবাবু একই সঙ্গে স্বস্তি পান, তাহলে অন্তত একটা রিভলবার কম হল, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভয় পান, তাঁর বাঁ উরুতে লেগে যদি রিভলবারটা থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। তিনি বাঁ পাটা সংকুচিত করেন।

এবারে ললিত ফুকনের ডান-হাতি লোকটি তাঁর ঝাপসা চোখের সামনে একটা কালো কাপড় আনে। কাপড়টা আনতে গিয়ে তাকে ডান হাতে কাপড়টা ধরে একটু ঝুঁকে ললিত ফুকনের কাছে আসতে হয়, কালো কাপড়টা তাঁর চোখের পাশে ঝুলতে থাকে। ললিতবাবু একবার ডাইনে তাকিয়ে কাপড়টা দেখেন। তারপর বোঝেন তাঁর মুখের দিকে আসছে—আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে। ললিতবাবু একটু এগিয়ে লোকটির কাজের সুবিধে করে দেন। লোকটি তাঁর দিকে আরো একটু ঝোঁকে। গাড়িটা খুব জোরে চলছিল, ফলে তাঁরা সবাই দুলছিলেন। লোকটিও সেই কারণে নিজের লক্ষ স্থির রাখতে পারে না। সে প্রায় ললিতবাবুর ডান কাঁধ ও ডান হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে আবার পর মুহূর্তে দরজার দিকে ছিটকে যায়। তার বাঁ হাতটাও ললিতবাবুর পিঠ আর সিটের ফাঁকে পড়ে যায়। সে এবার সেই হাত দিয়ে ললিতবাবুর বাঁ কাঁধটা ধরে সোজা হয়, ললিতবাবু তার দিকে ঘুরে তাকে উঠতে একটু সাহায্যও করতে যান, সে সোজা হয়ে বসে, তারপর ললিতবাবুকে বলে, 'এদিকে ফিরান মুখ।' ললিতবাবু ডান দিকে মুখ ফেরান। তোলা কালো কাচের ভিতর দিয়ে ললিতবাবু অপস্রিয়মাণ কিন্তু আচ্ছন্ন কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ওপর দৃষ্টি রাখেন, তাঁর স্বদেশের নিসর্গের প্রতি বন্দীদশায় সেই তাঁর শেষ সচেতন দৃষ্টিপাত। লোকটি কালো কাপড়টা তাঁর চোখের ওপর সেঁটে পেছনে টেনে নিয়ে যায় গিঁট দিতে। এরকম যে হতে পারে ললিতবাবু তার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলেন না। ফলে তিনি ডান চোখটা বুজতে পেরেছিলেন, বাঁ চোখটা আধখোলা ছিল। চোখের পাতায় ব্যথা লাগে। 'না, না' বলে অল্প কথায় শান্ত নীরব মানুষটা বাঁ হাত দিয়ে বাঁ চোখের ওপর কাপড়ের যে অংশটা ছিল সেটা ঢিলে করে নিতে গেলে বাঁ দিকের লোকটি তাঁর হাতটি এক ঝটকায় নামিয়ে দেয়। যদিও ঐ স্পর্শটুকুতেই তিনি বাঁ চোখের পাতা পুরো বন্ধ করতে পেরেছেন, পেছনের গিঁটটা শক্ত করে পড়ে। তাঁর মাথার পেছনে ব্যথা করতেই তিনি ডান হাত তুলে মাথার পেছনে নিয়ে যান। এবার তাঁর হাত কেউ ঝটকা মেরে নামিয়ে দেয় না অথচ সরিয়ে দিয়ে গিঁটটা একটু ঢিলে করে দেয়। ললিতবাবু আরাম বোধ করেন। কেউ একজন তাঁর চোখে চশমা পরিয়ে দেয়। তাঁর চোখটা বেঁধে তাঁকে তাঁর চশমাটাই পরিয়ে দেওয়া হল নাকি? কিন্তু তাঁর চশমা হলেও চশমাটা কাপড়ের ফালির ওপর দিয়ে পরানো হলে চোখে বেশি শক্ত হয়ে বসছিল। কিন্তু এটা তাঁর চশমাই তো? তাঁর চশমাই হবে—তাঁর চশমার দায়িত্ব ওরা নিতে যাবে কেন। তবু আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে তিনি ডান হাতটা গাঁটের ওপর

রাখেন। তাঁর চশমাই হবে। আঙুলটা গাঁটের ওপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান, একটা ছোট্ট ফাটল ধরেছে। তাঁর পাওয়ার বদলানোর সময় হয়েছে কিন্তু সময় করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে উঠতে পারেননি। ফাটলটা আঙুলে লাগল না। তাহলে কি এটা কালো চশমা যাতে পট্টিটা দেখা না যায়? তিনি হাতটা নামিয়ে এনে দুই হাতই কোলের ওপর রাখা ব্রিফকেসের ওপর জড়ো করে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে রাখেন। অফিসের বাসেও তিনি এভাবেই বসেন।

তাঁর অপহরণকারীদের প্রাথমিক কাজগুলো শেষ হওয়ার পর তারাও যেমন, হয়তো, একটু জিরোতে পারে, ললিতবাবুও যেন তখন, তখনই প্রথম বোঝেন তাঁকে অপহরণ করা হচ্ছে, করা হল, একেবারে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে, তাঁর অফিস বাসটার সামনে থেকে। অফিস বাসে যারা বসেছিল তাদের দেখতে পাওয়া উচিত, তাঁকে অপহরণ করা হল। কিন্তু দেখে থাকলেও কেউ সেটা স্বীকার করবে না, দিনকাল এমন। তাঁর স্ত্রী যদি ততক্ষণে ঘরের দরজা বন্ধ করে না থাকেন, তাহলে, তাঁরও দেখার কথা যে ললিতবাবু অফিস বাসে না উঠে একটা সাদা অ্যামবাসাডারে উঠলেন। সাদাই তো রং ছিল গাড়িটার? চোখ বাঁধা অবস্থায় ললিতবাবু মনে আনার চেষ্টা করেন সেই গাড়িরই ভিতর বসে।

তাঁকে অপহরণ করা হল, করা হচ্ছে, এখনও তিনি অপহৃত হচ্ছেন—এটা সম্যক বোঝার পর ললিতবাবুর প্রথম মনে হল, তাঁর স্ত্রীকে বলে আসা হল না, তিনি কতক্ষণ পরে জানতে পারবেন, জানতে পারার পর তিনি কীরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবেন। অফিসেও খবর দেওয়া হল না, তাঁর আজকে একটা কনফারেন্স ছিল, তার কাগজপত্র এই ব্রিফকেসে।

মানুষ তো সবসময়ই প্রতিবর্তক্রিয়ায় চলে। এই শান্ত নীরব মানুষটি কখনও কাউকে বিব্রত করতে চান না, নিজের কোনো সমস্যা নিয়ে বিব্রত করতে তো আরও সংকুচিত হয়ে পড়েন। উলফা অপহরণকারীরা তাঁকে অপহরণ করার ফলে তাঁর যে জীবনসংশয় দেখা দিল—এটা কোনো নাটকীয় আঘাতে তাঁর মনে চাড়িয়ে ওঠে না। বরঞ্চ, তিনি কিছুতেই তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না, চাইছিলেন, তবু পারছিলেন না। এরকম কথাও তাঁর মনে চকিতে আসছিল—তাঁর অফিসের গাড়িটা এই গাড়িটাকে ধাওয়া করেনি তো? সেরকম অবিশ্যি আজকাল কেউ করে না। তিনি চাইছিলেন বা আশা করছিলেন—তাঁর অফিসের গাড়িটা পেছন-পেছনে আসুক, তাহলে তাঁর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর একটা যোগ থাকে। তিনি আবার এটাও চাইছিলেন, অফিসের গাড়িটা যেন ধাওয়া না করে। যদি করে এবং যদি এই গাড়িটাকে টপকে সামনে গিয়ে এই গাড়িটাকে ঠেকিয়ে দেয় তাহলে হয়তো এই অপহরণকারীরা এই গাড়ি ছেড়ে পালাবার আগে তাঁকে গুলি করে মেরে যাবে। অথবা হয়তো বোমা মেরে তাঁকে শুদ্ধ গাড়িটা ধ্বংস করে দেবে, অথবা হয়তো...। আবার তিনি এও ভাবছিলেন, এমনও তো হতে পারে যে তাঁর অপহরণকারীরা নিজেরা পালানোতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তাঁকে রিভলবার দিয়ে মারতে পারল না, বা বোমা মেরে গাড়িশুদ্ধ তাঁকে লোপাট করে দিল না। কিন্তু তা হবেই-বা কেন? এ পর্যন্ত কেউ কোথাও

কোনো অপহরণকারীকে ধাওয়া করেনি, ধরেনি, এমনকি পুলিশও প্রায় করে না। তাহলে তাঁর অফিসের গাড়িই-বা কেন করবে? আর তাঁর স্ত্রী যদি দেখেও থাকেন, বুঝে উঠতে পারবেন কী না কে জানে। আর যদি বুঝে উঠতে পারেনও তা হলেই-বা তাঁর কী করণীয় তা তিনি কি করে স্থির করবেন?

তাঁকে অপহরণ করা হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়াটা চলছে আর এতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে—এই ভয়টা যেহেতু তাঁর প্রতিদিনের ভয় নয়, তাই ললিত ফুকনের চৈতন্যের ভিতর ঢুকে একটা একটা শারীরিক ভয় হয়ে উঠতে বেশ কিছুক্ষণ কাটে। এই সময়ের মধ্যে ফুকনের সময়চেতনা পারিপার্শ্বিক থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। কতক্ষণ তিনি গাড়িতে আছেন, গাড়িটা কতক্ষণ ধরে চলছে, এ-সবের কোনো আন্দাজ তিনি মনে-মনে করতে পারেন না। অয়েল ইন্ডিয়ার যে-অফিসে তিনি বসেন, তাঁর বাড়ি থেকে অফিসের বাসে সেখানে পৌঁছতে আধঘণ্টা লাগে। অফিসে ঢুকে, নিজের চেয়ারে বসে, একটু বিশ্রাম করে তিনি পুরো একগ্লাস জল খান। সেই পিপাসা তাঁর শরীরের অভ্যাস। এখন তিনি সেই পিপাসা বোধ করেন। তা হলে কি আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে?

ফুকন নিশ্চিত হতে পারেন না। অপহরণের উত্তেজনায় তিনি পিপাসাটা ভুলে গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু প্রথম দিকে তো তিনি উত্তেজিত হননি। যদিও রিভলবারের নল দেখিয়েই তাঁকে অ্যামবাসাডারে তোলা হয়, যদিও অ্যামবাসাডারের পাশেই ছিল তাঁর অফিসের গাড়ি, যদিও রিভলবারের সেই নলের আশঙ্কায় তিনি বাঁ উরু সরিয়ে রেখেছেন একটু, তবু, রিভলবারটা যে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে পারে, তাঁর মৃত্যু ঘটানোর জন্যেই যে রিভলবারটা আছে, এটা তাঁর তখনও ততটা বাস্তব বলে মনে হয়নি। এমনকী তখনও নয় যখন তিনি ভেবেছেন, এই গাড়িটার আয়তনের তুলনায় আগ্নেয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক অনেক বেশি। কিন্তু এখন, এখন তাঁর সারা শরীরে মৃত্যুভয় ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি হাত-পা কিছু নাড়াতে পারেন না, যেন নাড়ালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু।

ললিত ফুকন শুনতে পান রিকশার হর্ন, ও বেলের আওয়াজ, স্কুটারের আওয়াজ, গাড়ির আওয়াজ, ট্রাকের আওয়াজ, বাসের গায়ে কনডাক্টারের চড় মারার আওয়াজ ও চিৎকার, কোথাও মাইক বাজছে। এইসব আওয়াজ শোনার পর তিনি বুঝতে পারেন, গাড়িটা ধীরে-ধীরে যাচ্ছে, বাঁক নিচ্ছে, এমনকী দাঁড়িয়ে পড়ছে। গাড়িটার যেন কোনো তাড়া নেই। প্রতিদিনের এই অফিস টাইমের ভিড়ের সঙ্গে মিশেই গাড়িটা অফিস টাইমের অন্যান্য গাড়ির মতোই এগোচ্ছে। অথচ এই গাড়িতে ফুকনকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাঁর জন্যে একটা মুক্তিপণ দাবি করা হবে, বা, মুক্তিপণ তো দাবি করাই আছে—সমস্ত উলফা বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, বা, এমন মুক্তিপণ যা নিয়ে তাঁর পরিবারের কেউ কিছু করতে পারবে না, সরকারের সঙ্গে কোনো সূত্রে উলফার কারও কথাবার্তা চলতে থাকবে, কোনো একসময় সেই মধ্যস্থকেই খুন করে ফেলা হবে, আবার পুলিশ কিছু ছোটাছুটি করবে, সেই পুলিশের ভিতরই উলফার লোক আছে, আবার কথা উঠবে উলফার সবাইকে ছেড়ে দেয়া হোক, আবার সি-আর-পি আসবে, আবার সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হবে কি হবে না তাই নিয়ে তর্ক চলবে, আবার

উলফা তাদের দাবি পূরণে সরকারকে বাধ্য করার জন্যে একজন পণবন্দীকে মেরে ফেলে রাখবে, গৌহাটিতে বা মালিগাঁওয়ে বা শিবসাগরে বা নওগাঁয়। সেই পণবন্দী, মৃত্যুর জন্যে নির্বাচিত সেই পণবন্দী ললিত ফুকনও হতে পারেন। ললিত ফুকন না হয়ে আর-কোনো পণবন্দী হতে পারেন। আর-কোনো পণবন্দী হলে ললিত ফুকনই-বা হবেন না কেন? ললিত ফুকন যদি আজ অপহৃত হতে পারেন তাহলে কাল, বা আজই ললিত ফুকনের মতো আরও কেউ অপহৃত হবেন না কেন? ললিত ফুকন ভয় পান। এমনও তো হতে পারে যে তাঁকে ওরা পণবন্দী করে রাখবেই না, এখনই, এই গাড়ির মধ্যেই মেরে বাইরে ফেলে দিতে পারে। ললিতবাবু জানে সে-রকম যদি এরা করেও তা হলেও কেউ কিছু বলবে না। ললিত ফুকন ওই রিকশার হর্ন, স্কুটারের আওয়াজ, পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাওয়ার অনুভব, বড়ো ভারী ট্রাকের আওয়াজ, গাড়িটার গা ঘেঁষে যাত্রী-ভরতি কোনো বাস চলে যাওয়া টের পাওয়া—এইসব কিছুর মধ্যে যেন বেঁচে থাকার আশ্বাস সংগ্রহ করতে চান। এত ভিড়ের মধ্যে কেউ দেখছে না যে তাঁকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এ গাড়ির কাচগুলো কালো, কাচগুলো তোলা আছে। বাইরে থেকে ভিতরটা দেখা যায় না, তিনিও দেখতে পাননি। ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যায়, তিনিও দেখেছেন। তাঁর দেখা তাঁর স্বদেশের নিসর্গের এক অবান্তর টুকরো।

ললিত ফুকন গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করেন। দু-একবার, গোপনে। এমন হতে পারে যে এরকম গন্ধ শোঁকা নিষিদ্ধ। তারপর জোরে শ্বাস টানার ভঙ্গিতে একবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো পরিচিত গন্ধ পান না। ভেবেছিলেন, গন্ধ নিয়ে তিনি আন্দাজ করতে পারবেন জায়গাটা পানবাজার, উজানবাজার বা পল্টনবাজার কি না। কিন্তু তিনি নাক টেনে গন্ধ পান এই গাড়ির ভিতরটাই এক যান্ত্রিক পরিচ্ছন্ন গন্ধ। এ-গাড়ির কাচ তোলা। বাইরের কোনো গন্ধ এখানে ঢুকছে না।

ললিত ফুকন মানুষ হিসেবে শান্ত, নীরব ও স্থির। নিজের কোনো ইচ্ছে কারও ওপর চাপাতে পারেন না, কিন্তু নিজের ইচ্ছেটা নিজের ভিতর লালন করতে পারেন। সে জন্যে বাড়িটা অসম্পূর্ণ পর্যন্ত রাখেন। তাঁর সম্পূর্ণতার বোধটা হয়তো একটু বেশি ব্যক্তিগত। তিনি নিজের মনেও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কিছু একটা কথা তাঁর জমেছে, তাঁর সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করতে চান, কিন্তু কথাটা যে কী তা তিনি স্পষ্ট বোঝেন না নিজেও। নিজের মনের সেই অনিশ্চয়তা তিনি হয়তো উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নিজেই শুনতে চান—তাঁর গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরোয় না, ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে।

ললিত ফুকনকে এখন একটা ঘরে রাখা হয়েছে। ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। একটা মাঝারি সাইজের ঘর। ঘরের সঙ্গে বাথরুম। তাঁর শোবার তক্তাপোশটিতে সেটুকু আরাম তাঁর জোটে, যেটুকুতে তিনি অভ্যস্ত। সকালে একটি লোক এসে তাঁর বাথরুমে জল ভরে রেখে যায়। তারপর যথাসময়ে তিনি চা, দুপুরের খাবার, বিকেলের চা-খাবার ও রাত্রির খাবার পান। বাড়িতে, বা বাইরে তিনি যে রুটিনে অভ্যস্ত ছিলেন, এখানেও তাঁর জীবন সেরকম রুটিন মাফিক চলে। তাতে তাঁর শরীরের কোনো কষ্ট

হয় না। এমনকী দাড়ি কামানোর সরঞ্জামও ওরা দিয়েছে। এ-ঘরের সবগুলো জানলা বন্ধ, একটিমাত্র দরজা সব সময় বাইরে থেকে বন্ধ থাকে। বাইরের কোনো একটি দৃশ্যের টুকরোও তিনি দেখতে পান না। শুধু পাঁচবার যখন ঘরের দরজা খোলা হয় তখন তিনি চোখ ভরে দেখে নেন বাইরের আকাশ, প্রায় বনের আভাস আনে এরকম দীর্ঘ ও বড়ো গাছের জটলা।

উলফা তাঁকে কেন ধরল—এ নিয়ে তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। উলফা তাঁকে নিয়ে কী কী করতে পারে—এ নিয়েও তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। এ-সবই তো তিনি বাইরে থেকে জেনে এসেছেন। তাঁর মতো অত্যন্ত সাধারণ লোকজনকেই উলফা ধরছে ও তাঁদের পণবন্দী রেখে নিজেদের লোকজনের মুক্তি আদায় করছে। এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাদের দর কষাকষি চলছে। দর কষাকষিতে নিজেদের দর বাড়াবার জন্যে উলফা মাঝেমধ্যে দু-একজনকে খুন করে ফেলে আসছে। সরকার ওতে তাড়াতাড়ি তাদের দাবি পূরণ করতে পারেন—এই হচ্ছে উলফার হিসেব।

তাঁকেও যে মারতে পারে এ নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। এ নিয়ে তাঁর আপাদমস্তক ভয়ই আছে। প্রত্যেক দিন যে-পাঁচবার দরজা খোলা হয়, সেই পাঁচবারই তিনি চমকে উঠে প্রস্তুত হন ওরা তাঁকে এবার খুন করতে নিয়ে যাবে। এমনকী সেই পাঁচবার ব্যতীত অন্যসময়ও তিনি মাঝেমধ্যে চমকে ওঠেন—তাহলে কি ওরা তাকে খুন করতে এসে গেল! যে-জীবন তিনি যাপন করে এসেছেন, তাতে কোথাও খুন হওয়ার জন্যে কোনো প্রস্তুতি ছিল না। কোনো মানুষেরই থাকে না।

তিনি এই সময়টুকুর মধ্যে শুয়ে থাকতে-থাকতে, হাঁটতে-হাঁটতে অনুমানের চেষ্টা করেন যে তাঁকে ওরা কোথায় রেখেছে। গন্ধ পান গাছের, বুনো পাতার। কিন্তু তিনি তো কখনও বনজঙ্গলে থাকেননি। কী করে বুঝবেন সত্যি এটা একটা ভুল গন্ধমাত্র কি না, নাকি সত্যি এটা জঙ্গল। তবে এটুকু বুঝতে পারেন যে এর কাছাকাছি কোনো শহর বা বড়ো রাস্তা নেই। শহরের আওয়াজ, রাস্তার আওয়াজ এ-সব কোনো কিছুই তাঁর কানে আসে না। দিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বোধহয় একটা প্লেনেরই আওয়াজ পান। এমন হতে পারে যে কাছাকাছি কোথাও ছোটোখাটো প্লেন ঘাঁটি আছে। এমন হতে পারে যে প্লেনটা এখানকার আকাশ দিয়ে উড়ে যায় মাত্র, আর-কোনো আওয়াজ নেই বলে আওয়াজটা তাঁর কানে আসে রোজ বেলা আড়াইটে নাগাদ। তাঁর ঘড়ি, তারিখসহ, তাঁর কাছেই আছে। তাঁর পকেটের ডটপেনটাও আছে। কিন্তু ব্রিফকেসটা নেই। প্লেনের আওয়াজটা চা বাগানের প্লেনের আওয়াজও হতে পারে—অনেক বাগানের নিজস্ব ছোটো প্লেন আছে। কিন্তু কোনো দূর আকাশ দিয়ে বেলা আড়াইটে নাগাদ একটা প্লেন উড়ে যায় তার আওয়াজ শুনে তিনি কী করে জানবেন তাঁর বর্তমান আবাসের স্থানাঙ্ক কী?

যারা তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছে তারা তাঁর ঘরে তাদের গোটা তিনেক ছোটো-ছোটো প্রচারপুস্তিকা দিয়ে গেছে। সেগুলো দেখতে-দেখতে পড়া হয়ে গেছে তাঁর। তারপরও, আর কিছুই হাতের কাছে না থাকায়, ওইগুলোই ফিরে-ফিরে পড়েছেন। ওদের এই পুস্তিকাগুলো থেকে ললিত ফুকন জানতে পারেন যে তাঁর অপহরণকারীদের

কাছে তাঁর আসল পরিচয় এটা যে তিনি ভারতবাসী। উলফা মনে করে, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ অহোম দেশকে জোর করে দখলে রেখেছে ও তাদের এই সংগ্রাম ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রাম।

উলফা যে এরকমভাবে তা তো আর ললিত ফুকনের কাছে কোনো আবিষ্কার নয়। এসব তো জানা কথাই। কিন্তু এই বিষয়টিই তিনি জানতেন না যে তিনি ১০০ কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেন ইতিহাসের কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে। সরকারের মন্ত্রীটন্ত্রি বাদ দিয়ে কেউ-কেউ যে কোনো-কোনো সময় একটা দেশেরই প্রতীক হয়ে ওঠে তা তো তিনি টিভিতে চাক্ষুষই করেছেন, অলিম্পিকে বা এক-একটা টেস্ট খেলায় বা এরকম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যখন একজন ব্যক্তি ব্যক্তি হিসেবে যে কৃতিত্ব পান তা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বই থাকে না। দেশের পতাকা ওড়ে, দেশের জাতীয় সংগীত বাজে। তখন ওই একটি মানুষ বা দশ-এগারোটি মানুষের একটি দল পুরো দেশ হয়ে ওঠে। দেশ বলতে তো বোঝায় সুনীল গাভাসকার, কপিল দেব, পি টি উষা এঁদের। ললিত ফুকনকে কী করে দেশ বোঝাবে?

তেমন কোনো কৃতিত্ব তো তাঁর জীবনে নেই। এমনকী তিনি যে এত শান্ত, ধীর ও নীরব এও তাঁর ব্যক্তিত্বচর্চার কোনো সচেতন ফল নয়। অথবা হতে পারে হয়তো ব্যক্তিত্বচর্চার সচেতন ফলই—কারণ তিনি নিজের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করতে চান না, টিনের চালে বৃষ্টির শব্দের অভ্যস্ততা থেকে বিচলিত হতে চান না, তিনি নিজের কথাটুকু স্থিরভাবে জানার আগে কথাটা বলে ফেলতে চান না, তিনি যেমন রাস্তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাঁটতে চান তেমনি যাঁদের সঙ্গে তাঁর বিনিময় তাঁদের মুখচোখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তাঁদের মনের কথার আঁচ পান।

এই বন্দী দশায় সারাদিন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে-থাকতে তাঁকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে নিজেকে ভারতবাসী হিসেবে আবিষ্কার করতে হচ্ছে। ঘরের বাইরে এক পা যেতে পারেন না। রাত্রির ঘুম তাই কমে যাচ্ছে, পাতলা হচ্ছে। সেই ঘুমের মধ্যেও তাঁকে জাগরণের এই প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হয়, অন্তত সে-রকম থাকাটাই তাঁর অভ্যেস হয়ে গেছে যে তখুনি তাঁকে উঠে মরতে যেতে হতে পারে। মৃত্যুর এমন আশঙ্কা নিয়ে এমন নিভৃতিতে রাতদিন কাটানো এক ধরনের অধৈর্য এনে দেয়। ললিত ফুকন বুঝতে পারেন—তাঁর ভিতর সেই অধৈর্য ধীরে-ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে পুঞ্জিত হয়ে উঠছে। তিনি জানেন না, সেই পুঞ্জীভূত অধৈর্য কোন দিক দিয়ে কীভাবে তিনি কোনোদিন প্রকাশ করবেন।

একদিকে সেই অধৈর্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে আর-একদিকে সেই বিস্ময়ের ঘোর তিনি কাটাতে তো পারছেনই না বরং বিস্ময়ের সেই ঘোর অলক্ষে বেড়েই চলেছে যে তিনি ভারতবাসী হিসেবে এখানে বন্দী, তিনি একশ কোটি ভারতবাসীর একজনমাত্র প্রতিনিধি।

এই ঘরে একটি ঘুলঘুলি পর্যন্ত নেই যে সেখান থেকে রোদের বা ছায়ার আভাস পাওয়া যাবে। জানলাগুলোর ফাঁক দিয়ে আর বাথরুমের নালার গর্ত দিয়ে বাইরের সেই ছায়া ও আলোর ইঙ্গিত এ-ঘরে আসে। এই ছোটো-ছোটো সরলরেখার মতো

আলোকরেখাকে বা ছায়ারেখাকে ললিত ফুকন তাঁর স্বদেশের আলো ও ছায়া বলে এক ধরনের নতুন আকো অনুভব করেন। কখনও-কখনও হয়তো হাওয়া জাগে। সে হাওয়াতে দরজা-জানালায় আওয়াজ হয় না কিন্তু মনে হয় যেন বাইরে গাছগাছালির পাতায় মর্মর ওঠে। সেটা হাওয়া নাও হতে পারে, সেটা মর্মর নাও হতে পারে। তবু ললিত ফুকন ভেবে নেন, এ তাঁর স্বদেশের বাতাস, স্বদেশের মর্মর। সেই স্বদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পণবন্দী। সেই বেলা আড়াইটে নাগাদ প্লেনের আওয়াজ পাওয়া যায়, সেটা প্লেনের আওয়াজ না হতে পারে, অন্য কোনো একটা নিয়মিত আওয়াজ হতে পারে কিন্তু ললিত ফুকন ভেবে নেন তাঁর স্বদেশের আকাশ থেকে আকাশ জুড়ে এই স্বদেশের ধ্বনি এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তের দিকে চলে যাচ্ছে। সকালেই তাঁর বাথরুমে যে-জল ভরতি করে দেওয়া হয় সেই জলের তরল স্পর্শ নিজের হাতে বা চোখেমুখে বা সারা শরীরে মাখতে-মাখতে ললিত ফুকন ভাবেন এ-জল তাঁর স্বদেশের মাটির অন্তঃস্থল থেকে উঠে এসেছে। তাঁর দুপুরের বা রাত্রির খাবার যখন তিনি খান তখন সেই খাবারের স্বাদের চাইতেও এই অনুভবটি তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে যে এই ভাত যে-চালের তৈরি তা তাঁর স্বদেশের আদিগন্ত ধানখেতগুলো থেকে সংগৃহীত। এ-অনুভবে তাঁর খাদ্য যে বেশি গ্রহণীয় ঠেকে তা নয়, তার স্বাদও যে কিছু বদলায়, তাও নয়, কিন্তু তাঁর মুঠো যেন প্রতিবারই ভরা হয়ে যায় স্বদেশের শস্যে। পাখির ডাক শোনার চেষ্টা করেন ললিতবাবু। শুনতে পান না। কিছুতেই শুনতে পান না। ভারতবর্ষে পাখিহীন কোনো জায়গা তো থাকতে পারে না। নেইও। তাহলে নিশ্চয় কোনো কারণে সেই আওয়াজ তাঁর কানে পৌঁছচ্ছে না। এমনকী দিনের বেলায় দরজা যখন খোলা হয় তিনি দুটো-একটা পাখি দেখেওছেন—কিন্তু সে পাখির স্বর তাঁর কাছে পৌঁছয় না।

ললিত ফুকন হঠাৎ আবেগে কিছু করার বা ভাবার মানুষ নন। নিজের আকোকে অতটা স্বয়ংক্রিয় করে তুলবার মতো স্বাধীনতাবোধও তাঁর নেই। হাওয়ার, প্লেনের আওয়াজ, জলের স্পর্শ, শস্যের স্বাদে তিনি এই সম্পূর্ণ একাকিত্বে তাঁর স্বদেশকে আবিষ্কার করলেন, করছেন—এমন একটা নাটকীয় ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটতেই পারে না। কিন্তু যে-স্বদেশ নিয়ে তিনি সারাজীবনে কখনও ভাবেননি, যে-ভারতবাসী হিসেবে সারাজীবনে তিনি কোনোরকম সক্রিয়তার দায় বোধ করেননি, যে-ভারতবর্ষ তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের অংশ নয়—সেই স্বদেশ, সেই ভারতবাসিত্ব ও সেই ভারতবর্ষকে যদি তাঁকে এই সম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন, বন্দীদশায়, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়ে মনে আনতে হয় তাহলে তিনি আর এখন কোথায় পাবেন তাঁর স্বদেশের ও ভারতবর্ষের অভিজ্ঞান? সেই অভিজ্ঞান তাহলে তাঁকে অপরিহার্যত সংগ্রহ করতে হয় এখানে বসে যে-আওয়াজ তিনি শুনছেন, যে-স্পর্শ তিনি পাচ্ছেন, যে-স্বাদ তিনি পাচ্ছেন তারই ভিতর থেকে।

আর জাগরণে-নিদ্রায় তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষা থেকে ললিত ফুকন তো কখনও ভাবেননি মৃত্যু তাঁর এত অব্যবহিত কখনও হতে পারে। দরজায় টোকা দিয়েও এ মৃত্যু আসবে না। এ-দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। যারা তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে বন্ধ করে

দিয়ে গেছে, তারাই তাঁকে মারবার জন্যে খুলবে। ললিত ফুকনের কোনো প্রতিরক্ষা নেই, কোনো আত্মরক্ষা নেই। দরজা খুলে তাঁকে যখন ডাকবে তখন তাঁকে উঠে যেতে হবে। উঠে তাঁর হত্যাকারীরা যেখানে তাঁকে মারতে চায় সেই জায়গা পর্যন্ত যেতে হবে, স্বেচ্ছায়। যেতে হবে, তাঁর স্বদেশের মাটি, ঘাস মাড়িয়ে, গাছপালার ছায়া দিয়ে-দিয়ে, আকাশের তলায়-তলায়। তাঁর হত্যাকারীদের কাছে তিনি এই মাটির, ছায়ার, রোদের প্রতিনিধি। যদি তিনি যেতে না চান তাহলে এই ঘরের ওরা তাঁকে মারবে, এই তক্তাপোশের ওপর। তারপর তাঁর শবটা নিয়ে ফেলে রাখবে সেখানে যেখানে ওরা ফেলে রেখে জানাতে চায় আরও একজন ভারতবাসীকে হত্যা করা হল। ললিত ফুকন এখন তাঁর হত্যার সীমার মধ্যে আছেন, এই ঘর তাঁর জীবনযাপনের সীমার বাইরে। তাঁর হত্যাকারীরা তাঁর জন্যে কোনো বিকল্প রাখেনি—তাঁকে এই ঘরের মধ্যে বাঁচতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে ভারতবাসী হিসেবে, তাঁকে এই ঘর থেকে বেরিয়ে মরতে হবে ভারতবাসী হিসেবে। ললিত ফুকনের শুধু দুঃখ হয়—কত বড়ো দেশ তাঁর, শেষ পর্যন্ত সেই দেশটা তাঁকে আবিষ্কার করতে হল এইটুকু একটা ঘরের মধ্যে, বৃষ্টি পড়লেও যে-ঘরে বৃষ্টির আওয়াজ পাওয়া যাবে না। □

সন্তাপ

সু কা ন্ত   গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

আজ আমাদের উঠোনে অনেক আত্মীয় প্রতিবেশী। শেষবার বোনের বিয়ের সময় এ রকম জমায়েত হয়েছিল। দেড়টা বছর কেটে গেছে। আবার আগের মতো জ্যাঠা-কাকাদের দোতালা বাড়ির পেছনে, ঝোপ আগাছায় ভরা পুকুরের আড়ালে চলে গেছে আমাদের ভিটে। প্লাস্টারহীন একটা ঘর আর দালান নিয়ে বাড়ি। উঠোনের শেষ প্রান্তে কুয়োতলার পাশে বাথরুম পায়খানা। জমি ঘিরে রাংচিতার অগোছালো বেড়া।

আমাদের জমিটুকুর অস্তিত্ব এ গ্রামের অনেক মানুষেরই বোধহয় অজানা। জানলেও মনে থাকার কথা নয়। কাকপক্ষী কুকুর শিয়াল বিড়াল ভামরা জানে। এ ভিটেতে তাদের নিত্য যাতায়াত।

এখন যেমন বেলগাছে বসে থাকা দুটো কাক অন্যান্য পরিজনের দেখাদেখি বোবা হয়ে আছে। বিকেলের এই সময়টা যে ওদের রোজ রুটি দেয়, সে গলায় মালা পরে শুয়ে আছে বারান্দায়। আমার মা।

শ্মশানযাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেছে। মায়ের মাথার কাছে বসে আছি বাবার অপেক্ষায়। ভোররাতে ফার্স্ট ট্রেন ধরে ছোটোকাকা কলকাতায় গেছে৷ বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে। বড়বাজারে একটা ঘি-মাখনের দোকানে কাজ করে বাবা। রাতে গদিতেই শোয়। মায়ের শোকের বদলে এখন আমি বাবার চিন্তাতেই আচ্ছন্ন বেশি। বাবাকে যদি না পায় কাকা। মা তো আমার একার সম্পত্তি নয়। বোন বিয়ের পর আগ্রায়। শ্রাদ্ধের আগে হয়তো এসে পড়বে। কিন্তু বাবার অবর্তমানে মাকে দাহ করে ফেলা কি ঠিক হবে?

এমনিতে মাকে, বলা ভালো গোটা সংসারকেই এড়িয়ে চলে বাবা। বাড়িতে লাস্ট কবে এসেছিল মনে পড়ছে না। তবু শেষ দেখা বলে একটা ব্যাপার আছে না। খবর পেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। যেমন একজন অপরাধী নিজের কৃতকর্মের জায়গায় একবার ঠিক ফিরে আসে।

বাবার উপেক্ষার কারণেই যে এই ভিটে, পুকুর, মায়ের এরকম দশা, এটা আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রতিষ্ঠিত। ওই ঝাঁঝি শ্যাওলায় ভরা অযত্নের পুকুরে ডুবে মারা গেছে মা। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল খুব। প্রাণ পেয়ে গিয়েছিল পুকুরটা। আর এক অবহেলিত সঙ্গিনীকে টেনে নিল। পুরো ঘটনার সাক্ষী আমি। কেন কী জানি মনে হচ্ছে, মাকে দাহ করার আগে গতকালের দুর্ঘটনাটা সবিস্তারে বাবাকে বলে নেওয়া উচিত।

এখনও পর্যন্ত মায়ের মৃত্যুটা আত্মহত্যা না অ্যাক্সিডেন্ট সেটা পরিষ্কার নয়। তা নিয়ে অবশ্য কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কারণগত চার বছর ধরে মা ধীরে ধীরে পাগল

হয়ে যাচ্ছিল। পাগলদের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্ট আর আত্মহত্যার মাঝে কোনও সীমানা থাকে না। মায়ের ওই অবস্থায় বাবা কোনও ডাক্তার দেখায়নি। বলেছে, মায়ের বংশে পাগল হওয়ার প্রবণতা আছে। আমার দাদুও নাকি শেষ বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। কথাগুলো বাবা এমনভাবে বলত যেন, পাগল হওয়া মায়ের বংশগৌরব। ডাক্তার দেখিয়ে মিছিমিছি সেটা নষ্ট করে দেওয়া ঠিক হবে না।

নিজের আর্থিক অক্ষমতা ঢাকা দেওয়ার অদ্ভুত প্রয়াস! ইচ্ছে করলেই জ্যাঠা-কাকার সাহায্য পেতে পারত। হাত পাতবে না। আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে। অথচ চিরকালের বাউণ্ডুলে বাবার বিয়ে দিয়েছিল জ্যাঠা-কাকারাই।

গোড়ার দিকে মায়ের পাগলামিগুলো যখন ধরা পড়ল, ব্যাপারটার মধ্যে মজাই ছিল বেশি। যেমন, মামার বাড়ি থেকে মাকে নিয়ে ফিরছি। বাসে উঠে দেখি, মায়ের পা খালি। অবাক হয়ে বললাম, এ কি তোমার চটি কোথায়?

— এইরে, দেখেছিস, একদম ভুলে গেছি! আসলে ছোটোবেলায় খালি পায়ে ঘুরতাম তো পাড়ায়, তাই খেয়াল পড়েনি। ছেড়ে দে, এখন আবার কে আনতে যাবে।

এরকমই আরও অনেক ভুল করত। ফি শনিবার বাবার ফেরার কথা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হন্টন শুরু হয়ে গেল, দেখ না দেবু তোর বাবা এখনও কেন এল না! থার্ড লোকালের সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নিশ্চযই পাঁচুর দোকানে বসে চা খাচ্ছে।

বললাম, আজ তো বৃহস্পতিবার। হঠাৎ আসতে যাবে কেন? তর্ক জুড়ে দিল, কে বলেছে বেস্পতিবার। কাল শুক্রবার গেল।

আমি বিরক্ত হলেও রুনু হত না। বলত, দাঁড়াও, জ্যাঠার কাছে জেনে আসি আজ কী বার। সেই যে পুকুরের পাশ দিয়ে জ্যাঠাদের পোর্সানে চলে যেত রুনু, সারাদিন আর ফিরত না। ও জানত মা সেদিন আরও অনেক গণ্ডগোল করবে। জ্যাঠাদের রঙিন টিভি, কেবল লাইন, ফ্রিজের ঠান্ডা জল রুনু ভালোবাসত। জ্যাঠারাও পছন্দ করত ওকে। জ্যাঠার উদ্যোগ ছাড়া রুনুর বিয়েই দেওয়া হত না। অষ্টমঙ্গলায় রুনু প্রথমে জ্যাঠার বাড়িতেই উঠেছিল। কারণ, মেয়ে বিদায়ের আগে আশীর্বাদ করতে গিয়ে মারাত্মক একটু ভুল করে ফেলেছিল মা। ধান দুর্বো জামাইয়ের মাথায় দেওয়ার বদলে পায়ে দিয়ে প্রণাম করেছিল। ঘটনাটা মুখফেরতা হয়ে রুনুর শ্বশুরবাড়িতে যেতে সময় লাগেনি।

রুনুর বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে রুনুর বাবার একচড়ে মায়ের পাগলামি স্থায়িভাবে মোড় ঘুরে যায়। সেদিন হয়েছিল কি, দুপুরে চানটান করে খেতে বসেছিল বাবা। একটু আগেই কলকাতা থেকে ফিরেছে। পেটে আগুন খিদে। মা-ও দিব্যি আসন জল দিয়ে ভাত নামাতে গেল। রান্নাঘর থেকে ভেসে এলে মায়ের অসহায় গলা, এইরে, জল ফুটতে দিয়ে চাল দিতে ভুলে গেছি। সেদিন আর মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেনি বাবা। সেই একবারই বউয়ের গায়ে হাত। জ্যাঠা-কাকাদের বাড়িতেও খেলো না।সোজা কলকাতায়। তারপর থেকেই বাড়িতে আসা প্রায় বন্ধই করে দিল বাবা। তবে মাসের শেষে টাকা পাঠিয়ে দিত ঠিকই।

বাবা, রুনু দূরে সরে যেতে, মায়ের রোগটা আরও বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়তে লাগল। আমি পড়লাম মহা আতান্তরে। মাকে ফেলে দূরে কোথাও চাকরির খোঁজ করতে

পারছি না। ব্যবসার পুঁজি নেই। আমাদের গ্রামে রোজগারপাতির সুযোগও খুব কম। এই অজপাড়াগাঁয়ে দুপুরের আগে খবরের কাগজ আসে না। দেড় ঘণ্টা অন্তর লোকাল ট্রেন। টানা লোডশেডিং। এখানকার মেধাবী ছাত্রদের একটাই অ্যামবিশন, কলকাতার কাছাকাছি চলে যাওয়া। চাষাবাদেই যা দুচার পয়সা দেখে গ্রামের মানুষ। তাও তো শুনছি, ধানের ফলন এত বেশি, দাম পাচ্ছে না চাষিরা। পার্টির তদ্বিরে অটো রিকশার রুট চালু হবে। অনেক ছেলেই লাফাচ্ছে। কিন্তু এখানে তো রিকশাওলারাই ফুল টাইমার নয়। এছাড়া ব্যবসার সামান্য যেটুকু সুযোগ আছে, সবই পার্টির মাথা আর ধান্দাবাজদের দখলে। আমরা, মাঝারিরা কী করব?

মা অনেক কিছু ভুলে গেলেও রান্নাটা করতে পারত। ভিটের পশুপাখির সঙ্গে আমাদের খাওয়াটাও জুটে যাচ্ছিল। খাওয়া শোয়া ছাড়া বাড়িতে থাকি না। ক্লাবঘরে তাস পেটাই। ইলেকশন এলে খাটাখাটনি করি। এইভাবেই চলে যাচ্ছিল একরকম। জ্যাঠা খোঁজখবর করে। পরামর্শ দেয়, বাবাকে বল খানিকটা জমি আর পুকুরটা বেচে দিতে। আমিই না হয়ে কিনে নেব। সেই পয়সায় কারবারে নেমে যা। জ্যাঠা ব্যবসা বোঝে। সর্ষের তেলের ডিলারশিপ জোগাড় করে দেবে। বাবাকে বলেছিলাম কথাটা। রাজি হয়নি। বাবার বক্তব্য, পিতৃপুরুষের কাছে এই সামান্য জায়গাটুকু পেয়েছি। এটা তাঁদের আশীর্বাদ। নিজে তো এতটুকু বাড়াতে পারিনি, বিক্রি করে দেব।

এসব সেন্টিমেন্টের কোন মূল্য নেই, ওজন আছে। কিছু বলাও যায় না। অতএব যেমন আছে, তেমন থাকো। নো ভবিষ্যৎ। মুখে বিড়বিড়ানি নিয়ে দিনমান ভিটেতে চড়ে বেড়াত মা। চুলে তেল নেই, চান করতেও ভুলে যেত। পাখির বাসার মতো শুকনো খোঁপা, স্টেশন ধারে লাটে ওঠা গুমটি দোকানের মতো শূন্য চাউনি নিয়ে রোজ সন্ধেবেলায় বসে থাকত বারান্দায়। তখন প্রতিদিনই মায়ের কাছে শনিবার।

এসব কাল রাত থেকেই স্মৃতি হয়ে গেছে। স্মৃতি যত পুরনো হবে, মধুর সুবাস হয়ে উঠবে। কিন্তু মায়ের ডেড বডি বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। তাহলে কি বাবার অপেক্ষা না করাই ভালো? চোখ তুলে জ্যাঠাকে খুঁজি, তখনই পুকুরের পাশ দিয়ে রিকশা আসতে দেখা যায়। ছোটোকাকার পাশে বসে বাবা। একটু যেন আড়ষ্ট।

রিকশাটা সরাসরি উঠোনেই চলে আসে। বাবার মুখের দিকে তাকাই, ছিটেফোটা শোক নেই। কেমন যেন ভয় পেয়ে যাওয়া মুখ। এই সিচুয়েশনে শোকের বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। স্বামী হিসেবে বাবার ভাবমূর্তি সুবিধের নয় বলে, উঠল না। হেঁটে আসা বাবার খালি পা দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। শোক না থাকলেও সেটা অন্তত পালন করছে।

কাছে আসতে দামি ঘি-এর গন্ধ পেলাম। ঘিয়ের দোকানে কাজ করার সুবাদে গন্ধটা নিয়ে ঘুরলেও কোনও দিন বাড়িতে একপলা ঘি আনেনি।

মায়ের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল বাবা। সেকেন্ডখানেক মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, একটা কথাই বলল, বুনুকে খবর করা হয়েছে?

মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বললাম। ব্যাস। আর কিছু জানার নেই। ভিড় থেকে একটু তফাতে গিয়ে বসল। ধীরে ধীরে কয়েকজন আত্মীয়-প্রতিবেশী ঘিরে নিল বাবাকে।

এখানে বসেই শুনতে পাচ্ছি, কান্নাহীন শুকনো গলায় বাবা পরিজনদের বলছে, কাল রাতে হঠাৎ নিভাকে স্বপ্নে দেখলাম। কী যেন বলতে এসেছিল। খালি বিড়বিড় করছে। আজকাল তো ওর কথা বোঝা যেত না। যত জিজ্ঞেস করি কী বলছ, স্পষ্ট করে বলো...

শুনেই বোঝা যাচ্ছে বাবার কথাগুলো বানানো। দূরতম আত্মীয়রা ঠিক এইভাবেই মৃতের ঘনিষ্ঠ প্রমাণ করে নিজেকে।

উড়ো খই, হরিধ্বনি গ্রামে ফেলে এসে আমরা এখন ডিভিসি খালের পারে। ওপারে শ্মশান। ঘাটে নৌকো আছে, মাঝি নেই। প্রায়ই থাকে না। খুব একটা চওড়া নয় খালটা। দাঁড় বাইতে হয় না। দুপারে দুটো বাঁশের খুঁটিতে মোটা দড়ি বাঁধা। দড়ি ধরে এগিয়ে গেলে, নৌকোও এগোয়। মাকে পাটাতনে শোয়ানোর পর কাজটা বাবাই করতে লাগল।

মাথার উপরে দুপুর গড়িয়ে যাওয়া নির্মল আকাশ। ভেসে যাচ্ছে মেঘ, চিল। খুন হওয়ার পর যে নিপুণতায় রাজপথ ধুয়ে ফেলে পুলিশ, ঠিক তেমনই কাল রাতের ঝড়-বৃষ্টির কোনও চিহ্নই রাখেনি প্রকৃতি। মায়ের যদি চোখ খোলা থাকত, খুশি হত। বাবা বোধহয় এই প্রথম মাকে নিয়ে নদী পেরিয়ে কোথাও চলেছে।

ঘাটে নৌকো ভিড়তে দেখি, চার-পাঁচটা বন্ধু পারে দাঁড়িয়ে। এরা চাষি বন্ধু। আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। পড়াশোনার মাঝপথেই চাষাবাদকে রুটিরুজি করে নেয়। দিনরাতের বেশিরভাগ সময় এপারেই কেটে যায় এদের। এদিকটা যেন পৃথিবীর অন্য পিঠ। কোনও বসত নেই, দিগন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। মানুষের খাবার জোগান যায় এখান থেকে। পাগল হওয়ার আগে মা বলত, চাকরিবাকরি না পাস, বিলে বাবুইদের মতো চাষবাসও তো করতে পারিস। ওরা তো দিব্যি রোজগার করছে। রাগ হত আমার। যার জ্যাঠা-কাকার এত ভালো অবস্থা, তাদের বাড়ির ছেলে চাষ করতে যাবে। বাবার প্রেস্টিজটাও তো ভাবতে হয়। অনেকেই জানে বাবা কলকাতায় ভালো অফিসে চাকরি করে।

নৌকো থেকে সাবধানে খাট নামাল বন্ধুরা। ওরাই কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলল শ্মশানের দিকে। একপাশে টইটম্বুর খাল। অন্যপাশে ফসল-ভরা গর্বিত জমি। অথচ অভাবে মনোকষ্টে মরে যাওয়া এই গ্রামেরই একটা বউ চারজনের কাঁধে চলেছে।

চিতা জ্বালিয়ে তেপান্তরের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন সূর্য। একসময় হঠাৎই হারিয়ে গেলেন। এতক্ষণ আমাকে আগলে রেখেছিল যারা, চিতা নিভতে থাকলে নিরাপত্তা তুলে নিল। মাঠের একপাশে বসে আছি। সন্ধ্যে তারা উঠেছে আকাশে। বোনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওরা কি ট্রেন ধরেছে?

পাশে এসে বসল ঘিয়ের গন্ধ। বাবা। না, পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনাটান্ত্বনা কিছু নয়। শুধু বলল, এখানকার কাজ শেষ হলে, খুব তাড়াতাড়ি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিতে হবে।

—কেন?

—মৃত্যুটা তো স্বাভাবিক নয়। গয়ায় প্রেতশিলায় পিণ্ডি না দেওয়া অবধি এসব আত্মার মুক্তি হয় না। এই তো এখনও যেন মনে হচ্ছে, তোর মা কানের কাছে কী সব যেন বলছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে কথাগুলো। এখনও সবটা বুঝতে পারছি না। আসলে আত্মা তো পাগল হয় না। বেঁচে থাকতে মনটাকেই বশে রাখতে পারে না মানুষ। নিভার আত্মা অতৃপ্ত, মুক্তির একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। মুক্তি চাইছে আসলে

বাবা। অপরাধ বোধ থেকে নিষ্কৃতি। সারাজীবন মাকে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু স্মৃতিকে এড়াতে পারছে না। বাবার কথার কোনও জবাব দিলাম না আমি। খানিকবাদেই নিভে গেল চিতা। শ্মশান সঙ্গী অস্থি খুঁজে মালসার মধ্যে দিল। সিঁড়ি ভেঙে খালের কালো জলে নেমে এলাম। অস্থি ভাসিয়ে দিতে গিয়ে গা ছমছম করে উঠল। মনে হল যেন বিস্মৃতির অতলে গুম করে দিচ্ছি মায়ের শেষ অস্তিত্ব।

জলে ডুব দিয়ে উঠে আসছি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন চান করেছে। পাশে কে যেন কনুই ধরল। স্পর্শটা চিনতে পারি, বাবা। ফিসফিস করে বলল, আত্মহত্যা করতে গেলেও তো কিছু চিন্তা ভাবনার দরকার হয়। শেষ দিকে সে ক্ষমতা তোর মায়ের ছিল না।

চমকে বাবার দিকে তাকাই। ঘাটের ওপর থেকে টর্চ মেরে পথ দেখাচ্ছে কোনও একজন। ওই কম আলোয় বাবার মুখটা পড়তে পারি না। বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করছে কি? মায়ের মৃত্যুটা যে আত্মহত্যা, এ কথা কে বলেছে বাবাকে? বলে থাকলেও বাবা বিশ্বাস করেনি। আরও অন্য কিছু সন্দেহ করছে।

আসল ঘটনাটা আমি ছাড়া শঙ্কর অনেকটা জানে। ও অবশ্য ঘটনার দায় থেকে আমায় আড়াল করে রেখেছে। মাকে পুকুরপাড়ে তোলার পর সবাইকে বলতে লাগল, আমি দেবু আড্ডা মেরে ফিরছি, দেখি, পুকুরের জলে হুড়োহুড়ি। টর্চ মেরে বুঝি কাকিমা। ডাইভ মেরে তুলে আনলাম। লাভ হল না।

ঘটনাটা ঠিক এরকম ঘটেনি। ক্লাবঘরে শুধু শঙ্কর আর আমি। শঙ্কর কলকেতে গাঁজা বানিয়েছে। বাইরে ঝড় বৃষ্টি। রাত ঠাহর করা যাচ্ছে না। আমাদের ভাষায় পুরো আবগারি ওয়েদার। এক সময় ধুনকি ঠেলে ঘড়ি দেখি, এগারোটা! তার মানে মা নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি দরজার বাইরে আসি, যা ভেবেছিলাম তাই। ক্লাবঘরের আলোটা যেখানে শেষ হয়েছে, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে মা। কিন্তু ডাকছে না। ইদানীং কথা বলা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগেও ক্লাবঘরের সামনে এসে চেঁচাত, দেবু চলে আয়। রাত হয়েছে। খেতে দিয়েছি।

কেন কী জানি কাল রাতে মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গেল। দিনের পর দিন মায়ের বোবা হয়ে থাকাটা সহ্য হচ্ছিল না। ক্লাবঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাকে যা তা বলতে শুরু করলাম, যাও তো, আমার যখন সময় হবে যাব। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরজ্বারি বাধাবে, পয়সার শ্রাদ্ধ। কে দেবে পয়সা? যা সংসারের ছিরি করে রেখেছ, তাই তো আসতে চায় না বাবা। আরাও কী কী বলেছিলাম এখন আর মনে নেই। শঙ্কর এসে থামিয়েছিল। গৃহপালিত অবলা পশুর মতো ঝড়-বাদলায়, অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল মা।

মিনিটখানেক পর মাথা ঠান্ডা হতে ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। বাড়ি ঢোকার আগে পুকুরের জলে বড়ো বড়ো ঘাই দেখে প্রথমে ভাবি, বড়ো কাতলা। জ্যাঠার বাড়ির আলো পুকুরে এসে পড়েছে।

আরও বারকয়েক ঘাই দেখে সন্দেহ হয়, জিনিসটা জলের নয়। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠতে স্পষ্ট মাকে দেখতে পাই। মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। কেন জানি দাঁড়িয়ে যাই! অঝোর ধারায় পড়ে যাচ্ছে বৃষ্টি। কালো জলে আকুলিবিকুলি করছে মা।

আর একটু পরেই শান্ত হয়ে যাবে। অনেকদিন আগেই বাতিল হয়ে যাওয়া একটা মানুষ এবার সত্যিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হলেও মনে একটা নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়ার ভাব কাজ করেছিল আমার। মায়ের হাত দুটো তখন শূন্য আঁকড়ে ধরার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। বিশাল হাঁ করে টেনে নিচ্ছে পাওনা বাতাস।

ঘোর কাটে। বুঝতে পারি শূন্য নয়, আমাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে মা। ওই হাত দুটো দিয়ে পরম মমতায়, যত্নে বড়ো করেছে আমায়। শঙ্কর! শঙ্কর! বলে ডেকে উঠি। তারপরই ঝাঁপ মারি জলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কর কোথা থেকে এসে জলে লাফিয়ে পড়ে। ডাঙায় তোলার আগেই সব শেষ। 'বাঁচাও' শব্দটাও কি ভুলে গিয়েছিল মা! জলে ঝাঁপ মারার আগে ঠিক কতটা অমূল্য সময় নষ্ট করেছিলাম জানি না। কেউই জানে না। পুকুর পারের গাছপালারা অচল সাক্ষী।

পেট টিপে জল বার করতে করতে শঙ্কর বলছিল, মিছিমিছি অত ক-টা কথা বলতে গেলি। রেগেমেগে কী করে ফেলল বল তো! সরল সাদাসিধে ছেলে শঙ্কর, ধরে নিয়েছে মা আত্মহত্যাই করেছে। সেটা আমার উপর অভিমান করে। আমার জলে ঝাঁপাতে দেরি করাটা শঙ্কর টের পায়নি। কিন্তু বাবা কি কিছু আন্দাজ করছে?

শ্মশান থেকে হেঁটে এসে এখন আমরা ফের নৌকোয়। আসাখ ফুটে উঠেছে তারাদের পরিবার। হাওয়ায় জল-মাটির গন্ধ। অনেকটা সময় কেটে গেছে। তবু বাবার সন্দেহের তিরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য উসখুস করে উঠি। বলি, কাল রাতে যা বৃষ্টি, হয়তো পা স্লিপ করে...

—উঁ, কিছু বললি?

উত্তর দিই না। বাবা ডুবে গেছে নিজের অতীতে। সন্দেহের তির অবিরাম ছুটে চলেছে সেখানে। মায়ের মৃত্যুর জন্য বাবাও তো কম দায়ী নয়।

অপঘাতের মৃত্যুকে শোক স্থায়ী হতে দিতে নেই। মা মারা যাওয়ার পর তিন রাত কেটে গিয়ে আজ চার দিন। শ্রাদ্ধের কাজ চলছে। সকাল থেকেই আকাশের মুখ থমথমে। আমার পাশে জ্যাঠা। নিখিল পুরুতের নির্দেশ মতো উপাচার জোগান দিচ্ছে। বুনু এখনও এসে পৌঁছয়নি। বাবা বেশ কিছুটা তফাতে বসে এক মনের শ্রাদ্ধের কাজ দেখে যাচ্ছে। দাহ করার পরের দিনই কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল, কাল রাতে ফিরেছে। এসেই দায়িত্ব মতো জানতে চেয়েছে, কাল তো কাজ, জোগাড়যন্ত্র সব হয়েছে?

ভাবটা এমন যেন, যদি কিছু বাকি থাকে, এক্ষুনি নিয়ে আসবে। শোকের বাড়িতে রাগারাগি মানায় না বলেই বলি, হ্যাঁ। জ্যাঠা সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। তার পরই কাঁধ-ঝোলা থেকে এক হরলিক্সের শিশি ঘি বার করে বাবা। এই হয়তো প্রথমবার। বলে, এটা নিয়ে এলাম। কাল হোমে লাগবে। রেখে দে।

কেন কী জানি তখন খুব নিষ্ঠুর লেগেছিল বাবাকে। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা তুলতে দ্বিধা হয়নি। সরাসরি বললাম, পুকুরটা এবার বুজিয়ে ফেলা উচিত। জ্যাঠা তো অনেকদিন ধরেই চাইছে। পুকুরের জমির সঙ্গে আরও কাঠাখানেক বিক্রি করে দিয়ে ভাবছি, সর্বের তেলের এজেন্সিটা নিয়ে নেব। কী যেন ভেবে নিয়ে বাবা বলল, ক-টা দিন যাক। ভেবে দেখি।

কীসের অপেক্ষা বুঝলাম না। মায়ের ওরকম একটা মৃত্যুর পরেও কি মনে করে এই

ভিটে-পুকুর পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ। কথাটা তোলার পর থেকেই বাবা আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কালরাতে বারান্দায় শুলো।

অনেকক্ষণ ধরে হোমযজ্ঞি চলছে। চোখ জ্বালা করছে আমার। নিখিল পুরুত মালসা এগিয়ে দিয়ে বলল, যাও, কোনও পুকুর বা ডোবার কাছে রেখে এসো। মা খেয়ে নেবেন।

মালসার মধ্যে পোড়া শোল মাছ। পাত্রটা হাতে নিয়ে উঠে এলাম। সঙ্গে জ্যাঠামশাই আসছেন। খোলা আকাশের নীচে আসতে টের পেলাম দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। নেড়া মাথার কারণে আমিই বোধহয় সব থেকে আগে ভেজা বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছি। যেন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে, কাজের ফাঁকে উঠে আসা মায়ের জল-হাতের আশীর্বাদ।

কাছাকাছি পুকুর বলতে এই মারণপুকুর। পারের কাছাকাছি এসে জ্যাঠা বলল, এখানেই রেখে দে। ডুমুর তলায় মালসাটা নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, মাছটা ঠোঁটে তুলে উড়ে গেল একটা মাছরাঙা। মা কি পাখি হয়ে গেল!

কান্নাকাটি কম পড়ে যাচ্ছে দেখেই বোধহয় রাতের দিকে বৃষ্টি নামল। আরবি ঢালাইয়ের ছাদ। বৃষ্টির চড়বড়ে আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, দরজা হাট খোলা। ঘরে ঢুকে আসছে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া। আমি মেঝেতে শুয়েছিলাম। বাবা খাটে। টর্চ জ্বেলে বাবার বিছানা দেখি, নেই!

মশারি তুলে বেরিয়ে আসি বারান্দায়। উঠোনের শেষে বাথরুমে তো আলো জ্বলছে না! ঝোপে বৃষ্টি পড়ছে। এই ওয়েদাবে গেল কোথায় লোকটা? টর্চ হাতে বৃষ্টিতে নেমে এলাম। নেড়া মাথায় বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা ফেটে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক টর্চ ঘোরাতেই থমকে যাই, বাবা পুকুর ধারে কেন? শুধু দাঁড়িয়ে নেই, অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করছে। ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছে যেন। স্লিপ খেয়ে জলের কাছে নেমে যাচ্ছে, আবার উঠে আসছে ওপরে। ফের স্লিপ খাচ্ছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। বৃষ্টি ধারায় বাবার সমস্ত আচরণ আরও যেন অস্পষ্ট লাগছে।

হঠাৎ বুকটা ধক করে ওঠে। মায়ের জলে পড়ে যাওয়াটা মনে পড়ে যায়। দৌড়ে যাই। কাদায় দু-তিনবার পা হড়কায়। হাত ধরে নিই বাবার, কী করছ কি এখানে? আমাকে দেখে কেমন জানি ভয় পেয়ে যায় বাবা। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে পালাতে চায়। ছাড়ি না। বলি, কেন পাগলের মতো করছ! ঘরে চলো। এক্ষুনি গাছপালা ভেঙে পড়তে পারে ঘাড়ে।

বৃষ্টি ভেজা ঘড়ঘড়ে গলায় বাবা বলে, আমার মনে হয় ওকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এই তো, আমি এত চেষ্টা করলাম, পড়লাম না তো।

বাবার হাতটা কখন যেন ছেড়ে দিয়েছি। জলকাদার পুকুর পার ধরে হেঁটে যাচ্ছে বাবা। বিলাপের মতো বলছে, এরকমই কিছু একটা বলতে চাইছে নিভা। কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না।

পুজো কেটে গিয়ে শীত এসে গেল। শ্রাদ্ধের পরের দিন সেই যে চলে গিয়েছিল বাবা, আর ফেরেনি। কাজের দুদিন বাদে মুনুরা এসে ঘুরে গেছে। আর কোনও খোঁজখবর করে না। এই ক-মাসে ছ-টা অটো চালু হয়েছে স্টেশন রাস্তায়। প্যাসেঞ্জার

নেই। ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই হবে। বেশ ক-টা বিয়ের ম্যারাপও পড়ে গেল গ্রামে। ধানের দাম ওঠেনি। তেমন লাভ না হলেও চাষিদের গোলায় ধান পড়ে নেই। সবজি চাষের বাজার বাড়ছে। ঢিমেতালে হলেও ভবিষ্যতের দিকে চলেছে আমাদের গ্রাম। শুধু আমাদের ভিটে-পুকুর একই রকম আছে। তেলের এজেন্সি নেওয়া হয়নি আমার। এখন জ্যাঠার বাড়িতে খাই আর সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াই। একা। বাড়িতে ভালো লাগে না, বন্ধুদেরও না। মাথায় খালি একটা কথাই ঘোরে, আমার উদাসীনতায় মা ডুবে গেছে, আমার আক্রোশ দেখে বাবা বাড়ি ফিরতে ভয় পায়... হাঁটতে হাঁটতে ক্যানেল পারে চলে যাই। দেখি, গলায় সর্ষে ফুলের মালা পরে এ গ্রামের চাষের জমি শুয়ে আছে। যেন, আমার মা। নিজেকে কেমন জানি আততাযী আততায়ী মনে হয়। □

বরাভয়ে অবিশ্বাস

অ ম লে ন্দু চ ক্র ব র্তী

ভোর গড়িয়ে সকালের আলোয় মস্ত শহর কলকাতা তার প্রস্ফুটনে দিগ্‌বিদিক খুলে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে চতুর্দিকে। বুঝি কোনো অতিকায় কারখানারই রকমফের। রাতের নিঝুমে ঝিমিয়ে-থাকা স্থবির যন্ত্রটা যথানিয়মে ঠিকঠাক চালু করে দিয়েছে কেউ। কোথায় কোন্ নিভৃতে সুইচটা টিপে দিতেই তালগোল উথালপাথালে সুবিশাল মোটরটা ঘুরতে শুরু করেছে কোথাও। শব্দব্রহ্মের বিপুল তোলপাড়ে শহরের রাস্তায় ফুটপাথে দোকানপাটে বাজারহাটে থেমে নেই কেউ। দেশজোড়া উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় দুরন্ত মহানগর। আস্তে আস্তে, একটু একটু করে দামাল হয়ে উঠেছে। বীভৎস হট্টগোল। নানান রংয়ের বিভিন্ন মডেলের অটোমোবাইলে পেট্রলের কালো ধোঁয়া, কালো ধোঁয়ায় রুদ্ধ নিঃশ্বাস, রাস্তার এপাশ-ওপাশ জুড়ে কত যে মানুষজন! বহু বিচিত্র সাজপোশাকে, অসংখ্য বর্ণে অগুনতি মানুষের ঢল—নারীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ বুঝি-বা বড়োসড়ো কোনো ফ্যাক্টরিরই পণ্যসামগ্রী ফিনিস্‌ড প্রডাক্ট। কোথাও গিয়ে পৌঁছেতে হবে প্রতিদিনের হাজিরায়। ছড়িয়ে যাচ্ছে, চারিয়ে যাচ্ছে, ছুটছে। একপলকে হঠাৎ তাকালে মনেই হয় না একজন থেকে অন্যজনের নাকে মুখে চোখে আলাদা আদল আছে কিছু। হাতে, পায়ে, চলার গতিতে ছন্দ ভিন্ন প্রকৃতির, চোখের পাতায় অন্য রং। ভিন্ন ভিন্ন নামধামে বা বিবিধ পেশায় বা আচরণে ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র হলেও, মনেই হয় না, এই সাতসকালে সাড়ে নটায় নিত্যদিনের অফিসযাত্রায় জাতেধর্মে তারতম্য আছে কোথাও। অথচ নির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণে ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা তো থাকে সকলেরই। কিংবা কোথাও গিয়ে পৌঁছবার পৃথক ঠাঁই।

রণক্ষেত্রে হলাহলে মন্থরতা নিশ্চিতই বাতিল। হাইস্পিড বড়ো রাস্তায় রিকশ ঠেলাগাড়ি নিষিদ্ধ অনেকদিন। দূষণমুক্ত ট্রামও নাকি অচল হয়ে আসছে মহানগরীর ভূগোলে? দুপুর গড়িয়ে এলে বিকেলের দীর্ঘ ছায়ায় সদ্য বার্ধক্য ছুঁয়ে ফেলা ভরাট অবসরের দিনে নিজেরই ঢিলেঢালা পা ফেলার হালকা ভঙ্গিটা বেশ বেমানান ছিল নিজের কাছেই। একা একা নিঝুম হাঁটায় একটু থমকে দাঁড়ালেন শিবনাথ। যাবেন অনেক দূর। দক্ষিণ কলকাতার চেতলা থেকে কতভাবে বাঁক ঘুরে বাসে-বাসে পুবদিকে সুদূর শিয়ালদা। অফিস টাইমের পিক-আওয়ারে ঝিমোনো মনমেজাজ শরীর নিয়ে লম্বা পাড়ি? কিন্তু যেতে তো হবেই তাঁকে। বড্ড প্রয়োজন। অলস মন্থরভার যদি এভাবেই জড়িয়ে ধরছে পায়ে পায়ে, ভাবনা ছিল। আতঙ্কই কিছুটা। প্রয়োজনটা যদি সর্বজনীন, রোজকার অফিসে লাল কালির খোঁচা এড়ানো যদি রুজিরোজগারেরই তাগিদ সকলেরই,

ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির প্রচণ্ড ভিড়ে রেয়াত করবে না কেউ। অথচ তাঁকেও একটু ঠাঁই খুঁজে নিতেই হবে প্রাত্যহিক রণাঙ্গনে। যদি বেলা সাড়ে-দশটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে শিয়ালদা স্টেশন এবং যদি দু-টাকার বাসভাড়া বাঁচাতে অন্যূন সত্তর টাকার ট্যাকসিভাড়া খেসারত দেবার মুরদ না থাকে, বরং যুদ্ধই শ্রেয়।

ঘনপল্লবিত বৃক্ষশাখায় অগুনতি পত্রগুচ্ছ যেমন, প্রতিটি বাসের ভেতর-বাইরে উপচে পড়েছে মানুষ। চিৎকারে কোলাহলে যন্ত্রণায় হলাহলে খাঁচাভর্তি হাঁসমুরগির ডানা ঝাপটানির মতো হাত বাড়িয়ে কিছু একটা আঁকড়ে ধরা বা পা ফেলার জরুরি তাগিদে এক ফোঁটা জমিদখলের তীব্র লড়াই। নানান বয়সের নানান মাপের লম্বা বা বেঁটে বা শান্ত বা ভদ্র অথবা খামোকা খেঁকুড়ে শুধুই মানুষ—নারীপুরুষের ছোঁয়াছানির দিগদারি নেই, কারুর ঘেমো গায়ের পচা দুর্গন্ধে নাক সিঁটকনোর অধিকার নেই, একজন অন্যজনকে কামড়ে খিঁচড়ে দেবার অবাধ মালিকানায় সেন্টিমিটার জমিও সেখানে কেড়ে নেবার সম্পত্তি, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির জটলা কোনোভাবে ঢুকে পড়ার পর পেছন থেকে আটাময়দা মাখাইয়ের ঘাঁটাঘাঁটিতে একটু দুরমুশের চাপ যখন লজঝড় গোটা শরীরটাকেই গেঁথে দিতে চাইছে ভেতরের দিকে, শিবনাথ, নেহাতই এক অতি দুর্বল প্রাণী, দুঃসহ গরমে অচিরেই ঘেমেনেয়ে হাঁসফাসে সিঁড়ির পাদানিতে একটা পা রেখে ডানহাতে শক্ত করে ধরেও ফেললেন ফাঁকফোকরের কিছু একটা। কিন্তু এক কদমও উঠতে পারছেন না ওপরের দিকে। নিজের অসহায়ত্বে চারপাশ থেকে চেপ্টে গিয়ে গালমন্দও সইতে হচ্ছে বিস্তর—'ঢুকুন দাদু, ঢুকুন। এই পাঁউরুটি সেঁকার গরমে এ-যে ফ্রিজের গরমে জমে গেলেন দেখছি। একটু ডিবলিং দিন বাঁদিকে। পা-টা রাখতে দিন...'

কিংবা অন্য কেউ—'এ-কী ক্যাওড়া মাইরি? রিটায়ার নেই মেসোমশাইয়ের। লিডার নাকি? এ-শালা অফিস টাইমে...'

'ও-দাদু, আপনি পারবেন না। নেমে যান নেমে যান...'

বলবে। বলতেই পারে ওরা। দরজার বাইরে অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে যারা। অবশ্য কম-বেশি সকলেই যুবক। প্রাণের সংশয়? অথবা এভাবেই জীবনকে দাবড়ে চলার মরিয়া চেষ্টায় ওদেরও পৌঁছতে হবে প্রতিদিনের হাজিরায়। জীবন যদি এরকমই এক নিয়ত যাত্রা।

এবং পৌঁছতে হবে তাঁকেও। চারদিক ঘিরে চেপ্টে থেকে গোটা শরীরের সামর্থ্য নিয়েও যদি শক্ত কব্জায় আর ধরে রাখতে পারছেন না লোহার রড অথবা দরজার কাঠ এবং সেটুকুও যদি আর কোনো অবলম্বন নয়, দাঁতমুখের খিঁচুনিতে শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় টিকে থাকা এবং এভাবেই কোনোরকমে টিকে থাকার মরণপণে ঘামছেন শিবনাথ। নাভিশ্বাসে ঝড় কাঁপিয়ে হাঁপাতে থাকেন। ডানে-বাঁয়ে নড়ার নিয়ম নেই। কমজোরি শীর্ণতায় যদি অস্তিত্বরক্ষাও এক কঠিন পরীক্ষা, কিঞ্চিৎ করুণা চাইবারও অবকাশ থাকে না মানুষের কাছে? এবং তখনও তুলকালাম প্রলয় নিনাদ। তাজা যৌবনের উদ্দাম ঝড়ই ছিল চারপাশে। চলতি বাসের দরজায় ঝুলে আছে যারা, ঝুলতে ঝুলতেই ছুটছে, ঝড়ে ঝাপটায় বেসামাল হয়তো এভাবেই বাজি জিতে নিতে চায় নিজেদের। শিবনাথ

খাচ্ছিল তাঁর নিজের নিষ্ফলতায়।

এবং অকস্মাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা। শেষ সূর্যাস্ত একটি পরিপূর্ণ যৌবনের।

বেলা প্রায় দশটা। দলবদ্ধ বুনো জানোয়ারগুলো যেমন, ছুটতে ছুটতে বাসগুলো এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে হাজরা পার্কের মোড়ে বাসস্টপে। হুড়মুড়িয়ে নেমে যেতে চাইছে কিছু লোক। অন্ধকূপের যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার স্বস্তি খুঁজে নিতে চারপাশকে ঠেলেঠুলে গুতিয়েগাতিয়ে যখন নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে কিছু মানুষ সরাসরি ধাক্কায় ধাক্কায় সুযোগ থাকে না নিজেদের বাঁচাবার। প্রাণান্ত হাঁসফাঁস। কাঠের দেয়ালে পিঠ ঠেসে আরও বেশি করে সেঁটে যেতে থাকেন শিবনাথ। কন্ডাক্টর ছোঁড়া তখনও প্রফিট খুঁজছে। কানের কাছে টিকিটের বান্ডিল বাজিয়ে গলা ছিঁড়ে চিৎকার—'খালি গাড়ি খালি গাড়ি। মিন্টো পার্ক বেকবাগান মল্লিকবাজার মৌলালি শিয়ালদা...'

কাছাকাছিই মর্নিং শিফটে একটি মেয়েদের কলেজ। হরেক রংয়ের শালোয়ারকামিজে ওড়নায় কলকল তরুণীরাও ছিল বাসস্টপে। ক্লাসের শেষে ঘরে ফিরবে। কী সর্বনাশ! এমন বিপদপাত যদি ওরাও ঠাঁই চায়? লড়াই-ই চায় যদি? 'মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত' আসনটাসন? কোথায় ব্রজবুলি? ক্রিকেট ফুটবল ছাপিয়ে আলাদা করে কুস্তিবক্সিং অব্দিও না-হয় ভাবা যেতে পারে। কিন্তু রোজকার এই যুদ্ধে ললনারা? একপর নাকি কোনো প্রতিবন্ধীও এসে যেতে পারেন মহাযুদ্ধে প্রবেশের দরজায়? শিবনাথ কাঁপছেন সন্ত্রস্ত জরায়।

কিংবা ওরাও বোধ হয় বুঝে নিয়েছে প্রতিযোগিতার চড়া বাজার। অল্প দু-চারজন নেমে যাবার হুড়োহুড়িতে যেটুকু ফাঁক তৈরি হল, মুহূর্তের ফুটোফাটায় বুঝি একঝাঁক রঙিন প্রজাপতি ফড়ফড়িয়ে তেড়েফুড়ে উঠে পড়ল প্রাণ-অফুরান মানবসম্পদের খাঁচায়। চিড়েচ্যাপ্টায় ত্রাহিশ্বাস। অযথা কলহ চিৎকার চেঁচামেচি। কেউ কারুর শত্রু নয়, আপন মানুষও নয় কেউ। আপন-পর থাকে না শহরবাসের নিত্যতায়। নারীপুরুষ নেই। সাবেকি আব্রু-বেআব্রুর ভড়ংফড়ং সবই বস্তাপচা। ফালতু সব ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ ভেবে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এভাবেই কেড়ে নিতে হবে হকের জমি। জবরদস্ত পুরুষপেশির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি এমন করেই বুঝে নিতে হয় নিজেদের অধিকার।

শিবনাথ আঁতকে উঠলেন। দলছুট একটি মেয়ে কীভাবেই যেন পিছিয়ে পড়েছিল। গুটিকয়েক যাত্রীকে পথ করে দিতে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা, দরজায় ঝুলন্ত মানুষজন, গাড়ি ছেড়ে দেবার মুহূর্তে নতুন করে আবার তাদের হাতল ধরার, কোনো রকমে সিঁড়িতে পা রেখে ঝুলে থাকার হট্টগোলে কী ভয়ংকর সেই দৃশ্য? একটি মেয়ে? গোটা শরীরের সবটা দেখা যাচ্ছে না পুরোপুরি। থুতনিটা উঁচিয়ে আছে। হাঁকপাকে ঘর্মাক্ত মুখে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কী করে, কীভাবেই যেন যুযুধান পুরুষদের জোরজবরদস্তির চাপে গায়ে গা লেপটে মিশে গিয়ে যুদ্ধ লড়ছে। চিৎকার করছে। আর্তরব সহযাত্রীদেরও। জাঁতিকলে আটকে পড়ে ধ্যাতা ইঁদুর যেমন, তাজা সতেজ বয়সের একটি ললিত কন্যা মূলত ঝুলে আছে? গাড়িটা ছুটছে। এভাবে নিরালম্বে ঝুলে থাকা একটি মেয়ের জন্যে বাসের ভেতরে-বাইরে যাত্রীদের হাহাকার অথবা বাসের গায়ে এলোপাথাড়ি থাবড়াথুবড়ি সব মিলিয়ে বীভৎস তাণ্ডবে কনডাক্টর জোরে

জোরে চাপড়ানি মেরে যাচ্ছে কাঠের দরজায়—'রোক্‌কে রোক্‌কে... অ্যাই অ্যাই রোক্‌ না শালা পাটনায়...”

কোলাহলে হলাহলে শুনছে না ড্রাইভার। কোনো হদিস পাচ্ছে না সামনের দরজার কনডাক্টর। অথবা বড়ো রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছে পুলিশ-সিগনালে থামতে চাইছে না হয়তো। থামতে দিচ্ছে না। অথচ বিপজ্জনকভাবেই মেয়েটি ঝুলছে। এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিকে সামাল দেবার, মানবিকতায় সংহত করার সাধ্য ছিল না শিবনাথের। সাধ্য নেই কারুরই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল—সর্বনাশ। সতেরো আঠারো...বড়োজোর উনিশ বা কুড়ি ছুঁয়েছে বয়স। ভোরের শিশির-ভেজা কোনো ফুলই একমাত্র উপমা হতে পারে যার, কচিকাচা নিষ্পাপ মুখের ছবি। ভিড়ভাট্টার চাপে কীভাবেই যেন টকটকে লাল ওড়নায় ফাঁস লেগে গিয়েছিল গলায়। ভয়ার্ত সে-চোখজোড়ায় আকুলতা ছিল, বাসনা ছিল, জেদও ছিল। একদিকের একটা রড ধরে ফেলেছিল কোনোরকমে। সেটুকু নিয়েই আলগাভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যেতে যেতে যখন সেই ভয়ংকর মুহূর্ত, পাশাপাশি ঝুলছে যারা, নিজেদের আরও বেশি বিপন্ন করে ওকে ঠেলেঠুলে ভেতরের দিকে তুলে দিতে চাইছিল যে-মানুষগুলো, তাদেরই একজন—স্পষ্ট দেখলেন শিবনাথ ছিপছিপে সজ্জন চেহারার একটি যুবক হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতেই হঠাৎ কী হল, কী দেখল কী বুঝল সে-মেয়ে, হাতল ধরার একমাত্র অবলম্বনটুকুও ছেড়ে দিয়ে ত্বরিত ক্ষিপ্রতায় হয়তো বা থাপ্পড়ই মারতে চেয়েছিল একটা। চারদিকে প্রলয় নিনাদ। বাস থেমে গেল কর্কশ ব্রেক কষে এবং মুহূর্তেই প্রবল বিস্ফোরণে গোটা চত্বর জুড়ে হাজার হাজার মানুষের সমবেত আর্তনাদে অন্য এক বীভৎস বিপর্যয়।

বৃন্তচ্যুত সেই মেয়ে খসে পড়েছিল রাস্তায়। অতর্কিত দুর্বিপাকে চটজলদি ব্রেক কষতে পারেনি পেছনের বাস। খরতাপ দ্বিপ্রহরে অগ্নিদাহে জ্বলছিল কলকাতা। সূর্যাস্ত অনেক দূর। এবং চকিতেই ভিন্নতর রণক্ষেত্রে লাখো-লাখো মানুষের ঝাঁপিয়ে পড়া কোলাহলে আগ্নেয় ক্রোধ। জনস্রোতে উত্তাল বিভীষিকা। ট্রাম বাস ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ি যেখানে যা কিছু চলমান, সবই থেমে গেছে। বীভৎস যানজট। প্রশ্ন করে লাভ নেই। উন্মত্ত জনতার শ্রুতি নেই, ছন্নছাড়া আক্রোশের বল্‌গা নেই, নিজস্ব কোনো ভাবাও থাকে না স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভের। শুধু ক্রোধ, ক্রোধের বিবমিষায় এখানে-ওখানে ভাঙচুর। দ্রুত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রাস্তার দোকানপাট। অবরোধ তৈরি হয়ে যাচ্ছে মস্ত মস্ত দুটো রাস্তার মোড়ে। আশুতোষ মুখার্জি রোডে কোথাও জট পাকিয়ে গেলে যে দক্ষিণে-উত্তরে গোটা কলকাতা শহরের শিরদাঁড়ার ধমনীতেই রক্তের ছুটোছুটি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে! পুলিশ আছে বা নেই। নিয়ন্ত্রণ নেই প্রশাসন নেই। অতি হিংস্র সেই বাসের ড্রাইভার-কনডাক্টর গাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে? কিংবা পালাবে না কেউ। চতুরতায় অতি আধুনিক। জনরোষে মিশে যাবে। আততায়ীই খুঁজবে আততায়ীকে। কেন না এটা হনন নয়। কোনো মোটিভ নেই। কোন বিদ্বেষ ছিল না। মরবে কেউ? ঘটে যেতেই পারে এরকম কিছু একটা। হাইস্পিডের বিধি।

শিবনাথ নন। অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, নিজের মধ্যেই রক্তপ্রবাহে চেতনারহিত অন্য কেউ, অন্য কোনো মানুষ হাতে পায়ে কোমরে শিরদাঁড়ায় ব্যথায়যন্ত্রণায়,

স্নায়ুপ্রদাহের দিশেহারা বিভ্রমে আর সব সহযাত্রীদের মতোই নেমে এসেছেন রাস্তায়। পথ চাইছেন। ডানে-বাঁয়ে সামনে পেছনে পথ নেই নিজেরই পরিত্রাণের। পকেটের রুমাল টেনে ঘাম মোছেন গালে কপালে নাকে মুখে। একের পর এক গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আমজনতার ফাঁদে। নানা রংয়ের ইস্পাতে আর কাচে রোদ ঠিকরোচ্ছে শাণিত ছুরির ফলায়। কয়েক শো হর্নের আওয়াজ আর হাজার হাজার মানুষের প্রলয়ংকরে চকিতে-খসে-পড়া যুবতি দেহের যন্ত্রণার মতো গোটা এলাকা জুড়ে জটিল বিভীষিকা। বিভীষিকার কেন্দ্রে কোনো এক রক্তাক্ত যুবতি লাখো মানুষের চোখের সামনে খোলামেলায় বড়ো বেশি উদোম আর নিঝুম আর ন্যাংটো। কারুর কন্যা! হয়তো-বা একমাত্র সন্তান? আজও ঘুম-ভাঙার ভোরে দাঁত মাজার ফেনায় ফেনায় মুখ ধুয়ে নিতে বেসিনের ঊর্ধ্বে মুখোমুখি দেখেছিল নিজেরই স্বাভাবিক চোখ একজোড়া। আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল। হয়তো-বা দক্ষতাও ছিল। পাঁজিপুঁথির তিথিনক্ষত্র না হোক, ক্যালেন্ডারের পাতায় হঠাৎ-ই একটি সংখ্যাশব্দ কী ভীষণভাবেই নির্মম হয়ে উঠতে পারে তাজা বয়সের নিষ্পাপে?

গণবিস্ফোরণের দিশেহারায় জরাক্রান্ত মন্থর শিবনাথ। নিঃসঙ্গ একা। বাবলিকে মনে পড়ছে। একমাত্র সন্তান বি টেক পাস করে বড়ো একটি মালটিন্যাশনাল ফার্মে সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। প্রতিদিনের মতো আজও সকালে অফিসে বেরুবার আগে দেখা করে গেছে। বাবলি বা অনুনয় যার নাম, বংশরক্তধারায় যে তাঁর নিজেরই সন্তান বা অন্য কেউ? বাবলি এখন অফিসে? নিজেরই ভাঙনে গুঁড়িয়ে যেতে যেতে শ্লথ পায়ে পথ খোঁজেন। মানুষের উজান ঠেলে মানুষেরই সঙ্গে সরাসরি ধাক্কায় ধাক্কায় ঘটনা থেকে দূরে, বিপরীতে, পৌঁছে যেতে চাইছেন কোথাও। আকাশ খোঁজেন। শহরের রাস্তায় মস্ত মস্ত প্রাসাদচূড়ায় ঊর্ধ্বে নিজেকে সম্পূর্ণ করে খুলে দিতে পারে না মেঘলোক। বায়ুদূষণের নিশ্বাসে দম বন্ধ হয়ে এলে ভেতরে ভেতরে দুঃসহ অস্থিরতা। বাবলি ঘরে ফিরবে তো আজ?

পিছু ফিরে তাকাবার ভয় ছিল। সামনে সুবিশাল কলকাতা মূলত নিরাকার। সেখানেও বিপুল জনতা। অগুনতি মানুষ। হৃদ্‌পিণ্ডটা ভেতর থেকে আঁকড়ে ধরে আছে কেউ। বুকের আইঢাইয়ে হৃদয় খোঁজেন। উন্মত্ত জনতার ক্রোধানল কি কোনো দুঃখতাপ? কোনো শোকবেদনা? নাকি দৃশ্যমান কোনো প্রতিপক্ষকে চিনে উঠতে না পারার পরাভবে অবোধ বিবেরই উদ্‌গার? এগোন পায়ে পায়ে। কোথাও পৌঁছোতে চান। নিরবয়ব শূন্যতা। কোনো কন্যাসন্তান নেই তাঁর। অথচ অসংখ্য আত্মজ। প্রায় চৌত্রিশ বছর কলেজের মাস্টারিতে এতকাল যারা ছিল বেষ্টিতে, পুষ্পিত উদ্যানে অগুনতি মুখ! আলাদা করে এখন আর মনে পড়ে না অনেককেই। নির্ভার স্মৃতি। এখন কে কোথায়? অন্তবর্তীদাহে গোটা শরীরের কাঁপুনি নিয়ে রক্তবীজের দংশনে দংশনে গালে কপালে ঘাম মুছে.. মুছেও যদি স্বস্তি নেই ঘন বাষ্পে আলতো করে ঝাপসা হয়ে উঠছে চশমার কাচ। ওকে তিনি চিনতেন? একঝলক দেখার মধ্যেই মনে হয়েছিল, দেখছেন কোথাও। এখন নিরর্থক মনে হওয়ার কোনো বাস্তব হেতু নেই। যুক্তি নেই। চারপাশের বাহুপেশিরও জঙ্গলে একপলক দেখার মধ্যেই ফোলা-ফোলা ফরসা গাল,

ঘর্মাক্ত নাকমুখ। ভয়ার্ত দুটো চোখের গুলতিতে রূপলাবণ্য খামোখা ঠাট্টা। পৃথিবীর কাছে, মানুষের কাছে একটু করুণা চেয়েছিল সেই মেয়ে। গলায় ফাঁস বেঁধে গিয়েছিল রক্তজবার রংয়ে লাল ওড়নায়। অতি প্রশস্ত বিশাল রাজপথই ওর লাল ওড়না এখন। দ্রৌপদীর শাড়ি। নিঃশেষে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। অনেক...অনেক রক্তেই ঢেলে দিতে পারে সুঠাম দেহের তাজা যুবতি শরীর।

কতটা পথ চলে এসেছেন ভিড়জনতা থেকে দূরে? থমকে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির খুঁট তুলে চশমার কাচ মুছে নিচ্ছিলেন শিবনাথ। আঁতকে উঠলেন। বাবলি? বাবলি এখানে? দ্রুত পা ফেলে ছুটতে থাকেন। মানুষের ভিড়ে নিশানা ঠিক রেখে, যেন হারিয়ে না যায়। এবং অদূরেই পথচলিত জনতার ধার ঘেঁষে একটা দোকানের সামনে রক গোছের বাড়তি একফালি কার্নিশে কোমর ঠেসে উবু হয়ে, হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে দুহাতের শক্ত মুঠোয় নিজেরই চুলের মুঠি খামচে ধরে ঝিম মেরে বসে ছিল যুবক। আজ এরকমই একটা গাঢ় নীল রংয়ের প্যান্ট ছিল বাবলির পরনে। হালকা জলপাই রংয়ের স্ট্রাইপ-টানা হলুদ একটা শার্ট। পায়ে ভারী জুতো।

কাছাকছি গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালেন শিবনাথ। তাঁর ছায়া পড়ল ওর গায়ে। হয়তো সেই ছায়াও কোনো স্পর্শ মানুষের? ছায়াও আঘাত? সচকিত সেই যুবক পিঠটানে সোজা হয়ে বসল শান্তভাবে এবং চোখে চোখ পড়তেই দু-দুটো সূর্য-ঝলশানো চশমার কাচে কী তীক্ষ্ণ আর উন্মুখ সে-চাহনি? শিবনাথ স্তব্ধ স্থবির। কোনো উচ্চারণ ছিল না মুখে।

সংশয়ের চোখজোড়াও নিস্পলক ছিল কয়েক সেকেন্ড। এবং আচম্বিতে, কী মনে হল, একঝটকায় লাফিয়ে উঠল তড়াক করে—'আপনি? আপনি ছিলেন ওই বাসে? আপনি ছিলেন?'

শিবনাথ কম্পনহীন। ঘটনার সাক্ষ্যে বুঝি তিনিও কোনো অপরাধী কেউ। নির্বাক মৃদুতায় মাথা নাড়তেও হয়।

'আমাকে... আমাকে কেন বিশ্বাস করলেন না উনি? বিশ্বাস করুন, আমি...বিশ্বাস করুন...' কী ভীষণভাবেই উজ্জ্বল দুটো চোখ! চোখজোড়া সজল ছিল কিনা, স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু গলার স্বরে, অথবা হাতের পায়ের সমস্ত অস্থিচর্ম নিয়ে যে-অসহ্য যন্ত্রণা, অস্থির কাতরতায় দুর্বার ছিল সে-সজলতা—'বিশ্বাস করুন, কোনো ইল মোটিভ ছিল না আমার। এত ইনডিসেন্ট কুচ্ছিত খারাপ লোক আমি নই। আমি...'

'জানি। আমি দেখেছি।...' অলস অবশ হাতটা উঠে এসেছিল অসাড় শূন্যতায়। ছেলেটির কাঁধে স্পর্শ রাখলেন শিবনাথ। নিতান্তই অধিকারবিহীন যে-স্পর্শের শীতলতায় কোনো গ্রন্থি ছিল না। মানুষের ভাষা যেখানে মূলত সবই নিরর্থক।

কিংবা এই ছোঁয়াটুকুই হয়তো বা অনেক বড়ো প্রাপ্তি ছিল সে-যুবকের। মাথার একরাশ ঝাঁকড়া চুল আর সুমসৃণ গালের শোভনসুন্দরে ছিমছাম স্মার্ট ইয়ংম্যান। দুটো হাত নিয়ে কোথায় কী করবে দিশেহারায় আঁকড়ে ধরতে চাইছে কিছু একটা। নাকেমুখে কুঞ্চনে কুঞ্চনে অসহ্য তিক্ততায় অথবা আর্তনাদে—'আমি শুধু হাত বাড়িয়ে আগলে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। কতটুকু আর সময়? সামনের স্টপে গাড়ি থামলেই

একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। না হয় নেমে যেতে বলতাম। হয় না। এ-হয় না ওভাবে। ইম্‌পসিবল। দে ক্যান নট রান লাইক দ্যাট। দ্যাট হ্যাজার্ডাস গেম...'

পাপদগ্ধতার কী মর্মান্তিক দাহ? পকেটের রুমাল টেনে ঘাড়গলার ঘাম মুছতে মুছতে অস্থিরতায় বুঝি-বা নিজের মধ্যেই কোনোভাবে কিছুটা পরিত্রাণ চাইছিল ছেলেটি। হঠাৎই আটকে গিয়ে হাতটা থমকে যায় নাকের ডগায়। হাতে রক্ত ছিল না। অথচ অঢেল রক্তপাত? হাতের পাতা, পাঁচটা আঙুল, আঙুল-চ্যাবড়ানো হাতের তেলোয় কররেখার অজস্র আঁকিবুকি।

স্থির পলকে তাকিয়ে থাকেন শিবনাথ। হয়তো পৃথিবীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো পরমাণুকে নিয়ে খেলা! অথবা ভয়ংকর রকমেরই বিস্ফোরক কিছু। অপরিচয়ের ভেদরেখাটুকু থেকেই যায়। ইচ্ছে থাকে না আরও বেশি নাড়াচাড়ার। ওকে বিব্রত করার। অপ্রকৃতিস্থ মাতালের ছন্নছাড়ায় নিজেরই ডান হাতটাকে বিশ্বাস করতে না-পারার কুহকে হয়তো বা নিদারুণ কোনো মনস্তাপ। বন্ধুর হাত? অস্থির সেই যুবক সর্বাঙ্গে মোচড় খেয়ে দুটো চোখের বিহ্বলতায় এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে আবার ঝপ করে বসে পড়ল রাস্তার ধারে অপরিসর ঠেকনাটুকুতে কোমর ঠেসে। পরিত্রাণের হাতই যদি এমন রক্তখেকো অবিশ্বাসের, গলাটা উঁচিয়ে তুলে রুমাল ঘষে নাকে মুখে কপালে ঘাম মুছতে থাকে দীর্ঘ আক্রোশের টানে টানে। অনেকটা সময় নিয়ে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কেউ আছে কিনা ডানে-বাঁয়ে। অথচ ওর নাগাল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অবসাদে শিবনাথ বাতিল হয়ে যান।

বাতিল নিষ্প্রয়োজনেই। গোটা চত্বর জুড়ে যদি গণরোষের উন্মাদ তাণ্ডব, চিহ্নিত হতে পারে না বিপদতারণের আপনজন। আশঙ্কা থাকে না অন্যভাবে শনাক্ত হবার। রাস্তার ধারে এক কোণে আপন নিভৃতে দহনে দহনে নিজের শুদ্ধি খুঁজছে যুবক? আরো একটু সময় স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে থেকে সেই দহন সইলেন শিবনাথ। হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে, ডান হাতের কনুই হাঁটুতে ঠেকিয়ে পিঠের শিরদাঁড়াশুদ্ধ আনত মাথা আঙুলের সাঁড়াশিতে চেপে ধরে থাকার স্থিরচিত্রে সেই যুবক যদি ক্ষুব্ধ জনতার কেউ নয়, ওকে ওর যন্ত্রণার দাহে একা রেখেই সরে আসতে হয় এবং সরে এসে তাঁর নিজের জন্যেও কোনো নিভৃতি থাকে না। বড়ো বেশি চিৎকার আর জনকোলাহলের মহাপ্রলয়ে শূন্যতটা তাঁর নিজেরও। বুঝি কোনো স্পয়ারাল সিঁড়ি পাকে পাকে ঘুরে উঠে এসেছে পায়ের গোড়ালি থেকে মাথার ব্রহ্মতালুতে। কিংবা সিঁড়িটা যখন নেই, অবাস্তবে, নিজের মধ্যেই বিভ্রমের আঁকিবুকিগুলো আরো বেশি জগাখিচুড়িতে স্নায়ুতে শিরায় শিরায় সত্যি হয়ে উঠতে থাকে। পায়ের পাতায় চটিজোড়া আছে কি না নেই—থাকা না-থাকার অভ্যাসে টালমাটালে চলতে গিয়ে হাঁটুর কাঁপুনিতে হামলে পড়তে চায় শরীরের ভার। চটি দুটো মূল্যবান হয়ে ওঠে। ছিটকে বেরিয়ে যাবার ভয়। এমনটাই হয় ঘোরানো-সিঁড়ির পাকে পাকে। সঙ্কীর্ণ লোহার ধাপে ধাপে পা ফেলতে হাত বাড়িয়ে ধরতে হয় কিছু। মাঝখানে শক্ত একটা শিরদাঁড়া উঠে গেছে অনেক উঁচু অব্দি। ভারী লোহার স্তম্ভটা একমাত্র অবলম্বন। সেটা বাঁহাতের মুঠোয় চেপে ধরলে হাতটা কাঁপে। ডান-বাঁয়ে কোনো দেয়াল থাকে না। মাথার ওপর ছাদ নেই, ছাদ-দেয়ালের কোনো

অভ্যন্তর নেই। ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণির ঘোরে পা ফেলে ফেলে আরোহনে যত ঊর্ধ্বমুখী, নীচের দিকে পৃথিবীর মাটি নেমে যেতে থাকে অনেক তলায়। মাধ্যাকর্ষণ ছিঁড়ে নিজের জোরে এগোবার প্রক্রিয়া যদি একই রকম, মাথাটা ঘোরে। অথবা মাথামগজ স্থির থাকে, চারপাশটা দোল খায়। নিজের স্থির থাকা অথবা আকাশমাটির দোল—কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, টালটামালে যদি নিজেকে নিয়েই বেসামাল, পিছু ফিরে তাকাবার প্রয়োজনেই দুটো চোখ বার-বার খোঁজে কাউকে। খুঁজে পেতে চায়। মানুষের ভিড়ে পায়ে পায়ে হাঁটায় সেই যুবক যদি ইতিমধ্যেই আড়াল পেয়ে গেছে, অদূরেই সুবিপুল মানব-বিস্ফোরণের কেন্দ্রে কোথায় সেই রক্তাক্ত যুবতি? এখনও আছে? অথবা নেই? শবদেহ অথবা হাসপাতাল? শেষ নিশ্বাসটুকুর জন্য নিশ্চয়ই কোনো একটি দুর্লঙ্ঘ্য মুহূর্ত নির্দিষ্ট হয়েই ছিল ওর জীবনচরিতে। সকলেরই থাকে। কেউ তার হদিস জানে না। কিন্তু প্রদীপ ছোঁয়ানোর আগেই দেশলাইয়ের কাঠিতেই যে-আগুন নিভে যায়, তার কোনো ইতিহাস নেই। এই পৃথিবীর আলোয় বাতাসে জলে কিছুদিনের অনুগ্রহণ বা ফুসফুসে নিশ্বাসপান যার জন্য বরাদ্দ ছিল, অতি সংক্ষিপ্ত সেই স্বপ্নের বৃত্ত কোনো জীবনকথা নয়। মুছে যায় নাম। নিরর্থক নামটুকুর জন্য শোকদুঃখতাপে কোনো একটি পরিবার? মা-বাবা? কিছু আত্মীয়পরিজন? মৃতের জন্য শোক? কলেজে এক দিনের ছুটি? তারপর শান্ত বিস্মৃতি? থানাপুলিশ নেই। আগামীকাল খবরের কাগজের কোণে খামচিতে বড়োজোর ছোটো একটা সংবাদ হয়ে উঠতে পারে সেই যুবতি। নিছক একটি নাম। অঘটনই যদি সংবাদ, নামটুকুই একমাত্র মুদ্রাক্ষর-সম্মান।

লাগামছাড়া এলোমেলো জনতার কোনো অভিভাবক নেই। পুলিশটুলিশ কোথাও কেউ আছে কি নেই, কোথায় কী হচ্ছে বা না-হচ্ছে, কিছু বুঝে বা না-বুঝেই হাঁটতে হাঁটতে ভীষণভাবে একা, কোথায় গিয়ে পৌঁছতে চাইলেন শিবনাথ। একটু বিশ্রাম! বিস্তীর্ণ রাজপথও বড়ো সঙ্কীর্ণ এখন। আপ-ডাউন নেই। কানুনটানুন বরবাদ। ওভারটেকিং-ওভারটেকিংয়ে একজন আরেকজনকে টপকেটাপকে পাশাপাশি গা ঘেঁষে তিনটে-চারটে লাইন করে রাস্তার প্রায় সবটাই বাস লরি ট্যাক্সি ডিজেল-পেট্রলের সব রকম গাড়ি। এরই মধ্যে ফাঁকফোকরে অটোগুলো আরেক উৎপাত। ফুটপাতে গায়ে গায়ে ধাক্কায় মানুষের পায়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাবার হয়রানিতে পরিত্রাণ খোঁজেন। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে শহরতলির ট্রেন ধরার কথা ছিল দশটা চল্লিশে। যাওয়া হবে না। ঘরে ফেরার পথটুকুও বড়ো কঠিন হয়ে উঠছে। ডানে-বাঁয়ে আশেপাশে অচেনা মানুষজনের মুখেচোখে যদি নিজের কাছে নিজেরই অচেনা কোনো মহানগর, প্রবাসে নিরাশ্রয়ে ঢিলেঢালা পা ফেলার অলস ভঙ্গিতে! হঠাৎ-ই সামনে একটা টেলিফোন-বুথ! এবং চোখে পড়তেই ত্বরিতে ঝলকানিতে কী মনে হল, থমকে দাঁড়ালেন।

ঘাড়ে-গলায় নাকেমুখে রুমালটা ঘষে নেবার অছিলায় নিজেকেই খুঁজেপেতে হাতড়ে দেখতে হয় একবার। এক ঝটকায় হঠাৎ কিছু মনে-হওয়াই যে চটজলদি কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারে না, জেনেবুঝেই হলুদ বোর্ডের ওপর লাল হরফে এস.টি.ডি., আই.এস.ডি., পি.সি.ও., অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন ঊর্ধ্বগ্রীবায়। বাঁদিকে তাকালে সোজাসুজি চোখে পড়ে, ভেতরে কাচের ঘরে জলপাই রঙের টেলিফোন

সেটটা এখন নিঝুম। কেউ নেই। কাচের ঘরে কেউ থাকা বা না-থাকার নির্জনতা অথবা বাইরে উন্মত্ত জনতার কোলাহলে ধুন্ধুমার—দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে সন্ত্রস্ত জরায় শূন্যতা বাড়ে। অন্য এক ধরনের সংক্রমণ। ঘোলাটে হয়ে ওঠে চোখজোড়া। দুঃসহ স্নায়ুচাপ। চারদিকে ঘিরে মানুষের হট্টমেলায় দুপাশের প্রাসাদ অট্টালিকাগুলোও যদি তাঁর আপন কেউ নয়, এতকালের চেনা শহরে, দীর্ঘ রেলযাত্রায় অসংলগ্ন সহযাত্রীদের ভিড়ে বুকের মধ্যে সঙ্গোপন টিকিটটাকেই প্রাণকবচ মনে হতে থাকে। আবাসনে নিজের ঘর! এপাশে-ওপাশে চোখ রেখে পায়ের চটি হিঁচড়ে টেনে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে একটু থিতু হয়ে দাঁড়াতে চাইলেন কোথাও। মুখোমুখি তাকাতেই উলটোদিকে চারতলা বাড়ির তিনতলায় ভেজাকাপড় শুকোতে দিয়েছে কারা? নিজের ঘরটাকেই মনে পড়ছে। জীবনের শেষ কানাকড়ি দিয়ে এতবড়ো শহরে সবরকমেই নিজের জন্য একার, সর্বতোভাবে নিজস্ব একটা আস্তানা যদি গড়ে তোলাই গেল, মালিকানা থাকবে না আপন সম্পদের? প্রেসার সুগার কোলেসটারোল ইউরিক সব সামাল দিয়ে বেঁচেবর্তে থাকার মূঢ়তায় ভগ্নস্তূপে শঙ্খধ্বনি—পরমায়ু বাড়ছে মানুষের! হাজার স্কোয়ার ফুটের আস্ত একটা ফ্ল্যাট নিজেরই পরিহাসে ব্যালকনির কার্নিশে টবে-ঝোলানো অর্কিডের প্রতিরূপে ঝুলছে তিনতলায়। আদপে হয়তো কোনো বসতই নয় সেটা। বাবুই পাখির বাসা। হালকা বাতাসেই দোল খেয়ে যেতে পারে ইটকংক্রিট।

নাড়া খেলেন। দেশদুনিয়ার ওপর রাগঝালের বিরক্তিতে চিৎকার করে যাচ্ছে কারা? বাসের ড্রাইভারকে খিস্তি। এবং এদেরই পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী শিবনাথ জানেন, ফিন্‌কি-ছোটানো রক্তের ভয়াবহে দুর্যোধন-দুঃশাসনরা ছিল না কেউ। কিংবা দুর্লঙ্ঘ শকুনির পাশা। কোনো ঘাতক থাকে না এমন হননে। বন্ধুর হাতই যদি কোথাও কখনও ঘাতক হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যাচ্ছে বাবলিকে। হাজারো হট্টগোলে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সেই যুবককে। নিশ্চিতই উঠে দাঁড়িয়েছে এরপর। প্যান্টের পেছনের দিকে দু-চারটে থাবড়াথুবড়ায় আলগা ধুলোময়লা ঝেড়েমুছে নিজেকে অনেকটাই চাঙা করে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। ওকে বেঁচে থাকতে হবে। জীবনের সব নিয়ে চাওয়া বা না-পাবার যোগবিয়োগে বাঁচার নিয়মেই তাজা বয়সের উদ্দামে সপ্রাণ বেঁচে-থাকা! হয়তো ভুলেও যাবে একদিন। ঝোপজঙ্গলের ঘিঞ্জিতে একঝলকে দেখা তরতাজা কোনো বুনোফুল! কাঁধের লাল উড়নি যদি ওর চনমনে টাটকা প্রাণের লাল নিশান, অঢেল রক্ত ছিল ওর শরীরে। অঢেল বাতাস টেনে নেবার শক্তি ছিল সতেজ ফুসফুসে।

শূন্যে চোখ রেখে কাগজের আঁকিবুকিতে অন্য রকমের আলাদা কোনো গণিত খোঁজেন শিবনাথ। চেনাজানা ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে যদি দেখেছেন দুজনকেই, বেয়াড়া ধরনের তালগোল হিসেবটা ঘুলিয়ে উঠতে থাকে নিরর্থক ভাবনায় ভাবনায়। পরিত্রাণই যদি, যদি অবিশ্বাস্য যা ওদের বয়সের মাপজোখ, এরকমই অন্য কোনো অঘটনে নিষ্ফল অপচয়ের রক্তধারা হয়তো বা অপরিচয়ের বেড়া ভেঙে মিলেমিশে পুষ্পময় হয়ে উঠতে পারত ঘাতকের সঙ্গেই শরীরে শরীরে হৃদয়মনে অন্যভাবে, ভিন্ন নামে।

কাচের ঘরে জলপাই রংয়ের বোবা টেলিফোনটা এক-বুক নিশ্বাস বুকে নিয়ে মৃতবৎ

স্থির। মৃত নয়, পৌঁছে দিতে পারে কোনো স্নেহবাসনার ঘরে ; শ্রবণে কথনে। ছোঁয়া যায় এপার-ওপার। আরও একবার ভাবলেন শিবনাথ।

কিংবা মতিভ্রম। সাবানফেনার অসংখ্য বুদবুদে আছেন ঠিকই, কোথাও আটকে গেছেন এককোণে খাঁজখুঁজে। নিজেকে নিয়েই অদ্ভুত এক সজল স্থবিরতা। ভেসে যাবার স্রোতে নেই। মনে হয়, সবটাই এক ধরনের বেবুঝ বাড়াবাড়ি। প্রাচীন কপিলাবস্তুর সেই মূঢ় যুবক নন। শুধু একটি মাত্র রক্তঝরায় এমন করে খামোখা বিচলিত হয়ে ওঠা যদি নিজের কাছেই একটা ঠাট্টা, ভাবনাটা রাশ টানে ভেতর থেকে। রেখাপাতহীন একমাত্র মরণে আজও নাকি বুকের খাঁচায় নিশ্বাস গাঢ়তর হয়ে ওঠে কারুর ? অথবা দুর্বহ বয়সের ভার ? অবাধ অবসরের ক্লান্তি ? দুহাত বাড়িয়ে লম্বিত স্পর্শে কারুর মাথা ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে। করস্পর্শ আরও দীর্ঘায়ত সময়ের প্রান্তরে। জানেন, যেখানে তাঁর পা পড়বে না কোনোদিন। যে-সময় তাঁর কর্ষণভূমি নয়। দ্বিধা থাকে। সংশয়। এবং কুণ্ঠাজড়তার দোলাচল ভেঙে অতর্কিত সাতসতেরয় নিজেকে টেনে নিয়ে কখন ঢুকে পড়েছেন টেলিফোন-বুথের ভেতরে কাচের ঘরে।

হ্যালো....

'কবিতা আছে'

আপনি কে বলছেন ?

'আমি ? আমি ম্‌মানে...আমি অনুনয়ের বাবা...'

ওহ্ আপনি ? কী আশ্চর্য ! ভালো আছেন ?

'হ্যাঁ, আছি। আছি একরকম।'

দিদি ?

'আছেন। হ্যাঁ ভালোই...'

ধরুন, আপনি একটু ধরুন। বুবুকে ডেকে দিচ্ছি...

'না না, শুনুন...' হাতটা কাঁপল একটু। কানের কাছে রিসিভারটা এলোমেলো। কোথাও একটু বেশি রকমের ছেলেমানুষিই হয়ে যাচ্ছে বোধ হয় এবং সত্যি-সত্যি কোনো ছেলেমানুষের কাছে চকিত প্রগল্‌ভতায় চিত্রভ্রম ! কুণ্ঠিত গলার স্বরে শিবনাথ—'ন্‌নাহ্ থাক। ওকে তো বেরুতে হবে এক্ষুনি ? বরং আমারই ভুল হয়ে গেছে। এখন ওর কাজের সময়। নাহয় পরেই হবে। পরে...আমিই টেলিফোন করব সন্ধেবেলা...'

সে-কী ? ও-কী কথা ? আপনি ডাকছেন ? আপনার দরকার ? কলেজে যাবে। দুপুরের দিকে কখন যেন ক্লাস ! সে-হোক গে, আপনি ধরুন। ও ঘরেই আছে। আমি ডেকে দিচ্ছি...

অনেকটা গলা বাড়িয়ে বুঝি কোনো রূপকথার সারস পাখি কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলতে চাইছে গূঢ়তর কোনো সংবাদ। ওরই গলাটা কানের কাছে চেপে ধরে থাকেন শিবনাথ। যন্ত্রটা কানে গেঁথে রেখেও কিছু ভাবছেন মনে মনে। ভাবতেই হয়। তরল আবেগে এতটা চঞ্চল হবার হয়তো কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু যদি ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসেই গেছে সেই মেয়ে, জমাট-বাঁধা সংশয়ের গিঁটগুলো আরও বেশি করে আঁটোআঁটো হয়ে উঠতে থাকে গাঁটে-গাঁটে মাথার ঝিমঝিমে। কবিতা নামের কোনো মেয়ে, ওরকে

বুবুকে চোখে দেখা যাবে না এপার থেকে এবং ওপারে যদি এখনও শব্দ নেই, নৈঃশব্দ্যে, পঁচিশ-ছাব্বিশ...বড়োজোর সাতাশ বছরের অন্য এক জ্যান্ত আর সজীব কন্যার কণ্ঠস্বর ধ্বনিময় হয়ে উঠবে এক্ষুনি। সুললিত সংগীতও যার গলার স্বরে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই কখনও কদাচিৎ তরঙ্গিত হয়ে উঠতে পারে ঘরোয়া আসরে। অথচ এই মুহূর্তে ওকে বলার কিছু নেই। অথবা যে-মেয়ে কখনও সামনে এসে দাঁড়ালে মিতবাক নম্রতায় মাথা নুয়েই থাকে সলজ্জ সম্ভ্রমে, যদি তাকে বলারই কিছু না থাকে, কিছুই না-বলার অবিমৃষ্যকারিতায় টেলিফোনে খামোখা ছোটো একটি মেয়ের মুখোমুখি হবার অস্বস্তি নিজেরই মূঢ়তা, দীনতা বাড়ে। শব্দ কথা বাক্য সংলাপ—যদি সেভাবে আর কোনো অর্থই নেই কিছুর, স্বভাবের বাইরে নিজেরই অত্যদ্ভুত আচরণে গোটা শরীরে রক্ত চামড়ায় শিরায় শিরায় এক ধরনের আচ্ছন্নতা।

হ্যালো...

'কে কবিতা?' নাড়া খেলেন শিবনাথ। কী বলবেন? কেনই বা বলবেন? স্মৃতিময় কোনো ফোটোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন নিজেরই আগোছালো কুণ্ঠিত স্বর—'নাহ্, একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে...'

আমার সঙ্গে। ওপারেও সচকিত হয়ে ওটাব কাঁপুনি। গলাব স্বরে মৃদুতায সভয সম্ভ্রম—ব...ব...বলুন...

'না, অবিশ্যি তেমন জরুরি কিছু নয়। তুমি দেখা করতে পারবে একবার? তোমার সুবিধেমতো...'

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি যাচ্ছি, এক্ষুনি যাচ্ছি...

'এক্ষুনি? বাচ্চাদের সঙ্গে লকোচুরি খেলার নিযমই বোধ হয এই, ছোঁযা পেযে যাবার ভয়। আচমকা ধাক্কায রিসিভারটা কানে গুঁজে রেখেই খানিকটা বিব্রত শিবনাথ—'শোনো, আমি তো বাড়িতে নেই এখন। ঘরে ফেরার চেষ্টা কবছি। কিন্তু ফিরব কী করে, কখন ফিরব...'

কেন?

'শিয়ালদা যাবার কথা ছিল। যাওয়া যাচ্ছে না। হাজরার মোড়ে বিচ্ছিরি একটা অ্যাকসিডেন্ট! উঃ হরিবল্...' চোখমুখ কুঁচকে গোটা শরীরের অস্থিচর্ম কুঞ্চনে সত্যি-সত্যি কেঁপে উঠলেন শিবনাথ। মুদিত নয়ন ভেঙে শিহরণ থেকে থিতু হয়ে আসতে সময় লাগে—'না না, সে-তোমাকে বলা যাবে না। চারদিকে বিচ্ছিরি হুলুস্থুল। ট্রামবাস সব বন্ধ। সব দিকে ট্র্যাফিক জ্যাম। দেখি, যদি একটা অটোটটো জোটে। নইলে...'

নইলে?

'নইলে সে-আর কী করা যাবে? হাঁটতে হবে।'

হাঁটবেন? এই দুপুরবেলা অ্যাদ্দুর হেঁটে যাবেন আপনি? কী বলছেন? ছাতা আছে সঙ্গে?

আয়ত চোখের ভ্রূরেখায় উদ্‌বেগের কুঞ্চন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন শিবনাথ। শিরদাঁড়া ভেঙে মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। এভাবে ব্যাকুল হলে রিসিভার ধরে থাকায় মুঠোটা বড়ো শক্ত হয়ে ওঠে। ললাটের রেখায় ভাঁজগুলো খুব একটা স্পষ্ট থাকে

না এই বয়সে। কিন্তু দুটো চোখের পাতায় উৎকণ্ঠা ত্রস্ততা, সশঙ্ক গলার স্বর! খানিকটা হালকা নিশ্বাস টেনে নেবার প্রসন্নতায় ছোটো একটু কাঁপল বুকে। ঠোঁট ভেঙে হাসলেন আলতো করে—'ন্নাহ্, অত কী ভাববার আছে? হাজরা থেকে চেতলা? সে-আর কতটুকু রাস্তা? এ-তো হাঁটাহাঁটিতেই সেরেছি এতকাল...'

তাই বলে এখনও হবে? এই বয়সে?

'তুমি আমার বয়সটাকেই বড়ো করে দেখছ। আমার ক্ষমতাটা ছোটো করছ কেন?'

ওপাশে ছোটো করে একটু হাসি। বিনম্র হাসিটুকুর কোনো ধ্বনি ছিল না। কথনে উচ্চারণে এক ধরনের সুর এসে যায়—তাহলে আপনি দাঁড়ান একটু। আমি আসছি...

'আসছি মানে? কোথায় আসছ?'

ওখানেই আপনি দাঁড়ান কোথাও। দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি একটা ট্যাকসি নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি।

'দাঁড়াব? কোথায় দাঁড়াব? এখানে তো যুদ্ধ চলছে। তোমার ট্যাকসিই বা এগোবে কতদূর? চারদিকে সব বন্ধ। ভীষণ জ্যাম।'

আপনাদের বাড়িই যাচ্ছি তাহলে...

'তুমি আসবে বলছ।'

আপনি টেলিফোন করে এভাবে খবরটা দিলেন..

'তোমার কলেজ?'

সে আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক চলে যাব। কলেজে যাবার পথেই একবার ঘুরে যাব আপনাদের ওখানে। আপনি সাবধানে আসবেন। হাঁটবেন না অ্যাদ্দুর। একটা ট্যাকসি নেবেন। ট্যাকসি না পান, অটো...

কিঞ্চিৎ কাঁপলেন শিবনাথ। অবসন্ন জরা ছুঁয়ে ফেলার পরও অবলুপ্ত শৈশবের যে-চিরন্তনী প্রত্যাশায় টিকে থাকে, বুঝি সেখানেই মৃদু করাঘাত কোনো। নিজেরই শ্রুতিতে মায়াময় হয়ে উঠতে পারে নিজেরই কণ্ঠস্বর—'আরে না না, অত কী এমন একটা? ও আমি ঠিক-ঠিক চলে যাব। কিচ্ছু ভাববে না। কতটুকু আর সময়? আধ ঘণ্টা! চল্লিশ মিনিট! হায়েস্ট এক ঘণ্টা?'

আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি যান। আমিও আসছি...

'তুমি আসবে?' রিসিভারটা অনেকটাই আলগা হয়ে এসেছিল কানের কাছে মতিভ্রংশে হঠাৎ ফেঁসে যাওয়া অবোধ অনাবশ্যকে মেনে নিতেই হয় নিজের আহাম্মকিটা। বৈরাগ্যই এক ধরনের। ভুতুড়ে বিপাকে গলার স্বর দীর্ঘায়িত হয়—'বেশ, এসো তাহলে যদি অসুবিধে না থাকে...'

রিসিভারটা আলতো করে শান্তভাবেই রাখলেন শিবনাথ। টুং করে শব্দ হল একটা। বৃষ্টিভেজা গাছের পাতা থেকে ডগা ছুঁয়ে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ার চেয়েও নিঝুম কোনো ধ্বনি! আওয়াজটুকু নৈঃশব্দ্যেরই। এলোমেলো প্রলাপের অর্থহীন কথাগুলো সব ফুরিয়ে যায়। জলপাই রংয়ের বোবা যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবনাথ। একঝলকের দেখা মৃণালভাঙা কোনো রক্তগোলাপ নয়। বয়সের মাপে নিশ্চিতই কিছু বেশি, রক্তমাংসে প্রায় একই ধরনের স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল ভরপুর যৌবনে

প্রশান্তির অন্য এক ছবি। অনেক কালের চেনা অথবা চেনা-অচেনার ভিড়ে স্বতন্ত্রভাবে নিবিড় হয়ে ওঠা কল্যাণীয়া। টেলিফোনের দিকে স্থিরপলকে তাকিয়ে থেকে যেন সর্বাঙ্গেই বাস্তব দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটিকে। যে-মেয়ে তাঁর নিজের মেয়ে নয়। ছাত্রীও নয়। পরের ঘরের অন্য কেউ। অথবা আত্মজার বিকল্পে যে-কন্যা ঘনিষ্ঠ আপন। ঘরেই আছে বলে হয়তো ম্যাকসিক্যাকসি কিছু একটা গায়ে পরে আছে এখন। কিংবা কলেজে যাবে বলে স্নান সেরে তরতাজায চুল বেঁধে হালকা প্রসাধনে শাড়ি ব্লাউজ। কদিন আগেও রঙিন শালোযার কামিজে তিনি দেখছেন অনেকবার। যে-সময়ে মেয়েদের বয়স বড়ো বেশি ওঠা-নামা করে শাড়ি আর না-শাড়িতে।

কাচের ঘরে টেলিফোনের জন্য আলাদা খুপরি। ঘেরাটোপ থেকে শান্ত পায়ে বেরোলেন শিবনাথ। পাওনাগণ্ডা মেটাতে হবে। শুধু তো টেলিফোন নয়। আসলে জেরক্সেরও দোকান। পাশেই মেশিনে দাঁড়িযে কিছু কাগজপত্রের হুবহু নকল-কপি তুলে যাচ্ছিল একজন যুবক। বাইরের এত সব তুলকালামেও দুজন খদ্দের ছিল। মগজের অস্থির ঝিমঝিমানিতে পেছনের পরিত্যক্ত নিঝুম টেলিফোনটা আসলে তখনও এক সজীব অস্তিত্ব। কিন্তু পিছু ফিরে তাকাবার প্রযোজন থাকে না। কেননা, পৃথিবীর অন্য এক সজীব কন্যার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ হযে গেছে এক্ষুনি। প্রায অভ্রান্ত অনুমানে চিনে নিতে পারছেন ওপাশের প্রতিক্রিযা। এমন একটা অভাবিত আকস্মিক টেলিফোনে হয়তো এখনও ঝাঁকুনি সামলে উঠতে পারছে না সে-মেয়ে! ওদের লুকিয়েচুরিযে চলার আবডালে যদি হঠাৎ-ই এমন করে ডেকে কথা বলবেন প্রবীণ বযস্ক কেউ? সমীহ সম্ভ্রমের মানুষ? প্রয়োজনটাও স্পষ্ট নয। নিষ্প্রযোজনে হেঁযালি বেশি। কিছুটা সঙ্কোচ তো থাকতেই পারে। আবোলতাবোল অযথা ভাববে অনেক কিছু।

বড্ড ভুল হয়ে গেল। টাল সামলে শিরদাঁড়ায় শক্ত থাকার চেষ্টায শিবনাথ নিজেও বড়ো ভঙ্গুর। পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। মন্থর শীতলতায অলস পা ফেলে। ইটকংক্রিটের পাথুরে রাস্তাটা পা ফেলে এগোবার জন্যে সোজা সরলরেখায মসৃণ ছিল না তখনও। দিশেহারা জনরোষের ভিড়ে কোলাহলে অসংখ্য বাঁক, অজস্র খাঁজখুঁজ। বড়ো বড়ো বনস্পতির ঘনবদ্ধ ছায়ায ছায়ায় দুর্ভেদ্য অরণ্যে যদি সূর্য এসে পৌঁছয় না মাটিতে, মহানগর রাজপথে খরতাপ দ্বিপ্রহর মাথার ওপর। ঝোপজঙ্গল কেটে পা ফেলার জমিতে যদি কাঁটায় কাঁটায় রক্তাক্ত হবার আশঙ্কা, পোশাকি দুনিয়ায় তাঁকে আগলে দাঁড়াচ্ছে না কেউ। কোনো রক্তক্ষরণ নেই। কিংবা সমূহ রক্তপাত! দেহেমনে ভরাট যুবতি তার ভূমিশয্যায় চারপাশ থেকে টেনে এনেছে হাজারো মানুষ। অথচ শহিদ নয়। শহিদ হলে নির্দিষ্ট শত্রু থাকত কেউ। বেসামাল জনতা ক্রোধে ফেটে পড়তে পারত আরও বড়ো সাড়ম্বর গর্জনে। কিন্তু অগৌরবের মৃত্যুতেও জনগণ থাকে, ক্রোধ থাকে। শোকে-দুঃখে-অনুতাপে-বেদনায় বড়ো বেশি ভেজা-ভেজা। প্রতিপক্ষ নেই কেউ। স্লোগান নেই, অমরত্বের দাবি নেই। অনির্দিষ্ট ঘাতকের মোকাবিলায় ছন্নছাড়া ক্রোধের বিকার—পথ অবরোধ, পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সংঘাত, দুরূহ যানজট। আরও এক দুঃসহ যন্ত্রণা। বিপন্ন শিবনাথ। জনারণ্যে মানুষের পায়ে পায়ে পা ফেলে এগোবার টানাটানে নিজের নিঃসঙ্গতাকে নীচে গড়িয়ে চলার মন্থরতায় নিজেকেই ভাঙতে হয়

নানাভাবে। থামতে হয়, বাঁক ঘুরতে হয়, মোচড় খেতে হয় ডানে-বাঁয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হয় আশেপাশের মানুষজনকে। মানুষে-মানুষে হারিয়ে যাবার গোলকধাঁধায় অতি বৃহৎ রাজসড়কের প্রশস্ত আর সুমসৃণ সরল রাস্তাটা যদি এতই জটিল আর দুর্গম, সামনেই চৌমাথার মোড় পেরিয়ে যাবার মিনিট পাঁচেকের দূরত্বটুকু ক্রমশই দুস্তর হয়ে উঠতে থাকে। এলোমেলো দিশেহারায় নারী বা পুরুষ, বৃদ্ধ বা যুবক, লম্বা বা বেঁটে, ফর্সা বা কালো কারুরই কোনো আলাদা আদল নেই। রোগা ল্যাতপেতে বা সচল পেশির কসরতি খেলায় নিজের কৃশকায় অস্তিত্বটুকু সংরক্ষণের সতর্কতায় শিবনাথ নিতান্তই দীনজন। পকেটের রুমাল টেনে ঘন ঘন ঘাড় গলা কপালের ঘাম মোছেন ঘষে ঘষে। পান চিবোনোর অভ্যেস ছিল না কোনোকালেই। ধূমপানের তুখোড় নেশা ছিল। ইদানীং সেটা ছেড়ে দেবার আত্মতুষ্টি জাহির করাটাও আসলে নিজের সঙ্গেই লুকোচুরি এক ধরনের। এবং এখনও এত টেনশনেও হাত বাড়িয়ে কোনো দোকান থেকে কিনে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেবার সাধ থাকে না আপাতত। নিজের মধ্যে নিজেকে আড়াল দিয়ে রাখার নির্জনতাকে এড়িয়েই চলেছেন জীবনে। বরং প্রখর আড্ডাবাজই ছিলেন একসময়। বন্ধুবান্ধবঘন হইহইয়ে মেতে থাকার দিনগুলো জীবনচরিতে আজ এক প্রাচীন বৃত্তান্ত। এবং আজ ঠিক এই মুহূর্তে অগুনতি মানুষের জটলায় নানাভাবে নিজেকে ভেঙেচুরে পায়ের তলায় পা ফেলার জমি খুঁজে নেবার শিথিলতায়, মনে ভয়, ভুলেই গেছেন মিছিলে হাঁটার পুরোনো কানুনগুলো। কিংবা পায়ের তলায় রাস্তাটা কোনো শানবাঁধানো পথ নয় আর। বুঝি দীর্ঘ সময়ের পথরেখায় হাঁটছেন অনেক দিন, অনেক যুগ। হেঁটে হেঁটে, এখনও হাঁটায় বুকের খাঁচায় হাঁপটানার যতিচ্ছেদগুলো উল্টোপাল্টা ওঠা-নামায় অবসাদের শরীর ভেঙে ক্লান্তি জমে উঠছে দুর্বহ দেহভারে। নিশ্বাসের পূর্ণচ্ছেদ ভয়ংকর।

থমকে দাঁড়ালেন। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিছুটা দূরেই মানুষের ভিড়ে আর যানজটে শক্ত গিঁটে আটকে গেছে বিশাল দুটো দ্রুতগতি রাজপথের সংযোগসীমায় বিস্তীর্ণ এলাকা। কিছু একটা ঘটছে সেখানে এবং কী হচ্ছে, দূর থেকে বোঝা না গেলেও সব মানুষের মাথা ছাপিয়ে খুবই স্পষ্ট—দু-দুটো পুলিশের গাড়ি। অ্যামবুলেন্সও থাকতে পারে ওপাশে। থাকবেই। লাঠিবন্দুকের গায়ে মলম মাখাতেই সেবাসামগ্রীর উৎপাদন। পুলিশ নেমে পড়েছে রাস্তায়। হয়তো লাঠি নিয়েই তাড়া করছে বিক্ষোভের জনতাকে। উত্তেজিত জনতা ঢিল ছুঁড়ছে। কোতিকে দল বেঁধে দলা পাকিয়ে পিছু হাঁটছে দৌড়ঝাঁপে। এবং এভাবে এলোমেলো বেসামাল লণ্ডভণ্ড ছুটে এসে গায়ের ওপর হামলে পড়লে আত্মরক্ষার সহজ হিসেবেই নিজের অসহায়ত্বে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেই হয় অভাজন দুর্বলকে। শিবনাথ সত্যি-সত্যি ভয় পেলেন। একপাশে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকারও যদি ঝুঁকি অনেক, খুব একটা ভরসা পেলেন না অবিচল থাকার। পিছিয়ে এলেন। দুর্ভেদ্য অরণ্যকে যদি সোজাসুজি ডিঙানো যাবে না, পথ একটা খুঁজে নিতেই হবে অস্তিত্বরক্ষার। দেহের কমজোরি কব্জায় সবরকম ঘাটতিকে মেনে না-চলার অহংকার ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে। হাঁপিয়ে উঠলেন। হঠাৎ-ই ডানদিকে বেশ বড়োসড়ো চওড়া একটা গলি। গলির মুখে ভিড় ছিল। রাস্তাটার কী নাম বা কোনদিকে

কোথায় নিয়ে পৌঁছেছে, কিছুই জানা নেই। ঢুকে পড়লেন। কলকাতাটা যেহেতু তাঁর নিজেরই শহর এবং দক্ষিণ কলকাতার এ-তল্লাটের সঙ্গে পরিচয় অনেক কালের এপাশ-ওপাশে কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না রেখে অবশ ভঙ্গির শ্লথতায় এগোতে থাকেন। ক্রেপব্যান্ডেজের রোল গড়িয়ে গড়িয়ে যাবার মতো আধা-পরিচয়ের গলিটা যেভাবে যেদিকেই নিয়ে যাক, মোটামুটি একটা হিসেবের ছক তৈরি হয়েই যায় মগজের ক্রিয়ায়। হয়তো বিস্তর ঘুরপাক। দুপুরের রোদে মাথামগজ পুড়িয়ে গলদঘর্মে ক্লান্তি অগাধ। তবু অনেকটাই ঘুরপথে ঘুরে ঘুরে দম ফুরিয়ে রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে পৌঁছে যাবেনই একসময়। চেতলা পৌঁছনোর বিকল্প পথ। বাস আছে দুটো রুটে। অঢেল অটো।

অঢেল রক্তপাতের অকালবিনষ্টিকে পেছনে ফেলে রেখে পাযে পাযে এগোনোয় কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারলে বিকল্প কোনো কন্যা পৃথিবীর ? এক ঝলকের দৃষ্টিপাতে স্বপ্নভঙ্গে ভয়ার্ত দুটো চোখ যদি সর্বাংশে অচেনা, কিছুটা চেনাজানায নীরব শঙ্খধ্বনিতে ভরাট যুবতি অন্যজন ?

ঘটনা থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন শিবনাথ। পালাতে থাকেন। অথবা পৌঁছে যেতে থাকেন কোথাও। পলায়নের প্রক্রিয়ায অস্থিমজ্জা-কাঁপানো ভিন্ন রকমের অস্থিরতায ঠিকমতো হিসেবও পাচ্ছেন না, প্রাণান্ত হযে ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত যদি পৌঁছনোও যায নিজের বৃত্তে, নিরাপত্তা কতটুকু ? প্রেশার আছে। পিতৃপিতামহের একমাত্র উত্তরাধিকারসম্পদ জীবনে। প্রতিদিন সকালে ট্যাবলেটসেবন নিযমিত বিধি। রাতে শোবার আগে ঘুমের ট্যাবলেট অত্যাবশ্যক।

গলির ভেতর চলে এসেছেন অনেকটা পথ। দুপুরের শান্ত গলিতে রোদ আর ছায়ার আঁকিবুকির অলস নিঝুমে এবার নিশ্চিতই নিরুৎপাতে স্থিব হযে দাঁড়াতে পারেন কিছুক্ষণ। কোনো একটা বাড়ির সঙ্গে গা লেপটে ছাযায ছাযায খানিকটা বিশ্রাম। নিদেন হাঁপধরা বুকের তোলপাড়টা সামলে নিতে পারেন কিঞ্চিৎ। চশমাটা নামিযে নিলেন বাঁহাতে। পাঞ্জাবির তলাটা টেনে নিয়ে কাচদুটো মুছে নিতে নিতে তাকালেন ঊর্ধ্বগ্রীবায়। কুতকুতে চোখের ভ্রুকুটিটা তৈরি হয়ে যায। এগোয় না বেশিদূরে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। ভ্রূ-কপালের কুঞ্চনে চোখজোড়া যতই তীক্ষ্ণ আর সদাশিব হোক, আসলে সবটাই মেকি আর অসার। গুটিসুটি মেরে থাকার সংশয় আতঙ্ক আর তিতিবিরক্তির যন্ত্রণা। বুকের খাঁচায় খাবলে ধরে থাকে ভয়। বুঝি এখনও তাড়া করছে কেউ ? লাঠি উঁচিয়ে অকুস্থলে বিশৃঙ্খলা হটাতে চাইছে পুলিশ। মারমুখো জনতা অথবা মার-খাওয়া মানুষ...অগুনতি মানুষের ঢল হামলে পড়তে চাইছে গাযের ওপর ? এবং সেটা যদি শ্মশানজুড়ে ডোমচণ্ডালের নৃত্য না হয, এবং তিনি নিজেও যদি রক্তের রঙে টকটকে লাল চুল্লিতে টুলি দেবার কেউ নন, একজন মানুষ হিসেবেই অন্য সব মানুষের ভিড়ে ভিড়ের-মানুষ হয়ে উঠতে না-পারার অলীক শোকের মর্মান্ত দাহে, বুকের হাঁসফাঁসে শুধু সেই ভয়ংকর বাসের দরজাটাকেই মনে করতে পারছেন। গ্যাসচেম্বারের মারণগুহা ? অন্ধকারের দ্বার। যন্ত্রণাবিদ্ধ যিশুর মুখ ! অথবা বনবাদাড়ে আগাছার জঙ্গলে হঠাৎ-ই অলক্ষণে কোনো রক্তগোলাপ ? প্রস্ফুটনে সম্পূর্ণ ছিল না। শেষ সর্বনাশের আতঙ্কে স্বপ্নের চোখদুটো যেভাবে চিৎকার করে উঠেছিল, আঁতুড়ঘরে

আত্মঘোষণার প্রথম কান্নায় তার সুর মেলে। একটা সবল হাত এসে পড়েছিল পিঠের দিকে। বিবাক্ত হাত ? একটি নয়, অনেক। অসংখ্য হাতই উদ্যত ছিল চারপাশে। বিঘ্ন ছিল না কোথাও। অঢেল ভালোবাসা, অজস্র প্রাণ, হৃদ্য স্নেহপ্রীতি সোহাগ অনুরাগ মায়াময় জগতে।

ফাঁদ থেকে পেরিয়ে এসে পায়ের তলায় পথ-চলার রাস্তা ফিরে পেয়েছেন শিবনাথ। ঘরে ফেরার পথ !

খরতাপ দ্বিপ্রহর। ছাতাটা সঙ্গো আনেননি ভুল করে। অথবা ইচ্ছে করেই। সারা গায়ে ঘামছেন ভেতরে ভেতরে। অস্থির হাঁকপাক নিশ্বাসে ফুসফুসে। দুর্গন্ধে ভেজা ন্যাতান্যাতা ছোটো রুমালটা নিজের কাছেই দূষিত আবর্জনা হয়ে ওঠার পর এখন আর কোনো মানেই হয় না সেটা হাতে ধরে থাকার। পকেটে ফেলে রাখতে দুটো হাত বড্ড খালি-খালি। কিছু একটা তো চাই হাতের মুঠোয়। মুষ্টিবন্ধতাও কিছুটা আত্মবিশ্বাসের জোর। কিংবা সবটাই খামোখা। একেবারেই ফালতু। এমন কত কিছুই রোজ আকছার ঘটছে দুনিয়ায। খবরের কাগজ পড়ার পুরোনো অভ্যাসটা যদি জঞ্জাল ঘেঁটে নোংরা কাগজকুড়ুনি শিশুশ্রমিকেরই কাজ, একটি মাত্র তুচ্ছ ঘটনায় এতটা কিলিত হয়ে নিজের মধ্যে অশান্তির রান্নাবান্না যে আসলে কোনো কাজের কথা নয়, বুঝে নেবার পরও স্বস্তি পাওয়া যায় না পুরোপুরি। জলন্যাকড়ায় ঘষে ঘষে ভুল অঙ্ক মুছে নিতেও চাইলেন মনে মনে। অবশ দেহভার। অলস শরীরের বোঝা আর বইতে পারছে না পা দুটো। মৃদু ঝিনঝিনানির একটা অস্বস্তি বাঁহাতে ওপরের দিকে শিরায় ধমনিতে। বড়ো বড়ো লম্বা নিশ্বাস ? ভাবনা বাড়ে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে রাস্তায় নিঃসঙ্গ একা ? মাত্রা ছাড়িয়ে অকারণেই দীর্ঘতর হয়ে উঠতে চাইছে সামনের গলিটা। যেকোনো পথের যাত্রায় শুরু থাকে একটা। কোথাও শেষ ? পৌঁছানো যায়নি শিয়ালদা। রিল থেকে সুতো টেনে নিতে নিতে, যতটুকু প্রয়োজন, তার আগেই যদি দাঁতে কামড়ে সেটা ছিঁড়ে দেয় কেউ ? ছেঁড়া সুতোর অর্ধেকটুকুও নতুন করে আস্ত একটা সুতো হয়ে উঠতে পারে—ঘরে ফেরার পথ ! ছবিটা বদলে যায়। ছেঁড়া সুতোর একপ্রান্তে কার ঘরের কোন্ এক হতভাগীকে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে ওর শেষ নির্বাপণে ? সুতোয় ডগায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়তো পরের ঘরে অন্য কোনো কন্যা ? জ্যান্ত।

পাখি হয়ে উড়ে যাবে ওদেরই কেউ একজন ? আকাশ চিনে নেবার আগেই খোলামেলা রাস্তায় দাঁতেনখে হিংস্রতায় কাউকে ছিঁড়ে খাবে বাঘ ? লম্বা সুতোটা এভাবেই দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে দেবে কেউ ?

হঠাৎ-ই হাঁপধরা বুকে প্রসন্নতা কিঞ্চিৎ। থমকে দাঁড়ালেন শিবনাথ। দীর্ঘ অবসাদের শরীর ভেঙে ক্লান্তশ্বাসে কীভাবে কী করেই যেন শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছে গেছেন অভীষ্টে। নিজের কাছেই হিসেব ছিল না। ফুসফুসে খানিকটা খোলামেলা বাতাস। অদূরেই হাজরার মোড়ে এত বড়ো একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর আস্তে আস্তে চারিয়ে গিয়ে যানজটের ধাক্কা এসে পড়েছে এখানেও। ট্রাম বাস গাড়ি আর অগুনতি লোকচলাচলের জটিল চক্রে মানবদশার আরও এক দুর্বিপাক—মাথার ওপর ভরদুপুরের সূর্য জ্বলছিল রক্তচক্ষু নিয়ে। পায়ের তলায় ক্রীতদাস ছায়াটাও কোনো সহচর

নয়। মধ্যবর্তী অবস্থানে রক্তমাংসের মানবদেহ অনিত্য জেনেও নিত্যচলার অভ্যাসে প্রতিটি পা ফেলায় রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে কামড়ে ধরে থাকে কণ্ঠনালি। এপাশ-ওপাশ থেকে আচমকাই ঘটে যেতে পারে কিছু। নাগরিক পথচলা এক রণক্ষেত্র সুবৃহৎ। কিংবা সৌরঅনন্তে লক্ষকোটি নক্ষত্রমণ্ডলীতে কোনো এক স্খলিত নক্ষত্রই হয়তো-বা। অন্য কোনো কক্ষপথে আশ্রয় খুঁজে নেবার তাড়নায়, অসম প্রতিযোগিতায়, ভিড়জঞ্জাল কাটিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শিবনাথ বড়ো বড়ো দুটো রাস্তাকে এপার-ওপার ডিঙোলেন সাবধানে। সন্তর্পণে পা ফেলার প্রতিটি ঝুঁকিতে মাথাটা নিজের দিকে নুয়ে রাখতে হয়। গলিত পিচ, ভাঙা ইট, গর্তফর্ত, উদোম ম্যানহোল বা ডিভাইডারের ট্রামলাইন—কোনটা যে চমকে দেবে হঠাৎ কখন? এত এত বছরের দীর্ঘ পথ চলার শেষে আজই যে ঘরে ফেরার রাস্তাটা কেন এত সঙ্কুল? পথই যদি ঘব চেনায় মানুষকে? গৃহ সম্পূর্ণ হয়।

বাস নয় ভিড়ের বাস এখনও বিভীষিকা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। স্নায়ুপীড়ায় অসহ্য দাহে একটু স্বস্তি কুড়োতে যদি অটোরিকশর জন্যেই হা-পিত্যেশ, রেহাই নেই সেখানেও। অপিসের সময় পেরিয়ে যাবার পর ভরদুপুরের এত বেলায় ভিড় থাকার কথা ছিল না। কিন্তু নানাদিকের দুর্বিপাকে ছুটে ছুটে এসেছেন অনেক মানুষ। আশ্চর্য! লাইন দিচ্ছে না কেউ? সারি বেঁধে দাঁড়াবার উদ্যোগ নেই কারুর? অটোর ছোঁড়াগুলোও বাজার পেয়ে গেছে খামোখা। চারজনের বেশি সিট নেই। পাঁচজন-ছজনকে নিয়ে বোঝাই হয়ে ওপাশ থেকে আসছে যারা, পোলিও রোগীর হুইল চেয়ারের মতো নড়বড়ে তিন চাকায় কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না রেখে বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। যদি নেমে যাচ্ছেন কেউ, দুটি কি একটি আসন ফাঁকা হয়ে যেতেই গোত্তা মেলে হামলে পড়ছে সবাই। ড্রাইভার ছোঁড়া চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। হুড়মুড়িতে সামলাতে না পেরে বারকয়েক পিছু ফিরে এলেন শিবনাথ। শান্তভাবেই নিজেকে প্রত্যাহাব করে নেওয়া বার-বাব এবং পরমুহূর্তেই কিঞ্চিৎ ঠাঁই পাবার চেষ্টায় ঠুকরে ঠুকরে যাওয়া পাখির নিয়মে। রাগ নয়, বিরক্তিও নয়। খ্যাচাখেঁচি গুঁতো৲.ত, এমনকী, আশেপাশে কিঞ্চিদধিক অশিষ্টাচারেও কোনো উত্তেজনা থাকে না শীতল রক্তে। নাজেহাল জেরবার মেনে নিতে হয় সবটাই। বরং ডানে-বাঁয়ে প্রতিটি মানুষকেই বড়ো বেশি মূল্যবান মনে হতে থাকে। প্রতিবাসী প্রতিবেশীদের দিকে এমন করে চোখ তুলে তাকাননি কোনোকালে। আজই যদি তার প্রথম পথ চেনার, পথিক চেনার দিন!

হয়তো অনুকম্পাও নয় সবটা। ভালোবাসারই কী এক উদ্ভট চেহারা!

হঠাৎই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। নিতান্তই আকস্মিক—নেমে গেলেন আরোহীরা চারজনই এবং সঙ্গে সঙ্গে দুপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হালকা পলকা গাড়িটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ির তুমুল ওলটপালট। যথারীতি হেরেই গিয়েছিলেন শিবনাথ। পিছিয়ে এসেছিলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। চমকে উঠলেন। হাত ধরে টানছে কে? স্পষ্ট অনুভব, পিঠের দিকে হাত বাড়িয়ে আগলে ধরেছে কেউ—'আসুন দাদা, বসুন। আপনি বসুন...

'আমি?' আরও এক গোলমেলে বাঁধা। হতচ্ছাড়া চকরাবকরা জামাপ্যান্টে কী বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি দেখতে একটা লোক! ডান হাতের কব্জি ধরে সেই লোকটাই টানছে তাঁকে! শিবনাথ ভ্যাবাচাকায় তাকালেন চোখ তুলে—'না, না, এ-তো আপনার সিট। আপনি?'

লোকটা বেখাপ্পা। ফাটা ঢাকের আওয়াজে ড্যাপড্যাপ গলার স্বর— 'সেই থেকে দেখছি, আপনি ট্রাই লাগিয়ে যাচ্ছেন দাদু। অ্যায়সা তেজী রোদ ব্লুটি সেঁকছে মাথার চাঁদিতে। উঃ, বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে য্যাঃ গরম! আপনি বুড়োমানুষ! বাংলাবাজার বহুত খারাপ। জিন্দিগিতে চান্স পাবেন না সাটল মেলে থাকলে। নিন উঠুন। উঠে পড়ুন...'

বিহ্বল শিবনাথ। হিসেবটা বুঝে উঠতে পারছেন না ঠিকমতো। কিংবা বোঝার অবকাশ নেই। পেছনে একটা বাস আটকে গেছে। হর্ন টিপছে অ্যালসেশিয়ানের রাগে। দরজায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে বাসের গায়ে টিন বাজিয়ে গালমন্দ চিৎকার কনডাক্টরদের। অটোর ড্রাইভারও দাবড়ে যাচ্ছে বদখত হেঁড়ে গলায়। তালগোলে গোলমালে শিবনাথ নিতান্তই বেকুব। পা ফেলতেই হয় সামনের দিকে। ডান হাতের কবজি ধরে টানছে লোকটা। ওর গাবদা হাতের থাবাটা পিঠের ওপর পাঞ্জা ফেলে ঠেলছে বদান্যতায়। পিঠে চাপ লাগে। চাপটা স্পর্শের অনুভব। স্পর্শটুকু চারিয়ে গিয়ে অন্যভাবে অন্যরকম একটা শিহরণ গোটা শরীর জুড়ে। সেটা নিজের মধ্যেই সঙ্গোপনে আড়াল রাখতে হয়। গাড়ির গা ছুঁয়ে অনেকটাই হেঁট হয়ে, অনেকটাই বাধ্যতায় ডান পা তুলে অতিকষ্টে কোমরটা ঠেলে ড্রাইভারের পাশে এসে বসলেন। ঘাড় উঁচিয়ে তাকালেন একবার। রেওয়াজমাফিক একবার ধন্যবাদ বলার নিয়ম। নিদেন হাত নেড়ে মৃদু একটু হাসিও তো প্রাপ্য হতে পারে মানুষটার? কিন্তু বলবেন কাকে? কিংবা কোনো সুযোগও থাকে না। ভটভটির চাপা গর্জনে থরথর কাঁপছিল গাড়িটা। চারটে সিট ভরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে লজঝর লোহালক্কড়ের মোচড়ানি তুলে ছুটতে শুরু করল এমন, তিনদিকে টালটামাল দোল খেয়ে যাত্রীদের নাভিশ্বাস। পেছনে পড়ে রইল কৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞ ছোটো মুখোমুখি খোলা বাতাসের ঝাপটায় ঝাপটায়।

পেছনে বসে আছে কারা? চড়া মেজাজের বাজখাই গলায় গালিমন্দ বা অভিসম্পাত বা মুণ্ডুপাত কেন বা কাদের উদ্দেশে, কে বা কারা ওদের দুর্ভাগ্যের হেতু—দুর্নিরীক্ষ প্রতিপক্ষকে বাতাসে ভাসিয়ে রেখে বড়ো বেশি উত্তেজিত জনতিনেক ভদ্রলোক। গোটা শরীরেই বারুদ-ঠাসা উত্তাপে দোনলা বন্দুকের মতো ড্যালাড্যালা দুটো চোখের ভয়ংকরে ব্রিফকেস হাতে ঝুলিয়ে ছুটছে যারা নব্য তরুণ, শিবনাথ স্বভাবতই কুঁকড়ে থাকেন এদের সন্নিধানে। নিজের নারীকেও বোধ হয় চুম্বন করে না এরা। আদায়পত্তরগুলো সবই বড়ো কৌতুকহীন সরাসরি। এবং আজ ক্ষুব্ধ হতেই পারে। ভরদুপুরের আপিসটাইমে এরকম একটা ইম্‌পর্ট্যান্ট রাস্তায় মোড় আটকে গেলে কী সর্বনাশ হাজার হাজার মানুষের? মেট্রো রেলের লাইনে আছে যারা, না-হয় একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যরা? কলকাতার ওপারে সবই লুটপাটে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে কারা? ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে না পারলে এক দুপুরেই বিস্তর লোকসান, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।

ঘাড় ফিরিয়ে শিবনাথ একবার দেখে নিতে চাইলেন মুখগুলো। বেয়াড়া ছেলেটা দুহাতে স্টিয়ারিং বাগিয়ে বাঁ হাতের কনুইটা ছড়িয়ে রেখেছে এতদূর, বুক অব্দি ছুঁয়ে আছে আড়াআড়িভাবে। একটু কাত হলেই ঘাড়ে-গলায় ব্যথা ধরিয়ে শিরদাঁড়ায় টান। একচিলতে ঠাঁইটুকুতে নড়েচড়ে বসাও নিষিদ্ধ যদি, হাত-পা গুটিয়ে থাকতেই হয়

নিজের অবস্থানে।

কোন্ একটা কলেজের মেয়ে বাস থেকে পড়ে গিয়ে থেঁতলে গেছে চাকার তলায়। টেঁসেই গেছে কি ধুকপুক করছে এখনও, জানে না কেউ। না-জানার জনশ্রুতি ঢিল-ছোঁড়া দিঘির জলে জলচুড়ির ঢেউ কাঁপায়। গাঢ়তর বেদনা—কিছু একটা হয়ে যায় তো সে বরং অনেক ভালো? বেঁচে গেলেই আরেক মরণ। কিছুর মধ্যে কিছু না, দুটো পাই বাদ দিয়ে দেবে ডাক্তাররা। একে মেয়েছেলে, তায় যদি খামোখা প্রতিবন্ধী...'

'প্রতিবন্ধী? প্রতিবন্ধী আবার কী?' পেছনের দিকে খেঁকিয়ে উঠেছেন কে একজন—'দুটো করে জ্যান্ত হাত আর জ্যান্ত পা নিয়ে আমি-আপনিই বা কী করছি মশাই? লাইফ কয়লা হয়ে গেল শালা সকালসন্ধে চরকি ঘুরে ঘুরে...'

সামনের দিকে গুড়িয়ে মাড়িয়ে ছুটছে লজ্ঝর গাড়িটা। পাশেই স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে আরেক জুয়াড়ি। ওভারটেকিংয়ের নেশায় মাঝেমধ্যে কচ্ছপও খরগোশ ডিঙোতে চায়? যেকোনো রকম একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে যখন-তখন। হাত-পা সিঁধিয়ে বসে থাকার গুটিসুটিতে অসুবিধা ছিল অনেক। ভঙ্গুর দেহে নিদেন বসে থাকার স্বস্তি ছিল। লোহালক্কড়ের উল্টোপাল্টা কর্কশ আওয়াজের জগাখিচুড়িতে চড়া পর্দায় আরও কিছু বিদঘুটে কণ্ঠস্বর পেছনের দিকে। প্রতি মুহূর্তের ঝাঁকুনি সামলে সামনের কাচে চোখ রেখে ভয়ংকরকে চিনে নিতে থাকেন শিবনাথ। অবিচ্ছেদকে একটানা ধরে রাখতে না পারলে যদি এভাবেই কোনো অসতর্ক মীড় ছিঁড়ে যেতে পারে আচমকা? ফুরিয়ে গেছে অথবা ফুরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা? জাপানে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে একটি জনাকীর্ণ নগরী নিশ্চিহ্নপ্রায়, অথবা কাশ্মীরে উগ্রপন্থী হানায় কুড়িজন নিহত, কিংবা সমুদ্র-উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে ঘূর্ণিঝড়ে শতাধিক ব্যক্তির মৃত্যু—রেখাপাতহীন সংবাদ-শিরোনামের তুচ্ছতায় কোনো একটি ঘটনা? ভুলতে হবে। ব্যক্তিগত শোক নয়, বৃহৎ কোনো ক্ষয়ক্ষতি নয় সমাজসংসারের। অকিঞ্চিৎকরকে ভুলে থাকাই যদি প্রকৃতির বিধান, মন অবোধ। কাট্যছেঁড়ার ঘায়ে নিরাময়ের আইডিন যেমন, সর্বাঙ্গব্যাপী দুঃসহ জ্বালা। ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে মনে পড়বে, রক্তাক্ত হবার আগেই টকটকে লাল উড়নির ফাঁসে জড়িয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্যে নিষ্পাপ সুডোল মুখশ্রী! ভয়ার্ত দুটো চোখের কালো কালো গুলতি দুটো বেরিয়ে এসেছিল আলগাভাবে। গড়িয়ে গড়িয়ে নিজেরই ঝরে পড়ার মতো। দাঁতমুখের খিঁচুনিতে, পরিত্রাণে কী ভেবেছিল? শেষ সর্বনাশেও কেন এত অবিশ্বাস? আঁটোসাটো সংকুচনে নিজেকে শক্ত পাথর করে রেখে অনেকটাই মুদিত নেত্রে শিবনাথ চিনে নিতে চাইলেন নিজেরই প্রতি অণুকণাকে। ষাট বছর ধরে একটু একটু করে জীবন সঞ্চিত হবার পর আজও যা হয়তো পূর্ণকুম্ভ নয়। আরও কিছু সূর্যোদয়, আরও কিছু ভরাট পূর্ণিমা হয়তো অবশিষ্ট এখনও? ঝটকা লাগে। আড় ভেঙে নড়েচড়ে উঠলেন হালকা নিশ্বাসে। তাকালেন এদিক-ওদিক। হয়তো-বা নিরর্থক টেনশনে নিজেকে বিপন্ন করে তোলারও কোনো হেতু নেই। শান্তভাবেই স্নিগ্ধ প্রলেপ খুঁজতে চাইলেন নিজের দহনে। ভুলতে হবে। দ্রুত ধাবমানতায় সোজাসুজি চোখ রেখে প্রশস্ত রাজপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সব রকম ভিড়ভাট্টা পেরিয়ে এসে গাড়িটা যখন ছুটছে, যদি নিশ্চিতভাবেই পৌঁছে যাচ্ছেন নিজের ঠিকানায়, ভুলতেই পারেন। দগ্ধতৃষ্ণায়

বিশাল নগরীর আরও কিছু দূষিত বাতাস টেনে নিতে পারেন নিশ্বাসে নিশ্বাসে। ভুলে যেতে পারেন সেই যুবককেও। ভুলতে না পারলে স্মৃতি সততই বিভ্রম।

চড়া রোদের দুপুরে অবশ মন্থর শরীরটা একটা বিশ্রাম চায় এরপর। নিজস্ব ঘরের বৃত্তই তো একমাত্র প্রার্থনা হয়ে উঠতে পারে এই মুহূর্তে। এবং যেভাবে মানুষের সব যাত্রাই ফুরোয় একসময়, প্রশস্ত ব্রিজ পেরিয়ে চেতলা পার্কের কাছে পৌঁছে গেছে গাড়ি, যেখান থেকে হাঁটাপথে, একমাত্র পায়ে হেঁটেই পৌঁছেতে হবে নিজের আস্তানায়। সুবিশাল ভূমণ্ডলের অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতে যা আলাদা-আলাদা সম্পূর্ণ পৃথিবী সব মানুষের। জীবনের উদ্যান।

জ্বলন্ত রোদে আর বিভিন্ন ব্লকের বড়ো বড়ো চূড়ার কৌণিক ছায়ায় ছায়ায় হাউজিংয়ের গোটা চত্বরটাই শান্ত নিঝুম। এমনকী, কেয়ারটেকার লক্ষ্মণও ওর নিজের টুলে বসে নেই। ওর বাচ্চাদুটো গ্যারাজের বাঁধানো চাতালে ফাঁকা জায়গাটায় প্রায় খেলে দুপুরবেলা। বোধহয় ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্মশান থেকে ফেরা নয়। সোদপুরে ছোটোবোনের শ্বশুরবাড়িতে ওর বুড়ি শাশুড়ির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পৌঁছনো গেল না। পারিবারিক ঝামেলাটা রয়েই গেল। এবং যাত্রাভঙ্গে আরও অনেক বেশি ঝক্কিঝঞ্ঝাট পোহানোর শেষে নিজের আঙিনায় পৌঁছে, যেন কপর্দকশূন্য রিক্ততায়, ভেঙে ভেঙে পড়ছিল অবসাদের হাড়গোড়গুলো। যত বেশি ঘরের কাছাকাছি এসে যাচ্ছেন, ভগ্নদশায় ক্লান্তি বাড়ছে। বাঁহাতে রেলিং ধরে পা গুনে গুনে সিঁড়ি ভাঙার ঝোঁকেও বুঝি মালিকানা থাকে না কোথাও—না হকের টাকায় কেনা ফ্ল্যাটের প্লিন্থ এরিয়ার, না অস্তিত্বের সম্পদ নিজেরই হাঁটু দুটোর ওপর। বয়সের ভারে মেদ ঝরে-পড়া অস্থিচর্মসার কোমরে উরুতে খটখটে হাড়ের ওপর চাপ বড়ো বেশি। প্রতিটি ধাপে পা ফেলতে শিরদাঁড়াটা বেঁকে আসে সামনের দিকে। দোতলায় উঠে এসে দাঁড়াতে হয়, হাঁপাতে হয়। গালে গলায় কপালে ঘষে ঘষে ঘাম মুছেও স্বস্তি নেই। চড়াইয়ের টানে আর একটা বাঁক ঘুরলেই কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে পৌঁছে যাওয়া যায়, সত্যি বিশ্রাম।

কোনোরকম হুঁশিয়ারির তকমা ছাড়াই 'প্রবেশ-নিষেধ'-এর রুদ্ধ দরজায় অন্তঃপুর আড়াল হয়েছিল। হাত বাড়িয়ে বেল টিপতেই ভেতর থেকে মৃদু ধ্বনিকম্পনের সাড়ায় যেভাবে দরজাটা খুলে গেল, যথাযথ নিয়মমাফিক হলেও জানা ছিল না, সেটা রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের দীর্ঘ প্রতীক্ষা বা প্রত্যাশায় আঘাত।

'তুমি!' অবিন্যস্ত আলুলায়িততায় শিবানীর মুখেচোখে ঘন উদ্‌বেগ অথবা বাঞ্ছিত প্রত্যাশাই আচম্বিতে প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে উঠলে দমচাপা গাঢ় নিশ্বাসগুলোকে একসঙ্গে রেহাই দেওয়াও এক ধরনের বিশেষ শারীরিক শ্রম। ঘরের মানুষ ঘরে ফিরেছে জেনে সর্বাংশে নিশ্চিন্ত হওয়ার ধকল সামলাতে দরজার ফ্রেমে অন্য এক বিধ্বস্ত রমণীমূর্তি

'কী? কী হয়েছে তোমার?'

'কেন? নিরুত্তাপে তাকালেন শিবনাথ।

'কেন? কেন মানে? কী বলছ?' রাগ অথবা যন্ত্রণা! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গৃহিণীর দিশেহারা বিস্ফোরণ—'সোদপুর যাওনি? হঠাৎ কী হল, বাড়িতেও তো টেলিফোন আছে একটা। এখানে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ ওকে টেলিফোন করতে গেলে কেন?'

বলার থাকে না কিছু। বিব্রত শিবনাথ। দরজা ডিঙিয়ে ঢুকে রুমাল টেনে কপাল মুছতে মুছতে দু-পা এগিয়ে এসে মাথার ওপর চলতি পাখার আশ্রয় চাইলেন। আকস্মিক কিছু নয়। সহজ স্বাভাবিক নিয়মেই যা হবার কথা ছিল, ঠিক সেভাবেই কথা রেখেছে মেয়ে! শেকড় থেকে ডালপালায় সারাগায়ে অপুষ্টি নিয়ে শহরের রাস্তায় গাছগুলো যেমন ধুঁকে ধুঁকে মরে, নববর্ষের ঘন শ্যামলিমায় যদি কেউ এসে যায় এই শহরেই ঘরের ভেতর? পলকপাতে স্নিগ্ধ বাতাসের ছোঁয়া লাগে ঘর্মাক্ত দেহের চঞ্চলতায়। লাল জরি-পাড় ঘন সবুজ শাড়ি, সবুজ ব্লাউজে কোনোরকম বাড়তি প্রসাধন ছাড়াই পূর্ণযৌবনে তন্বী। তিনজনের ছোটো সংসারে আজও যে কেউ নয়, অথচ মাত্র কয়েক বছরের লালিত স্নেহে লালিত ভালোবাসায় যার আগমনী ভরাট মেঘের বর্ষণে ভিজিয়ে রেখেছে পরিবারের প্রতি অণুকণা জমি, সেদিকেই চোখ রেখে একটু হাসলেন হালকা করে—'তুমি এসে গেছো? হ্যাঁ, তাই তো কথা ছিল। তুমি আসবে বলেছিলে...'

'এসে গেছে কী? সেই তখন থেকে এসে বসে আছে মেয়েটা? কলেজ নেই ওর? কাজকম্মো নেই? তোমার মতো রিটায়ার্ড নাকি?' ঝাঁঝালো গলায় গিন্নি তীক্ষ্ণ তখনও— 'কী যে ভীমরতি এই বুড়ো বয়সে? সবাইকে নাজেহাল করে ছেড়েছে এক দুপুরেই। শুধু কবিতা কেন? বাবলিও তো এসে পড়বে এক্ষুনি। এই এল বলে...'

'বাবলি? বাবলি আসবে কেন? চমকে তাকলেন শিবনাথ—'ও তো অফিসে বেরিয়েছে সকালবেলা।'

'সে তো বেরিয়েছে।'

'তাহলে?'

'কী যে কাণ্ড করে বসে আছো, মাথামুণ্ডু আছে কিছু?' চাঁছাছোলা ভ্রূকুটি শিবানীর— 'মেয়েটা এই ভরদুপুরবেলা এসে বলল, সোদপুর য়্যাওনি। মাঝরাস্তায় কোথায় নাকি আটকে আছো। ওর কাছে শুনে আমি তো পাগলের মতো এ-ঘর-ও-ঘর করছি তখন থেকে। কী করব? বাবলির আপিসে টেলিফোন করলাম। ও-ছাই ছেলেও সে আপিসে নেই, বেরিয়ে গেছে...'

'সে যাক গে, ও-নিয়ে ভাবছেন কেন এত? খবর তো পেয়ে গেছে। নিজেই চলে আসবে। নয়তো টেলিফোন করবে। আপনি বসুন না একটু। বসুন এখানে। এই রোদ্দুরে ঘেমে নেয়ে এসেছেন। রেস্ট নিন...' মাথা নুয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে-মেয়ে। চোখ তুলল। হাসল আলতো করে। যে-হাসিতে সিলিংয়ের ঝালরে হিরের ধাঁচে কাচের টুকরোগুলো একসঙ্গে দোল খায় হালকা বাতাসে। মৃদুতায় শান্ত গলায় স্বর—'আমি পেজারে কল দিয়েছি। রিংব্যাক করেছে একটু আগে...'

'কী বলল?'

'ট্যাকসি চেপে বাবু এক্ষুনি যাচ্ছেন বাপকে খুঁজতে...' শিবানী একইরকম খরখরে। পিঠের আঁচল টেনে ঘষে ঘষে মুখের ছালচামড়া ছিঁড়ে তোলার খিঁচুনিতে—'বলো দেখি, কী ভজকট পাকিয়ে দিয়েছ সবটায়। এই রোদে-রোদে কোথায় ঘুরছে ছেলেটা?'

বিহ্বল শিবনাথ—'আমাকে খুঁজছে? কোথায়?'

'হাজরার মোড়ে কী নাকি হয়েছে? তাই তো বলেছ কবিতাকে।'

অস্থিরচিত্ত খেয়ালিপনার দায়। ভোগান্তিটা শুধু তার একার নয়, ওদের সকলেরই। কোনো সাফাই নেই। কোনো কথাই চলতে পারে না এরপর। কিংবা সাজানোটা প্রয়োজনের বাইরে কেউই আর কারুর কথা শুনতে চায় না আজকাল। বধির ঘরের মানুষগুলোও। তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু একটা ফিরে পেতে চেয়েছিলেন নিজের দিশেহারায়। এবং তাৎক্ষণিকের ভ্রষ্ট আক্ষেপটুকু যদি এতটাই মতিভ্রম, নিজের ঘরে ফিরে এসে অসহায়ভাবে তাকালেন এপাশ-ওপাশ। অতিথি আপ্যায়নের সোফাসেট, প্যারিস প্লাস্টারের মসৃণ দেয়ালে নামিদামি শিল্পীদের গোটাকয়েক ছবির প্রিন্ট সুন্দর করে বাঁধানো। দেয়ালে দেয়ালে শৌখিন ওয়ালল্যাম্প, সিলিংয়ে পাখা দু-প্রান্তে দুটো। মধ্যবর্তী অবস্থানে মাঝারি মাপের সুশোভন ঝালর। ওপাশে একটু আড়াল ঢেকে খাবারের টেবিল, রঙিন টিভি, ফ্রিজ, বেসিনে সাহেবি দস্তুর, বাথরুমের ধার ঘেঁষে দেয়ালের খাঁজে মাঝারি মাপের ওয়াশিং মেশিন। সবই বাবলির শখ-সাধ। নিজেরই রোজগারে নিজেদের সাজিয়ে তোলার নাট্যমঞ্চে জীবনযাপন নয়। জীবনের প্রদর্শনী। জাতে-ওঠা মধ্যবিত্তের শোভনশোভায় জীবন যেখানে শেষ পূর্ণতায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়, কোনো ফাঁকি থাকে না তার নির্বাচনে। শিবনাথ তাকিয়ে থাকেন স্নেহময় আর্দ্রতায়। খুব একটা রূপসি হয়তো নয়। কুরূপাও কেউ বলবে না নির্ঘাত। স্বভাবে নম্রতায় মিশুভাবে বাড়তি কিছু একটা আছে অবশ্যই। নিশ্চিতই সুন্দরী। একহারা ছিমছাম চেহারার সজীবতায় কচিকাচা মুখে দীর্ঘায়ত কাচের ফ্রেমে টলমল একজোড়া চোখের চাহনি বুঝি নিরুচ্চারেই অনেক কথা বলে। শিবনাথ জানেন, যা ওদের নিজেদের বোঝাপড়া, ওদের নিভৃত সংলাপ, সে-ভাষা চেনার জন্যে অনেক যুগ আগেই অতীত হয়ে গেছেন। শস্যবীজের সঙ্গে মৃত্তিকার যে গোপন সখ্য, অভিভাবক চাষি তার হদিস বোঝে না।

'আঃ হচ্ছেটা কী ছাই? ওভাবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দেখছ কী হাঁ করে?'

শিবনাথ কেঁপে উঠলেন—'ননাহ্, কিছু না...'

'কিছু না তো টেলিফোন করে ডেকে এনেছ ওকে? কেন ডেকেছ, কী বলতে, কিছু একটা করো। বেচারি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার জন্যে? কোথায় যেতে হবে? ওকেও তো বেরুতে হবে এক্ষুনি...'

স্ত্রীর আচরণে এক ধরনের মৃদু সন্ত্রাস ছিল। কী বলবেন শিবনাথ? বলার কথা ছিল না কিছু। অথচ একটি মেয়েকে ঘরে ডেকে এনে অনেকটাই বিব্রত করে ঘন সান্নিধ্যের উত্তাপে কিছু বলতে না-পারার ধ্বনিপুঞ্জই গাঢ়তর হয়ে উঠতে থাকে নির্বাক নিষ্পলকে। পাগলামিটা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওদের কাছে। নিজের ঘরের দিকে নিঃশব্দে পা বাড়িয়ে আচমকা আটকে যেতে হয়।

বিনীত সম্ভ্রমে নিঝুম দাঁড়িয়ে ছিল সে-মেয়ে। হঠাৎই সচকিত। সহজ হাসিতে—'না না, সে-কিছু না। আমার জন্যে ভাববেন না। উনি এত টায়ার্ড! একটু রেস্ট নিন। তারপর না হয়...'

'হ্যাঁ, সেই থেকে আমিও তো বলে যাচ্ছি ছাই। শোনে কে?' একরাশ বিরক্তির ঝাঁকে উত্যক্ত শিবানী। মুখচোখের বিকারে—'রোদে-রোদে তেতেপুড়ে এসেছে! ঘরে

গিয়ে দেখো না কী হয়েছে চেহারাটা। হাতমুখ ধুয়ে জিরোও না খানিকটা। ঘুমোও একটু। আমি চা করে দিচ্ছি...'

সরাসরি তাকালেন শিবনাথ। এতটুকু ফ্ল্যাটের খাঁচায় প্রসারিত দৃষ্টির আঙিনাও খুব বড়ো নয়। যতই স্মার্ট আর শিক্ষার অভিমান থাক, এ-বাড়িতে এতটা খোলামেলায় দুই বুড়োবুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় কিছুটা সংকোচ থাকতেই পারে ওর। পৃথিবীর আনতনয়না কোনো কন্যা নানাবিধ বর্ণের ছটায় বুঝি-বা নিজেদেরই সেচনেসিঞ্চনে বড়ো হয়ে ওঠা কোনো পুষ্পিত বৃক্ষেরই আদল, যে ফুল দেবে, সৌরভ দেবে, স্নিগ্ধতা দেবে জীবনের পড়ন্ত বেলায়? থিরথির থিরথির মৃদু কম্পন ছিল জরাক্রান্ত দেহে রক্তে-শিরায়। বাতিল হয়ে ওঠা পুরোনো ক্যালেন্ডারে ডিসেম্বরের শেষ তারিখ চিনে নিতে চায় দেয়ালের একই পেরেকে ঝুলবে যে-নতুন বর্ষপঞ্জি, তার দিন আর রাতগুলো, তার রংছবি সংখ্যাশব্দমালা। কেমন হবে ওদের নতুন বৎসর? আরও আরও অসংখ্য বর্ষকাল, দীর্ঘ তেপান্তর?

রান্নাঘরের দিকেই চলে যাচ্ছিলেন শিবানী। বোধ হয় চায়ের জল চাপাতেই। মেয়েটি ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছে।

বন্ধুর হাত? পলকহীন তাকিয়ে থাকায় অস্বস্তি ছিল। আত্মজা নয় আত্মায় নয়। আপন কন্যা হয়ে ওঠার জন্যে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হওয়া এখন যদি শুধু সময়ের প্রতীক্ষা, আনুষ্ঠানিকভাবে বাকিটুকু সম্পূর্ণ করে তোলার আগে এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না, স্নেহসিক্ত হাত বাড়িয়ে পরের মেয়েকে কেমন করে টেনে নিতে হয় নিজের বুকে। বন্ধুর হাত চিনে নিতে কোনো ভুল হয়নি তো তোমাদের? ঠিক জানো? স্পষ্ট করে জেনেছ নিজেদের? বাইরের রাস্তায় পায়ে পায়ে অনেক খোদল মা? শুধুই চোরাবালি।

কথাগুলো বলা হয় না। বলতে চাওয়া বা বলতে না-পাবার নিবুচ্চারে চাপ থাকে স্নায়ুতে, বুকের ভারে। হয়তো টলে উঠেছিলেন একটু। হেলে পড়তে পড়তে দেয়ালটা ধরে ফেলেছিলেন হাত বাড়িয়ে। হকচকানিতে বিহ্বল সে-মেয়ে বোধহয় ঘাবড়েই গিয়েছিল প্রথম ঝটকায় এবং চকিতেই গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরল দুহাতের শক্ত চাপে। আর্তরবে কাকিমাকে জরুরি এস.ও.এস।

তড়িঘড়ি ছুটে এসেছে শিবানী—'কী হল? এমন করছ কেন? কী হয়েছে বলবে তো ছাই। শরীর খারাপ লাগছে ঘরে গিয়ে শোবে তো আগে। তখন থেকে বলছি... ডাক্তার ডাকব?'

ছোটো করে হাসলেন শিবনাথ। কী বলছেন গিন্নি অথবা কেন অনর্থপাত? কোনো হুঁশ নেই। এবং মেয়েটি যখন তাঁকে দুটো হাতে আগলে ধরে ওর পক্ষে যতটা সম্ভব সব শক্তি নিয়ে কোথাও বসিয়ে দিতে চাইছে সামনের সোফায়, তিনি নিজেও হাত বাড়ালেন বাৎসল্যে মমতায়। পৃথিবীর মাটিকে আঁকড়ে ধরার শেষ প্রণিপাত। বাঁ-হাতটা ওর পিঠে ছড়িয়ে রেখে ডানহাতটা ছোঁয়ালেন মাথায়। টানটান-বাঁধা একরাশ ঘন কালো চুল দীর্ঘ এক বিনুনি হয়ে কোথায় গড়িয়ে পড়েছে পেছনের দিকে। ঘাসের আদর নিকোনোর ভঙ্গিতেই তাঁর হাত, হাতের পাতা, কররেখা লগ্নিত টানে মসৃণ কেশগুচ্ছ ছুঁয়ে যেতে থাকে। যেন অনেক দূর বিস্তৃত সময়ের মাঠে আরও একটা শতাব্দীকে ছুঁয়ে

থেকে নিজেরই দীর্ঘযাত্রা—অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। শুভ হোক শুভ হোক। কল্যাণ হোক তোমাদের...

ধ্বনিত হয় না মন্ত্রের উচ্চারণ। ফুরিয়েও যায় না। ঘনিষ্ঠ প্রাণের আকুতি বুঝে নির্বচনেও অনশ্বর থাকে কোথাও। থেকেই যায়। নিজেকে আবার ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে ফিরে পেয়ে শিথিল পায়ে ঘরের দিকে এগোলেন শিবনাথ। মেয়েটির কাঁধে হাত থাকে। শান্ত শীতলতায় বিনম্র সে-মেয়ে। শিবানীও থাকে পাশে পাশে। পুরো পাগলামিটাই হয়তো আরও ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে ওদের কাছে। বায়ুগ্রস্ত বৃদ্ধের অবোধ বিকার। □

দেশের কথা

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আমার পিতামহ ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। নোয়াখালি জেলার দত্তপাড়া ইশকুলে ভূগোল পড়াতেন। স্বাধীনতা মানে দেশভাগের পর আমার দাদু-ঠাকুমাদের এধারে চলে আসতে হয়েছিল। আমার জন্ম স্বাধীনতার বেশ কযেক বছর পর।

ছোটোবেলায় দাদুর কাছেই পড়তাম। ভূগোলটা খুব ভালো পড়াতেন। ম্যাপ আঁকার নিয়মটা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিযেছিলেন। ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকার সময় বলতেন ইংল্যান্ডের ম্যাপ আমেরিকার ম্যাপ আমি একটানে আঁইক্যা দিতে পারি। বহুবছরের অইভ্যাস। ভারতের ম্যাপও নিমেষেব মধ্যেই আঁইক্যা দিতে পারতাম, ব্ল্যাকবোর্ডে কত আঁকছি, ফরটিসেভেনের পব তো সেই অভ্যাসেই কাম হয না। ইন্ডিয়ার শরীরের থিক্যা যে মাংসগুলি খুবলাইযা লইল সেই খুবলাইযা লওযা মাংস বাদ দিয়া বাকিটা আঁকতে হয়। নখের আঁচড়ের দাগগুলি ঠিকমতো আঁকতে পারি না এখনও।

বাংলাদেশ হাইকমিশনের ওয়েটিং রুমের দেওয়ালে বাংলাদেশের ম্যাপটার সামনে দাঁড়িযে দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদুর কাছ থেকে শোনা হারিয়ে যাওযা শব্দগুলিকে খুঁজতে লাগলাম। এই তো চাঁদপুর। ওই তো মতলব, মতলবেব দই-এর কথা খুব শুনতাম যতবার যত ভালো দই এনেছি, গাঙ্গুরাম, জলযোগ, যেখান থেকেই হোক, মতলবের দইয়ের কাছে নাকি কিছু নয। ছোটোবেলায দাদুর হাত ধরে বিয়ে বাড়িটারি নেমতন্ন খেতে যেতাম। ওখানে খাঁটি নোযাখালি ভাষায কথাবার্তা হত। কোনো সবজিতেই দেশের বাড়ির সবজির স্বাদ পেতেন না ওঁরা, কোনো মাছেই না, আর শেষ পাতে দই এলে সমবেত আপশোষ শুনতাম মতলব, হায় মতলব। গোযালন্দ দেখলাম। ওখান থেকেই স্টিমারে করে চাঁদপুর নামতে হত। চাঁদপুর থেকে কীভাবে যেন দত্তপাড়া যেতে হত। আমি দত্তপাড়া গ্রাম নামটা ওখানে খুঁজে পেলাম না। লক্ষ্মীপুর খুঁজে পেলাম। ওটা আমার মামার বাড়ি। দেশ ভাগের পরও আমার মায়ের বাবা-মা ওখানেই থাকতেন। আমার মায়ের বাবা, দাদামশাই মাঝে মাঝে আসতেন। ওঁকে আমরা বলতাম পাকিস্তানি দাদু। একটা পোঁটলার ভিতর থেকে বার করা একটা রোল করা জিনিসের প্রতি আমার প্রতীক্ষা থাকত। ওটা হল আমসত্ত্ব। আমসত্ত্বের সারা গায়ে ফুটে থাকতো একটা নকশা। যে পাটির উপর আমের রস মাখিয়ে আমসত্ত্ব তৈরী করা হত, সেই শীতল পাটির নকসাটা ফুটে উঠত শুকনো আমসত্ত্বের সারা গায়ে। এই আমসত্ত্ব বয়ে আনত দেশের বাড়ির ছাপ। আমার মা ছাপা পাটিটার গাযে হাত বুলোত, ফেলে আসা গ্রামটার গায়েই হাত বুলোত বোধহয়।

আমার দাদু আর দাদামশাই গল্প করতেন। ওরা বলত দেশের বাড়ির গল্প আমরা বলতাম ওসব পাকিস্তানের গল্প। ওদের গল্পের মধ্যে জিন্না-গান্ধী থাকত, শরৎ বোস ফজলুল হক থাকত, গোলাম সরওয়ারের নাম করতে গিয়ে ওরা মুখ বিকৃত করত। সেই নাকি নোয়াখালির দাঙ্গার নেতৃত্বে ছিল। ওদের কথার মধ্যে থাকত মতিচুর খই, 'মূলার অম্বল', 'টাটকিনি মাছ', 'মতলবের দই'। ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো খুঁজছিলাম।

বাংলাদেশ হাইকমিশনে যেতে হয়েছিল একটা ভিসার ব্যাপারে। জলের আর্সেনিক নিয়ে একটা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই ব্যাপারেই যেতে হয়েছিল হাইকমিশনে। ভিসা সহজেই পেয়ে গেলাম। ট্রেনে বনগাঁ গিয়ে বর্ডার পেরিয়ে বেনাপোল থেকে বাসে খুলনা যাওয়া খুবই সহজ। সেরকমই ঠিক করলাম। আমার দাদু অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন, ঠাকুরমা এখনও আছেন। নব্বই বছর বয়েস, শয্যাশায়ী, ঠাকুমা একসময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন। এখনকার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। গত দুমাস ধরে পায়খানা পেচ্ছাপ বিছানাতেই। যখন-তখন অবস্থা। এই অবস্থাতেই আমাকে যেতে হবে। যাওয়াটা মিস করতে চাই না। মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনাম থেকেও লোক আসবে। আর্সেনিক সমস্যা ওরা কীভাবে মোকাবিলা করছে শোনা যাবে। ঠাকুরমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলাম ঠাকুমা, বাংলাদেশ যাচ্ছি, বক্তৃতা দিতে, দেশের বাড়ি, দেশের বাড়ি। ঠাকুমা মুখটা যেন হাসি হাসি হল। কী যেন বলার চেষ্টা করল। আমার কানটা ঠাকুরমার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। মনে হল যেন বলছে জব্বর। জব্বর।

জব্বর নামটা একটু চেনা চেনা। জব্বর আলী। দাদু জব্বর আলী নামটা তুলে গালমন্দ করতেন, যতদূর মনে পড়ে, ঠাকুরমা মৃদু প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলে দাদু রেগে যেতেন। দাদু ঠাকুরমার মধ্যে যখন পিওর নোয়াখালি ভাষায় ঝগড়াঝাটি হত, আমরা ভাইবোনেরা বেশ উপভোগ করতাম। দাদু ঠাকুরমা ঝগড়ার মধ্যে জব্বর আলী নামটা প্রায়ই শুনতাম মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরমা কী বলতে চাইছে? জব্বর আলীকে কিছু খবর দিতে চাইছে, নাকি জব্বর আলীর খবর আনতে বলছে, নাকি অন্য কোনও ব্যাপার?

আমার বাবার বয়স এখন চুয়াত্তর। বাবার কাছ থেকে ওই বাংলাদেশের গল্প খুব একটা শুনিনি।

আমার বাবা যদিও দত্তপাড়া স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছিলেন, আর আই. এস. সি ঢাকা থেকে। বি.এস.সি পড়তে কলকাতা চলে এসেছিলেন। হোস্টেলে থেকে পড়তে হত। চাকরি জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। বদলির চাকরি ছিল। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে আমরা থাকতাম, বাবা বাইরে বাইরে ঘুরতেন। বাবার কাছে রূপসা, মধুমতী, মেঘনা, ডাকাত্তিয়া নদীর কথা যত শুনেছি. তারচেয়ে বেশি শুনেছি শতদ্রু ঝিলম, তুঙ্গাভদ্রা, বেত্রবতীর কথা। মেঘতাবুরু, অম্বিকাপুর, ছত্তিশগড় বাদাম-পাহাড় যত শুনেছি ঢাকা ময়মনসিংহ তত শুনিনি। তবে বাবার কাছে দত্তপাড়া ইশকুলের ফুটবল মাঠ, অঙ্কের টিচার গোলাম মুস্তাফা, বহুরূপী আনার আলী, এদের

কথা কিছু কিছু শুনেছি। মনে হয়, দেশ ভাগের ব্যথা আমার বাবার বুকে ততটা বাজেনি। কারণ বাবার বোধহয় স্বপ্নই ছিল গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসার, আর শহরেই যদি আসবেন, তো ঢাকা কেন, কলকাতা। যখন দেশভাগ হল, বাবার তখন একুশ বছর বয়েস। রিপন কলেজের হোস্টেলে থাকেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাস, বাবা অবাক হয়ে দেখলেন একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা অবস্থায় আমার দাদু হোস্টেলের দরজা ধাক্কা দিচ্ছেন, রাত দশটার সময়।

বাবা জানতেন দেশে দাঙ্গা চলছে। গান্ধীজি নোয়াখালি যাবেন, কাগজে পড়েছেন, খুবই চিন্তায় ছিলেন আমার বাবা। কলকাতার অবস্থাও খুব সুবিধের নয়। আগস্ট মাসের কলকাতার দাঙ্গার জের চলছে তখনও। দাদুকে দেখে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন-আপনে একা আসছেন, মা কোই? দাদু নাকি তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। বলেছিলেন-তর মারে আনতে পারলাম না, আমারে তুই মাইর‍্যা ফালা। আমার ঠাকুরমা পরে এসেছিলেন। দিন দশেক পরে। এক মুসলমান পরিবারের আশ্রয় পেয়েছিলেন। তবে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন জানে ঠাকুরমাকে মুসলমানেরা কেড়ে রেখে দিয়েছিল, সাতদিন ধরে অত্যাচারিতা হবার পর কোনোরকমে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আমার ঠাকুরমার বয়স তখন ৩৮ বছর ছিল। খুব বেশি বয়স নয়। আজকাল এই বয়েসে অনেক মেয়ে বিয়ে করে।

আমার বাবা জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বেশ একটা উঁচু পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন। রিটায়ার করার সময় ডেপুটি ডাইরেক্টার ছিলেন। দমদম পার্কে আমাদের দোতলা বাড়ি, বাড়িতে যুঁই লতিয়েছে, একটা লোমওলা কুকুরও আছে, প্যাপিলন জাতের। আমার মা যখন বেঁচেছিলেন, কচুরলতি, কচুর শাক, ইলিশ মাছের পাতুরি, থোড়ঘন্ট, এসব খেতাম। এখন হয় না। আমার স্ত্রী এলাহাবাদের মেয়ে। ওরা প্রবাসী বাঙালি। ও পালক-পনির ভালোবাসে। চানা মশালা ভালোবাসে। মাঝে মধ্যে শখ করে রান্না করে। এমনিতে আমাদের বাড়িতে রান্নার লোক আছে। ও কচুরলতি-টতির ঝামেলায় যায় না।

আমার বাবার ঘরে একটা আলাদা টি ভি আছে। একা থাকেন, মা মারা গেছেন বছর তিনেক হয়ে গেল। মা খুব বাংলাদেশ টি ভি দেখতেন। বলতেন, মন্ত্রীরা বক্তৃতা দিতে যায়। তখন দেখায়, মন্ত্রীরা কত জায়গায় যায়, লক্ষ্মীপুরে যায় না ক্যান, তাইলে লক্ষ্মীপুরটা একবার দেখতাম। এখন বাবা ওই ঘরে সারাদিন একা থাকেন। বাংলাদেশ টিভি দেখেন কি না কে জানে যদি দত্তপাড়া স্কুলটা, স্কুলের মাঠটা একবার দেখা যায়...।

আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—জব্বর আলি কে গো বাবা।

বাবা বললেন, জব্বর আলী আমাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকত। শুনেছি সেই এখন আমাদের ঘরবাড়ি দখল করে আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ঠাকুর্মা তাহলে জব্বরের কথা কেন বললেন। তবে কি বলতে চাইছে ভিটে বাড়িটা জব্বর কতটা দখল করে রেখেছে সেটাই দেখে আসতে?

দাদুর একটা সুটকেস ছিল। দাদু মারা গেছেন, বছর পঁচিশ হয়ে গেল। ওই সুটকেসে কিছু কাগজপত্র ছিল। একটা খাতা, ডায়েরি, টুকরো কাগজ, চিঠিপত্র, সবই

একটা পলিথিন পেপারে মুড়ে আমার কাচের আলমারিটার একটা তাকে রেখে দিয়েছিলাম। তখন একটু খুলেছিলাম, ভাল করে পড়িনি, এখন আমার মনে হল বাংলাদেশ যাবার আগে কাগজপত্রগুলো একটু দেখি।

দেখি একটা খাতা। খাতায় লেখা-বাস্তুহারা কাব্য। হে বরেণ্য কবি নবীনচন্দ্র সেন, আপনার আর্শীবাদ ভিক্ষা করিয়া এই কাব্য শুরু করিতেছি। এই কাব্যে থাকিবে কিরূপে জন্মভূমি হইতে পলাইয়া আসিতে হইল, সেই দুঃখের বিবরণ।

প্রথম সর্গ, সন ১৯৪৬

জিগির তুলেছে জিন্না চাই পাকিস্তান।
এইবার দেশ বুঝি হবে খান খান।
আসিল ক্রিপস সাহেব ভারত মাটিতে।
আলাপ আলোচনা হল স্বাধীনতা দিতে।
জিন্না কহে পাকিস্তান, নচেত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।
তারপরই পালটে গেল আমাদের গ্রাম।
দাদুর একটু আধটু কাব্যরোগ ছিল জানতাম।

ক্লাস সিক্সে যখন স্কুল ম্যাগাজিনে আমার একটা কবিতা বেরুল, দাদু খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্র এই প্রতিভা আসে। তখন খাতা খুলে বলেছিলেন তবে শোন। কী পড়েছিলেন মনে নেই। এখন মনে হচ্ছে বোধহয় এই অংশটাই শুনিয়েছিলেন সেদিন—উপরে ব্র্যাকেটে লেখা-এই অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত।

পড়তে থাকি :

সন্ধি যবে করে কেহ অন্যায়ের সনে
মনুষ্যত্ব তখনি শেষ। ভাবি দেখ মনে
স্বার্থবুদ্ধি বেতাইল মুসলিম লিগ।
মনে পড়ে ১৯৪৬ অক্টোবর দশে
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা চন্দ্র আকাশে
সহসা প্রকম্পিত দত্তপাড়া গ্রাম
এ সময়ে আমি প্রমাদ গনিলাম
নারায়ে তকদীর ও আল্লাহ আকবর
আওয়াজ করিয়া আসে গোলাম সারওয়ার।
গ্রাম হল অবরুদ্ধ কান্দে হিন্দুগণ
লুণ্ঠণ অগ্নিযোগ এবং নারীহরণ
করিল কাহারা? যাহারা ছিল প্রতিবেশী
সামান্য স্বার্থবুদ্ধি হয় সর্বনাশী।
এ সময়ে জব্বার মোর ঘরেতে আসিল
পরিবার তরে মোরে লুঙ্গি খানি দিল।
কহিল এখনি যান, বসেক নৌকায়
দেরি করিলে প্রাণে বাঁচা হবে দায়।

আমার পত্নীকে তারা বোরখা পরাইল
কিন্তু তাহাকে মোর সঙ্গে নাহি দিল।
সঙ্গে লয়ে যাও বলে ক্রন্দিল সে নারী
কিন্তু তারও আগে মোর নৌকা দিল ছাড়ি।

এরকমভাবে অনেকটাই পড়ে বোঝা যাচ্ছে আমার দাদু ঠাকুরমার জন্য নৌকা থেকে লাফ দিয়ে সাঁতরে পাড়ে উঠতে চেয়েছিলেন কিন্তু নৌকোর অন্যরা বলেছিল কর্তা অস্থির হবেন না। এখন গ্রামের অবস্থা খারাপ। আমরা আপনার নুন খেয়েছি, আপনার কাছে আমাদের ছেলেরা পড়াশোনা করেছে, আপনার জান না বাঁচালে আমাদের গুনা হবে।

আফজল কহে 'স্যার, আপনে একটু শুনহ
আপনের জান না বাচাইলে হইবে গুনাহ।
ক্ষতি কিছু করিব না, ইহাই ইমান।
কিন্তু স্যার, এইবার রাজ করিবে মোছলমান।

দাদু কিন্তু বেশি লেখেননি। ধৈর্য শেষে হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কলকাতায় রিপন হোস্টেলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত রয়েছে।

দাদুর ওই খাতায় এরপর নানারকম ঠিকানা, অম্বল অ্যাসিডে-বিসম্যাগ ট্যাবলেট, হার্টের অসুবিধায় অর্জুন মাদার টিংচার, বিধান রায় রুগি দেখেন প্রতি সোম ও বুধবার সকাল দশটা হইতে, ডাক্তার নলিনীরঞ্জন কোনার ও ডাক্তার অমল রায়চৌধুরির ঠিকানা, এইসব, আর নানারকম মন্তব্য। যেমন, দেশ ভাগ না হইলে কি ইলেকট্রিকের আলো দেখিতাম?

গান্ধীজি কি দেশ ভাগ রোধ করিতে আর একবার অনশনে বসিতে পারিতেন না?

পাঞ্জাবে জন বিনিময় হইল, বাংলায় হইল না, নেহেরু কী জবাব দিবেন?

রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন, আমি কী পরীক্ষা করিব? খোকার মা দশ দিন মোছলমান ঘরে ছিল। জব্বার কি ছাড়িয়া দিযাছে?

একগোছা চিঠি। এখানেও জব্বার। চিঠিগুলি এরকম।

৬ই বৈশাখ ১৩৫৭

পরম পূজনীয় ঠাকুর ভাই,

আপনে আমার সাতকুটি আদাব মানিবেন। আমার পূর্ব চিঠির জবাব না পাইয়া চিন্তা যুক্ত আছি। এই পত্রপাট মাত্র আপনাদের কোশল সংবাদ জানাইয়া সুকি করিবেন। আজ দিন কতেক হয় আমনের বাস্তু ঘর মেরামত করিয়াছি। আটচালা ঘরের পালার গোড়ায় মাটি আছিল না দেখিয়া সমস্ত পালার গোড়ায় মাটি দিয়াছি। এবং আলকেত্রা দিয়াছি। সবাই বলে আলকেত্রা দিলে উলি পোকা উপরে উঠিবে না। এই সব করি দেখিয়া অনেকে বলে তোর কী সাধ্য? কেন করস? কিন্তু চোক্ষের সামনে উলিপোকা ঘর নষ্ট করিবে কি রূপে দেখিব। আপনার গাছের সুপারী পকিয়াছিল। সুপারী বেচিয়া ৩৫ টাকা মসজিদে দিয়াছি। পুকুরে জাল ফেলিয়া সমস্ত মাছ কাদের মিঞা লৈয়া গেছে। আর বোদ হয় আমনের ঘরবাড়ি রাখা যাইবে না অন্যালোকে দখল করিবে

কেন, আপনি আমাকেই লিখাপড়ি করিয়া দেন। আমনের ঘর কখান সমেত ভিটা আর দুইকানি জমি আমি কিনিয়া লইব। ইচ্ছা করিলে আমি দখল করিয়া নিতে পারিতাম, কিন্তু পাকিস্তান হইয়াছে বৈলা হিন্দুর সম্পত্তি লুট করিয়া খাওয়া ইমানদারীর কাজ নহে। খোদার ফজলে আমি টাকা দিয়াই নিব। আমি সাকুল্যে দশ হাজার দিব। স্বীকার যাইতেছি উহা বাজার দরের কিছু কম। কিন্তু আপনি খোঁজ নিয়া দেখিবেন সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর ৩ কানি জমি, পুকুর ও ভিটা বাড়ি দশ হাজারে নুরুল মিঞা কিনিয়াছে। আমনের উপর আমার দাবি আছে। আমি আপনের এবং আমনের পরিবারে জানে বাঁচাইয়াছিলাম আশা করি ইহা মিত্যু পৈয্যন্ত ভুলিবেন না। আর বিশেষ কি, মঙ্গালদানে সুকি করিবেন। ইতি

জব্বার আলী

পুঃ এতদিন হিন্দু যাহা আজ্ঞা দিয়াছে মোছলমানে পালন করিয়াছে। এখন মোছলমানের কথা হিন্দুর শুনিতে হইবে।

আর একটা চিঠি ঃ-

মান্যবর মাস্টার মহাশয়, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

বহুকষ্টে আপনার কলিকাতার বাসার ঠিকানা যোগাড় করিয়াছি। আমার এই পত্র পাই নিশ্চই খুব অবাক হইতেছেন। আমনেরা চলিয়া যাইবার পর গ্রাম খাঁ খাঁ করিতেছে। ইশকুলে নিয়ম মত ঘন্টা বাজে ঠিকই কিন্তু ক্লাস হয় না। ভালো কথা, লোক মুখে শুনিলাম জব্বর আলী আমনের ভিটাবাড়ি কিনতে চায়। সে নাকি দশ হাজার টাকা দিবে বলিযাছে। ছ্যার, সুজুগ পাইয়া সে আমনের ঠকাইয়া জমি নিতে চায়। এই জমি হালাল জমি হইবে না। সে কি তাহা বুজে না? আমি ১৫০০০ টাকা দর দিলাম। এই টাকা জব্বার দিতে পারিবে না। আপনি রাজি হইলে পত্রপাঠ জানাইবেন। আমি কলকাতা গিয়া সিকি টাকা বায়না করিয়া আসিব। দেরি করিলে জানিবেন আপনার জমিতে জব্বার হাল দিবে। আপনার নতুন দেশে কিরূপ আছেন? মঙ্গালদানে সুকি করিবেন। আমার শতকুটি আদাব জানিবেন।

ইতি

আবদুল মমিম।

পুঃ দুই দেশ যদি আবার এক হয় ইনসাল্লা, আমনে যদি ফিরিয়া আসেন, আমি জমি ফিরত দিব জবান দিলাম।

এরকম গোটা বিশেক চিঠি। সবই ১৩৫৭ থেকে ১৩৬০ এর মধ্যে লেখা। জব্বার বলছে। আবদুলকে দিও না, আমায় দাও, প্রচ্ছন্ন হুমকিও রয়েছে আবার আব্দুল বলেছে জব্বারকে নয়, আমাকে দাও, আমি বেশি দাম দেব। যদিও আব্দুলের অফার করা দামও বাজার দরের তুলনায় বেশ কম। শেষের দিকে চিঠিগুলি পড়লে সম্পত্তি বেহাত হওয়ার ইতিবৃত্ত জানা যায়। জব্বার লিখছে-কর্ত্তা, কয়দিন আগে একটি কুগা পোষ্ট করিয়াছি, ইহাতে সরকারি নোটিশ ছিল। আমনের চৌকিদারি টেক্স, খাজনা ব্যাবাক বাকি পড়িয়াছে দেখিয়া সরকার নিলামের নুটিশ দিয়াছে....।

আবদুলের চিঠিতে জানা যায় নিলামে জব্বারই কিনে নিয়েছে।

....ছ্যার, আপনি আমার কথা শুনিলেন না। জব্বর মিঞা নিলামের দিন গুন্ডা লাগাইয়া কাহাকেও আসিতে দিল না। নিজের লোকই নিলামের সময় ছিল। কেউই জব্বারের চেয়ে বেশি ডাকিল না। সবই শট্‌করা ছিল। আর কী করিব। আমাকে জমি দিলেন না, এই আপসোস মিত্যু পৈর্যন্ত রহিবে। ইতি আব্দুল।

চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে আমি অবাক হয়ে লক্ষ করি যে সব চিঠিরই হাতের লেখা এক। চিঠি লিখছে জাব্বার কিম্বা আব্দুল, পরস্পরের বিরোধী পক্ষ, ভিন্ন স্বার্থ। কিন্তু হাতের লেখা এক কী করে হয়? খুব ভালো করে লক্ষ করলাম, কয়েকটি বিশেষ অক্ষর মেলালাম। একই লোকের লেখা মনে হল। বেশ রহস্য রহস্য ব্যাপার। বাবাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বিশেষ লাভ হল না। আব্দুলকে চিনতে পারল না। তবে জব্বারকে ভালোই চেনে। ভালো স্বাস্থ্য। দাদুর চেয়ে বয়সে বেশ ছোটোই। জলপড়া দিত। অনেক লোক আসত ওই 'পানিপড়া' নিতে।

দাদুর ওই খাতাতে আরও কিছু মন্তব্য পড়া গেল যেমন—

জব্বর ভাবিয়াছে কী? সে কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করিতে চায়?

আবদুল বড়োলোক হইতে পারে, টাকা বেশি দিতে চায়, কিন্তু এক লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি মাত্র পনেরো হাজার, ভাবিতেছে খুব বেশি দিতেছে? আবদুলকে দিব না। দিলে সে আমাদের সব গাছ করিয়া নৌকা বানাইবে। সে নৌকার ব্যাপারি।

জব্বার বারংবার ওই কাহিনি বলিয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিতে চায়।

যাবার আগে ওই জব্বার এবং আবদুলের কয়েকটি চিঠি যত্ন করে খামে ভরে ব্যাগে পুরলাম বাবাকে বললাম সময় করতে পারলে আমাদের জন্মভিটেটা একবার দেখে আসব। বাবা বললেন পারিস তো দত্তপাড়া হাইস্কুলের একটা ছবি তুলে আনিস। যাবার আগে ঠাকুরমাকে বললাম, যাচ্ছি। ঠাকুরমা আমার হাতটা চেপে ধরলেন, ঠোঁটটা খুলে গেল, কিছু বলতে চান, মুখের কাছে কান নিলাম, পাউডারের গন্ধের সঙ্গে স্মিত শব্দ জব্বর। জব্বর।

বাংলাদেশে স্বাগত। বর্ডারের ওপাশে বাংলা লেখা। থ্রিল হল। বরং বাংলাতেই বলি উত্তেজনা। খুলনা থেকে গাড়ি এসেছিল, লোক এসেছিল রিসিভ করতে, মানে স্বাগত জানাতে। গাড়িতে ক্যাসেটে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলের গান, হোটেলে কুচো মাছের চচ্চড়ি খেলাম, যশোরে মধুসুইটস এ অপূর্ব স্বাদ। রাস্তাগুলি দারুন গাছে ছাওয়া। সত্যিই শ্যামল, খুলনার ভৈরব নদী দেখলাম, নদীতে স্টিমার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোটিও দেখলাম, নদীর পাড়ে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র থাকতেন। যে গাছের তলায় বঙ্কিমচন্দ্র বসতে ভালোবাসতেন সেখানে একটি বেদী, কবিতা লেখা বেশ থ্রিল, মানে উত্তেজনা নয়, হিল্লোল সারাশরীরে হিল্লোল।

সেমিনার শেষ হল। বাংলাদেশের মাটির উপরের জলভান্ডার এত বেশি যে, যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তবে মাটির তলায় জল কম ব্যবহার করলেই চলে। ও ব্যাপারে এখন আর যাচ্ছি না। ওই সেমিনারে একজন বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যার বাড়ি নোয়াখালি জেলার কোমপুরে। বাংলাদেশীর আতিথেয়তার তুলনা মেলা ভার। ভদ্রলোকের নাম আব্দুল ফজল। আমার চেয়ে বছর দুয়েক আগের ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি। আমার পূর্বপুরুষের বাসস্থান নোয়াখালি জেলা শুনে উনি জোরাজোরি করলেন—ওঁর সঙ্গে যেতে হবে, কোমপুরে ওর বাড়িতে দুবেলা দাওয়াত নিয়ে তারপর শিকড়ের সন্ধানে যাওয়া যাবে। বাবার কাছ থেকে জেনেছিলাম আমাদের গ্রামে যেতে হলে চাঁদপুর থেকে স্টিমারে হরিহরপুরে নেমে পায়ে হেঁটে ৮ মাইল দূরে দত্তপাড়া গ্রাম। হরিহরপুর থেকে নৌকাতেও যাওয়া যেত। দত্তপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে তার নাম দয়াবতী। ওই নদীতে স্টিমার চলে না। নৌকা যায়। আমার দাদুকে পার করে দিয়েছিল দয়াবতী, আর ফেরত নেয়নি। আর একভাবে যাওয়া যেত—চাঁদপুর থেকে ট্রেনে সোনাইমুড়ি নেমে হাঁটা পথে চার মাইল। আব্দুল ফজল সাহেব বললেন—ওইসব বহুদিন আগেকার কথা। এখন চাঁদপুর থেকে রামগতি পর্যন্ত বাস চলে। দত্তপাড়ার পাশ দিয়েই সে রাস্তা। দত্তপাড়া আর সেই গ্রাম নাই। তাছাড়া দত্তপাড়া এখন আর নোয়াখালি জেলার মধ্যেই নাই। নতুন জেলা। লক্ষ্মীপুর। দত্তপাড়া লক্ষ্মীপুর জেলার মধ্যেই পড়েছে। ইস। মা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। মায়ে গ্রামের নামে জেলা, মায়ের গ্রামে নিশ্চয়ই এখন ডি এম বসেন, আর মায়ের গ্রামের আন্ডারেই বাবার গ্রাম।

খুলনা থেকে সকালে রওনা দিয়ে বিকেলে আব্দুল ফজলের বাড়ি পৌঁছলাম। কোমগঞ্জ। আতিথেয়তার কথা এখন থাক। শুধু শুঁটকি মাছের অপূর্ব ভর্তাটির কথা আর একবার মনে করি। ওঁর স্ত্রীর নাম মুক্তা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের খুব ফ্যান। সৌমিত্রের অভিনয় করা অনেক ছবির ভিডিয়ো ক্যাসেট আছে।

আব্দুল ফজলকে পরদিন সকালেই চলে যেতে হল চট্টগ্রামে। টেলিফোনে খবর এল ওর বড়দা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আব্দুল ফজল বলল—সরি, আপনার শিকড়ের সন্ধানের সাক্ষী থাকতে পারলাম না। উনি ওঁর গাড়িটা আমাকে দিলেন। ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিলেন—দত্তপাড়া হয়ে যেন চাঁদপুর পৌঁছে দেয় আমাকে। চাঁদপুর থেকে আমি ঢাকা যাব। রিকন্ডিশনড করা গাড়ি টয়াটো। টেপে যথারীতি বাংলা গান। রিমেক। ইন্দ্রনীল আর শ্রীকান্ত আচার্যের গান। ড্রাইভারের নাম ভাস্কর। বয়েস বছর পঁচিশ। প্রথমে ভেবেছিলাম হিন্দু। কথায় কথায় যখন বলল—দুর্নীতিটা যদি একটু কমানো যায়, ইনসাল্লা, বাংলাদেশেরে রুখন যাইব না। তখন বুঝলাম ছেলেটা মুসলমান।

মসৃণ রাস্তায়, রাস্তায় জঞ্জাল পড়ে নেই, জাতটা বেশ পরিচ্ছন্নতা শিখেছে। গঞ্জের ধারের ভ্যাট নিয়মিত পরিষ্কার হয়। বাসগুলির নাম—দুরন্ত, দুর্বার, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, বজ্রমানিক। পেট্রলপাম্পের নাম তরলসোনা, চায়ের ছোটো দোকানের নাম বিনোদন, পাটের গুদামের নাম সুবর্ণতন্তু। গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা দেখলাম। সমস্ত সাইনবোর্ড বাংলায়, গাড়ির নম্বর বাংলায়। আমার বেশ থ্রিল, মানে গর্ব হয়।

ড্রাইভারটি বলল, এই রাস্তায় মুনির চৌধুরীর বাড়ি। রাজাকারে মারছিল। আর ওই বাড়িতে গান্ধীজি ছিলেন তিন দিন। ড্রাইভারটিও নাট্যকার মুনির চৌধুরীর নাম জানে? ১৯৭১ সালে খুন করা হয়েছিল মুনির চৌধুরিকে। গান্ধীজির কথাও জানে? নোয়াখালির দাঙ্গার পর গান্ধীজি এসেছিলেন ৪৭-এর জানুয়ারি মাসে। একটু পরেই রাস্তার ধারে একটা পোস্ট, লেখা—দয়াবতী সেতু ১ কিলোমিটার।

এবার আমার গায়ে সত্যিই থ্রিল। থ্রিল কাঁটা ফুটে উঠছে। এই সেই নদী, নদী বেয়ে নাইয়র আসত। ব্রিজের গোড়ায় এসে ড্রাইভারকে বলি একটু আস্তে ভাই। নদীর ঘোলা জলে বয়ে যাওয়া একটা ছই ঢাকা নৌকা দেখলাম, ভিতরে লাল শাড়ি পরা আবহমান বউ।

ব্রিজটা পেরিয়ে ড্রাইভার দত্তপাড়া গ্রামটির কথা জিজ্ঞেস করে জানে—সামনেই বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। একটু পরেই দেখলাম। বাঁদিকে পিচ রাস্তাটা গত জন্মের দিকে চলে গেছে। একটু পরই দত্তপাড়া হাইস্কুল। স্থাপিত ১৮৯০, মাঠের এক কোণে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। স্কুলে ঘন্টা বেজে উঠল যেন তোপধ্বনি। স্কুলের প্রাচীরে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, সূর্যসেন, জসিমউদ্দিন, প্রীতিলতা এবং ঢাকার শহীদ মিনারের ছবি। এই স্কুলেই আমার পিতামহ তারাপদ চক্রবর্তী শিক্ষক ছিলেন। সেটা কি মনে রেখেছে? স্কুলের ছবি নিলাম। বাবা এলে কি একবার স্কুল মাঠে হাঁটতেন?

গাড়ি নিয়ে সামনে এগোই। বাড়ির দেওয়ালে রাজনৈতিক লিখন। নবিনুর সাইকেল মেরামতির সামনে কয়েকটা কমবয়েসি ছেলে, পাশেই হেকিমি দাওয়াখানা হেকিম—সৈয়দ ইদ্রিস্ আহাসান। ওখানে বেঞ্চিতে বসে আছেন কয়েকজন বৃদ্ধ, সাদা দাড়ি, সাদা চুল দেখে একজন বুড়ো লোককে দেখলাম। যতই বুড়ো হোক না কেন, আমার দাদুর সমবয়েসি হতেই পারে না। দাদু বেঁচে থাকলে দাদুর বয়েস একশোর বেশি হত।

আমি সমবেত বৃদ্ধদের মধ্যে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিই আপনার কি কেউ তারাপদ চক্রবর্তী কে চিনতেন, কিম্বা তাঁর ছেলে ত্রিদিব চক্রবর্তীকে?

তখন একটা রোগা মতো বুড়ো, লম্বা চুল, গোঁফদাড়ি নেই, লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমনে কোনানতো৹ আইছেন? কে আঁপনে? আমি বলি—আমি তারাপদ চক্রবর্তীর নাতি।

হাঁচানি, ও আল্লা, খোয়াব নি দেখি? লাঠি ফেলে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন ওই বুড়ো। আমি এগিয়ে যাই ওঁর দু'হাত ধরি।

বুড়োটা বলে ইয়াঁন ক্যাম্বাই আইলেন?

আমি বলি — বাংলাদেশে অ..্য কাজে এসেছিলাম, তখন ভাবলাম পূর্বপুরুষের ভিটা....খোব বালা কইচ্চেন, খোব বালা কইচ্চেন। আমনের ভিটায় অখন জব্বর মিঞার এতিমখানা হইছে। [illegible] বেবাক দেখামু। ছারের বুঝি ইন্তেকাম হই গেছে গৈ? আম্রি হেতেনের ছাত্র। ক্লাস এইট পৈয্যন্ত পইচ্ছিলাম আরি।

—আমি মাথা নাড়ি।

—কবে?

—বছর কুড়ি আগে।

—আহারে। ঠারাইন আছেন কি?

—আমার ঠাকুরমা?

—হু! হু!

খুব উৎসাহে জিজ্ঞাসা করেন ওই বুড়ো। পরনে লুঙি, গায়ে গেঞ্জি। কথা বলাবর ধরন মেয়েলি মেয়েলি। গলাটিও সরু। আমি বলি, হ্যা, ঠাকুরমা আছেন।

হাঁচানি? খুশি হল ওই বুড়ো।

আর একজন বুড়োমানুষ অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। ওঁর গায়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি। লুঙ্গি। মাথায় টুপি। বলল—আমিও তারাপদ স্যারের ছাত্র। বড়ো বালা ভূগুল ফড়াইতেন এক্কোই টানে ম্যাপ আকতে ফাইত্তেন।

ওরা চা খাওয়ালেন আমাকে। গোঁফদাড়িহীন বুড়োটি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। উনি ওষুধপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে চল্লেন গাড়িতে।

আর একটু সামনে গেলেই গঞ্জ এলাকা শেষ। বাঁশের বেড়ার বাড়ি। টিনের ছাউনি, বাড়ির চারিদিকে সুপুরি গাছের আর নারকোল গাছের সারি। পাকা বাড়িও আছে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওই ভদ্রলোকের নাম ফজল আলি। বাড়িতে নীচু স্কুলের বাচ্চাদের পড়াতেন। আঁঞি ভাইচ্চার সংসারে থাকি। বিয়াশাদি করিনঁ।

একটা লাজুক হাসি দিল ওই বুড়ো, আবার একটা কাল্পনিক আঁচলের খুট দিয়ে হাসিটা ঢাকল।

...ফজল আলি একজায়গায় গাড়িটা থামাতে বলল। একটা প্রাচীন বাড়ি। বাড়ির অনেকটা থুবড়ে পড়েছে, দরজা জানালা একটাও নেই অশ্বত্থ গাছ উঠেছে। ফজল বললেন, চৌধুরী বাড়ি। ছয়জন খুন হইছিল। সেইরাত্রেই আমনের ঠাকুরদারে আমরা সেইভ করি। গাড়িগা ইয়ানো থাউক। আঁয়ার লগে আইয়েন। আমনেরে বেবাক দেখাইয়ুম।

চৌধুরি বাড়ির ভাঙা ইট ছোঁয়া হাওয়া আমার জিন্স-এর শার্ট এ ঢুকছে। চৌধুরীদের ওই ভাঙা বাড়ির চারিপাশে কয়েকটি টিনের চালের বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে ওদের জমিতেই ওইসব পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে।

পিচরাস্তা থেকে একটা মাটির রাস্তা চলে গেছে। একটা বিশাল বটগাছ। দাদু যে বটগাছের দোলনা চড়ার কথা বলতেন, এটাই সেই বটবৃক্ষ? একটা বাড়ির কাছে এসে ফজল আলি বললেন, আঁয়ার বাসা। ইয়ানো আঁঞি থাকি। ভাইচ্চার সংসার। একডু পায়ের ধূল দেওয়ন লাগব। বেশি নঁ, হাঁচ মিনিড।

উঠানে মুরগি ঘুরছে। একটা কোঠাবাড়ি আর একটা টিনের। টিনের বাড়িতে ফজল আলি থাকেন।

অল্প একডু বয়োন, আন্ডাভাজা আর চা খান।

আমি আপত্তি করি না।

ফজল আলি বললেন—আমনেরে কোনোদিন পামু ভাবি নাই। আমনেরে যখন পাইছি, একখান জিনিস দিমু, ঠাইরাইনেরই জিনিস, ঠাইরাইনেরে দিয়া দিয়েন।

কী জিনিস?

একখানা চিডি। পুরো লেখা হয় নাইঁ।

—কাকে লেখা চিঠি?

—জব্বার আলিরে।

—আপনি কী করে পেলেন?

—আমি তো লিখাইয়া জন। অন্যের চিডি লিখি। পাকিস্তান হওনের পরে হিঁদুরা ইন্ডিয়ায় গেলগিয়া, তারপর চিডি লিখনের লোক কইম্যা গেল। আঞি পোসড আপিসে বই, চিডি লিখতাম। ইয়ার আগে অইন্যের চিডি লিখতাম। মাইনষের ঘরেও আঁয়ারে ডাইকত। বিবিরা বোরখাপড়ি বয়ান কইত, বাপের বাড়ি চিডি লিখাইত। আঁয়ার মইধ্যে মাইয়া মাইয়া ভাব আছে দেহি বিবিরা পরানের কথা কইতে পারত। জব্বর আলির অন্দরে ডাক পড়ছিল আমার। জব্বারের দুই বিবি। বাপের বাড়ি ইদের চিডি দিব। একফাঁকে ঠাইরিন আইল বোরখা পিন্ধ্যা। কইল আমি চক্কতি বাড়ির মইধ্যের হিস্যার বড়োবউ। ঠাইরিন বড়ো সুন্দরী আছিল। বোরখার মইধ্যে রই, আঁয়ারে কয় একখান চিডি লিখি দ্যান।

বোরখায় কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি। সে আর এক কিস্‌সা। বোরখা না পইল্লে ঠাইরেনের বিপদ হইত। ডায়মন মিঞার ফৌজ আই গেল, ডায়মন মিঞা হইল গৈ গোলাম সারোয়ারের অইন্য নাম। পিছে পিছে কাসেমের ফৌজ। জব্বর, মিঞা ছ্যাররে নৌকা তো বসাই ছিল, ঠাইরিনরে রাখল বোরখা পিন্ধ্যাই, অন্দরে।

একটা টিনের সুটকেস খুলে একটা হলুদ হয়ে যাওয়া ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চিডিডা শ্যাষ কইরেতে পারেন নঁ ঠাইরিনে। শ্যাষ হওঅনের আগেই এক বিবি আসি পড়ল।

চিঠিটা খুলেই বিরাট বিস্ময়ে দেখি সেই হাতের লেখা। যে হাতের লেখায় জব্বার চিঠি লিখত আমার দাদুকে। আবদুল চিঠি লিখত, সেই হাতের লেখাতেই লেখা—পরানের জব্বর ভাই,

আমনে মোছলমান। আমি হিন্দুর ঘরের বউ হইয়া আমনের চিঠি লিখিতেছি ইহা যেন কেহ না জানে। আমনেরে চিঠি না লিখি আর আইমি পারিলাম না। শুধু মিত্যু পৈয্যন্তই নয়, জম্মে জম্মে আমনেরে আমি মনে রাখিব। আমনে আমারে জীবন দিলেন, আমি আমনেরে কী দিব? ভালবাসা ছাড়া দিবার কিছু নাই।

আমি যখন এই বাড়ির বধূ হইয়া আসিলাম তখন আমার মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। আমি আমনেরে দূর হইতে দেখিতাম....

আর নেই।

চিডিখান আঁঞি কী করুম। ঠাইরেনের চিঠি ঠাইরেনেরেই দিয়েন।

আমি বললাম আপনি ওটা জব্বারকে দিয়ে দিলেন না কেন?

ক্যামনে দিউম? আঁঞি কেবল লিখনেরি মালিক। তাছাড়া চিডি ত শ্যাষ হয় নঁ। আধা কথায় চিডি হয়নি? আধা খাওয়া খাওয়া নঁ, আধা চিডি চিডি নঁ।

ঠারিনে ত আঁয়ারে কয় নাই চিডিডা দিয়েন। বরং জব্বরের বড় বিবি আইয়া পড়ল, ঠাইরিন চুপ হই গেল। ইয়ার পরে আর লিখনের ফুসরৎ পাইনঁ। কয়দিন পর জব্বার ভাই ঠাইরিনরে ইনডিয়া পাঠাই দিলেন, আর চিডিগা আঁয়ার কাছে পড়ি রইল।

আমি জিজ্ঞাসা করি জব্বার আলী কি বেঁচে আছেন এখনও?

ফজল আলি মাথা নাড়লেন। বললেন, আছে।

আমি বলি—আবদুল মমিন নামে কাউকে চিনতেন?

ফজল মাথা নাড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমনে নাম জানলেন কেমবাই। আমি বলেছি — চিঠি দেখেছি।

ফজল হেসে উঠলেন। একটু যেন হাঁপানির টান উঠেছিল ওর। শ্বাস টেনে বললেন ওই চিডি আমিই লিখতাম। জব্বার যেই চিডি লিখতো হেই চিডিও আঁয়ারই হাতের লিখা। জব্বার আব্দুল কেউ তো লিখন জানে না, আমিই লিখইন্যা। জব্বার কী লেখছে আবদুল জানে না, আব্দুল কী লেখছে জব্বার জানে না। শুধু আমিই জানইন্যা। বেবাক কথা আমার প্যাটে।

আমি এবার বুঝলাম দুজনের একরকম হাতে লেখার রহস্য।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আবদুল বেঁচে আছে?

—না ইন্তেকাল হইছে গিয়া। আজ আমনের একখানা কথা কই। আব্দুলের ইচ্ছা ছিল আমনের জমি কিনে। আব্দুলের আরজ ছিল পাকিস্তান যেন ভাঙা যায়। পাকিস্তান ভাঙলে তারাপদ স্যার আবার আইবে, তখন পুরা জমিন ছাড়ব। নিজেও থাকবে পড়শি হইয়া ঠাইরিনরে দেখবে, ঠাইরিন বড়ো সুন্দরী ছিলেন, যেন হুর পরী।

ফজল আলীকে বলি—এবার আমার ভিটে দেখতে নিয়ে চলুন।

সুপুরির সারি। পুকুরে নারকেল গাছ ফেলে ঘাট তৈরি হয়েছে। কলাগাছ ঘন হয়ে আছে হাঁটা দশ মিনিটের পথ। এই পথে কি গান্ধীজি হেঁটেছিলেন, নোয়াখালিতে?

ফজল বলল দ্যাখেন চিতাখোলা, আমনের পরিবারের শ্মশান। দেখলাম ওখানে একটা পাকুড় গাছ। একটা বাঁশঝাড়। কয়েকটা ঘুঘু পাখি। একটা সরু খাল। বাঁশের সাঁকো দিয়ে পার হলে খালের জলে কচুরিপানা ভাসে।

ফজল বলল ওই দ্যাখেন আমনেগো ভিটা।

দেখি একটা টিনের চাল দেওয়া লম্বা বাড়ি। বাড়ির সামনে লেখা এস.ও এস, ব্র্যাকেটে লেখা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস।

কিছু প্রশ্ন করার আগেই ফজল আলি বলল, জব্বার সাহেবের দুই ছেলে। এন.জিও দিছে। এইটা এতিম খান। আমি দেখি একটা নিম গাছ, আমগাছের গায়ে লেখা সাপোর্টেড বাই ব্র্যাকেটে একটা এন.জি. ওর নাম। একটা হালফ্যাশনের টিউবওয়েল, লেখা ডোনেটেড বাই রোটারি ক্লাব অফ বাংলাদেশ। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দোলনায় দুলছে। একটা প্রাচীন আম গাছ। একটা পুকুর। ঘাট বাঁধানো। দাদু বঁড়শি ফেলতেন? ঠাকুরমা কলসি কাঁখে যায়....

জিজ্ঞাসা করলাম জব্বার কোথায় থাকে? ফজল একটু দূরে একটা ঘর দেখাল পাকাঘর। ফজল বলল ছ্যারের আমলের ঘরবাড়ি আর নাই, শুধু গাছ আছে।

মাটিও তো আছে। আমি হঠাৎ নীচু হয়ে এক খাবলা মাটি খামচে নিয়ে আমার রুমালে বাঁধি। আর একটা পুরান আমগাছ থেকে পাতা ছিঁড়েনি। ফজল বলল জব্বর আছিল খোন্দকর। কত মুরিদ আছিল তাঁর, পানিপড়া, লবণপড়া.....। আমনেগো গাছে জব্বারের পোষা জিনপরী ঝুলত।

পাকিস্তান হওয়নের পর জব্বার মাতব্বর হইল। নীলামে আমনেগো জমি লইয়া

কেরদানির আস্তানা বানাইছিল।

জব্বরের নিজের বাড়িটা নেই?

আছে। দুই বিবি। এক সংসার হেইখানে থাকে, এক সংসার এইহানে। পোলায় এন জি ও দিছে।

আমাদের প্রাচীন ভিটার দিকে অসহায় তাকাই। জুবুথুবু হয়ে বসে আছে জব্বার মিঞা। বারান্দায় কাবাশরীফের ছবি। দুলদুল ঘোড়ার ছবি, জব্বারের কানের কাছে মুখ নিযে ফজল আলি বললেন—তারাপদ ঠাউরের নাতি আইছে, ইনডিযার থোন, তারাপদ ছ্যারের নাতি। দু-তিনবার বলতে হল। জব্বারের চোখের তাবা নড়ে উঠল দ্রুত। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, হাতটা বাড়িযে দিলেন। আমি হাতটা ধরলাম।

অনেকক্ষণ হাতটা ধরেছিলেন। উনি আমাদের জমিব দখলদাব। কিন্তু ওব হাতের চাপ ও কবজির স্থাপনের ভাষায় আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস আমি বুঝতে পারছি। ওর চামড়া ফুড়ে বের হওযা নীল শিরাটি মাঠ চিরে যাওযা নদীটির মতো, যে রাস্তাব গল্পকথা শুনেছিলাম আমার পিতামহর কাছে।

আমার হাতটা ছেড়ে একটা মোড়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন জব্বব আলি। ওর মুখের মাংস কুঁচকে ঝুলে রযেছে। থুতনিতে সাদা দাড়ি।

আমনেগার সাত পুরুষের ভিটা .....বলতে গিয়ে গলাটা ভেঙে গেল জব্ববের, নাকি ওর গলাটা একরকম ভেঙেই গেছে বৃদ্ধবযসে।

ফজল আলিকে বযস জিজ্ঞেস করি। ফজল বলে সঠিক কইতে পাইলাম না। একশ হয় নাই বোধহয়।

কার যেন নাম ধরে ডাকেন। একটি মেযে এল, বেশ স্মার্ট দেখতে।

জব্বার আলি মেয়েটিকে বললেন, তারাপদ ঠাউরের নাতি। আজ আমাব মেহমান। মেয়েটি জব্বারের নাতনি। ব্যস্ত হযে পড়ল কী হল দাদু, এরকম কবেন কেন? আমার দিকে তাকিয়ে বলুন—একটু এরপরই জব্বারের মুখ থেকে কেমন একটা শব্দ হতে লাগল।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে গেল। সুরেলা গলায বলল উঃ, আবার কী হইল নানাভাই এরকম করলে চলে?

আমার দিকে তাকিযে বলল—বড্ড সেন্টিমেন্টাল গেছেন আজকাল।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল। ওর বছর কুড়ি বযেস হবে। ছোটো নাতনি। এই এন. জি.ও-র সঙ্গে যুক্ত আছে। নাম সপ্তপর্ণী। ওকে পাতা বলে ডাকে। মেয়েটি ওর দাদুকে ধরে নিয়ে ঘরের বিছানায় শুইযে দিল। আমাকে হাতছানি দিযে ডাকল জব্বার আলি।

আমি ওর বিছানার সামনে দাঁড়ালাম।

—কর্তা?

—উঁহু।

—নাই?

—না।

—কবে ?
—বিশ বছর।
—ঠাইরিন।
—আছে।
—ভালানি ?
—শোয়া।
—কতা কয় ?
—পারে না।
চম্পা কলির মতো রং আছিল ঠাইরিনের। একটা লাজুক হাসি ফুটে উঠল জব্বারের মুখে। আমি পকেট থেকে ওই চিঠিটা বার করলাম। ঠাকুরমার লেখা চিঠিটা। চিঠিটার বৃত্তান্ত বললাম। তারপর পড়ে শোনালাম।
জব্বার হাত বাড়ালেন।
আমি চিঠিটা দিলাম।
জব্বার চিঠিটা বালিশের তলায় রাখলেন।
আমি বললাম রেখে দিলেন ওটা ?
জব্বার বললেন—রাখলাম।
ক-দিন রাখবেন ?
মিত্যু পৈর্যন্ত।
দুপুরে খেতে হল। জব্বারের পুত্রবধূর সঙ্গে কথাবার্তা হল। উনি নাকি ওঁর শ্বশুরের কাছে আমার ঠাকুরদাদার কথা শুনেছেন। একজোড়া খড়ম নাকি বহুদিন বাড়িতে ছিল, ওটা আমার দাদুর খড়ম। খোঁজা হল কিন্তু পাওয়া গেল না।
আমার তাড়া ছিল। চাঁদপুর যেতে হবে। চাঁদপুর থেকে ঢাকা। ওরা বলেছিল দুদিন থেকে যেতে।
ওরা আমাকে একটা আমসত্ত্ব দিল। রোল করা। আমাদের বাড়ির গাছের আমের আমসত্ত্ব।
আমসত্ত্বের গায়ে শীতল পাটির ছাপ নেই। পাটিতে শুকোন হয়নি। রেকাবিতে। আমসত্ত্বের গায়ে ফুটে উঠেছে একটা ছোটো চাঁদ, তারা, আর কতকগুলি অক্ষর। অক্ষর সাজানো লেখা—সোনার বাংলা।
জব্বারের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। বেশ স্মার্টলি। ভাবলাম কোনো সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলব না।
বললাম চলি, খুব ভালো লাগাল।
জব্বার হাতের ইশারায় আবার বসতে বললেন। বসলাম।
অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঘুঘু ডাকছে। বেলা একটা। বললেন—ঠাইরিন ক-দিন আছিল আমার ঘরে। হেই কয়দিন নিরামিষ্য ছালুন হইছিল।
ঠাইরিন থাকতো বোরখা পরি।
ঠাইরিনকে আমার ঘরে না রাখলে বিপদ হইত। ডায়মন মিঞার লোকেরা বড়ো খাইচ্চত।

কম্ভারে কইলাম আমনে যান। আমি লুঙ্গি দিলাম। টুপি দিলাম। মাথায় আছিল টিক্কি। কাডি দিলাম। কর্তা ভাবল মোছলমানের অইত্যাচার। না হইলে জানে বাঁচত না।

লোকে জানে জব্বারের দুই বিবি। তিনি বিবি হয় কেমনে? যদি ডায়মন মিঞার লোক জানে, খারাপ হইব। এক ছোটো বিবিরে বাপের বাড়ি পাঠাইলাম।

একদিন একরাতে আমার ঘরে বড়ো বিবি আর ঠাইরিন।

ঠাইরিনরে কইলাম বোরখা খুলেন। বড়ো গরম। ঠাইরিন বোরখা খুলি বসি রইল।

ঘরে ল্যাম্পের আলো। দেখলাম ঠাইরিনের চোখে পানি। গাল বাই পড়ে। আমি চোখের পানি মুছাইতে পারিনি।

ফরের দিন বেয়ানে পাশের গ্রামের ভৌমিকবা ইন্ডিযা গেল। ঠাইরিনরে ফাডাই দিলাম বুইজেননি। আঁঞি কোনো গুনা করিনি।

জব্বার চুপ হয়ে গেলেন আবার।

আমি বলি—এবার চলি?

জব্বার বললেন, যাওযন নাই। আবার আইযেন।

আমি উঠি।

জব্বার আবার বললেন, ঠাইরিনরে কইযেন আবি।

কী কমু?

জব্বর কিছু বলল না আর। ওর চোখের শূন্য দৃষ্টিতে অনেক কথা ছিল।

ফিরলাম। ঠাকুরমাকে বললাম জব্বার আলি কে দেখলাম। বেঁচে আছে। ভালো আছে।

মৃদু হাসলেন ঠাকুরমা।

কিছু বলার চেষ্টা করছেন ঠাকুরমা। মনে হল বলছেন—কী আনলি?

আমি স্থির তাকিয়ে থাকি কনকচাঁপা ঠাইরিনেব দিকে। ঠাকুরমাও আমাব দিকে তাকিযে আছে। আমি এনেছি। অনেক কথায রূপালি কুযাশা এনেছি সারাগাযে মেখে।

ঠাকুমা, তুমি পড়ে নাও।

পড়তে থাকো, আমার শরীর থেকে পড়। মিত্যু পৈর্যন্ত। □

খুরশিদ

সু চি ত্রা ভ ট্টা চা র্য

বছর দশ বারো আগের কথা। কিংবা তার একটু বেশিই। সাল তারিখ অতশত মনে নেই, তবে সময়টা ছিল শীতের শুরু। বোধহয় ভাইফোঁটার এক দু-সপ্তাহ পরেই হবে। কী একটা কাজে যেন গিয়েছি রানিকুঠি, দেখি দিদি জামাইবাবুর ফ্ল্যাট আলো করে বসে এক কাশ্মীরি তরুণ।

হ্যাঁ, কাশ্মীরি যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এক নজরেই ঠাহর করা যায়। দিব্যি দ্যুতিময় চেহারা। তেমন লম্বাচওড়া নয় বটে, তবে রীতিমতো রূপবান। টকটকে রং, ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ নাক, চোখ—যেন পারস্যের রাজকুমার। শীতকালটায় এমন চেহারার রাজপুত্রদের হামেশাই শাল গাঁঠরি কাঁধে কলকাতার যত্রতত্র দেখা যায়।

বোঁচকা পড়ে আছে মেঝেতে, কার্পেট জুড়ে রংবেরংয়ের শাল। দিদি ঝুঁকে শালগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। উলটোদিকের সোফায় হেলান দিয়ে জামাইবাবু। ভুরু কুঁচকে জরিপ করছিল দিদির কার্যকলাপ। অসীমদা একেবারে টাকা-আনা-পাই হিসেব করা মানুষ, দিদি কিছু কিনব বললেই কাঁটা হয়ে যায়।

আমাকে দেখামাত্র অসীমদার কপালের ভাঁজ উধাও। একগাল হেসে বলল — এই তো, শাল কেনার আসল খরিদ্দার এসে গেছে। বলেই শালওয়ালাকে ডাক, — এই ফেভাই...এই...কী যেন নাম বললে তোমার?

—জি খুরশিদ, বাবুজি। খুরশিদ আলম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুরশিদ। উর্দুতে খুরশিদ মানেটা কী যেন?

—জী সুরজ। সান্।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সূয্যিমশাই....তা শোনো সূয্যিমশাই, এই দিদিকে ছেড়ে এবার এই দিদিকে শাল দেখাও। এ হল আসলি রইস। খুদ কামাতি হ্যায়। সংসার মে কুছ নেহি দেনা পড়তা। সব পয়সা শাড়িমে উড়াতা হ্যায়। পছন্দ করাতে পারলে ধড়াধ্ধড় তোমার পাঁচ-সাতখানা শাল নেমে যাবে।

অসীমদার এ ধরনের রসিকতা আমার একটুও ভালো লাগে না। অসীমদার বদ্ধমূল ধারণা, চাকরি করাটা আমার নেহাতই শখ। কিছুতেই বুঝতে চায় না আজকালকার দিনে হাত পা ছড়িয়ে মনের মতো করে বাঁচতে চাইলে একার রোজগারে কুলিয়ে ওঠা কঠিন। কিংবা হয়তো বোঝে। হয়তো বা মনে মনে কিঞ্চিৎ খেদও আছে। তার এম-এ পাস করা বউটি তো কস্মিনকালেও চাকরিবাকরির ধার মাড়াল না।

অন্যদিন হলে আমিও হয়তো পালটা হুল ফোটাতাম, সেদিন অবশ্য চটিনি। সত্যি

একটা দুটো শাল কেনার কথা তখন ঘুরছিল মাথায়। বিশেষ করে দীপকের জন্য একটা তো বটেই। বেশ কিছুদিন ধরে দীপকের গজগজ শুনতে হচ্ছে, তার একমাত্র শালখানা নাকি খসকুটে মার্কা হয়ে গেছে, আমি নাকি দেখেও দেখি না, ওই শাল গায়ে জড়িয়ে কোনও ভদ্র সমাজে নাকি বেরোনো যায় না। শুধুমাত্র একটা দেখনবাহার শালের অভাবেই দীপককে আজকাল শীতকালে নেমন্তন্নবাড়িতে প্যান্টশার্ট পড়ে যেতে হয়, হেন তেন।

আলগাভাবে জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার কাছে জেন্টস শাল আছে ভাই?

এমন একটা প্রশ্নের জন্যই বুঝি অপেক্ষা করছিল খুরশিদ। অসীমদার কথা শুনে ততক্ষণে সে ধরেই নিয়েছে নির্ঘাত আমি এক লোভনীয় কাস্টমার। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে একটা বিনয়ী নমস্কার — জরুর হ্যায় দিদি। আইয়ে না দিদি, দেখিয়ে না, লেডিজ জেন্টস যা আপনার পসন্দ...

বসেই পড়লাম দিদির পাশটিতে। গাঁঠরি ঘেঁটে একের পর এক শীতবস্ত্র বার করে চলেছে খুরশিদ। খুলছে। মেলে ধরছে সামনে। কোনওটা বা জড়াচ্ছে নিজের গায়ে, বসে দাঁড়িয়ে পোজ দিচ্ছে নানারকম। তাল মিলিয়ে চলছে প্রতিটি শালের গুণকীর্তন। রঙের। কারুকাজের। পশমের উৎকর্ষের। কোন শালটির পিছনে কত দিনের মেহনত আছে তাও শোনাচ্ছে সবিস্তারে।

বেশ লাগছিল খুরশিদকে। শালওয়ালা আগেও দেখেছি। বিয়ের আগেই তো আমাদের বাড়িতে এক মধ্যবয়সি কাশ্মীরি আসত মাঝে মাঝে। খুব ভদ্র ছিল লোকটা, তবে বড্ড গম্ভীর। কথা বলত ভীষণ কম, তাও অতি নীচু গলায়, এবং মেপে জুপে। খুরশিদ মোটেই সেরকম নীরস নয়। সে বেশ প্রাণবন্ত। হাসিখুশি। কেজো সেল্‌সম্যানশিপের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের জিনিস পছন্দ করা নিয়ে সরস মন্তব্য করছে টুকটাক। বাংলার সঙ্গে হিন্দি উর্দু কাশ্মীরি ইংরিজি মিশিয়ে। অসীমদার বিচিত্র রাষ্ট্রভাষাও সে উপভোগ করছে খুব। কাঁড়িখানেক শাল দেখার পরেও একটিও চোখে ধরল না বলে সে আদৌ বিরক্ত নয়, বরং আমাকে মনোমত জিনিস না দিতে পারার জন্য নিজেই লজ্জা প্রকাশ করল বার-বার।

দিদিকে একটা শাল বেচে সেদিনের মতো তল্পিতল্পা গোটাল খুরশিদ। তবে আমার ঠিকানাটা নিয়ে নিল। সে নাকি আমাকে শাল পছন্দ করিয়েই ছাড়বে।

এবং বাড়ি খুঁজে খুঁজে পরের রবিবারই খুরশিদ হাজির। সেদিন একটা নয়, ভাড়া করা কুলির কাঁধে আরও একটা গাঁঠরি। শাল ছাড়াও হরেক কিসিমের সম্ভার রয়েছে তাতে। কাশ্মীরি কাজ করা বেডকভার, নামদা, চিনন সিল্কের শাড়ি....ব্যবসা ব্যাপারটা ছোকরা ভালোই বোঝে, আগেরদিনই কথায় কথায় শুনে নিয়েছিল আমার মেয়ে সদ্য কলেজে ভরতি হয়েছে, মনে করে তার জন্য ফিরহনও এনেছে খান কতক।

বলতে গেলে সেদিন থেকেই খুরশিদের সঙ্গে আমাদের ভাল মতো পরিচয়।

সেদিন থেকেই জেনে গেলাম খোদ শ্রীনগরেই বাড়ি আছে খুরশিদের। পারিবারিক অবস্থা খুব দীনহীন নয়, বাপ-জ্যাঠার পুরুষানুক্রমিক কারবার, এই শাল টালেরই। দোকানও আছে একটা শ্রীনগরে। বাপ মা জ্যাঠা জেঠি ভাই বোন মিলিয়ে তাদের

সংসারটিও বেশ বড়োসড়ো। জিজাজি হঠাৎ মারা যাওয়ার পর দিদি ফিরে এসেছে, ভাগ্নে ভাগ্নিরাও মানুষ হচ্ছে তাদের পরিবারে। বছরে এই সময়টা শ্রীনগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়াটা খুরশিদদের বংশানুক্রমিক অভ্যেস। বাপ-জ্যাঠারাও শাল কাঁধে পাড়ি জমাত একসময়ে, কেউ দিল্লি, কেউ মুম্বাই, কেউ কলকাতা। এখন পালা পরের প্রজন্মের। তারা চরকি খায় এ-শহর ও-শহর। কলকাতায় এই নিয়ে পঞ্চমবার এল খুরশিদ, এখনও নাকি এই বিশাল শহরটা তার ঠিকমতো সড়গড় হয়নি। তবে আর পাঁচটা কাশ্মীরির তুলনায় বাংলাটা সে ভালোই রপ্ত করে নিয়েছে। অন্তত খুরশিদের তাই ধারণা।

দীপক জিজ্ঞেস করল, — পাঁচবার এসেছ মানে? তোমার বয়স কত?

খুরশিদ বলল, জি থারটিওয়ান।

—বলো কী? তোমাকে দেখে তো কুড়িবাইশের বেশি মনেই হয় না।

খুরশিদ লজ্জা পেল একটু— কী যে বলেন বাবু? জানেন, আমার আট সালকা এক লেড়কা আছে। আফরোজ। লাস্ট ইয়ার এক লেড়কি ভি হল।

আমি ঠাট্টা করে বললাম — কী করে এমন বাচ্চা বাচ্চা চেহারা রেখেছ বলো তো?

—ইয়ে হামারা কাশ্মীরকা জাদু আছে দিদি। কাশ্মীরে সহজে কারুর উমর বাড়ে না। কাশ্মীর জন্নত হ্যায়, জন্নত।

গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে ভালোই বাণিজ্য করে ফেলল খুরশিদ। দু-দুখানা শাল, একটা ফিরহন, আর একখানা চিনন শাড়ি। একটা নামদাও প্রায় গছিয়ে ফেলেছিল, কোনওক্রমে কাটাল দীপক। ইনস্টলমেন্টই হোক আর যাই হোক, টাকা তো দিতে হবে। তাছাড়া আগের বছরই মির্জাপুরি গাল্‌চে এসেছে বাড়িতে, ফালতু ফালতু অপচয় করবই বা কেন!

তা, সেবছর কিস্তির টাকা নিতে আরও বার তিনেক আনাগোনা করল খুরশিদ। আমি তো চিরকালই গপ্পে, সেলস্‌ম্যান সেলস্‌গার্লদের সঙ্গে আমার দিব্যি জমে যায়। তুলনামূলকভাবে দীপক আর বুবলি যথেষ্ট নাক উঁচু। চুজি। তাদেরও কিন্তু খুরশিদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। ওই জন্নত কাশ্মীর সম্পর্কে বাপ মেয়ে দুজনেরই অশেষ কৌতূহল। অজস্র ধরনের প্রশ্নবাণ হেনে যায় তারা, প্রফুল্ল মুখে জবাব দেয় খুরশিদ।

—আপ কেয়া ডাল লেক কে পাস হি রহতে হ্যাঁয়, খুরশিদভাই?

—নেহি বহিন, পাস নেহি। লেকিন নজদিক।

—পুরো ডাল লেক শীতকালে জমে বরফ হয়ে যায়, তাই না?

—বেশক্‌। বিলকুল সফেদ ময়দান বনে যায়। বচ্চেলোগ তো উসকি উপর সাইকেল ভি চালায়। খেলকুদ ভি করে।

—হ্যাঁ রে বুবলি। শীতকালে ডাল লেকের ওপর নাকি মোটরগাড়িও চলে। একবার তো জহরলাল নেহরু জিপ নিয়ে ঘুরেছিলেন। কী হে খুরশিদ, ঠিক বলছি?

—একদম ঠিক। কচ্চে উমর মে দেখেছি শেখসাহাব ভি ঘুমতেন লেকে। পয়দল।

—শেখসাহেব মানে শেখ আবদুল্লাহ্‌?

—জি বাবুজি।

—ওর পার্টিরই তো গভর্নমেন্ট এখন?

—জি।

—তোমাদের ওখানে পলিটিকাল সিচুয়েশন এখন কেমন? খুব গন্ডগোল হচ্ছে, তাই না?

—হচ্ছে কোথাও কোথাও তেমন খাস কিছু না। পলিটিকাল ঝামেলা কোথায় না হচ্ছে বাবুজি? দিল্লি মে হচ্ছে, মুম্বই-মে হচ্ছে, আপনাদের বাঙাল মুলুকমে ভি....। দুড়ুম দাড়ুম কাজিয়া বাধে, বোম উম্ ফাটে, দোকানপাট বন্ধ থাকে...আবার সব খুলেও যায়। কাশ্মীরমে ভি ওইসাই।

—কিন্তু হঠাৎ শুরু হল কেন অশান্তি? অ্যাদ্দিন তো সব ঠিকঠাকই চলছিল?

—কৌন জানে বাবুজি? যাদের কামকাজ থাকে না তারাই জাদা হল্লাবাজি করে।

—লোকজন যাচ্ছে এখন কাশ্মীরে?

—জরুর যাচ্ছে। বহুত যাচ্ছে। এই শাল ভি তো সব হাউসবোট ফুল ছিল।

—হাউসবোটে থাকাটা দারুণ থ্রিলিং। কাশ্মীর যদি যাই আমরা কিন্তু হাউসবোটে থাকব বাবা।

—আরে, চলে আও না বহিন। আমার ফুফার হাউসবোট আছে, আমি সব ইন্তেজাম করে দেব। খুব মজা আসবে। শিকারা চড়ে ঘুরবে, নাগিনা লেকে চলে যাবে। অগর দিল চাহে তো নাগিনা লেকে ভি থাকতে পারো। ওই সাইডটা মোর বিউটিফুল।

—বাহ্। চল্ রে বুবলি, ঘুরেই আসি। কখন যাবি? সামারে? না উইন্টারে?

—উইন্টারে হরগিস্ যাবেন না বাবুজি। কোথায় ঘুরবেন তখন? সারা ভ্যালিই তো তখন বরফের নীচে। আমাদের শ্রীনগরেই তো কম্ সে কম্ চার-পাঁচ ফুট বরফ থাকে। তাছাড়া ঠিক সে কুছ দেখতেও তো পাবেন না। সারে কে সারে সফেদ।

—বলছ? তাহলে কাশ্মীর যাওয়ার বেস্ট টাইম কোনটা? মে-জুন?

—সামার-মে ট্যুরিস্টলোগ আসে বেশি। লেকিন আমাকে যদি পুছেন তো বলব সেপ্টেম্বরে আসুন। কাশ্মীর কি খুবসুরতি তখন লা-জবাব। কিত্না ফুল, কিত্না কালার, পীর পাঞ্জাল কা বরফ তখন মনে হয় কাচ্চা সোনা।

কাশ্মীরের গল্প শোনানোর সুযোগ পেলে খুরশিদ আর থামতই না। ঝলমল করে উঠত তার চোখ দুটো। কতভাবেই যে বর্ণনা করত তার জন্নতের রূপ। বসন্ত সমাগমে কীরকম ধীরে ধীরে সরে যায় বরফ, কীভাবে একটু একটু করে উঁকি দেয় নবীন পাতারা, বৃক্ষ ডালপালায় সবুজের ছোঁয়া লাগে, ফিকে সবুজ কেমন করে গাঢ় হয় ক্রমশ, আঙুর আপেল আখরোট ভরে ওঠে বাগিচা, জাফরানখেত সুবাসিত হয়, বাতাস কীভাবে নেচে বেড়ায় উইলোর ঝাড়ে, বার্চ পাইন পপলারের বনে, চিনারের পাতা ঝিরঝির কাঁপে কেমন, পাহাড়ের ঢালে ফুটে ওঠে অগুন্তি রাঙা গোলাপ...

মার্চ থেকে নভেম্বরের বর্ণনা শুনতে শুনতে বুবলি বিমোহিত। আমরাও। নাহ্, হিমাচল প্রদেশ, ইউ-পি, সিকিম, ভূটান, অনেক হয়েছে, এবার একবার ভূস্বর্গে যেতেই হয়। শ্রীনগর গুলমার্গ সোনমার্গ পহেলগাঁও....। সিন্ধু ঝিলম লিদ্দার.....।

আমাদের চোখে স্বপ্নের সুরমা মাখিয়ে দিয়ে খুরশিদ দেশে ফিরে গেল সেবার। মার্চের গোড়ায়।

কথায় বলে, ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস। সে বছর কাশ্মীর যাওয়ার ফুরসতই পেলাম না। মে জুনেও নয়, সেপ্টেম্বর অক্টোবরেও না।

দীপকের একটা প্রমোশন হল সেবার। অফিসে দায়িত্ব বেড়ে গেল চতুর্গুণ। প্রতি সপ্তাহেই ট্যুরে যেতে হচ্ছে। ভুবনেশ্বর পাটনা রাঁচি গৌহাটি শিলিগুড়ি...। কাশ্মীর যেতে গেলে অন্তত দিন পনেরো-কুড়ি টানা ছুটি চাই। আমার সরকারি চাকরি, আর্নড লিভের অসুবিধে নেই, কিন্তু দীপকের পক্ষে ছুটি শব্দ উচ্চারণ করাই মুশকিল।

তা শীতের মুখে মুখে কাশ্মীরই এসে গেল কলকাতায়। সঙ্গে আখরোট কিশমিশ মেওয়া। শাল ফিরহন্ ছড়িয়ে বসার আগেই অনুযোগ জুড়ল, — আপনারা তো এলেন না দিদি? আমি কিন্তু আপনাদের ইন্তেজার করছিলাম।

মনে আফশোস থাকলেও হেসে বললাম,— যাব যাব। এবছর হয়নি তো কী আছে, সামনের বছর যাব। নয় তো পরের বছর। কাশ্মীর তো পালাচ্ছে না।

—উও তো ঠিক হ্যায়। ফির ভি, এবার ঘুরে এলেই আচ্ছা হত।

—কেন? এবার কী স্পেশালিটি ছিল?

—ফুফাজিকে বলে এক বড়িয়া হাউসবোট ফিট করে রেখেছিলাম। পুরনো বোট, মগর অলগ ইজ্জৎ আছে।

—কীরকম?

—আপলোগ কাশ্মীর কি কলি জরুর দেখেছেন? শাম্মী কাপুর? শর্মিলা টেগোর?

—হ্যাঁ। তো?

—শর্মিলা টেগোর তিন রোজ ওই হাউসবোটে ছিলেন।

হেসে ফেললাম। নীচু গলায় দীপককে বললাম, — কী গপ্পো ঝাড়ছে গো? ওর ফুফার হাউসবোটে শর্মিলা ঠাকুর?

—পুরো ঢপ। দীপকও গলা নামিয়েছে — ওরা এসব বলে খুব আনন্দ পায়।

—তাই না তাই। কোন্ কালের ছবি, এখন হয়তো সেই হাউসবোটের কোনও অস্তিত্ব নেই।

আমাদের চাপা স্বর সঠিক অনুধাবন করতে পারছিল না খুরশিদ। চোখ পিটপিট করে বলল, — ইস্ বার ভি কিতনা শুটিং চল্ রহা থা। ডাল লেকমে, নাশিমবাগমে.....অনিল কাপুর শ্রীদেবী সানি দেওল গুলশন গ্রোভার.....

—ফিল্মের কথা ছাড়ো। ঠোঁট টিপে বললাম,—তোমার ঘর গেরস্থালির কথা বলো। সব ঠিকঠাক ছিল তো?

—অ্যাইসে ঠিক হি হ্যায়। সিরিফ্ আমার নানিজি মরে গেলেন।

—তোমার মার মা?

—হাঁ দিদি। আফশোস। শ-সাল পুরা হোনে হে-মাহিনা আর বাকি ছিল।

—তাহলে তো বয়স হয়েছিল?

—আমাদের কাশ্মীরে শ-সাল বাঁচা তো এমন কিছু জাদা নয় দিদি। মেরা নানাজি

তো সেনচুরি করকেই গয়েঁ।

—হুম্। তোমার মা ভালো আছেন তো?

—হাঁ দিদি।

—বিবি?

—ঠিক হ্যায়। ঘরকা কাজকামমে বিজি আছে।

—আর ছেলে-মেয়ে?

—আফরোজ ইবার ফোর্থ ক্লাসে উঠল। বহুৎ শয়তান হয়েছে। পড়াইমে দিলচস্পি নেহি, খালি খেলা করবে।

—কী খেলে? ফুটবল? ক্রিকেট? না ডান্ডাগুলি?

—কিরিকেট। কপিলদেবকা বহুত ফ্যান হ্যায়।

দীপক দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল,— শুধু কপিলদেবের ফ্যান? ইমরান, আক্রামের ভক্ত নয়?

একটু বুঝি হোঁচট খেয়ে গেল খুরশিদ। পরক্ষণে ঘাড় নেড়ে বলল — হাঁ হাঁ, ওদেরও ফ্যান। যে প্লেয়ার জোর জোর বল করে আর ঠাঁইঠুঁই ব্যাট চালায়, হামার আফরোজ তাকেই জাদা পসন্দ করে।

দীপকের প্রশ্নের সুর যেন বিদ্রূপ ঘেঁষা। যেন খুরশিদকে একটু অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করল দীপক। খুরশিদকে যেন বাজিয়ে দেখতে চাইল কাশ্মীরিদের মধ্যে কতটা পাকিস্তান প্রীতি ঘাপটি মেরে আছে।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলাম আমি। বললাম,

—আর তোমার মেয়ে কার ভক্ত? তোমার?

—জরুর। ও তো বাপ কি বেটি। ঘরে থাকলে হামাকে এক্কু মিনিট ছোড়ে না।

সামান্য বুঝি আনমনা দেখাল খুরশিদকে। হাসছে, কিন্তু দূরমনস্ক চোখে ফুটে উঠেছে পিতৃত্বের চিরন্তন মায়া। স্মিত মুখেই বলল — শাহিন তার দাদাজির ভি বহুত ফ্যান আছে। দাদাজি দুকান গেলেও সাথ সাথ যেতে চাইবে।

বুবলির ছোটোবেলার কথা মনে পড়ল। দীপক যতক্ষণ বাড়ি আছে, ফেবিকলের মতো তার গায়ে সেঁটে আছে, আর দীপক না থাকলে দীপকের বাবা। শ্বশুরমশাই বিকেলে ক্লাবে তাস খেলতে যাবেন, সেখানেও বুবলির যাওয়া চাই।

সেবছর শুধু গল্পগাছাই হল, শালটাল তেমন রাখা হল না। কলকাতায় শীত কোথায় যে বছর বছর শাল কিনব। তাও খুরশিদের উপরোধে একখানা নামদা নিতেই হল। সাদার ওপর নীল হলুদ সবুজে জংলা লতাপাতা। ইরানি কাজ। চেনাজানা কয়েকজনের ঠিকানাও দিলাম খুরশিদকে, আমার সুবাদে আর কোথাও বাণিজ্য করে নিতে পারে তো করুক।

খুরশিদের সঙ্গে এভাবেই একটু একটু করে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল। ছুটির সকালে এদিকে এলেই আমাদের বাড়ি চলে আসত, চা-টা খেত, বকবক করত খানিক। কত হাবিজাবি গল্প যে করত! ওদের কাশ্মীরে নাকি ঋতুচক্রের দুটো মাত্র ভাগ! এক, যখন চিনারগাছে পাতা আছে। দুই, যখন চিনারগাছে পাতা নেই। চিনারের

পাতার রংই নাকি ওদের বলে দেয় এবার মুলুক ছাড়ার সময় ঘনিয়ে এল। চিনার পাতা ঝরে গেলেই ঘুমিয়ে পড়ে গোটা উপত্যকা, আবার জাগে যখন নতুন পাতা আসে। গুটিগুটি পায়ে তখনই ঘরে ফেরে খুরশিদরা। আশ্চর্য, যে চিনারগাছ কাশ্মীরিদের নয়নের মণি, তা নাকি আদৌ কাশ্মীরের নয়। মুঘল বাদশা আকবর নাকি ইরানদেশ থেকে এ গাছের চারা এনেছিলেন। আরও বহু জায়গায় নাকি বসানোর চেষ্টা করেছিলেন চিনারগাছ, কিন্তু কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও নাকি এ গাছ বাঁচেনি।

আরও একটা প্রিয় বিষয় ছিল খুরশিদের। গোলাপ। ইরান ছাড়া আর কোথাও নাকি কাশ্মীরের মতো গোলাপ ফোটে না। দুনিয়ায় বসরাই গোলাপের পরেই কাশ্মীরি গোলাপের স্থান।

খুরশিদের কল্যাণে আর কত কী যে জেনে ফেললাম আমরা। পৃথিবীর সবচেয়ে মিঠা শবনম নাকি কাশ্মীরের মাটিতেই ঝরে পড়ে। আসলি চিনন শাড়ি নাকি একটা কাঠবাদামের খোলার মধ্যে অবলীলায় পুরে ফেলা যায়। কোন্ এক দুষ্প্রাপ্য ছাগলের ঝরে পড়া লোমে তৈরি পশমিনা শাল নাকি সাইবেরিয়ান ফারকোটকে উষ্ণতায় হার মানায়।

শুনতে শুনতে ছটফট করি সেই স্বপ্নের উপত্যকায় যাওয়ার জন্য। চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে পাই ভোরের কুয়াশা-মাখা ডাল হ্রদ, শিকারায় চড়ে ফুল বেচতে এসেছে হুরিপরির মতো কাশ্মীরি বালিকা, ফুলে ফুলে বর্ণময় শালিমার, নিশাতবাগ, চশমেশাহি.....

২

কাশ্মীর আমাদের যাওয়া হল না।

প্রতিবছরই কোনও না কোনও বাধা পড়ে যায়। হয় বুবলির পরীক্ষা, নয় দীপকের অফিস। এক বছর আমার শরীর খারাপ, তো কোনও বছর উটকো সাংসারিক সমস্যা।

ওদিকে কাশ্মীরের অবস্থাও দ্রুত বদলাচ্ছিল। কাগজ পড়ে, টিভি খুলে শিউরে উঠি। আজ এখানে বোমা বিস্ফোরণ, কাল ওখানে জঙ্গি সন্ত্রাস...। কোনওদিন দশজন মরছে, কোনও দিন বিশজন, রোজ কিছু না কিছু গন্ডগোল লেগেই আছে। ক্রমশ অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠছে জন্নত।

তার মধ্যেও খুরশিদ আসছিল প্রতিবছর। একটু একটু করে মুখের হাসিটা তার নিবে আসছিল, তবুও। গোলমালের কথা উঠলে আগের মতো উড়িয়ে দিতে পারে না বটে, তবে জোর গলায় বলে, এমনটা নাকি বেশি দিন চলতে পারে না, আবার আগের মতো হয়ে যাবে কাশ্মীর।

আমারও সেরকমটাই ভাবতে ভালো লাগল। দীপক অবশ্য বলত অন্যকথা। তার মতে কাশ্মীর একটা অসম্ভব স্পর্শকাতর স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট, কোনও বিগ পাওয়ারই চায় না ওখানে শান্তি আসুক। কাশ্মীরের আগুন সহজে নিববে না।

সেবছর খুরশিদ হঠাৎ অসময়ে আবির্ভূত হল কলকাতায়। পুজোর আগে। আমি বেজায় অবাক। বললাম — কী গো, তোমার চিনারগাছের পাতারা কি এবার তাড়াতাড়ি

হলুদ হয়ে গেল? নাকি খিলানমার্গে সেপ্টেম্বরেই বরফ পড়ছে?

খুরশিদকে রীতিমতো বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। শুকনো মুখে বলল — নেহি দিদি। বরফ গিরছে নসিব কা উপর।

—নতুন করে আবার কী হল?

—বহুত প্রবলেমে পড়ে গেছি দিদি। বিজনেসের হাল খুব খারাপ। টাউন জুড়ে পুলিশ মিলিটারি, হপ্তায় দো দিন তিন দিন স্ট্রাইক.....বেচাকেনা বিলকুল হচ্ছে না। দুকান বন্ধ রাখলে পুলিশ মিলিটারি শাসায়, খোলা রাখলে জান লিয়ে টানাটানি। কেয়া করে কুছ সমঝমে নেহি আতা।

—তাই চলে এলে?

—কী করব থেকে? ট্যুরিস্ট ভি তো নেই। ফুফাজি-কা কারবার চৌপাট, হাউসবোট সুনা পড়ে আছে। দো ফরেনার এসছিল, এক হপ্তে-কা অন্দর তারাও ভাগল। হয়রান হয়ে ফুফালোগ মন্থুরা চলে গেল, গাঁওমে। খুরশিদ ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, —হামলোগকা ফ্যামিলি-কা হালত্ ভি ঠিক নেহি। তাউজিরা সব সেপ্রেট হয়ে গেল।

—সে কী?

—হাঁ দিদি, ক্রাইসিস কা টাইম-মে শাযদ অ্যাইসা হি হোতা হ্যায। পেট ঠান্ডা আছে তো দিমাক ভি ঠান্ডা, নেহি তো রিস্তা খতম। তাউজি কা লেড়কালোখ অলগ্ বিজনেস শুরু করে দিল। টিম্বারকা। ঘরমে পার্টিশান উঠে গেছে।

—ওহ্ হো, এ তো সত্যিই খুব খারাপ খবর।

—আব্বাজান তো বহুত আপসেট হয়ে গেছেন। বড়াভাইকো ইত্না ইজ্জত করতে থে..।

—কী করবে বলো, সংসারের এরকমই নিয়ম। বিপদের সময়ে সবাই স্বার্থ দেখে, কে আর শ্রদ্ধা-ভক্তির তোয়াক্কা করে।

একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে, গাঁঠরি খুলছে খুরশিদ। সামান্য অস্বস্তিতেই পড়ে গেলাম। পুজোর মুখে আবার এখন কেনাকাটা?

মিনতির ভঙ্গিতে বললাম,—এখন শাল-টাল আর বের কোরো না খুরশিদ। যা প্যাচপেচে গরম, ভেবেই আতঙ্ক হচ্ছে।

—শল আনি নি দিদি। শল হ্যায় কাঁহা? কারখানা তো বন্ধ।

—তো কী এনেছ? সেই তোমার লুধিয়ানার সোয়েটার কম্বল?

—ও ভি নেহি দিদি। ও চিজ ভি এখন কলকাত্তামে চলবে কেন? খুরশিদ ম্লান হাসল, —ইখানে জান পহেচান তো আছে, মহাজনলোগদের কাছ থেকে কুছ শাড়ি কাপড়া তুলে নিলাম। পুজোর টাইমে আপনারা বহুত চিজ খরিদ করেন, হামার কাছ থেকে ভি দু-চার পিস্ লিয়ে লিন।

ভারী মায়া হল খুরশিদের ওপর। বেচারার চেহারাটাও কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। ঔজ্জ্বল্য কমে আসা মুখে কালচে ছায়া, ঠেলে উঠছে গালের হনু, চোখ দীপ্তিহীন।

বললাম,—ঠিক আছে, কী এনেছ দেখি।

শাড়িগুলো বার করতেই নাক কুঁচকে গেল। সবই প্রায় সিন্থেটিক। সস্তার। এইসব শাড়ি বেচতে এসেছে খুরশিদ? হায় রে, পারস্যের রাজকুমারের এই অধঃপতন?

খুরশিদ কমলা রংয়ের একখানা কাপড় এগিয়ে দিল—এঠো আপ রাখ্ লিজিয়ে দিদি। আপনাকে বহুত মানাবে।

ইস এই ক্যাটকেটে রংয়ের শাড়ি পরব আমি? হাতে করে এ শাড়ি কাউকে দেওয়াও যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, —আর কিছু নেই? অন্য টাইপের? সিল্কটিল্ক?

—ম্যাহেঙ্গা কাপড়া তুলতে পারিনি দিদি। জাদা ক্যাশ ছিল না। হামলোগকো তো উধার দেনে মে....। খুরশিদ হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু পরে গলা নামিয়ে বলল, —বিবিকে নিয়ে এসেছি দিদি। ডক্টর দিখানে। উসকা ভি তো খরচা আছে। চমকিত হলাম—তোমার বউ এসেছে? আগে বলবে তো?

খুরশিদের মুখে অপ্রস্তুত হাসি,—উন্‌কা পেটমে একটো দর্দ্ হচ্ছে। ভাবলাম কলকাত্তার ডক্টর দেখিয়ে দিই। বাচ্চেলোগ ভি আয়া। উধার তো স্কুল উল সব বন্ধ পড়া হ্যায়, সোচলাম ও লোগ ভি সাথ সাথ চলুক।

—ও মা, ফুল ব্যাটেলিয়ান নিয়ে এসেছ? কোথায় উঠেছে ওরা?

—চাঁদনি চউককে বগলমে। ছে মাহিনেকে লিয়ে এক কামরা কিরায়াপে নিয়ে নিলাম।

—খুব ভালো করেছ। একদিন নিয়ে এসো সবাইকে। দেখি ওদের।

—জরুর আনব দিদি। হামার বিবি আপনার কথা বহুত শুনেছে। তবে উয়ো তো ঘরসে জাদা নিকালতি নেহি। লোজ্জা পায়।

—তো কী আছে? দিদির কাছে আসবে...

—বিলকুল সহি। দো চার দিন যেতে দিন, নয়া শহরমে জরা অ্যাডজাস্ট করে নিক...

খুরশিদের বিবির অনারে রেখেই দিলাম একটা শাড়ি, হাল্‌কা রংয়ের। গড়িয়াহাটে সাড়ে তিনশোয় পেতাম, খুরশিদ একটু বেশিই নিল। দরাদরি করলাম না। যাক গে, বেচারা চাপে আছে, না হয় দু-পয়সা বেশি লাভ করল।

ছুটির সকালে আড্ডা মারতে বেরিয়েছিল দীপক, ফিরতেই তাকে শোনালাম খুরশিদ সমাচার। দীপক শুনে তেমন প্রীত হল না, সন্দিগ্ধ স্বরে বলল—কাশ্মীরিদের এরকম অড টাইমে কলকাতা আসাটা তো খুব সুবিধের কথা নয়। স্পেশালি বউবাচ্চা নিয়ে চলে আসাটা।

—আহা, ও তো বউকে ডাক্তার দেখাতে এনেছে।

—স্টিল...শুনেছ কখনও কাশ্মীরি শালওয়ালা বউ নিয়ে এসেছে? আই থিংক সামথিং ইজ রং।

—কী রং?

—অনেক কিছু হতে পারে। চোখকান খোলা রাখো না? দেখতে পাও না, কাশ্মীরে এখন ঘরে ঘরে এক্সট্রিমিস্ট?

—কী পাগলের মতো যা তা বলছ? খুরশিদ এক্সট্রিমিস্ট? ওঁর সঙ্গে এতকাল কথা বলেও বোঝনি ও একজন ফ্যামিলিম্যান?

—উগ্রপন্থীরা কি আকাশ থেকে পড়ে? তাদেরও ফ্যামিলি থাকে। বাপ মা ভাই বোন বউ বাচ্চা....। খুরশিদ নিজে ইনভলভড্ না হলেও তার কানেকশন থাকতে পারে।

—যাহ্, আমি বিশ্বাস করি না।

—কোরো না। বাট বি প্র্যাকটিকাল। বি র‍্যাশনাল। সত্যি করে বলো তো খুরশিদকে তুমি কতটুকু চেনো? বছরে পাঁচ-সাতটা দিন আসে, কিছু ধসায়। কিছু মিষ্টি মিষ্টি গল্প শোনায়, ব্যাস। ওর ফ্যামিলি সম্পর্কে ও যা বলেছে তুমি সেইটুকুই জানো। এমন হওয়া কি নেহাতই অসম্ভব, ওদের ফ্যামিলির কেউ জঙ্গিদলে নাম লিখিয়েছে? পুলিশ হয়তো বাড়িশুদ্ধ সবাইকে হুড়কো দিচ্ছিল, তাই হয়তো পিঠ বাঁচাতে.... ?

এবার যেন অত জোর করে না বলতে পারলাম না। আপনা-আপনি মাথা দুলে গেল — তা অবশ্য ঠিক। তবে...।

—তবে টবে নয়। কে বলতে পারে খুরশিদের ছেলেটাই উগ্রপন্থী দলে ভেড়েনি?

—ধ্যাত, দিস ইজ টু মাচ। খুরশিদের ছেলে কতটুকুনি? হার্ডলি বারো কি তেরো।

—ওই বয়সের ছেলেরাই বেশি গালিবল্ হয়। তাদের তাতিযে দেওযাটাও সোজা। খবরে দ্যাখো না, ওই বয়সের কত ছেলে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে?

অস্বীকার করার উপায় নেই। এই তো ক-দিন আগে একদল সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়ল কাশ্মীরে, তাদের মধ্যে দেবশিশুর মতো দেখতে কযেকটা কিশোরও তো ছিল। কী সব ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তাদের কাছ থেকে। মর্টার গ্রেনেড কার্তুজ রাইফেল রকেটলঞ্চার....

দীপক আজকাল ধূমপান প্রায় ছেড়েই দিযেছে। হঠাৎ ফস করে অসময়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল—শোনো, খুরশিদ তোমায যতই দিদি দিদি করুক, ভুলে যেয়ো না ও কাশ্মীরি। ওদের মদত আছে বলেই জঙ্গিরা জো পেয়ে গেছে। ...খুরশিদ কেমন, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে আমাদের লাভ নেই। তবে ওঁর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করাটা বোধহয় আর ঠিক নয।

—আহা মাখামাখিটা কী করি?

অ্যাদ্দিন ধরে বাড়িতে আসছে, হেসে দু-চারটে কথা বলি। তার বেশি তো কিছু নয়।

—ওইটুকুই ঠিক আছে। অভদ্র হওয়ার দরকার নেই। তবে বি ফরমাল। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে এলে বেশি আহ্লাদ কোরো না। অবশ্য আদৌ যদি নিয়ে আসে।

—আনবে না কেন? না আনার কী আছে?

—দ্যাখো কী করে। ওরা তো খুব পরদা-টরদা মানে। পর্দানশিন বউকে হুট করে একটা হিন্দুর বাড়িতে এনে হাজির করবে...আই ডাউট। আর ছেলেটার যদি কোনও ব্ল্যাক স্পট-টট থাকে তো হয়েই গেল। রাস্তায় ঘাটে ওকে থোড়াই বেশি বার করবে।

কিছুতেই মন থেকে মানতে পারছিলাম না কথাগুলো। আবার একটা কূট সংশয়

ঘোরাফেরাও করছিল মনে। একসঙ্গো দুটো স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। একটা স্বর চেঁচিয়ে বলছিল, অসম্ভব অসম্ভব। অন্যস্বর মৃদুভাবে বিনবিন করছিল, হতে পারে, হতে পারে, হতেও তো পারে।

খুরশিদ বউ-বাচ্চা নিয়ে এল না।

সেবছর আর দর্শনই মিলল না খুরশিদের।

৩

শুধু সেবার নয়, খুরশিদ পরের বছরও গরহাজির। তার পরের বছরও।

ইতিমধ্যে বাড়িতে একটা বড়োসড়ো অনুষ্ঠান লেগে গেল। বুবলির বিয়ে।

কলেজের এক সহপাঠীর সঙ্গো অনেকদিন ধরে ভাবসাব চলছিল বুবলির। মৈনাক। বেশ ঝকমকে ছেলে। আমাদেরও মৈনাককে খুব পছন্দ। তবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেরিয়ার আর ভবিষ্যত নিরাপত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। মৈনাক মনের মতো একটা চাকরি পায়নি বলে ওদের বিয়ের ফুলটা ফুটি-ফুটি করেও ফুটছিল না। চেন্নাইতে একটা বহুজাতিক কোম্পানিতে অফার পেয়ে তবে ছাঁদনাতলায় যেতে রাজি হল মৈনাক।

তা বিয়ে কি যে-সে ব্যাপার, বিয়ে মানে মহাযজ্ঞ। ঘুরে ঘুরে মার্কেটিং করো রে, গয়না গড়াতে দাও রে, ফার্নিচারের অর্ডার দিতে ছোটো, বিয়েবাড়ি বুক করো, কেটারিং, ডেকরেটার, গাড়ির আয়োজন, নেমন্তন্নর লিস্ট এবং চরকির মতো ঘুরে ঘুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বেড়ানো। কাজের সঙ্গো সঙ্গো টেনশানও চলে অবিরাম। কোথাও কোনও গোল পাকাবে না তো? ভালো মতন উৎরোবে তো বিয়েটা?

খুরশিদের কথা তখন আর আমাদের মাথাতেই ছিল না। থাকার কথাও নয়। সে আর এমন কী ইম্পর্ট্যান্ট ব্যক্তি? তবে কাশ্মীরে অশান্তি চলছেই, উত্তরোত্তর বাড়ছে বই কমছে না। শ্রীনগরের কোনও কোনও খবর ক্বচিত কখনও স্মরণে এনে দেয় খুরশিদের মুখ। পুলিশ মিলিটারির পাশাপাশি জঙ্গি আর সাধারণ মানুষও মারা যাচ্ছে প্রায়ই, কাগজে সেভাবে হতাহতের তালিকাও বেরোয় না। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, ওই সব মৃতদেহ ভিড়ে খুরশিদ নেই তো? বুকটা একটু খচখচও করে কখনও সখনও। খুরশিদকে কি চিনতে ভুল করেছিলাম?

বুবলির বিয়েটা হল অঘ্রাণের গোড়ায়। অনুষ্ঠান চোকার পর দুম করে হঠাৎ সব ফাঁকা হয়ে গেল। অফিস যাই, বাড়ি আসি, ফিরে আসি, ফিরে স্বামী স্ত্রী মুখোমুখি বসে থাকি ফ্ল্যাটে। বুবলি যে আমাদের কতখানি ছিল টের পাই প্রতি মুহূর্তে। খাবারে স্বাদ পাই না, বই উলটোতে ভালো লাগে না, অকারণে টিভির চ্যানেল ঘোরাই... একটা বিশ্রী শূন্যতা যেন গ্রাস করে ফেলছিল আমাদের। মন ভালো করার জন্যে দুজনে ক-দিন বেড়িয়ে এলাম পুরী থেকে। বলা যায় সে আমাদের দ্বিতীয় মধুযামিনী। বালুকাবেলায় বসে ঢেউ গোনা আর স্মৃতি রোমন্থন — এছাড়া আর কীই বা করার থাকে আমাদের মতো হঠাৎ একলা হয়ে যাওয়া মধ্যবয়সি দম্পতির?

তাও খানিকটা তরতাজা হলাম বইকি। ফিরে এসে আবার শুরু হল দিনগত

পাপক্ষয়। একটু একটু করে ফিরছি পুরনো বৃত্তে। অফিসের। বন্ধু-বান্ধবদের। আত্মীয়স্বজনের।

তখনই হঠাৎ একদিন খুরশিদের উদয়।

দারুণ চমকেছি। যতটা না খুরশিদকে দেখে তার চেয়ে বেশি খুরশিদের চেহারার পরিবর্তনে। অনেকটা বয়স বেড়ে গেছে খুরশিদের, যুবক যুবক সেই ভাবটাই নেই। মাত্র দু-বছরে এত বুড়ো হয়ে যায় মানুষ? জন্নতের বাসিন্দারাও?

খানিকটা থতমত খেয়েই দাঁড়িয়ে ছিলাম। চটকা ভাঙল খুরশিদের হাসিতে। গাল ছড়ানো হাসি, অনেকটা সেই পুরনো ঢংয়ের।

ঘাড় ঝুঁকিয়ে খুরশিদ বলল —নমস্তে দিদি। কেমন আছেন?

—চলছে একরকম। এসো এসো, ভেতরে এসো।

দীপক অন্দরে দাড়ি কামাচ্ছিল। ড্রয়িংরুমে এসে সেও অবাক। বলল —কী ব্যাপার, কোথায় ছিলে এতদিন?

মাঘের গোড়ায় শীতটা হঠাৎ কমে গেছে। মৃদু মৃদু ঘামছিল খুরশিদ। কাঁধের গাঁঠরি নামিয়ে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে বলল—ঘরেই ছিলাম বাবুজি। তবিয়ত ঠিক ছিল না, তাই পিছলে দো সাল আসতে পারিনি।

—কী হয়েছিল?

—বুখার, খাঁসি, হাতে পায়ে জোর পেতাম না....

—টিবি?

খুরশিদ মাথা নাড়ল—হাঁ বাবুজি। ওইরকমই।

—তো বেরিয়েছ যে আবার?

—অভি ঠিক আছি। ফিট...আপলোগ কাঁহা থে বাবুজি? আমি একবার ফিরে গেছি।

—একটু বাইরে গেছিলাম। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল তো, মন ভালো লাগছিল না।

—বহিনের শাদি হয়ে গেল? খুরশিদের চোখে নিখাদ বিস্ময়—সচ্? কব?

—এই তো, দু-মাস পোরেনি। বুবলি এখন বরের সঙ্গে চেন্নাইতে।

—ইস, জরা আগে এলে ভালো হত। বহিনের শাদি দেখতে পারতাম।

—হ্যাঁ, বুবলিও তোমার কথা বলছিল।

নেহাতই ভদ্রতা করে বলা। শুনে ভারী খুশি হল খুরশিদ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছে বুবলির শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে। আগের মতো উচ্ছ্বাস নেই বটে, তবে আন্তরিকতাটা আছে। দেখে আমার প্রাথমিক আড়ষ্টতাটা কেটে যাচ্ছিল।

মনের মধ্যে পুষে রাখা প্রশ্নটা করেই ফেললাম—সেইবার তুমি কোথায় ভ্যানিশ করে গেলে বলো তো? বিবি-বাচ্চা নিয়ে আসবে বলেছিলে...?

—গুস্তাকি মাফ করবেন দিদি। শ্রীনগরসে অচানক বুরা খবর এল, আব্বাজানের স্ট্রোক হয়েছে।

—তাই বলো। দীপকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিলাম —এখন কেমন আছেন তিনি?

—নেই। ইন্তেকাল হয়ে গেল। স্ট্রোকক্কা দুসরা দিনই।

—ও। ....বাড়ির আর সবাই... ?

—আছে। আব্বাজানকে গুজর যানে কে বাদ আম্মিকে হাল ভি কুছ খাস নেহি। টেনশান সব কো খা যা রহা হ্যায়।

—তোমার বিবির সেই ট্রিটমেন্ট হল ?

—ঠিকসে আর হল কই দিদি। ওখানেই হাকিমজিকা দাওয়াই চলছে। কেয়া করে, তকদিরমে যো লিখা হ্যায় ওহি হোগা। নেহি তো আব্বাজান ওরকম চলে যাবেনই বা কেন ? আমিও কেন বিমারিতে পড়ে যাব ?

দীপক সোফায় বসেছে। বলল—তোমাদের ওখানকার গন্ডগোল থামারও তো কোনও লক্ষণ নেই !

—না বাবুজি। ইস্ হালমে হি সব কুছ চালাতে হবে।

—বিজনেসের অবস্থা কেমন এখন ? একই ?

—থোড়া বেহতর হুয়া। ফ্যাক্টরিমে থোড়া বহুত কাম হচ্ছে। আদমি কিতনা দিন ভুখা থাকবে বাবুজি ? মেরা লেড়কা ভি এখন কামে লেগে গেছে। দুকানমে। মেরা ছোটাভাইকে সাথ।

কথা প্রসঙ্গে নিজের বাড়ির কিছু শুভ সংবাদও দিল খুরশিদ। তার ভায়ের বউয়ের একটা ছেলে হয়েছে, ছোটোবোনের বিয়ের ঠিক হয়েছে জম্মুতে, পাত্র সরকারি চাকরি করে, এই বসন্তেই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে নাজনিন।

কী আশ্চর্য ! যেখানে সারাক্ষণ গোলাগুলি চলছে, বাতাসে অহরহ বারুদের ঘ্রাণ, সেখানেও জীবন থেমে নেই। জন্ম মৃত্যু বিয়ে সুখ অসুখ সবই তো চলছে ! আপন লয়ে ! নিজস্ব ছন্দে !

গল্প শোনাতে শোনাতেই খুরশিদ গাঁঠরি খুলে ফেলেছে। বলল—এবার আপনাকে শাল দিখাই ?

মনে মনে বললাম, শাল তো গাদা জমে গেছে, আর নিয়ে কী করব ?

মুখে বললাম—কীরকম শাল এনেছ ?

খুঁজে খুঁজে তলার দিক থেকে খুরশিদ একখানা চন্দনরঙা শাল বার করল। চন্দনরংয়েরই সুতো দিয়ে অলওভার কাজ। বলল,—ইস চিজ কো দেখিয়ে। একদম আনকমন। আমার দিদি নিজের হাতে বানিয়েছেন। বহুত মেহনত হয়েছে।

শালখানা সুন্দর তো বটেই, হাত বুলিয়ে বুঝলাম যথেষ্ট মহার্ঘও। তবু জিজ্ঞেস করলাম—দাম কত ?

—দাম নিয়ে আপনি ভাববেন না দিদি। রেখে দিন।

—তবু শুনি দামটা ?

—অন্য কাস্টমার হলে তিন হাজার। আপনি যা খুশি দেবেন।

—সর্ব্বনাশ, এতটাকা দামের শাল দিয়ে আমার কী হবে ?

—গায়ে ওড়াবেন। আমার এক দিদি বানিয়েছে, এক দিদি পরবে।

বেশি আপত্তি করার সুযোগই দিল না খুরশিদ। শালখানা প্রায় জোর করে গুছিয়ে

রেখে দিল পাশে।

খুরশিদ চলে যাওয়ার পর দীপক মিটিমিটি হাসছে —কী, গ্যাস খেয়ে ক্ষুদিরাম বনে গেলে তো?

—মানে? আমি চোখ কুঁচকোলাম।

—কলকাতার শীতে তিন হাজার টাকা দামের শাল তুমি কোথায় পরবে?

—পরব না। আলমারিতে সাজিয়ে রাখব। বুবলিকে দিয়ে দেব। বলেই বাঁকা সুরে প্রশ্ন ছুঁড়লাম—খুরশিদ সম্পর্কে তোমার ভুলটা ভেঙেছে তো? বুঝলে, তোমার মন্তব্যগুলো কত অসার ছিল?

দীপক উত্তর দিল না। শুধু আলগাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল।

৪

মাসখানেকও বোধহয় কাটেনি, হঠাৎই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

সেবছর শীতটা গিয়েও আবার ফিরে এসেছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে বাতাস বইছিল কনকনে, হাঁড় কাঁপানো। লেপকম্বল আবার পাড়তে হয়েছিল লফ্‌ট থেকে। বাসে-ট্রামে অফিসে রাস্তায় সর্বত্র বেখাপ্পা আবহাওয়ার আলোচনা।

সন্ধেবেলা সেদিন তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিল দীপক। আমি ঢোকার পর পরই। দুজনে শাল মুড়ি দিয়ে মৌজ করে কফি খাচ্ছিলাম, তখনই দরজায় বেল।

খুরশিদ।

বিকেল সন্ধের দিকে কখনওই আসে না খুরশিদ। অবাক হয়ে বললাম। —তুমি?

হাঁপাচ্ছিল খুরশিদ। মুখ থমথম করছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—আমি ঘর চলে যাচ্ছি দিদি। আভি। রাতকি গাড়িমে।

খুরশিদের পোশাকআশাকও আজ অন্যরকম। প্যান্টশার্টের বদলে শিলওয়ার কুর্তা, কাঁধে গাঁঠরির বদলে কিটসব্যাগ এবং হাতে একটি স্যুটকেস।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম—আজই ফিরছ মানে? হঠাৎ কোনও খবরটবর এসেছে নাকি?

—নেহি দিদি। লেকিন আমি আর একদিনও থাকব না। আর বিজনেস করব না এখানে।

দীপকের চোখ কুঁচকে গেল —কেন?

হলটা কী?

—কেয়া কহুঁ বাবুজি, আপনারাই হামাদের থাকতে দিচ্ছেন না।

—মানে?

খুরশিদ উত্তেজিত স্বরে বলল—কাল রাতকো অচানক পুলিশ এসে ডেরায় হামলা করল। সাত আদমিকে তুলে নিয়ে গেল। কিতনেবার বললাম আমরা বহুত সাল সে কলকাত্তা আসছি, আমাদের বহুত সারে কাস্টমার আছে, শুনলই না। পিটল আমাদের। কৌন এক মকবুল নামকা টেররিস্ট কলকাত্তামে আয়া হ্যায়, আমরা নাকি তাকে ছুপিয়ে রেখেছি...। আপলোগ হি বোলিয়ে, অ্যাইসা সোচনা কেয়া সহি হ্যায়?

—আহা, এত এক্সসাইটেড হচ্চ কেন? দীপক খুরশিদকে শান্ত করতে চাইল—এ তো পুলিশের ভুল। পুলিশরা আকছার এরকম ভুল করে। ছেড়েও তো দিয়েছে!

—তো? সব মিটে গেল? আপ সোচ ভি নেহি সকেঙ্গে কিতনা বুরা বুরা গালি দিয়া। কাশ্মীরমে ভি ইতনা গালি নেহি শুননা পড়তা। হামলোগ্ হিন্দস্তানকে গন্দা করে দিচ্ছি...লাথ মারকে হামলোগকো হিন্দুস্তানসে নিকাল দেনা চাহিয়ে....।

—আরে দূর দূর, ওসব গায়ে মেখো না। দেখছ তো এখনকার সিচুয়েশান। তোমাদের কাশ্মীরে পাকিস্তানের চরটর থাকে তো, তাই আর কি...। এবার চিনে গেল। আর প্রবলেম হবে না।

—নেহি বাবুজি। আমি পহেলে বলিনি, হর বার অ্যাইসা হোতা হ্যায়। পুলিশ পকড়তি নেহি, লেকিন ডেরামে এসে পুছতাছ করে যায়। নাম পতা সব উনকো দেনা পড়তা হ্যায়। কিঁউ অ্যাইসা হোগা বাবুজি? আমরা কি ইন্ডিয়ান নেহি? আপনে হি দেশ মে বিজনেস করতে পারব না? খুরশিদের গলা থেকে তীব্র উষ্মা ঝরে পড়ছে। চোখে গনগন করছে ক্ষোভ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—ইয়ে বহুত গলত বাত হ্যায় বাবুজি। অ্যাইসা নেহি হোনা চাহিয়ে।

দীপক ফস করে বলে বসল—পুলিশকে শুধু দোষ দিলে তো হবে না ভাই। পুলিশকে তো তার ডিউটি করতেই হবে। তাছাড়া তোমাদেরও তো দোষ কম নেই। আই মিন কাশ্মীরিদের।

—হামলোগকা কেয়া কসুর বাবুজি? কাশ্মীরি হলেই এক্সট্রিমিস্ট বনে গেল?

—ঠিক তা নয়।...তবে তোমরাও তো এ দেশটাকে ঠিক আপন ভাবতে পারো না।

এ ধরনের কথা শোনার জন্য খুরশিদ বুঝি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তার ফরসা মুখ আরও লাল হয়ে গেছে। আহত মুখে বল — এ আপনি কী বললেন বাবুজী? আপনারা আমার আপনালোগ নয়?

—আহা হা, তা বলছি না। আমি বলতে চাইছি তোমরা তো ইন্ডিয়াতে কখনও ...

—দেশ কি সির্ফ এক মিট্টিসে বনতা হ্যায় বাবুজি? দেশ তো আদমি সে হি বনতা হ্যায়। ফিলিংস্‌সে বনতা হ্যায। আপনারা যদি আমার আপনা হন, তো দেশ কেন আপনা হবে না?

সোজা সরল যুক্তি। দীপক ঝপ করে জবাব দিতে পারল না। একটু আমতা আমতা করে বলল—তাহলে আর তোমাদের ওখানে এত প্রবলেম হচ্ছে কেন?

—ও তো নেতালোগকা মর্জিকা খেল্ হ্যায় বাবুজি। হামলোগ আম আদমি। হামলোগ তো স্রিফ পুতলি হ্যায়, পুতলি। খুরশিদের স্বর ভারী হয়ে এল—শুনিয়ে বাবুজি, কাশ্মীর ইন্ডিয়ামে রহে, ইয়া পাকিস্তানমে, উসমে হামলোগকা কোই ফরক নেই পড়েগা। কাশ্মীর অলগ কান্ট্রি বনে গেলেই বা আমজনতার এক্সট্রা কী ফায়দা হবে? হামলোগ তো য্যাইসে কি ত্যাইসে হি রহেঙ্গে। কাম করো, রোটি কামাও, বাচ্চা পালো, ঘর চালাও...। ডিসটার্বেন্স হলে হামলোগকা হি জাদা নুকসান হবে বাবুজি।...নেহি বাবুজি, আম আদমি কভি ভি মারদাঙ্গা নেই চাহতা। হামলোগকা শান্তি চাহিয়ে। হামলোগ জিনা চাহতে হ্যাঁয়।

দীপক এবার একেবারে স্পিকটি নট্‌। আমি স্থির চোখে খুরশিদকে দেখছিলাম। তার মুখমণ্ডলের ক্রোধ বদলে গেছে বিষন্নতায়। মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুরশিদ শালওয়ালা।

খুরশিদ বিড়বিড় করে বলে উঠল—এক বাত কহুঁ বাবুজি? গুলাবফুল পেড়মে হি জাদা আচ্ছি লগতি হ্যায। ফির ভি সবকোই গুলাবকো তোড়কে আপনে কজ্জেমে রাখনা চাহতা হ্যায়। ইস্‌মে গুলাবকা কিতনি তকলিফ্‌ হোতি হ্যায, কোই সোচতা হ্যায় কেয়া?

ঘরের বাতাস যেন আরও ভারী হয়ে গেল সহসা। অস্ফুটে বললাম—তোমার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি খুরশিদ। তবু বলি, একটু ভাবো। দুম করে এভাবে বিজনেস ফেলে চলে যেযো না।

—নেহি দিদি। কাফি হো গিয়া। পুলিশের কথা বাদ দিন, আপনারাও তো আমাদেব বিশ্‌ওযাস করতে পারেন না। ঘরকা রুখাসুখা রোটি ইস অপ্‌মানসে বেহতর হ্যায।

নাহ্‌, মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, অবিশ্বাসের একটা শিকড় তো সত্যিই আমাদের মধ্যে চারিয়ে আছে। আজন্মলালিত কিছু সংস্কারও।

তবু বললাম—তোমার এখানে এত টাকা পড়ে রইল....?

—যিতনা হো সকে আজ কালেক্ট করে নিযেছি। সবকোইকো পতা ভি দিযে দিলাম, যদি দিতে চায় পাঠিয়ে দেবে।

—আমার টাকাটাও তাহলে নিযে নাও।

—নেহি দিদি। আভি রহনে দিজিযে। অনেকক্ষণ পর খুরশিদ ভাঙা ভাঙা হাসল,

—আপনি যখন কাশ্মীর আসবেন তখন নিযে নেব।

যাহ্‌, তা হয় নাকি? জোরে জোবে মাথা নাড়লাম, যদি কোনও দিন কাশ্মীব যাওয়া না হয?

—তো কী আছে! জানব, আমার দিদির কাছে আমার রুপিযা বাখা আছে।

কিছুতেই টাকাটা নেওযাতে পারলাম না খুরশিদকে। খুদা হাফিজ বলে চলে গেল খুরশিদ।

আমি বসে রইলাম স্থাণুবত। কেমন যেন অবশ অবশ লাগছিল নিজেকে। আষ্টেপৃষ্ঠে শাল জড়িয়েও শীত শীত করছিল।

৬

ক-দিন আগে কাশ্মীরে একটা যুদ্ধ হয়ে গেল। কারগিল্‌ ওয়ার। গোটা উপত্যকায় অশান্তি এখন চরমে। সৈন্যসামন্তের বুটের আওয়াজে পীরপাঞ্জাল কাঁপছে থরথর।

এমন পরিস্থিতিতে কাশ্মীর যাওযার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কাশ্মীর যাওয়া আর বোধহয় হবেও না আমাদের। সব কিছু শান্ত হয়ে গেলেও। গত বছর মে মাসে চাকরি থেকে রিটায়ার করল দীপক। আজীবন অফিসপাগল মানুষ ছিল, দুম করে কর্মজীবনের অবসানটা ধাতে সয়নি। মাস দুয়েকের মাথায় হঠাৎ একদিন স্ট্রোক। সেরিব্রাল অ্যাটাক। তেমন ভয়ংকর কিছু ঘটেনি বটে, তবে চলাফেরা

খুব নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে দীপকের। সঙ্গে সঙ্গে আমারও। কাশ্মীর তো দূরস্থান, চেন্নাইতে বুবলির কাছে যাওয়ার কথা ভাবলেও নার্ভাস লাগে।

তবে কাশ্মীর এখনও টানে আমাদের। বরফঢাকা পীরপাঞ্জাল নয়, সোনমার্গ গুলমার্গ পহেলগাঁওয়ের নিসর্গ নয়, বাদশাহি গোলাপ বাগান নয়, লিদ্দার ঝিলমসিন্ধু নয়, চিনারগাছের পাতারাও নয়। টানে একটা অভিমানী মুখ। এক বিষন্ন চলে যাওয়া।

খুরশিদের টাকাটা আজও পাঠানো হয়নি। পাঠাতে পারিনি। যদি খুরশিদ কিছু মনে করে? যদি খুরশিদ আবার আঘাত পায়?

দেনাটা রয়েই গেল।

কার কাছে দেনা? খুরশিদ? না কাশ্মীর? □

শিল্পী

আ ন সা র উ দ্দি ন

শিল কোটাবেন শি-ল। শিল কোটাবেন শিল। শিলের উপর রামমন্দির বাবরি মসজিদের ছবি আঁকা হয়। লোকটা হাঁকল, আবার হাঁকল। গলাটা প্রায় কলার মোচার মতো ফুলে উঠছিল। এই উদাস দুপুরে তার রব প্রতিটি বাড়িতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিল। লোকটা হাঁকছিল আর হেঁটে যাচ্ছিল। খালি পা। পরনে শতেক রকমেব তালিমারা প্যান্ট। বোতামহীন। দড়ি দিয়ে কোমরের সঙ্গে আটকানো। মুখের উপরের পাটির কয়েকটা দাঁত নেই। রোদে জলে সেদ্ধ হয়ে শরীব তামাটে। গাযেব জামাটা বোধ হয শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নেয়া। পিঠ বরাবর ছিড়ে বাতাসে হগল-কাল। কনুই থেকে একটা হাতা নেই। কাঁধে ঝোলানো ঘোড়া রংযের ঢোলা ব্যাগ। কপালের মাঝখানে ডাবের মতো মস্ত আব। মোট কথায় চেহাবাটা অদ্ভুত। এই অদ্ভুত চেহাবার মানুষটাকে একবার দেখলে চিনে নিতে কষ্ট হয না। মাথাব প্রায তাবত চুল কপালেব উপর থেকে উড়ে পালিযেছে হযতো বা কোনো ঝোড়ো বাতাসে। বাদবাকি চুলগুলো পিছনের পাড় ধরে ঝুলছে। মুখে গুটি বসন্তের অসংখ্য ছোটো ছোটো গর্ত। একপলক তাকিযে দেখলে মনে হয ওর সাবা-মুখের উপর একসময রীতিমতো ঝড়-বৃষ্টি বযে গেছে।

কযেকটা কুকুর এগলি-ওগলি থেকে বেবিযে এল ঘেউঘেউ কবে। তাদেব ডাকাডাকিতে আরও কিছু। লোকটা একবার থমকে দাঁড়াল। পাযের তলাব তপ্তধুলোয পুড়ে যাচ্ছিল তার পা। হিংস্র কুকুরগুলোর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটাকে সে যাচাই করতে চাইল। বুঝল, প্রভুভক্ত এইসব জন্তুগুলোর আর যাই হোক জাতিভেদ ধর্মভেদ নেই। বাঁ কাঁধের ঝোলায একহাত রাখতেই নিজেকে কিছুটা মুক্ত করতে পারল। আরও কয়েক পা কুকুরের শোভাযাত্রার মধ্যে এগিযে হাঁক দিল—শিল কোটাবেন—শিল। শিলের উপর—

—দাঁড়াও, ওগো কোটাই মিস্ত্রি। একজন মাঝবযসি বনেদি বাড়ির বউ বেবিযে এল।

—শিল কোটাবেন মা?

—হ্যাঁ। তা নয়তো কীজন্য ডাকা। শিলই কোটাব আমরা।

—আপনারা ক ঘর?

—আমরা তিন ঘর। তিনটে শিল।

—আর কেউ কোটাবে না?

—বাটনাবাটা কাজ যখন কোটাবে বইকী। পথের ওপাশে মিযাপাড়া।

—আপনাদের গাঁয়ে হিন্দু মোছলমান দুইয়েরই বাস?

—হ্যাঁ। দু-জেতের মানুষ দু-পাড়াতে বাস করে। এপাড়া-ওপাড়া মন্দির-মসজিদ। এই দুপুরে কুথায় বা যাবে। শিল যদি কোটাও তবে সামনে ওই অশথতলায় বস। হ্যাঁ

গো কোটাই মিস্ত্রি, শিলের গায়ে সত্যি সত্যি রাম-মন্দিরের ছবি আঁকা হয়?

—হ্যাঁ মা। আগে তো শিলের গায় লতাপাতা ফুল প্রজাপতির ছবি আঁকতাম। পানপাতা পরীদের ছবি আঁকতাম। এখন ওসব চলে না। দিনে দিনে দিনকাল সব পালটে যাচ্ছে। মানুষের নতুন করে ধর্মে মতি ফিরছে। রামমন্দির বাবরি মসজিদ সব আঁকি। সেই একই হাত একই ছেনি-হাতুড়ির কারসাজি। যার যা পছন্দ। যান, এবার শিল আনেন। আপনারটা থেকে এ বেলাটার যাত্রা শুরু করি। আচ্ছা মা, একটু জল পাওয়া যাবে? লোকটা করুণ মুখে নিঃশব্দে হাসল। যা রোদের তাপ, পথ নয়তো খোলা হাঁড়ি। একমুঠো চাল ফেলুন সঙ্গে সঙ্গে মুড়ি। যা ডাকাতি খরানি। —বলে পথের ধারে বনের উপর পা ঘষল। হয়তো-বা একটু আরাম পেল। কপালে গুচ্ছেক ভাঁজ ফেলে আকাশের দিকে তাকাল। বলতে গেলে তখনই চোখ নামাল। ডান হাতের তর্জনী আঙুলে রগ ও কপালের ঘাম দুয়ে ফেলে অশথ গাছের দিকে এগিয়ে যেতেই একটা কাঠবেড়ালি গুঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে উপরে উঠে গেল। ছায়ায় নিশ্চিন্তে শুয়ে জাবর কাটতে থাকা কাদের গাইগোরু হঠাৎ করেই দড়ি ছিঁড়ে ছুটে পালাল। কেমন যেন ধন্দে পড়ে যায় লোকটা। অচেনা তো গাঁয়ে গেলেই কুকুর লাগে। গোরু ফ্যাসকায়। কাচ্চাবাচ্চা আচমকা ডরিয়ে কেঁদে উঠলেই লোকে ভাবে ছেলে-ধরা। এমন বেকায়দায় ঘাপটি মেরে প্রাণ বাঁচানো। এই ঝনঝনে বন্ধ্যা দুপুরে তেমন কোনো বালবাচ্চা চোখে পড়েনি। যাক্ বাঁচা গেল।

অশথ গাছের ঝিমানো ছায়ার নীচে লোকটা বসল। বাঁদিকের জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছল। ওপাশে পালানো গোরুর ছেঁড়া দড়িটা শেকড়ে ঝুলছে। পাতার আঁজলা বেয়ে নেমে আসা ঘন কালো ছায়ার মাঝে ইত্তিউতি আততায়ী রোদ। আশেপাশে কয়েক তাল গোবর। চোনামাটি। তার উপর ভাঙা ভাঙা ক্ষুরের ছাপ।

—কই মা, এনেছেন? উপরের পাটির ঝুলে থাকা দাঁত খামচে লোকটা বলে উঠল।

—হ্যাঁ এনেছি। ভরদুপুরে জল চাইলেই কি মানুষকে শুধু জল দেয়া যায়? এই নাও ছোলা আর চালভাজা। বড়োবউ ভাজলে আস্ত করে। তুমার আবেস্তা দেখে বললাম, দাও গুঁড়ো করে। মাড়িতে জোর পাবে না।

—তা ভালোই করেছেন। এমন করে কজন ভাবে বলুন? বলে ফোকলা মুখে হাসল লোকটা। কবজি অব্দি ধুলো রেখেই চাল আর ছোলাভাজা মেখে গোগ্রাসে খেল। খেল না তো গিলল। সেই সঙ্গে কয়েক গিলাস জল। কোটরে বসে যাওয়া ঘোলাটে চোখ দুটো এতক্ষণ পর জেগে উঠল। দুপাশের গাল নাক মুখ জুড়ে এক চাপা প্রসন্নতা। কষে যাওয়া কোমরের বাঁধনটাকে আলগা করে আঃ বলে পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর এমনভাবে তুলল যেন এতক্ষণ ওই দড়িতেই খিদেটাকে বেঁধে রেখেছিল। একটা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান মেরে বলল — আর দেরি করে লাভ নেই। আমাকে তো পাঁচ জায়গা চরে খুঁটে খেতে হবে। যান বাড়িতে সব খন্দা-খবর করুন।

মাঝবয়সি স্ত্রীলোক থালা গিলাস নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। লোকটা এবার আরও তেজালো গলায় একবার হিন্দু পাড়া একবার মুসলমান পাড়ার দিকে মুখ করে

হাঁক দিল—শিল কোটাবেন শিল। শিলের উপর রাম মন্দির বাবরি মসজিদের ছবি আঁকা হয়।

এ-পাড়া ও-পাড়ার গলি বেয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল নানান বয়সি বউ-ঝি। কারও পরনে আলতা-পেড়ে, কারও বা পাছাপেড়ে। প্রত্যেকের কাঁখে মাথায় শিল। শিল নয় যেন টুকরো টুকরো পর্বত নিয়ে ছুটছে সব। কেউ বলে রাম মন্দির কেউ বলে বাবরি মসজিদ।

অত হইচই করলে হবে না। আস্তে আস্তে নামান। পায়ে পড়লে আদা ছেঁচা হয়ে এখনই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে। মন্দির মসজিদ দুদিকে লাইন লাগান।

নির্দেশমতো কাজ হল। অশত্থ গাছের দুদিকে বেশ কিছু শিলের লাইন। আরও আসছে। মাঝে মধ্যে ধুপ্ ধাপ্! একটা ঘুঘু আচমকা বাসা ছেড়ে উড়ে পালাল। মধ্যিখানে লোকটা চটের থলে পেতে বসে গেল। বুক পকেট থেকে একটা মোটা কাচের চশমা চোখে পরাতেই চেহারাটা আমূল বদলে গেল। হাতে এখন ছেনি-হাতুড়ি। ও-দুটো কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠল। তারপর বললে, কোনটা আপনার?

—আমার?

—হ্যাঁ, আপনার। বলেছি তো আপনারটা থেকে এবেলার যাত্রা করব।

—আমার তো তিন ছেলে। তিনটে বউ আপন আপন শিল এনেছে। মাঝবয়সি স্ত্রীলোক কেমন ফাঁপরে পড়ে যায়। নিজের বলতে কিছুই নেই। সবই ওদের নিয়ে থুয়ে। কাকে সত্যি কাকে পথ্যি করি বাবা?

—তিনটে শিল যখন তিন ছেলেই আলাদা। তাহলে বড়োবউয়ের শিল আগে কোটাই। চাল ছোলা ভেজে বড়োবউ তো ভোখ মেটালে।

তিন বউয়ের মধ্যে দুটো বউযের হাত শিলের গা থেকে শিথিল হয়ে পড়ল। বড়ো বউ শিলটাকে সামনে ধরল। রামমন্দির।

ঠক্ঠক্ শব্দ উঠে আসতে লাগল। সামনে রাম মন্দিরের জন্য বিঘত খানেক জায়গা রেখে শুরু করল শিল কোটানো। একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত আড়াআড়ি এক সুচারু বুননি। ছেনির সঙ্গে হাত, হাতের সঙ্গে হাতুড়ির এক অপূর্ব সমন্বয়। অদ্ভুত শিল্পায়ন। প্রতিটি আঘাতে আঘাতে উঠে আসে টুকরো টুকরো ধাতব সংলাপ। ছড়িয়ে পড়ে এতদিনের ঝাল মশলার ঝাঁঝ। মুখে কাপড় গুঁজে হেঁচে নেয় বড়োবউ। দেখে কঠিন শিলার উপর কিভাবে ক্ষণে ক্ষণে তৈরি হচ্ছে সমান মাপের গর্ত। গর্ত তো নয় যেন গুটি বসন্তের দাগ। অবিকল লোকটার মুখের মতো।

—এভাবে ঝুঁকবেন না মা, একটু তফাতে বসুন।

—ওটা আমার বড়োবউ গো কোটাই মিস্ত্রি। প্রতিবাদের সুরে মাঝবয়সি বলে উঠল।

—আপনার বড়োবউ? তাহলে তো আমার বৌদি হ্যা-হ্যা। হাতের হাতুড়ি থামিয়ে নতমুখে হাসল লোকটা। আজকাল সব কিছু স্মরণে থাকে না। তা মেয়েরা তো মায়েরই জাত। এমন আর খারাপ বললাম কী! কাজের সময় শিলের সামনে হ্যাপা মেয়ে বসে থাকা ভালো নয়; বুঝলেন? টুকরো টাকরা পাথর ছিটকে চোখে ঢুকলে

সব্বোনাশ। এই যে চোখে চশমা দেখছেন, এটা ওজন্যিই পরা। তাছাড়া সবকাজে একটা ধ্যান থাকে। এভাবে চারপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারলে আর গায়ের উপর গরম গরম নিঃশ্বাস ফেললে কাজে মর্জি টুটে। চশমার কাচ ফুঁড়ে ভাসা ভাসা চোখে বড়ো বউয়ের দিকে একপলক তাকিয়ে শিল্পীর হাতটা উঠে গেল শিলের উপরে।

মৃদু গুঞ্জন ফিসফিস। জয় ছিরাম। লোকটা দু-হাত একসঙ্গো কপালে ঠেকাল। দেখল, শিলের উপর নোড়ার ঘর্ষণে খয়ে যাওয়া অস্পষ্ট পানপাতা। হাতের ছেনিটা আবার চঞ্চল। এবার শব্দ নয় যেন কতকগুলো খুচরো শব্দের মাদকতা। চারিদিকে বিস্ফারিত মেয়েলি চোখের চাহনি। হাতুড়ির প্রতিটি আঘাতে গড়ে ওঠে আশ্চর্য ইন্দ্রজাল ; অদ্ভুত ভাস্কর্য। একটু একটু করে মুছে যেতে থাকে পানপাতা। রামচবুতরা থেকে জেগে ওঠে রামমন্দির। তার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ। দালান দরজা। ছোটো বড়ো নানান আকারে চূড়া। সর্বোচ্চ চূড়ায় উড়ছে এক গেরুয়া পতাকা।

সলজ্জ মুখে বড়োবউ জিজ্ঞাসা করল কত নেবে?

—নেবার কথা কী বলব বউদি। আপনারটা বিনি পয়সাতেই দিতাম। কিন্তু বউনি বলে কথা। দেবেন আর কী। এই একপালি চাল আর পাঁচসিকে পয়সা।

—আগে তো একপালি চালে শিল কুটেছি, এখন আবার পয়সা কেনে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা মুখফোঁড় বউ বলে উঠল ।

—অন্যায় দাবি তো করিনি। ওটা ওই মন্দিরে মানত আর মসজিদের সেলাম। ভক্তিভরে দিলে দেবেন। না দিলে আমার আর কী! পরকালে পাপের দায়ে ঠেকলে আপনারাই ঠেকবেন। তবে হ্যাঁ, এখন কেউ চাল টাকা পয়সা দেবেন না। কেউ শিল নেবেন না। আজকালকার মানুষের মন বড় খুঁতখুঁতে। সবাই ভাবে আমার কাজটা বুঝি ফাঁকি দিলে। একই হাত একই ছেনি-হাতুড়ি দু-রকম কেন হবে। দশের সামনে পর পর সাজিয়ে রাখছি মিলিয়ে নিন। কাজশেষে নিজের নিজেরটা নেবেন। এতে আমারও ঝঞ্ঝাট কমে। একবার পালি মাপা। পয়সা গোনা।

খুলে আসা বাঁ হাতের হাতাটা গুটিয়ে ডান হাতের শিলের গাদায় হাত রাখল লোকটা। এতক্ষণে ঝিম মেরে বসে থাকা মুসলমান পাড়ার মেয়ে-বউরা কলবলিয়ে উঠল। বিবিদের মধ্যে একজন বললে, হ্যাঁ কোটাই মিস্ত্রি, তুমার আর কোনো যন্ত্রপাতি নেই?

— কেন? এ যন্ত্রপাতির অপরাধ কুথায়? হাতের ছন্দ থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—ওটা দিয়ে তো ওদের কোটালে। আমাদের হাজিশাহেব কানে শুনলে গোসা করবে। বড় ইমানদার মানুষ যে?

—ও! আপনি হাজিশাহেবের পরিবার বুঝি?

—হ্যাঁ বাবা। শাদিতে ওর সঙ্গোই কলমা পড়িছি।

—আমার একটাই যন্ত্রপাতি মা। আপনাদের দোয়ায় এতেই করে খাচ্ছি।

—তবে দাঁড়াও। বাড়ি থেকে জমজমের পানি আনি। ওতে ধুয়ে পাক সাফ করে কাজ চালাও।

—জমজমের পানি? মক্কার! সে তো বড়ো পবিত্র মা-জান। চটজলদি নিয়ে আসুন। জমজমের পানির পরশ। আঃ কি ভাগ্য আমার।

বলতে গেলে প্রায় তখনই জমজমের পানি এল। হাজিবিবির মুখে হাসি। বিসমিল্লা বলে বাবরি মসজিদ আঁকছে লোকটা। যে মসজিদে মেয়েমানুষের নামাজ পড়া দূর অস্ত, স্পর্শ করা হাদিছে মানা সেই মসজিদ সামনে রেখে কুটনো কোটা বাটনা বাটা। হাজিবিবি দ্যাখে প্রতিটি নির্মাণ। দ্যাখে কীভাবে একটা ধ্বংসস্তূপ ফুঁড়ে উঠে আসছে সাড়ে চারশো বছরের অধিককাল এক প্রাচীন ইমারত। নিখুঁত তার রোয়াক, মিনার। সুউচ্চ গম্বুজের উপর স্পষ্ট চাঁদ তারা যেন আল্লার আরশ ছুঁতে চাইছে। একপাশে গঙ্গাজল অন্যপাশে জমজমের পানি। দুটো বাটিতে হাতুড়ি-ছেনি ডুবিয়ে প্রয়োজন মতো শুদ্ধিকরণ চলছে। শিল্পীর চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। যে শিলে এখনো ছ-মাস বাটনা বাটার কাজ চলে সে শিলও মন্দির মসজিদের দাবি জানায়। বিয়ের প্রথম দিনে নতুন বউ এইসব শিলের উপর দাঁড়িয়ে চুকুত চুকুত ছিন্নি খেযে পরের দিন আলাদা হয়ে উনুন জ্বালায়। দিনের পর দিন ভেঙে পড়ছে বড়ো বড়ো ঘর-গেরস্থালি। কে আব সাত মন্দের ভাতের হাঁড়িতে ফেন গালে আমানি গালে। গাঁ-গেরামের মেয়েছেলে ঘরের স্বামী আর হেঁসেলের শিল ছাড়া চেনেই বা কী। কোটাই মিস্ত্রি ধ্যানস্থ হয। কঠিন শিলাস্তর ভেদ করে একের পর এক ফুটে উঠেছে মন্দির মসজিদ। কোটাই মিস্ত্রি নয় যেন ঈশ্বরই এঁকে দিচ্ছেন এসব।

হঠাৎ করেই সেই মাঝবযসি জিজ্ঞেস করে, হ্যাগো কোটাই মিস্ত্রী, তুমি হিন্দু না মুছলমান?

—কেন মা? মানুষের আবার জাত কীসের? এই জাত জাত করেই যত অশান্তি দাঙ্গা, হাঙ্গামা। পশুপাখি জন্তু জানোযার এদের মধ্যে দাঙ্গা দেখেছেন? এরা মানুষ থেকেও সরেস।

—বলছি মন্দির মসজিদ দুটোই আঁকছ কি না?

—ওসব বুঝিনে, আমি মানুষ মা। জাত থাকলে একটাই আঁকতে পারতাম। জাত নেই বলে দুটোই সমানভাবে পারি। এই দ্যাখেন উপরের পাটিতে ক-টা দাঁত নেই। হিন্দু-গাঁয়ে গিযে এই অবস্থা। ওদের দাবি মজুরি যা খুশি নাও বাবরি মসজিদ আঁকতে পারবে না। আর কান চোয়ালের এই কোপের দাগটা দেখেছেন? ওটা মুসলমান গাঁযে। বলেছিল কাফেরদের মন্দির আঁকলে কোরবানি দেব। ভাগ্যির খাতিরে বেঁচে গেছি। আসলে ধর্মটা হল মনের বিশ্বাস। আর মনের মধ্যে মন্দির মসজিদ। যাদের মানুষের উপর বিশ্বাস নেই তাদের আবার ধর্ম করা কেন?

একটা শিল আসল বাড়ুজ্যে বাড়ি থেকে। আর একটা আসছে মৌলভী শাহেবের। আট মাসের পোয়াতি বিবির শিলের ভারে শরীর বেসামাল। আচমকা পাযের কাছে ভূমিকম্প হল। এ কি শিল নামাতে গিয়ে চুড়িতে হাত কাটলেন। ইস! এত রক্ত! এই অবস্থায় নাই বা আসতেন। বলে ক্ষতস্থানটি টিপে ধরল। লজ্জায় মৌলভী বিবির রাঙা মুখ আরও রাঙা হয়ে উঠল। একটা অচেনা পরপুরুষের নোংরা হাতের স্পর্শ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে বুঝল হাতের উপর একটা আস্ত পাথর বসে আছে।

—একটু দাঁড়ান। রক্ত জমাট বাঁধুক।

মৌলভী-বিবির সারা শরীর রি-রি করে ওঠে। এ কুন দজ্জালের কানায় পড়নু

খোদা। কোমরের দড়ির দিকে চোখ পড়তেই গর্ভের শিশুটা চাগাড় মেরে ওঠে। আপন মনে বলে ওঠে, এ যে দেখছি কয়েদভাঙা আসামী মাগো—

বিবিসাহেবা ছাড়া পেয়ে, এখন ভিড়ের মধ্যে। এমনভাবে ভারী শরীরে দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে পা গুটিয়ে বসে যেন নিজেই একটা আস্ত হ্যারিকেন। লোকটা আবার শিলের সঙ্গে মোলাকাতে মেতেছে। মুখ-ফোঁড় বউটা এবার বললে, একটা শিল কোটানো গান গাবে না?

—আগে খুব যেতাম বউদি। এখন গলায় তেমন রব নেই। দশের মজলিশে বললেন যখন শুনুন,

জষ্টি মাসেতে গেলাম শ্বউরবাড়িতে
শালা সুমুন্দি এসে বলে বাপজান এয়েছে।
শাউড়ি বলে ও প্রাণোনাথ আছ কেমন
শ্বউর বলে সাবাশ বটে মোর ভায়রা ভাই।
আমার আহ্লাদের আর সীমা নাই।

আঁচলে মুখ চেপে মেয়েমহলে উথলে উঠল হাসির তরলতা। তলে তলে লোকটা জানেও তো খুব। হাসির মুখে লাগাম দিয়ে আবার বললে, আর হবে না?

—শুনবেন? আপনাদের গাঁয়ে কাজে এসে আজ মনটা ভালো আছে। শোনেন তো একটা বউয়ের গান বলি,

আমি কি মরব ভাই সাধের বউ কুঁদুনি বউয়ের জ্বালাতে
বউ খাব না খাব না করে তিন হাঁড়ি ভাত উজোড় করে
আবার ধামাভরা মাংস-রুটি আমার পাতে জোটে না।
আমি কী মরব ভাই সাধের বউ কুঁদুনি বউয়ের জ্বালাতে।
বউ খায় তিন তপ্ত মাগুর মাছের ঝোল
আমার বেলা পাতে ঢালে পচা তেঁতুলের ঘোল।
আমি কি মরব ভাই —সাধের বউ কুঁদুনি বউয়ের জ্বালাতে।
বউয়ের রূপেতে ঘর ঝিলিক মারে
আলো ঘর আঁধার করে
আবার শ্যাওড়া গাছের পেত্নী এসে
বউয়ের সাথে সই পাতায়
আমি কি মরব ভাই সাধের বউ কুঁদুনি বউয়ের জ্বালাতে।

শিল্পী শিল কোটাতে কোটাতে গান গাইছিল। গান গাইতে গাইতে শিল কোটাচ্ছিল। ছেনি-হাতুড়িটা গঙ্গাজলে ডোবাতে গিয়ে আবার কী ভেবে জমজমের পানিতে ডোবাল। ঠোঁট কচলে সেই মুখ-আলগা বউটা বললে, হ্যাঁগো তুমার বিয়ে হয়েচে?

—বিয়ে? তা হইছিলো একসময়।

—এখন বউ নেই?

—নাঃ নেই। সবই এই কপাল বুঝলেন। বলে হাতুড়িটা আবে ঠেকাল।

—বাবার বাড়ি পালিয়েছে বুঝি? খুব মারাধরা করতে?

এ প্রশ্নে গলাটা কেমন যেন আড়ষ্ট মেরে যায়। তা বাবার বাড়ি পালানোর কথা বলতে পারেন। গভ্যে দশ মাসের সোন্তান নিয়ে মারা গিছে গো।

শুনেই মৌলভী-বিবির পেটের ভিতর ভূমিকম্প হয়। ভিড়ের মধ্যে মেয়ে-বউদের কেউ কেউ মনপত্তানির সুরে বলে ওঠে — আহা, আহারে!

—বাড়িতে আর কেউ নেই।

—থাকার মধ্যে চার বছরের দুটো যমজ লেংড়া লেংড়ি আছে মা। হাবাগোবা, মুখে বাক্যিও দেয় নাই ওপরঅলা। আমি বাড়ি না থাকলে নিজেদের মধ্যে মারামারি খামচাখামচি করে। সকালবেলা কাজে বেরুলেই দুজনেই কাঁধের ঝোলা ঝাপটে ধরে ঝামেলা পাকায়। জোর করে ছাড়িয়ে পথে নামতেই আমার পানে শুধু প্যাটপ্যাট করে তাকায়। সে থাকলে—একবার ঢোক গিলে বললে—এই যে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় ; সে থাকলে নিজেই কেচে দিত। সুঁচে সুতো পরিয়ে কেমন সুন্দর সেলাই করে দিত। অশত্থ গাছের ডালে ঝুল খেয়ে একটা মাকড়সা সুতোর মতো লালা ঝরিয়ে শিরদাঁড়া বরাবর ছেঁড়া জামার উপর নেমে আসছিল সে সময়। শিল্পী বলেই চলে, বাপ মা হারা গরিব ঘরের মেয়ে ছিল সে। দেহে রূপ ছিল যৈবন ছিল। গলাটা আরও ধরে আসে। বাবরি মসজিদের গম্বুজ আঁকতে আঁকতে ভাবতে পারে এমনই পুরুষ্ট স্তন ছিল তার। বুকের গভীরে ওম ছিল। ছিল সহবৎ। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শিল্পী। চোখের সামনে শিলাখন্ডটি যেন একটু একটু করে গলে যাচ্ছে।

বেলা পড়ে এসেছে। মাটিতে লতিযে নামছে গাছেদের সাবালক ছায়া। অশথ গাছের মাথায় এখন পাঁচমেশালি পাখির কলরব। দুপুরের শানানো রোদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন রেশমি বিকেল। কোটাই মিস্ত্রি সারাদিনের আড়ষ্টতা ভেঙে অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। মাথায় চালের থলে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি ভারী। কাঁধে ঝোলা। সব শিল কোটা শেষ। যে যার শিল নিয়ে ফিরে গেছে ঘরে। সারাদিনের ক্লান্ত বোঁদ এ সময় মূর্ছা যায় পথের ধুলোয়। একটু একটু করে বাড়ির দিকে হাঁটে লোকটা। মৌলভী-বিবি উঠানে পা দিয়ে শিলের উপর হঠাৎ করে নজর পড়তেই ভিরমী খায়। সর্বনাশ। মসজিদের জায়গায় মন্দিরের ছবি! এ শিলের বাটনা বাটা তরকারি পেটে পড়লেই ইমান নষ্ট। ওজু নষ্ট। যদি জানতে পারে এ অবস্থাতেও তিন তালাকের বয়ান হাঁকাবে। যদি জানতে পারে লোকটা তার গায়ের উপর হাত রেখেছে। ভয়ে সারাশরীরে কাঁপুনি চড়ে। হায় আল্লা আল্লা গো—

ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েন মৌলভী। মাথার টুপিটা খুলে পড়ল দোরের গোড়ায়। বল বিবিজান, বল কী হয়েছে?

ওই দেখ শিলের অবস্থা। লোকটা মসজিদ না এঁকে মন্দির এঁকেছে।

মড়িঘরের গলিত শব দেখার ঘৃণা নিয়ে দূর থেকে দেখলেন। তৌবা! তৌবা? লোকটা বিজেপির মস্ত দালাল। কাফের! এখনই হারামজাদা ইবলিশকে কোতল করব। বলে খুনের কসম খেয়ে লাফিয়ে বেরুলেন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে চিনতে পারেন ওই তো সেই লোকটা। চোখ দুটো জ্বলে উঠল দ্বিগুণ হিংসায়। কিন্তু পাশে ওই লোকটা রতন বাঁড়ুজ্যে না? কী বলছে মৌলভী শাহেব শোনেন—

শালা ইয়ার্কি পেয়েছ না? আমার শিলের উপর মসজিদ। রাম? রাম।? বাড়ির মেয়েমানুষ পেয়ে বোকা বানাবে? আগে মন্দির আঁক নইলে শ্মশানে শোয়াব।

—না দাদা! আমাকে মাফ করবেন। মরে গেলেও পারব না। মানুষ হিসাবে আমারও তো একটা ধর্ম আছে। যে মসজিদ নিজ হাতে গড়েছি তাকে কেমন করে ভাঙি? কাতর অনুরোধে লোকটার গলা ভারী হয়ে উঠল?

—কী পারবি না? তবে রে শালা—বলেই মাথার উপর আস্ত শিলটা ছুঁড়ে মারে। একটা অস্পষ্ট গোঙানি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। মৌলভী সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে আচমকা থমকে দাঁড়ালেন। আর তখনই শঙ্খের সুরের সাথে ভেসে এল মগরিবের আজান। চারপাশ জুড়ে নেমে এল শিলাময় অন্ধকার। এমন শিলাময় অন্ধকার খোদাই করে পাশাপাশি আঁকা যায় অসংখ্য রামমন্দির বাবরি মসজিদ। □

আলমারি

স ন্দী প ন চ ট্টো পা ধ্যা য়

আজ সকালে উমার আলমারি আসবে।

পাখির ডাকে রোজদিনের মতো জেগে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আজ পুস্পেন একটা স্বপ্ন দেখছিল। ঘুম ভাঙতে, না তখনও ঠিক ভাঙেনি, সে তখনও আধেক-ঘুমে—তার প্রথমেই মনে পড়ল, আজ আলমারি আসবে।

পাখি বলতে মাত্র দুটি। ধূসর-শাদা ও মূলত বেগুনি দুটি বদ্‌রি। ভোর হতে না হতেই এই দুই হারামজাদে মিলে একদিন দুশো পাখির মতো চেল্লাবে, আগে জানলে, উঃ, কোন শালা এদের ঘরে আনত।

কী যেন ছিল স্বপ্নটা? পুস্পেনের মনে পড়ল না। 'যাঃ, এই তো দেখছিলুম, এর মধ্যেই'....এইরকম একটা ফোঁপরা পরাজযবোধের সঙ্গে, 'যাআকগে, না পড়ল, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন ছাড়া তো আজকাল কিছুই দেখি না'—এ-রূপ অভিমান মিশে, উড়ে-যাওযা পাখির ছাযার মতো, শেষপর্যন্ত হরেদরে তাব চেতনায যা পড়ে রইল তাহল, 'আফটার অল, মনে তো পড়ল না!' মনে পড়লে কী বা ক্ষতি হত, হোক না দুঃস্বপ্ন, স্বপ্ন বৈ কিছু তো নয।

উমার একটি স্বপ্ন কিন্তু আজ সার্থক হবে। আজ সকালেই। স্বপ্নের আগে যে অব্যর্থ শব্দটি এসে বরাবর গেড়ে বসে, তা হল 'রঙিন।' বড্ড বিমূর্ত! কী রং, কোন রং? জানতে ইচ্ছে করেই। উমার ক্ষেত্রে এখন বলে দেওয়া যায যে, তাব স্বপ্নের রং নীল। সে স্বয়ং কারখানায় গিযে, গ্রহণ-বর্জন, গ্রহণ-বর্জন, বর্জন ও গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শেষাবধি পাউডার-ব্লু রং পছন্দ করে এসেছে। কাবখানায, গতকাল সন্ধ্যায, মালিক সুবোধবাবু যখন স্বহস্তে উমার স্বপ্নে দ্বিতীয় কোট নীল স্প্রে করছিলেন, তখন তারা, স্বামী-স্ত্রী, দুজনে অনেকক্ষণ দাঁড়িযে দাঁড়িযে দেখেছে। বহুদিনেব মধ্যে কোনো-কিছুই তাদের এত কাছাকাছি টেনে আনতে পারেনি, আর এতক্ষণ ধরে। যেমন, যৌনতা।

রং-করার পর আযনা ফিট হবে। সে জন্যে চাব-বাই-এক ফিট ফ্রেমের স্পেস ছাড়া রয়েছে। হ্যান্ডেলের পাশে চাবির স্লট। চাবির দাগ যাতে না লাগে সে-জন্যে স্লটের নীচে একটি বেকোলাইট প্লেট লাগানো। এ দুটি জিনিস প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া। স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে স্লটের ওপর কোম্পানির নাম স্পষ্ট পড়া যায।

পুস্পেন হেসে সে-দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'দেখেছ?'

'কী?'

ওই যে। নামটা? সৎসাহসের সঙ্গে সবার অলক্ষে সে উমার উন্মুক্ত কোমরে একবার তর্জনী বুলিয়ে নেয়, 'মন আমি?'

উত্তরে লিপস্টিকের ওপর উমা শুধু ঠোঁটটুকুতে হাসি মাখায়। বোঝা যায়, সে জানে।

পুষ্পেন তবু বলে 'মাই লাভার। তাই না?'

মূল প্রশ্নের প্রতি উমার হাসি-হাসি উপেক্ষা দেখে বোঝা যায় খুব-একটা ভুল হয়-নি। উচ্চারণ ঠিক হয়েছে কী?

'উই মসিয়ো।' সামনের সারিতে একটার ওপর উঠে পড়া জোড়া-দাঁত দেখিয়ে সে এবার বিশদভাবে হাসে।

'আই সী।' পুষ্পেন এবার উমার মাথার পিছনে চালচিত্রের মতো তার লেখা-পড়ার কনভেন্ট-ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পায়। অ্যানিমিক, প্রায় ফ্রিজিড। বাঁজা? তবু, অতি অননুমেয়ভাবে দুলে উঠে, অই পটভূমিকা তাকে যখন-তখন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফ্যালে। ঝাড়া পাঁচটি বছর কাঠখড় পুড়িয়ে রিচি রোডের এই সফিস্ট্রিকেই সে বিবাহ করেছে।

তাদের বাড়ি থেকে কারখানাটি আধমাইলটাক দূরে। ডেলিভারি গতকাল বিকেলেই নেওয়া যেত। এ-জন্যে রংয়ে খুব বেশি ড্রাই দেওয়া হয়েছিল। রিক্সায় ফেরার পথে এ নিয়ে তাদের মধ্যে রীতিমতো কথা-কাটাকাটিও হয়ে যায়। বেশ খানিকটা তর্কাতর্কির পর ঠিক হয় যে, আজ সকালে আলমারিটি আসবে। পুষ্পেন প্রথমটা কিছুতেই রাজি হয়নি। সে চেয়েছিল দুপুরে আসুক। না হয় সে ক্যাজুয়াল নেবে? তার যুক্তি ছিল, তাদের মধ্যবিত্ত তথা নিম্নবিত্ত পাড়া। এ-রকম জায়গায় বড়ো রাস্তা দিয়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে, একটি নতুন স্টিল আলমারি ঠেলা-গাড়িতে চেপে ধীর ও নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে, এ-দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে; কিন্তু তাদের পাড়ায় পৌঁছে গাড়িটি রুখে গেল, এটা সচরাচর ঘটে কি? রাস্তার মোড়ে 'ওয়েসিস' নামে একটি দোকান হয়েছে। কত রকমের কুক্‌ড় ফুড পাওয়া যায় সেখানে। সালামি, হট-ডগ, সসেজ—কত কী। দোকানটিতে কি ভিড় হয় না। বরং আজকাল বেশি ভিড় হয়। প্লাস্টিকের থালায় ভরে ডীপ-ফ্রিজের মুর্গি দুলিয়ে যারা রাস্তা দিয়ে যায়, তারা কি ব্রীফ-কেসের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যায়? উমা তীব্রস্বরে জানতে চেয়েছিল। অসতর্কভাবে হাসলে যে ঠোঁটের রক্তাভ পাউটিং আন-কথা মনে পড়ায় ও যা জানে বলে সেসময় মুখে আঁচল চাপা দিতে উমা কখনো ভোলে না, সামান্য মতবিরোধে তা কত বিবর্ণ-বূঢ় হয়ে ওটে! 'বড়ো এফিমিনেট তুমি', বলে ঈষৎ পৌরুষ-আক্রান্ত করে দিয়ে উমা এককথায় সমস্যাটির সমাধান করে দিয়েছিল বটে। কিন্তু, উঁহু, বিষয়টি আরও জটিল বলেই তাকে এত সরল দেখাচ্ছে—পুষ্পেন টের পেয়েছিল। সে আর কথা বাড়ায়নি।

'কাল সকালেই আমার আলমারি চাই! একটা আলমারির জন্যে আপিস কামাই? হাসালে!' বলে, ঘুঘুর মতো কুহর কেটে কেটে, উমা সত্যিই হাসতে শুরু করে।

পাখির ডাকে যদিও রোজই ঘুম ভাঙে, জেগে উঠে কিন্তু তিনদিকে দেওয়াল ছাড়া শহরের আর কিছুই পুষ্পেন দেখতে পায় না। পাখি বলতে দুটি বদরি, নিউমার্কেট

থেকে কিনে-আনা দোলনা ও ফুটো-অলা মাটির ভাঁড়ের ঘর সহ বড়োসড়ো কাঠের কাঁচায় তারা দুটিতে দুশো পাখির মতো চেঁচাচ্ছে। দেওয়াল পেরিয়ে ওপারে বড়ো রাস্তার মুখে দুধের বোতলের খাঁচা নামছে। সে বাসটি এইমাত্র গীয়ার পাল্টালো সেটা একটা ডাবল ডেকার এবং নিঃসন্দেহে প্রথম বা দ্বিতীয় বাস, সে টের পায়, হয়তো এখনও বাসটিতে আলো জ্বলছে। কী করে টের পায় কে জানে, কিন্তু পায়। এই শহরে দেখতে দেখতে তিন যুগ কেটে গেল।

বাসটির গীয়ার পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পেনের মনে পড়ে গেল, বিবাহের প্রথম বার্ষিকীর দিন, মুগা-ডুরে শাড়িটি কেনার পর, বিলিতি কটেজের স্থাপত্য-ধাঁচে তৈরি দুটি পাখিসহ রাঙা খাঁচাটি দেখেই—বিশেষত তারা দম্পতি শুনে—উমার জন্য অনির্বচনীয় সারপ্রাইজ হিশেবে দরদাম না করে সে খাঁচাটি কিনে ফ্যালে ও ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফেরে। দোলনায় উমা একটি মিনি ঘণ্টা ফিট করে দিয়েছে। টিং-টিং-টিং-টিং করে সেটা সমানে বেজে চলেছে। কী ভয়াবহভাবে বিশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ নিরর্থক ওদের এই উত্তেজনা! ইনিসিয়েশান সব সময় মাদি পাখিটার, পুষ্পেন লক্ষ করে দেখেছে, পুরুষ-পাখিটা যদি এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়েছে, অমনি—ফুড়ুত। ঝাঁপিয়ে পড়ল দোলনায়—টিং করে ঘণ্টার শব্দ—কি ভাঁড়ের গর্ত দিয়ে ঢুকে গেল গোঁসা-ঘরে। নাও, ঠ্যালা সামলাও। ভোরবেলার নব-উন্মোচিত মাথায় পক্ষীদম্পতির চরিত্র-ছকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে একটা জটিল বিষয় তার কাছে জলবৎ স্বচ্ছ হয়ে উঠল। সে হঠাৎ তার অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পেল।

তার সহসা মনে পড়ে গেল পাখি-আসার পরদিনই, 'কী ব্রাদার, এত কিচির-মিচির কীসের', বলে ঢুকে ওই জানালার ধারে গিয়ে বসেছিলেন রাস্তার ওপারের তিনতলার ফ্ল্যাটের শৈলবাবু। ভদ্রলোক উমাকে 'বউমা' বলেন। শো-উইনডোর ম্যানিকিনের মতো, বিপত্নীক ভদ্রলোকের পাট-করা কাঁচাপাকা চুলে এসে পড়েছিল সকালবেলার শারদীয় আলো—তাঁর হার্ট-শেপের লাবণ্য-মাখা মুখটা কী অসম্ভব কালো দেখিয়েছিল, যখন, পাখি দেখে, উনি বলেছিলেন, 'তোমার ভাই স্পেয়ার মানি আছে, ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড। চাকরিটিও ভালো।'—একটি বড়োসড়ো প্রশ্বাস নেবেন বলে ফুলে উঠেছিল নাকের পাটা, 'আই হ্যাভ সেভেন মাউথ্স টু ফীড। নামেই গেজেটেড অফিসার, মেয়েরে বিয়ে দিতে গিয়ে তো সর্বস্বান্ত...।' 'চাকরিটিও ভালো' বাক্যবন্ধটি ক্ষীণ হাসিসহ ঠোঁট থেকে উড়ে যাবার আগে একটুখানি তির্যক বিষ্ঠাত্যাগ করে যায়নি কী? অর্থাৎ, ঘুষ? পুষ্পেনের পে-স্কেলে অমন কত লোক শৈলবাবুর আন্ডারে কাজ করে।

শাড়ি তো বটেই, মায় পাখিদুটিও সে কিনেছিল প্রথম ঘুষের টাকায়। বিয়ের প্রথম বছর, অথচ হাতে টাকা নেই এবং একটা পার্টিও ঘুরঘুর করছে কদিন—তার সঙ্গে বেরোবার মুখে অফিস গেটেই সে টাকা নিয়েছিল। ওঃ, শালা, কী ভয় করেছিল রে সেদিন। দুজন লোককে একসঙ্গে দেখলেই মনে হচ্ছিল ভিজিলেন্সের, দুজনই থাকে। হাতে-নাতে ধরার পর, কানকোয় আঙুলে গুঁজে মাছের মতো ঝুলিয়ে দুজন লোকই আনোয়ারুলকে ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছিল। ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরল যখন, সে তখনও ভয়ে একাকার। আরও অধিকরাতে, মুগা-ডুরে টান মেরে খুলে, তুলনাবিহীনভাবে

বেশি বলশালী কাম দিয়ে সেই একাকার ভয়কে সম্পূর্ণ ধ্বস্ত করা গিয়েছিল।

আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে পুষ্পেনের। পাশের জোড়া খাটে নীল নাইলন মশারির মধ্যে উমা চিত হয়ে হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে—আহা-রে। তার গা থেকে চাপা সরে গেছে। কীভাবে টের পেয়ে উমা সেটা বুকে টেনে নিচ্ছে, সে দ্যাখে। পীরিয়ড। আজ নিশ্চিত শেষ দিন, আজ আসবে। আজ উমার নীল আলমারি আসবে। আবার মনে পড়ল পুষ্পেনের, পাখি দুটির মতোই, আলমারি আসছে রামপুরিয়ার টাকায়। পুষ্পেনের পেটের মধ্যে হজম হবার গুরুগুরু ধ্বনি। যার হয়, সে ছাড়া এই ধ্বনি নাকি আর কেউ শুনতে পায় না।

আবার ঘুম পাচ্ছে পুষ্পেনের। পাখির ডাক স্তিমিত হয়ে আসছে।

'এই, শুনছ?'

আলমারি আনার সময়-নির্বাচনের ব্যাপারটা এমন সরল দেখাচ্ছে বলেই বিষয়টি রীতিমতো সন্দেহজনক, পুষ্পেন আগেই টের পেয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন অভূতপূর্ব দিক থেকে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। মৃদু নাড়া দিয়ে, ঘণ্টাখানেক পরে উমা তার ঘুম ভাঙাচ্ছে, সে দেখল।

'একবার যেতে হবে।' উমা নম্রস্বরে বলছে, সে শুনল।

'কোথায়?'

'শৈলবাবুদের ফ্ল্যাটে।'

'কেন?'

'শৈলবাবুর ভোরবেলা মারা গেছেন। ওঠো, একবার যা-আও!' মিনতি-মাখা সুরে উমা আবেদন করে।

আলমারি আসার কথা সকাল ৯টা নাগাদ। এ কে ভাবতে পারবে, এত তাড়াতাড়ি, আলমারি এসে পড়ার ঠিক অব্যর্থ সময়টিতেই রাস্তায় খাট সাজানো শুরু হবে! পুষ্পেনদের জানালা থেকে ও-বাড়ির চারতলা দেখা যায়। চারতলার ছেলেবুড়ো সবাই বারান্দায় ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, দেখে, উমা পাঁচির-মাকে পাঠিয়েছিল তদন্ত করতে। হ্যাঁ, খাট সাজানো শুরু হয়েছে।

পুষ্পেন তখনও জানালায় দাঁড়িয়ে। উমা পাশে এসে দাঁড়ালো। 'যাও, বারণ করে এসো।' অর্থাৎ, আলমারি। 'কেমন-বলেছিলাম-কিনা'-চোখে পুষ্পেন উমার দিকে তাকায়। একই সঙ্গে সে বেশ ঝরঝরে বোধ করে। যাক বাবা, সেই তাহলে দুপুরেই...বাঃ, নিঃসন্দেহে কম-ভারী লাগছে তার নিজেকে।

রাস্তায়, তার সাইকেল-রিক্সা থেকে নেমে, শূন্য খাটের একধারে, পায়ের দিকে, আকবর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। রিক্সা-ব্যাপারে উমার হাবভাব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতন, এক সন্তানপ্রসব ছাড়া সবই সে রিক্সায় চেপে করে এসেছে এবং বেশিরভাগ এই সদানন্দ মাসকুলার ছোকরার গাড়িতে। আকবর জানে না, এ শুধু পুষ্পেন জানে যে, একদিন তার নাতিপ্রশস্ত বুকে সহাস্য মুখ ও স্ফুরিত নাসা ঘসে উমা স্বীকার করেছে যে, বুদ্ধপূর্ণিমার আলোয় ওর ঘর্মাক্ত কাঁধের মাস্‌লস্‌-এর কাজ দেখবে বলে, সিনেমা-ফেরত গলির শর্টকাট ছেড়ে একদিন সে রাজপথে বেরিয়ে পড়েছিল ও অনেক ঘুরে বাড়ি ফেরে। তার জোলো-গোলাপি সাদা পোর্সিলিন মুখের পিছনে যে অপর-নারী,

তার সম্পর্কে উমা তাকে এ-যাবত এই একটি মাত্র তথ্য জানতে দিয়েছে। খীকারোক্তির সময় সে নিখুঁত উচ্চারণে 'ওয়ার্কিং অফ দ্য মাস্‌লস্‌' ফ্রেজটি ব্যবহার করেছিল, পুষ্পেনের মনে পড়ে।

খাট-সাজানো সম্পূর্ণ। বোকের মধ্যে গোঁজা গোছা ধূপ ধোঁয়া ছাড়ছে। বালিশের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে মার জগদীশবাবুর গীতাটিও। একটি কীর্তনের দলও হাজির। খোলে চাঁটি পড়ল বলে। আর দেরি নয়। 'জোরে চালাও আকবর', বলে পুষ্পেন রিক্সায় উঠে পড়ে।

কারখানা পর্যন্ত তাকে আর যেতে হয় না। একটানা ঋজু গলিটিতে প্রবেশ করেই এ-প্রান্ত থেকে সে দেখতে পায়, যা হবার তা হয়ে গেছে। ঠেলাগাড়িতে পাতা পুরু খড়ের গদির ওপর মহারাজকে ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে। দড়িদড়া দিয়ে বাঁধাছাঁদির কাজও সম্পূর্ণ। সে একটু এগোতেই, নড়ে-চড়ে উঠে ঠেলাটি যাত্রা শুরু করে দেয়। 'দুর্গা! দুর্গা!' পুষ্পেন মনে মনে বলে ওঠে।

পিছনে ঠেলাওলাদের হারে-রেরে, গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠে, ঢালু রাস্তা দিয়ে গড়গড়িয়ে বিকট-নীল জন্তুর মতো, কখনো মুখ উঁচিয়ে, কী আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছুটে আসছে ঠেলাটা—আরে, আরে, ধাক্কা মারবে নাকি—সরে দাঁড়াবার জায়গাও যে নেই! 'আকবর, রিক্সা ঘোরা', পুষ্পেন সন্ত্রস্তভাবে বলে ওঠে। কাছাকাছি এসে ঠেলার গতি শ্লথ হয়ে আসে। চট ও প্লাসটিক মোড়কের ফাঁকফোঁক দিয়ে আলমারির যেটুকু দেখা যায়, পুষ্পেন তাতেই চমৎকৃত হয়। আ, রং পছন্দ করেছে বটে উমা। কী যেন নাম রংটার? বাড়িতে বসে সুবোধবাবুকে দিয়ে অভ্যন্তরের তা অন্তত দশ-বারোটি স্কেচ করাবার পর তবে একটি তার মনোনয়ন পায়। ডালা খুললে প্রথমেই, ওপরে, দুধারে নবসহ কখ তাক দুটি করে, মাঝখানে লকার। লকারের পিছন দিকে কিন্তু আর-একটি খুদে লকার আছে, বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না। একেবারে নীচের তাকে হাত বুলিয়ে পাওয়া যাবে যে স্লটটি, তা এই আলমারির গোপনতম গোপন—চাবি ঘোরালেই সেই অনির্বচনীয় গুপ্ত-তাক দুদিকে ফাঁক হয়ে যাবে। এবং, নির্মাতা ও মালিক ছাড়া এর অস্তিত্বের হদিস কেউ কোনোদিন পাবে না। মাঝ-বরাবর বাঁ-দিকে আধাআধি জুড়ে পুষ্পেনের ওয়াড্রোব, বাকি অর্ধেক স্পেসে অর্ধ-তাকগুলো শেষাবধি দুটি না তিনটিতে দাঁড়ালো তা সে এখনও জানে না।

ঠেলার সঙ্গে চলেছে কারখানার আরও জনাচারেক লোক। এরা আলমারি তুলবে। দলপতি ঠাকুর সিংকে পথনির্দেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয় পুষ্পেন, 'হঁ! ওই মন্দির পর্যন্ত যাবে। তার পরেই দেখবে রাস্তায় একটা মড়া খাটে শোয়ানো...'

'মুর্দা বাবুজি?'

'হাঁ-হাঁ!' সে এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, 'ওই মড়ার সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তোমাদের দেখে ঠিক উলটোদিকের যে প্যাসেজটাতে আমি ঢুকে পড়ব, তোমরাও সেটাতেই—'

'আপ সাথ সাথ চলিয়ে না বাবুজি!'

'নেই, নেই!' দড়ির খ্যাচে পুতুলের মতো হাত-পা ঝাঁকিয়ে পুষ্পেন উত্তেজনা কমায়, 'হাম আগাড়ি যাতা হ্যায়। দূর সে মুর্দাকা পাশ হামকো দেখ্‌ কর্‌—ম্যায় যো

গল্লিমে ঘুসেগা ওহিমে—কিসিকো পুছতাছ করনেকা কোঈ জরুরৎ নেই হ্যায়, সমঝা?' এত বলে পুম্পেন হাঁপিয়ে পড়ে। সে আগ্রহভরে ঠাকুর সিং-র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে।

ব্যাটা, বুঝেছে নিঃসন্দেহে। কেন যে এই অশিক্ষিত লোকগুলো একটু বেশি বুঝে ফেলে। তার হাসি দেখে তাই তো মনে হয়। 'কোঈ বাত নেই বাবুজি', সে হেসে বলে। আর দ্বিরুক্তি না করে পুম্পেন চাপা গলায় আকবরকে বলে, 'জোরে চালাও আকবর।' বোধহয়ত তার ব্যস্ততার সংক্রামিত হয়েই হই-হই করে ঠেলা তাকে তাড়া করে। 'কোঈ জলদি নেহি। তুমলোগ ধীরসে আও,' পিছনের পর্দা তুলে পুম্পেন ঠাকুর সিং-এর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে।

সে পৌঁছে দেখল, শৈলবাবুকে খাটে শোয়ানো শেষ। উন্মুক্ত বলতে শুধু মুখখানি—অবশ্য এরকমটা না হলেও মুখটাই প্রথমে চোখে পড়ত। মৃত্যু-পূর্বের শেষে জীবিত অভিব্যক্তিটি এখনও মুখে লেগে আছে। কাল সকালেও তো বাসের লাইনে দেখা হয়েছে। রোজ যেমন, উনি ছিলেন পুরোভাগে। ডগায় চুনসহ পানের বোঁটা তুলে দূর থেকে ওয়েভ করেছিলেন। ভাই-বোনটোন মিলিয়ে আত্মীয়স্বজন তা খুব মন্দ ছিল না দেখা যাচ্ছে শৈলবাবুর, শোকোচ্ছ্বাসে ছেলে-মেয়েদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে। ফোটো তোলার সময় শুধু জড়বুদ্ধি মেজোছেলেটা ছাড়া সবাই মুখ তুলল, পুম্পেন দেখল। সে রিক্সা থেকে নেমে মৃতের পাদদেশে দাঁড়াল।

এবং সব মিলিয়ে হয়তো মিনিট পাঁচেকও হয়নি, যার মধ্যে গত বছর সপ্তমী পুজোর দিন লোডশেডিং-এর সন্ধ্যার মাত্র একটি দৃশ্য কোনোমতে টায়েটায়ে ফোটাতে পেরেছে পুম্পেন, যেদিন, যখন, তাঁর নগ্ননির্জন ফ্ল্যাটে শৈলবাবু একটা—মোমবাতি হাতে আলমারির লকারের ভেতর থেকে একটি যশোরের চিরুনি বের করে, তা থেকে ফুটদেড়েক একটা লম্বা চুল কাঁপা হাতে খুলতে খুলতে, মাঝে মাঝে হাত তুলে নিয়ে—যেন তাতে বিদ্যুৎ রয়েছে—হঠাৎ উনি হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, টেবিলে মাথা ঠুকে ঠুকে বলছিলেন 'আমি তাকে ভালবাসতাম', 'আমি তাকে ভালবাসতাম'— আর, যার অনুবাদ 'সে আমাকে ভালোবাসত', 'সে আমাকে ভালোবাসত' করে নিচ্ছিল পুম্পেন—এই একটি-মাত্র দৃশ্য কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করাবার আগেই—মাত্র পাঁচ মিনিটও হয়তো হয়নি—হঠাৎ ঠেলাটি মোড় নিল এবং পুম্পেনকে দেখতে পেয়ে, মাত্র দশ গজ দূর থেকে, ঠাকুর সিং তার বিশুদ্ধ ভোজপুরিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'কাউন গল্‌লি—এ বাবু—কিদ্‌ধর?'

ঘাড়ের ওপর পুম্পেনের মুণ্ডু শক্ত হয়ে থাকে। সাড়াশব্দ না দিয়ে, রিক্সায় লাফ দিয়ে নেমে সে সুট করে তাদের প্যাসেজে ঢুকে পড়ে। কার আলমারি, কে তার বাবু, কে জানে।

প্রথম হরিধ্বনি দিয়ে খাট মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল।

'জয় রামজীকে' বলে দোতলার ফ্ল্যাটের সামনে আলমারিটা লম্বা করে দাঁড় করাতেই, একটু, পুম্পেন উমার দিকে তাকিয়েছিল। গুডনেস! দরজায় চেয়ে আলমারিটা ইঞ্চিছয়েক লম্বা হয়ে গেল কী করে?

'আমি ছ-ইঞ্চি বড়ো করতে বলেছি,' উমার চোখে চিকুর, প্রাসাদের সিঁড়ি-শ্রেণির মুখে দাঁড়িয়ে সম্রাজ্ঞীর মুখে কৃষক রমণীর হাসি। 'আলমারির যদি ঘরে নিতেই হয়

তো জায়ান্ট সাইজ নেব। ছোটো জিনিস নেব কেন?' সে হেসে জানায়। সত্যি কামনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে এই সব 'কূ্য' বা ছোটো-অভ্যুত্থানের সময় তার ডেলিবারেট ওষ্ঠ-লীলা দেখবার জিনিস।

'কিন্তু...এ কি ঢুকবে?'

গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল ঠাকুর সিং।

'হামি ঘুষিয়ে দেবে', সে হই-হই করে ওঠে, 'সাইজ দেখে আপনি কুছু ঘবড়াবেন না মাঈজি', হাত তুলে সে বরাভয় দেয়, 'এ্যায়সা শওয়া-শওয়া আলমারি ঠাকুর সিং ঘুষিযে দিয়েছে।'

তা দিযে থাকতে পারে। এক্‌স্‌পার্ট লোক বটে ঠাকুর সিং · সুবোধবাবুও তাই বলে দিয়েছেন!

'বলো তো বাবুকে।' কী ভেবে, আরক্ত মুখ-ঝামটা দিয়ে উমা সরে যায়।

'হাঁ বাবুজি।' ঠাকুর সিং বলল, 'বেনিয়াপাড়ার দাস্তোবাবুকে চিনেন তো—একদম এহি সাইজ—শাল্‌হা কুছুতেই ঘুষবে না। দাস্তোগিন্নির আঁখমে পানি এসে গেলো। বললো কী, ঠাকুর সিং, কিসি ওজরসে ইসকো ঘুষা দেও। পাঁচ কেজি মাংসোকা দাম বকশিস মিললো, বাবুজি, হাঁ! এ ভেইয়া, হাত লাগাও!'

'জয় রামজীকি' ধ্বনি দিযে তারা মাটি থেকে আলমারি শূন্যে তুলে ধরে।

হযতো ঢুকে যেত। কিন্তু ভেতরে করিডর প্রস্থে মাত্র সওযা-দু ফিট। পাড়ার ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে দরজায় একটি পাল্লা খুলে ফেলেও কিছু হল না। প্লাসটিক শিট দুফাল হয়ে ছিঁড়ে আলমারির গা ছড়ে গেল, অপব পাল্লা মটমট করে উঠল, তবু ঢোকানো গেল না। উমার চোখ জল এসে গেল। 'ছি-ছি, এ কী করলে তুমি' বলে পুস্পেন গেল সুবোধবাবুকে ডেকে আনতে।

আধঘণ্টা পরে সুবোধবাবুর সঙ্গো ফিরে পুস্পেন দেখল, আলমারি পূর্ববত দরজা জুড়ে শুয়ে আছে। তার ওপর একটি বেডশিট ভাঁজ করে পেতে উমা কুলিদের সিঙারা-কচুরি পরিবেশন করছে। পাঁচির মা-র হাতে মস্ত চাঙাড়ি। ভিতরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দ, স্টোভ জ্বলছে। কেটলি চেপেছে নিঃসন্দেহে। দস্তুরমতো পিকনিকের আবহাওয়া। পাড়ার ফুটবল প্লেয়ার দুলু গাঙ্গুলিও জুটে গেছে। ভালোই হল, একটা হাত বাড়ল, যদিও ভারী অসময়ে বেরসিকের মতো দুলু জানতে চাইল, 'দাদা, আমার চাকরির কদ্দূর কী হল?'

চা-সিঙারা খেয়ে সুবোধবাবু মাপজোক করতে বসলেন। দরজা, আলমারি ও করিডরের দৈর্ঘ-প্রস্থের মাপ নিয়ে,মেঝেয খড়ি দিযে নানারকম জ্যামিতি কষে, তারপর তিনি মাথা নাড়লেন, উঁহুঁ। এ জিনিস এ দরজা দিয়ে ঢোকার নয়। করিডরটা যদি অন্তত পুরোপুরি তিন ফিট চওড়াও হত, তাহলেও...

তাহলে? বাকি দিন এবং সারারাত কি আলমারিটা এভাবেই এক-পাল্লা দরজা জুড়ে পড়ে থাকবে নাকি? ওপারে থাকবে উমা... এবারে পুস্পেন... রাত হলে তো সবাই চলে যাবে। তারপর খালি হাতে সারারাত খোলা দরজা পাহারা দেবে নাকি পুস্পেন? বাড়িতে তো একটা বেড়াবার ছড়িও নেই!

এখনও রংয়ে পাক ধরেনি। টপকে যাওয়া যাবে? হঠাৎ মনে হল পুস্পেনের বুড়ো

ভাম বিকট এক জরো ভাল্লুক মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়েছে তাদের প্রবেশপথ জুড়ে। সে মৃত না মটকা মেরে আছে, বোঝার উপায় নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে তাকে ডিঙিয়ে যাবার মতো বিপজ্জনকও আর কিছু হতে পারে না।

টুল-ব্যাগ থেকে একটা বেঁটে করাত বের করলেন সুবোধবাবু। ছ-ইঞ্চি করে পায়া চারটি কেটে ফেলা ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই।

কাটা পায়াগুলো উমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, সুবোধবাবু জানালেন, দু-এক দিনের মধ্যেই উনি আলমারির মাপে একটি ছ-ইঞ্চি স্টিলের চৌকি পাঠিয়ে দেবেন। ঠাকুর সিং লোকজন এনে তার ওপর আলমারি বসিয়ে দিয়ে যাবে। বাইরে থেকে দেখে এই জোড়া-তালি একদম বোঝাই যাবে না। হরেদরে, ঘরের মধ্যে সেই জায়ান্ট সাইজই দাঁড়াবে। রংচং যেখানে যা চটেছে মিলিয়ে দেওয়া হবে। এবং এজন্যে টাকাকড়ি কিছুই লাগবে না।

চার-চারটি পা কেটে ঠাকুর সিং ও তার দলবলসহ সুবোধবাবুকে বিদায় দিতে বেলা দুটো বেজে গেল।

'বলহরি হরিবোল...'

শ্মাশানযাত্রীরা ও-বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল।

রাত্রে, বিনা আমন্ত্রণে উমা এল সেই মুগা-ডুরে পরে। কী না-ভেবে যে! কল্পনাশক্তিহীন অন্ধকার নারীশরীরের চেয়ে কাম্য আর কী। এই ক-ঘন্টায় সে কত সাফসুফ, ঝরঝরে আর হালকা হয়ে গেছে। বিয়ের আগে ফ্লার্ট করার দিনগুলোয়—কবেকার সেই একদিন সন্ধ্যায়—উমা গলি থেকে বেরুতেই হু-হু কালবোশেখি, পূর্বদিক থেকে এত জোরে ছুটে আসছে, গলিতে বোঝাই যায়নি। একটু পিছিয়ে পড়া পুল্পেন গলির মুখে দাঁড়িয়ে উমাকে দেখেছিল লোকজনের ছুটোছুটির মধ্যে হাওয়ার দিকে চকিতে ঘুরে দাঁড়াতে ; তার আঁচল উড়ছে, বব-করা চুল উড়ছে, সাদা লিনেনের শাড়ি লেপটে দিয়ে রেখায়িত করে তুলেছে তার বাহুল্যবর্জিত তলপেট, স্তনদুটি বায়ুচাপে একটু বসে গিয়ে আবার ফুলে উঠছে যেন। ঋতুসম্মত বৃষ্টি-ফোঁটায় ধুয়ে স্মিত মুখের ওপর চকচক করছে তার ছোটখাটো তীক্ষ্ণ নাক। এমন কি, সেদিনের মতো আজও, তার কানের রিংগুলি টিংটিং করে সমানে বেজে চলেছে। আজ সন্ধ্যা থেকে যেমন, সেদিন তারা একটাও কথা বলেনি। শুধু হেঁটেছিল।

পাখি দুটো বারান্দায় ঝটপট করে ওঠে। তিনতলায় শৈলবাবুর ফ্ল্যাটে এখনও আলো জ্বলছে। ভোরের শার্সির মতো নীল দেখাচ্ছে আলমারিটা। আয়না জুড়ে সাদা অন্ধকার। আজ চার বছরে সন্তানবতী হতে না-পারলেও পুল্পেনের ঔরসে উমা ওই নীল আলমারি প্রসব করেছে। তুল্যমূল্যে, অন্তত প্রসব-বেদনার দিক থেকে, এই বা কম কী, সে ভেবে দেখল।

যান্ত্রিক একটি সিগারেট ধরিয়ে, না টেনে, গোঁজার জন্যে আসট্রের বদলে অন্ধকারে একটি পিকদানি টেনে এনে পুল্পেন টের পায়—ভুল! কিন্তু এখন কোনো মানে হয় না-গোঁজার ? সে পিকদানিতে অগ্নিমুণ্ড চেপে ধরে। □

ডোবা মানুষ

অ নি তা অ গ্নি হো ত্রী

'এ কী, উঠছেন কেন, বসুন!'

তবু, মৃদু হেসে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় মেয়েটি, দেশমুখের বউ। লম্বায় সাড়ে পাঁচফুটের মতন হবে, নীল সালোয়ার কামিজে তাকে আরো তীব্র দেখায়। দীর্ঘ বেণী কোমর ছাড়িয়ে ঠিক কতদূর গেছে দেখতে গেলে মুখ থেকে চোখ ফেরাতে হয়। তাই আপাতত সৌম্য ভেবে রাখে যে ওইভাবে ডানদিকে সিঁথি কেটে কপালে চুল পাতানো একটু যেন অদ্ভুত, অনেকটা কোনো বিয়ে না-হওয়া কপালের মতন—

'আপনার জন্য ভাত গরম করেছি, বংগালিবাবু তো, ভাত ছাড়া কী করে খাবেন—'

কতকিছু ছাড়াই তো খাচ্ছি, সৌম্য মনে মনে ভাবে। মাছের তো নামগন্ধ নেই কোথাও।

পাতে সত্যিই গরম ভাত এসে পড়ে, আলোচালের ফরসা ভাত। এই ভাতের উপর যদি কেউ ভাজা মুগের ডাল আশা করে থাকে, সে নির্বোধ। স্টিলের বাটিতে করে ম্লান পিঙ্গল অদ্ভুত তরল ঢেলে দিয়ে অমৃতা বলে, 'আপনার জন্য পিঠ্‌ল করেছিলাম।'

বেসনের সেই গাঢ় মনস্তাপ ভাঙতে ভাঙতে হতাশ্বাস সৌম্য বলে, 'একটা কাঁচালংকা দেবেন?'

'এই যে দিচ্ছি।'

একটা কাঁচালংকা, সরু এক চিলতে পাতিলেবু ছোটো রেকাবিতে এনে অমৃতা দুই ঠোঁট বর্তুল করে বলে, "বাবুমশ-য়!"

ভাতের খিদে অনেকটা কমে গেছে, সেই সঙ্গে থালার উপর মনঃসংযোগও, ওর কপালে বিষণ্ণতা মাখামাখি হয়ে আছে। চোখের কোণ কি সামান্য লাল, অথবা জলে ভরে উঠছে কি দু-চোখ? নিয়ন আলোয় ওসব বোঝার মতন এলেম সৌম্যর নেই।

কলকাতা থেকে দিনসাতেকের জন্য এসেছে। কাগজ থেকেই পাঠিয়েছে। সত্যেশ বাগচি কনট্যাক্ট নম্বর, ঠিকানা সব দিয়েছেন। মনসুনের মাঝামাঝি বানভাসি উপত্যকায় জল-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবে। তার প্রস্তুতির ডিটেল। আন্দোলনের পঁচিশ বছরের নানা বাঁক। আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে গেছে নানা সমাজসেবী সংস্থা। তাদের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা। আসল মানুষটার দেখা নেই। তিনি আসছেন—রোজই শোনা যাচ্ছে। সঞ্জয় দেশমুখের অফিসে ফোন বাজছে তো বাজছেই। তিনি এসে না পৌঁছলেও শনিবারের

ট্রেন ধরতেই হবে সৌম্যকে। সঞ্জয় দেশমুখ পিঠে চাপড় মেরে বলেছে, 'ইয়ংম্যান, চিন্তা কোরো না, আমার এখানে এসেছ, খালি হাতে ফিরবে না। দেখা করিয়ে দেবই দেব।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে অমৃতা বলেছিল, 'আপনি ভাববেন না ভাইসাহাব। ইনি যখন বলেছেন, কাজ হবে। ওঁর কথা কেউ ফেলতে পারে না।'

তখন কেমন যেন পতিব্রতা ভারতীয় নারীগোছের মনে হয়েছিল অমৃতাকে। অথচ চালচলন, কথাবার্তায় পুরোদস্তুর আধুনিক মেয়ে, ভুলভাল ক্রিয়াপদ বসিয়ে ইংরেজি বলে। সঞ্জয় দেশমুখের স্কুলের অফিস, অ্যাডমিশন, হস্টেল সবই বলতে গেলে ওর হাতে। সেইজন্য ওর হাসিমুখের একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার শুনতে মন্দ লাগে না সৌম্যর।

'বলুন না আমার কথা কি বলছিলেন মীনাতাঈ?'

'সত্যি, কিছু বলেননি, বললেন অমৃতা খুব ভালো মেয়ে, যেমন ঘরের কাজে চটপটে, যেমন বাইরের কাজে—'

'ধ্যাত, আপনি বলছেন না, বলবেন না মুখের উপর সেই জন্য'—ঝটপট থালা তুলে ভিজে কাপড়ে মেঝে মুছে ফেলে অমৃতা। রান্নাঘরে গিয়ে বাসনকোসন তুলছে, তার শব্দ বাইরে দাঁড়িয়ে পায় সৌম্য।

হাত ধোওয়ার ঘটি নিয়ে এখন ও কুয়োতলায় দাঁড়িয়েছে। বিশাল সিমেন্ট বাঁধাই কুয়োতলায় ছায়া ফেলছে কয়েকটি ছোটো গাছ। শিউলি, টগর । জলে শ্যাওলা পাতা, নানা রংয়ের ধুলিকণা ভাসছে। ওই জল মুখের ভিতর নিতে সংকোচ হয়। ঘটির জলেই অল্প করে আঁচিয়ে হাত ধুয়ে নিল সৌম্য।

হুহু করে হাওয়া ছুটে আসছে। আবার হয়তো বৃষ্টি হবে রাতে। হলে ভালোই হয়। তেতেপুড়ে জ্বলতে থাকে এই পাহাড়ি এলাকা। ক-দিন হল মনসুন মেঘের ছায়া ঘনাচ্ছে তাই রক্ষে। নইলে, সৌম্যর ভয় ছিল রোদে জ্বরজ্বারি না হয়ে যায়। কলকাতায় ভ্যাপসা গরম বটে, কিন্তু এখনও তাপমাত্রা সাঁইত্রিশ ছাড়ায়নি। তাছাড়া, যার যেমন অভ্যেস।

সঞ্জয় দেশমুখ বাড়ি থাকবে না, সেইজন্য সৌম্য ইচ্ছে করেই সন্ধে পার করে এসেছে। কী আর করবে, ছোট্ট, এই অচেনা শহরে, যার দিগন্ত জুড়ে কেবল সাতপুরা পাহাড় ও পাহাড়ের নানা আত্মীয়-পরিজন। ডায়েরিতে বিলাস রাও ভোঁসলের ঠিকানা ছিল। ওখানে খানিকটা সময় কাটল। বিলাসরাও পুরোনো সর্বোদয় কর্মী। আয়ুর্বেদিক ডাক্তার। মুখে পাকাদাড়ি চাপ হয়ে আছে। খাদির শার্ট, পাজামা পরা বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ বৃদ্ধ। পুত্রবধূ মীনা চা আর চানাচুর দিয়ে জানতে চেয়েছিল কোথায় উঠেছে। সপ্রতিভ মধ্যবয়সি মহিলা, রগের কাছে এখনই দু-একটা পাকা চুল। নাকে মুক্তোর নথ।

হ্যাঁ, অমৃতার প্রশংসা তো করেইছিল মীনা ভোঁসলে, তেমনটিই যেমন সৌম্য বলেছে অমৃতাকে।

শ্বশুর খবরের কাগজের ফাইল আনতে ভিতরে গেলে চোখ-ভুরু নাচিয়ে বলেছিল, 'কেমন লাগল অমৃতাকে? ও কিন্তু এখানকার না, জানেন?'

এর মধ্যেই বিলাসরাও গলা ঝেড়ে ঘরে ঢুকে জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

বোঝাতে লাগলেন সৌম্যকে, ফলে অমৃতার কথা চাপা পড়ে গেল। প্রাচীন সর্বোদয় নেতা ব্যক্তিগত কুটকচালির গন্ধ পেলেই দাড়ি নেড়ে গলা খাঁকারি দেবেন, তাঁর পুত্রবধূ জানে।

অমৃতা ছোটো কাচের প্লেটে ছোটো এলাচ এনেছে, আর সরু করে কাটা সুপুরি। সৌম্য আঙুলে এলাচ তুলে নিতে নিতে বলে, "আপনি কখন খাবেন?"

'আজ রাত হবে।' গালে টোল ফেলে অমৃতা হাসে। 'ওর আসতে রাত বারোটা। খেয়ে আসবে কি না বলেনি।'

'স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেন রোজ।'

'অপেক্ষা করব না?' ঘুমন্ত ছেলের গায়ে নকশি চাদর আলতো করে বিছিয়ে দিযে অমৃতা বলে, 'এখন তো কেবল অপেক্ষাই করব।'

স্কুলটা বিরাট বড়ো মাঠের মধ্যে। চারদিকে পাহাড়ের ঢাল মনোরম বঙ্কিম রেখায় বয়ে গেছে। লম্বা স্কুলবাড়িটা একতলা। টানা বারান্দা। ওতে ক্লাসরুম আছে, ল্যাব, কম্প্যুটার হল, অফিসরুম।

মাঠের উঁচু নিচু পেরিয়ে উলটোদিকে অনেকটা দূরে এখনও শেষ না হওয়া হস্টেল-বাড়ি, তিনতলা। সবকটা জানলায় পাল্লা লাগেনি। পিছনে টিনের চাল দেওযা কাঁচা বাথরুম। সব শেষে দেশমুখদের ঘর, মাঝে তিন-চারটে ছোটো ছোটো ঘর। তাদের গায়ে টিনের বোর্ড মেরে লেখা আছে 'গুরুকুল'। অর্থাৎ আগের হেডমাস্টার এবং অঙ্কের মাস্টার ক্রমাগত নিরামিষ খেয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে যদি না পালাতেন, তবে তাঁদের গামছা-গেঞ্জি এই ঘরগুলোর সামনের দড়িতে ঝোলানো দেখা যেত।

এরই একটা ঘরে আপাতত সৌম্যর জায়গা হয়েছে। কিন্তু শহর এখান থেকে এতদূর যে সকালের জলখাবার, রাতের ডিনার দুটোই খেতে হচ্ছে দেশমুখের বাড়িতে। অটোরিক্সার ভাড়া মেটাতেই পকেট খালি হয়ে যেত না হলে।

এখন রাত দশটা। সৌম্যর ওঠা উচিত। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কিছু একটা পড়ার বা লেখার চেষ্টা করা যায়। নানা আকারের, আওয়াজের-বীভৎস সব পোকা এই ঘরগুলোয়। অনেকদিন বন্ধ পড়ে থাকার জন্যই কি ওদের মৌসুমী ডেরা হয়ে গেছে? রাতে ঘুমোতে হয় পাতলা চাদর কানে জড়িয়ে। এটা অমৃতা-ই বলে দিয়েছে। বড়ো ডেঁয়ো পিঁপড়ে কানের ভিতর ঢুকে কামড়ে দিতে পারে, ওদের কামড় ভয়ংকর।

খাটে পা মুড়ে বসে অমৃতা তার দিঘল চোখ দুটি একপলক বন্ধ করে। ওর নাকের পাথর আর ঝিলিক দিল না। তারপর সৌম্যর দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, 'জানেন, আমি হিন্দু নই।'

সৌম্য একটু অবাক হয়, সামান্য বিরক্ত। মেয়েটা কি ভাবছে, ও চমকে আঁতকে উঠবে? কে কী, তাতে কী আসে যায়? এখানকার মানুষজন এখনও ঊনবিংশ শতকে পড়ে আছে। কিন্তু ঠোঁটে হাসি টেনে এনে বলে, 'তা-ই? আমার মনেই হয়নি।'

—'মীনাতাঈ আপনাকে সত্যি কিছু বলেননি?'

—'সত্যি, বিশ্বাস করুন, না। কিন্তু আপনি এতদিন পরে এসব ভাবছেন কেন অমৃতা?'

—'ভাবছি, কারণ সময় ফুরিয়ে এল!'

এবার গা ছমছম্ করে সৌম্যর। ভয়াবহ কোনো সম্ভাব্য পরিণতির ছবি ওর বুকের মধ্যে ঝুলন্ত পা হয়ে দোলে। দেশমুখদের সংসারের ফাটলের ফাঁক দিয়ে যেন দূরবিস্তৃত ধূসর মরুভূমি দেখা যাচ্ছে। অথচ বাইরে এত ঠাটঠমক, মানুষের যাওয়া আসা, ফোনের পর ফোন, ব্যস্ততা.....

—'সকালে আপনি কিছু বুঝতে পারেন নি? কিছু শোনেননি তারপর?'

বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়ে সৌম্য। এমন ঝগড়া কোন্ সংসারে না হয়? তবে সঞ্জয় দেশমুখের মতো মান্যগণ্য মানুষ সামান্য কারণে এমন জ্বলেপুড়ে উঠতে পারে, ভাবতে খারাপ লেগেছিল। একটা কাগজের সম্পাদক, অন্যটার মালিক। সারা জেলার মানুষ একডাকে চেনে। ডাকসাইটে সাংবাদিক।

দোষের মধ্যে সৌম্য সত্যি কথা বলে ফেলেছিল। চেপে যেতে পারত।

'জলখাবার, চা পেয়েছেন তো?' সঞ্জয় হেসে জিজ্ঞেস করেছিল। কুয়োপাড়ে বসে। চান হয়নি। অথচ খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। চা না পেলে আলস্য ভাঙছে না।

সৌম্য সহজভাবেই ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'নাঃ।' বিসর্গ দুটোর মধ্যে কি কোনো নালিশ লুকোনো ছিল?

ক্রুদ্ধপায়ে ভিতরে ঢুকে সঞ্জয় কিছু একটা বলেছিল। যার উত্তর এঘর থেকে স্বভাবতই শুনতে পায়নি সৌম্য। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ভয় হঠাৎই লাফিয়ে উঠেছে। কারণ, সেই ভোরেই হস্টেলের চাকরটাকে বেধড়ক মারছে সঞ্জয় এই দৃশ্যটা ও দেখে ফেলেছিল ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ভোরের আলো ভালো ফোটেনি তখনও। বাড়ির পিছনে কমন বাথরুমে যেতে হয়েছিল সৌম্যকে। ওর আগেই উঠে পড়েছে বাড়ি আর স্কুলের মালিক।

কিন্তু ও কী? অমন করে হাত দিয়ে মারে মানুষ?

আর ওভাবে, নিঃশব্দে, একটুও প্রতিরোধ না দেখিয়ে মার খায় কেউ?

হয়তো গতরাতের কোনো ভুলভ্রান্তি, কোনো অবাধ্যতার জের।

দেশমুখ সাহেবের ডিসিপ্লিন একেবারে পাক্কা। একটু এদিক সইতে পারেন না উনি। প্রথমদিনই কি বলেনি অমৃতা?

অমৃতার গায়ে সঞ্জয় হাত তুলছে এই দৃশ্যটা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মনের সামনে থেকে সরাতে পারছিল না সৌম্য। কিন্তু অল্প পরে ডাক পড়েছিল ওর।

ছোটো টেবিলে ধোঁওয়া ওঠা জলখাবার, চা সাজিয়ে অমৃতা বলেছিল, 'খেয়ে নিন, দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না।'

ফোলা, রাঙা ওর চোখ দুটিতে, মনে হচ্ছিল, বহুদিনের বেদনা জমে আছে।

'দেশমুখ সাহেব?'

ইশারায় আঙুল তুলে অমৃতা বলেছিল, 'স্নানে গেছেন?'

এদেশে কলঘর বলে কিছু নেই। স্নানের জায়গার একদিকে আধখানা দেয়াল। পুরো দেয়াল তুললে কি মানুষ নিঃস্ব হয়ে যেত? স্নানের জায়গা রান্নাঘরের একপাশে। সেখানেই আবার খাবার জলের কলসি।

অমৃতা খুব, খুব, মৃদু গলায় বলেছিল, ‘পেটে বড়ো ব্যথা ছিল, উঠতে পারিনি।’

সৌম্য আর বসা উচিত মনে করেনি। দ্রুত চা গিলে, থ্যাংক য়ু বলে উঠে পড়েছিল।

কিন্তু এক্ষুনি, এই এগারোটা রাতে, সৌম্যর কাছে সকালবেলার ঘটনাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে আসে।

‘আপনি তো এখনও খেলেন না, অমৃতাকে বলে, আপনার সেই পেটে ব্যথা?’

‘ওরে বাবা, আবার মার খাই, আগে খেয়ে নিয়ে।’ অমৃতা হাসিতে দুলে ওঠে।

‘সকালে উঠতে পারছিলাম না, কন্‌কি বাঈ দেরিতে এল, ওর ছেলেটার জ্বর, চা-জলখাবার হল না। অতিথির কষ্ট হল। দেশমুখ সাহেব আমার উপর শোধ তুললেন—।

‘দুপুরে ওষুধ খেয়েছি—কিন্তু, কী লাভ বলুন?’

—কী হবে মানে কী, ডাক্তার দেখাবেন না, চিকিৎসা করাবেন না?”

অমৃতা উঠে গিয়ে টেলিভিশনটা চালু করে দেয়। প্রবল বেগে নাচগান চলছে চ্যানেল টু-তে।

তারপর সৌম্যকে বলে, ‘আপনি তো বাইরের লোক, কী বলব, কতই বা বলব, এক মাস ধরে ব্যথা, পেটটা ফুলছে। বসতে কষ্ট হয। তবু সোজা বসে স্কুলের অফিসের কাজকর্ম করি। দেশমুখ সাহেব তো আজ এখানে, কাল সেখানে। রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, একশো দশটা দস্যি ছেলে, তাদের দেখাশুনো—কার মাথা ফাটল, কার পড়ে পা ভাঙল! গার্জেন সব বড়ো বড়ো বিজনেসম্যান, তারা তো আমাকেই ধরবে, বলুন।’

—‘আপনি আসার দুদিন আগে, খুব কষ্ট পাচ্ছি, রাজ্জুর জন্মদিন ছিল। সেদিন বলা কওয়া নেই পঞ্চাশজন বন্ধুকে বাড়িতে খবর দিয়ে নেমন্তন্ন করে আনল। খাওযাতেই হবে, রাঁধতেই হবে, নইলে দেশমুখের নাম থাকবে না। মরতে মরতে সব করেছি, ওই কন্‌কি বাঈ ছিল, ও জানে, কতবার রাঁধতে রাঁধতে বমি হঁযেছে আমার—সাহেব জানেন না! জানেন ন্য, কারণ, আর দরকার নেই! দরকার নেই, কারণ, অমৃতার যাওয়ার জাযগা নেই! এটা এতদিনে প্রমাণ হয়ে গেছে।’

‘সকালে সেটাই বলছিল আমাকে মারতে মারতে, ‘যা তোর বাপের বাড়ি গিযে শুয়ে থাক।’ ’

সৌম্য প্রায় ফিসফিস করে বলে, “এখন কেমন বোধ করছেন?”

—‘ওষুধে ব্যথাটা গেছে, কষ্ট তো যায়নি। বারো বছর ধরে সংসার করার পর যাকে সব চেয়ে কাছের ভেবেছি, সে কোনো কিছুই বোঝেনি, কিছুই শুনতে চায় না। কোথায় কষ্ট জানেন?’

‘পনেরো বছর আগে আমাদের প্রেমের গল্প ছিল ও অঞ্চলের রূপকথা। আমি জামনগরের মেয়ে, আমার ঠাকুরদা ওখানকার বড়ো বিজনেসম্যান। এখানে মামাবাড়ি এলাম, অসুখে পড়লাম, তারপর এখানকার কলেজে ভরতি হয়েছি। দেশমুখ সাহেব নামজাদা স্টুডেন্ট লিডার, তখন বি এস সি করে, পলিটিক্স করে, প্রথম দিন থেকে আমার পিছনে আঠার মতন লেগে গেল। আঠারো বছরের মেয়ে আমি কী বুঝি জাতধর্মের? আমার ঘর গেল, বাপ-মা-ভাই সব ছাড়লাম, আমার মুখ দেখল না

আমার খানদান। দেশমুখ বলল, 'চলো আমার ঘরে, নাজমীন, সব ছেড়ে চলে এসো।' আজ ফেরার রাস্তা বন্ধ বলে আমি একটা সংসারে মানুষের ইজ্জতও পাই না, যে ইজ্জত, বিশ্বাস করুন, কন্‌কি বাঈ-এর আছে এ সংসারে।'

—'শেষের সময় ঘনিয়েছে, এসব কী বলছিলেন আপনি? মানুষ কত কষ্টে বাঁচে জানেন?' সৌম্য বলে। উপত্যকার জলবন্দী মানুষদের দেখে এসেছে পরশুই। আবার মনসুনে ডুবে যাবে গ্রামগুলি। বাইরে, দূর পাহাড়ের মাথায় তারাগুলি জ্বলে নেভে। গাঢ়, মখমলের মতন কালো আকাশ। জোলো হাওয়া বইছে, গাছগুলি দুলছে। ভাগ্যিস রাজ্জু ঘুমিয়ে গেছে। ছেলে জেগে থাকলে অমৃতা অথবা নাজমীন তার বোঝা নামাত কী করে? এখন ও দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পাহাড়টিলা থেকে নামা সরু পথটির দিকে চেয়ে।

দরজা থেকে ফিরে এসে অমৃতা বলল, 'নাঃ, ও খেয়েই আসবে বোধ হয়। নইলে এত রাত করত না।'

'মানুষের কষ্টের কথা বলছিলেন না?'

'ওসব কষ্ট আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি, সাহেব। দেশমুখ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। বানভাসি এলাকায় র‍্যালিতে গেছি, অ্যারেস্ট হতে হতে বেঁচে ফিরেছি। আবার ঘরে এসে ছেলে সামলেছি, রান্না করেছি। ও একরকম কষ্ট। মনসুনে বাঁধের ব্যাকওয়াটারে গ্রাম ডুবে যায়। তখন গাছের ডালে তক্তা বেঁধে থাকা, খাবার জল নেই, সাপ কিল্‌বিল্‌ করছে, মরা মানুষকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া....আর আমার আর এরকম কষ্ট, বুকের মধ্যে রোজ রক্ত পড়ে, রোজ ভোররাতে মনে হয় সংসার ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি—'

—'কিন্তু বেরিয়ে পড়েননি তো!' সৌম্যর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়। মনের কথায় উঠে আসা বাকি কথাগুলোকে সামলে নেয় কোনোমতে। এই ঘর, ছাদ, টেলিভিশন, ভালো ভালো শাড়ি, গয়না, খাবার, বানভাসি মানুষের সঙ্গে তফাত তো কোথাও থাকবেই।

রাজ্জু ঘুমের মধ্যে একটু নড়ে ওঠে। একটানা কিছু বলে জড়িয়ে, যা বোঝা যায় না।

ছেলের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখে অমৃতা। তারপর বলে, 'রাজ্জুর জন্য পারিনি। ওর বাবা তো ছাড়বে না ওকে। ছেলের জন্য ভীষণ মায়া হত। এতদিনে সেটা কাটাতে পেরেছি। যদি ওকে না পাই, না দেখি ছ-মাস, এক বছর, তবুও...'

বলতে বলতে চোখে জল উপচে ওঠে, লাল হয়ে ওঠে মুখ, অমৃতা মাটির দিকে তাকিয়ে নিজের এই দুঃখ সামলাতে থাকে।

আজ সকালে ছেলে বলেছে, 'মা তুই বাপের বাড়ি যা। আমি পারব, বাবার কাছে থাকব আমি, তু একটু আরামে থাক্‌ গে যা।'

অমৃতা গলা নামিয়ে আনে। যদিও ধারেকাছে কেউ নেই, মধ্যরাত প্রায়, প্যাঁচাও ডাকছে না, ঠিক তখন, জ্বলজ্বলে চোখের নীচে কালি, সৌম্যকে রহস্য গল্পের মতো করে বলে, 'ভাই-এর চিঠি পেয়েছি। বাবা এখনও কথা কন না, চিঠি দেন না, কিন্তু

ভাইকে বলেছেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। ভাই বলেছে, 'চলে এসো, যেদিন খুশি। আদর করে রাখব।'

'এত বড়ো স্কুল, বড়ো হস্টেল, সব ছেড়ে চলে যাবেন? আব কিছুদিন যাক, একটু শিকড় গেড়ে বসুক স্কুলটা...'

মাঠের ওপ্রান্তে, গভীর অন্ধকারে জেগে উঠেছে বুক কাঁপানো অথচ মৃদু গুম্‌গুম্‌ শব্দ...দেশমুখের মোটরসাইকেল হাইওয়ে থেকে পাহাড়ের বুকের নরম পাকদন্ডিতে উঠে আসছে, ষড়যন্ত্রের মতো...

'ও আসছে, উঠুন, আপনি ঘবে যান, নিজের ঘরে—'

অমৃতার সরু, ফর্সা আঙুলগুলি সৌম্যর কাঁধ ছোঁবার আগেই সন্ত্রস্ত সৌম্য আগুন লাগা মানুষের মতো চৌকাঠ পেরোয। সৌম্য কি পাবে সঞ্জয দেশমুখকে অসন্তুষ্ট করতে? এত বড় রিপোর্ট হবে, আসল মানুষটি এখনও ইন্দোব থেকে এসে পৌছননি, তাঁর সঙ্গে দেখা করিযে দেবার চাবিকাঠি সঞ্জযেব হাতে। সৌম্য দ্রুত যাবে, নিজেব তোশকটিতে টানটান শুযে পড়বে, গাঢ় ঘুমেব ভান কববে, অবশ্য তার আগে কান পাতলা কাপড় নিচ্ছিদ্র কবে জড়িযে নিতে হবে, যাতে ডেঁযো পিঁপড়ে ঢুকে না কামড়ায়....

অমৃতাও চৌকাঠ পেরিযে বাইবে আসে, যেন ও হতাশ, অপমানিত, সৌম্যব আকস্মিক উঠে পড়ায। হযতো ও ভেবেছিল, সৌম্য সত্যিই যাবে না, পিঠ ফেবাবে না তক্ষুণি।

অমৃতা বলে, 'ডিসেম্ববে ইলেকশান। দেশমুখ ইলেকশানে দাঁড়াবে, আমি জানতে পেবেছি। আমি থাকলে দুই সম্প্রদাযেব ভোট টানবে, আজ নয, চোদ্দ বছব আগেই ঠিক ছিল, বঁড়শি দিযে গেঁথে তুলেছিল বিধর্মী বউ—আমি ইলেকশানেব নোটিশ পড়াব আগেই চলে যাব, যাতে ও জিততে না পাবে—'

সৌম্য আর দাঁড়াযনি। বাইকেব হেডলাইট ওব চোখ ধাঁধানোব আগেই ঘরে ঢুকে পড়ে, পালিযে বাঁচে।

সারারাত মোটরবাইকের ভট ভট্‌ শব্দ বর্তুল পথে ঘুবে বেড়ায ওর ঘুমেব মধ্যে। অমৃতার জন্য ভয়ে আর নিজেব কাজের উত্তেজনায ওর মাথাব মধ্যে দপদপ্‌ কবতে থাকে একশো জোনাকি।

ভোররাতে আসল মানুষ এসে পৌঁছল।

ইন্দোর থেকে এগারো ঘন্টা বাসে চেপে। বাসভবতি আন্দোলনেব কর্মী, অন্য জেলার জলভাসি এলাকার আদিবাসী মানুষ, সুবথ আসে, ঢেমনী, বিশা বাইগা, দীপংকর আসে, মনোজ আসে, সুদীপা—

সঞ্জয় দেশমুখের হুইস্কি-বিজড়িত ঘুম তখনো ভাঙেনি। বাজ্জ ঘুমিযে।

সৌম্য নিজেই এগিয়ে যায, পরিচয় দিযে আলাপ করে আন্দোলন নেত্রীর সঙ্গে। মোটা তাঁতের শাড়ি, রাতজাগা কপালে দু-একটি পাকাচুল, ক্লান্ত ভাঙা গলা—

বিস্তীর্ণ এলাকায় আগুনের গোলার মতো ঘুরছেন, সবাই ভালোবাসে, নিরস্ত্র সব মানুষ তাঁর বন্ধু।

অমৃতা উঠে বসে, বাসভরতি সবার জন্য লিকার চা করে। হাতে হাতে চা পৌঁছতে থাকে।

অনেক বেলায় রোদ উঠলে যখন সত্যাগ্রহীদের বসিয়ে পুলিসের লাঠির অহিংস মোকাবিলার কথা বলে মানুষটি, 'মার খাবে, কিন্তু মেরুদন্ড সোজা রাখবে, মাথা সোজা রাখবে—জানবে আমাদের দেওয়ালে পিঠ, জানবে আমাদের পায়ের তলায় জমি নেই, বড়ো চাষির বড়ো ব্যবসাদারদের, বড়ো কারখানার চক্রান্তের সঙ্গে আমাদের লড়াই...'

দেশমুখের ভাড়া করা সস্তার মাইক্রোফোন সাতপুরার উপরের বাতাসে কুসুমচূর্ণের মতো ছড়াতে থাকে মেধা পাটকরের কন্ঠস্বর...'মেরুদন্ড...মেরুদন্ড সোজা, লড়াই, লড়াই...'

অমৃতা দেশমুখ ততক্ষণে রোদজ্বলা পথ মাড়িয়ে টাউনের বাসস্টেশনে পৌঁছে গেছে।

সৌম্যর বিস্তৃত রিপোর্টে আন্দোলনের ইতিহাস উঠে আসে, আসল মানুষটির মুখের বহু কথা, সুরথ, ঢেমনী, বিশা-দের কথা। অমৃতার মুখ সেই মানুষের বন্যায় ডুবে তলিয়ে গেছে কবেই। ❐

কেশবতী কন্যার কিস্‌সা

চি ত্ত ঘো ষা ল

নেন বাবুসকল, নেন মা-জননীরা, একখান করি কোল ডিরিংক খান। খেযি মেজাজখান চাগায়ি নেন। আইজকাল মেজাজ চাগাতি ওই বস্তুখান অনিবাজ্জ। নেন, খান। আপনেরা কিন্তু কিন্তু করতিছেন ক্যান? ওডার মূল্য আমার দক্ষিণের মদ্যি ধরা আছে। দিনকাল যা পড়িছে, যা চলিতেছে আপনের দুনিয়া জুইড়ে, তাতে মূল্য ধরায কী বাড়তি লজ্জা কারও হয় দেখিছেন? সরকারেরই হয না, আমি তো ছার ক্ষুদ্র এক মনিষ্যি, কথকতা করি প্যাটের ভাত জুটাই। আমার লজ্জা কীসির। নেন, নেন...

হ্যাঁ, দিনকালের কথা যা বলতিছেলাম... আমি দেশ গেরামেব কথক, পঞ্চাশ টাকা পালিই আসর বসাই, তাও পাই কই। মান্‌ষির যা হাল। বাপ-পিতেম-র পেশা, ছাড়তি পারি নাই। ছাড়লিই বা ধরতাম কী কলাপোড়াডা। কামটা যত গুটাযি আনতি পারা যাবে, যত লাভখোরদের হাতে সব তুলি দিতি পারবা, তত দেশেব ভালো। আমি তুচ্ছু কথক মনিষ্যি, আমি অত বুঝিনে। আপনেরা শুদোতি পারেন, দেশের ভালো না হলি তুমি হরিদাস এখানে আলা কী করি? তুমি কি বাপেব জন্মে ভাবিছিলে এই ঠান্ডাকল লাগানো হলঘরে আসর বসাতি পারবা? না, ভাবি নাই।

হাত-পাযের লোম তুলি বুনেদের মা-জননীদের সুন্দুজ্জু বাড়ানোর অষুদের এই কোম্পানি আমারে ইসপনসর না করলি এখানে আসবার কথা ভাবতিও পাবতাম না আমি। হাজারবার মানি 'এই কথাডা। নতুন নতুন ব্যবস্থা-বিধান যা-সব হতিছে তারই জন্যি আমার এই সুখ। তবে কথাডা হতিছে.. বলব কি? যা থাকে কপালে বলিই ফেলি। আমার মতন গরিব কাজকম্ম করি যারা প্যাট চালায তাদেব সক্কলেব জন্যি একটা একটা ইসপনসর দরকার। পাওয়া যাবে? আমার ভাই বেন্দাবন চাষবাস করি সংসার চালায়। তার অবস্থা দেখি আমার তো আতঙ্ক হতিছে। তার জন্যি এই মুহূত্তে এট্টা ইসপনসর দরকার। পাওয়া যাবে বলি তো মনে হয় না। আমার কথা শুনি আপনেরা হাসতিছেন। হাসেন, হাসেন। হাসলি শরীল ভালো হয, মন পেসন্ন থাকে। আমি কথা দিতিছি আইজ যা শুনাব তা শুনি আপনেদের হাসতি হাসতি পেরান বেরযে যাবার উপক্কম হবে। আমারে আনার জন্যি ধন্যি ধন্যি করবেন আমার ইসপনসব কোম্পানিরে। আমারে ভুলি গেলিও যেতি পারেন, কিন্তু আমার কোম্পানিরে ভুলতি পারবেন না। আমি না থাকতি পারি, কথকতা না থাকতি পারে, কিন্তু লোম তো থাকবে, লোম থাকলি তো মোলায়েম করি উপড়াযি ফেলার জন্যি আমার কোম্পানির অষুদও থাকবে।

এই কথা বলি শুরু করি আসল কেচ্ছা। আইজ কেশবতী কইন্যার যে কেচ্ছাখান

শুনাতি মন করিছি সেডা যেমন বিচিত্তির তেমন এট্টু শক্তও ঠেকতি পারে আপনেদের। সেজন্যি আমার কথকতার মদ্যি মদ্যি য্যান 'এডা ক্যান, সেডা ক্যান' শুদোয়ে আমার ফোলোডা খারাপ করি দিবেন না। কথকতা শ্যাষ হলি তখন শুদোতি মন চায় শুদোবেন। মুখ্যুর মতন উত্তর যা পারি দিব। আসলি কী জানেন, পণ্ডিতেরে যা মানায় মুখ্য সেডা করতি গেলি ভারি মজার কাণ্ড হয়। সেই মজাডা চাখতিই তো আপনেদের আসা, কী বলেন ? আসলি এই ব্যাটা মুখ্যু পণ্ডিতের কায়দা ধরিছে। আমি নতুন কিছু করতিছি না। আপনেদের আর কী কব। আমি মুখি মুখি কেচ্ছা শুনাই। শুনিছি কেচ্ছা যারা লিখে, ফালতু কথারে যে যত ঘুরোয়ে পেঁচোয়ে লিখতি পারে সে তত কেলেবর। তবে সেকথায় আমার কী কাজ! আমি তো ফালতু কথার বাণিজ্য করতি বসি নাই। আমার আইজকের কেচ্ছাখানই ঘুরপ্যাঁচের, কেমন কেমন য্যান....

তয় শুরু করি...

ক্যাশবতী কইন্যার রূপির বিত্তান্ত কে না শুনিছে, কত্‌কাল ধরি যে শুনতিছে তার ঠিকঠিকানা নাই। আমি শুনিছি, আমার বাপ শুনিছে, তারও বাপ শুনিছে, আপনেদেরও বাপ, বাপের বাপ, তারও বাপ, সব্বাই শুনিছে মনে করি। আপনেরাও শুনিছেন। না শুনি থাকলি একবার ইন্টারনেটে খবর করি দেখতি পারেন। ক্যাশবতী কইন্যার রূপ সম্পর্কে কথা একখানই —ত্রিভুবনের সব রূপসির রূপির মুখি সে ঝামা ঘষি দেছে। তার রূপির তুলনা খুঁজতি হলি আকাশি দেখতি হবে, মান্‌ষির মদ্যে খুঁজলি ওই বস্তু পাবার নয়। আকাশের নীল বন্ন, সুয্যির ঝাঁ ঝা তেজ, ভরা চাঁদের ঠান্ডা নরম আলোর সমুদ্দুর, শিমূল তুলোর মতন হালকা হালকা উড়তি থাকা সাদা সাদা ম্যাঘগুলান, কী মোষ-কালো উলটি-পালটি খাতি থাকা ঘোর ম্যাঘ— এইসব মিলায়ি মিশায়ি, অনুমান শক্তিটা ভাল থাকলি তার উপর নিভভর করি ক্যাশবতী কইন্যারে ভাবি নিতি পারা যায়। মোদ্দা কথাটা হতিছে এই যে, রূপ যত্‌খানটা চোখের সামনি তার ঢের বেশি মনের ভাবনায়, ভাবে। তারে ওজন করতি গেলি, তার হিসেব নিতি গেলি সে এক বিপজ্জয় কাণ্ড বলিই আমার মনে হয়। যাক, অতসব আমার মনে না হলিও চলবে। তবে একটা কথা না বললিই নয়, রূপের মদ্যি কিন্তু বড়ো একটা শক্তি থাকে, ক্যাশবতী কইন্যারও আছে। রূপ সত্যি সত্যি হলি শক্তিডা বড়ো ভীষণ। মিথ্যে মিথ্যে রূপির শক্তি টাকা-পয়সায় হিসেব করতি পারা যায়। সে আপনেরা অনেক দেখিছেন, রোজই দেখতিছেন।

তো ক্যাশবতী কইন্যা একদিন উড়াল পাড়িছে আকাশে। সে মাঝে-মদ্যিই এমন উড়াল দেয়। অত যার রূপ সে উড়াল দিবে না তো করবেডা কী!

সূয্যিবরন শাড়ি পরনে কইন্যার, মেঘবরন চুলির বিত্তান্ত আমার আর কতি লাগবে ক্যান! শাড়ির ঝিলিক বলে আমারে দ্যাখ্, চুলির চমক বলে আমারে দ্যাখ্, সব ছাপায়ি কইন্যার রূপ বলে, আমারে দেখি চক্ষু সাত্থক করো তোমার। তবে দেখতি কি পাবা ? সেই চক্ষু আছে কি তোমার ? আপনেরা নিচ্চয় দেখিছেন। আমার মতো হতভাগা বোকাসোকা মনিষ্যি যখন দেখিছে, আপনেরা দেখিছেন ধরিই নিতি পারি।

এই ছুটতিছে কইন্যা য্যান একখানা বুইব্ অ্যালোপ্লেন, খান বিশ-পঁচিশ নানা বন্নের

আলো য্যান একসাথে ছুটতিছে হাওযার সাথে পাল্লা দে। ময়ূর যদি উড়তি পাইরত আকাশে তারেও ছাড়ায়ি যায কইন্যার উড়াল। হাত ছড়াযি ডানার মতন শরীল ভাসায চিলির মতন, তো পরক্ষণে ঝিরি ঝিরি জল কাটি ওলিম্পিকের মেইযাদের মতন য্যান সাঁতার টানে— জলের তলার ছবিতি যেমন দেখা যায। উথালিপাথালি আলোপারা রূপ ছড়াযি ঠিকরাযি ভাসায়ি কইন্যা কাণ্ডই বটে করতি থাকে একখানা।

দেব্‌তারা বোধ করি আরও অনেক উপরিতে থাকে। না হলি ক্যাশবতী কইন্যাবে নজরে পড়লি ওই লোচ্চা ইন্দ্র ঠাকুরটা নিচ্চয হামলাযি পড়িত। উড়তি উড়তি কইন্যা দেখে নিচিতে এক বিশ্ব-সুন্দরী পিতিযোকিতার পেল্লায আযোজন চলতিছে।

চক্কর খাতি খাতি কইন্যা সব দেখে। দেখতি দেখতি ভাবে—আমি কম কীসি? আমি নামলি আমার একনম্বর হওযা ঠেকাতি পারবে ও হাড়গিলেগুলান? ওই মুটুক আমার না হলি কার?

সুন্দরী মাত্তরেরই এট্টু-আধটু দেমাক থাকে। ক্যাশবতী কইন্যারও আছে। তবে হ্যাঁ, তার দেমাক মানাযে যায়। তিন পযসাব বুপিব দেমাক দেখতি দেখতি আমাদের চোখ পচি গেছে। আর ক্যাশবতী কইন্যার রূপির দাম তো টাকা-পযসায হবার নয, সমুদ্দুরে মানিক খোঁজার মতো মনের মদ্যি ডুব দিযি তার দাম খুঁজতি হয। সে কইন্যেব দেমাক না থাকলি কার থাকবে।

এসবের খবর কি জানা নেই কইন্যেব? আছে, নিচ্চযই আছে। কিন্তু হাজার হোক মেইযে ছাওযাল তো। কেউ যে তার লক্ষ কিলোমিটারের মদ্যিও আসতি পাবে না সেডা দেখাবার জন্যি তার মনডা কুটকুটোতি থাকে। ভাসতি ভাসতি সে ভাবে। ভাবতি ভাবতি ঝুপ করি নামিই পড়ে একসময।

কইন্যা আকাশ থে নামিছে, বিশ্বসুন্দবী পিতিযোগিতায নামিছে।

ক্যাশবতী কইন্যাবে এইখানে ছাড়ি আমরা বিশ্বসুন্দরী পিতিযোগিতার খবরাখবর নিতি যাব এট্টু।

২

এইবেরে আমি আপনেদের আমার বন্ধু পাগলা মাষ্টারেব এট্টা লেখা শোনাতিছি। আমি আপনেদের মতো লেখাপড়া শিখি নাই। পাগলা মাষ্টার আমার বন্ধু হলি কী হবে, সে কিছু লেখাপড়া শিখিছে। আমি তার লেখা পড়তি গেলি উচ্চারণে ভুল হতিই পারে। তাই আমার ইসপনসর কোম্পানির এক দিদিমণি মিমি মুকুজ্জি লেখাটা পড়ি দেবেন। আসেন। দিদিমণি।

ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও একটি নতুন মাত্রা

ইলু ইলু কনডোম প্রস্তুতকারক সংস্থার স্পনসরশিপে হতে চলেছে ইলু ইলু বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এটা আর এমনকী উল্লেখযোগ্য খবর? সম্প্রতি বিশিষ্ট জননেতা ভবতোষ সরখেলের পিতৃশ্রাদ্ধও তো আমরা স্পনসরশিপে হতে দেখেছি। তামাকের ধোঁয়া গিলিয়ে গিলিয়ে মানুষকে বেদম করার কোম্পানি হচ্ছে জোরদার দমের খেলা ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক আসরের স্পনসর। এরকম কতই না হচ্ছে। এই ঘনঘোর

বিশ্বায়নের যুগে মাল কি অমনি অমনি বেচা যায় দাদা! সুন্দরীর আন্ডার-গারমেন্টের চেনে লটকানো অসম্ভব দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে অসম্ভব সলমন খান লাফ দিয়ে পড়ে নিচের হ্রদে চলন্ত বোটে, সুন্দরীর পাশে। এত কসরতের পরেও কিন্তু হাতের নরম পানীয়ের বোতলটি ঠিকঠাক। তবেই না আট আনার মিষ্টি জল বিকোয় ধাঁই ধাঁই আট-দশ টাকা বোতল। তা বিকোচ্ছে বিকোক।

যে কথা হচ্ছিল—ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা। বিশ্ব-বাজারে ইলু ইলু এক মহা-কনডোম। মহা অর্থে কেউ যেন আকার-আয়তন না ধরেন। সেটা স্বাভাবিক না হলে তো কনডোম অন্য অনেক কিছুই হতে পারে, যেমন—বেলুন, ব্লাডার, হতে পারে না শুধু কনডোম। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে ইলু ইলুর মসৃণতা, সূক্ষ্মতা, যা প্রবল সংঘর্ষের সময়েও প্রায় অশরীরী অচ্ছেদ্যতা নিয়ে নিরঙ্কুশ নির্ভয় নির্ভার আনন্দলীলায় ভাসায় কত-না যৌথ হৃদয়কে! তবে না খোদ আমরিকাতে তিনটির এক প্যাকেট চার ডলার! ইন্ডিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশেও ভালো বাজার। এক টাকায় তিনটির প্যাকেটের লোকেরা এর মর্ম বোঝে না। উচ্চকোটির শৌখিন সংঘর্ষ কিন্তু ইলু ইলু ছাড়া ভাবতেও পারে না তেমন তেমন সমঝদার লোকেরা। পঞ্চশরে দগ্ধ করে এ তুমি কী করেছ সন্ন্যাসী? বিশ্বময় ছড়ানো ইলু ইলু, ইলু ইলুর জবরদস্ত বাজার। এহেন ইলু ইলু কনডোম কোম্পানির কর্তারা যখন ভাবলেন বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার স্পনসর হওয়া তাদেরই মানায়, ঠিকই তো ভাবলেন। তেমন তেমন সুন্দরী-ভাবনার অনুষঙ্গে ইলু ইলু যেমন এসেই পড়ে অনিবার্যভাবে, অবশ্য তেমন তেমন আধুনিক গ্লোবাল মননে কৃতবিদ্য সফল মানুষদেরই চেতনায়, এই ব্যাপক গভীর ব্যাপারটার সঙ্গে মানানসই তো হতেই হবে ইলু ইলু কনডোম কোম্পানির স্পনসরশিপে ইলু ইলু বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এককথায় এই প্রতিযোগিতা হবে অতুলনীয়। যেমনটি আগে কখনও হয়নি, ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কত বিলিয়নের ধামাকা কে জানে! ইলু ইলুর তুখোড় ফিনান্স আর সেল্স এক্সপার্টরা বলেছে—ভয়ের নেই কিছু, উনিশটা ইন্টারন্যাশনাল টিভি চ্যানেলকে টেলিকাস্টিং রাইট বিক্রি করেই উঠে আসবে আদ্দেক টাকা। আর প্রতিযোগিতা চলার সময়েই ইলু ইলু সুপার কনডোম বেশি বিক্রি হবে অন্তত টোয়েনটি ফাইভ মিলিয়ন প্যাকেট্স। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এইসব বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে মানুষের ইলু ইলুর প্রয়োজন বেড়ে যায়। সৌন্দর্যের আবাহনে হৃদয় যখন উথালপাতাল তখনই সে ইলু ইলুর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে চায়—এ তো মানুষের স্বাভাবিক এক প্রবণতা। উপলক্ষ যখন প্রবল—যেমন এই সুপার ফেস্টিভেল, সুপান বোনানজা—প্রবণতাও প্রবল হওয়া স্বাভাবিক। সুপার-ডুপার কমপিউটার কষে দিয়েছে— ইলু ইলুর এই মুহূর্তের বিক্রিই যে শুধু টোয়েনটি-ফাইভ মিলিয়ন প্যাকেট্স বাড়ছে তা নয়, এই প্রতিযোগিতা স্থায়ী প্রভাব ফেলবে ইলু ইলুর ভবিষ্যৎ বাজারেও। থাক ওসব বাণিজ্যের কথা। এখন আমরা মগ্ন বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতার মতো এক নান্দনিক বিষয়ে।

প্রতিযোগিতার জন্য সমুদ্রসৈকতে নির্মিত হচ্ছে এক আশ্চর্য উপনগরী। থাকছে সর্বাধুনিক জীবন যাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা। যে প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে সুন্দরী

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্যায়, চূড়ান্ত কারিগরি দক্ষতা সেখানে সৃষ্টি করবে শব্দ আর আলোর জাদুময় এক অকল্পনীয় নন্দন-কানন। সুন্দরীদের উপস্থিতি, চলনভঙ্গিমা, আবরণ-নিরাবরণের সমন্বয়-সুষমা দশ-হাজারি বিশ-হাজারি ডলার আসন মূল্যে প্রত্যক্ষদর্শীদের হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে যে উতরোল আবেগ সৃষ্টি করবে, প্রেক্ষাগৃহের নেপথ্য সুরলহরি আর আলোর উৎসব প্রতিমুহূর্তে অনুসরণ করবে তাকে। পরে এখানেই গড়ে উঠবে ইলু ইলু মাল্‌টি-পারপাজ এনটারটেনমেন্ট স্টেশন। কল্পনীয়-অকল্পনীয় সবরকম আনন্দ-উপভোগের আয়োজন থাকবে এখানে। এমনকি গে-ক্লাবের একটি শাখাও। 'গে-ক্লাব' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে পশ্চাদ্‌দুয়ারি সংঘ।

একশো আঠারোটি দেশ তাদের সুন্দরীশ্রেষ্ঠাদের পাঠাবে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। প্রতিযোগিতা-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একদল সৌন্দর্য-বিশেষজ্ঞ একশো আঠারো সুন্দরীর মুখ-চোখ-চুল-ত্বকের বর্ণ,দেহের তামাম জ্যামিতির মাপজোখ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং ভিডিয়ো ক্যাসেটে এদের গতিময় ভঙ্গিমাসকল যৎপরোনাস্তি বিশ্লেষণ করে তিনটি শ্রেণিতে এদের ভাগ করেছেন—আকাশপরি, জলপরি, স্থলপরি। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানকে অসাধারণ বর্ণাঢ্য করে তোলার জন্যই এই পরিকল্পনা। নবনির্মিত গার্ডেন অব্‌ কিউপিড স্টেডিয়ামে আসন-বিন্যাস এমনই যে দর্শকরা সমুদ্রকেও পাবেন দৃষ্টির সীমানায়। সুন্দরীরা প্রথমে সমবেত হবেন পাশের এক ছোট্ট শহরে। ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা উপনগরীতে তাদের প্রথম আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটবে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের দিন. জলপরিদের ছোটো ছোটো বায়ুযান মেঘ ফুঁড়ে নামবে সমুদ্রে। তারপর বিশাল পুষ্পস্তবকের মতো সাজানো ভেলায় চেপে তারা এসে নামবে গার্ডেন অব্‌ কিউপিডের দুয়ারসমুখে। আকাশপরিরা নামবে আকাশ থেকে—হাজার রংয়ের ঝিলিক ঠিকরানো প্যারাসুটে করে। স্থলপরিরা স্টেডিয়ামে ঢুকবে রোমান চ্যারিয়টে। উদ্‌বোধনী-পর্বের এটুকুতেই কত মিলিয়নের ধাক্কা— ভাবা যায়!

গোটা ব্যাপারটার বিশালত্ব বোঝাতেই সামান্য আন্দাজ দেওয়া হল। সবে তো প্রস্তুতিপর্ব। আপনারা সবই জানতে পারবেন যেমন যেমন এগোতে থাকবে ঘটনাপ্রবাহ পরিণতির দিকে, সেই মহা-মুহূর্তটির লক্ষ্যে, যখন ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরীর মুকুটটি উঠবে কোনো সৌভাগ্যবতীর মাথায়। সবই আপনারা দেখবেন, জানবেন যথাসময়ে। উনিশটি টিভি চ্যানেল আর তাবত প্রিন্ট-মিডিয়া তো উদগ্রীব হয়েই আছে দেখাতে, শোনাতে, জানাতে।

আমরা আজ উপস্থিত হয়েছি কয়েকটি স্কুপ-নিউজ নিয়ে—যা, আমাদের বিশ্বাস, আর কারো পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ব-সুন্দরীর মুকুটের ডিজাইন নিয়ে নেপথ্যে যে নাটক ঘটে গেল কজন জানে তার খবর। প্রথম থেকেই ঠিক ছিল যে মুকুটের চেহারা গতানুগতিক হবে না। এই যুক্তিতেই ইলু ইলুর বোর্ড অব্‌ ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান বলে বসলেন, মুকুটের চেহারা হোক ইলু ইলুর প্রাইজ প্রোডাক্টর আদলে। সকলের মাথা হাত। বলে কী বুড়ো! কে তাকে বোঝায়? কার এত সাহস? শুধু কি চেয়ারম্যান? দুনিয়ার ধনকুবের-তালিকায় তিন নম্বরে। মানানসই মেজাজ, তেমনই জেদ। বয়েস আশি, শরীরে চল্লিশের যৌবন।

শেষ পর্যন্ত কর্তাব্যক্তিরা শরণাপন্ন চেয়ারম্যানের পি এ প্রাক্তন গোল্ডি হেয়ার-রিমুভার বিশ্ব-সুন্দরী তুরি তুরতুরিনার। তুরি দেড় ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার আলোচনায় চেয়ারম্যানকে বোঝাতে পেরেছিল কেন বিশ্ব-সুন্দরীর মুকুট প্রাইজ প্রোডাক্টের আদলে হতে পারে না। শোনা যায়, বার কয়েক প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনের পর চেয়ারম্যান মেনে নিয়েছিলেন, যে ওটি ধারণযোগ্য বস্তু হলেও শিরোধার্য নয়। তারপর একদল বিশেষজ্ঞের হাতে মুকুটের ডিজাইনের ভার তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা অত্যন্ত গোপনে কাজ করে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে নারী-সৌন্দর্যের যে কোনো উত্তুঙ্গ বিন্দুকেই তাঁরা এই মুকুটে ধরে রাখবেন।

বিচারমণ্ডলীর নির্বাচনের ব্যাপারেও দারুণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

শারীরিক সৌন্দর্যের মধ্যে স্বাস্থ্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক শিল্পসম্মত পরিমাপ ইত্যাদির বিচারের দায়িত্বে থাকবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শারীরতত্ত্ববিদ, সুইডেনের ডক্টর হ্যান্‌স হেনেরিকসন ও নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী তামাকুসি ফুজিয়ামা।

ত্বক, চোখ, ঠোঁট, দাঁত ইত্যাদির সৌন্দর্য বিচারের জন্য তৈরি হয়েছে দশজন বিশেষজ্ঞের টিম। অবশ্যই নেতৃত্বে আছেন দুনিয়ার একনম্বর বিউটিসিয়ান মাদাম মঁ ভঁ।

বাচনভঙ্গি-স্বরক্ষেপণ-অভিব্যক্তির দিকটা দেখবেন হলিউডের অসকার-জয়ী দুই অভিনেতা অভিনেত্রী—বিল হুইটন ও রেবেকা হোগান।

শরীরের ভাষা, চলন উপবেশন শয়ন এরকম প্রতিটি ভঙ্গিমার লালিত্য পরিমাপ করার দায়িত্বে আছেন বিখ্যাত ব্যালেরিনা সুজান কাপ্রি। তাঁকে সাহায্য করবেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী কুস্তিগীর হামিদ-উল-হারুন ও চিত্রশিল্পী এডমুন্ডো দোহাম্বা।

কিন্তু এসবে যতই গরিমা থাক নারীর, সবই বাহ্য। আসল নারীত্বের যে দীপ্তি সে তো অন্তরে, মননে, মেধায়। ইতিপূর্বে যত বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়েছে তাতেও মেধাবিচারের একটা করে পর্ব ছিল বটে, কিন্তু মোদ্দাব্যাপারটা একটা সু-অভিনীত তামাশার বেশি কিছু ছিল না। গুরুগম্ভীর মুখের চেহারা করে সাদামাটা মামুলি কিছু প্রশ্ন করেন বিচারকরা, প্রতিযোগিনীরা চালাক-চালাক মুখ করে তার উত্তর দেয়। সেসব প্রশ্ন বা উত্তরের সঙ্গে নারীত্বের মহিমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না।

ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা এক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চায়। নারীত্বের মাধুর্যমণ্ডিত অন্তর-মনন-মেধার অন্বেষণে তাই থাকছেন তিন মহাপণ্ডিত। অ্যানথ্রোপলজির বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত দুসান ক্রিগ, ইতিহাসবেত্তা সিরিল ব্রাবাদু ও প্রখ্যাত ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ ত্রিকাল চতুর্ভুজ।

দেহমনের সৌন্দর্য বিচারের এই নক্ষত্রখচিত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে থাকছেন সম্প্রতি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণকারী রুশি দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর বোলবোলাওস্কি। বোলবোলাওস্কিকে রাজি করাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বিচারকদের প্রাপ্য সমস্ত সুযোগসুবিধা ও সম্মান-দক্ষিণার প্রস্তাব তো তিনি প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। পরিষ্কার কথা— পছন্দের কাজ না হলে কোনো কিছুর বিনিময়েই কোনো কাজ তিনি করেন না। ইলু ইলু কর্তারাও সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। বুদ্ধিজীবী মহলে ঘোরাফেরা করা তাদের চরেরা খবর নিয়ে এল, এই মুহূর্তে বোলবোলাওস্কির সবচেয়ে

পছন্দের কাজ একটি বিপুল গবেষণা, যার বিষয়—মার্কসিজম ইজ অবসোলিট : কমিউনিজম আ হোক্স। এর পরে বোলবোলাওস্কিকে রাজি করাতে বিশেষ অসুবিধা হল না। সম্মানদক্ষিণা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার অতিরিক্ত গবেষণার কাজে সহায়তার জন্য কুড়ি হাজার ডলারের বৃত্তি। ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতাব বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের পদটি গ্রহণ করলেন বোলবোলাওস্কি।

ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত এইসব জানা-অজানা খবরে আপনাদের আনন্দ ও আগ্রহের তুলনা নেই, জানি। কিন্তু এবার যে খবরটি আপনাদের জানাব তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই রহস্যময়। মনোজ প্রভাকরের কায়দায় আমাদের গ্লোবাল কোলাবোরেটরদের সাহায্যে ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর সর্বশেষ বৈঠকটি গোপনে ভিডিও ক্যাসেট-বন্দী করতে পেরেছি আমরা। সেখানে আশ্চর্য কিছু আলোচনা হয়েছে, যার মর্মোদ্ধার আমরা করতে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ যে ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতায সম্পূর্ণ নতুন গভীর এক মাত্রা সংযোজিত হতে চলেছে।

ভিডিযো ক্যাসেটে আমরা যা দেখলাম ও শুনলাম তার কিছু কিছু আপনাদের জন্য রাখা হল। আমাদের সঙ্গে আপনারও ভাবুন তো, কোন্ বিস্ময আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

বোলবোলওস্কি · আমবা এদের স্বাস্থ্য-সুষমা, দেহের জ্যামিতিক অনুপাত ইত্যাদি নিখুঁতভাবে বিচার করব। চূড়ান্ত পর্যায়ে এদের হৃদয-মন-মানসিক বিকাশেব পবীক্ষাও আমরা নেব। অর্থাৎ নারীত্বের সম্পূর্ণ শারীবিক ও মানসিক বিকাশ যাব মধ্যে দেখা যাবে তাকেই দেব শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে নারীত্বের চরম বিকাশ ও প্রকাশের সব বিন্দুগুলিকেই আমরা বিচারেব আওতায আনতে পারছি কি ? আমাদেব দিক থেকে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি থেকে যাচ্ছে না তো ?

(ক্ষণিকের নীরবতার পর)

সিরিল ব্রাবাদু : আপনার কি মনে হয কোনো ভাইটাল অ্যাসপেক্ট আমাদেব বিচাব থেকে বাদ চলে যাচ্ছে ?

বোলবোলাওস্কি : সেরকমই একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার।

মাদাম মঁ ভঁ · তাহলে খুলে বলুন সেটা।

বোলবোলাওস্কি : আপনারা ভাবুন।

দুসান ক্রিস · মঁসিযে, চিন্তাটা যখন আপনাবাই মাথায এসেছে, আপনিই বলুন-না।

বোলবোলাওস্কি : না। আপনাদের কারও মনেই যদি প্রশ্নটা না এসে থাকে, আমি নিজের মুখে একটা বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করতে চাই না। এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

(গম্ভীর হয়ে মুখ বন্ধ করেন চেয়ারম্যান। অন্যরাও গম্ভীর মুখে চিন্তাকুল।)

— আমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। ইলু ইলু কোম্পানির প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন।

তারপর এগিয়ে যান চেয়ারম্যানের চেয়ারের দিকে। তাঁর কানে কানে কিছু বলেন। বোলবোলাওসকি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে প্রতিনিধিকে খুব নীচু গলায় যা বলেন যন্ত্র তা রেকর্ড করতে পারেনি।

প্রতিনিধি এবার সভার উদ্দেশে বলেন—চেয়ারম্যান যা ভেবেছেন আমি সর্বাংশে তার সঙ্গে একমত। আজকের এই সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তার আগে স্পনসর-কর্তৃপক্ষ ও প্রতিযোগিনীদের মতামত নিতে হবে। আমার ধারণা, ধারণা কেন বিশ্বাস, সবাই এতে সানন্দে সম্মত হবেন। পরীক্ষা যত কঠোর হবে জয়ে ততই না আনন্দ!

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষায় আমি আমরা। আপনারও থাকুন। দেখুন কী আছে অপেক্ষা করে আমাদের জন্য। সৌন্দর্যের কোন্ নবতর মাত্রার সন্ধান পাব আমরা কে জানে!

৩

বাবুসকল মা-জননীরা, আমার বন্ধু পাগলা মাষ্টারের লেখাটা তো শোনলেন। এট্টু সায়েব-সাযেব উশ্চারণে চমৎকার পড়িছে কিন্তু মিমি দিদিমণি। ধইন্যবাদ।

আপনেরা তো ইলু ইলু বিশ্ব-সুন্দরী পিতিযোগিতার কথা খানিক শোনলেন। এখানেই নামি পড়ে ক্যাশবতী কইন্যা।

বোলবোলাওস্কি সায়েব তখন যে চমৎকার বাংলোখানায় তার থাকার ব্যবস্থা হইছে তার বাগানে পায়চারি করিতেছেলেন। তিনি কইন্যারে আকাশ থে নামতি দেখেন, চক্ষে পলক পড়ে না, একদিষ্টে তাকাযি থাকেন। কইন্যা একেবারে তার সাঁমনিতেই নামি পড়ে। কইন্যা উড়তি উড়তি নামিছে তো, কাপড়চোপড় এট্টু বেসামাল ছেল। সামলি নিতি থাকে। সেই ফাঁকে সায়েব কিছু কিছু দেখি-টেকি নেন। যা দেখিছেন তাতেই মাথাটা তিনটে চক্কর দিযি ঝিমঝিম করতি থাকে।

কইন্যা সামলি-সুমলি দাঁড়াতি সায়েব বলেন— তোমারে তো চিনতি পারলাম না।

কইন্যা ঝিকমিক করি একখানা হাসি ছাড়ি বলে— চিনি কাজ কী। আমি পিতিযোগিতার মুটুকখান জিতি নিতি আসিছি।

হাসিখান খুচ করি বিঁদি যায় সাযেবের বুকের বাঁ দিকি। সেখানটা খামচি ধরি সায়েব বলেন—তুমি আকাশ থে নামিছ। পিতিযোগিতায় তোমারে জায়গা দিতিই হবে। কিন্তু সব্বাঙ্গো কাপড় জড়াযি, মাতার অত বড়ো বড়ো চুল নিয়ি তো তুমি নামতি পারবা না। নিয়মে আটকায়ি যাবে। আরো অনেক বিষয় তোমারে জানতি হবে।

কইন্যা আবার হাসি উঠে, এবারি খিলখিলায়ি, সায়েবের বুকিতি ঘ্যাচাং করি মস্ত একখানা ছুরি বিঁধি যায় য্যান। আগের বার ছুঁচ বিঁধিছিল। সায়েব টলতি থাকে।

কইন্যা ব্যাপারডা বুঝতি পেরি হাসি থামায়ে বলে— তার জন্যি আপনেরে ভাবতি হবে না। যেমন সাজতি নিয়ম তেমন করিই সাজব আমি। কানি পরি দাঁড়ালিও মুটুক আমারেই দিতি হবে আপনাদের। আচ্ছা, এত্ত কথা যে বলতিছেন, আপনে কেডা?

— আমি পেপেচর বোলবোলাওস্কি। বিচারকমণ্ডলীর পেধান। বলতি পারো এত বড়ো যে কাণ্ডখান হতিছে আমি তার মাথা।

— তবে আর কী। আপনের লোকজনেরে ডাকেন। মুটুক পাতি হলি যা যা নিয়ম মানতি হবে শিকায়ে দিক আমারে।

— হবে, হবে, সব হবে। ব্যস্ত কীসির। আসো-না, আমার ঘরে আসো। কফি-টফি খেতি খেতি আলাপ করি এট্টুস।

আবার খিলখিলায়ি উঠিছিল পেরায় কইন্যা. সায়েবের বুকের কথা ভেবি সামলায়ি নেয়। এট্টু থেমে বলে—আমার সনে আলাপ অমন করি হয় না সাযেব। যার হবার তার এমনিতিই হয়।

— তোমার কথা আমি বুঝতি পারতিছি না। সায়েবের মুখখান বোকা বোকা দেখাতি থাকে।

— আচ্ছা, আপনে ম্যাঘলা আকাশ দেখিছেন?

— হ্যাঁ, কতবার।

— সেই আকাশি আমারে কখনও দেখিছেন?

— কতিছ কী তুমি!

— আচ্ছা, কোনি-কোনি হালকা আলোয় পুন্নিমের রাত্তিরি সাদা সাদা ম্যাঘগুলান যখন হাওয়া খাতি থাকে আকাশি, দেখেন নাই আমারে?

— তুমি কি আমারে বোকা বানাতি চাও?

— আপনেরে বোকা বানায়ি আমার লাভ? বরং আমিই বোকা বনি যাতিছি।

— সে কী কথা!

— ঠিকই কথা। নদী-সমুদ্দুর-পাহাড়-বনের উপর উপর অনেক রূপ। আমি তাদের দেখি, তাদের ছাড়ায়িয়ো দেখি। অনেক কিছু দেখি। কী জানি আপনি ক্যান দেখতি পান না! আপনে আবার সুন্দরী পিতিযোগিতার পেধান! কইন্যা ঠোঁট বেঁকায়।

— তুমি আমার মাথাডা গুলাই দিবে দেখতিছি।

— কারও মাথা গুলায়ি কারুর কাজ নাই। আপনে বরং আমারে মুটুকটা দিবার ব্যবস্থা করেন।

সায়েব তখন সুন্দরী বানানোর কারিগর মঁ ভঁ মাসিকে ডাকি বললেন—এরে বানাও। এ মুটুকের জন্যি লড়বে।

কইন্যারে ভালো করি দেখি মাসির তো চক্ষু গোলা গোলা। আহা, এমন রূপ মান্‌ষির হয়! এমন একখানা তার সাইড ব্যবসায় রাখতি পারলি আরবের শেখ-টেখেরা এক রাত্তিরির জন্যি লাখ লাখ ডলার ঢালতি রাজি থাকবে। মেইযেডারে পরে একবার সময়মতো বাজায়ি দেখতি হবে। মাসি ভাবে।

— গোল-গোল চক্ষু করি দেখতিছ কী, মাসির হতভম্ব ভাব দেখি সায়েব শুধোয়, পারব না?

— আপনে কন কী, নিজেরে সামলায়ি মাসি বলে, আমি মনে মনে মাপজোখগুলি দেখি নেচ্ছেলাম।

— কেমন দেখলা?

সেকথায় কান না দিয়ি মাসি শুধোয় কইন্যারে—তোমার নাম কী মেইয়া?

— আমারে চেরডা কাল লোকে ক্যাশবতী কইন্যা বলিই ডাকি আসতিছে।

— চেরডা কাল! সেডা কী কথা?

— ওই বললাম আর কী। কইন্যা হাসে।

— শুনো কইন্যা, মাসি বলে — তোমারে মুটুকের জন্যি বানায়ি দিব যদি আমার কথা শুনি চল। পেথম কথা, তোমার চুল কাটতি হবে। বয়কাট করলি তোমারে মানাবে।

— সেডা কী?

— একরকম মেইয়েলোকের চুল কাটা। আমি সুন্দুজ্জু ইসপেসালিস্ট, আমি যা করব তোমার ভালোর জন্যিই করব। মুটুক জিতি আবার মন চালি চুল গজায়ি নেবা।

— তার জন্যি চিন্তা নাই। আমি ক্যাশবতী কইন্যা। মন চালি নিমিষে আকাশ ঢাকি ফেলতি পারি চুলিতি। আর কী করতি হবে?

— হ্যাঁ, তোমার শাড়ির বন্নখান বড়োই সুন্দর। কিন্তু ওতে মাপজোখ সব ঢাকি রাখলি বিশ্ব-সুন্দরী হবা কী করি? সুন্দুজ্জু মেইযেদের সবখানে, শুদু চুলিতি আর মুখিতি না। সুন্দুজ্জু রাখি ঢাকি লুকাযে রাখি তুমি বিশ্ব-সুন্দরী হতি পারবে না।

— কী করতি হবে সেডা বলেন।

— অন্য মেইয়েরা যেমন পোশাক পরি পরীক্ষা দিতি আসবে তোমারেও সেইরকম পোশাক পরতি হবে। আমি বানায়ি দিব পোশাক।

ক্যাশবতী কইন্যার মাথায় তখন বিশ্ব-সুন্দুরীর মুটুকখান ভর করিছে। চিত্তবিভম ঘটি গিছে তার, সে ভাবনাচিন্তা না করিই বলি বসে — সব মেইয়েরা যা পারবে, আমার তা পরতি কী।

— তবে আর কী। লাগি যাও। মুটুকখান তোমার কপালেই নাচতিছে মনে হয়। কেমন করি হাঁটতি হবে, কেমন করি কথা কতি হবে সেসব দুদিনি তোমারে শিকায়ি দেবার লোক আছে। তুমি পেধানের লোক, তোমারে সবাই খুশি করতি চাবে।

কইন্যার আঁতে ঠোকন দেয় কথাডা। সে কারও লোকটোক না। নিজির রূপিতিই সে সব্বারে পেছুতে ফ্যালাবে। তবে কথাডা বলতি পারে না, মুটুকের লোভেতে সে আচ্ছন্ন হয়ি আছে।

কিন্তু দিন দুচ্চার যেদি না যেতিই তার মেজাজ একটু একটু করি গরম হতি থাকে।

মাসি তিন পরস্থ পোশাক আনি হাজির করে। তার মদ্যি একখানা হাতি নিয়ি দেখতি থাকে কইন্যা। সামনের দিকি সব ঢাকা, পিঠখান বেবাক আদুড়।

মাসি হাসতি হাসতি বলে— এখান কিছু না। এডা পরি একবার হাইজরা দিতি হবে শুদু। আসল পরীক্ষা তো হবি ওই দুখান পরি।

কইন্যা বাকি দুখান হাতে নিযি দেখতে দেখতি মহাধন্দে পড়ি যায়। টানটান চকচকা কপালখান কোঁচকায়ে যায়। এতে শরীলের কত্খান কী ঢাকা পড়বে বুঝি উঠতি পারে না।

মাসি তার মুখের ভাব দেখি বলে — ভাবতিছ কী?

— এগুলান পরি লোকের সামনি যেতি হবে?

— না পরলি তোমার সব্বাঙ্গোর সুন্দুজ্জের বিজ্জারডা হবে কেমন করি? নাও, এই খান পরি নাও।

কইন্যার মুটুকের ঘোর তখনও কাটে নাই। সে মাসির কথামতো তেরো আনা খোলা তিন আনা ঢাকা পোশাকখান পরি নেয়।

পরি তো সে লাজে মরে। আর মাসির চোখ খুশিতি ঝকঝকাতি থাকে— আহা, আহা। এই রকম জিনিসপত্তর কোনো মেইযার থাকতি পারে ভাবি নাই জেবনে, দেখা তো দূর। মুটুক তোমার মাথায় উঠবিই উঠবি। নাও, এই জোতাজোড়া পরি এবার হাঁটো দেখি বেশ ঢলায়ে ঢলাযে।

হাঁইটবে কী কইন্যা! একে লজ্জা, তার উপর আট আঙুল খুর তোলা জোতা পরি তার তো এই পড়ি এই পড়ি অবস্থা। তবু মুটুকের লোভ তারে হাঁটাতি থাকে। সে ধীরি ধীরি আছাড় বাঁচাযে হাঁটে।

মাসি কইন্যার বুকিতি নরম করি এট্টা খামচা মারে। পাছাতি তারপর এট্টু হাত বুলাযি বলে — এই অনবদ্য জিনিসগুলান আছে ক্যান। এগুলান দুলাযে দুলাযে খেলাযে খেলাযে হাঁটতি হবে। কত্তাদের মাথা ঝিমঝিম বুক ধড়ফড় করতি থাকবে। তবে না মুটুক। এই দ্যাখো, এমনি করি হাঁটতি হবে।

মাসি হাঁটি দেখায়। তার বুকিতি পাছাতি হাত দেওয়ায কইন্যাব বড়ো রাগ হইছিল। বুড়ি মাগি বলি ছাড়ি দেছে। ভেতরে গজগজানি ছেল। এখন বুড়িব জোড়া হত্তুকিপারা পাছা আর ফ্যালেট বুক হেলাযি দোলাযি হাঁটা দেখি তারে কষ্ট কবি হাসি চাপতি হয।

মাসি হাঁটা থামাযি বলে — বুঝিছ?

— হ্যাঁ, বুঝিছি।

— পারবা?

— হ্যাঁ, পারব।

বিত্তান্ত বাড়াযি লাভ নাই। ভালো না লাগলিও কইন্যা সব শিখিপড়ি নেয। মুটুক তারে জিততিই হবে। সুন্দুরীব জিদ বলি কথা। সুন্দুরী নে যে ঘব কবিছে, কী কাছ থেকে সুন্দরী দেখিছে সে-ই জানে ওই জিদির খপর।

ক্যাশবতী কইন্যার শিক্ষা শ্যাষ হতি সেক্রেটারি সাযেব আলেন তার সাথে কথা বলতি।

পেথমে তো হতভম্ব হয়ি তাকাযি থাকেন অনেকক্ষণ। তারপর থতাযে থতাযে কথা কতি শুরু করেন। শুরু যদি করেন তো থামতি আব চান না, আলফাল বলিই যেতি থাকেন। কইন্যা বুঝতি পারে সেক্রেটারি সায়েবের দশাটা। শালার বুড়া তো বড়ো মাগির পোকা। কইন্যা মনে মনে হাসে, গাল পাড়ে। হুঁ হাঁ দিয়ি সাযেবের কথার উত্তর সারে।

অনেক প্যাঁচাল পাড়ি শ্যাষে সেক্রেটারি সায়েব কন— তোমার যা সুরুত দেখতিছি, হবার হলি তুমি বিশ্ব-সুন্দরী হতি পারো।

— হবার হলি কীরকম? প্যাঁচ মারি কথা কবেন না, কইন্যা চোখ ঘুরায়ে কয, ওই পেঁচিগুলান আমার ধারে-কাছে আসতি পারবে না।

— হাজারবার ঠিক কথা, সেক্রেটারি সায়েব বোঝাতি চেষ্টা করেন, কিন্তু কোতা কোতা কলকাটি নড়তি থাকে সে না জানো তুমি না জানি আমি। তবে পেধানের ইচ্ছা, আমারও ষোলো আনা ইচ্ছা তুমিই হও। মঁ ভঁ দিদি বলিছে, তুমি সব শিখি পড়ি নেছ। তোমার না হবার কোনো কারণ আমি দেখতিছি না। এট্টা ছোট্ট কথা শুধু বাকি আছে। সেডা বলতিই আমার আসা। তুমি নিচ্চয় রাজি হবা।

কইন্যা চোখ কুঁচকায়ি জিগেস করে— আবার কীসি রাজি হতি হবে?

সেক্রেটারি সায়েব ইদিক উদিক তাকায়ি কইন্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলে। কী বলে সেডা আমি জানতি পারি নাই।

কথাডা শুনি কইন্যা য্যান সপ্প-দশংনে লাফায়ি উঠে। চ্যাচায়ি বলে— এডা আপনে কী কলেন? কতি পারলেন আপনে?

— অলেজ্জ কী কলাম। বড়ো বড়ো মাথারা একত্তরে বসি এডা ঠিক করিছে। এডা না হলি সুন্দরী বিচার অসম্পূর্ণ থাকি যায়। সব মেইয়ারা তত্ত্বখান বুঝিছে, মানি নিছে। বিশ্বসুন্দরী হবা, এটুক পারবা না?

কইন্যা ঝামড়ি উঠে। তার চোখ দুখান জ্বলতি থাকে অংরা-পারা।

—শালা ঢ্যামনা। কইন্যা গজ্জন করে।

সাথে সাথে কইন্যার মাথা আবার ভরি যায় মেঘের মতো চুলিতি। অঙ্গে ওঠে সূয্যিবরণ শাড়ি। কইন্যা উড়াল দিয়ি উঠি যায় আকাশি।

তারপর রং ঝরায়ি আলো ঠিকরায়ি উড়তি থাকে, উড়তিই থাকে, উড়তি উড়তি নাচতি থাকে, নাচতি নাচতি উড়তি থাকে। পিত্থিবি আকাশ সব য্যান কইন্যার রূপের আলোতি ভাসি যায।

সেক্রেটারি সায়েব উধ্বাকাশি তাকায়ি হাঁ করি সেই দৃশ্য দেখতি থাকেন। দেখতি দেখতি তাঁর মুখিতি রামধনুর সাতখান রং ঝটাপটি লাগায়ি দেয়। আচমকা তিনি আকাশি চোখ রাখি দুহাত তুলি নাচতি শুরু করেন, আর চ্যাচান— চুলায় যাক বিশ্ব-সুন্দরী পিতিযোগিতা। ক্যাশবতী কইন্যারে আমি দেখিছি... দেখেছি...। সে আমারে ঢ্যামনা বলিছে। আমি ধইন্য ... আমি ধইন্য....

আমার কেচ্ছা-কথন শ্যাষ। নমস্কার বাবুসকল, নমস্কার মা-জননীরা।

আবার কোল ডিরিংক খেতি পেরান চালি চলি যান পাশের ঘরিতি। তার জন্যি অবিশ্যি দাম দিতি হবে। এডা আমার দক্ষিণের মদ্যি ধরা নাই।

আর এট্টা কথা, যাবার সময় বাইরি কোম্পানির লোকের থে টিকিটের আধখানা দেখায়ি এক শিশি লোম তোলার অষুদ নে যাবেন। ফিরিতে।

আবারও নমস্কার বাবু সকল, মা-জননীরা। □

লাইভ ডকুমেন্টেশন

ঘ ন শ্যা ম চৌ ধু রী

গত বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক অহীন্দ্র সেনের ছবি পুরস্কার পেয়েছিল। ছবির বিষয় ছিল মানব সম্পর্ক। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই ও বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে ফিচাব ফিল্ম করে তিনি এর আগে আবও দু-দুটো আন্তর্জাতিক পুরস্কাব তাঁর ঝুলিতে ভবেছেন। সর্বশেষ যে কাজটি করে তিনি কান থেকে পুরস্কাবটি তুলে নিয়ে এলেন, সেখানে তিনি দাবুণ সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এই কথা চলচ্চিত্র সমালোচকরাই বলছেন।

আজ সন্ধেয় এমনই একজন ডাকসাইটে ফিল্ম ক্রিটিক চন্দ্রভান মুখার্জীর সঙ্গে অহীন্দ্র সেনেব বাড়ির ড্রইংরুমে বসে কথা হচ্ছিল তাঁব।

সমাজের অস্থিবতা আর মুক্তচিন্তাকে আপনি এই ফিল্মে যেভাবে এনেছেন তা এক কথায় অনবদ্য।— বললেন চন্দ্রভান। গর্বিত হাসি অহীন্দ্র সেনের মুখে।

—আধুনিক যৌনজীবনের জিজ্ঞাসা, টিন এজ সেক্স এবং তাব মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আপনার কাহিনি ও ক্যামেবায শুধু জীবন্ত হযে উঠেছে বললে কমই বলা হয, এই ফিল্ম ভারতীয় চলচিত্রের ইতিহাসে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

—হ্যাঁ। আমি আমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিযে ঘনিষ্ঠতব দৃশ্যে অভিনয করিযে নিয়েছি সাবলীলভাবে। স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে। আজন্ম লালিত ভারতীয় সংস্কার আমি ভেঙেছি।

—সেখানে-ই আপনি কেল্লা মেরে দিয়েছেন। আপনার পববর্তী ভেঞ্চাব কী, সেটা জানতেই আমরা আপনার কাছে এসেছি অহীন্দ্রবাবু।

—আপনারা, মিডিযাজগতের মানুষ যেভাবে আমাকে হেল্প করেছেন, তা আমি ভুলি কি করে।

চন্দ্রভানবাবুও হাসলেন। হাসিতে কৌতুক উছলে উঠলো।

বুঝলেন চন্দ্রভানবাবু, এবারও আমি আমার ফিল্মে, বলতে পারেন আমার চিন্তাব বিন্যাসে চমক আনতে চাইছি। এবার বেছেছি সাঙ্ঘাতিক কঠিন এক জীবন।

—কী সেই থিম?

—কয়লাখনির শ্রমিক-মজুরদের জীবন। ক-দিন ধবে তাই নিয়ে পড়াশোনা করছি। পাতালগহ্বরে প্রতিদিন ওরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িযে কযলা কাটে। ধসে, আগুনে মাবা যায়। মৃত্যুর মধ্যেই ওদের জীবন চলমান। তারই মধ্যে নরনারীর সম্পর্ক গড়ে, আবার ভাঙে। ওদের প্রেম, ওদের সংসার, ওদের যৌনতা, ওদের লড়াই—সবকিছুকে আমার পরবর্তী ফিল্মে এক ফ্রেমে বাঁধতে চাই আমি।

ওয়াণ্ডারফুল! মিস্টার সেন, ওয়াণ্ডারফুল আপনার আইডিয়া। আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি, অসাধারণ এক প্রোডাকশন পর্দার বুকে ফুটে উঠেছে। জুরিদের বেশিরভাগ রায় আপনার দিকে। বিদেশি প্রতিনিধিদের করতালি... বারে বারে ক্যামেরায় ফ্লাশগান ঝলসে উঠছে।

এইসব কথা শুনে অহীন্দ্র সেনের চোখ দুটো মদির—স্বপ্নময় হয়ে উঠছিলো। তিনি দেখছিলেন চলচ্চিত্র উৎসবের রঙিন বর্ণোজ্জ্বল আলো।... সেরা ছবি নির্মাতার স্বর্ণ স্মারক হাতে মঞ্চের মধ্যমণি তিনিই।

চন্দ্রভান মুখার্জী চলে যাবার পর মোবাইল থেকে ফোন করেন অহীন্দ্র সেন।

হ্যালো!

হ্যালো, সুবোধ।

হাঁ অহীন্দ্রদা।

লোকেশন কনফার্মড হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। সব কাজ পাকা। ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের টিকিট কাটতে দিলাম।

কবে?

আপনি যেদিন বলেছেন। রবিবার।

ওকে। ভেরি গুড।

হাওড়ায় স্টেশন থেকে রবিবার ভোরের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে চেপে অহীন্দ্র সেনের প্রোডাকশন টিম সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ আসানসোল স্টেশনে এসে পৌঁছলো। স্টেশন থেকে পাঁচতারা হোটেল আসানসোল ইনটারন্যাশনাল। আজ বিশ্রাম। বিকেলের ট্রেনে এসে পৌঁছোবেন জনপ্রিয় নায়িকা আম্রপালি চৌধুরী। এই হোটেলে অহীন্দ্র সেনের পাশের এ.সি. রুমটা তাঁর জন্য বুক করা আছে।

বিকেলের গাড়ি রাইট টাইমেই ঢুকলো। আম্রপালি চৌধুরী এলেন। তাঁর জন্য একটা দুধসাদা অ্যাম্বাসাডার স্টেশনে মজুত ছিল। সেই গাড়ি তাঁকে নিয়ে এলো হোটেল আসানসোল ইণ্টারন্যাশনালে।

অহীন্দ্র সেনের রুমে বেল বাজলো। তিনি দরজা খোলামাত্রই একরাশ বিদেশি পারফিউমের গন্ধ আর উদ্ধত উগ্র সৌন্দর্যের চাকচিক্য নিযে নায়িকার প্রবেশ। আম্রপালির অহংকারী শরীরের দিকে প্রথমেই চোখ চলে গেল অহীন্দ্রবাবুর।

অহীন্দ্রদা, চলে এলাম।

গুড। কাল সকালে শুটিং স্পটে যাবো। এখন স্নান-খাওয়া এবং রেস্ট। সন্ধে সাড়ে সাতটায় তোমাকে নিয়ে বসবো। তখন ডায়লগ হাতে পাবে। তোমার ক্যারেকটারের ধরন, বিশেষ করে মানসিক দিকগুলোর ডিটেল এক্সপ্ল্যানেশন তখন তুমি পেয়ে যাবে।

থ্যাংকস, অহীন্দ্রদা।

ঠিক আছে। তোমার রুমে ঢুকে পড়ো।

আম্রপালি নিজের ঘরে ঢুকে পড়বার পরে পরেই অহীন্দ্রবাবুর কাছে এলেন তাঁর টিমের প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস।

এসো সুবোধ।

যেটা বলতে এলাম দাদা।

বলো।

লোকেশনের জন্য যে জায়গাটা ঠিক করেছি, তা হলো বারাবনি লুপ রেললাইনের কিছুটা দূরে ভানোড়া কয়লাখনির পরিত্যক্ত ধস এলাকা। তার আশেপাশে ছোটো ছোটো আদিবাসী তফসিলি গ্রামও আছে।

জায়গাটা দেখে তুমি স্যাটিসফায়েড তো ?

হ্যাঁ। আপনি একবার দেখুন।

কাল সকালেই চলো যাই। দেখে আসি। পরশুর জন্য একটু ওয়ার্ম আপ হয়ে যাবে।

প্রোডাকশন ম্যানেজার চলে গেলেন। পরিচালক চুপচাপ বসে রইলেন তাঁর চেয়ারে। বহুক্ষণ। অহীন্দ্র সেন শুটিংয়ে নেমে সাংঘাতিক পরিশ্রম করেন এ-কথা সবাই জানে। তার আগে একা ঘরে চুপ করে বসে নিজের গভীরতায় ডুব দিয়ে পরিচালক আসন্ন কর্মপ্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

চিত্রনাট্যের যে দৃশ্যটি আগামী পরশুদিন তিনি ক্যামেরাবন্দী করবেন, তার সংলাপের কাগজপত্রগুলো ফাইল থেকে বের করে আরো একবার দেখে নিলেন। মোটামুটি সমস্ত বিষয়গুলোই হাতের মুঠোয়। ফের তিনি ডুব দিলেন নিজস্ব চেতনার গভীরতর প্রদেশে।

মাপা সময়ে কাজ করেন এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক। যেমনটি কথা দিয়েছিলেন ঠিক সাড়ে-সাতটায় তিনি তাঁর ছবির নায়িকা আম্রপালি চৌধুরীর ঘরে নক্ করলেন।

দরজা খুলেই উচ্ছ্বাসের মাত্রা সপ্তমে তুললো একুশ বছরের গৌরাঙ্গী।

হাই অহীন্দ্রদা। একেবারে সাড়ে সাতটা, হানড্রেড পার্সেন্ট পাংচুয়াল !

না হলে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ হয় না। হয় না কোনো বড় মাপের কাজ।

একেবারে জড়িয়ে ধরে আম্রপালি তার পরিচালককে তার ঘরের শোফায় এনে বসালো। প্রায় অহীন্দ্র সেনের কোলেই বসে পড়লো সে।

বিশ্বখ্যাত পরিচালক মনে মনে চল্‌কে যাচ্ছিলেন। টলে পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন, কখন কোথায় চলতে হয়, আর কখন কোথায় থামতে হয়। নাহলে তিনি এই খ্যাতির চূড়ায় আসতে পারতেন না।

কী খাবেন অহীন্দ্রদা ?

কফি বলে দাও।

টেলিফোন তুললো আম্রপালি। বললো দু-কাপ কফি আর স্ন্যাকস।

অহীন্দ্র সেন এখন সিরিয়াস। যে জীবনকে তিনি তুলে আনতে যাচ্ছেন, তাতে যেন চূড়ান্ত বাস্তবতা থাকে।

আম্রপালি, শোনো

বলুন।

তুমি এক কয়লাখনি শ্রমিকের যুবতি স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করবে। এই রুক্ষ কঠিন কয়লাখনি অঞ্চল, সেখানে আগুন, ধস, গ্যাসে বিস্ফোরণ, এমন অজস্র বিপদ

লুকিয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে তোমাদের শ্রমিক বস্তিতে তোমাদের ছোট্ট সংসার। মালভূমির এই পাহাড়ী প্রকৃতির সঙ্গে তোমাদের জীবন যেন একাকার হয়ে আছে। এমন এক শ্রমিক-বধূর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে তোমাকে।

আম্রপালি নিবিষ্টতার গহীনে নিয়ে গেল নিজের মনকে। তার পরিচালকের কথার প্রতিটি অক্ষর বুঝে নিতে চাইলো সে।

দুই

পরের দিন সকালেই ওরা চলে এলো এখানে। মালভূমির চড়াই-উৎরাই জমি। দূরে দূরে দ্বীপের মতো গ্রামগুলো। বারাবনি লুপ রেলপথের অদূরে ভানোড়া কয়লাখনির পরিত্যক্ত ধসে ডেবে যাওয়া অঞ্চল। মাঠের পর মাঠ সবুজ ধানের চারাগুলো নিয়ে ঝুলে রয়েছে এখানে সেখানে।

অদ্ভুত ! যেন ভূমিকম্প হয়েছে এখানে। সুবোধ, তুমি একেবারে আমার মন মতো জায়গা চুজ করেছো।

অহীন্দ্র সেন খুব খুশি।

অহীন্দ্রদা, ওই যে কাছাকাছি যেসব গ্রাম দেখা যাচ্ছে, সব আদিবাসী সাঁওতাল অথবা তফসিলি ডোম-বাগদি-বাউড়িদের গ্রাম। সব ঘুরে দেখে এসেছি আমি। ওদের বসতবাড়িগুলোতেও ফাটল ধরেছে।

ওইসব গ্রাম আর বাড়িগুলোকেও ক্যামেরায় ধরতে হবে।

ঠিক আছে। সেসব হয়ে যাবে।

আজ পরিচালকের সঙ্গে প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস ছাড়াও এসেছেন ক্যামেরাম্যান, লাইট এক্সপার্ট এবং আরো একজন সহকারী ক্যামেরাম্যান। অভিনেত্রী আম্রপালি চৌধুরী তো এসেছেনই। তার সঙ্গে এসেছেন তাকে সর্বক্ষণ পরিচর্যা করার জন্য একজন মহিলা বিউটিশিয়ান।

তা হলে সুবোধ, আমার পার্টিকুলার যে স্পটটা চাই, তেমন জায়গাটা কোথায় ?

চলুন, সামনেই আছে। সুবোধ বিশ্বাস চললেন আগে আগে। তারপর পুরো দলটা। মিনিট দশ-বারোর রাস্তা। সুবোধ বিশ্বাস এবার দাঁড়ালেন। যে পাকা রাস্তা ধরে ওরা এতটা পথ এলো, সেই পথ সহসা উধাও। সামনে ভয়ংকর এক ফাটল। মনে হচ্ছে তা যেন পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গখনির যে বিশাল হেডগিয়ারের চাকা ঘুরতে ঘুরতে ডুলিগুলো খনির ভেতরে নামিয়ে দেয়, হেডগিয়ারের সেই লোহার খাঁচার বেশিরভাগটাই মাটির ফাটলে ঢুকে গেছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

বেশিদিন হয়নি এই খনিতে ধস নেমেছে। কয়েকজন শ্রমিক মারাও গেছে তাতে। বললেন সুবোধ বিশ্বাস।

অসাধারণ ! সুবোধ, তোমার লোকেশন চয়েজ অসাধারণ !— অহীন্দ্র সেন উত্তেজিত। দারুণ খুশি।

আম্রপালি ! এদিকে এসো তো !

আম্রপালি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। ধস কবলিত কয়লাখনি এলাকার প্রকৃতিতে এক ধরনের খাঁ-খাঁ শূন্যতা থাকে। তার প্রভাব পড়েছিলো তার মনে। সে খানিকটা

ঘাবড়েই গিয়েছে। সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো।

কী অহীন্দ্রদা ?

চলো, আরও খানিকটা এগিয়ে যাই।

অহীন্দ্র সেন, আম্রপালি চৌধুরী আর সুবোধ বিশ্বাস সেই ভয়ংকর ফাটলের আরো কাছে এগিয়ে গেল। ধসের যত কাছে যাচ্ছিলো আম্রপালি, ততই সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। এবার দাঁড়ালেন পরিচালক সেন।

এক চূড়ান্ত মানবিক দৃশ্য আমি কালকে এখানে ক্যামেরাবন্দী করতে চাই।

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের কথায় প্রতিটি শব্দবিন্যাস এরা নিবিড়ভাবে বুঝে নিতে চাইছিল। অহীন্দ্র সেনের প্রতিটি কথায় এখন প্রবল আত্মপ্রত্যয়।

শোনো আম্রপালি, কয়লাখনির শ্রমিক বস্তির ছোটেলাল বাগদির বউ তুমি। শ্রমিক ধাওড়ায় তোমাদের দুজনের সংসার। তোমার ডাকনাম মুন্নি। মুন্নি বাগদি। তোমাদের একটা ছোটো ছাগল ছানা আছে। তুমি তোমার ঘরের সামনেটা ঝাড়ু দিচ্ছিলে। সেই সময় তোমার পোষা ছাগল ছানাটি লাফাচ্ছিলো। উলটোপালটা দৌড়োচ্ছিলো। তোমাকে কল্পনা করতে হবে, ও যেন ছোট্ট একটা মানব শিশু। তাকে তুমি বলছো, অ্যাই, লাফাস না ! দৌড়োস না ! কিন্তু সে প্রচণ্ড এক ছুট লাগালো। তুমিও ছুটলে। দিগবিদিগ ছুটতে ছুটতে সে ধসের গভীর ফাটলের মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল। তুমি ডুকরে কেঁদে উঠলে। যেন তোমার সন্তান হারানোর তীব্র শোক, কান্না, আর্তি সব ফুটিয়ে তুলতে হবে।

আম্রপালি নিশ্চুপ।

আম্রপালি, ওই দেখো, ধসের মধ্যে এই পরিত্যক্ত কয়লাখনির সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক তার রূপ। এই ভয়ানকের সঙ্গে তোমাদের রোজকার ওঠা-বসা। প্রতিদিনের কথন। সম্পর্ক। তুমি ফাটলের সেই কিনারা পর্যন্ত যাবে। ক্যামেরা তোমাকে ফলো করবে। তোমার এক্সপ্রেশন ক্লোজ আপে ধরবে।

কিন্তু এই সময়কার জনপ্রিয় নায়িকা আম্রপালি চৌধুরী ধসের ভেতরে কয়লাখনির নিকষ কালো সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়লো। সে দরদর করে ঘামছে। তাঁর সঙ্গী বিউটিশিয়ান মহিলা ছুটে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘাড়-গলা মুছে দিলো। ফ্লাস্ক থেকে ঢকঢক করে জল খেলো আম্রপালি চৌধুরী।

না, না, না ! আমি এখানে দাঁড়িয়ে শট্ দিতে পারবো না ! কি ভয়ানক সুড়ঙ্গ ! আমার মাথা ঘুরছে অহীন্দ্রদা। আমি এখানে দাঁড়াতে পারছি না !

অহীন্দ্রবাবুর নির্দেশে সেই বিউটিশিয়ান মহিলা ও সহকারি ক্যামেরাম্যান নায়িকাকে ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। পরিচালকের কপালে ভাঁজ পড়লো

সুবোধবাবু বললেন, ডামি লাগবেই অহীন্দ্রদা।

কিন্তু এই মরুভূমিতে ডামি অ্যাক্টর কোথায় পাবো ? তাও আবার হিরোইনের পাল্টা ! এদিকে কাল সারাদিনের জন্য সমস্ত সেট আপ রেডি। এমন ছিচকাঁদুনে মেয়েদের দিয়ে কাজ হয়। যত্তো সব বোগাস।

এরকম একটা আন্দাজ করে আমি ডামির ব্যাপারে একটা কথা বলে রেখেছি। কিন্তু

আদিবাসী শ্রমিক আর আঞ্চলিক কিছু পুরুষ-মহিলা না হলে সিনটায় রিয়ালিটি আসবে না। অ্যাবসার্ড মনে হবে। — বললেন প্রোডাকশন ম্যানেজার।

দ্যাখো তাহলে তুমি।

অহীন্দ্রদা, কোনো চিন্তা করবেন না। আজ সারাদিন পুরো পাচ্ছি। প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে যাবে। এসব সমস্যা তো রোজকার ব্যাপার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অহীন্দ্র সেন তাঁর ছবির নায়িকাকে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেলেন হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশনালে।

পুরো ব্যাপারস্যাপারগুলোই একটু ঘোরালো হয়ে গেল। তবে অহীন্দ্র সেন ভাগ্যবান এই কারণেই যে, তাঁর সহ-পরিচালক দীপ্তেন্দু রায়চৌধুরী, প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস এবং ক্যামেরাম্যান ভিক্টর বাসু তিনজনই একেবারে রত্ন। একটা প্রোডাকশন ইউনিটে এমন চৌখস মানুষজন থাকলে সত্যি কথা বলতে কি, ডিরেক্টরের ভাবনাচিন্তা পঞ্চাশ শতাংশ কমে যায়। তাই হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে, একটা হুইস্কির বোতল টেবিলে রেখে, চেয়ারে বুঁদ হয়ে বসে রইলেন তিনি।

সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে অহীন্দ্র সেনের ঘরে কলিং বেল বাজলো। পরিচালক দরজা খুলেই দেখলেন সুবোধ এবং দীপ্তেন্দু দাঁড়িয়ে। হুইস্কির প্রভাবে অহীন্দ্রবাবু আচ্ছন্ন। চোখদুটো রক্তাভ।

অহীন্দ্রদা, ডামি জোগাড় হয়ে গেছে। একেবারে সলিড? এতটা সাকসেস হবো ভাবিনি।

বাঃ। তাই নাকি? তোমরা বোসো একটু। আমি বাথরুম থেকে আসছি।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে নিজেকে ভিজিয়ে নিয়ে নেশা কাটিয়ে অহীন্দ্র সেন ফের নিজের মেজাজে চলে এলেন। কাজের ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। শোকতাপ অথবা নেশা, কোন কিছুই তাঁকে আটকে রাখতে পারে না। ঝকঝকে হয়ে বাথরুম থেকে বেরোলেন অহীন্দ্র সেন।

বলো দীপ্তেন্দু, সুবোধ।

একজন টাউটকে পাঠিয়েছিলাম ওখানকার বাউড়িপাড়ায়। একটি মেয়েকে পাওয়া গেছে? নাম শেফালি বাউড়ি। বয়স চব্বিশ। শক্ত সমর্থ মেয়ে। বোকা হাঁদা নয়। ডেকে পাঠিয়েছিলাম। হাইটে আম্রপালিদির মতোই হবে। হিরোইন ছাগল ছানার পিছু পিছু ফাটলের পঞ্চাশফুট দূরত্ব পর্যন্ত যাক। বাকি পঞ্চাশ ফুট ডামি শেফালি বাউড়ি করবে। অসুবিধের কিছু নেই। ডামির ডায়লগ থাকছে না। শুধু কয়েক সেকেন্ড ছাগল ছানার পিছু পিছু দৌড়ে যাওয়া। বাকি পঞ্চাশ ফুট হিরোইনকে ছেড়ে ক্যামেরা ডামিকে টেক করবে।

সব ব্যাপারটা নিয়ে তিনজন মিলে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আলোচনা করলো। কীভাবে কী হবে, তার নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি হলো। তারপর পাশের ঘর থেকে আম্রপালিকে ডাকা হলো। তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো আগামীকালের শুটিংয়ের যাবতীয় বিষয়।

আম্রপালি যথেষ্ট মনমরা হয়ে পড়েছে। সে যত্ন নিয়েই শুনলো কালকে তার কাজের ধরন কেমন হবে।

নিজের ঘরে যাবার সময় সে যথেষ্ট সংকোচে বললো, অহীন্দ্রদা, আপনাদের ভারী প্রবলেমে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু কী করবো বলুন। ওই বিরাট হা-হা করা ফাটল দেখলেই আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। গা গোলাচ্ছে।

ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও। কালকের শুটিংযের জন্য তৈরি হও। আর সবকথা ভুলে যাও এখন থেকে। ডায়লগ মুখস্থ করতে থাকো।

দরাজ হয়ে উঠলেন পরিচালক অহীন্দ্র সেন।

তিন

স্থানীয় থানাকে বলে রাখা হয়েছিল। পরের দিন সকালেই একটা জিপে ডজনখানেক আর্মড কনস্টেবল হাজির ভানোড়া কয়লাখনির পরিত্যক্ত ধসের সামনে। ক্যামেরাম্যান সহ শুটিংকর্মীদের পুরো দল নিয়ে বিরাট একটা গাড়ি চলে এলো। এলো জেনারেটর কার। সহ-পবিচালক, মেকআপম্যান, সহশিল্পীদের নিয়ে এলো আরও একটা লাক্সারি গাড়ি। অহীন্দ্রবাবু আম্রপালির সঙ্গে এলেন একটা অ্যাম্বাসাডারে। টিমের লোকজন কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করা হচ্ছে। নামানো হলো ফোল্ডিং চেয়ার-টেবিল।

সুবোধ কোথায়? — অহীন্দ্র সেন জিজ্ঞেস করলেন।

শেফালি বাউড়িকে আনতে ওদের গ্রামে গেছে।

দীপ্তেন্দু, মেয়েটির সঙ্গে টাকা-পযসাব ব্যাপারটা পবিষ্কাব করে নিযেছো তো? এসব কেসে পরে বড্ড ঝামেলা হয।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। শেফালিব স্বামীর হাতে তিন হাজার টাকা আগে দিযে দেওযা হবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে শেফালিকে দেওয়া হবে এক হাজাব টাকা। ব্যাস!

দেখা গেল একটা প্রাইভেট কার ধুলো উড়িয়ে এদিকেই আসছে।

গাড়ি থামলো। নামলো সুবোধ বিশ্বাস। আরো নামলো ঋজু চেহাবা এক কালো মেয়ে এবং একজন আদিবাসী যুবক। ওদের নিযে সুবোধ বিশ্বাস পরিচালকের কাছে এলো দ্রুত।

অহীন্দ্রদা, চলে এসেছি। একটুও সময় নষ্ট করিনি। এই হলো শেফালি বাউড়ি। ওর রোল গুছিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে। এই যে শেফালির স্বামী হরিরাম বাউড়ি। হরিরামের হাতে আগাম তিন হাজার টাকা দিযে দিয়েছি গাড়িতেই।

শুটিং স্পষ্ট তৈরি। ক্যামেরা ট্রলিতে দাঁড়িয়ে। অহীন্দ্র সেন ফিরে পেযেছেন তাঁর নিজস্ব মেজাজ। টগবগ করে ফুটছেন তিনি।

লাইট-এক্সপার্ট পকেট থেকে এ্যাপারচার মাপযন্ত্র বের করে আলোর কাঙ্খিত মাপ বুঝে নিচ্ছেন। রিফ্লেকটরম্যানরা এখানে-ওখানে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টারের নির্দেশের অপেক্ষায়।

সিনেমার পর্দায় দেখা সুন্দরী নায়িকা আম্রপালি চৌধুরীর পাশে বসে মেক আপ নিচ্ছে শেফালি বাউড়ি। শেফালি ভাবতেই পারছে না। সে স্বপ্ন দেখছে, না কি সবটাই বাস্তব! পর্দার হিরোইন তাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, শেফালি, কাজটা একেবারে ফার্স্ট

ক্লাস করে করতে হবে কিন্তু।' তাহলে আর কি লাগে! জান দিয়ে দেবে শেফালি। সুবোধবাবু বলেছেন, তোমাকে দেখবে সারাদেশের লোক। শেফালি, তুমি তো প্রায় হিরোইন।

গতরাতে মাতাল স্বামী শেফালিকে বহুদিন বাদে আদর করেছে। শেফালির দৌলতে তার হাতে চলে আসছে কড়কড়ে চার হাজার টাকা। সোজা কথা! বহু-বহুদিন বাদে শেফালির আনন্দ একেবারে উপচে উঠছে। গতরাতে তাই সে দেশি মহুয়াতেও কয়েকটা চুমুক দিয়েছিলো

পরিচালক চিৎকার করে উঠলেন।

এবার স্পট রিহার্সাল। সব রেডি! সামনেই ছাগল ছানাটি কোলে নিয়ে প্রোডাকশনের এক কর্মী। কাছাকাছি একটি সাঁওতাল গ্রাম থেকে এটিকে কিনে আনা হয়েছে।

স্পট রিহার্সাল হলো।

তারপর ফাইনাল রিহার্সাল। এবার হবে কমপ্লিট শট্।

ক্যামেরা প্রস্তুত। অ্যাপারচার মিটারে আলো পরীক্ষা করে নিলেন লাইট এক্সপার্ট। আম্রপালির মুখে, বুকে তীব্র আলোর ছটা। শেফালিরও তাই।

এবার কমপ্লিট ফাইনাল শট। সব রেডি। পরিচালক বললেন।

হ্যাঁ অহীন্দ্রদা। সব ওকে। দীপ্তেন্দু বললো।

নো টক্! ফুল সাইলেন্স। অহীন্দ্র সেন ক্যামেরাম্যানকে বললেন স্টার্ট!

ক্যামেরা চলতে শুরু করলো।

ছাগল ছানাটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সন্ত্রস্ত ছাগল ছানা দৌড়াচ্ছে আগে আগে। তার পেছনে 'এই-এই' করে ছুটলো হিরোইন আম্রপালি। ক্যামেরা টেক করছে সবটাই।

কাট্!— চিৎকার করলেন পরিচালক।

প্রথম পর্যায় এই পর্যন্ত। এবার ডামির সেকেন্ড ফেজ এক্ষুনি। ক্যামেরা রেডি। শেফালি, তুমি রেডি তো? তুমিই তো এখন হিরোইন — শেফালি খুশিতে মাথা নাড়লো।

লাইট! ক্যামেরা স্টার্ট।

এবার টিমের একজন ছাগল ছানাটির ল্যাজটা মুচড়ে বেশ করে কান মুলে ছেড়ে দিলো। তাড়া দিলো ধসের দিকে। ভীত ছাগল ছানা সেদিকে দৌড়লো।

ক্যামেরা ফের চলতে শুরু করেছে। ছাগল ছানার পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে শেফালি বাউড়ি। অহীন্দ্র সেন নিজেও একাত্ম হয়ে গেছেন এই দৃশ্যটির সঙ্গে। তিনি চিৎকার করলেন, শেফালি, আরো জোরে! আর একটু!

সে নায়িকা। হিরোইন। সিনেমায় তাকে দেখা যাবে। এই ঘোরে ছিলো শেফালি বাউড়ি। খনি শ্রমিকের বউ। দিগবিদিগ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। পরিচালক বলেছে ছাগল ছানাটিকে নিজের সন্তানের মতো ভেবে তাকে দৌড়াতে হবে। ছাগল ছানাটির কাছাকাছি তাকে থাকতে হবে। ক্যামেরার একই ফ্রেমের মধ্যে। সে নিখুঁত কাজ করে দেখাবে। একেবারে নিখুঁত। তার সামনে শুধুই ছাগল ছানাটি, যে তার সন্তানের মতো।

চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক ফুটিয়ে তুললো শেফালি।

ক্যামেরা দূর থেকে জুমিং করে ক্লোজআপে ধরেছে শেফালীর মুখ। একেবারে নিখুঁত অভিব্যক্তি।

ছাগল ছানাটি ছুটতে ছুটতে এবার ধসের ফাটলের গভীরে পড়ে হারিয়ে গেল। তার ক্ষীণকণ্ঠ শুধু ভেসে উঠলো বাতাসে।

ঘোরের মধ্যে থাকা শেফালির কানে গিয়ে পৌছলো ছাগল ছানার সেই ক্ষীণ আর্ত রব। তার সন্তান? সে আরও জোরে ছুটলো। তার চোখে মুখে সন্তান হারানোর শোক আর হাহাকারের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। এ তো অভিনয় নয়! এ তো প্রখর বাস্তবের দৃশ্যপট। ক্যামেরা জুম করে ধরে নিয়েছে সেই মুখচ্ছবি।

অহীন্দ্র সেন চিৎকার করলেন।

কাট। শেফালি থামো!

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের নায়িকা শেফালি বাউড়ি তখন আর নিজের মধ্যে ছিলো না। পঞ্চাশ ফুট দৌড়েও সে থামেনি। থামার কথা তার মনেও আসেনি।

এবার আর তার পা দুটো মাটির ওপরে নেই। ফাটলের গভীর শূন্যতা ধরে সে হারিয়ে যেতে লাগলো। তার মরণ চিৎকার ফাটলের দুপাশে ধাক্কা খেয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিধ্বনি তুলে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। অহীন্দ্র সেন চিৎকার করে উঠলেন—

সর্বনাশ! সর্বনাশ হয়ে গেল। চারদিকে হই হই রব উঠলো। বন্দুকধারী পুলিস কনস্টেবলরা ছুটে এলো ধসের কাছে। গোটা প্রোডাকশন টিম আতঙ্কিত, বিমূঢ়।

তারই মধ্যে পরিচালক অহীন্দ্র সেন প্রোডাকশন টিমকে প্যাক আপ অর্ডার দিলেন।

চার

ভয়ঙ্কর এই ঘটনায় বিহ্বল সবাই। জনবসতি থেকে দূরে বলে গ্রামের লোক এখনও ব্যাপারটা জানে না। শেফালি বাউড়ির স্বামী হরিরাম চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। সকালে একটু বাংলা মদও পেটে ঢেলেছিলো সে। এবার তার চোটে কান্নাকাটিও বেশ বেড়ে গেল।

সুবোধ বিশ্বাস ঠান্ডা মাথার মানুষ। সে আম্রপালি ও তার সাহায্যকারী বিউটিশিয়ান মহিলা মেকআপম্যান, লাইট এক্সপার্টসহ টিমের টেকনিক্যাল গ্রুপটাকে আসানসোল ফেরত পাঠিয়ে দিলো। এবার পরিচালককে বললো, অহীন্দ্রদা, দীপেন্দুকে নিয়ে আপনি থানায় চলে যান। আমি হরিরামকে সামলাচ্ছি। টোটাল প্যাক-আপ করে জেনারেটর আর সমস্ত গাড়ি আসানসোল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর দীপেন্দু রায়চৌধুরীকে নিয়ে অহীন্দ্রবাবু থানায় চলে গেলেন। সুবোধ বিশ্বাস টোটাল টিম-ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো।

এবার হরিরামকে নিয়ে সুবোধ বিশ্বাস তার ক্রিম রংয়ের টাটা সুমো গাড়ির কাছে এলো।

কাঁদতে কাঁদতে হরিরামের গলা ভেঙে গেছে।

হমার বৌটি মর গেল রে! হা ভগবান! হামায় ইবার কি হব্যেক রে! হাঁই বাবুলোগ, বৌকে ফিঁরাঞ্চিন দে বাবু। হা শেফালি! তু কুথাকে গেঁইলে বটে! তু

কুত্থাকে গেঁইলি রে!

হরিরামের কান্নায় একটুও গললো না সুবোধ বিশ্বাস। কারণ যে শুনেই এসেছে, হরিরাম তার মাইনের বেশিরভাগ টাকা মদ খেয়েই উড়িয়ে দেয়। পারলে শেফালিকেই বেচে দেয়, এমনধারা লোক সে।

সুবোধবাবু হরিরামকে ঠেলে টাটা সুমোয় তুললো। নিজেও উঠলো।

হরিরাম, বোস। চুপ করে। ধমক খেয়ে হরিরাম চুপ। সুবোধবাবু সিটের নিচে থেকে একটা অ্যাটাচি কেস বের করলেন। এবার কড়া চোখে তাকালেন হরিরামের দিকে।

তোমার বউয়ের দাম কতো? দশ হাজার? না বিশ হাজার?

অ্যাটাচি কেসের ডালা খুললেন সুবোধ বিশ্বাস। সেখানে একশো আর পাঁচশো টাকার বান্ডিল ঠাসা ছিলো। হরিরাম বাউড়ি চুপ।

পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। আজ দূরে কোনো আত্মীয় বাড়িতে চলে যাও। গ্রামে যাবে না। কাল সকালে হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

হরিরাম মনে মনে ভাবে, পঞ্চাশ হাজার! বাপ রে বাপ! কাল উটাকে ষাট-সত্তর বুলবক। আর এক ট বিহা করবক। শেফালি টি বড়ো দজ্জাল ছিল্য বটে!

অহীন্দ্রবাবু আর দীপ্তেন্দু রায়চৌধুরীর সঙ্গে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই থানার ও.সি. চলে এলেন। অহীন্দ্রবাবু তার ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য রেখে ও.সি-র সঙ্গে কথা বলছিলেন।

সো স্যাড। আচমকা এমন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল! সো আনফরচুনেট।

চলুন, স্পটে যাই। — ও. সি বললেন।

সব ঘুরে দেখলেন ও.সি। বিশ্বখ্যাত এই চিত্র পরিচালককে তিনি কীই বা বলবেন! অহীন্দ্র সেন শুধু বললেন, আপনি একটু দেখবেন, যাতে আমরা এখানে শুটিংয়ের কাজটা কমপ্লিট করতে পারি। শেফালির হাজব্যান্ডের চাহিদা মতো আমরা ওকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিচ্ছি।

ও.সি বললেন, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। পুলিস ফুল প্রোটেকশন দেবে আপনাদের।

থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি আসুন না আজ হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশনালে।

দেখি, পারলে যাবো। কোথায় কখন ছুটতে হয়, তার তো কোনো ঠিক নেই। ও সি হেসে বললেন।

শেষ পর্যন্ত পুলিস একটা মামুলি দুর্ঘটনাজনিত কেস ফাইল করলো। বিরাট বড়ো এক ঝঞ্ঝাট মিটলো। পরিচালক, সহ-পরিচালক, প্রোডাকশন ম্যানেজার, অভিনেত্রী আর ইউনিটের কর্মীরা হোটেলে নিশ্চিন্তভাবে একটু বিশ্রাম নেবার অবকাশ পেল।

রাতে হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে ডিনার দিলেন ডিরেক্টর। থানার ও.সি-ও চলে এসেছেন।

আরে, আসন আসুন মিস্টার বক্সী!

হ্যাঁ, চলে এলাম আপনার লোকজনদের সঙ্গে আলাপ করতে।

বলুন, কী খাবেন? ড্রিংকস, কোল্ড, না হট? আপাতত কফি খান। তারপর অন্যগুলো হবে। আম্রপালি! এদিকে এসো! ইনি হচ্ছেন মিস্টার বক্সী, দারুণ, মানুষ আমাদের সব প্রবলেম সলভ্ করে দিয়েছেন। এখানকার থানার ও.সি। ও হচ্ছে আম্রপালি চৌধুরী। এখনকার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। আমাদের এই ছবির হিরোইন।

নমস্কার। আপনি আমাদের গোটা টিমকে এক বিচ্ছিরি অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছেন।— আম্রপালি মদির হাসি হাসলো।

ও.সি. সাহেব গদগদ। না না, এ আর এমনকি। আপনারা সব রিনাউন্ড পার্সনস। এই ফিল্মই হযতো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওযার্ড নিযে আসবে।

একথায অহীন্দ্র সেন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হযে উঠলেন।

হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি, যে শট্‌টা আমরা নিলাম, তার তুলনা নেই! এমন রিযালিটি ভাবাই যায় না। যেখানে ক্যামেরার কোনো কেরামতি নেই। অসাধারণ মানবিক এবং রূঢ়কঠিন বাস্তব এক দৃশ্য আমাদের ক্যামেবা আজ টেক করে রাখলো। পৃথিবীর কোন ফিল্ম ডিরেক্টর এমন উদাহরণ রাখতে পেরেছেন কি না আমার জানা নেই।

সত্যি, রিযেলি এক্‌সেলেন্ট! উচ্ছ্বাসে আবেগে আম্রপালি তাব পবিচালক অহীন্দ্র সেনকে জড়িযে ধরলো। অহীন্দ্র সেনও আজ বুঝি উদ্দাম হযে উঠতে চাইছেন।

আম্রপালি জানে, এই ছবি যদি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায, ছবির নাযিকা হিসাবে তাঁরও পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা থাকছে। না হলেও পুবস্কৃত ছবিব নাযিকা হিসাবে আন্তর্জাতিক মহলে তার নাম পরিচিতি পাবেই পাবে।

তাই আম্রপালি চৌধুরী তাঁর পবিচালকেব কাছে আজ আরও মদির, আরও কামনাময়ী হযে উঠতে চাইলো। আত্মসমর্পিতার ভঙ্গি তাব চাহনিতে, শরীরে। সে মনে মনে বললো, অহীন্দ্রদা, আজ রাতে আমি তোমারই।

এদিকে ব্যাংকোয়েট হলে ডিনার পার্টি দারুণভাবে জমে উঠেছে। হুইস্কির বোতল খোলার আওযাজ। প্লেটে কাটা চামচের শব্দ।

বুঝলে আম্রপালি, যে ছবি আজ সেলুলয়েডে ধরা পড়লো, তাকেই এককথায বলা যায় লাইভ ডক্যুমেন্টেশন।

রিয়েলি তাই অহীন্দ্রদা। আম্রপালির কণ্ঠস্বর তখন মদির। তাব ঢলঢল কাঁচা অঙ্গ তখন পরিচালকের শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বহুদূরে কয়লাখনি ধসের সেই ফাটলের অন্ধকারে শেফালি বাউড়ি নিস্পন্দ ছাগল ছানাটির পাশেই রক্তাক্ত থ্যাঁতলোনো অবস্থায় পড়ে রইলো। অন্ধকার ঘন হযে উঠলো পৃথিবীর বুকে। □

বুড়ো এবং ফুচা

মতি নন্দী

ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করার প্রথম কয়েকটা দিন শব্দটা সে টের পায়নি। বাবান, তনু আর কাজের মেয়ে শম্পা ঘুমিয়ে পড়ার পর বিশ্বনাথ লিখতে বসে। শোবার ঘরটা আজকালকার সাধারণ ঘরের প্রায় আড়াইগুণ। এককোণে কাঠের ছোটো টেবলে দুটো অভিধান, কলম রাখার জন্য একটা নকশাকাটা পিতলের গ্লাস, লেখার প্যাড, লেখা পাতাগুলো জমা করার একটা ফাইল, কয়েকটা দরকারী বই, সবই গুছিয়ে রাখা। অনাবশ্যক একটি জিনিসও সে টেবিলে রাখে না।

ঝরা পাতার উপর দিয়ে সাপ চললে যেমন, শুনলেই সিরসির করে ওঠে গায়ের চামড়া; শব্দটা সেই রকমই। বিশ্বনাথ অবশ্য ঝরাপাতার উপর দিয়ে সাপ কেন কোনো সরীসৃপকেই চলতে দেখেনি বা চলার শব্দও শোনেনি। ছোটোবেলায় একটা অ্যাডভেঞ্চার বইয়ে পড়েছিল, খরখর, সরসর শব্দও করে 'সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন এগিয়ে আসছে গোপনে।' এটা এখনও তার মাথার মধ্যে গেঁথে আছে। মুখটা তুলে সে কড়িকাঠের দিকে তাকায়, গত শতাব্দীর বাড়ি। ছাদটা এখনকার ঘরের প্রায় দ্বিগুণ উঁচুতে। পাখা ঝোলাবার জন্য পাঁচ ফুট লম্বা রড কিনে দুধারে প্যাঁচ কাটিয়ে আনতে হয়েছে। মোটা মোটা পাঁচটা কাঠের কড়ি আর গোটা ষাটেক বরগায় ভর দিয়ে রয়েছে দোতলার ঘরের মেঝেটা। সেটা বরফির মতো সাদা আর কালো পাথরে ঢাকা। অনেকগুলো পাথর ফেটে গেছে। ফাটলে ময়লার দাগ টানা। তাদের নিচের ঘরটার মেঝেও হুবহু একই দশায় ফাটা পাথরের ফাঁকে নোংরা জমে আছে। উপর-নিচের ঘরদুটো আয়তনে উচ্চতায় একই রকমের।

বিশ্বনাথ সরসর শব্দটা শুনেছিল রাত বারোটা নাগাদ। ঠিক মাথার উপর ঘরে একধার থেকে অন্যধার তারপর দরজা দিয়ে পৌঁছল লম্বা বারান্দাটায়। কয়েক সেকেন্ড থেমে বারান্দার অন্য প্রান্তে সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গিয়ে অবশেষে আবার ঘরে ফিরে আসা। সাপ চলার শব্দের সঙ্গে ছিল ছপ্‌ছপ্ বাড়তি একটা অস্পষ্ট শব্দ। নৌকোর দাঁড় জলে পড়ার মতো এই শব্দটা। বিশ্বনাথ নৌকোয় গঙ্গা পারাপার করেছে বলেই সেইরকম মনে হল শব্দটাকে। সর্ব অর্থেই প্রায় তখন নিশুতি। পার্টিশান করা পাশের শরিকি বাড়িতে রোজরাতে কেউ একজন মোটরে ফেরে। বন্ধ করার আগে দু-তিনবার এঞ্জিনটাকে গোঁ-গোঁ করিয়ে নেয়। সেটা কন্ধ হয়ে গেছে। আশেপাশের টিভি সেটগুলো বন্ধ। যদি কোনো রিকশার চাকা রাস্তার গর্তে পড়ে ঘটাং ঘট্ করে ওঠে সেটা বরং এই সময় সজীব লাগে। কিন্তু মাথার উপরের এই শব্দটা সিলিং থেকে হিমের মতো

নেমে এসে শিরদাঁড়ায় যে অনুভূতি দিচ্ছে, এটা তার ভালো লাগছে না। হঠাৎ 'খরখর সরসর শব্দে সাক্ষাৎ মৃত্যু' শব্দ কটা মনের মধ্যে কেন যে ঝিলিক দিল তার কোনো কারণ সে নিজের কাছে দর্শাতে পারল না। সে মুখ তুলে, শব্দটা কে করছে সেটাই বুঝতে চেষ্টা করল।

উপরে থাকে এটা বুড়ো। এই বাড়ির মালিক। মাঝারি উচ্চতার শীর্ণ ছোটোখাটো দেহ। পাতাকাটা কাঁচাপাকা হালকা চুল। টানা সরু চোখ এবং একটু বেমানান লম্বা নাক। গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে ট্রেসিং কাগজের মত পাতলা। বিশ্বনাথ একবারই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওকে খালি গায়ে দেখেছে যখন অ্যাডভান্সের টাকা দিতে আসে। লম্বা বারান্দার শেষে একটা ভারী পায়াওলা চেয়ারে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে বুড়ো বসেছিল সামনের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখেই দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। বুড়োর পায়ে ছিল পাতাঢাকা ক্যানভাসের সাদা চটি। পাঞ্জাবির মতো চটিটাও সব সময় পরে থাকে। চলার সময় শব্দ হয় না।

তাহলে এত রাতে শব্দটা কেন? উপরে বুড়ো ছাড়া আর তো কোনো মানুষ বাস করে না! বিশ্বনাথ ভুলে গেছল বুড়োর সঙ্গে একটা কুকুরও উপরে থাকে। সেটা মনে পড়তেই কুকুরেব চেহারাটা তার চোখে ভেসে উঠল। ঘুমন্ত বউ আর ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে সন্তর্পণে দরজার ছিটকিনি খুলে সে দালানে বেরিয়ে আলো জ্বালল। দোতলার বারান্দার নিচেই তাদের এই দালান যেটাকে ভাড়াটের জন্য দেওয়াল তুলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে দোতলায যাবার সিঁড়ির সঙ্গে। এই দেওয়াল ঘেরা দালানেই রান্নাঘর ইত্যাদি এবং শম্পা রাতে ঘুমোয়। ঘুমন্ত মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে সে বাইরে বেরোবার দরজাটা খুলল।

বাড়িটার তিনদিক ঘিরে সরু জমি। আরও জমি ছিল কিন্তু বিক্রি হতে হতে এবং সম্পত্তি ভাগ হয়ে বুড়োর এই বাড়িটা বড়ো শরিকের পেছনের অংশে পড়ে গেছে। সামনের বাড়ির, যাকে বলা হয় 'ও বাড়ি', তাদের ভাগে লোহাব ফটক কিন্তু বুড়োর অংশে আসতে হলে পাশের সরু গলিটায ঢুকে কোমর সমান লোহার পাতের দরজাটা ব্যবহার করতে হয়। সেখান থেকে হাত দশেক চওড়া জমি বাড়িটাকে ঘুরে বিশ্বনাথের দরজার সামনে দিয়ে এগিয়ে একটা দেয়ালে শেষ হয়েছে। সেখানে এক কালোয়ারের টিনের চালা যাতে জমা করা আছে বাতিল বা নীলামে কেনা মেসিনপত্তর। মাঝে মাঝে কুলিরা লোহালক্কড় রাখতে বা তুলে নিয়ে যেতে আসে। রাতে একজন পাহারাদার চালার নিচে ঘুমোয়।

কালোয়ারের লাগান একটা ষাট পাওয়ারের বালব চালার বাইরে জ্বলছে। তাইতে অন্ধকার ঘোচে না তবে চেনা জায়গাটা চেনা যায়। সামনের দেওয়ালে দুটো হুকে কাপড় মেলতে দেওয়ার নাইলন দড়িটা যেখানে ঝুলে পড়েছে সেখানে আলকাতরায় লেখা, ঝাপসা হয়ে যাওয়া "খতম" শব্দটাকে বিশ্বনাথ এখন চিনতে পারছে এই জন্যই, ওটা ওখানে যে রয়েছে তা জানে বলেই। নয়তো সে দূর থেকে আসা ষাট পাওয়ারের আলোয় "খতম"-কে বুঝে উঠতে পারত না। কলকাতার বহু দেওয়ালে

এই শব্দটা একসময় সে দেখেছে, এখন আর দেখতে পায় না।

দরজা থেকে বেরিয়ে "খতম"-এর কাছাকাছি ঘুরে এসে ঘুরে উপর দিকে সে তাকাল। শব্দ কীভাবে এবং কে তৈরি করছে এটাই সে জানতে চায়। ঢালাই লোহার ধূসর নকশাদার রেলিং, দু-তিন জায়গায় লোহা অদৃশ্য। বিশ্বনাথ বারান্দায় দুই প্রান্তে রেলিং-এর উপর দিয়ে কয়েকবার দৃষ্টি টানল। রেলিং এর ফাঁক দিয়ে কিছুই গোচর হল না! কান পেতেও কোনো শব্দ পেল না। পাহারাদারটা খাটিয়ায় ঘুমোচ্ছে দেখে সে বাড়ির মধ্যে ঢোকার জন্য চার-পাঁচ পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। কেন জানি তার মনে হল বারান্দায় কেউ রয়েছে। আর একবার বারান্দার দিকে তাকাবার ইচ্ছাটা সামলাতে না পেরে সে মুখ তুলল।

একটা সাদা ছুঁচলো মুখ বারান্দার ভাঙা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে, ঠিক তার মাথার উপর। কলিজাটাকে একবার কে যেন কচলে দিয়ে ছেড়ে দিল। বিশ্বনাথের প্রায় এক মিনিট সময় লাগল ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে। সে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানো প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়। মাথার কয়েক হাত উপরে, নিশুত আধা অন্ধকারে অপ্রত্যাশিত একটা সাদা জন্তুর মাথা দেখতে পেয়ে সে ভয় পেল। নীচের দিকে মাথাটা নামিয়ে জন্তুটা তার দিকেই যেন তাকিয়ে। মাথাটা কয়েক সেকেন্ড রেলিংয়ের বাইরে থাকার পর অদৃশ্য হল। বিশ্বনাথ ছুটে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসার পর মুখ তুলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে সে নিজের মনে বলল, 'কুকরটার চোখ দুটো কি ভীষণ জ্বলজ্বল করছিল!'

সেই প্রথম দিন অ্যাডভান্সের টাকা দিতে এসে বুড়োর চেয়ারের পিছনে সে কুকুরটাকে দেয়াল ঘেঁষে ঘুমোতে দেখেছিল। তাদের কথাবার্তার শব্দে ওর ঘুম ভাঙেনি। বড়ো সাদা লোম কিন্তু নোংরা। একনজরেই বোঝা যায় ওকে কখনও স্নান করান হয় না, কোনও কালে চিরুনিও পড়েনি। লেজের ডগায় চটা পড়ে একটা ডেলা হয়ে রয়েছে। কোমরের দিকে পিঠের উপর লোমগুলো চর্মরোগের চুলকুনিতে কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা। জায়গাটা কাঁচা দগদগে ঘা। পাঁজরের মোল উঠে যাওয়ায় গোলাপি রংয়ের চামড়া দেখা যাচ্ছে। ওর চার পায়ের নখ কিন্তু বিশ্বনাথকে অবাক করে ছিল। সেগুলো প্রায় ইঞ্চি দুয়েক লম্বা। তখন একবার মনে হয়ে ছিল এত বড়ো নখ দিয়ে চলাফেরা করে কি করে? সে আর দেখেছিল কুকুরটার বকলসের বদলে একটা কাপড়ের ফালি গলায় বাঁধা আর তাতে লাগানো রয়েছে একটা লোহর চেইন। চেইনটা মেঝেয় পড়ে আছে। কুকুরটি পুরুষ, বৃদ্ধ আর তার প্রভুর মতই রুগ্ণ।

পরদিন সকালে তনু স্কুলে যাবার জন্য যখন সায়ার উপর সাড়িটাকে পাক দিয়ে আঁচলটা পিঠে ঝোলাতে ব্যস্ত, বিশ্বনাথ তখন ব্রাশে পেস্ট লাগাতে লাগাতে বলল, "রাতে একটা সরসর শব্দ হয ওপরের মেঝেয়, শুনেছ কি?"

"রাতে! কখন?"

"এই বারোটা নাগাদ।"

"তখন তো ঘুমে কাদা, শুনব কি করে!" এই বলে নাভির উপরে পাট করা শাড়ির গুছি গুঁজতে গুঁজতে তনু কৌতূহলী চোখে তাকাল। বিশ্বনাথ খুবই পছন্দ করে

তনুর ক্ষীণকটি। মা হবার পর মেয়েরা দেহের ছন্দ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে, তনু পড়েনি। ওর চরিত্রের কাঠিন্য দেহতেও বিস্তৃত।

"অত রাতে মাথার উপর গা সিরসির করা একটা শব্দ তার সঙ্গে আর একটা ছপছপ শব্দ রীতিমতো ভয় লাগিয়ে দেয়।"

"কীসের শব্দ, বুড়োটা পায়চারি করছিল।"

"তাই জানতেই তো কালরাতে বাইবে বেরিয়ে ছিলুম। বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখি রেলিং থেকে মুখ বার করে কুকুরটা আমাকে দেখছে।"

তনুর উদ্‌বিগ্ন চোখ হাত ঘড়ি হয়ে শম্পার কোলে বাবানেব মুখের উপর পড়ল। "ঠিক তিনটের সময ওকে মুসুম্বির বস করে খাওযাবি...দাদা না ফেরা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে যাবি না।... হ্যাঁ তারপর, কুকুরটা দেখছে বললে—"

"মনে হল চোখদুটো জ্বলছে।"

"অন্ধকারে জন্তুজানোয়ারের চোখ অমন দেখায।"

"বৌদি, দাদাকে সেই কথাটা বলেছ।" শম্পা মনে করিয়ে দিল।

"কোন কথা?"

"ওপর থেকে বাড়িওলা আমাদের জানলার পাশে কুকুরের গু ফেলে।"

"হ্যাঁ, এই এক বিশ্রী ব্যাপার করে বুড়োটা, এটা নিয়ে ওকে বলা দরকার। হাগাতে মোতাতে রাস্তায় নিয়ে যেতে পারে তো! জানলাব ধারে এইসব নোংরা জমলে রোগভোগ হতে কতক্ষণ। তুমি একবার ওকে বলো।" হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, রামকৃষ্ণের ছবির সামনে চোখ বন্ধ করে সেকেন্ড পনেরো মাথা নামিযে তনু দাঁড়িয়ে থাকল। হাতঘড়িটা আর একবার দেখেই সে চটি পরে নিয়ে, "যাচ্ছি" বলে বেরিয়ে গেল। শম্পা পিছু নিল বাবানকে কোলে নিয়ে, সদর দরজা থেকে বাবান তার মাকে টা-টা করবে।

তনিমা এখন বাস ধরে শেযালদা স্টেশন যাবে। ন-টা আঠাশের কৃষ্ণনগর লোকাল ধরে যাবে চাকদা। দেড় ঘণ্টা ট্রেনের পর কুড়ি মিনিট ভ্যান রিকশায় সহজপুর। সীতানাথ আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালযে তার প্রথম ক্লাস সাড়ে এগারোটায। স্কুল ছুটির পর ছ-টি ছেলেমেয়েকে সে অঙ্ক আর ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়ায এক ঘণ্টা। এটা সে করে যাতায়াতের আর যৎসামান্য খাওয়ার জন্য খরচটা তুলে নিতে। সাতটা-এগারোর কৃষ্ণনগর ধরে বাড়ি ফিরতে প্রায়শই রাত সাড়ে ন-টা হয়। ক্ষুধাকাতর, অবসন্নতায় বসে যাওয়া মুখ নিয়ে সে মোটামুটি বারো ঘণ্টা বসবাসের জন্য বাড়ি ফেরে। বিয়ের আগে থেকেই সে জীবনযাপনের এই প্রণালীর সঙ্গে সড়গড়। বিশ্বনাথ এর জন্য কষ্টবোধ করে, ওকে সমীহ করে, ভয়ও পায়।

স্নান করতে যাবার আগে সে বাইরে গিয়ে ঘরের পিছন দিকটা দেখতে গেল। বুড়োকে বলার আগে ব্যাপারটা দেখে রাখা উচিত। যা দেখল তাকে বিরক্ত হতে হতে মাথা গরম হয়ে উঠল। সবু জমিটা এতরকম জঞ্জাল, আগাছা, ভাঙা ইট-রাবিশে ভরা যে পরিষ্কার করতে কর্পোরেশনের মযলা ফেলার অন্তত তিনটে হাতগাড়ির দরকার হবে। তনু মিথ্যা বলেনি, জানলার গায়েই রোগের ডিপো! বিশ্বনাথের মনে হল, এটা

আরও ত্রুটি। যতক্ষণ সে ঘরে থাকে শুধু লেখার চিন্তা নিয়ে সংসারকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াতেই ব্যস্ত থাকে। জানলার বাইরে কি জমা রয়েছে সেটা তারও তো লক্ষ করা উচিত ছিল। বাবানের স্বাস্থ্যের কথাটাই আগে ভাবা দরকার। বুড়োকে আজ সন্ধ্যাবেলায় সে বলবে, দুদিনের মধ্যে যেন সে পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে। শুধু ঘর ভাড়া দিয়েই বাড়িওয়ালার কর্তব্য যে শেষ হয় না, এটা ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

বাড়ি ফিরতে বিশ্বনাথের একটু বেশি দেরি হল। এক বিদেশি ওষুধ কোম্পানিতে সে মার্কেটিং ম্যানেজারের স্টেনো। তাছাড়া সে চিত্রনাট্য লেখে টিভি সিরিয়ালের জন্য। অফিস ছুটির পর ভবানীপুরে স্নেহময়ের বাড়িতে গেছল চিত্রনাট্যের কিছু অংশ দেখাবার জন্য। স্নেহর সঙ্গে কলেজে পড়ার সময় তার পরিচয়। কলেজের বড়ো ঘরটায় ইউনিয়নের কালচারাল কমিটির উদ্যোগে বছর তিন-চারবার যেসব অনুষ্ঠান হত তাতে দুবার বিশ্বনাথের লেখা একাঙ্ক হাসির নাটক অভিনীত হয় স্নেহর পরিচালনায়। সবাই খুব হেসেছিল। বি কম পাস করার পর বিশ্বনাথ নাট্যকার হবার সখটা আর লালন করেনি ভেঙ্গে পড়া সংসারটাকে মেরামত করার জরুরি তাগিদে। এর বছর দশেক পর পাড়ার এক বন্ধুর বাড়িতে সে ওয়ান-ডে ক্রিকেট ম্যাচ টিভি-তে দেখতে যায়। ম্যাচ শেষ হবার পর একটা ডকুমেন্টারি হচ্ছিল প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে। সেটা শেষ হতেই বিশ্বনাথ পাঁচ-ছ সেকেন্ডের জন্য একটা নাম দেখেছিল : 'পরিচালক স্নেহময় মান্না।' তার মনে হল এই লোকটি তার সহপাঠী স্নেহ ছাড়া আর কেউ নয়। অতঃপর সে খুঁজে বার করে স্নেহকে এবং তার স্ক্রিপ্ট লেখক হয়ে যায়। কয়েকটা ডকুমেন্টারির পর ছোটোগল্পের একটি তেরো পর্বের সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লিখে বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এখন সে স্নেহর সঙ্গে আলোচনা করে অস্ট্রেলীয় একটি সিরিয়ালকে তেরো পর্বে বঙ্গীকরণের কাজে ব্যস্ত। এজন্য প্রায়ই তাকে ভবানীপুরে স্নেহের বাড়িতে যেতে হচ্ছে সিরিয়ালটির ভিডিও ক্যাসেট দেখার জন্য।

ভবানীপুর থেকে তার এবং চাকদা থেকে তনুর ফেরাটা প্রায় একই সময়ে ঘটল। বারান্দায় রেলিংয়ের ধারে বুড়োটা চেয়ারে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু একটা পড়ছে বাড়ি ঢোকার সময় এটা দুজনেই দেখেছে। বিশ্বনাথই শুরু করল :

"রাত হয়ে গেছে, আজ থাক। বুড়োকে কাল কি পরশু বলব।"

"বলার সময় একটু মাথা ঠান্ডা রেখে বলো। ঝগড়া করে বসোনা।" খাটে পা ঝুলিয়ে চিত হয়ে শুয়ে তনু বলল।

চেয়ারে বসা বিশ্বনাথ মুখ ঘুরিয়ে তনুর দেহের মাঝামাঝি অংশটায় চোখ রেখে বলল, "পাগল নাকি। এমন নিরিবিলি পরিবেশ, ভিড়ভাট্টা চ্যাঁ ভ্যাঁ নেই, ঝুটঝামেলা নেই, এইরকম জায়গায় ঝগড়া করে অশান্তি টেনে আনতে যাব কেন? এই একটা ঘর মানে তো দুটো ঘর, সঙ্গে অতবড়ো দালান, এই ভাড়ায় কলকাতায় এখন কোথায় পাব! বুড়ো মানুষ, একা, ওর সঙ্গে মানিয়ে আমাদেরই চলতে হবে।"

"বুড়োকে কখনও দোতলা থেকে নামতে দেখেছি?" তনু মুখ ফিরিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল এবং খোলা পেটের উপর শাড়িটা টেনে দিল। বিশ্বনাথের চোয়াল শক্ত হয়েই আবার শিথিল হল। চোখ দেখেই ও বোধহয় বুঝতে পারে স্বামী কি চায়। তার

মনে হচ্ছে রাতে তনু বলবে, 'আজ থাক, বড্ড ক্লান্ত।' তারপর পাশ ফিরে বাবানকে জড়িয়ে ধরে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে। তনু অবশ্য সত্যিই ক্লান্ত থাকে।

"লক্ষ করিনি। কাজের লোকজন নেই যখন নিশ্চয় বেরোয়। তুমি দেখেছ?"

"বেরোয়। শম্পা দেখেছে, বেলা দশটায় থলি হাতে বেরোয। কালোয়ারের দারোয়ানটা কেরোসিন এনে দেয়। বুড়ো নিজের হাতে রান্না, কাচা, ঘর মোছা সব কাজ করে।.. খুব কিপ্টে।" তনু স্বামীর দিকে তাকাল, কিছু একটা মন্তব্য আশা করে।

"কুকুর পোষার শখ আছে।" বিশ্বনাথ মন্তব্য না করে উঠে পড়ল। এখন স্নান করে, কিছু খেয়ে বিছানায় চিত হয়ে সকালে চোখ বুলোন খবরের কাগজটা সে খুঁটিয়ে পড়বে।

"টিভি সেট-এর কি হল, খোঁজ নিলে?" তনু উঠে বসে আলগা স্বরে জানতে চাইল। "প্রোগ্রামগুলো তো তোমার দেখা দরকার।"

"দেখার আর কি আছে। আমার কাজ গল্প তৈরি করা আর সাজানো। আসল কাজটা তো করবে স্নেহ।"

"তবু—খোঁজ নাও।"

"নিয়েছি। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। দু-হাজারের মধ্যে, কালার চোদ্দ হাজার।"

"চোদ্দ! অত টাকা দিয়ে তো নেওয়া সম্ভব নয়।"

বিশ্বনাথ কথা না বাড়িয়ে স্নানে চলে গেল। সে জানেই তনু চোদ্দ হাজার টাকা খরচে আপত্তি জানাবে। তার নিজের নেই বটে কিন্তু টাকার অঙ্কটার সঙ্গে শখ-এর বনিবনা যে সম্ভব নয় অসহায় ভাবে সেটা তাকে মেনে নিতে হয়েছে। তারা দুজনেই টাকা জমাচ্ছে একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য। কলকাতার আশেপাশে ছোটো দুঘরের ফ্ল্যাট তিন লাখের কমে পাওয়া যাবে না এটা তারা জানে। আজ পর্যন্ত দুজনে যা জমিয়েছে আর নানান জায়গা থেকে ধার বা আগাম হিসাবে যা সংগ্রহ করতে পারবে, সব মিলিয়ে যোগ করে দেখেছে আধখানা ফ্ল্যাটের মালিক হবার মতো অবস্থায় তারা এখন রয়েছে। সুতরাং দুরকমের টিভি সেট-এর মধ্যে বারো হাজারের ব্যবধানটা তাদের কাছে মারি মেঝের সঙ্গে মোজাইক টালির মতো। টি ভি সেট কেনার বাসনাটা এতদিন তারা দমন করেই রেখেছিল। কিন্তু স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ থেকে বাড়তি আয়ের পথ খুলে যাওয়ায় তারা পরিজনে ঠাসা পৈতৃক বাড়ির ছোটো একটা ঘর, অবিরাম চেঁচামেচি এবং নিত্য বিবাদের কবল থেকে রেহাই পেতে বেরিয়ে এসেছে। এজন্য প্রতিমাসে আটশো টাকা বেশি খরচ হবে। বিশ্বনাথ তখন সেটা তনুকে বলেছিল।

"হোক, তবু এখানে আমি বাবানকে মানুষ হতে দেব না। এত ইতরোমি আর নোংরা কথাবার্তার মধ্যে ও একটা অমানুষ হয়ে উঠবে। ওকে আমি ভালোভাবে মানুষ করব, ওকে ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াব।' কঠিন গলায় তনু জানিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে সংসার পেতে সে ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে না। বাপ-ঠাকুর্দার বাড়ি ছেড়ে আসতে বিশ্বনাথের কষ্ট হয়েছিল কিন্তু তনুর উচ্চকাঙ্ক্ষা তার কষ্টটাকে ঘাড় ধরে নুইয়ে দিয়েছিল। এখন আর ব্যথা করে না।

রাত্রে লিখতে বসে বিশ্বনাথ অনেকক্ষণ পর আবিষ্কার করল সে একলাইনও লেখেনি, উৎকর্ণ হয়ে দোতালা থেকে সরসর আর ছপছপ শব্দ দুটো কখন নেমে আসবে তার জন্যই সে অপেক্ষা করছে। বারবার সে সিলিংয়ের দিকে তাকাল। কোন শব্দ নেই। অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে হতাশা হয়ে পড়ল। আজ আর লেখা হবে না, এমন এক ধারণায় পৌঁছে সে আলো নিভিয়ে শুয়ে, বাঁ হাতটা অঘোর ঘুমোন তনুর কোমরের উপর আলতো রাখল। বিশ্বনাথ আশা করল তনু নড়ে-চড়ে উঠবে। কিছুই হল না। আঙুলগুলো কোমরে চেপে বসাতে যাচ্ছে আর তখনই দোতলায় সরসর শব্দটা চলতে শুরু করল। আঙুলগলো প্রথমে অসাড় হল তারপর নেতিয়ে পড়ল। সরসর শব্দের সঙ্গে ছপছপটাও যথারীতি দালানের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো তারপর ঘরের মধ্যে, থেমে থেমে যাতায়াত শুরু করল। বিশ্বনাথের মনে হল, বাসি ভাতের মতো তার শরীর কড়কড়ে ঠান্ডা লাগছে। তনুর কোমর থেকে হাতটা তুলে নিয়ে সে স্থির করল, বুড়োর সঙ্গে কাল অবশ্যই কথা বলবে।

পরদিন সকালে সেসময় করে উঠতে পারল না। সন্ধ্যায় অফিসে থেকে ফিরে নিজের দরজায় না থেমে সে সোজা দোতলার সিঁড়ি ধরল। বাঁকটা নিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতেই সে দেখল বারান্দার মাঝখানে কুকুরটা উবু হয়ে সামনের পায়ের থাবাদুটো পাশাপাশি রেখে বসে। সিঁড়ির দিকে মুখ করে সোজা এমনভাবে তাকিয়ে যেন তার জন্যই প্রতীক্ষা করছে। বারান্দার অল্প পাওয়ারের বালবটা কুকুরটার পিছনে তাই মুখটা বিশ্বনাথের কাছে স্পষ্ট লাগল না। চেয়ারে বসে চশমা-পরা বুড়ো মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বই পড়ছে। সে থমকে গেল।

আর দুটো ধাপ উঠলেই দালান! কুকুরটার স্বভাব তার জানা নেই, পাশ দিয়ে যেতে গেলে যদি কামড়ে দেয়? বিশ্বনাথ গলা খাঁকারি দিল বুড়োর মুখ ফেরাবার জন্য। মুখ ফিরল। বুড়ো যখন বোঝার চেষ্টা করছে লোকটি কে, তখন বিশ্বনাথ বলল, "আমি আপনার ভাড়াটে, নীচে থাকি।"

চশমাটা খুলে ঠান্ডা মৃদুস্বরে বুড়ো বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।"

"আপনার কুকুরটা।"

"ও কিছু বলবে না, পাশ দিয়ে চলে আসুন।" চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বুড়ো বলল। "কিছু কি দরকার আছে?"

"হ্যাঁ, একটা কথা বলার জন্যে এসেছি।" বাকি দুটোধাপ বিশ্বনাথ এখনও ওঠেনি। এখনও সে পুরো ভরসায় পৌঁছতে পারেনি। কুকুরটা একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে, একইভাবে সিঁড়ির দিকে সোজা তাকিয়ে। ভয়ে ভয়ে বিশ্বনাথ ওর চোখদুটো লক্ষ করল। ছায়া ঢাকা মুখের মধ্যিখানে দুটো অনুজ্জ্বল মার্বেলের গুলি যেন বসান রয়েছে। মনে মনে সে বলল, 'তবে কি ভুল দেখে ছিলাম সেদিন!'

ঘর থেকে একটা মোড়া এনে দালানে রেখে বুড়ো বলল, "আসুন আসুন, ভয়ের কিছু নেই। জীবনে ও কখনও কাউকে কামড়ায়নি।" বিশ্বনাথ যখন আড়ষ্টভাবে পা টিপে কুকুরটিকে অতিক্রম করছে বুড়ো তখন বলল, 'ফুচা দেখতে পায় না, ও অন্ধ।"

বিশ্বনাথ ধাক্কা খেল কথাটা শুনে। ঘাড় ঘুড়িয়ে অবাক হয়ে সে ফুচার দিকে

তাকিয়ে রইল। একই ভাবে ও বসে রয়েছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। বসার ভঙ্গিতে রয়েছে যেন কারুর জন্য অপেক্ষা। নিশ্চয় তার জন্য নয়। সে যে আজ দোতলায় উঠে আসবে ফুচার সেটা জানার কথা নয়।

মোড়ায় বসে বিশ্বনাথ বলল, "রোজ রাতে ওপরে একটা সরসর, ছপছপ শব্দ শুনতে পাই।"

বুড়োর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। চোখ দুটো সরু করে একটু রুক্ষস্বরে বলল, "তাতে কি হয়েছে? কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাকি?"

বিশ্বনাথ সাবধান হয়ে গেল। চটাচটির মধ্যে কোনোক্রমেই সে যাবে না, "তেমন কিছু নয়, তবে কৌতূহলও হয়।"

বুড়ো চাপাগলায় নরম সুরে ডাকল, "ফুচা, ফুচা। ...এখানে আয়।"

ফুচা মুখ ফিরিয়ি কিছুক্ষণ পিছনে তাকিয়ে থেকে মাথা নামিযে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বুড়ো দিকে। গলার চেইনটা মেঝেয় ঘষড়ানর দরুন ও শব্দটা হচ্ছে বিশ্বনাথের সেটা চিনতে পারল। বড়ো বড়ো নখগুলো ওর প্রত্যেকবার পা ফেলাতে যে শব্দ তৈরি করল, সেটা বুঝে নিতেও তার অসুবিধা হল না।

"ফুচা কি সারারাতই ঘুরে বেড়ায?"

"হ্যাঁ। এটা ওর অনেকদিনের অভ্যেস। আজীবন একা একাই ওর কেটেছে। জীবনের শেষ সীমায় এখন ও।"

বুড়োর থেকে তিন হাত দূরত্বে উবু হযে বসে মুখ তুলে ফুচা কথাগুলো শুনছে। বিশ্বনাথ কয়েকটা কালো পোকা ওর চোখের কোণে, কানের পাশ, হাঁটুর কাছে দেখতে পেল।

"পোকা হয়েছে, খুব কষ্ট পায় নিশ্চয।"

"হযতো পায়।"

"পোকা মারার জন্য তো পাউডার পাওযা যায।"

বুড়ো তীব্র চোখে তাকিযে বলল, "তা যায়। আপনি কি পোকা নিয়ে কথা বলার জন্য এসেছেন?"

বিশ্বনাথ আর একবার সাবধান হল।

"ওপর থেকে আমার জানলার ধারে যে সব জিনিস পড়ে তাতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। কী পরিমাণ জঞ্জাল, কী ধরনের ময়লা উঠেছে সেটা যদি দযা করে একবার দেখে আসেন।" যথাসম্ভব বিনীত স্বরে সে বলল।

সচকিত বুড়ো সোজা হয়ে বসল। "জঞ্জাল? আপনার জানলার ধারে! ছি ছি ছি, এটা আমারই দোষ। বহুদিনের অভ্যেস তো, নীচে কেউ থাকত না বলে, তাই..." বুড়ো দুই তালু চেপে বলল, "আমারই অন্যায়।"

বিশ্বনাথ আশা করেছিল তিরিক্ষে বা মেজাজী স্বরে দায় এড়িয়ে যাওয়ার মতো জবাব পাবে। তার বদলে ওকে এমন অনুতপ্ত হতে দেখে সে অপ্রতিভ বোধ করল।

"কালকেই আমি রামবিলাসকে বলে জঞ্জাল সরাবার ব্যবস্থা করব।"

"এত ব্যস্ত হবার কি আছে। যে কোন একদিন পরিষ্কার করে দিলেই হবে।"

বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়াল। ফুচা একইভাবে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো ফুলে উঠে কোটর থেকে অল্প বেরিয়ে, পুরোটাই ঘোলাটে সাদা। বোধহয় ছানি পড়েছে। কুকুরেরও তো ছানি অপারেশন হয়। বলতে গিয়েও বিশ্বনাথ নিজেকে সামলে নিল। হয়তো চটে গিয়ে বলবে 'হ্যাঁ হয়। আপনি কি ছানি নিয়ে কথা বলার জন্য এসেছেন ?"

ফুচার পাশ দিয়ে এগোতে গিয়ে সে চেইনটা মাড়িয়ে অল্প একটু হড়কে যেতেই পাথরের সঙ্গে লোহা ঘষার শব্দ হল। কর্কশ শব্দটায় তার দুই বাহুর রোমের গোড়া সিরসির করে উঠল। তার মনে হল একটা সাপ যেন সে মাড়িয়ে ফেলেছে।

"মাঝে মাঝে একটু মেজাজ খারাপ করে তখন বেঁধে রাখতে হয় বলে চেইনটা গলায় লাগিয়েই রেখে দিয়েছি। কে আর খোলে-পরায়।" বুড়ো নীচু গলায় বলল।

প্রসঙ্গটা বদলাতে বিশ্বনাথ বলল, "আপনার তো ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি নেই, টি ভি অ্যান্টেনা লাগাই কি করে সেটাই ভাবছি।"

"কেন, ও-বাড়ি দিয়ে ছাদে আসবেন! আমার ভাইপো রবিকে বলবেন ও আপনাকে ছাদে নিয়ে যাবে। বাড়ি পার্টিশানে সিঁড়িটা ওদের ভাগে পড়ল। আমার দিকে নতুন সিঁড়ি। করে নেওয়ার কথা কিন্তু করা আর—"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিশ্বনাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ফুচা বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে একইভাবে বসে রয়েছে আর বুড়ো তাকিয়ে সিঁড়ির দিকে।

"জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেবে বলল", তনু ফেরামাত্রই বিশ্বনাথ জানিয়ে দিল।

"ভালো।"

"কুকুরটাকে ভাল করে দেখলুম...একদম অন্ধ, শুধুই বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে! গায়ে পোকা অজস্র। ...রাতে যে শব্দ শুনি সেটা যে ওরই কাজ আজ বুঝলুম। গলায় একটা চেইন বাঁধা, সেটা মেঝের উপর দিয়ে টানতে টানতে যায়, আর পায়ের বড় বড় নখ, তাই থেকেই শব্দ হয়। ...বাবা বাঁচা গেল, যা টেনশান হয়! আমি ভাবলুম না জানি অন্য কিছু—"

"অন্যকিছু মানে ভূতটুত ?"

স্কুলের শাড়িটা খাটের উপর বিছিয়ে তনু আলনা থেকে শাড়ি নিতে এগোল। শায়াটা ধরধবে, বিশ্বনাথ চোখ বুড়িয়ে একটা কোনো দাগও দেখতে পেল না। এই বয়সে তনুর শরীর একটু ভারী হওয়ার কথা। কিন্তু সেই রোগাই রয়ে গেল।

"প্রায় তাইই। সিনেমায় দেখো না, পোড়ো বাড়িতে কুয়াশা আর ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে কতরকম শব্দ আর গান হয়, অনেকটাই সেই রকম লাগত।" কথাটা বলার সঙ্গেই বিশ্বনাথের দৃষ্টি থেকে তনুর নিতম্বের বক্র ভাঁজ অদৃশ্য হয়ে গেল শাড়ি জড়িয়ে নেওয়ায়। আধময়লা ছাপা শাড়ি। সাশ্রয়ের জন্য হপ্তায় এক দিন, রবিবার, তনু সারা পরিবারের কাচাকাচি কাজ সারে, ইস্ত্রি করে স্কুলের জন্য মাড় দেওয়া শাড়ি। ছুটির দিনেও নিজেকে ক্লান্ত করতে হন্যে হয়ে ওঠে।

শম্পা চা দিয়ে গেল দুজনকে। খাট থেকে শাড়িটা তুলে পাট করতে করতে তনু বলল, "তুমি আগে গা ধুয়ে এসো।"

"টি ভি শনিবার আনব। রোববার সকালে প্রোগ্রাম চলার সময় ওদের লোক এসে অ্যান্টেনা লাগাবে। বুড়ো বলল ও-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাওয়া যাবে।"

"ভালো। তার আগে জঞ্জালগুলো পরিষ্কার হোক্ তো।"

বিশ্বনাথ রাতে সিলিংয়ের দিকে মুখ করে শুয়ে অপেক্ষা করছিল। সরসর শব্দটা শুরু হতেই সে আজ এর মধ্যে কোনো রহস্য অনুভব করল না। ওপাশ ফিরে শোওয়া তনুকে কাঁধ করে হ্যাঁচকা টানে সোজা করে দিতেই সে "কে, কে", বলে উঠে বসতে গেল।

"কে আবার, আমি।"

বিশ্বনাথ বুকে ছোট্ট ঠেলা দিয়ে ওকে শুইয়ে দিল। মিনিট পাঁচেক পর শাড়িটা উরু থেকে নামিয়ে, বিড়বিড় করতে করতে তনু আবার পাশ ফিরে শুল।

রবিবার অ্যান্টেনা লাগাবার লোকটিকে নিয়ে বিশ্বনাথ হাজির হল ও-বাড়িতে। বরফিকাটা তকতকে পাথরের মেঝে, দরজা জানলায় উজ্জ্বল রং, আসবাবে ধুলো নেই অথচ সবাই প্রাচীন। বুড়োর ভাইপো রবির কথাবার্তা মার্জিত ও নম্র। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। সাদা পাজামা আর গেঞ্জিটা তনুর শায়ার মতই ধবধবে, নিদাগ। বিশ্বনাথের অস্বস্তি ছিল হয়তো ছাদে যেতে দেবে না। জ্যাঠার সঙ্গে শরিকি সম্পর্কটা কেমন রয়েছে সেটা তার জানা নেই। সাধারণত ভালো থাকে না।

"নিশ্চয় যাবেন, এতে আপত্তি কবার কি আছে। ওদিকের ছাদটা তো জ্যাঠামশায়েরই।"

জলছাদের সুরকির আস্তরণ উঠে গিয়ে খোয়া বেরিয়ে পড়েছে। বৃষ্টির জল বেরোবার নলের মুখে আবর্জনা। পাঁপড়ের মতো মড়মড়ে হযে রযেছে শুকিযে যাওযা শ্যাওলা। গাছের পাতা, কাগজ, কাঠকুটোয ঝাঁঝরির মুখ বন্ধ। পলেস্তরা খসা ইট বহু জায়গায় বেরিয়ে হাঁটু সমান একটা পাঁচিল দিয়ে ছাদটা ভাগ করা।

"আমরা মাঝে মাঝে নর্দমার মুখ পরিষ্কার করে দি। বৃষ্টির জল বসে বসে জ্যাঠামশায়ের পোর্শানটার যা অবস্থা হযেছে!"

চোখে জ্বালা ধরানো রোদে দাঁড়িযে তারা। লোকটি অ্যান্টেনা লাগাবার কাজে ব্যস্ত। ঘণ্টাখানেক সময় তো লাগবেই। বিশ্বনাথের মনে হল, এখান তার দাঁড়িয়ে কাজ দেখার কোনো দরকার নেই। রবি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল বিশ্বনাথের মনোভাব।

"এই রোদে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ, আপনি নিচে গিয়ে বসতে পারেন, ততক্ষণ ও কাজ করুক।"

বিশ্বনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একতলায় বসার ঘরে গোল একটা মেহগনির টেবল ঘিরে চারটে কাঠের চেয়ার। সবই পুরনো আমলের। একটা লোক সামনের চেয়ারে বসে, কিছু একটা বিষয় পেড়ে কথা তো বলতে হবে, তাই বিশ্বনাথ শুরু করল, "আমার ঘরের বাইরে বহু দিনের জঞ্জাল জমে ছিল। ওনাকে বলেছিলুম তাই আজ সাফ হচ্ছে।"

"এসব ব্যাপারে উনি খুব পার্টিকুলার ছিলেন আপনাকে সাফ করার কথা বলতেই হত না। এখন অবশ্য—।"

"আপনার জ্যাঠামশাই বোধহয় একা থাকতেই ভালোবাসেন।"

"বছর কুড়ি-বাইশ হল উনি এইরকম হয়ে গেছেন।" স্বরটাকে গাঢ় করে রবি কিঞ্চিৎ বিষাদ মাখিয়ে বলল। "ওর একমাত্র ছেলে ভাস্তু, আমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোটো, নকশাল আমলে খুন হল। তারপর থেকেই উনি এমন হয়ে গেলেন।"

বিশ্বনাথ নড়েচড়ে বসল। "বলেন কী! ওনার ছেলে খুন হয়েছে? কোথায়, কারা করল?"

"যে দরজা দিয়ে আপনি ঢোকেন ঠিক তার সামনে, সন্ধ্যেবেলায়। আমরা শুধু একটা চিৎকার শুনে ছিলুম। আটবার স্ট্যাব করে। ছুটে গিয়ে যখন পৌঁছুলম তখন ওরা পালিয়ে গেছে। জ্যাঠামশাই দোতলার বারান্দা থেকে ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছিলেন।'

নিজের অজান্তে বিশ্বনাথ মুখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল। মোটা মোটা কাঠের কড়ি আর বরগা এ-বাড়িতেও।

"ভাস্তুকে আমরাই মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাই, তখন আর বেঁচে নেই।"

"দেয়ালে এখনও আলকাতরার অস্পষ্ট একটা কথা পড়া যায়।"

"সে কি! এখনও আছে?" রবি খুবই অবাক হল। "বহু বছর ওদিকে আর যাওয়া হয়নি। আশ্চর্য, এখনও আছে?" বিস্ময়ের সঙ্গে ধাক্কাটা সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়ে উঠে রবি বলল, "সেদিন রাতেই লিখে দিয়ে গেছল, 'খুন নয় খতম'। কথাটার মানে আজও বুঝি না। শুনেছি জ্যাঠামশাই দোতলায় বসে থাকেন ওই দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে।"

"হ্যাঁ আমিও দেখেছি, কারণটা এতদিন জানতাম না। ভাস্তু পলিটিক্স করত কি?"

"বলতে পারব না। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স নিয়ে পড়ত, মুখচোরা, বাবার মতই বুগ্ণ ছিল। জ্যেঠিমা তো পাগলের মতো হয়ে গেলেন। ওদের মেয়ে টরন্টোয় কম্পুটার সায়ান্স পড়তে গিয়ে ওখানেই বিয়ে করে সেট্‌ল করেছে। সে এসে মাকে নিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে বাবাকে টাকা পাঠাত। জ্যেঠিমা ওখানেই মারা গেছেন, এখন বোধহয় আর টাকা আসে না।" রবি নিশ্চিত ভঙ্গিতে ছোট্ট করে মাথা নাড়ল। ওর কথা বলার ধরণ থেকে বিশ্বনাথের মনে হল, লোকটি গপ্পো শোনানোর মতো কাউকে পেলে অনর্গল বকে যেতে পারে।

"আপনার জ্যাঠামশায়ের একটা কুকুর আছে?"

"জানি, স্পিৎজ্। খুব বুড়ো, মরার টাইম হয়ে গেছে।"

"ও অন্ধ।"

রবি কথাটা কানে নিল না বরং নম্র করে জানতে চাইল, "আপনার স্ত্রী কোথায় বোধহয় পড়াতে যান?"

প্রশ্নটা শুনে বিশ্বনাথের ভ্রূ উঠে গেল। রবি তাহলে তাদের সম্পর্কে খবর রাখে। 'চাকদায় একটা স্কুলে।"

'অতদূরে! তাই ফিরতে অ্যাতো রাত হয়। আপনি তো সিরিয়াল লেখেন, আমার মেয়ের কাছে শুনেছি।"

এই সময় চাকর এসে রবিকে জানাল, তাকে ভিতরে ডাকছে। রবি উঠে যাবার পরও বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ বসে যুড়োর কথা ভাবল। ছাদে অ্যান্টেনা লাগানোর কাজ আর সে দেখতে গেল না, নিজের ঘরে ফিরে এল।

টিভি সেটটা রাখা আছে তার টেবলে। এটাকে অন্য কোথাও জায়গা থাকবে।"

"না থাকবে না।" হঠাৎই রেগে উঠল বিশ্বনাথ। নিজেকে তার মনে হচ্ছে চারদিক থেকে চাপ খাওয়া কুঁকড়ে যাওয়া একটা মানুষ। "এত অল্প জায়গায় আমি লিখতে পারব না।"

একই রকম তিক্ত স্বরে তনু বলল, "না পারতো সেট্‌টাকে রান্নাঘরে রেখে এস, শম্পা বসে বসে দেখবে।"

"সেই ভালো।"

"ওটা তোমার জন্যই আনা, আমার বা বাবানের জন্য নয়।" শান্ত ধীর গলায় তনু বলল।

"এতবড়ো ঘর অথচ এইটুকু একটা জিনিস রাখার জন্য আমার টেবল ছাড়া কি আর জায়গা নেই?"

"নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ, কী আছে কী নেই।"

জানলা ঘেঁষে কালো ফিতের মতো অ্যান্টেনার তার ঝুলছে। গোল করে পাকানো তারের বাকিটা জানলা গলিয়ে ঘরের মধ্যে বাড়িয়ে এই সময় লোকটি বলল, "ধরুন।"

বিশ্বনাথ ধরল। লোকটা এবার ঘরে আসবে। নরম গলায় সে বলল, "টেবলেই এখন থাকুক, পরে দেখা যাবে।"

সারাদিন দেখা আর হল না। টেবলে যতটুক জায়গা বিশ্বনাথ সেইটুকুতেই কাজ চালিয়ে রাতে লেখায় বসল। বিকেল থেকে টিভি চালান হয়েছে। সবাই বাংলা সিনেমা দেখেছে, তিন ভাষায় খবর শুনেছে। ওরা সবাই খুশি। ভোরে উঠতে হবে বলে রোজকার মতো দশটাতেই তনু শুয়ে পড়েছে বাবানকে নিয়ে। মাথার মধ্যে ছুঁচ ফোটানোর মতো একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। দু-হাতের চেটোয় রগ চেপে বিশ্বনাথ মাথা নামিয়ে বসে আধ ঘণ্টারও বেশি। একটা লাইনও লেখা হয়নি। বাড়ির সুইমিংপুলে পূর্ণিমার রাতে জলবিহার করতে নামবে বিশাল শিল্পসাম্রাজ্যের মালিক আর তার স্ত্রী। শিল্পপতির মৃত্যু ঘটিয়ে সাম্রাজ্য দখল করার জন্য চক্রান্ত করেছে শিল্পপতির মধ্যবয়সী স্ত্রী এবং তার তরুণ প্রেমিক। বিশ্বনাথ আপত্তি করে বলেছিল, 'এই ধরনের অবৈধ প্রেম আমাদের ভিউয়াররা পছন্দ করবে না।' স্নেহ বলেছে, 'পছন্দ করাতে হবে। আমরা তো এই ধরণের প্রেমের বিরুদ্ধেই বলতে চাই। ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আনতে চাই বলেই—'।

সুইমিং পুলের জলে গলায় চেইন বাঁধা একটা কুমির গোপনে রেখে দেওয়া হবে। খিলখিল হেসে মজা করার জন্য স্ত্রী ধাক্কা মেরে স্বামীকে জলে ফেলে দেবে। তারপর একটা বীভৎস কাণ্ড। কুমিরে ধরা একটা লোকের চিৎকার, জলের তোলপাড় চোখের পাতা না ফেলে স্ত্রী কঠিন মুখে তাকিয়ে থাকবে এবং ধীরে ধীরে জল শান্ত হয়ে যাবে, জলের রং বদলে যেতে থাকবে। এই দেখিয়ে ঘৃণার সঞ্চার করা যাবে! স্নেহ

পাগল নয়, খুব ঠান্ডা মাথাতেই সে ঘটনাটা ছকেছে।

দৃশ্যটা কল্পনা করে বিশ্বনাথ নিজের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা বুঝে নিতে গিয়ে দেখল কোনো প্রকারের ঘৃণা তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে না। বরং মাথার মধ্যে একটা ছুঁচ অবিরত ফুটে চলেছে। ঘৃণাটাকে ঠিকমতো কবজা করতে না পারলে দৃশ্যটা সে লিখবে কি করে? অসহায় ভাবে বিশ্বনাথ মুখ তুলে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবাক হয়ে পড়ল। একি! কোনো শব্দ তো সে এখনও পেল না। টেবলে রাখা রিস্টওয়াচে দেখল সওয়া বারোটা।

ফুচার চলাফেরা কি শেষ হয়ে গেছে? কুমিরের মানুষ খাওয়া দেখতে দেখতে সে খুবই কি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল? কিন্তু সরসর শব্দটা এমনই যে সেটা তার শরীরের যেকোনো জায়গা স্পর্শ করবেই, বীভৎস সুখে তার সর্বাঙ্গ মোড়া থাকলেও! ফুচা আজ সময় রাখতে পারেনি। আলো নিভিয়ে বিশ্বনাথ চিত হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। ফুচার চলাফেরা হল কি না সে জানল না।

পরের রাতেও একই ব্যাপার, ফুচার চলাফেরা আভাষটুকুও নেই। কৌতূহলী হয়ে বিশ্বনাথ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সামনের দেয়ালে 'খতম'-এ পিঠ লাগিয়ে দোতলার বারান্দায় রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে যতদূর দেখা যায়, দেখার জন্য গোড়ালিও তুলল। কিছুই নেই। খাটিয়ায় রামবিলাস ঘুমোচ্ছে। ফিরে আসার জন্য দরজার কাছে এসে থমকে সে মুখ তুলল। চোখ বন্ধ করে একবার শিউরে উঠে চোখ খুলল।

ফুচার মাথাটা বেরিয়ে নেই, সেই জ্বলজ্বলে চোখ দুটোও নেই। জন্তু জানোয়ারের চোখ, তনু বলেছে অন্ধকারে জ্বলে। কিন্তু ফুচার চোখে কোন আলো থাকার কথা নয়, ও দুটো তো ছানি পড়ে সাদা হয়ে আছে! ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে বিশ্বনাথের একটাই চিন্তা, আমি ভুল দেখলাম কেন? কূলকিনারা না পেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সে তনুকে বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার, ফুচার নখ আর চেইনের শব্দ দুদিন হলে পেলুম না!"

শাড়ি পাট করে নাভির উপর গুঁজে দিতে দিতে তনু আড়চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "বুড়ো হয়তো কোথাও চেইনটা বেঁধে রেখেছে তাই ও চলছে না... শম্পা ঠিক তিনটের সময় মনে করে কিন্তু রসটা খাওয়াবি।" রামকৃষ্ণের ছবির সামনে সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াল।

বোধহয় তাই, ফুচাকে বেঁধেই রাখা হয়েছে কেননা আরও চার দিন বিশ্বনাথ শব্দ পেল না। এখন তার শব্দ না পাওয়ার অস্বস্তিটা আর হয় না। কিন্তু শম্পার একটা কথায় সে বিচলিত বোধ করল।

"আজ সকালে বউদি বলল, জানলা দিয়ে কীরকম যেন একটা গন্ধ আসছে। তুমি কি পাচ্ছ?"

বিশ্বনাথ জানলার কাছে এসে কয়েকবার শ্বাস টানল। একটা গন্ধ সে পেল। কথা না বলে সে বেরিয়ে এসে জানলার বাইরে দাঁড়াল। ইঁদুর কি বেড়াল কিছু একটা মরেছে, সকালে দেখা যাবে এই ভেবে সে ফিরে এল।

তনু ফিরে এসে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "আবার ওপর থেকে ফেলা শুরু

করেছে। কাল সকালেই গিয়ে বলো।"

বিশ্বনাথ সকালে বলতে যাবার আগে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জানলার বাইরে একবার খোঁজাখুঁজি করল। উপর থেকে কোন কিছু পড়ার চিহ্ন নেই। তবে সে মাংস পচার একটা গন্ধ পেল। কিছুই যখন পাওয়া গেল না তাহলে কি বলতে সে উপরে যাবে? বিশ্বনাথ ফাঁপরে পড়ল।

"বলো একটা উৎকট গন্ধ পাচ্ছি। এ-ব্যাপারে বাড়িওয়ালা হিসেবে ওনারও তো কিছু কর্তব্য আছে, নাকি নেই।" তনু স্নান করে ভিজে শাড়ি জড়িয়ে ঘরে এসেছে। মাথা দিয়ে গলিয়ে এবার শুকনো শায়াটা পরবে, যাতে একটা দাগও নেই। তারপর শায়াটাকে কালের আর নীচে না নামিযে দড়ি বাঁধবে এবং ভিজে শাড়িটা প্রতিদিনের মতো ঝরে পড়বে পায়ের কাছে। হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা শাযার তলায় সরু দুটো পা দেখলে বিশ্বনাথের হাসি পায় কিন্তু সে কখনও হাসে না।

"শম্পা মেলে দিয়ে আয়।" তনু চেঁচিযে কথাটা বলে বিশ্বনাথের দিকে ফিরে বলল, 'দাঁড়িযে থেকো না।"

বিশ্বনাথ আর দাঁড়াল না। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই গন্ধটা তার নাকে ধাক্কা দিল। বারান্দার শেষ প্রান্তে বুড়ো মাথা ঝুঁকিযে খবরের কাগজ পড়ছে। তার পিছনেই পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে ফুচা। চেইনটা গলা বাঁধা।

ওটা যে ফুচার মৃতদেহ এটা বুঝতে বিশ্বনাথকে অর্ধসমাপ্ত একটি মাত্র বাক্য খরচ করতে হল।

"একটা বিশ্রী পচা গন্ধ আজ দুদিন ধরে আমরা—"

বুড়ো মুখ ফিরে বিশ্বনাথের দিকে শান্ত চোখ তাকাল এবং কয়েক সেকেন্ড পর আঙুল দিয়ে ফুচাকে দেখাল, "মরে গেছে।"

হতভম্ব বিশ্বনাথ ধাতস্থ হবার পর বলল, "এটা কীরকম ব্যাপার হল? মরে গেছে তো ফেলে দেননি কেন?"

"থাক্ না, যতদিন খুশি ও থাক্ না।" বুড়ো আবার খবরের কাগজে মাথা ঝোঁকাল।

বিশ্বনাথ স্তম্ভিত। একটা মরা কুকুর নিয়ে এটা কি ধরনের আদিখ্যেতা? সে শুনেছে অনেক ছেলেমেযের মতনই কুকুরকে ভালোবাসে, মারা গেলে কান্নাকাটি করে, নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। খবরের কাগজে ছবি দিয়ে শোকও প্রকাশ করে কিন্তু এটা কি করছে বুড়ো।

"আপনি এই মরা কুকুরটাকে রেখে দেবেন?" বিশ্বনাথ অবিশ্বাসভাবে বলল।

"হ্যাঁ। কেন, তাতে আপনার আপত্তি আছে?"

"অবশ্যই আছে। আপনি কি এখনও গন্ধটা পাচ্ছেন না?"

"না তো।" বুড়ো মাথা ঘুরিয়ে ফুচার লাসটার দিকে তাকাল। "না পাচ্ছি না।" শান্ত গলায় আবার বলল।

"আমার নীচের থেকে পাচ্ছি আর আপনি—" বিশ্বনাথ ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল।

"আমি কী করতে পারি?"

"কর্পোরেশনের ধাঙড় ডেকে, কিছু টাকা দিয়ে এটাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।"

"না।" বুড়ো খবরের কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরল। বসার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল আর সে কোন কথা শুনতে চায় না।

বিশ্বনাথ প্রায় ছুটেই ফিরে এল। তনু তখন ভাত খেতে শুরু করেছে।

"ওপরে কুকুরটা মরেছে, তারই পচা গন্ধ। ওটাকে ওইভাবেই রেখে দেবে বলল।"

"য়্যা!" থালার উপর তনুর হাতটা স্থির হয়ে গেল। "মরাটাকে রেখে দেবে? কী বলছ তুমি!"

"তাই তো বলল।"

ব্যস্ত হয়ে খাওয়া ফেলে উঠে, কোনোক্রমে হাতটা ধুয়েই তনু সিঁড়ির দিকে ছুটল। বিশ্বনাথ ওকে অনুসরণ করে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আপনি নাকি এই মরা কুকুরটাকে রেখে দেবেন?"

বুড়োর উত্তর বিশ্বনাথ শুনতে পেল না।

"আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে? জানেন এর থেকে কত রকমের রোগ ছড়াতে পারে, মহামারিও হতে পারে। ঘরে বাচ্চা রয়েছে।"

বিশ্বনাথ দুধাপ উঠেও বুড়োর কথাগুলো বুঝতে পারল না। কেন জানি তার মনে হল, বুড়ো তার জেদ থেকে একইঞ্চিও সরবে না।

"এই পচা গন্ধ নাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে আর তর্ক করতে পারব না, বসে বসে প্রাণভরে আপনি শুঁকে যান কিন্তু দয়া করে এটাকে বিদেয় করুন। এটা সভ্য সমাজ, পাঁচজনের কথা ভেবে চলতে হয়। আপনি যদি আজকেই এটাকে—"

"গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট!"

বুড়োর তীক্ষ্ণ চীৎকারের সঙ্গেই চেয়ার সরাবার শব্দ বিশ্বনাথ শুনতে পেল। তারপরই ভীতমুখে তনুকে নেমে আসতে দেখল।

"তেড়ে এল আমার দিকে। মনে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে।... চোখ দুটো যেন কীরকম—" তনু থেমে গেল।

বিশ্বনাথ অস্ফুটে বলল, 'জ্বলজ্বল করছিল।"

"জানলে কী করে! তুমি তো নীচে ছিলে!"

তনুর ভাত খাওয়া আর হল না। ন-টা আঠাশের কৃষ্ণনগরটা এখনও ধরার সময় আছে। বেরোবার সময় সে বলে গেল, "একবার ও-বাড়িতে গিয়ে বরং রবিবাবুকে বলো যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কুকুরটা ফেলার ব্যবস্থা করতে পারে। আর এখুনি ফিনাইল এনে চারিদিকে ছড়িয়ে দাও... শম্পা মনে করে রসটা খাওয়াস।"

ফিনাইল নিয়ে ফেরার সময় বিশ্বনাথ ও-বাড়িতে ঢুকল। খবর পেয়ে নেমে এল রবি।

"কুকুরটা মরে গেছে...আজ চার দিন।"

"বলেই ছিলাম টাইম হয়ে এসেছে।" রবির মুখ তৃপ্তিতে ভরে উঠল।

"আপনার জ্যাঠামশায়ের মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। উনি ওই মরা কুকুরটাকে রেখে দিয়েছেন।"

"বলেন কী!" রবি খাড়া হয়ে বসল। "মরা কুকুরটাকে?"

"হ্যাঁ। এখন কি করি বলুন তো। আমি বললুম, আমার স্ত্রীও বলল, উনি তো তেড়ে প্রায় মারতেই এলেন। অথচ এই সেদিন জঞ্জাল সাফ করে দেবার কথা বলতেই উনি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সাফ করিয়ে দিলেন। ...আপনি কি একবার ওনাকে বলবেন?"

"আমি কী বলব?"

"যাতে কুকুরটার ব্যবস্থা করেন।"

"ও বাড়িতে আমরা কেউ যাই না। আপনি বরং কর্পোরেশনে কি পুলিশে খবর দিন। ওপরে আমি কাজ ফেলে এসেছি, কিছু মনে করবেন না।" রবি চেয়ার থেকে উঠল।

"মরা কুকুর পড়ে থাকলে আশপাশের বাড়িতে রোগভোগ তো হতে পারে!" বিশ্বনাথ শেষ চেষ্টা করল রবিকে সক্রিয় করে তুলতে।

"তা তো পারেই। আচ্ছা—"।

বিশ্বনাথ দরজা, জানলার বাইরে ফিনাইল ছড়িয়ে তনুর মতো না খেয়েই অফিসে গেল। যাবার আগে শম্পাকে হুঁশিয়ার করল, বাবান যেন ঘরের বাইরে না যায়। অফিস থেকে আজ সে তাড়াতাড়ি ফিরল এবং তনুও ফিরল প্রাইভেট কোচিং না করেই। বিশ্বনাথ একবার ফিনাইল ছড়িয়ে এসে ঘরের জানলা বন্ধ করে দিল।

"এভাবে কতদিন চলা যাবে?" তনুর প্রশ্নে বিশ্বনাথ অসহায়ভাবে শুধু তাকিয়ে রইল।

"কাল সকালেই থানায় যাও। পুলিস দেখলে হয়তো বুড়ো ভয় পাবে।"

"কিন্তু পুলিস যে আসবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ব্যাপারটা একদমই অবাস্তব। ওরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কেনই বা করবে, আমি নিজেকে তো বিশ্বাস করাতে পারছি না।"

"তবু তুমি সকালে একবার যাও। লোক পাঠিয়ে অন্তত একবার ওরা দেখে যাক ব্যাপারটা সত্যি কি না। পুলিস ছাড়া তাড়াতাড়ি কিছু করার আর তো উপায় নেই!"

"পুলিস তো তার হাতে করে কুকুরটাকে ফেলতে আসবে না, কর্পোরেশনের ডোমকে দিয়ে ফেলাবে। গড়িমসি করে, সময় নেবে। আমি তো কেষ্টবিষ্টু নই। তবে আমার মনে হয় সোজা যদি কাউন্সিলারের কাছে যাই তাহলে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

"সেই ভালো।"

ওরা টিভি দেখল না। বিশ্বনাথ লিখতে বসল না। রাতে খেতে বসে তনু বমি করতে ছুটে গেল কল ঘরে। বিশ্বনাথ বিষণ্ণ মুখে চেয়ারে বসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, "এইরকম পাগলের বাড়িতে বাস করা যায় না, অন্য কোথাও ঘর দেখতে হবে। জায়গাটা কিন্তু আমার খুব পছন্দের ছিল।"

বালিশে মুখ চেপে তনু উপুড় হয়ে শুয়ে। মুখ ফিরিয়ে শুকনো গলায় বলল, "বাবানকে নিয়ে কালই আমি শ্যামপুকুর চলে যাব।"

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে আলো নিভিয়ে বিশ্বনাথ শুয়ে পড়ল। ভোর রাত্রের দিকে হঠাৎই তার ঘুম ভেঙে গেল। জানলার বাইরে কীসের যেন একটা শব্দ। কিছু একটা দিয়ে মাটিতে আঘাত করার মত ধস্ ধস্ ধস্ হয়ে চলেছে।

প্রথমেই তার মনে হল চোর! ভয়ে সে কিছুক্ষণ সিঁটিয়ে রইল। মিনিট কয়েক পর, শব্দটা থেমে গেল। বিশ্বনাথ ভাবে, একবার উঠে জানলাটা খুলে দেখবে কি না। বিছানায় উঠে বসতেই শব্দটা আবার শুরু হল আর সেইসঙ্গে জোরে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ। কোনো মানুষই হবে তবে চোর নয়।

অন্ধকারে পা টিপে জানলায় এসে সন্তর্পণে একটা পাল্লা সে ইঞ্চি চারেক ফাঁক করল। দূর থেকে রাস্তার আলোয় অন্ধকারটা ঈষৎ ফিকে। বিশ্বনাথ চোখ সইয়ে নিতে কিছুটা সময় নিল। জানলার পাশেই গেঞ্জি ঢাকা একটা পিঠ। কেউ উবু হয়ে বসে। হাতে শাবলের মতো একটা কিছু তাই দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে।

এত রাতে, এখানে, এমন কাজে ব্যস্ত হল কে? তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিশ্বনাথ প্রায় বলে ফেলেছিল, "কী কচ্ছেন আপনি?" তার বদলে সে বিস্ফারিত চোখে বুড়োর দিকে শুধু তাকিয়ে রইল।

হাঁটু গেড়ে বুড়ো এবার দু-হাত দিয়ে গর্ত থেকে মাটি তুলছে। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়া দেহ থেকে বিশ্বনাথের মনে হল গর্তটা হাত খানেক গভীর। মাটি তোলার সঙ্গে রয়েছে হাঁপ ধরার শব্দ। কিছুক্ষণ ধরে গর্ত খোঁড়া ও মাটি তোলা চলল। বুড়ো তারপর শাবলটা মাটিতে রেখে ব্যস্তভাবে জানলার সামনে চলে গেল। বিশ্বনাথ ভাবল, বাইরে বেরিয়ে কী দেখে আসবে, বুড়ো এতরাতে গর্ত খুঁড়ছে কেন?

ইতঃস্তত করে অবশেষে অন্ধকার ঘরে থেকে সে দালানে বেরিয়ে আলো জ্বেলে শম্পাকে দেখে নিয়েই নিভিয়ে দিল। বাইরে দরজার খিল নিঃশব্দে নামিয়ে পাল্লাটা খুলতে যাবে তখনই নাক লাগল একটা মাংসপচা গন্ধের এগিয়ে আসা। বিশ্বনাথ অপেক্ষা করল দরজার ফাঁকে চোখ রেখে। একটা পুঁটুলি বুকের কাছে দুহাতে ধরে বুড়ো তার সামনে দিয়ে চলে গেল। পুঁটলিটা থেকে ঝুলছে একটা লোহর শিকল যেটাকে সে চেনে। বিশ্বনাথ পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে এসে খাটে শুয়ে পড়ল। জানলার বাইরে মাটি থাবড়ানর শব্দ হচ্ছে এবং সেটাও একসময় থেমে গেল। তার আর ঘুম এল না।

সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। জানলার ফাঁক করা পাল্লা দুটোর মাঝে ধূসর রেখাটি একটু উজ্জ্বল হতেই বিশ্বনাথ বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়িটা ঘুরে ঘরের জানলার কাছে এসে দেখল হাত দুয়েক লম্বা জায়গাটার মাটির রং গাঢ়। ওখানে গর্ত খুঁড়ে আবার তা বুঁজিয়ে ফেলা হয়েছে। আলগা মাটির উপর পায়ের ছাপ! পা দিয়ে চেপে মাটি বসানো হয়েছে। জায়গাটা কচ্ছপের পিঠের মতো ঈষৎ উঁচু তবে চোখে পড়ার মতো নয়। বৃষ্টি আর রোদ একসময় এটাকে সমান করে দেবে।

বিশ্বনাথ একদৃষ্টি ফুচার কবরের দিতে তাকিয়ে একটা স্বস্তি, ভোরের বাতাসের

মতো তার চেতনার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বুড়ো কেন যে এমন একটা কাণ্ড করল সেটা কোনদিনই জানা যাবে না। চিরকাল এটা রহস্যই থেকে যাবে। ফুচা আর বুড়োর সম্পর্কটা এই মাটির নিচেই বরং রয়ে যাক। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে চমকে উঠল। ওটা কী? কবরের মাটির মধ্যে থেকে ওটা কী বেরিয়ে? সে ঝুঁকে পড়ল।

ফুচার চেইনের একটা প্রান্ত সে দেখতে পেল। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুড়ো বোধহয় দেখতে পায়নি চেইনটা পুরোপুরি মাটির নীচে চাপা পড়েনি। আঙুলে করে তুলে নিয়ে চেইনটায় অল্প টান দিতেই বিশ্বনাথের মনে হল এটা এখনও ফুচার গলায় বাঁধা রয়েছে। অদ্ভুত একটা আতঙ্ক তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করল। চেইনটা হাত থেকে ফেলে দিতে গিয়ে তার মনে হল এটা তার আঙুলের সঙ্গে আটকে গেছে, হাজার চেষ্টা করলেও সে আঙুল থেকে ছাড়াতে পারবে না। সারাজীবন ফুচা তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে, কিন্তু কোথায়?

বাবানের জন্য, তনুর জন্য তার চোখ জলে ভরে উঠল। চেইনটা নরম মাটির মধ্যে চেপে বসিয়ে সে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। ওরা যেন কখনও জানতে না পারে এখানে ফুচা রয়েছে।

ঘরে ফিরে আসার সময় বিশ্বনাথ মুখ তুলল। বারান্দায় বুড়ো চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে সামনের দেয়ালটা দেখছে। □

মৃত্যুভূমি

সু কা ন্ত চ ট্টো পা ধ্যা য়

এই তাহলে ছকাঠা জমির ওপর পাকা বাড়ি! ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘড়ি দেখবার উপায় নেই। বুক সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চারদিকটা। রং-করা টিনের একটা গেট, সেখানে কয়েকটা জোনাকি এলোমেলো উড়ছিল। সমীর শেষ ঘড়ি দেখেছিল বাসে, গড়িয়া ব্রিজের ওপর। প্রবল এক জ্যামে প্রায় মিনিট চল্লিশ আটকে ছিল বাসটা। সাড়ে পাঁচটা বাজে তখন, বিকেল মরে এসেছে প্রায়, তবু ঘড়ি দেখবার মতো আলো ছিল আকাশে।

এখন তাহলে ক-টা হবে? সাতটার কাছাকাছি? ভেতরে একটু তাড়া বোধ করছিল সে। এ অঞ্চলের যানবাহনের খবর ভালো জানা নেই তার, সত্যি বলতে কি আজই প্রথম এ দিকটায় আসা। বাড়ি ফেরার পথটা চকিতে একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাস বা অটোয় গড়িয়া, সেখানে বাস পালটে হাওড়া, তারপরে ট্রেনে আন্দুল। স্টেশন থেকে মিনিট দশেক হেঁটে তবে তার দুইল্যার দু-ঘরা ভাড়াবাড়ি।

আশপাশের জমাট অন্ধকারের রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে কাছাকাছি অমাবস্যা। সমীর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার ওধারে ক্লাবঘরটা দেখবার চেষ্টা করল। প্লাস্টারহীন চালের ক্লাবঘরটা অন্ধকারের পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে কখন, দেখা গেল না। তবে গাছটা চিনতে পারল। মোড়ের মাথায় বাস থেকে নেমেই সে একটা পানের দোকানে জিজ্ঞেস করেছিল। এসব পাড়াগাঁমতো ছোটোখাটো জায়গায় সবাই সবাইকে চেনে। সমীর জানে। পান-দোকানি বলেছিল, সোজা গিয়ে হাতের ডানদিকে একটা পুকুর পাবেন, তার পরেই ক্লাবঘর। তরুণ সঙ্ঘ। উল্টোদিকের বাড়িটা, দেখবেন সামনে একটা বেলগাছ আছে...

বেলগাছ কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে বেশ ঝাঁকড়া। অন্ধকারে বাড়িটার হতশ্রী ভাব টের পাচ্ছিল সে। দেখা যাচ্ছে না কিছুই, একটা ঘ্রাণই কি পাওয়া যাচ্ছে তবে? নইলে 'খণ্ডহর' শব্দটা মনে আসবে কেন? গেটের কাছটায় ঝোপজঙ্গল হয়ে আছে, মানকচুর বড়ো বড়ো পাতা শেষ নভেম্বরের চোরা হাওয়ায় চামরের মতো দুলছিল। বুকের ভেতরে একটা শিরশিরানি টের পেল সমীর। একটু শীতও অনুভব করছিল সে। কচি কলাপাতা রংয়ের হাফ সোয়েটারটা বকসখাটের গহ্বর থেকে কদিন আগেই বের করে রেখেছিল আরতি। বেরোবার সময় আজও আনতে ভুলে গেছে। বেলগাছের ডাল থেকে নাকি ওই বাড়ির ভেতর থেকেই কে জানে একটা তক্ষক ডেকে উঠল —টক্ কো.....টক্ কো...

বার কয়েক ডেকেই চুপ মেরে গেল তক্ষকটা। প্রায় পঁচিশ বছর পর ডাকটা শুনল সমীর। ভারী অবাক কাণ্ড! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। পঁচিশ বছর মানে তো দুই যুগের ওপর! এরই মধ্যে এতগুলো বছর চলে গেল কী করে? একাত্তর সালে রাজাকারদের

তাড়া খেয়ে কুমিল্লা থেকে পালিয়ে এসেছিল। কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরা। যুদ্ধের পর ফিরেও গিয়েছিল কুমিল্লায়। তখন চারদিকটা একেবারে ফাঁকা! কোন দুঃখে ফিরে এসেছিল আবার, সেকথা কাউকে বলা যাবে না কোনওদিন। তারপর চাকরি-বাকরি। বিবাহ। সন্তান। এসব আর এক কাহিনি। এখন আবার একটা বাড়ির খোঁজে এল এতদূর। পঁচিশ বছর আগে তার বয়স ছিল তেইশ, ঢাকার জগন্নাথ হল থেকে সবে এম এ করে বেরিয়েছে। ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি, ছুতোর মিস্ত্রির বাটালির মতো ধারালো। কপালঢাকা চুলের ঘন বুনোট, কুচকুচে কালো। চোখের সাদা অংশে তখনও হলদে ছোপ পড়েনি। ছোড়দি বলত, তোকে একদম ডাকাতের মতো দেখতে, সমু!

আঃ ছোড়দি? ছোড়দিকে যখন টেনে হিঁচড়ে মিলিটারি জিপে তোলা হচ্ছিল তখন শুধু তার নাম করেই চেঁচাচ্ছিল, সমু! সমু!

ভেতরের ঘরে অন্ধকার মেঝেয় সমীর তখন পাথরের মতো বসে। ছোড়দি বেঁচে আছে কি এখনও? এই মহাপৃথিবীর কোথাও? সমীর তো আর খোঁজ করেনি তার। ছোড়দির কথাটা ভোলবার জন্যে অন্ধকারেই দু'পা এগিয়ে গিয়ে গেটের কড়া নাড়ল সে। ঘাড় উঁচু করে পাঁচিলের ওপর দিয়ে বাড়ির ভেতরটা পরখ করে নেবার চেষ্টা করছিল সমীর। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না কিছুই, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ভেতরে বাগান মতো আছে একটা। সেটা পেরিয়ে তবে দালান হবে হয়তো, অনেকখানি জায়গা জুড়ে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। বেশ বড়োই বাড়িটা। কাগজের বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, ছ কাঠার ওপর পাকা বাড়ি। গড়িয়া ব্রিজ থেকে বাস, অটো, দশ মিনিট।

কড়া নাড়ার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। সমীর উঁচু হয়ে দেখল আবার, এই সন্ধেরাতেই সব দরজা-জানালা বন্ধ। আলোর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। অথচ এ পাড়ায় আলো আছে সব বাড়িতেই। একটু আগেই পুকুরের ওপারে একটা বাড়ির গেটে আলো জ্বলতে দেখেছে সে। লোকজন কেউ নেই নাকি বাড়িটায়? তারস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। টর্চটা নিয়ে বেরোনো উচিত ছিল। মনেই থাকে না আজকাল কোনও কিছু। আরতির পেড়াপীড়িতেই আসা। বাড়িঘর জমিজমা এসব কি কেউ রাতের অন্ধকারে দেখতে বেরোয়? অবশ্য এখন তো ঠিক রাতও নয়, সবে সন্ধে হল বলা যায়। আকাশে একটি-দুটি করে তারা ফুটে চলেছে এখনও।

ভেতরে খুক্ করে কেউ কেশে উঠল কি? সামনের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল সমীর। নাঃ, আর কোনও শব্দ নেই। বিজ্ঞাপনে বকস-নম্বর নয়, পরিষ্কার নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল। শ্রীসুধীর চন্দ্র বিশ্বাস। সারদা পল্লী। পোঃ নরেন্দ্রপুর। দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

জোরে কড়া নেড়ে সমীর এবার ডাকল, কেউ আছেন? কেউ আছেন ভেতরে? উত্তরের জন্যে কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার কড়া নাড়ল। টিনের পুরনো গেটটা থেকে কর্কশ একটা শব্দ উঠছিল। ঝিঁঝিগুলো চুপ মেরে গেল।

কে? কে ওখানে?

দূরাগত একটা গলার শব্দ পেয়ে সমীর থামল। ভেতর থেকেই আসছে শব্দটা। দালানের আলোটা জ্বলে উঠল এবার। সেই আলোয় সমীর দেখল গেট থেকে একটা

বাঁধানো পথ দালানের সিঁড়ি পর্যন্ত গেছে। পথের দুদিকে আগাছার ঝোপ হয়ে আছে। বোধহয় বাগানই ছিল এককালে। গ্রিলঘেরা বারান্দায় দাঁড়ানো বছর পঞ্চান্নর একটা মানুষকে দেখতে পাচ্ছে এখন সে। দূর থেকেও লোকটার শক্ত-সমর্থ চেহারা, কালো ফ্রেমের চশমা, মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল সমস্ত দেখা যাচ্ছিল। লোকটার বয়স কি আরও বেশি হতে পারে?

সমীর চেঁচিয়ে বলল, আমি বাড়ির ব্যাপারে এসেছিলাম। আপনারা কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন.....

লোকটা ভুরু কুঁচকে বেশ বিরক্ত গলায় বলল, বিজ্ঞাপনে তো আমাদের টাইম দেয়া ছিল। সকাল দশটা থেকে বারোটা। এখন এই অন্ধকারে কী করে বাড়ি-ঘর দেখবেন? আমার লোকজন কেউ নেই।

সমীর প্রমাদ গুনছিল। এতদূর এসে যদি ফিরে যেতে হয়? টাইম দেয়া ছিল নাকি? হয়তো ছিল। সমীর খেয়ালি করেনি। আরতিরও চোখ এড়িয়ে গেছে। এত সস্তায় একটা পুরো বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে— সেকথাই ভাবছিল তখন দুজনে। রোববারের কাগজে বাড়িঘর সম্পত্তির কলাম থেকে আরতিই বিজ্ঞাপনটা খুঁজে বার করেছিল প্রথম। শুনে সমীর বলেছিল, গড়িয়া ব্রিজ থেকে অটোয় দশ মিনিট মানে জায়গাটা কোথায় হতে পারে চিন্তা করে দেখেছ? নরেন্দ্রপুর-ফরেন্দ্রপুর ছাড়িয়ে চলে যেতে হবে মনে হচ্ছে।

তা হোক। তবু তো নিজের একটা কিছু হবে। বাচ্চাটার ভবিষ্যত নিয়ে ভাব কখনও? তাছাড়া গড়িয়াহাট দক্ষিণাপন এসব কত কাছে হবে বল।

গড়িয়াহাট জায়গাটার প্রতি মেয়েদের একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ থাকে। সমীর দেখেছে। তাছাড়া আরতি খাস দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে। কাকুঁলিয়া রোডে ওদের দুই পুরুষের ভাড়া বাড়ি। মুরলীধর থেকে বি.এ করেছিল। বিয়ের পর দুইল্যায় এসে প্রথম প্রথম খুব মননরা হয়ে থাকত। সন্ধের পর একেবারে নিঝুমপুরি। রাস্তায় আলো নেই। কুণ্ডুবাগানের শেয়ালগুলো এক একদিন একেবারে বাড়ির সামনে উঠে এসে ডাকত।

কিন্তু এই অজ জায়গা খাস কলকাতার মেয়ের কেমন লাগবে? উত্তুরে হাওয়ায় বেলের পাতা ঝরে পড়ছিল অন্ধকারে। এখন তো পাতা ঝরারই সময়। চারদিকে অবিরল পতনের শব্দ শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সমীর। কুমিল্লায় ঠাকুর পাড়ার বাড়িতে সন্ধেবেলায় এরকমই অন্ধকার নেমেছিল সেদিন। ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল। ঘরের ভেতর দরজা-জানালা বন্ধ করে ওরা দু-ভাইবোন, বাবা-মা। সকালবেলায় দেশওয়ালি পট্টি থেকে ছোটো পিসেমশাই খবর দিয়ে গেছেন, ধীরেন দত্ত এবং তাঁর ছেলে পল্টুকে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেছে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টে। সারা দেশে আরও ভয়ংকর একটা কিছু ঘটতে চলেছে। আরও লোকক্ষয় অনিবার্য।

বাবা বলেছিলেন, আরও ক-টা দিন দেখি, নির্মল। এই বয়সে কোথায় আর যাব।

তাইলে আপনে থাকেন, জামাইবাবু। ছেলেমেয়ে দুইটারে আটকাইয়া রাইখেন না, আমরার লগে দিয়া দেন। বিবির বাজারের পথটা খোলা আছে এখনও, কুন সময় আবার মিলিটারি আইয়া বন্ধ কইরা দিব তার ঠিক নাই। আইজ রাইতেই যাত্রা করুম ঠিক করছি। দালালও ধরা আছে। ঠাকুরের ইচ্ছায় কুনো রকমে আগরতলা পৌঁছাইতে পারলে হয়।

মা বলেছিলেন, তাই ভালো। যাউক গিয়া অরা। আমরা বুড়াবুড়ি, আমরারে কে আর কী করব?

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বাবা বলেছিলেন, কত ঝড়ঝাপটা গেল, দেশ ছাড়লাম না। ফিফটি টুতে দাদা চলে গেলেন কলকাতায়, আমি রইয়া গেলাম। জন্মভূমি বলে কথা। সিক্সটিফাইভের ওয়ারের পর বাড়ির অর্ধেক এনিমি প্রোপার্টি হইয়া গেল। তবুও রইলাম। এখনও দেশত্যাগ করার কথা ভাবি না, নির্মল।

যাইক, আমার কওয়ার কথা কইলাম। পরে আর আমার দোষ ধরবেন না যেন, জামাইবাবু!

বাবা তখনও হাসছেন, তিরিশ বছরের ওপর এই শহরে মাস্টারি করছি, নির্মল। চারদিকে আমার কত ছাত্র আছে, জান?

ছাত্ররা আইসা বাঁচাইব? ধীরেনবাবুরে বাঁচাইল কেউ?

তিনি রাজনীতির লোক, তাঁর কথা আলাদা

সেদিনই সন্ধেবেলায় একটা মিলিটারি জিপ এসে থেমেছিল বাড়ির সামনে। সদরের কড়া নড়ে উঠেছিল, পরিষ্কার বাংলায় কেউ ডাকছিল, স্যার! স্যার!

কে? কে ডাকে?

আমি! আমি, স্যার। আপনার ছাত্র।

একটু দাঁড়াও, বাবা। আসছি।

কাঁপা কাঁপা গলায় কথাটা বলে বাবা এগিয়ে যাচ্ছেন দরজা খুলতে। ঘরের বাকি তিনজন তখন পাথরের মতো নিশ্চল।

সমীরের স্পষ্ট মনে আছে।

কোত্থেকে আসছেন আপনি? সুধীরবাবু বললেন।

হাওড়ার দুইল্যা, আঁদুলের কাছে।

ওবাবা, সে তো অনেকদূর!

ভদ্রলোক কী ভাবলেন খানিক, তারপর বললেন, ঠিক আছে। আসুন। গেট খোলাই আছে, ন টার দিকে বন্ধ করি। একটু জোরে ঠেলুন।

জোরে ঠেলতেই কর্কশ শব্দে গেটটা খুলে গেল। সুধীরবাবু গ্রিলের তালা খুলছিলেন। বাগানটায় সাপখোপ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। টর্চটা সঙ্গে থাকলে ভালো হত। সমীর মনে মনে হিসেব কষে দেখল তিনটের মধ্যে টুক করে অফিস কেটে বেরিয়ে যেতে পারলে সাড়ে চারটের মধ্যে এ জায়গা পৌঁছে যাওয়া কঠিন নয়। বেরোতেই আজ দেরি হয়ে গেল। তার ওপর গড়িয়া ব্রিজের ওপর ওই জ্যাম।

বারান্দায় উঠতেই সুধীরবাবু গ্রিলের তালা বন্ধ করে দিলেন আবার। বিশাল টানা বারান্দা, সবটাই গ্রিলে ঘেরা। আজকাল এতবড়ো বারান্দা কেউ রাখে না, স্পেস নষ্ট। আরতি শুনলে খুশিতে লাফাবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিকটা সম্পর্কে একটা ধারণা করবার চেষ্টা করছিল সমীর। ছ-কাঠাই বটে। তবে বাড়িটা বেশ পুরনো। বারান্দার লাল মেঝে দেখে বাড়িটার বয়স অনুমান করবার চেষ্টা করছিল সে। বছর পঞ্চাশ তো বটেই। তার বেশি হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

আসুন। জুতো নিয়েই চলে আসুন। সুধীরবাবু বললেন।

বসবার ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছিল। দরজার পাশে সুইচবোর্ডে হাত বাড়িয়ে সেটা অফ করে টিউবলাইট জ্বালালেন সুধীরবাবু। তাতে ঘরের ভেতরকার ভুতুড়ে ভাবটা কাটল। একটু হেসে সুধীরবাবু বললেন, বসুন। আপনাকে কিন্তু চা খাওয়াতে পারব না, আমার কাজের লোক বিকেল পাঁচটায় কাজকর্ম সেরে চলে যায়। তারপর আর আমার বাড়িতে উনুন জ্বলে না।

পুরনো আমলের সোফা, বেশ নরম। বসতেই প্রায় ডুবে যাচ্ছিল সমীর। দু-হাত দুদিকের হ্যান্ডেলে রেখে একটু চাপ দিয়ে ভেসে উঠে অপ্রস্তুত গলায় বলল, না না, তাতে কী? তা ছাড়া চা আমি বিশেষ খাইও না। দু বেলা দু কাপ।

মিথ্যে কথাটা বলে ফেলে সমীর ভাবছিল, এতবড়ো বাড়িত লোকটা একা থাকে নাকি? বউ মরে গেছে? নাকি বাপের বাড়ি গেছে?

উল্টোদিকের সোফায় বসে সুধীরবাবু তখন সমীরকে মাপছেন। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল সমীরের। বিজ্ঞাপনে কত যেন দাম লেখা ছিল বাড়িটার? দু-লাখই তো? এসব দিকে জায়গার দাম কি খুব সস্তা? দুইল্যায় ছ-কাঠা জমির দামই দু-লাখের ওপর হবে। তার ওপর ওপর এতবড়ো একটা বাড়ি। হোক না পুরনো।

কুমিল্লার ঠাকুর পাড়ার বাড়িটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এরকমই তো ছিল সে বাড়ি। আবার সেই তক্ষকটার ডাক ভেসে আসছে, টক্ কো.....টক্ কো.... কুমিল্লার বাড়ির গেটের কাছে ছিল প্রকাণ্ড এক আমলকি গাছ,এই তক্ষকটাই বোধহয় গত জন্মে তার ডাল থেকে একই সুরে ডাকত, টক্ কো.....টক্ কো!

ভয়ংকর সেই সন্ধেবেলায়ও বোধহয় ডেকেছিল। দরজা খুলে বাবা বেরোচ্ছেন. পেছনে মা। স্যুইচ টিপে বারান্দায় আলো জ্বেলেছেন সবে, উঠোনে দাঁড়িয়ে কে একজন ডাকল, আসুন, স্যার। বাইরে আসুন একবার।

ভেতরের ঘরে দরজার আড়ালে দুই ভাইবোন, বারান্দার থামের আড়াল থেকে মা বললেন, বড্ড অন্ধকার। সাবধানে যাও।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে মানুষগুলোকে ভালো দেখা যাচ্ছে না, বললেই,কী চাই, বাবা, তোমাদের?

আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে, স্যার, আপনাকে!

আমার তো শরীর ভালো নাই, তাছাড়া চোখেও ভালো দেখি না আজকাল। মিলিটারি জিপ থেকে নেমে তখন সাক্ষাত এক যমদূত মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, মুহূর্তেই সচল হয় তার হাতের স্টেনগান —ট্যাট্........ট্যাট্............ট্যাট্.....ট্যাট্। গুলিতে ঝাঁঝরা শরীরটা লুটিয়ে পড়ছিল মাটিতে। মা বোধহয় তখন আর্ত চিৎকার করে ছুটে যাচ্ছিলেন উঠোনে। আবার শব্দ হয় ট্যাট্......ট্যাট্.........ট্যাট্!

ভেতরের ঘরে ছোড়দির হাত চেপে ধরে মেঝেয় বসে পড়েছিল সমীর। পাগলের মতো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছোড়দি বেরিয়ে গেল উঠোনে। না, আর কোনও গুলির শব্দ হয়নি। মিলিটারি জিপে টেনে তোলার সময় ভাঙা বিকৃত গলায় ছোড়দি তখন প্রাণপনে চেঁচাচ্ছে, সমু! সমু! সমুরে!

ভাগিস্য বড়দি তখন বেঁচে নেই। বিয়ের পর কী এক রহস্যময় অসুখে মৃত্যু হয়েছিল তার। মৃত্যুর আগে শরীরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, শ্বশুরবাড়িতে কোনও চিকিৎসা হয়নি। বেঁচে থাকলে তারও কি ওই অবস্থা হত? ছোড়দির মতো? ভেতরের ঘরে সমীর কি তখন সত্যি সত্যি বেঁচে ছিল। তেইশ বছরের সুঠাম যুবক? অবশ শরীর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর বেঁচে থাকবার তীব্র লোভে কখন অন্ধকারেই উঠে ছুটতে শুরু করেছিল সে। তাড়া খাওয়া জন্তু যেন। তারপর কোথা দিয়ে কী করে একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। কুমিল্লা থেকে সোনামুড়া, সেখান থেকে আগরতলা। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে একদিন কলকাতা।

আর দেরি করে লাভ নেই। রাত হয়ে গেলে আপনার ফেরার অসুবিধে হবে।

বলে সুধীরবাবু উঠলেন। কাঠের আলমারি থেকে টর্চ বার করে বললেন, চলুন, দেখবেন।

উঠে দাঁড়িয়ে সমীর বলল, চলুন। এই অসময়ে এসে খুব অসুবিধেয় ফেললাম আপনাকে। আসলে গড়িয়া ব্রিজের ওপর জ্যামে আটকে ছিলাম অনেকক্ষণ, তাইতেই......

সুধীরবাবু সমীরের কথা শুনছেন কিনা বোঝা গেল না, একটু অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। ভেতরের বারান্দায় এসে আলো জ্বেলে বললেন, ড্রইংরুম ছাড়াও দুটো বড়ো বেডরুম রয়েছে, বারো বাই চোদ্দ। তবে কিচেন বাথরুম অ্যাটাচড নয়।

টর্চের আলো ফেলে আগাছাভরা উঠোনের দুদিকে কিচেন আর বাথরুম দেখিয়ে একটু হাসলেন, আমার স্ত্রী গত হবার পর থেকে অবশ্য কিচেনের পাট উঠে গেছে। বছর দুই খালি পড়ে আছে। একটু রিপেয়ার-টিপেয়ার করিয়ে নিতে হবে। আমার কাজের লোক বারান্দাতেই দুটি ভাত ফুটিয়ে দিয়ে যায়।

বারান্দার কোণে আলো পড়েছে। সেখানে একটা জনতা স্টোভ রাখা আছে। হাঁড়ি-কুড়ি সব গুছোনো, ঝকঝকে করে মাজা। তার মানে, এরই মধ্যে রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?

চলুন, আপনাকে ছাদটা দেখিয়ে দিই।

বলে বারান্দার কোনে ছাদের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন সুধীরাবুব। টর্চের আলো ফেলে দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, আপনার আগে আরও ছটা পার্টি বাড়িটা দেখে গেছে। আসলে সস্তা দেখেই কিনতে চাইছে সবাই। দু-লাখ তো কোনও দামই নয়, বলুন?

ছাতে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখতে দেখতে সমীর বলল, তা ঠিক।

সুধীরবাবু যেন আপনমনেই বললেন, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে দূর বিদেশে, ছেলের কাছে। আর কোনওদিন হয়তো ফেরা হবে না এখানে। ছেলে বাড়ি করেছে আমেরিকায়, শারলোট নামে একটা ছোট্ট শহরে। সেখানে রয়েছেন মেমসাহেব বউমা, দুটি নাতি-নাতনি। অনেক দিন ধরেই লিখছিল।

উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা একটা হাওয়া এল। দুজনেরই বেশ শীত করছিল সমীর বলল, আপনারা কি এদেশেরই লোক?

হ্যাঁ। এখানেই আমাদের জন্মকর্ম। আপনি?

উদ্গত একটা নিঃশ্বাসকে হাওয়ায় গোপনে মিশিয়ে দিয়ে সমীর বলল, আমাদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। কুমিল্লায়।

মনে মনে সমীর ভাবছিল, দেশ মানে কী? বাড়িঘর, জমিজমা, নদী, পুকুর, পশুপাখি? দেশ মানে তো মানুষও। মানুষই যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে কি দেশ বলতে আর কিছু থাকে? একটা দেশের জন্যে রক্ত ঝরিয়েও তো তার মা, বাবা, ছোড়দি, ধীরেন দত্ত, পল্টু—এরা সব মুছে গেছেন সে দেশের স্মৃতি থেকে। কেউ বলে না আর তাঁদের কথা। ভুলে গেছে সবাই।

আকাশে অনেক তারা ফুটেছে। বাগানের দিক থেকে আগাছার ঝাঁঝালো একটা গন্ধ উঠে আসছিল। উদাস গলায় সুধীরবাবু বললেন, আপনাকে আমার পছন্দ হয়ে গেচে। বাড়ি আপনিই পাবেন। তবে টাকাটা আমার ক্যাশ চাই। কিছু দায়-দায়িত্ব আছে, সেগুলো মিটিয়ে যেতে হবে।

বলতে বলতে কথার মাঝখানে চুপ করে গেলেন। সমীর মনে মনে দু-লাখের হিসেব কষছিল। আরতির সোনার গয়না, জমানো যা আছে ব্যাংকে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ধার—সব মিলিয়ে লাখ খানেক হতে পারে। বাকি এক লাখ এইচ ডি এফ সি লোন দেবে কি?

দূরাগত একটা ট্রেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। শব্দটা কাছাকছি এগিয়ে এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল ধীরে। সমীরের দিকে ফিরে হঠাৎ সুধীরবাবু বললেন, এই যে পিতৃপুরুষের দেশ, ভিটেমাটি — এসব ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁই চলে যাচ্ছি তাতে আমার কোন রি-অ্যাকশন হচ্ছে না, জানেন। আমার আজকাল খুব মনে হয় দেশ মানে জন্মভূমি নয়, মৃত্যুভূমি! আসলে কি জানেন, মৃত্যুভূমিটাই রিয়েলিটি। জন্মভূমি হচ্ছে ইমাজিনেশন। নস্টালজিয়া।

বলে হাসলেন। যুদ্ধের পর কুমিল্লার বাড়িতে ফিরে গিয়ে সমীর দেখেছিল, সামনের আমলকি গাছটা নেই। কারা যেন কেটে ফেলেছে। পুরনো গেটটা নেই, শক্তপোক্ত গ্রিলের গেট বসেছে একটা। একপাশে কলিংবেলের বোতাম। বোতাম টিপতেই ভেতর থেকে লুঙ্গিপরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, কাকে চাই?

সমীর কী বলবে? সে তো কাউকে চায় না। নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল সে।

চলুন, নীচে নামা যাক।

সুধীরবাবু বললেন। টর্চের গোল আলো সিঁড়ির দিকে ফেলেছেন। সমীর কী ভেবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তার অন্ধকার মৃত্যুভূমি আর একবার দেখে নিয়ে বলল, চলুন।

নিষিদ্ধ ধর্ম

দে ব র্ষি সা র গী

নৌকো থেকে শীর্ণ, বালিময় নদীটির তীরে নেমে শেষ রাতের প্রাচীন শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, আমার কোনও স্বপ্নই বুঝি আমাকে এখানে টেনে এনেছে, নৌকোটা নয়। রাস্তার দুদিকে দাঁড়ানো বড়ো বড়ো পাথুরে বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে শহরের ভেতরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আকাশে যে থমথমে চাঁদ জ্বলছিল তার আলোয় এই বাড়িগুলোকে আরও প্রাচীন, আরও ভারী ও অভিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছিল। শুনেছি (এটা বাস্তবে, স্বপ্নে নয়) এখানে প্রায় দেড়শ বছর আগে এমন একজন জন্মেছিলেন এবং বছর তিরিশ বেঁচেছিলেন, যিনি ঈশ্বর কোথায় উপস্থিত না বুঝিয়ে ঈশ্বর যে কোথাও অনুপস্থিত নন সেটা বোঝাতেন। তাঁর ওরকম যুক্তিতে জগতের সমস্ত উপাসনালয়ই অর্থহীন হয়ে যায়। সেটাই হল। এবং ক্ষিপ্ত শাসক ও মৌলবাদীরা তাঁকে প্রাণদণ্ড দিল।

রাস্তার দুদিকে মাঝেমাঝে কিছু উপাসনালয়ও চোখে পড়ছিল। আমি অভিভূত হয়ে সেগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। এদের উঁচু, অলংকৃত, জটিল ও বিস্ময়কর স্থাপত্য দেখলে মনে হয় জগতে ঈশ্বরকে থাকার জায়গা নির্মাণ করে দিয়ে মানুষ তার ঈশ্বরীয় স্থাপত্য প্রতিভারই বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষের থাকার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন একটা গোটা গ্রহ। আর ঈশ্বরের থাকার জন্য মানুষ সৃষ্টি করল এইসব আশ্চর্য অট্টালিকা, যা আসলে এক-একটা গ্রহের মতই। প্রতিটি উপাসনালয়কেই আমার এক একটা গ্রহ, এক একটা স্বাধীন জগৎ বলে মনে হয়। সিলিংগুলোকে মনে হয় আকাশের মতো উঁচু। এবং আকাশের চেয়েও বেশি বৈচিত্রময়। এটা সৌভাগ্যের যে উপাসনালয়ের বাইরে ঈশ্বরকে খোঁজার জ্ঞানটা মানুষের হয়েছে অন্বেষণের অনেক পরের দিকে। যদি গোড়াতেই সে এই জ্ঞানটা লাভ করত তবে জগৎ এরকম আশ্চর্য স্থাপত্য থেকে বঞ্চিত হত।

অনেকটা হাঁটার পর চোখে পড়ল কিছু দূরে এক বৃদ্ধ হেঁটে যাচ্ছে। হয়তো রাত গভীর থাকতেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। একটা গলি দিয়ে একটু দ্রুত এগিয়ে আমি তাঁকে ধরলাম।

'আমি একজন বিদেশি', তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম। 'এই শহরে এসেছি একজনের গল্প এখানকারই কোনও মানুষের মুখ থেকে একটু শুনব বলে। তাঁর খ্যাতি আমাদের দেশেও বিস্তৃত। এবং শুনেছি পৃথিবীর আরও অনেক দেশে। যাঁর কথা বলছি তিনি মাত্র তিরিশ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু ওটুকু বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন এমন এক সত্যকে, যার জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হয়।'

আমার কথা শেষ হওয়ার পর বৃদ্ধ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। দাড়ি ও গোঁফে তাঁর মুখটা পাথুরে মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল। তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে রাস্তার দুদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'যাঁর কথা তুমি বলছ তাঁর সম্পর্কে আলোচনাও নিষিদ্ধ এখানে। আলোচনা করলে প্রাণদণ্ড হয়। হয়তো গোপনে আলোচনা হয়। সেরকম অবশ্য শুনি।'

'আমরাও নাহয় গোপনেই একটু কথা বলি, যদি অবশ্য দয়া করে আপনি রাজি হন,' আমি বললাম অনুনয়ের ভঙ্গিতে।

'তাতেও ঝুঁকি আছে। শাসকের টহলদার সৈনিকেরা শুনে ফেলতে পারে।'

আমি চুপ করে থাকি। আমার জন্য বৃদ্ধের বিপদ ঘটুক সেটা কী করে চাইতে পারি।

'প্রাণদণ্ডের কথা অবশ্য বেশি না ভাবাই ভালো,' হঠাৎ হেসে তিনি বললেন। 'কারণ মৃত্যু আসার পথ আরও অনেক আছে।'

আমাকে অনুসরণ করতে বলে কয়েকটা জটিল অলিগলি দিয়ে হেঁটে বৃদ্ধ নিজের বাড়ি এলেন। একা থাকেন। জানালেন বিয়ে করেননি। বসার ঘরটা সাদামাঠা, চেয়ার-টেবিল ছাড়া একটা প্রকাণ্ড ফুলদানি। উল্টোদিকের দেওয়ালে ঝুলছে সিরামিকের একটা ডিশ, যার গায়ে আমার অজানা ভাষায় একটা বাক্য নকশা করা লিপিতে লেখা।

'এরকম সংক্ষিপ্ত বাক্যে সাধারণত একটা কবিতাই লেখা হয়, কিন্তু এই ডিশটার বাক্যটিতে লেখা হয়েছে একটা গল্প', আমার কৌতূহল দূর করতে বৃদ্ধ বললেন।

আমি চুপ করে থাকলাম।

'গল্পটা এই', তিনি বললেন, 'এবং তারপর লুকোচুরি খেলবেন বলে তিনি তাঁর প্রতিযোগীর শরীরের ভেতরেই লুকিয়ে পড়লেন'।

জানলা দিয়ে একঝলক ঠান্ডা বাতাস ঢুকল, যদিও ভোর হতে এখনও দেরি। চারপাশ নিস্তব্ধ।

'বাইরে কোনও লোকের কাছে তাঁর সম্পর্কে এই প্রথম আমি কিছু বলছি', বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন, জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে। 'অবশ্য আমাকে বলতে বলে ভালোই করেছ। কারণ, আমার পূর্বপুরুষেরা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছে। তারপর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গোপনে তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। সেই প্রজন্ম আবার তার পরের প্রজন্মকে। আমিও শুনেছি আমার বাবার কাছে। বিয়ে করিনি বলে আমার কোনও ছেলেপিলে নেই। তাই তোমাকে বলতে পেরে আমার মনে হচ্ছে আমি আমার ছেলেকেই বলছি। তাঁর কথা শোনাতে রাজি হয়ে তোমার অনুরোধ আমি রাখলাম। তোমার কাছে আমারও একটা অনুরোধ আছে। সেটা হল, আমার কাছ থেকে শুনে তোমাদের দেশে তুমিও অন্যদের বলো।'

বৃদ্ধের গলায় আবেগের কাঁপুনি।

'নিশ্চয়ই', আমি বললাম সংকুচিত গলায়। 'তবে তার দরকার বিশেষ হবে না। কারণ তাঁর কথা, আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশেও প্রায় সবাই শুনেছে।'

'সেটা অবশ্য স্বাভাবিক', একটু অন্যমনস্কভাবে তিনি বললেন। 'আর তাঁর গল্পটাও

তো কত ছোটো। তাই না? অবশ্য ওইটুকু জীবনে আর কত বড়ো গল্প একজন রচনা করতে পারে? গল্প শুরু হতে না হতেই তো গল্পকারকে মেরে ফেলা হল! গল্পটা তাহলে শোন: তিনি জন্মেছিলেন এখানকার দক্ষিণপ্রান্তের পাহাড়শ্রেণির ওপারে একটা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। অবশ্য ধনী পরিবারে জন্মালেও হয়ত বিশেষ হেরফের হত না, কারণ সেক্ষেত্রেও তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের জীবন বেছে নিতেন। ঐশ্বর্যকে যে তিনি অপছন্দ করতেন তা নয়। তাঁর মতে, বিষয়ের ঐশ্বর্য সাধারণত মনের অন্যান্য ঐশ্বর্যকে গ্রাস করে নেয়, মনটা নিজেই যেন কোনও মহামূল্য দ্রব্যের মতো সতর্ক, আত্মসচেতন ও নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে। যে কোনও ভাবুকের মতো নিঃসঙ্গ ও নির্জন থাকতে পছন্দ করতেন। মাঝে মাঝে গভীর রাতে একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। এটা তাঁর নেহাতই সৌভাগ্য — তিনি মন্তব্য করতেন—কোনও শ্বাপদ পশুর সঙ্গে কখনও তাঁর দেখা হয়নি। ভাবতে ভাবতে একদিন তাঁর মনে হল নিজের ইচ্ছা ব্যতিরেকে জন্মানো মানুষ নিজের সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে একমাত্র তখনই, যদি জগতে ঈশ্বর বলে কিছু থাকেন। ঈশ্বর না থাকলে গোটা জগৎ প্রাণের জন্ম ও মৃত্যু সবই অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষ হয়ত তবু বেঁচে থাকবে। কিন্তু কোনও কিছুর স্থায়ী অর্থ খুঁজে পাবে না। এই যুক্তিতে তাঁর কাছে ঈশ্বর সেই সত্তা যা সবকিছুকে অর্থ প্রদান করে। কিন্তু যে উপলব্ধির জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হল সেটা হল: ঈশ্বরের জন্য কোনও উপাসনালয় নির্মাণ করার দরকার নেই। তাঁকে পেতে কোনও দীর্ঘ, জটিল, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার দরকার নেই। কোনও অবতারের অনুগামী হওয়ার দরকার নেই। কোনও তীর্থস্থানে যাওয়ার দরকার নেই। যা দরকার সেটা হল শুধু এটুকু স্মরণ করা যে জগতে তিনি আছেন। শুধু এটুকু স্মরণ করলেই তাঁকে পূজো করা হয়ে যায়, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে যায়, জীবন ও জগৎ একটা অর্থ পেয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এমনকী সবসময় তাঁকে স্মরণ করারও দরকার নেই (গোপনে প্রচারিত তাঁর বাণীর এক জায়গায় এটার উল্লেখ আছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি)। শুধু জীবনে অন্তত একবার এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেই যথেষ্ট যে জগতে ঈশ্বর আছেন। অবচেতনের অন্ধকারে এই একটা জ্ঞান একবার প্রদীপের মত জ্বালালেই যথেষ্ট। আর বারবার তাঁকে স্মরণ করার দরকার নেই। তাহলেও তাঁকে পুজো করা হয়ে গেল। এর চেয়ে সরল ও স্বাভাবিক ধর্ম আর কী হতে পারে মানুষের চেতনায়?

'কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে এত সহজ মতবাদ মানুষের সহজে পছন্দ হয় না। মানুষ ভাবে, এত জটিল একটা জগতের স্রষ্টা নিজে এত সহজলভ্য হতে পারেন না। আবার এটাও ঠিক, মানুষ ঈশ্বরকে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেতে চায়। ফলে আস্তে আস্তে তাঁর অনেক অনুগামীও তৈরি হল। তারা এক সময় উপাসনালয় যাওয়া বন্ধ করল। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা বন্ধ করল। কোনও অবতার বা ঈশ্বরপুত্রের অনুগামী হওয়া বন্ধ করল। অন্য সব ধর্মের চেয়ে তার নিজের ধর্ম উন্নত: এরকম ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করল। এবং এর ফলে শাসক ও মৌলবাদীদের কোপদৃষ্টিতে পড়ল। এক চন্দ্রহীন কালো মধ্যরাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করল

শাসকের সৈনিকেরা। এবং বিচারে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

'দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা অনুচ্চ কাঠের থামের মাথায়। একটু দূর থেকে পাঁচজন সৈনিক পরপর গুলি করবে। প্রকাশ্য শাস্তিদান, যাতে ধর্মদ্রোহীদের নিয়তি যে কত ভয়ংকর হতে পারে সবাই নিজের চোখে দেখতে পায়। লোকে লোকারণ্য। সৈনিকেরা গুলি চালাল। এবং প্রতিটি গুলিই তাঁর গায়ে না লেগে দড়িটায় লাগে এবং দড়ি ছিঁড়ে তিনি নিচে পড়ে যান। খুশিতে জনতা চিৎকার করে ওঠে, কাঁদতে থাকে, ছুটে গিয়ে তাঁকে তুলে নিতে চায় মাটি থেকে। একজন সৈনিক তাঁর কাছে গিয়ে নিচু স্বরে বলল : আমরা আপনার অনুগামী। আপনাকে গুলি করে মারলে আমরা নিজেরা আর শান্তিতে বাঁচতে পারব না। অনুগ্রহ করে আপনি উঠে দাঁড়ান। আর শাসকের কাছে বলুন ঈশ্বর নিজেই আপনার মৃত্যু চান না। সেজন্যই গুলি আপনার গায়ে না লেগে দড়িতে লেগেছে। তাই শাসক যেন আপনাকে মুক্তি দেন। অনুগ্রহ করে শুধু এটুকু বলুন শাসকের উদ্দেশে। জনতা ও সৈনিকেরা আপনার সঙ্গে আছে।

'তিনি রাজি হলেন না। কারণ ঈশ্বর যে কোনও অলৌকিক কাণ্ড দেখাতে পারেন সেটা তিনি বিশ্বাস করেন না। ওরকম কিছু করলে নিজের কঠোর নিয়মকানুন ঈশ্বর নিজেই লঙ্ঘন করবেন। তাছাড়া, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যে গুলিগুলো তাঁর গায়ে না লেগে দড়িটায় লাগল, তার অকাট্য প্রমাণ তিনি কী করে পাবেন? সেটা না পেয়ে ঈশ্বরের অলৌকিক মহিমা উল্লেখ করলে ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল মতবাদ প্রচার করা হয়।

'তিনি মাটিতে আগের মতোই পড়ে থাকলেন। শাসক সৈনিকদের হুকুম দিলেন তাঁকে আবার থামে ঝুলিয়ে গুলি চালাতে। সৈনিকেরা রাজি হল না। হতভম্ব শাসক অন্য পাঁচজন সৈনিককে ওটা করতে নির্দেশ দিলেন। তারা সেই নির্দেশ পালন করল। এবং পালন করল তাঁর সমস্ত অনুগামী ও আগের পাঁচজন সৈনিককে হত্যা করার নির্দেশও। এভাবে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষকে মেরে ফেলা হয়। আর নিষিদ্ধ হয় তাঁর সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা, তাঁর বাণী সংবলিত সমস্ত পুস্তিকা।'

বৃদ্ধ থামলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'তবে আমি নিজে মনে মনে তাঁরই অনুগামী।'

ঘরে স্তব্ধতা। জানালার বাইরে তখনও অন্ধকার।

'ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোঝার মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই,' আমি বললাম, অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙতে চেয়ে। 'নইলে তাঁকে তো তিনি বাঁচাতেই পারতেন'।

বৃদ্ধ হঠাৎ হেসে ফেললেন। প্রাজ্ঞ, অনাবিল হাসি।

'তাঁর একটা বাণীতে তিনি বলেছিলেন', বৃদ্ধ বললেন, 'যাই ঘটুক, তবু ঈশ্বরকে ভালোবাসব— ঈশ্বর সম্পর্কে এটাই খাঁটি মনোভাব। ঈশ্বর নিজেও এই মাপকাঠি দিয়েই বিচার করেন তাঁর অনুগামীদের।'

'আপনি নিজেও কি এরকম মনোভাব পোষণ করেন?'

এ প্রশ্ন আমার নয়। হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ে দুজন সৈনিক। প্রশ্নটা তাদের। বুঝলাম এতক্ষণ ওরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গোপনে শুনেছে আমাদের সব

কথাবার্তা। হয়তো গোড়া থেকেই অনুসরণ করছিল আমাদের। ভয়ে আমার বুক ধক ধক করতে লাগল। বৃন্ধ চুপ করে থাকেন। তাঁর মাথা দু'দিকে থিরথির করে কাঁপছিল।

'আপনি নিজেও কি এরকম মনোভাব পোষণ করেন?' সৈনিকটি আবার জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ', বৃন্ধ বললেন শান্ত গলায়।

'আপনার সততা আমার ভালো লাগল। তবু ওই নিষিন্ধ লোকটার অনুগামী হওয়ার জন্য আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। এবং শাসককে পরামর্শ দেব গুলি করে আপনাকে মারার হুকুম দিতে।'

এরপর তারা আমার দিকে তাকাল।

'আপনি বিদেশি', সৈনিকটি বলল। 'তাই আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল। আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি এখানে এসেছেন নিছক কৌতূহলবশত।'

'কিন্তু এই বৃন্ধের প্রাণদণ্ডের জন্য তো পরোক্ষভাবে আমিই দায়ী', মরিয়া হয়ে আমি বললাম। 'আমিই তাঁকে পীড়াপীড়ি করেছিলাম নিষিন্ধ লোকটার কথা বলতে, যা আপনারা শুনে ফেলেন। তাই বিদেশি বলে আমাকে যদি সত্যিই মর্যাদা দিতে চান তবে আমার অনুরোধ এঁকেও আপনারা ক্ষমা করে দিন।'

'এমন কিছু করার চেষ্টা আমরা করতে পারি না যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়.'

'তাহলে এঁর সঙ্গে আমাকেও গুলি করুন।'

এত নির্ভীক মনে মরতে চাওয়া জীবনে সেই প্রথম ঘটল আমার। আমি বুঝতে পারছিলাম বৃন্ধটির মৃত্যুর পর জীবনের মতো বড়ো অভিশাপ আর কিছু আমার কাছে হতে পারে না। স্বেচ্ছায় মরতে কেমন মুক্তির স্বাদ অনুভব করছিলাম, কারণ স্বেচ্ছায় মরতে রাজি হলে মৃত্যুভীতির দ্বারা কাহিল হতে হয় না।

বৃন্ধটি আগের মতোই চুপ। তাঁর মাথা থিরথির করে দুলছিল। সৈনিকেরা একবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে, একবার বৃন্ধের মুখের দিকে। জানলার বাইরে অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে।

'একটা শর্তে আমরা আপনার প্রাণ বাঁচাতে পারি', সৈনিকটি হঠাৎ বলল, বৃন্ধের দিকে তাকিয়ে। তার কণ্ঠস্বরে কেমন কাঁপুনি, কেমন বিহ্বলতা, যেন মনের কোনও প্রবল তোলপাড়কে প্রাণপণে সংবরণ করার চেষ্টা করছে। 'সেটা হল, ওই নিষিন্ধ লোকটা সম্পর্কে যে গল্পটা আপনি বললেন তাতে আরও একটা ঘটনা আপনাকে যোগ করতে হবে। ঘটনাটা আপনি জানেন না, কিন্তু আমরা জানি। ঘটনাটা হল, সেদিন তাঁকে মারার জন্য প্রথম যে পাঁচজন সৈনিক বন্দুকের ব্যর্থ গুলি ছুঁড়েছিল তাদের একজনের বংশধর আমরা এই দুজন। এ আমার সহোদর ভাই। এরপর যখন গল্পটা গোপনে কাউকে বলবেন তখন উল্লেখ করতে ভুলবেন না যে, ওই পাঁচজন সৈনিকের একজনের বংশধর এখনও টিকে আছে। এবং ওদের দুজনের সঙ্গে আপনার একদিন দেখাও হয়েছিল।'

কথাগুলো বলে সৈনিকটি বৃন্ধের হাত দুটো চেপে ধরে নিঃশব্দে কান্নায় ভেঙে

পড়ল। অশ্রু আমার চোখেও। এরপর ঘরটায় চারজন চুপ করে বসে থাকলাম। সকলের মুখে অব্যক্ত আনন্দ। বাইরে আস্তে আস্তে ভোর হয়ে এল।

'মনে মনে আমরাও তাঁর অনুগামী', চলে যাওয়ার আগে সৈনিকটি বলল। 'আর আমাদের মতো আরও অনেক সৈনিক। আর অসংখ্য সাধারণ মানুষ। আমরা নিশ্চিত জানি, একদিন সবাই তাঁর অনুগামী হবে। তখন আর গোপনে নয়, প্রকাশ্যে।'

দেশটায় আমি থেকে গেলাম। এখানে থাকতে আমার ভালো লাগে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মাঝেমাঝে একটু বিষণ্ণ মনে ভাবি, এই আশ্চর্য উপাসনালয়গুলো একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য তাতে ঈশ্বর গৃহচ্যুত হবেন না, পরক্ষণেই সান্ত্বনা দিই নিজেকে। কারণ, ততদিনে প্রতিটি মানুষ নিজেই এক একটা উপাসনালয় হয়ে গিয়েছে। □

আলাদিন, ও আলাদিন

সু কা ন্তি দ ত্ত

মুস্তাফা, আলাদিনের বাবা মুস্তাফার সাজপোশাক, চেহারা এরকমই ছিল না? ছুঁচালো লম্বা সাদা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি, টিকালো নাক। উলটোদিকে বসা লোকটাকে দেখতে দেখতে মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছিল নিতাই।

আর তখন ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ট্রেন, রাত পৌনে এগারোটায় দমদম জংশন আর ক্যান্টনমেন্টের মাঝখানে। অল্প ঠাণ্ডা, তাই কোনো জানলা খোলা, কোনোটা বন্ধ। ট্রেনের একদম প্রথম কামরায় জনাবিশেক লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঝিমন্ত। দু-একজন দরজার কাছে।

আচমকা ব্রেক কষলে বোধহয় এরকম ঝাঁকুনি আসে। শিকখোলা জানলা দিয়ে মাথা বাড়ালে লাইনের ডানদিকে সিগন্যাল পোস্টের লাল আলো। হয়তো ড্রাইভারেরও ঝিম এসেছিল অথবা দূর থেকে লাল সিগন্যাল দেখেও ট্রেনের গতি না কমিয়ে আশা করেছিল পোস্টের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সেটা সবুজ হয়ে যাবে, যেমন নিতাই ধার চাইবার সব জায়গাগুলো শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে জেনেও আশা করেছিল আজকে রাতের মধ্যে হাজার দুয়েক টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। যেমন নিতাই-এর কনস্টেবল বাবা আশা করতেন কোনক্রমে পাস করে ক্লাসে ওঠা নিতাই বড়ো হয়ে মস্ত পুলিশ অফিসার হবে।

হীরামোতি প্রকাশনীর ছবিতে 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ', প্রচ্ছদে শিংওয়ালা দৈত্য, বিকট চোখ, মুখ, গায়ের রং হলুদ। নিচে প্রদীপ হাতে দাঁড়ানো ছোট্ট আলাদিন। মাথায় হলুদ বর্ডার দেওয়া নীল টুপি। সবুজ পায়জামা, গলাবন্ধ গোলাপি কোট। আরও নিচে কালো রংয়ে লেখা অরূপকুমার। নিউব্যারাকপুর বইমেলা থেকে ছেলের জন্যে কিনেছিল। ছেলে শক্তিমানের বই চেয়েছিল, নিতাই কিনল আলাদিন। বইয়ের প্রথম ছবিটাই আলাদিনের বাবা মুস্তাফার। ছেলেকে অনেকবার পড়ে শোনাতে শোনাতে অনেকটাই প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। প্রথম চৌকো বক্সে মুস্তাফার ছবি দিয়ে তলায় লেখা ছিল—চীন দেশের এক শহরে মুস্তাফা নামে এক গরিব দর্জি বাস করত। তার ছিল একটি ছেলে। তার নাম আলাদিন।

উলটোদিকে বসা মুস্তাফার মতো লোকটা ঘুমে ঢলতে ঢলতে পড়েই যাচ্ছিল প্রায় হাইতোলা ক্লান্তি ডিঙিয়ে, বিরক্তির আঁচে অল্পসল্প জল ঢালতে চেয়ে নিতাই বিড়ি মুখে দেশলাই জ্বালাতেই জানলা দিয়ে আসা দমকা বাতাস আততায়ী হয়ে গেল। নিভে যাওয়া কাঠি ফেলে দিতে গিয়ে এই মুহূর্তে নিতাই-এর মনে হল বাতাস জিনিসটা এক উৎপাত বিশেষ! বাতাস ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হওয়া নিশ্চিত এমনতর প্রশ্ন তার

মনে উঁকি দিল না যেমন সচ্ছল মসৃণ ভোগবহুল জীবন-যাপন করতে করতে হঠাৎ কোন বিশেষ চাহিদা পূরণের সম্ভাবনাহীনতার বিরক্তিতে কেউ কেউ মনে করে থাকেন ধনসম্পদ অতি বিষম বস্তু এবং দারিদ্র্য মহান!

দরজার কাছে দাঁড়ানো একটি লোক, আপন মনে নাক খুঁটতে খুঁটতে, মৃদুস্বরে— শুয়ার শুয়ার, তারপর গলা একটু চড়িয়ে কাউকে শোনাতে চাই না অথচ শুনলে আপত্তি নেই এমন ভঙ্গিতে—র‍্যাল পাইভেটে দিয়ে দ্যাওয়া উচিত। বছর বছর খালি মায়না বাড়ানো কামের ব্যালায়...।

বিড়ির ধোঁয়া ওড়ায় নিতাই। মুসুরডালের সঙ্গে কুমড়ো ভাজা, হাপুস-হুপুস খেয়েই দৌড় সেই সকাল ন-টার মধ্যমগ্রাম লোকালে। সাড়ে দশটায় এন্টালি। ত্রিবেদির ফ্ল্যাটে পাঁচতলায়, লিফট খারাপ। সিঁড়ি ভাঙতে হাঁফ ধরে এল। বসে রইলাম ঝাড়া দুঘণ্টা কাজের কাজ কিস্যু হল না। জমির মালিক প্রশান্ত মল্লিক এল না। এই আসে এই আসে করে ফোন এল সাড়ে-বারোটায়, আজ আসতে পারছে না, বউ-এর শরীর খারাপ, সপ্তাহখানেক পরে জানাবে। এক একটা দিন এমন যায়! এই স্কিমটা নিয়ে ঘুরছি তা প্রায় বছরখানেক হবে। আজকে পাকা কথা হয়ে গেলে মাসখানেকের মধ্যেই ভালো দিন দেখে চুক্তি, কিছু আগাম টাকা আজই চেয়ে নেওয়া যেত, অন্তত দু-পাঁচ হাজার। এইসব ভাবনার মধ্যেই ট্রেন সচল।

প্রশান্তবাবুর দশ কাঠা জমি। ষোলোটা ফ্ল্যাট হবে। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করে ত্রিবেদির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলেই স্কোয়ারফিট পিছু দশ টাকা করে থাকবে আমার—অন্যদের দিয়ে থুয়েও পঞ্চাশ হাজার! আঃ বছরে এরকম একটা করে কেস করতে পারলে তো কোনো চিন্তাই থাকে না। একপয়সা ঢালতে হচ্ছে না। শুধু যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, প্রেমোটার শ্যামের সঙ্গে জমির মালিক রামের। এর আগে দু-দুটো কেস কেঁচে গেল। প্রশান্তবাবুও কি খেলাতে চাইছে? বউ-এর শরীর খারাপ-টারাপ ওসব কোনো ব্যাপারই নয় হয়তো। আর কত খেলাবে!

দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে হুড়মুড়িয়ে উঠল বেশ কয়েকজন, উগ্র সেন্ট মাখা পোশাক, দেখলেই বোঝা যায় বিয়েবাড়ি ফেরত। নানা বয়েসের পাঁচ-ছজন মহিলা, বাচ্চা-কাচ্চা, পুরুষ জনা দুই। তড়িঘড়ি তারা বসার জাগায় দখল করল। তাদের সমবেত কলকলানিতে কামরার ঝিমন্ত মানুষগুলো একটু নড়ে-চড়ে বসল যেন।

দুহাত ভরে দেছে মেয়ের বাবায়, নগদই তো দেছে শোনলাম পঞ্চাশ হাজার—

ছোটো বুনটা কি কানছিল।

দিনরাত লগে লগে থাকতো তো।

মেয়ে কিন্তু দেখতে ভালো হয়নি।

হ্যাঁ, রং চাপা, খ্যাঁদা নাক, ঝুমুর মা কচ্ছিল মেয়ের নাকি কি অসুখও আছে!

পঞ্চাশ হাজার নগদ! নিতাই ভাবে আমার বিয়ের সময় দিদিরা বলেছিল নগদ অন্তত দশ হাজার নিতে, মা তখন বেঁচে, মা আপত্তি করল, আমিও রাজি হইনি। বড়দি বলেছিল, কেন নিবি না? আমার বিয়েতে বাবাও দিয়েছিল, তুই না হয় খাওয়াবার খরচ কিছু তুলে নে।

আমার তখন স্ক্র্যাপ কেনা-বেচার ব্যবসা, মোটামুটি ভালোই, মা-র পেনশন,

ভাইয়ের আয়ও সংসারে ঢুকতো, সেও তো কত বছর হয়ে গেল— মা বলত, ঘরে লক্ষ্মী আসতিছে এটাই বড়ো কথা, লোভ কইরবি না খোকা, ঠাকুর খুশি থাকলি সব হবে। মার কথা মনে পড়তেই নিতাই-এর বুকের ভিতর মাটিতে প্রথম বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ ছড়ানো হাওয়া কেমন যেন হাত-পা ছেড়ে এলিয়ে পড়তে চাইল।

প্রায় তার ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে জানলা দিয়ে পানের পিক ফেলে এক মহিলা।

খাওয়াইছে ভালো, বিরিনিটা খুব ভালা করছিল!

ফিস ফ্রাইটাও আমি তো চারখানা খাইছি!

ই বাবা, কাল যদি পেট না ছাড়সে তো... অত লোভ ভালা নয়।

খাওয়ার কথায় খিদেটা মোচড় মেরে ওঠে। আজ কী খাওয়াবে সীমা। বাজার গেছিল কি বিকেলে? ক-টা টাকাই বা রাখা আছে— তবে ছেলে মাছ মাছ করে বড়ো। হয়তো কাটাপোনার ঝোল! তানা হলে ডাল আর ডালবড়া।

তবে এখনকার বিয়েবাড়ির খাওয়া ভালো লাগে না নিতাই-এর। কেমন যেন তৃপ্তি হয় না। বছর পনের আগেও যখন ক্যাটারারের এত চল হয়নি— লুচি, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, ছ্যাঁচড়া তারপর ঘি ভাত আর সাদা ভাত, মাছ, পাঁঠার মাংস, চাটনি, পাঁপর, দই-মিস্টি, রসগোল্লা কে ক-টা খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা— এখনতো দই উঠেই গেছে, কলাপাতা, মাটির খুরি, কিস্যু নেই।

আরও অনেককিছুই তো নেই, যে কথা আগে লোকে ট্রেনে-বাসে প্রকাশ্যে বলত না এখন বলে, বলে— কাটার বাচ্চাগুলোকে লাথি মেরে তাড়ানো উচিত পাকিস্তানে। কিছুই তো থাকে না আগের মতো, স্কুল-কলেজের আগুনখেকো বিপ্লবী বন্ধু এখন দিনের বেলায় কন্ট্রাকটারি করে রাতে সাট্টা খেলে! নিতাই, যে নিতাই খাওয়া-ঘুম ছাড়া বাকিসময় হয় ব্যাবসার ধান্দায় নয়তো ক্লাবে তাস ক্যারাম নিয়ে থাকত, এখন সে সময়মতো বাড়ি আসে, বাজার করে, রেশন তোলে, পায়খানা পরিষ্কার করে, বাচ্চার সঙ্গো ক্রিকেট খেলে।

ট্রেন দুর্গানগর ছাড়ে। অন্যদিন সারাদিনের নানা ধকলের পর একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে বাড়ি এগিয়ে আসলে যেন বুকের ভিতর গরমকালের সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাস ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আজ মনের কোনো অনির্দিষ্ট কোণে সূঁচফোটা চিনচিনে ব্যথা। সীমা বড়ো আশা করে বসে আছে, সকালে বেরোনোর সময় বড়োমুখ করে বলে এসেছিল নিতাই— চিন্তা কোর না, টাকার জোগাড় হবেই।

সকালে ত্রিবেদির ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডে এফ.সি. অফিসে গেলাম, যদি কিছু বাকি আদায় কিংবা বিক্রিবাটা হয়, কিস্যু হল না। লোকে কেনাকাটা কমিয়ে দিচ্ছে, খাওয়ার জোগাড় করতেই শালা পোঁদ ফেটে যাচ্ছে! বছরকয়েক আগেও এই অফিসে সারাবছর ধরেই অনেকে কমবেশি কেনাকাটা করত। ইদানীং বিক্রি বলতে সেই পূজোর সময়েই যা হয়। নিবারণবাবুই তো বলছিলেন— দেখ বাপু এবারের জামাই ষষ্ঠীতে শুধু ছোটো জামাইকেই দেব, এর বেশি পেরে উঠব না— অথচ গতবারও এই নিবারণবাবুই পাঁচ জামাইয়ের জন্যেই শার্টের পিস নিয়েছেন।

নিতাই হাসতে হাসতে বলেছিল— আপনারা যদি একথা বলেন, আপনাদের পে কমিশন আছে, ডি এ আছে, আমাদের অবস্থাটা ভাবুন একবার— আমরা বাঁচি কী

করে!

— অবস্থা আমাদেরও ভালো নয়, যে কোনোদিন গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে দিতে পারে।

পিছনে বসা একজন ফাইলের জঞ্জাল থেকে মুখ তুলে— গোল্ডন না আয়রন হ্যান্ডশেক নিবারণদা!

তোদের আয়রণ হ্যান্ডশেকই হওয়া উচিত! বারোটায় আসবি চারটেয় যাবি, তোদের ইয়েতে শালা, লোহার রড.... নিজের মনে বিড়বিড় করে নিতাই।

ওখান থেকে বেরিয়ে পুরোনো ব্যবসা সেই স্ক্র্যাপ কেনাবেচার ধান্ধায় আবার ক্যামাক স্ট্রিটের চা কোম্পানিতে, পুরোনো যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে, কাজ কম, দারুণ প্রতিযোগিতা, নতুন করে এনলিস্টেড হতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে, তরপর শিবঠাকুর সহ নন্দীভৃঙ্গিদের নগদে সন্তুষ্ট করা তো আছেই। তবু ভেবেছিল বলে কয়ে হাতে-পায়ে করে যদি কিছু করা যায়, তা সে গুড়ে কেরোসিন, কথাই শুনতে চায় না কেউ।

তারপর নৈহাটি, বড়দির বাড়ি, জামাইবাবু অসুস্থ, দিদির মন খারাপ, টাকা ধার চাওয়ার কথা বলতেই পারল না নিতাই।

অমিত এমন তাল তুলল আর আমিও আগামাথা না ভেবে ঝোঁকের মাথায় সায় দিয়ে দিলাম : আমি দিনদিন যে কী হচ্ছি এমন ভাবনায় ঘন কালো চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে দেয় নিতাই।

চাঁদিপুর যাবি? তিনদিন দুই রাতের ট্যুর ওখান থেকে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, তোদের দুজনের সব মিলিয়ে ধর হাজার দুয়েক টাকা লাগবে।

বাল্যবন্ধু অমিত এমন একটা প্রস্তাব ছুঁড়ে দিয়েছিল। সে প্রায় মাসখানেক আগে এক রোববার সকালের কথা। পাঁচ ক্লাস থেকে দশ ক্লাস একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে দুজনে অমিতদের 'কিশোর সংঘ' বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান করছে। তার টিকিট বিক্রি করতেই বহুকাল বাদে নিতাইয়ের বাড়িতে আসা।

অমিতের অল্প ঢেউখেলানো চুল, সুখ চুঁইয়ে পড়া চকচকে গাল, ধপধপে সাদা পায়জামার ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজনন্দিত আদ্দির সাদা পাঞ্জাবি, পায়ে ঘি রঙের বহুমূল্য চপ্পল। গোয়ার বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছিল, অক্টোবরে গোয়া ঘুরে এসেছে।

কালানগুটে বীচ, মীরামার বীচ, সোনালি রূপালি বালি, আরব সাগর, মাণ্ডভী নদী পানাজির অ্যালটিনো পাহাড়, সমুদ্রের ধার দিয়ে চলা কোঙ্কন রেলওয়ে— অমিত বলার ভঙ্গিতে স্বপ্নরচনা করছিল। হাঁ করে গিলছিল সীমা।

নিতাই-এর মনে পড়ল পুজোর মাস দুই আগে নেতাজি ইনডোরের সামনে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল অমিতের সঙ্গে। নিতাই যাচ্ছিল স্ট্যান্ড রোডে নিজের ধান্দায়। অমিত হাত ধরে টেনে নিয়ে কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকার টিকিট কেটে ঢোকাল ইনডোরে বসা 'টুরিজম ফেয়ারে'।

নানা রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি ভ্রমণ সংস্থার প্যাভেলিয়ন। ভারতের নানান প্রান্ত তো বটেই, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এমনকি ইউরোপ সফরের নানান প্যাকেজের ভরপুর ব্যবস্থা। অমিত প্রায় সব প্যাভিলিয়নেই ঘুরল ব্যাগবন্দী করল একগাদা বুকলেট,

লিফলেট।

কী সব প্যাকেজ! কোথায় যাবেন? কিন্নর চলুন, হিমাচল প্রদেশের কিন্নর, ন হাজার ফুট উঁচুতে বরফেমোড়া সাংলা ভ্যালি, থাকবেন কোথায়? কেন আমাদের সুপার ডিলাক্স তাঁবুতে! দিল্লি থেকে নারকান্দা, তারপর সাংলা, ছিটকুল, কম্পা, সাহারান—স্বর্গ রাজ্যের নানাদিক! তাঁবুতে থাকা বলে হেলাফেলা করবেন না, সব পাবেন, গরম জলের ব্যবস্থা থেকে অ্যাটাচড বাথরুম পর্যন্ত। খাবার? ভারতীয়, পাশ্চাত্য, চীনা, যা চাইবেন। ঘুরবেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস বা সুমোতে। তাঁবু ছাড়াও কোথাও কোথাও রাজকীয় হোটেলে থাকারও সুযোগ পাবেন। এছাড়া আছে আমোদ-প্রমোদের নানা আয়োজন, ছোটো ছোটো ট্রেকিংও করতে পারেন আপনার খুশিমিতো। দিল্লি থেকে দিল্লি দশ দিনের ভ্রমণে খরচ খুবই কম, জনপ্রতি মাত্র তেরো হাজার টাকা!

বলুন, হ্যাঁ বলুন কোথায় যাবেন? ভিতর কণিকা? জয়শলমীর, অমরনাথ, পানাজি, কন্যাকুমারিকা— বলুন?

অমিত বলেছিল—এবার মৌমিতার ইচ্ছে বম্বে-গোয়া— আমি ভাবছিলাম জয়শলমীর উদয়পুরসহ গোটা রাজস্থান, দেখি, কী হয়!

তা, অমিতের গোয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে সেই রোববার সকালে নিতাই-এর বুকের ভিতর ঝিরঝির বৃষ্টি আর হ্যাংলা চোখ কান খুলে ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই আসল ভ্রমণের স্বাদ পেতে চাইছিল সীমা।

তারপর গোয়ার সমুদ্র বর্ণনায় যেতে গিয়ে অমিত বলে পুরী গেছো তো?

সীমা আস্তে মাথা নাড়িয়ে জানায় — না।

দীঘা!

না।

অমিত এবার নিতাই-এর দিকে ফেরে— সে কিরে। বিয়ের পর কোথাও বেড়াতে যাসনি?

নিতাই চুপ। সীমা আস্তে উঠে চা করতে রান্নাঘরে। তখন অমিতের চাঁদিপুর যাওয়ার প্রস্তাব।

সকালে হাওড়া থেকে ধৌলি এক্সপ্রেসে। বারোটার মধ্যে চাঁদিপুর, পরদিন পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, রাতে চাঁদিপুর, তারপরদিন সন্ধ্যায় ধৌলিতেই চেপে রাতেই ফেরা। চাঁদিপুরে হোটেল সুন্দরম বুকিং করব। ডাবল রুম উইথ অ্যাটাচড বাথ সাড়ে তিনশো। থাকা খাওয়া, ঘোরাফেরা, গাড়িভাড়া— হ্যাঁ সব মিলিয়ে তোদের আড়াইজনের ওই দু-হাজারেই হয়ে যাবে— কী রে যাবি তো?

বিয়ের পর এই সাত বছরে কোথাও বেরোনো হয়নি। গত দুবছর সীমার সঙ্গে বারেবারে পরিকল্পনা করেছে, দু-তিনদিনের জন্যে অন্তত দীঘা ঘুরে আসবে, কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। তাই নিতাই যেন কিছুটা মরিয়া হয়েই বলে দেয় যাব, যাব।

ঠিক আছে, তোর অ্যাডভান্স যা লাগে আমি করে দেব— হ্যাঁ, দিনদুয়েক আগে একবার ফোন করিস।

অমিত বেরোতেই সীমা বলে— কী ব্যাপার, হ্যাঁ করে দিলে, টাকা কোথায়? এখন

ব্যাবসার যা হাল— তাছাড়া মুদি দোকানে বাকি, এমাসে ছেলের স্কুলে ভরতির টাকা লাগবে চারশো, বড়দির ননদের বিয়ে—

হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, ভেবো না।

তুমি তো বলো ওরকম, ধার করবে তো? জায়গা আছে আর? শেষ পর্যন্ত একটা কেলেংকারি হবে।

বলছিল বটে সীমা, কিন্তু সেই কথার রোদে কোথাও মধ্যাহ্নের তেজ ছিল না, শীতের সকালের মিঠে রোদ্দুর হয়ে যেন গাছপালার ফাঁকে দোল খাচ্ছিল।

তারপর মাসখানেক ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা, যেমন বেড়াতে গিয়ে সঙ্গে কী কী নেওয়া হবে। সীমা বলল— আমি একটাও শাড়ি নেব না, স্রেফ চুড়িদার, ভালো দেখে ওয়াটার বটল কিনবে একটা— আচ্ছা, সমুর জন্যে কিছু খাবার মানে বিস্কুট, চিঁড়ে এসব নিতে হবে তো বল, এক কাজ কর না, ওয়াটার-বটল কেনার দরকার কী, মেজদির কুলজারটা চাইলে দেবে না? আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু সবার জন্যে কিছু না কিছু, এই ধর চুলের ক্লিপ-টিপ নিয়ে আসব, সবার জন্যে মানে তোমার দিদি, বউদি, তোমার শালি— আচ্ছা, সমুদ্রের ধারে ওখানে ঝিনুকের তৈরি কিছু পাওয়া যায়?

পাঁচ বছরের সমুর উৎসাহ খুব। চাঁদিপুরে বুঝি সমুদ্র আছে বাবা? সমুদ্রে কত জল? আমাদের নোয়াই খালের থেকে বেশি?

একটা করে দিন যায়, মাঝেমধ্যেই সীমা জিজ্ঞেস করে কিগো তোমার টাকার জোগাড় হল? দেখো আবার ডুবিয়ো না যেন!

বিরাটি ছেড়ে ছুটছে ট্রেন। এটা বোধহয় বিশরপাড়া স্টেশনে দাঁড়াবে না। নিতাই খেয়াল করল, মুস্তাফার মতো দেখতে লোকটি আর নেই, নেমে গেছে বোধ হয়।

'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' বইয়ের কথা মনে পড়ছিল— প্রদীপ ঘষতেই— প্রদীপ দৈত্য এল, আলাদিন তাকে বলল—তুমি খুব দামি জড়োয়া গয়না আর ভালো ভালো ফল সোনার থালায় করে সাজিয়ে নিয়ে এসো।

বাংকে রাখা ঢাউস ব্যাগটা নিয়ে নামার জন্যে দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই ট্রেন ক্রমশ গতি কমাতে কমাতে থেমে গেল। নিতাই দেখলে কামরার লোকগুলো বেবাক উধাও। গা ছমছম নৈঃশব্দে এই মুহূর্তে সবকিছু নিশ্চল নিস্পন্দ যেন।

আর তখন বাইরের থিকথিকে অন্ধকার থেকে কে যেন লাফ মেরে উঠে এল কামরায়। কামরায় কম আলো আরও কমে এসেছে।

কী মুখ শুকনো কেন? লোকটা বলে।

চেনা চেনা অথচ চেনা যায় না। অদ্ভুত বেশ, ভারী ধন্ধে পড়ে যায় নিতাই।

চিনতে পারনি তো? দেখ মনে করে।

নিতাই এবার বেশভূষা ভালোভাবে লক্ষ করে, মাথায় হলুদ বর্ডার দেওয়া নীল টুপি, সবুজ পায়জামা, গোলাপি গলাবন্ধ কোট।

আরে এতো আলাদিন, কত বড়ো দেখাচ্ছে তোমায়।

চিরকালই ছোটো থাকব নাকি। বড়ো হব না, বয়েস বাড়ে না নাকি আমার?

তোমার আশ্চর্য প্রদীপটা আছে?

আছে, প্রাসাদে।

প্রাসাদ কোথায় তোমার ?

প্রাসাদ আমার একটা নাকি ? কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন...বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছি...।

আমার দুহাজার টাকার খুব দরকার! দেবে আলাদিন ?

মোটে দুহাজার টাকা! হাসালে দেখছি—।

ঝিঁঝি পোকার সম্মেলক সংগীত, লাইনের পাশে রাস্তার ধারে লম্বা ঝাঁকড়া গাছের সারিতে ভুতুড়ে অন্ধকার, কাছে কোথাও কুকুরের একক বিলাপ, নিতাই কত টাকা চাইবে ভেবে উঠতে না উঠতেই ট্রেন চলতে শুরু করে, কামরায় আবার লোকজন, আলোর জোর বাড়ে, মিনিটখানেকের মধ্যেই স্টেশন নিউব্যারাকপুর।

মশারি টাঙাচ্ছিল সীমা। নিতাই-এর মুখ-হাত ধোওয়া, খাওয়া-দাওয়া পর্বে অতি প্রয়োজনীয় দু-একটা কথা ছাড়া সীমা নির্বাক ছিল। টাকার জোগান সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুই জানতে চায়নি। হয়তো নিতাই-এর ছেঁড়া চপ্পলের মতো মুখ দেখেই আন্দাজ পেয়েছে।

অস্বস্তি বোধ করছে নিতাই। অস্বস্তির একটা কারণ যদি হয় সীমার অস্বাভাবিক নীরবতা, অন্য কারণ অমিতকে বেড়াতে যাওযার অক্ষমতাটা জানানো। হোটেলে আগাম টাকা দেওয়া আছে, তাছাড়া আরও দু-একজন যেতে চেয়েছিল, তাদের বাদ দিয়েই নিতাইকে নেওয়া হয়েছে।

মশারি গুঁজে, চুল আঁচড়াতে আয়না বসানো আলমারির সামনে সীমা।

এবারও হল না সীমা।

জানতাম, কিন্তু অমিতদা কী ভাববে! ক্লান্ত স্বরে বলে সীমা।

ছোটোবেলার বন্ধু, বুঝবে নিশ্চয— আচ্ছা, ওর কাছে টাকাটা চাইলে—

অন্ধকারে সাপ-ব্যাঙ কিছু মাড়িয়ে ফেলে চমকে ওঠার ভঙ্গীতে ছিটকে আসে সীমা— না, একদম না, বন্ধু! কীসের বন্ধু, কতটুকু সুখ-দুঃখের খবর রাখে তোমার!

তুমি জানো না সীমা, একসময়ে আমরা একথালায ভাত খেয়েছি। আমরা—

থামো, একসময়ের কথা ছাড়ো, এখনকার কথা বলো।

নীচু হয়ে খাটের তলা দেখে নেয সীমা। জানলা বন্ধ করতে থাকে।

মেঝেতে বসে দেশলাই-এর খাপ থেকে অন্যমনস্কতায় কাঠিগুলো ঢেলে ফেলে আবার একটা একটা করে তুলতে থাকে নিতাই। ধীরে ধীরে, যেন এখন রাত সাড়ে বারোটা নয়, ছুটির দিনের অলস বিকেল।

বাবা যখন মারা যায়, মনে আছে তার পাঁচ দিন পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। ওর বাবা-মার বারণ সত্ত্বেও অমিত ছুটে এসে শ্মশানে গিয়েছিল, স্কুলে মাস্টার মশাইদের কাছে ঘুরে ঘুরে বাবার শেষ কাজের জন্যে কিছু টাকাও তুলে দিয়েছিল। ছয় ক্লাসে পড়ার সময় একবার বিকেলবেলায় ফুটবল খেলে পুকুরে স্নান করতে নেমে— সে কী কাণ্ড! আমি তো সাঁতার জানতাম না, প্রায় ডুবে মরতে বসেছিলাম, অমিতই ছুটে এসে...। কথাগুলো বিনা উচ্চারণে নিজেকেই শোনাচ্ছিল নিতাই।

বাবা থাকাকালীনই সংসারে বেশ টানাটানি ছিল। মারা যাওয়ার পর বাবার চাকরিটা দাদা পেল কমপেশনেট গ্রাউন্ডে। একবছরের মধ্যেই বিয়ে করে আলাদা। মেজদি,

ছোড়দির বিয়ে বাকি, আয় বলতে মা-র সামান্য পেনসন, ভাই তখনও মাধ্যমিক পেরোয়নি। মেজদি অবশ্য প্রাইভেট ফার্মে কাজ জুটিয়ে নিল, কিছুদিন পর ছোড়দি এলআইসি-র এজেন্সি শুরু করল, আমি কোনক্রমে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর স্টেনোগ্রাফি কোর্সে ভরতি হলাম।

রাতবাতির আবছায়ায় কোনো এক রহস্যময় অস্তিত্বের মতো দুহাত ছড়িয়ে মেঝেতে চিত হয়েছিল নিতাই। জালঘেরা জানলার টিনের পাল্লার আশেপাশে দু-একটা জোনাকি। গলির দখল নিয়ে সাংসারিক কলহে মত্ত একপাল কুকুর।

শুধু কিছুটা জমি আর দুখানা ঘর ছিল তাই রক্ষে। জমি বেচে দিদিদের বিয়ের কিছুটা সুরাহা করা গেছিল।

আমার স্ক্র্যাপের ব্যবসাটাও যদি থাকত। বড়ো বড়ো জুট ব্যাগে চা আসে বাগান থেকে, ব্লেন্ডিং করার সময় ব্যাগ স্ক্র্যাপ হয়ে যায়, তখন পার্টি ফিট কর, আগাম টাকা নাও, ইধার কা মাল উধার, বেশ ভালো লাভ। কোম্পানি চা রপ্তানি করতে চেক, হাঙ্গোরি, সোভিয়েত, গোলমাল শুরু হল ওখানে, রাজনৈতিক ডামাডোল, রপ্তানির পরিমাণ কমে গেল, অবস্থা খারাপ কোম্পানির, আমারও কপাল পুড়ল। মাঝে মাঝে অনেকে বলে না ওই যে— পৃথিবী এখন ছোটো হয়ে আসছে। সত্যিই হয়তো তাই, কোথায় পূর্ব ইউরোপে কী হল আর এখানে নিতাইচন্দ্র দাসে পুড়ে মোল!

যদি বিয়ে না করতাম! মা মৃত্যুশয্যায় নাছোড়বান্দা—নিতুরে, আমি চোখ বুইজলে তোরে কে দেইখব? ঠাকুরের কিরা, তুই বিয়ে কর কলাম, চিন্তা কইরবিনা। জীব দেছেন যিনি আহার দেবেন তিনি!

রং ওঠা, সিমেন্ট ঘসা পুব দেওয়ালের মাঝখানে টাঙানো মার ছবি। পাখার হাওয়ার প্লাস্টিকের মালা অল্প অল্প দুলছে। সাদা থান, ঘোমটা দেওয়া, কালো ফ্রেমের চশমা, এই প্রায়-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় নিতাই।

শর্টহ্যান্ড ছেড়ে দিতে হল, সবে ভালো স্পিড উঠছিল, আর কিছুদিন চালাতে পারলেই হয়তো ভালো চাকরি-টাকরি... মেজদির বিয়ে, সংসারে আয় দরকার, ব্যস, স্টেনোগ্রাফি শেষ! প্রথমে কিছুদিন ইট বালি সাপ্লাই দিলাম, তারপর ছোড়দির লাইনে এলআইসি-র এজেন্সি, সেটা একটু জমে উঠতে না উঠতেই মা-র ক্যানসার, খরচের ঠেলায় এর ওর দেওয়া প্রিমিয়ামের টাকায় হাত পড়ে গেল, এজেন্সি লাটে, অপমানের চূড়ান্ত!

বড্ড মশা। গায়ে পায়ে চাপড় মারলেও উঠে বিছনায় আসতে ইচ্ছা হয় না। খাটের নীচে খুটখাট শব্দ, ইঁদুর বোধহয়। সীমা ঘুমিয়ে পড়েছে কি? ডানহাত মশারির গায়ে লেপেট রয়েছে— সীমা, সীমা সাড়া নেই।

তবে আজ সীমার মুখের দিকে তাকান যাচ্ছিল না, বড়ো আশা করেছিল... বিয়ের পর এই প্রথম! কী করব আমি? গত বছর বাথরুম পায়খানা সারিয়ে তুলতে একগাদা খরচ, তা সামলাতে না সামলাতে ঘরের ছাদ ঠিক করতে হল, বৃষ্টি হলে যেভাবে জল পড়ে, হু হু বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, ইনস্টলমেন্টে প্যান্টের পিস শার্টের পিস বেচে এই বাজারে সংসার চালানো, ধার-দেনার পাঁকে মুখ পর্যন্ত ডুবে থাকে সব সময়।

রাতবাতির আলো-আঁধারিতে যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো জন্তুর মতো হামাগুড়ি

দিতে দিতে জলের জগের কাছ যায় নিতাই। আধজগ জল খেয়ে, বালতি থেকে ঢেলে আবার ভরে রেখে, দেশলাই খুঁজতে গিয়ে, পায়ের ধাক্কায় কোথায় যে গেছে, টিউবলাইট জ্বালাতেই হয়। দু-তিনটে আরশোলা ফরফর উড়ে আসে টেবিলের কাছে।

আর চোখ পড়ে, কাঠের ছোটো টেবিলে, তিন-চারটে কাগজের নৌকা, গতকাল ছেলের আবদারে বানানো, সমু সমুদ্রে ভাসাবে...।

নদীর বুকে বাঁধ দিলে বুঝে এমন হয়, ফুঁসে ওঠা জলকল্লোল। টের পায় নিতাই তারপর বেশ কয়েকমিনিট পরে কেমন যেন এক অবসাদে নিস্তেজ হয়ে যেতে যেতে একটা কাগজের নৌকা হাতে তুলে নেয়।

গলির লাইটপোস্ট আলোহীন। বিষণ্ণ একফালি চাঁদ। চিলতে বারান্দায় নিতাই, হাতে ধরা কাগজের নৌকা। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত গোটোনো লুঙ্গি, এলোমেলো চুল। বারান্দার উল্টোদিকে গলির ওপারে দোতলা বাড়ির ছাদ ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নারকেল গাছের পাতারা অল্প অল্প দুলছে।

অল্প অল্প দোলা পাতাগুলো কি ডানা হল? একটা গাছ কি সোজা উড়ে গেল আকাশে? উড়তে উড়তে আকাশে মিশে গিয়ে তারপর কাত হয়ে নামতে থাকল নিচে, আর তার পিঠে চেপে ছাদে এসে নামল—হ্যাঁ, স্পষ্ট চিনতে ভুল হয় না নিতাই-এর নামল আলাদিন।

আলাদিন, দুহাজার টাকা...

আলাদিন ঠোঁটে আঙুল রেখে বলে—চুপ, সবাই শুনে ফেলবে।

এবার ফিসফিসিয়ে বলে নিতাই—দুহাজার টাকা,

আলাদিন—ফিসক্যাল পলিসি বোঝ নিতাই?

না।

ঘাটতি বাজেট বোঝ?

না।

আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বোঝ?

না।

আমদানি-রপ্তানি ব্যালান্স বোঝ?

না, কিস্যু বঝি না— তোমার আশ্চর্য প্রদীপটা দেবে? দাও না।

দেব, তবে এখন না।

কখন? কবে দেবে?

দেব, দেব— সময় হলেই দেব, অত ছটফট করলে কি কিছু পাওয়া যায়? এখন চোখ বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক তো দেখি—

চোখ বোজে নিতাই। দলবন্ধ মেঘেরা চাঁদের দখল নিলে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসে। নিতাই দুহাত বাড়ায়, শুকনো পাতার মতো টুপ করে খসে যায় কাগজের নৌকা, হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে নিতাই, দাঁড়িয়েই থাকে, দাঁড়িয়েই থাকে...। □

মর্গে দুখিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ

উ দ য় ভা দু ড়ী

১০ তারিখ, ডিসেম্বর দশ, সন্ধের মুখটায় দুখিয়া মারা গেল। দুখিয়া মরবেই, এটা আমাদের জানাই ছিল। শুধু মৃত্যুর সঙ্গে সে কতক্ষণ পাঞ্জা লড়তে পারে সেটাই ছিল দেখবার।

অন্তিম মুহূর্তে দুখিয়ার কাছে আমরা কেউই ছিলাম না। গঙ্গাজল সম্বন্ধে ওর একটা দুর্বলতা ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর কলকাতার যে এলাকায় ওর বসত, ওর এবং ওর ঠেলাগাড়ির স্ট্যান্ড, সেখানে গঙ্গা জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্নান করা, কাপড় কাচা তো আছেই, পানীয় বা রান্নার জল হিসেবেও গঙ্গোদক স্বীকৃত, চল্লিশ বছর কেন, সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়া থেকে, যখন স্ট্রান্ড রোড বরাবর বিভিন্ন বাজারের পত্তন হয়েছিল। চুনের আড়ত, চিটেগুড়ের আড়ত, নুনের, তামাকের, চিনির কীসের নয়। একটু এগিয়ে গেলেই নিমতলায় কাঠের আড়ত। রাস্তার এদিকটায় আলু পোস্তা, পেঁয়াজ পোস্তা। মাঝবরাবর একটা ট্রামলাইন ছিল আগে, এখন নেই। রাস্তার ধারে ধারে কিছু ঝুপড়ি, মাথা ভাঙা কলে, গঙ্গার জোয়ারের জলই প্রচণ্ড তোড়ে উঠতে থাকে ফোয়ারার মতো। যদি তেল মেখে, গঙ্গার মাটি মেখে ঘাটে গিয়ে স্নান না হল, তো আন্ডার গ্রাউন্ডের পাইপের গঙ্গাজলই সই। পাইপবাহিত, গঙ্গা তো গঙ্গাহী হ্যায়, দুখিয়া বলত। শেষ মুহূর্তে দুখিয়া যখন বিধ্বস্ত, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে করে আরও কিছু নিঃশ্বাসের জন্য প্রাণপণ আঁকুপাঁকু, তখন ওর বেদম হাঁ করা মুখে কয়েকফোঁটা গঙ্গাজলের প্রশান্তি হয়তো তার পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তটিতে আমি বা আমাদের কেউ দুখিয়ার পাশে ছিলাম না। ওর দেশওয়ালি রামখিলাওন, সেও একই পেশার—শহরের এই এলাকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠেলাওয়ালা, বিকেলের দিকে আমাদের ঠেলাচালক সমিতিতে গিয়ে মাথা নিচু করে বলেছিল, দুখিয়া আর বাঁচবে না। তার থাকার কথা ছিল, থাকলেও পারত শেষসময়ে, ছিল না।

আমাদের ঠেলাচালক সমিতির সক্রিয় সহযোগী, দুখিয়া, চল্লিশ বছরের ওপর, শহরে, কলকাতার এ-মাথা থেকে ও-মাথা ও তার নিজস্ব বৈধ লাইসেন্সযুক্ত ঠেলা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনও এরকম কিছুই ঘটল না, শুধু আটই ডিসেম্বর রাত্রে কারা যে এভাবে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমরা অনেক খোঁজ করেও তার হদিস করতে পারিনি।

শহরের এ-দিকটা সেভাবে দাঙ্গাবিধ্বস্ত না হলেও ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হয়েছে। আনসার আলির তামাকের গুদামে আগুন লেগেছে, নন্দরাম ভূষিওয়ালার চিটেগুড়ের গদিতে বোমা পড়েছে, রাস্তার ওপর, ফুটপাতে রাখা, বিশ-তিরিশটা টিন বিস্ফোরণে

ফেটে-ফুটে গেছে—রাস্তায় ফুটপাতে গড়াচ্ছে, ওদিককার ছয়-সাতটা দোকানের দেওয়ালে ছিটে পড়েছে।

দশ তারিখ দুপুরেও এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হচ্ছিল, দুখিয়া বাঁচলে বেঁচে যেতেও পারে। আমাদেরই একজন বলেছিল, ঠেলাওলার জান, কঠিন জান — এত সহজে যাবার নয়।

দুখিয়া যে অবস্থায় হাসপাতালে এসেছে এবং তারও পরে দশ ঘন্টার ওপর মৃত্যুর সঙ্গো যুঝে গেছে, তাতে আমরা খানিকটা অবাকই হয়েছি এবং সত্যিই ক্ষীণ আশা পোষণ করতে শুরু করেছিলাম, দুখিয়া হয়ত এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠবে। আমরা মনে মনে ওর আঘাতের একটা পরিমাপ করারও চেষ্টা করেছিলাম। বছর সাত-আট আগে, চিৎপুরের কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় ট্রামলাইনে আটকে পড়া ঠেলার চাকা তোলা যাচ্ছে না। দুখিয়া আর তার সঙ্গী কে ছিল, এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ঘোর শ্রাবণের কলকাতা, তায় চিৎপুরে—পিছনে বিশাল এক জ্যামজট, অধৈর্য ট্রামের ঘন্টি, তার পিছনে আটকে পড়া ডবল ডেকারের যাত্রীদের অশ্রাব্য খিস্তি, বিচলিত দুখিয়া, বৃষস্কন্ধ ছিল সে, ঠেলার চাকায় কাঁধ লাগিয়ে তিন টন মাল চাপানো, ঠেলার চাকায় সমস্ত দম লাগিয়ে ট্রামলাইন থেকে সরে যেতে লড়ে যায়, ভয়ংকর ঠেলায় আহাম্মকী, মর্মান্তিক লড়াই। দুখিয়া পা পিছলায়, ঠেলা সরে যায়, কিন্তু ট্রামের লোহার চাকা দুখিয়াকে হেঁচড়ে নিয়ে অন্তত দশহাত।

দুখিয়া কিন্তু বেঁচে ফিরল। মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির এই একই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন, ওর দেশওয়ালি দু-তিনজন, সঙ্গো রামখিলানও ছিল, আমি ওকে রিলিজ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেবার পাঁজরের কটা হাড়ে চিড় ধরেছিল। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা বাদ চলে গিয়েছিল। মাথার যেখানটা থেঁতো হয়ে গিয়েছিল ট্রামের লোহার চাকার পার্শ্বচাপে, সেখানে অর্ধবৃত্তকারে দশ-বারোটা সেলাই পড়েছিল। এই কদিন আগে শিব চতুর্দশী না কোন পরবে মাথা নেড়া করেছিল দুখিয়া, ওর মাথার পিছনে বাঁদিকের কান ঘেঁষে সেই সেলাইয়ের অর্ধবৃত্তাকার দাগটা প্রকট দেখা গেছে। এখন দুখিয়ার আইডেনটিফিকেশন মার্ক।

হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিল, ধরে নিন ও মরেই এসেছে। নিজে আসেনি, কে বা কারা ওরই ঠেলাতে ওকে চাপিয়ে মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির হাসপাতালের সামনে ফেলে রেখে গেছে।

বিষয়টা আমি যতই গভীরে ভাবার চেষ্টা করছি, ততই আমার কেমন অদ্ভুত লেগেছে, সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। এমন নয়, দুখিয়াকে আমি বিশ বছর ধরে চিনি বলেই দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে, তার হত্যারহস্য নিয়ে আমি আলাদা ভাবে মেতে উঠছি। দাঙ্গায় খুন, রাহাজানি, জখম লুটপাটের মোটিফ, অন্তত যেখানে লড়াইটা ফুটপাতে প্রকাশ্য রাজপথে অনেকটাই তাৎক্ষণিক মনে হয়। পরিকল্পিত খুনের সঙ্গো এই সাময়িক চাগাড় দিয়ে ওঠা জিঘাংসার সম্ভবত তুলনা চলে না। দুখিয়াকে মেরে, এমন কি রাম মন্দির বা বাবরি মসজিদ কোনো ইস্যুই ঠিক কীভাবে কতটা এগোবে, অন্তত আমাদের এই মেট্রোপোলিসে, তার বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র—পোস্তায়, বড়বাজারে

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

দুখিয়া মৃতই এসেছিল বলা ভালো। কে বা কারা যেন তাকে ভোররাতে হাসপাতালের সামনে তারই ঠেলাতে ফেলে রেখে গিয়েছিল, তারা কারা? রাম সমর্থক, নাকি বাবরি সমর্থক, অথবা এর বাইরে কোনো তৃতীয় গোষ্ঠী, অন্য কিছুর সমর্থক, অথবা সেরকম কিছুই নয়, হয়তো দুখিয়ার রক্তাপ্লুত শরীরের কাছে তার ঠেলা ছিল বলে, তাতেই চাপিয়ে— যেই আনুক, হাসপাতালের সামনে ফেলে দিয়ে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে, হয়তো তারা দুখিয়াকে চেনে অথবা চেনে না, দুখিয়া বাঁচুক, বাঁচার শেষ চেষ্টা করুক তারা চেয়েছিল। সম্ভবত পুলিশের ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তারা ঠেলাটিকে রেখেই পালিয়ে গেছে।

সেই ট্রামের পাইলট আর কনডাকটারদের নিয়ে আমরা বেশ খানিকটা টানাহ্যাঁচড়া করেছিলাম। কলকাতা বলেই কি না জানি না, দুখিয়া, রক্তাক্ত ট্রামের চাকায় খানিকটা থেঁতলে যাওয়া ঠেলাওয়ালা, তাৎক্ষণিক একটা গণসমর্থন পেয়েছিল। ক্ষিপ্ত পথচারী দু-একটা চড়থাপড়, কিলঘুঁষিতে শেষ করলেও, ঠেলাওয়ালাদের সংগঠিত প্রতিবাদে পরবর্তী ঘন্টা তিনেক কলকাতার এই প্রান্তে, হুগলি নদীর অন্তবাহিকার সমান্তরালে যানজট। সেই জট ছাড়াতে শেষাবধি লালবাজার থেকে একজন ডেপুটি কমিশনারকেও ছুটে আসতে হয়েছিল।

এবারেও পুলিশ এসেছে, বড়বাজার থানার সাব-ইনস্‌পেক্টর পাকড়াশি, এসেছেন প্রায় ঠেলার ওপর শায়িত দুখিয়ার অর্ধমৃত শরীরের পিছু পিছু। ঠেলার ওপর রক্তাপ্লুত দেহটি যে মানুষের, এতদঞ্চলের—দুখিয়া ঠেল্যাওয়ালার, এটা সাব-ইনস্‌পেক্টর পাকড়াশির জীপগাড়ির হেডলাইটের দৈবী আলোতেই ধরা পড়ে।

খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে পৌঁছলে, এক জেনারেল ডিউটি এ্যাসিস্ট্যান্ট, এই হাসপাতালে আমার যাতায়াতের সুবাদে—ওই ঠেলাচালক বা রিক্সাচালক সমিতির তাগিদেই মুখচেনা, বললেন, প্রাণ আছে— তবে আর আধঘন্টাটাক পার হলেই নাকি সোজা মর্গেই পাঠাতে হত।

দুখিয়া মর্গেই গেল শেষপর্যন্ত, কেবল সে তার প্রাণশক্তিতে, ঠেলায় লাগানো জোয়াল টেনে অভ্যস্ত, বৃষস্কন্ধে খানিকটা লড়াই দিয়ে গেছে। অসম লড়াই, কিন্তু লড়েছে—ছত্রিশ ঘন্টা।

অনেকটাই আমাদের হস্তক্ষেপে, আমাদের কয়েকজনের মদতে, সমিতির তিনজন রক্ত দিয়েছিল, দুখিয়ার রক্তশূন্য হিম হয়ে আসা শরীর—ডিসেম্বরের পারদ কলকাতাতেও যখন মধ্যরাতে চোদ্দ-পনেরো, তখন খানিটা উষ্ণতা পেয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন, আমাদের তো চেষ্টা করতেই হবে, নাকে অক্সিজেনের নল, একদিকে জীবনের লবণ, অন্যদিকে রক্ত, আমরা রসদ জুগিয়ে যাচ্ছিলাম, দুখিয়াকে যেন বলেছিলাম, রক্তে-রক্তে, এটাই আমাদের লড়াই, অযোধ্যার বিরুদ্ধে লড়াই, বাবরির বিরুদ্ধে লড়াই। আবেগ, হবেও বা।

নার্স বলেছিলেন, গলার জখমটাই মারাত্মক, হেঁসো কিংবা রামদা—নেপালা বা ভোজালি হতে পারে। কাঁধের যেখানটায় আততায়ী নির্মম টেনেছে সেখান গজ,

ব্যান্ডেজ ধরে রাখা শক্ত, কাঁধ ঘেঁষে পশু বলি দেওয়ার আদলে, শুধু কী করে যে কণ্ঠনালী, আর দুটো জরুরি ভেন বেঁচে গেছে, নার্স আশ্বস্ত করতে চাইছিলেন, দেখুন কী হয়। মধ্যরাতে নগরীর তাণ্ডবে তিনিও লড়েছিলেন, সাদা পোশাকে নিঃশব্দ পদচারণায়, তিনি এবং গোটা হাসপাতালের আহত-নিহত আর তাদের আত্মীয় পরিজন, স্বজনবর্গ আর পুলিশের স্কুটারের সেই ভয়ংকর নৈরাজ্যে একটা কলকাতা, একটা হাসপাতালের কয়েকটা ওয়ার্ডে ধরে রাখতে চাইছিলেন, অকুতোভয় ভালোবাসায়। এমন একটা পরিসর চাইছিলেন যা, আমি দেখেছি অযোধ্যা নয়, রাম নয়, রহিম নয়। অন্য একেবারে অন্যকিছু।

কলকাতাকে অত্যন্ত দ্রুত ফিরে পেতে চাইছিল সবাই। ধরে নেওয়া যেন, সামনের বেড়ে শায়িত দুখিয়া ঠেলাওলার গলায় কোপ পড়েছে, অন্য কোনো কারণে। শহরের নৈমিত্তিক খুন, জখম ধর্ষণ, রাহাজানির জগতের কাম্য নিরুদ্বেগ তারা খুঁজে পেতে চাইছিল। শহর থাক শহরে, তার নিজস্ব ক্ষত ঘা পচন নিয়ে, তাতে অযোধ্যা কেন?

সাব-ইনসপেক্টর পাকড়াশি, মধ্যবয়স্ক, মাথার চুলে অল্প পাক ধরেছে, হাসপাতালের চত্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, কলকাতায় দাঙ্গা, মানে বুঝতে পারছেন কম্যুনাল ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হয় আপনার? লোকজন হানাহানি করবে, খুন জখম করবে শুধু হিন্দু বলে, শুধু মুসলমান বলে? কলকাতায়? হয় বলুন?

জীপে উঠতে উঠতে বললেন, পেশেন্টের জ্ঞান এলেই, আমায খবর দেবেন, স্টেটমেন্ট নেব. হতেও তো পারে এটার সঙ্গে বাবরির কোনো সম্পর্ক নেই। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, আমার জন্ম কিন্তু ওই বাংলায়। পার্টিশানের পর এসেছি। পাকড়াশিকে আমি এর আগেও কয়েকটা উপলক্ষে দেখেছি। প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি দাঁড় করিয়ে পয়সা তুলতেও দেখেছি, সিকিটা, আধুলিটা, টাকাটা। আজ এই হাসপাতালে মধ্যরাতে পাকড়াশির ভিতরের সাব-ইনস্‌পেক্টর মাথা ঝাঁকাচ্ছিল, না এটা অযোধ্যা ইস্যু নয়, রামমন্দির বাবরি মসজিদ নেই এতে—দুখিয়া বা তার ঠেলা কলকাতার অনুষঙ্গ। ডিসেম্বরের সেই দিনগুলি, রাতগুলি বলেই বোধহয অযোধ্যা ছুঁয়ে যাচ্ছিল শহরের সমস্ত মৃত্যুকে, রাহাজানি আর লুটপাটকে।

এমতো অবস্থায় দুখিয়া একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিল। ন তারিখ ভিজিটিং আওয়ার্সে এসে আমরা শুনলাম, বিকেলের দিকে কয়েক লহমার জন্য দুখিয়া চোখ মেলে তাকিয়েছিল, নিষ্পলক, সাব-ইনস্‌পেক্টর অজিত পাকড়াশি আগের দিন দুজন নামজাদা সমাজবিরোধীকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করে গিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারেই কয়েকটা অস্থায়ী চালায় ওরা আগুন দিয়েছিল। পরে আমি শুনেছিলাম, ধর্মত একজন হিন্দু, একজন মুসলমান, একই গ্যাংয়ে অপারেট করে। চালাগুলো অস্থায়ী দোকানঘরের। পান-বিড়ি, চা, পাইস হোটেল, ছেঁড়াছাঁটকা তামাকপাতার কারবারী সব, লোকগুলোকে উচ্ছেদ করে ওরা নতুন লোক বসাবার তালে ছিল। অসমর্থিত সংবাদ, পাকড়াশিও বিশদ হননি, কোনো এক স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের মদতেই এরা নাকি দাঙ্গার রাত্রে, আরেকটি সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করেছিল।

পুলিশের একাংশেরও নাকি সায় ছিল, এই উচ্ছেদে, নতুন পত্তনিতে। কোন্ পড়তি

ঠিকা টেনান্সির মালিকের ওই এক চিলতে জমি, বহুদিনই সরকারের কোনো এক ডিপার্টমেন্টের হাতে। বেওয়ারিশ সেই অর্থে, কিন্তু অযোধ্যায় রামমন্দির বা বাবরি মসজিদ হলে যা হয়, আর কি, পাশাপাশি দুই থানার মধ্যেও জ্ঞাতব্য সম্পর্কে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফাঁক থেকে যায়। এখানেও ছিল। অযোধ্যার ছয়ই ডিসেম্বরের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজবিরোধীদের পুলিশ চার্জ করে। দুজন এখন এই হাসপাতালে এমার্জেন্সিতে, নিজেদের জ্বালানো আগুনেই একজন পালাতে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি বার্ণিং ইন্‌জুরি নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। অন্যজন একটু ভালো।

এটা অযোধ্যা বলুন তো, পাকড়াশি জিজ্ঞেস করেছিলেন। এ তো মশায়, আপনাদের ভাগজোকের লড়াই, এলাকা দখলের লড়াই, নয় কী? একটা পান মুখে ফেলে, দুবার চিবিয়ে পাকড়াশি বললেন। ফচ্ করে পিচ ফেললেন।

দুখিয়া যখন চোখ মেলেছিল, তখন তা সজ্ঞানে কিনা, ওয়ার্ডের সিস্টার বলতে পারলেন না। তন্দ্রার মতো একটা অস্ফুট অবস্থায় বিড়বিড় করে কী যেন বলেছিল শোনা যায়নি। একটু দ্বিধাগ্রস্ত বলেছিল, জয় রামজীকা, বলেনি তো!

নার্সের দেওয়া এই তথ্যের মধ্যে পাকড়াশি অযোধ্যার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে একটু বিমর্ষই যেন, বললেন, ও তো আপনার সমিতির লোক, ও কি বজরঙ্গাবলীর দলে ভিড়েছিল!

সত্যিকথা বলতে কি, বজরঙ্গাবলীর দলে ভিড়ে থাকলেও, আমি বা আমাদের ঠেলাচালক সমিতির কেউই তা জানতাম না। চোখ খুলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, ধরা যাক দুখিয়ার মতো মানুষের চল্লিশ বছরের ঠেলাওয়ালার অবচেতন বলে যদি কিছু থাকে, সেখানে, শ্রীরামচন্দ্র কি এভাবেই আছেন, থেকে গেছেন যে, নাকে অক্সিজেনের নল, গলায় গভীর রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে সে নিমেষের জন্য চোখ খুলে জয়রামজীকা বলেছে? দুখিয়া রোজ গঙ্গা স্নান করত এটা তো সত্য!

এ অবস্থায় মাগো, বাবাগো কিংবা হায় আল্লা প্রভৃতি কাতর উক্তি কেবল দিনগুলো ডিসেম্বরের অযোধ্যা ছুঁয়ে থাকে বলেই কী তা একান্তই সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত অবচেতনের স্বাতোক্তির যা সেক্ষেত্রে গর্ভধারিণী নয়, বা নয় উত্তরাধিকারের পরিচিতি বা বংশগতিতে চিহ্নিত হয়, হায় আল্লা অথবা জয় রামজীকা শব্দে অস্পষ্ট বেদনার্ত ধ্বনিতে এবং সমস্তটাই অযোধ্যা প্রভাবিত, রামচন্দ্র প্রভাবিত। ঠেলাচালক সমিতির অন্যতম পুরনো কর্মী হলেও, আমার কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো লাগে নিজেকে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম, দুখিয়া আরেকবার চোখ খুলুক, ওর সেই চেনা চোখ সচেতনে, অন্য কিছু বলুক, অন্য কিছু। রাজপথে সমিতির, মেহনতী মানুষের লড়াই করতে গিয়ে ও গলায় ভোজালি বা নেপালার কোপ খায়নি যে ও ইন্‌ক্লাব বলবে তবুও ও অন্যকিছু বলুক। আমি আশ্বস্ত হতে চাইছিলাম। ও কোনো প্রিয়জনের নাম বলুক, শ্রীরামের নয়, ওর পেয়ারের সেই মেয়েছেলের কথা বলুক, তার নাম ধরে ডাকুক—হলেই বা রানডি, হাড়কাটার গলির কোনো অন্ধকূপ থেকে ছিটকে পড়া মোতিবিবি, তবু একবার চোখ খুলে, ওর তো আপনার জন বলতে এখন মোতিবিবিই, ও মোতিবিবির নাম বলুক, অস্ফুটে! মানুষ মানুষ থাকুক—চাইছিলাম।

এমন একটা অদ্ভুত ভাবনা আমার মাথায় কেন এল, জানি না, স্পষ্টত ধর্ম বিষয়ে বা রামবিমুখতা নয়, তবু ওই রাতে রক্তাপ্লুত সংজ্ঞাহীন দুখিয়ার অবচেতনে হাড়কাটা গলির বেবুশ্যের নাম অস্ফুটে তার মুখে আমি শুনতে চাইছিলাম। জয় শ্রীরাম নয়, মোতিবিবি—অবচেতন যাকে ছুঁতে পারে, চেতনা যাকে ছুঁয়েছে এমন একজন স্বজন। যেন দুখিয়া চোখ খুলে হাড়কাটা গলির সেই বেশ্যাটার নাম বললেই কলকাতা স্বাভাবিক হবে।

দুখিয়া চোখ খুলেছিল, আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে একবার এবং সেটাই শেষবার। বিস্ফারিত চোখ মেলে সে গত শতকের শেষদিকে তৈরি এই পুরনো বাড়িটার কড়িবরগার সংযোগস্থলে দৃষ্টি স্থির রেখেছিল। সে কিছু বলেছিল কিনা, দশ তারিখে, ডিসেম্বরের দশ, সন্ধের মুখটায়, কিছু বলার জন্যই সে চোখ খুলেছিল কিনা কেউ বলতে পারে না। সাব ইনসপেক্টর পাকড়াশিও এসেছিলেন, খোঁজ খবর নিলেন, যদি শেষসময়ে একান্তে কাউকে কিছু বলে থাকে।

মৃত্যুর সময় দুখিয়া তার নির্দিষ্ট বেডে ছিল না। সে ফিমেল ওয়ার্ডে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখটায় মরে পড়েছিল। বিস্ফারিত চোখে, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, তার কটা চোখের মণি প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে, সে শেষবারের মতো কলকাতার বাতাস বুক ভরে নিতে চেয়েছিল।

আসলে ন তারিখ কোনো একসময় আমরা শেষবার ওকে দেখে আসার পর, অথবা দশ তারিখেই দুখিয়াকে লোহার বেড থেকে, তোষক-রক্তাক্ত চাদর, যা বৃষস্কন্ধ তাকে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল নির্ঘাৎ—দুখিয়া তার চওড়া পিঠটাকে পুরোপুরি বিস্তৃত করে দিতে পেরেছিল, কোনো একসময় মেঝেতে দুটো কম্বল পেতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোতলায় ফিমেল ওয়ার্ডে ওঠার সিঁড়ির মুখটায় দুখিয়া কতক্ষণ ছিল, আমার জানা নেই। আমরা সেদিন শান্তি মিছিল, স্থানীয় জনসংযোগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলাম বলেই বিষয়টা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর দোষারোপ করা সম্ভবত ঠিক হবে না। এমনিতেই জনাকীর্ণ এতদঞ্চলের এই হাসপাতালে লোহার যে কটি বেড আছে, তাতে স্থান সঙ্কুলান হয় না। সারাবছরই বেশ কিছু রোগীকে কম্বল পেতে ভূমিশয্যা নিতে হয়। আর ডিসেম্বরের নয় তারিখ অথবা দশই, সারাদিন তো আপৎকালিন অবস্থা।

আমাদের কেউ দুখিয়াকে আবিষ্কার করে, হাসপাতালের দোতলার সিঁড়ির একপাশে জীবিত না মৃত ঠাহর করতে সময় লাগে একটু, তারপরই, ঠেলাচালক নির্ঘাত, সে তুলকালাম শুরু করে। দুখিয়া মৃত, সে সিঁড়ির ওপরে প্রায় তিনতলা সমান উঁচুতে কড়িবরগার সংযোগস্থলে বিস্ফারিত চোখ মেলে, মরে কাঠ হয়ে আছে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছই তখন রাত প্রায় আটটা, দুখিয়া সেভাবেই সিঁড়ির মুখে। গলার কাছে গভীর ক্ষত কোনোমতে চাপা দেওয়া হয়েছিল, রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘাড়ের একপাশ থেকে বুকের অনাবৃত খানিকটা অংশ পর্যন্ত চাপচাপ পাঁশুটে। আর সেই রক্তে গায়ের চাদর এমন সেঁটে রয়েছে যে, বেশ হ্যাঁচকা টানে চাদরটা খুলে না নিলে, চাদর টেনে দুখিয়ার মুখ, বিস্ফারিত চোখ চাপা দেওয়া যাচ্ছিল না।

আমরা ঠেলাচালক সমিতির কয়েকজন সদস্য, দুখিয়ার দেশওয়ালি ভাই রামখিলাওন হাসপাতালে পৌঁছবার পর, কিছু কাগজপত্রে সইসাবুদ করে দুখিয়াকে মর্গে পাঠানো হল।

সমিতির তরফ থেকে আমরা একটা বড়োসড়ো মালা দিলাম। এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের মালা দেওয়া হয় তেমন ধরনেরই মালা। পুলিশ থেকে বলা হয়েছিল মর্গ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মালা দিতে, কিন্তু সেটা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকার জন্য, কখন দুখিয়ার শব কাটাছেঁড়ার পর ছাড়া পাবে—আজ রাতে না কাল সকালে, আমরা শলাপরামর্শ করে মালা দিলাম।

আমরা অবশ্য হাসপাতালে ইনকিলাব বলতে পারিনি, দুখিয়া তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলব না জাতীয় কিছু বলিনি। ম্যাটাডোরে চাপাবার সময় শুধু কয়েকজন হরিধ্বনি দিয়েছিল, রামনামই সত্য বলেছিল।

আর সম্ভবত আমিই, ঘণ্টাখানেকের এই দমবন্ধ করা সময় অতিক্রম করে পুলিশকে বলেছিলাম, পাকড়াশি নয়, অন্য একজন কনস্টেবল, ওর চোখের পাতাটি নামিয়ে দেওয়া যায় না? একটু দিন না।

কনস্টেবলটি ইতস্তত করে চেষ্টা করেছিল, দুখিয়ার চোখ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। দুখিয়া এবং সঙ্গে আরও দুজনের দেহ নিয়ে ম্যাটাডোর গাড়িটা মর্গে চলে গেল। সমিতির লোকেরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই যে যার ঘরে ফেরার রাস্তা ধরল। নিরাপত্তা বোধের অভাবে, অজানিত আশংকায় তাদের বড়ো দুর্বল লাগছিল। তারা খিল আঁটা ঘরে নিরাপত্তায় আপন মহল্লায় আপনজনের কাছে ফিরে যেতে চাইছিল। আমি বাধা দিলাম না, মর্গে কিংবা আমার নিজের ডেরায়, নতুন বাজারের কাছে একটা ঘরে যেখানে আমি থাকি, কোথায় ফিরব ভাবতে ভাবতে আমি হাঁটতে শুরু করলাম।

রাস্তায় একটু শিশির পড়েছে। আমার ডানদিকে হুগলি নদীর রাত দশটার, ডিসেম্বরের শিশির-ভেজা হাওয়া। রাস্তায় যান চলাচল বড়ো একটা নেই, এখান থেকে মেডিকেল কলেজ আমি বহুবার হেঁটেই গেছি, একটু এগিয়ে গিয়ে কিছুটা জায়গা মুসলমান এলাকা বলে চিহ্নিত। সংশয় যে একেবারে ছিল না, তা নয়— তবু হাঁটতে শুরু করলাম।

আমার পাশাপাশি সহসাই একটা ছায়া, এমন যেন তার শ্বাস পড়ছে আমার পিঠে। আমি বললাম, কী রে, দুখিয়া?

দুখিয়া বলল, জয় রামজীকা।

একটু পরেই আসলমের সঙ্গে দেখা, আসলম কি মারা গেছে? শুনেছিলাম ওর আড়তে নাকি আগুন লেগেছে। আসলম নিঃশব্দে খানিকটা হাঁটে, এমন যে পা ফেলার শব্দ হয় না। খুদা হাফিজ বলে, সে চিৎপুরের এই ট্রাম লাইন যথার্থভাবে রবীন্দ্রসরণি বরাবর নাখোদা মসজিদের দিকে চলে গেল। চলতে চলতে আমি মুসলমান মহল্লা পেরিয়ে গেলাম।

দুখিয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল? মহল্লা পেরতে গিয়ে আমি কিছু ভীতত্রস্ত চোখ

দেখেছি। গলির মুখে মুখে চাপা জটলা শুনেছি। নিজের জন্য ভয় করি না, কিন্তু এই অগ্নিগর্ভে পরিস্থিতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজে দুখিয়া জয় রামজীকা বললেই তো ইস্যু এসে পড়ে—অযোধ্যার রামমন্দিরের, বাবরি মসজিদের। আসলমকে সতর্ক করা দরকার ছিল, ছোটো আড়তদার—তোমার ব্যবসা দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে, তুমি খুদা হাফিজ বলবে না।

দুখিয়া বলল, এবার রামনবমীতে ছাপড়ার দল আসবে, সমিতি থেকে দুশো টাকা চাঁদা লাগবে বাবুজী।

ছাপড়া দুখিয়ার নিজের জেলা। গত নির্বাচনে, ও আর রামখিলাওন উদ্যোগ নিয়েও ছাপড়ার দল আনতে পারেনি। সেবার তিনদিন রামধনু হয়েছিল লোকাল টিম নিয়ে। চারদিনের মাথায় নির্বাচনী প্রচার। রামের সুবাদে আমরা ভোট কতটা পেয়েছিলাম জানি না, তবে রামায়ণ গানের ব্যবস্থা তাও একেবারে দ্বারভাঙ্গার দেহাতি গায়কিতে সমিতিই যে করেছিল এটা ঠিক। আর সমিতির পৃষ্ঠপোষক যে রাজনৈতিক দল, বামপন্থীই অবশ্য, তাদের ভোটের দু-দুটো মিটিং তো রামায়নের মঞ্চে গান শুরু হওয়ার ঘন্টাখানেক আগেই করতে হয়েছিল—বলা ভালো জনসমাগমের জন্য, হয়তো বা ভোটের জন্য। কোলিয়ারি থেকে আমাদের যে নেতা এসেছিলেন, তিনি তো সরাসরি বিরোধীপক্ষকে রাবণের সঙ্গে, আমাদের দলের নেতাকে রামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, দেহাতি হিন্দিতে। সভায় ধ্বনি উঠেছিল জয় রামজীকা, জয় বজরংগবলী।

দুখিয়া আমার সঙ্গে ছায়ার মতো হাঁটছে। ফিসফিস করে কথা বলছে। দুখিয়াই তো? কথা বলতে ওর কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝি। হাত বুলিয়ে দেওয়ার উপায় নেই, কণ্ঠনালীর কয়েক চুল তফাতে সেই গভীর ক্ষত থেকে চুঁইযে রক্ত পড়ছে, কলার বোনের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িযে বাঁদিকে বুকের ওপর নেমে আসছে। চোখ একইভাবে বিস্ফারিত,এখন পচা মাছের চোখের মতো বর্ণহীন চোখের কটাশে মণি দুটো এই যা। যেন এক ভয়ংকর অন্ধ প্রখর দৃষ্টিতে দেখছে, আমি ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলাম।

দুখিয়া বলল, আসলমদের চাঁদা নিয়ে তুমি যে মুলুকে মজলিশ করলে, হাদিস হল কুরান হল—মিউনিসিপলটি ভোটে আমাদের রামায়ণটা বাদ দিলে বাবু? এটা সত্যিই, এই মহল্লাটা, যেটা আমি একটু আগে পার হয়ে এলাম, আসলমই পার করে দিল, চেয়েছিল—শুধু ভোটের মিটিং করলে লোক হবে না কমরেড, বলেছিল, একটু মজলিশ হক, হাদিস, কোরান আসুক—মৌলবী আসুক। বক্তারা বলুক হজরত, শেষ নবী সমাজতন্ত্র চেয়েছিল। আশ্চর্য, খিদিরপুর আড়ত থেকে আসা আমাদের বক্তা তাই বলেছিল। আমরা ভোট কী পেয়েছিলাম জানি না। আমার অবচেতনে এখানে রক্তাক্ত দুখিয়ার পাশাপাশি, বিশেষত ও যেভাবে চোখ মেলে আছে, হাঁটতে হাঁটতে আমি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে আমার এবং আমাদের দলের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম একটা যোগসূত্র খুঁজে পাই যেন, শ্রীরাম কিংবা হাদিসের উপযোগী ব্যবহারে।

আর এই অবস্থাতেই দুখিয়া অদৃশ্য হয় সহসাই। হঠাৎ যেন বুঝি, ছায়াটা ছিল, এখন নেই। আমি তখন মেডিকেল কলেজের কাছে, মর্গের প্রায় সামনে।

ঠেলাসমিতির আমরা, সহকর্মীদের শ্বাস-প্রশ্বাসে রাম আছে, বজরংগবলী—গলা টিপে তা তাদের ভিতর থেকে বার করি কী করে? যেটা আছে সেটাকে ওই জিনবাহিত, ডি.এন.এ অনুষঙ্গে রাম, তাকে রাজনীতির আঙিনা থেকে, ভোটবাক্সের গণতান্ত্রিক লীলাখেলা থেকে সরাই কী করে? ধর্ম জনতার আফিং এবং আফিং বড়ো খারাপ বস্তু বলাতে রামখিলাওন তো একবার বলেই ফেলল, আফিং বহত বড়িয়া চিজ। ওর বড়োবাবা অর্থাৎ ওর ঠাকুর্দা রোজ নাকি বেশ খানিটা আফিং গুলির মতো পাকিয়ে খেত, তার সঙ্গে দু-সের দুধ নয়তো পোউয়া দুধমালাই খেত। ওদের মহল্লায় ওর বড়বাবা ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল।

মর্গের সামনে অত রাতেও আট-দশজন পুলিশের একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, দুখিয়ার দেহ মর্গের মেঝেতে শোয়ানো আছে। ডাক্তার আজ রাতেই আসবেন। না এলে কাল সকালে ছুরি ধরবেন।

আট-দশজনের ছোটো জটলার মধ্যে থেকে, আমি মর্গের সামনের বারান্দার একপাশে, একটু দূরেই কে যেন এগিয়ে আসছে। মাথায় অনেকটা করে ঘোমটা টানা, স্ত্রীলোক। মুখ দেখা যাচ্ছে না বলে, অধিকন্তু চারপাশের আলোগুলো এমন টিমটিমে, আমি চিনতে পারছি না।

মহিলাটি প্রায় আমার সামনে, এমন যে তার ছোট্ট ছায়া আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, একটু লক্ষ করলে আদলটা যেন চেনা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কিছু বলবেন?

সে বলল, হামার নাম তো মতিবিবি, হাপুনে কী পহচানবে?

মতিবিবি, দুখিয়ার ঠেলাকেন্দ্রিক সংসারে তিন-চার বছরের ঘরণী। আমি তো দেখেওছি। পোস্তায় কিছু দোকানের সামনে পেঁয়াজ বাছে, রসুন বাছে—ঝটতি-পড়তি কিছু পেঁয়াজ, রসুন নিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডের পাশে ফুটপাতে বসে।

বছর পাঁচেক আগে এক শীতের রাতে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ঠেলাটাকে ফুটপাতে এক অদ্ভুত কায়দায়, দুনিয়া যখন ঠেলার নীচে ঘুমোয় তখন প্রায়ই সেই কায়দায় ঠেলাটাকে একটা চারচালার চেহারা দেয়, দুখিয়া ঘুমোচ্ছিল। একটু দূরে ছোট করে একটা আগুন করা হয়েছিল। ঠেলার ওপর, শীতের হিম-শিশির থেকে বাঁচার জন্য একটা কালো পলিথিন সামিয়ানার মতো, ঠেলার নীচে কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দুখিয়া ঘুমোচ্ছিল। সেইসময়, রামখিলাওন রামকসম বলেছিল—সে দেখেছে ওই মাগীটা, রাণ্ডীটা ঠেলার নীচে ঢুকছে। সরম কী বাত, তারপর কী হয়েছে, রামখিলাওন দেখেনি।

কিন্তু মোতিবিবি থেকে গেছে, ফুটপাতের ওপর পেঁয়াজ রসুনের সওদা নিয়ে, মাঝে মাঝে বড় একাকিত্বের রাতে, অতীব অসহায় মুহূর্তে পোস্তাও যখন শুনশান, ফুটপাতে ঠেলার নীচে মানুষ মগ্ন ঘুমে বা হয়তো স্বপ্নে, মোতিবিবিও থেকে গেছে, কয়েকঘণ্টা দুখিয়ার পঞ্চাশোর্ধ বৃষস্কন্ধ শরীরের উত্তাপে।

মোতিবিবি বিধর্মী এটা জানার পর ওর দেশওয়ালি কয়েকজন আতঙ্কিত হয়, পঞ্চায়েত ডাকে এবং দুখিয়াকে জানায় কলকাতায় কিছু না হলেও দেশে তার হাল বহুত খারাপ হয়ে যাব।

দুখিয়া কবে কলকাতা এসেছে, সে নিজেও তা বলতে পারে না। শুনেছি, ছেচল্লিশের দাঙ্গা নাকি সে দেখেছে, তব হমনে বহুত ছোটা থা। তারপর এই শহরে কোথায় বা মা, কোথায় বাপ, দুখিয়া কীভাবে ঠেলাওয়ালা হয়, লাইসেন্স পায়— তার ইতিবৃত্ত তার দেশওয়ালি অনেক ভাইয়ের মত। দুখিয়া দু-দুবার বিয়ে করেছিল। প্রথমটা ফুটপাতের ধকল সহ্য করতে পারেনি, কলেরায় মারায় গেছে। দ্বিতীয়টি ভেগে গেছে এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে।

বছর কয় হল মোতিবিবি এসে জুটেছে। হাড়কাটা গলির অনেক ভেতরে মোতিবিবি যেখানে ছিল, শুনেছি সেখানে খুব সামান্য হলেও দুখিয়ার যাতায়াত ছিল। সে তো অনেকেরই ছিল। কিন্তু দুখিয়াই কেবল কোনো এক সকালে লোটা হাতে গঙ্গাস্নানে যাবার সময় বিধ্বস্ত মোতিবিবিকে দেখে। কোঠিতে সে কিরায়া দিতে পারেনি, তায় তার গালে, ঠোঁটের পাশে শ্বেতীর চিহ্ন দেখা দিয়েছে, কেউ বলেছে কুঠ—কুষ্ঠ। মোতিবিবি পোস্তার ফুটপাতে দিকভ্রান্ত বসে থেকেছে।

দুখিয়াই তাকে চেনা দেয়, জয় রামজীকি। দেহাতী সুরে দুখিয়া বড়ো ভালো রামায়ণ গাইত।

ডাক্তার এসে গেছেন। যেহেতু হত্যা তা অযোধ্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে হলে, তাঁকে ছেঁড়াকাটা করতেই হবে। মৃত্যুর কারণ বলতে হবে, যা একান্তই শারীরিক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা-উপশিরা সংশ্লিষ্ট। শরীরের বাইরের, যা মৃতের অ্যানাটমির বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না, তা মর্গের কাটাছোঁড়ার হিসেবের আওতায় পড়ে না। ক্ষত দেখে বলা শক্ত কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ দুখিয়ার ওপর এমন মর্মান্তিক আঘাত হেনেছে।

ঘাতক হিন্দুও হতে পারে, মুসলমানও। সম্ভাবনাটা সাব ইনস্‌পেক্টর পাকড়াশিও উড়িয়ে দিলেন না। দুখিয়া লাইসেন্সপ্রাপ্ত চল্লিশ বছরের ঠেলাওয়ালা। স্বভাবতই ঠেলাচালকদের পক্ষেও সেই মুখিয়া। লাইসেন্সবিহীন ঠেলাওয়ালাদের একটা চাপা অসন্তোষ আছে, দুখিয়া বা তার মতো কিছু পুরনো ঠেলাচালকদের ওপর। গতবছর ঠেলার ওপর একটা সরকারি সমীক্ষায় দুখিয়া, রামখিলাওন আরও কিছু পুরনো ঠেলাওলা তো খোলাখুলিই আর্জি জানিয়েছে, তারাই একমাত্র ঠেলাচালানোর হকদার, কারণ তাদের লাইসেন্স আছে। সরকারের, করপোরেশনের বৈধ কাগজ যাদের নেই কলকাতা থেকে ঠেলা উচ্ছেদ হলে, তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত নয়, এই ছিল ওদের বক্তব্য। এ নিয়ে দুখিয়ার আমার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। কারণ, আমাদের সমিতিতে নথিভুক্ত সব ঠেলারই যে বৈধ লাইসেন্স আছে, একথাটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারব না।

মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল—ঠেলা সম্পর্কিত এই ক্ষোভ তো অযোধ্যাকে পেছনে রেখে আত্মপ্রকাশ করতেও পারে। লাইসেন্সবিহীন ঠেলাচালকদের মধ্যে দেহাতী হিন্দু-মুসলমান দুইই আছে। কিন্তু তারা তো কম-বেশি দুখিয়ারই সহোদর, কাজের সূত্রে কলকাতার একই রাস্তায় ঠেলাচালকের সূত্রে, পুলিশ আর করপোরেশনের নানা ঝকমারির সূত্রে, প্রায় একই মাটিতে দাঁড়িয়ে, লাইসেন্স নিয়ে বা না নিয়ে। তাহলে কী লাইসেন্সের গোটা ব্যাপারটার পিছনেও এক কুৎসিত দলীয় রাজনীতি ঢুকে পড়েছে,

তার হাতিয়ারে শান দিয়েছে অযোধ্যা? আমি উত্তেজিতভাবে মর্গে ঢুকে গেলাম।

মর্গের মেঝেতে দুখিয়ার দেহ প্রায় নগ্ন, কিন্তু দুখিয়ার বিস্ফারিত দুই চোখ একইভাবে খোলা। ডাক্তারকে বললাম, আপনি ওর চোখের পাতা দুটো একটু নামিয়ে দিন না।

বাইরে খোলা আকাশের নীচে, এই মধ্যরাতে ডিসেম্বরের কনকনে হাওয়া, কয়েকজন লোক এসে নতুন করে ঢুকল। আমি মর্গের সামনের আলোটা থেকে চোখ আড়াল করে, একটু পাশে অন্ধকারে সরে গেলাম। আমার বমি আসছিল মর্গের মধ্যে বাসি-পচা-গলা মৃতদেহের গন্ধে, খিদে আমার পেটের মধ্যে পাক খাচ্ছিল, কপালের শিরা দপদপ করছিল।

দুখিয়া আমার পাশে নিঃসাড়ে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, গরমিট সব ঠেলা কেড়ে নিলে হামাদের কী হোবে বাবু? লাইসিন যাদের নেই, তাদের ভী হাপনে, সমিতি মদত দিবে, এঠো ঠিক নেই বাবু—

দলের জন্য, মানে সমিতির জন্য সবই করতে হয় দুখিয়া, তাছাড়া যে ঠেলা চালাচ্ছে, লাইসেন্স না থাকলেও সে তো ঠেলাই চালাচ্ছে। সেবার ঠেলা উচ্ছেদ অভিযানে দুখিয়ার ঠেলাও আটক হয়েছিল। দুখিয়া অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে ঠেলা উদ্ধার করেছিল। ঠেলাতে ফুলের মালা চড়িয়ে, চন্দন আর সিঁদুরের টিপ্ দিয়ে সমিতির অফিসে এসে হাঁক দিয়েছিল, জয় বজরংগবলী, জয় রামজীকী!

মার্কস-লেলিন প্রত্যাশিত নয় সেভাবে, দুখিয়া বা তার দেহাতি ভাইদের কাছে। পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে দেখে আমি তাকে রামজীর ব্যাপারটা একটু সমঝে চলতে বলেছিলাম। দুখিয়া বলেছিল, সমিতি ভী থাকবে, রামজী ভী থাকবে।

এই সহাবস্থান বড়ো ঠুনকো বোধ হল। মর্গে দুখিয়ার খোলা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে আমাদের সমিতিরই কেউ দুখিয়ার ঠেলাটার নিশ্চিত অবস্থান যে জানে, দুখিয়া যে ওই ঠেলার ওপরই হিমরাতেও খোলা রাস্তায় শুয়ে থাকে, ঘুমোয় যে জানে — তেমন কেউ যদি ঘাতক হয়ে থাকে? দুখিয়ার চোখ কী সেজন্যই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ওভাবে বিস্ফারিত? সে কি তাকে চিনেছে? সে কি মুসলমান বাবরি-মসজিদ ভেবে, অথবা হিন্দু রাম-মন্দির ভেবে দুখিয়াকে কোপ মেরেছে?

দুখিয়া হিন্দু নেহি আছে, মোতিবিবিকে ও ঘরে তুলেছে। ওরই দেহাতী জাতভাই বলেছে, আমি বললাম ঘর কোথায়, ও তো ফুটপাত। ফুটপাত আর ঘর এক হল?

দুখিয়া হররোজ মোতিবিবির হাতে খানা খাচ্ছে। সে তো কলকাতার ফুটপাতে অজস্র চায়ের দোকান, পাইস হোটেল, ছাতুর দোকান, তোমরা সবার জাত জানো?

দুখিয়া কি তার মৃত্যুর কারণ জানত? শেষ মুহূর্তে ঘাতক তার নেপালা বা ভোজালিতে যখন চরম আঘাত হানতে উদ্যত—দুখিয়ার কাছে তখন কি স্পষ্ট হয়েছিল, এ আঘাত কী জন্য, সে হিন্দু বলে, জাতিভ্রষ্ট হিন্দু বলে, অথবা সে এখানকার বাঁধাধরা রাজনীতিরই আরেক শিকার, সে জানতেও পারেনি অযোধ্যা ইস্যু তার মৃত্যুকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে।

দুখিয়া খোলা চোখে আমার মুখোমুখি। আবছা আলোয় গলার ক্ষত থেকে কালো পাঁশুটে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বিস্ফারিত চোখ থেকে পচা মাছের বিবর্ণ চোখের মণিটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আমি চিৎকার করে মর্গের দরজায় ধাক্কা দিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, আমার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ, লংক্লথের সাদা পাতলুনে কিংবা পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগের ছিটে লেগে আছে, আমিও কী খুন করে থাকতে পারি, পারি না কি? ধর্মের ইস্যুতে হাত ধোয়ার জল কোথায় পাব?

ডাক্তার, আমি সকলকে সচকিত করে আর্তনাদ করে উঠলাম, ওর চোখের পাতা দুটো নামিয়ে দিন। কতক্ষণ ও এভাবে তাকিয়ে থাকবে। সাবইনসপেক্টর পাকড়াশি বললেন, আপনি বাইরে আসুন, আপার জামাকাপড়ে রক্তের ছিটে সবাই দেখতে পাবে। আমি বললাম, জামাকাপড়ে রক্ত কখন, কীভাবে লাগল বলুন তো!

ডাক্তার উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

আমি দেওয়ালের দিকে, একটু অন্ধকার কোণের দিকে সিঁটিয়ে গেলাম। আমার পিঠে হাত রাখল মোতিবিবি।

আর তখনি পুব আকাশে আলোর উদ্ভাস, পরিচিত পাখ-পাখালির ডাক। গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসা সকালের হাওয়া মর্গের ভেঙে পড়া জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। একটু অন্যরকম, তবু একটা সকাল হচ্ছে।

মোতিবিবির মুখ থেকে ঘোমটা সরে গেছে, নাকের পাটার পাশে দু-আঙুল প্যাচ এখন সকালের নরম আলোতেও স্পষ্ট। ওপরের ঠোঁটের একপাশও যেন গলতে শুরু করেছে। কুষ্ঠ।

মোতিবিবি বলল, আপনেরা যান বাবু, হামি আঁখ বুজিয়ে দিচ্ছি।

ক্ষয়া ক্ষয়া পাঁচটা আঙুল প্রসারিত হল, সূর্য খানিকটা আকাশে উঠে এল যেন। পরিচিত কলকাতার ট্রাম-বাসের শব্দে, ঠেলার শব্দে শহর জেগে উঠছে।

মোতিবিবি টেবিলে শোয়ানো দুখিয়ার দেহের দিকে এগিয়ে গেল। দুখিয়ার বিস্ফারিত চোখের ওপর সে বড়ো মমতায় আঙুল কটা নামিয়ে আনল। কোঁকড়ানো গলে যাওয়া নখহীন অমানবিক আঙুল কুষ্ঠগ্রস্ত মোতিবিবির।

আমি দরজার দিকে ফিরে চললাম, শেষ সময়ে দুখিয়ার একান্তে মোতিবিবিকে ছেড়ে দিয়ে। মর্গের দরজার পর একটা করিডর। তারপর কোলাপসিবল গেট—পার হলে কলকাতা।

বাড়ি গিয়ে প্রথম কাজই হবে জামাকাপড় থেকে রক্ত ধুয়ে তোলা। কার রক্ত কীভাবে কখন লেগেছে কে জানে? আজ দুপুরে কোথায়ও আর যাব না, ঘুমোব। বড়ো ধকল গেছে ক-টা দিন।

আমার চোখ বুজতে, ঘুম ভারী হয়ে আসছে, অসুবিধে নেই। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, মোতিবিবি আঙুল ছোঁয়ালেই দুখিয়ার চোখের পাতা নেমে আসবে। কলকাতা স্বাভাবিক হবে। ▢

কাছেই পায়ের শব্দ

ম ণি মু খো পা ধ্যা য়

টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

সদাশিব কারলেকার ধীরে-সুস্থে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলেন। কোনো ব্যাপারেই তিনি তাড়াহুড়ো করেন না। মহারাষ্ট্রের খ্যাতিমান পণ্ডিত তিনি। তাঁর নামের পর অনেকগুলি দেশি বিদেশি ডিগ্রি আছে। দীর্ঘদিন ধরে ইউনিভার্সিটির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরে উপাচার্য হন। এখন তাঁর অবসর জীবন। সেটা অবশ্য কর্মক্ষেত্র থেকে। নিজের বিষয় থেকে আমৃত্যু তাঁর কোনো অবসর নেই। পড়া এবং লেখা এখনও প্রাত্যহিক কাজ।

তিনি নৃতত্ত্বের লোক। বহু প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচনা অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। স্বদেশে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

ফোন যখন ধরতে গেলেন এবং ফোন যখন ছেড়ে এলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁর চেহারার আকাশ-পাতাল ফারাক ঘটে গেছে। এখন তাঁর চোখে মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি সোফার ওপর বসে পড়লেন। নাকের ওপর তাঁর চশমা ঝুলে পড়ল।

ঘরে ঢুকে স্ত্রী অম্বিকা কারলেকার চমকে গেলেন। স্বামীর গায়ে হাত রেখে উদ্‌বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

সদাশিব কারলেকার উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, ওরা কারা?

কাদের কথা বলছ তুমি? অম্বিকা কারলেকারের গলায় আরও বেশি উদ্‌বেগ ঝড়ে পড়ল।

দেয়ালের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে সদাশিব বললেন, আমাকে ফোন করেছিল।

কে ফোন করেছিল?

একই ভঙ্গিতে সদাশিব বললেন, ওরা সবাইকে চেনে। আমার ছেলে, ছেলের বউ, নাতনি। আমার মেয়ে, জামাই, তাদের ছেলে, সবাইকে।

এরকম পারম্পর্যহীন অসংলগ্ন কথায় আরো ভয় পেয়ে গেলেন অম্বিকা। দ্রুত টেলিফোনের কাছে গিয়ে প্রথমেই ফোন করলেন ডাক্তারকে। তারপর একে একে ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে আর জামাইকে।

অম্বিকা নিজেও অধ্যাপিকা। স্বামীর প্রতি তাঁর দুর্বলতা সীমাহীন। অসম্ভব পণ্ডিত, কৃতী, বিষয়বুদ্ধিহীন এই সরল মানুষটিকে তিনি প্রায় সারাজীবন আগলে রেখেছেন।

স্বামীকে হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলেন অম্বিকা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নরম গলায় বললেন, তুমি একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকো।

ইতিমধ্যে হাউস ফিজিসিয়ান এসে গেলেন। দেখে-টেখে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই। কোনো কারণে একটু প্যানিক ডিজঅর্ডার হয়েছে। কয়েকটা রিবোট্রিল দিয়ে যাচ্ছি। এখন একটা খাইয়ে দিন। ভালো বুঝলে আর দেবেন না। প্রেশার বা হার্ট নিয়ে কোনো চিন্তা নেই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন অম্বিকা।

কিন্তু প্যানিক ডিজঅর্ডার কেন? টেলিফোনে কী এমন খবর এল যা শুনে তাঁর স্বামী এতটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন?

এসব নিয়ে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করাটা সমীচীন মনে হল না অম্বিকার। হয় তো নার্ভাসনেসটা আরো বেড়ে যাবে। আগে সবাই আসুক, তখন দেখা যাবে। পরম মমতায় স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগালেন অম্বিকা।

দীর্ঘ পঁযত্রিশ বছর ধরে তিনি মানুষটাকে চেনেন। পবস্পরের অস্তিত্ব যেন পরস্পরের সঙ্গে নিশ্বাসের মতো মিশে গেছে। নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং আদর্শবোধে অবিচল তাঁর স্বামী। অর্থ নিযে কোনোদিন মাথা ঘামাননি। সংসারের কোনো মালিন্য কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। সেই মানুষটা টেলিফোনে কী এমন খবর শুনলেন, যার ফলে তাঁর প্যানিক ডিজঅর্ডার? চেষ্টা করেও নিজের ভাবনাস্রোতকে বন্ধ করতে পারলেন না অম্বিকা।

ছেলে, ছেলের বউ এল। তাবপরেই মেযে-জামাই। সকলেই উদ্‌বিগ্ন। সকলেই মানুষটাকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার চোখে দেখে।

চোখ বুজে শুযে ছিলেন সদাশিব। ইশাবায সবাইকে কথা বলতে নিষেধ করলেন অম্বিকা। তারপর পাশের ঘরে ডেকে নিযে গেলেন।

মেযে সোহিনী জিজ্ঞেস কবল—বাবার কী হযেছে, মা?

চাপা গলায অম্বিকা বলেন, কিছুই তো জানি না। একটা টেলিফোন আসার পর থেকেই এইরকম।

টেলিফোন। প্রায় সবাই একসঙ্গে উচ্চারণ করল।

হ্যাঁ। একটা টেলিফোন।

সকলের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল, কার টেলিফোন, কীসের টেলিফোন? কী সংবাদ ছিল সেই টেলিফোনে?

হঠাৎ জামাই তার মোবাইলেব বোতাম টিপতে শুবু করল। রিং হতেই বলল— হ্যালো, সুবার্বন স্কুল।

............।

ফর অ্যান আরজেন্সি প্লিজ গিভ দি দ্যা ডিটেইল্‌স্ অব শিবাজি। আ স্টুডেন্স অব ক্লাস ফাইভ। রোল নাম্বার সেভেন।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

সকলেই সবিশেষ উদ্‌বিগ্ন।

টেলিফানে সংবাদ এল।

......।

জামাই বলল, ওকে। থ্যাংক য়ু, থ্যংক য়ু।

চকিতে জামাইয়ের হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিল সদাশিবের ছেলে।

রিং হতেই বলল—হ্যালো, মুম্বাই সিটি স্কুল?

......।

প্লিজ, গিভ মি দ্য ডিটেইল্‌স সব সরিতা, আ স্টুডেন্ট অব ক্লাস সেভেন, রোল নাম্বার সিক্সটিন।

.......।

আ এম হার ফাদার গণেশ, সন অব সদাশিব কারলেকার।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

টেলিফোনে সংবাদ এল।

......।

গণেশ বললেন— থ্যাংক য়ু, থ্যাংক য়ু।

সকলেই যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, না—তাদের কারুর ছেলেমেয়ের কিডন্যাপিং-এর খবর শুনে অন্তত সদাশিবের নার্ভাস ডিজঅর্ডার হয়নি, ঠিক তখনই সদাশিব কারলেকার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সকলেই চমকে ফিরে তাকাল।

অম্বিকা চমকে ফিরে তাকাল।

অম্বিকা বললেন, তুমি কেন উঠে এলে?

সদাশিব ক্লান্ত গলায় বললেন, আসতে হল। আসতে হয়। ওরা বলেছে—আমার লেটেস্ট বইটাকে যদি আমি ভুল বলে উইথড্র না করি, তাহলে...

তাহলে? সকলেরই সমস্বর জিজ্ঞাসা। সদাশিব কেমন যেন নিরাসক্ত গলায় বলেন, ওরা প্রথমে খুন করবে আমার নাতি-নাতনিকে, তারপর ছেলে, ছেলের বউকে। তারপর মেয়ে-জামাইকে। আমাকে করবে না। তাতে একটা ইনটারন্যাশনাল ক্যায়োস্ ক্রিয়েটেড হবে। কিন্তু ভাবো, পুত্র কন্যা জামাতা, নাতি নাতনি নিহত হবার পর আমার বেঁচে থাকাটা কীরকম সুখের হবে।

অম্বিকা সদাশিবকে ধরে বসালেন।

বললেন, এসব কী বলছ তুমি।

যা বলছি তার প্রত্যেকটি কথা সত্য। সত্যের চাইতেও ভয়ংকর। ক্লান্ত গলায় বললেন সদাশিব।

ছেলে বলল, কারা ফোন করেছিল তোমাকে।

সেকথার উত্তর না দিয়ে সদাশিব বললেন, তাহলে কি তথ্য মিথ্যে হয়ে যাবে? বিজ্ঞান মিথ্যে হয়ে যাবে? আমার এতদিনের গবেষণার ফল মিথ্যে প্রমাণিত হবে?

ছেলে গণেশ বাবার পাশে বসে বলল, তোমাকে এরকম ভয় দেখাবার মানে কী। তুমিই বা এতটা ভয় পাচ্ছ কেন?

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সদাশিব বললেন, আমার বই। বর্ণহিন্দুস্ পিয়োরিটি ইজ আ রং কনসেপ্ট।

জামাই বলল, আপনার এই বই তো দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে।

হলে কী হবে, এখন আমাকে মার্কেট থেকে এই বই উইথড্র করতে হবে। লিখিতভাবে জানাতে হবে, প্রায় একযুগ ধরে গবেষণালব্ধ আমার বইটা আগাগোড়া ভুল।

উত্তেজিতভাবে গণেশ বলল, ইমপসিবিল! তুমি কখনও এরকম কাজ করতে পারো না।

ঘরের সকলকে চমকে দিয়ে টেলিফোনটা এসময় ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল। গণেশ উঠে গিয়ে ফোন ধরল। ধীরে ধীরে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কর্ডলেসটা বাবার হাতে দিয়ে বলল, তোমার ফোন।

কম্পিত হাতে ফোন ধরলেন সদাশিব, হ্যালো!

......।

আপনি কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

......।

দেখুন, এত তাড়াতাড়ি কি এরকম ডিসিশন নেওয়া যায়।

......।

আমি আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চাই। আপনি যেসব আপত্তির কথা তুলেছেন, আমি তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব।

কট্ করে ফোনটা কেটে গেল। বিহ্বলভাবে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সদাশিব। জামাই প্রশ্ন করল—ফোনটা কে করেছিল বলুন তো?

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গণেশ ফিসফিস করে কিছু বলল। চমকে উঠে সোফার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল সে।

ঘরে একটা নীরবতা।

মা আর মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারা এখনও রহস্য ভেদ করতে পারেনি। পরিস্থিতির কারণে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছে না। তবে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তা না হলে সদাশিব কারলেকারের মতো মানুষ ভয় পাবেন কেন? গণেশ আর জামাইয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাবে কেন? খুন করার হুমকি যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, সেটা তো মানুষগুলির চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

সবই একটা বইয়ের জন্য।

বাবার বইটাতে কী আছে তাও জানে না মেয়ে। এমনিতেই বাবার বিষয় বড়ো খটোমটো। ভালো করে বোঝেও না সে।

তথাপি সে-ই ঘরের নীরবতা ভাঙল—রিস্ক নিয়ে কী দরকার, বাবা?

তার মানে! সদাশিব মেয়ের দিকে ফিরলেন।

জামাই বলল, বইটা উইথড্র করে নেওয়াই ভালো। আপনি তো ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। যে ফোন করেছিল, সে কে—আপনিও জানেন আমরাও জানি।

তাই বলে ম্যাক্সিম ম্যারিয়ট, রোনাল্ড বি. ইনডেন, ডি. ডি. কৌশাম্বীকে হেঁটে

ফেলতে হবে। নৃবিজ্ঞানের সত্য, সমাজবিজ্ঞানের সত্যকে ছেঁটে বাদ দিতে হবে! অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন সদাশিব। এই অস্থিরতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বোঝা যায়, মনের মধ্যে কী ভীষণ লড়াই করতে হচ্ছে তাঁকে। অবসন্ন গলায় জামাই বলল, কিন্তু খুনের হুমকিটাও তো সত্য।

না, সত্য নয়। এটা বানিয়ে তোলা সত্য। সত্য কখনও বানানো যায় না। সেটা থাকে। তাকে আবিষ্কার করতে হয়। প্রায় ধমকে উঠলেন সদাশিব। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

অম্বিকা কারলেকার চোখের ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বললেন। স্বামীর মানসিক অবস্থটা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এতখানি অস্থির তাঁকে তিনি কখনও হতে দেখেননি।

তোমাকে একটু কফি দিই। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন অম্বিকা।

সদাশিব ঘাড় নাড়লেন। হ্যাঁ কি না, কিছু বোঝা গেল না। সবাইকে নিয়ে ডাইনিংয়ে এলেন অম্বিকা।

একটু তিক্ত গলায় মেয়ে জিজ্ঞেস করল, ফোনটা কে করেছিল, তোমরা তো কিছুই বলছ না।

গণেশ আর জামাই পরস্পরের দিকে তাকাল। গণেশ আস্তে আস্তে নামটা উচ্চারণ করল।

শোনামাত্র দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সদাশিব কারলেকারের মেয়ে।

কান্না-ভাঙা গলায় বলল—মা, তুমি বাবাকে বইটা উইথড্র করতে বলো। তা না হলে সব শেষ হয়ে যাবে।

নামমাহাত্ম্যে পরিস্থিতির ভয়ংকরতা অম্বিকাও যথেষ্টই বুঝতে পারছেন। কিন্তু নিজেকে স্থির রেখে বললেন, শুনলি তো বাবার কাছে। ওটা শুধু একটা বই নয়। একটা সত্য।

থাকো তোমরা তোমাদের সত্য নিয়ে। আমি শিবাজিকে নিয়ে এখান থেকে পালাব।

কোথায় পালাবে? ভেতরের ঘর থেকে ডাইনিংয়ে এসে দাঁড়ালেন সদাশিব। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। অম্বিকা কাজের লোককে কফি করতে বলল।

মেয়ে জানতে চাইল— বাবা, তোমার বইটাতে কী এমন লেখা আছে?

অত্যন্ত সাধারণ কিছু নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিক সত্য। বর্ণহিন্দুদের বর্ণ যে খাঁটি নয়, সেখানে অনেক জাতি-উপজাতির রক্ত এসে মিশেছে, সেটাই আমার বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। সংক্ষেপে জানালেন সদাশিব। গণেশ বলল, এতে কার কী ক্ষতি! পৃথিবীতে তো নানা জাতির মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছেই।

উত্তেজিত গলায় সদাশিব কারলেকার বললেন— না না, ব্রাহ্মণেরা ভারতভূমিতে ব্রাহ্মণ-রূপেই ঈশ্বর-প্রেরিত। আর্যরাও তাই। ভাবো—নৃবিজ্ঞানের, সমাজবিজ্ঞানের কী ভয়ংকর পরিণতি।

এতক্ষণ ছেলের বউ নির্বাক হয়েই ছিল। এবার বিনীত গলায় বলল—বাবা,

একসময় গ্যালিলিও তো মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর তত্ত্ব ভুল বলে স্বীকার করেছিলেন। তা সত্ত্বেও সেটাই আজ সত্য বলে প্রমাণিত।

মাথার শ্বেতশুভ্র চুলে আঙুল বুলিয়ে সদাশিব বললেন— বউমা, সে আজ বহু বছর আগেকার কথা। তখন গ্যালিলিও নিঃসঙ্গ যোদ্ধা। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীর মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে, আমি একা? কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, রাজনৈতিক দল নেই, যারা আমাকে সমর্থন করবে?

জামাই বলল, এখন আর কেউ রিস্‌ক নিতে চায় না।

সদাশিব জামাইয়ের দিকে একপলক তাকালেন। জামাই মালটিন্যাশনাল কোম্পানির বড়ো মাপের এগ্‌জিকিউটিভ। ছেলে গণেশ ডাক্তার। বউমা কলেজে ইংরিজির অধ্যাপিকা। মেয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা। সকলেই প্রতিষ্ঠিত। সুখের স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে।

ফোনে হুমকির পুরোটা তিনি এখনও সবাইকে বলেননি। সেই ভয়ংকর শীতল কণ্ঠস্বরটা তাঁকে জানিয়েছে, প্রথমে সকলকেই তাদের চাকরি থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হবে। তারপর হত্যা।

সদাশিবের চোখে-মুখে স্পষ্টতই একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল। সত্যিই তো, তিনি তাঁর জীবনের অপরাহ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওদের তো সবে শুরু। তাঁর জন্য ওরা কেন বিপদগ্রস্ত হবে। তবে কি বইটা উইথড্র করে নেওয়াই তাঁর উচিত? ভুল স্বীকার করে নেওয়াটা? না, কিছুতেই তিনি মনস্থির করে উঠতে পারছেন না।

তখনই ফোন বেজে উঠল।

সকলেই যে যার জায়গায় চুপচাপ। ফোনটা তুলতেও ভয় হচ্ছে সকলের।

সদাশিব উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন।

হ্যালো! মিঃ মেহেতা?

......।

তাই নাকি। খুব ভালো। আমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওরাই কাজটা সেরে ফেলেছে।

.......।

না না, আপনার কী করবার আছে? আমার দায় তো আমারই ঘাড়ে।

......।

ও.কে। থ্যাংকস্‌। ফোন নামিয়ে রাখলেন সদাশিব। ঘরের সবগুলি চোখ তাঁর দিকে স্থিরনিবদ্ধ। থমথমে মুখে সকলের দিকে তাকিয়ে সদাশিব ধরা গলায় বললেন, আমার প্রকাশক মেহেতা ফোন করেছিলেন। ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। মেহেতার গুদাম থেকে আমার সমস্ত বই লুঠ করে নিয়ে গেছে ওরা। আগুন জ্বালবে।

মেয়ে আর বউমা একসঙ্গে কেঁদে উঠল। কারলেকার বললেন, তোমরা আর দেরি কোরো না। গাড়ি বার করো। শিবাজি আর সরিতাকে স্কুল থেকে তুলে সোজা গ্রামের বাড়িতে চলে যাও।

ওরা জানে, বাবা এবং মাকে হাজার চেষ্টা করেও নড়ানো যাবে না। বাধ্য হয়েই

ওদের বেরিয়ে পড়তে হয়।

সদাশিব বললেন, নিম্বলকরকে একটা ফোন করো তো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন আমার এখানে চলে আসে।

অম্বিকা ফোন করতে গেলেন।

ঘরময় অস্থির পায়চারি করতে লাগলেন সদাশিব কারলেকার। তাঁর মন চিন্তার ঝড়ে উথাল পাথাল। কী চায় এরা? ক্ষমতা? সময়ের চাকাকে পেছনে দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে, সত্যকে দুপায়ে মাড়িয়ে? দেশের মাটিতে এত বড়ো ভাঙনের শব্দ তিনি শুনতে পাননি বলে রীতিমতো লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ এবং গবেষক। কোনো রাজনীতি করেন না। অথচ ভাগ্যের পরিহাস, তিনি হীন রাজনীতির কুটিল আবর্তে পড়ে গেছেন। আজ তাঁর সমগ্র পরিবারের জীবন বিপন্ন।

অম্বিকা জানালেন, নিম্বলকর এখুনি আসছেন।

নিম্বলকর সদাশিবের দীর্ঘদিনের বন্ধু। দুজন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। যদিও নিম্বলকরের বিষয় আলাদা। কিন্তু তাতে বন্ধুত্বে কোনো ঘাটতি পড়েনি।

নিম্বলকর তাড়াহুড়ো করেই এসে পড়লেন। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। মাথার চুল অবিন্যস্ত। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মুখ। একলাফে যেন পাঁচ বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর।

কী ব্যাপার বলো তো? তুমি কি অসুস্থ? উদ্‌বেগের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন নিম্বলকর।

হাতের ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন সদাশিব। একটু সময় চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাটা বলে গেলেন।

সর্বনাশ। শুনে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পললেন নিম্বলকর।

অম্বিকা বললেন, আমরা আর কিছু ভাবতে পারছি না। এখন আপনি কী করতে বলেন?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে আবার বন্ধুর পাশে বসে পড়লেন নিম্বলকর। বললেন, কী আছে তোমার বইটাতে বলো তো, যার ফলে এরকম একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছে?

নিঃশব্দে উঠে গিয়ে সদাশিব সেল্‌ফ থেকে বইটা পেড়ে আনলেন। পৃষ্ঠা উলটে একটা অধ্যায় বার করলেন। সেখানে আঙুল রেখে বললেন—দ্যাখো, জাতিগত কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা এক বিশেষ শ্রেণির জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করব এবং কোন্ জাতির সঙ্গে মিশ্রণ নিরূপণ করব তা ঠিক করার জন্য নৃবিজ্ঞানে কতকগুলি সূত্র দেওয়া আছে। যেমন—মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং, গায়ের রং, চোখের রং ও বৈশিষ্ট্য, দেহের দীর্ঘতা, মাথার আকার, মুখের গঠন, নাকের আকার, শোণিত-বর্গ। এর মধ্যে চুলের বৈশিষ্ট্যই প্রধানতম। একটু চুপ করে থেকে আঙুল চিহ্নিত অধ্যায়টা খুললেন সদাশিব। বললেন, বেশি পড়ার মতো পরিস্থিতি নয়। সামান্য শোনাচ্ছি— পড়তে শুরু করলেন সদাশিব—দাক্ষিণাত্যে মারাঠি ছাড়াও আরও অনেক জাতি আছে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যবর্তী দক্ষিণ কানাড়ায় কন্নড়

ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তুলোভাষী জাতিসমূহ অন্যতম। নৃতত্ত্বের বিচারে শিরাকার-জ্ঞাপক সূচকসংখ্যা ৭৮.০ থেকে ৮০.৪ পর্যন্ত, নাসিকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭১.৪ থেকে ৭২.২ পর্যন্ত। তুলুরা অনতিবিস্তৃত-শিরস্ক ও দীর্ঘনাসা। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে নিম্নবর্গীয়।

মহারাষ্ট্রের উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য লক্ষ করে সিদ্ধান্তে আসা যায়, একটা পর্যায়কাল উভয়ের মধ্যে শোণিত-সম্পর্ক চলেছিল।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সদাশিব বলেন, আর কি পড়ার প্রয়োজন আছে? আমাকে আক্রমণ করার পক্ষে এই যথেষ্ট।

বিস্মিত নিম্বলকর বললেন, কিন্তু এ তো বিজ্ঞানের সত্য!

সদাশিব হতাশ ভঙ্গিতে বললেন—অন্ধের কী বা দিন, কীবা রাত্রি।

একটা কিছুর আঘাতে বারান্দার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। তিনজন চমকে উঠে দাঁড়ালেন। আবার এবং আবার। চতুর্দিকে ভাঙনের শব্দ। বাইরে অনেকগুলি গলার জান্তব চিৎকার। রাস্তায় আগুনের শিখাও দেখতে পেলেন তাঁরা।

নিম্বলকর বললেন, ভয় পেয়ো না সদাশিব।

সদাশিব বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, একেবারে পাচ্ছি না, তা বলব না। তবে শেষ পর্যন্ত সত্য আর ভয়ের মধ্যে একটাকে তো বাছতেই হবে। আবার ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ল। □

হামিদরা কী বলতে চায়

স মী র র ক্ষি ত

তেরাত্তির না পেরোতেই বিরঘিট খানেরা জেনে গেছে কল্‌জে কাঁপানো ভয়ংকর যে শব্দ তাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তা বোমারু বিমানের এবং তার সঙ্গে ধাতব টক টক টক টক যে শব্দ ছুটে আসছে, খুব নীচু দিয়ে চলা হেলিকপ্টারের। এর মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম। তবু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে বিরঘিট খান, হাজি বিরঘিট গাঁয়ের পশ্চিমকোণে মসজিদের দিকে। এ তল্লাটের একমাত্র পাকা বাড়ি ওটিই।

আজ ভোরের নমাজও পড়িয়েছে বিরঘিট ওখানে। আল্লাকে মনে মনে ডেকেছে বারবার, তাঁর দোয়া প্রার্থনা করেছে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ বিরঘিট। জীবনে কোন্ গুণাহ্ করেছে সে যে তাকে, তার গাঁয়ের লোকদের বকরির মতো জবাই করছে এরা? বৃদ্ধের পায়ে তার কতটুকু বল যে এমন দৌড় দেবে যাতে পিছনে ছুটে আসা নেকড়েগুলো তার নাগাল পাবে না? এমনিতেই আজকাল কল্‌জেটা বড্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করে যখন তখন। বিশেষ করে যবে থেকে বোমারু বিমান পাক খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের তল্লাটের মাথার ওপর দিয়ে আর হেলিকপ্টার। সেই বিরঘিট বৃদ্ধ যে কবরের কাছে পৌঁছে গেছে, কত জোরে দৌড়তে পারে? পেছনে ছুটন্ত বুটের দ্রুত শব্দ যেন আরও জোরালো হচ্ছে। না, আল্লা মেহেরবান—এই তো মসজিদের গম্বুজ চোখে পড়ছে। ওই দরজা, ওই নমাজস্থান। শেষ মুহূর্তে প্রায় চোখে অন্ধকার নিয়ে লাফ দিয়ে দরজা গলে ভেতরে ঢোকে বিরঘিট। মসজিদের ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে হাঁপায়। গলা শুকিয়ে গেছে। তৃষ্ণায় জিভ জড়িয়ে আসছে। তবু নতজানু হয় বিরঘিট, আল্লার কাছে দোয়া প্রার্থনা করে, তার প্রাণটা যেন এই ম্লেচ্ছ কুলাঙ্গারেরা কেড়ে নিতে না পারে। তাকে আরও বাঁচতে হবে, এদেশটাকে পরের গোলামীর হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

ছুটন্ত বুটের শব্দ দরজার সামনে থামতে না থামতেই দরজায় কঠিন করাঘাত দরজা খোল্ ইয়ের বাচ্চা! গর্ভধারিণী জননীর নামে কুৎসিত গাল পাড়ে, ওদের কি নিজের নামা নেই বাড়িতে? এরা নাকি দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য দেশের মানুষ? এই নিয়ে তারা গর্ব করে? লাথি মারছে বুটসুদ্ধু। এরা নাকি ধর্মপুত্র যিশুখৃস্টের উপাসক? অন্য এক ধর্মস্থানের দরজায় পা তুলছে। দুবলা এই দরজা ভেঙে পড়ে আরও দুটি লাথি পড়তে। মড়াত করে দরজা পাল্লা ভাঙে, চোখের নিমেষে উলটে পড়ে বিরঘিট স্তব্ধ, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষায় এই মসজিদের মধ্যেই মৃত্যুকে বরণ করতে চায়, সে বীরের মৃত্যুবরণ করবে সে। তার পৃষ্ঠদেশে যাতে কোনো অস্ত্র না বেঁধে, যাতে তার

হৃদয়বিদীর্ণ হয় সেই ম্লেচ্ছদের হাতে, এজন্য ঘরে বসে চকিতে বিরঘিট। স্তব্ধ, স্থির, আফগানিস্থানের পর্বতের প্রাচীন প্রস্তরতুল্য বিরঘিটের দেহ।

—কিরে, ইয়ের বাচ্চা, রুশ-আফগান যুদ্ধে কোন্ দলে ছিলি তুই? নাজিবুলের গোলামি করেছিস? শোন ইয়ের বাচ্চা, বল তো এই আমরা, এই আমেরিকানরা কেমন? হঠাৎ যে প্রদীপ নিভে যাবেই সে যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, শেষ প্রশ্নে তেমনি বিরঘিট সহসা তার মুদিত দুচোখ মেলে তাকায়। তার দীর্ঘ শ্মশ্রুময় মুখটিতে জমে ওঠা অন্তিম থুথু—থুক করে ছিটিয়ে দেয় প্রশ্নকর্তার লাল মুখে। সঙ্গো শঙ্গো শাণিত সঙ্গিন বিদ্ধ করে পঁচাশি বছরের এই বৃদ্ধের বুক। বুলেট দুটো এসে সর্বাঙ্গ ঝাঁঝরা করে দেয়। মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে যায় বৃদ্ধ বিরঘিট, যাতে তার পৃষ্ঠদেশে এরা অস্ত্রাঘাত করতে না পারে। তার প্রশস্ত বুকের ওপর বুটসুদ্ধ জোড়া পায়ে লাফ দিয়ে ওঠে সেই আমেরিকান বীরপুঙ্গব। থু থু ছেটায় তার ডানহাতের সর্বাধুনিক পিস্তল থেকে অগ্নিবর্ষী গোলায় ক্ষতবিক্ষত করে দেয় বৃদ্ধ বিরঘিটের মস্তক আর মুখমণ্ডল। তারপর অতি সাহসী এক সেনার ভঙ্গিতে পদাঘাত করে সেই চূর্ণবিচূর্ণ দেহে। আফগানিস্তানের মরুভূমির অভ্যন্তরে ছোটো জনপদ হাজি বিরঘিটের উপজাতি সর্দার বিরঘিটের দেহে আর প্রাণ নেই তখন। ফলে বীরত্ব প্রকাশের এতবড়ো সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা দেশের সবচেয়ে সেরা সেনাবাহিনীর এক সেরা সৈনিক?

আর এই উন্মত্ত দৃশ্য চোখে পড়ে একজন মানুষের। ক্রোধে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে মানুষ। তার বুকের মধ্যে উপজাতি-রক্ত ফুঁসে ওঠে। বিরঘিটের পুত্র আসিফ ছুটে এসেছে, কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত তার বিলম্ব হয়েছে। তাই সে বাইরে দাঁড়িয়ে জানালার ফোকর দিয়ে দেখছে এই দৃশ্য।

তার বিলম্ব না হয়ে উপায় ছিল না। কেন না তাদের ডেরাগুলিতে অবাধে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে চলেছিল এই ক্ষিপ্ত বায়ু সেনারা। সে তার বিবি শবনম আর ছেলে হামিদ নিদ্রিত ছিল ঘরের মধ্যে, পাশের ঘরেই ছিল আব্বা বিরঘিট। তার কি রাতে ঘুম হয় না? শব্দ শুনেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আর ছুট দেয় মসজিদের পানে। তার ঘুম ভাঙার আগেই ত্রস্ত শবনম কোলে তুলে নিয়েছে হামিদকে। কেননা ততক্ষণে দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে তাদের খেজুর পাতার ছাওয়া ডেরা। তিনজনে যখন বাইরে এসেছে, শবনম ছুটছে হামিদকে বুকে নিয়ে, সহসা একটা গ্রেনেড এসে ফাটল শবনমের অদূরে। ধোঁয়ার আগুনে শূন্যে ছিটকে উঠল তাদের দেহ। ঝাপসা ধোঁয়া কেটে গেলে ছ-বছরের হামিদ চিৎকার করে উঠল, তার কিছু দূরে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে শবনম, তার নিম্নাঙ্গ উড়ে গেছে। তার ওপরের অংশ চিৎপাত হয়ে আছে। ছেলে হামিদ ছিটকে পড়েছে তার কোল থেকে। তারও দুটি উরুর মাংস খুবলে নিয়ে গেছে। রক্ত ঝরছে। কিন্তু তার সেই যন্ত্রণার চেয়েও অনেক বেশি যন্ত্রণায় ব্যথিয়ে উঠছে তার বুক। দুহাতে ভর দিয়ে সে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে চেষ্টা করছে মায়ের দিকে, পরিত্রাহি ডাকছে সে মাকে। ডাকতে ডাকতেই একসময় সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় হামিদ। প্রাণহীন মায়ের বুকের কাছে পৌঁছুতে পারে না সে। শুধু তার একটা হাত বালুর ওপরে স্থির হয়ে পড়ে থাকে।

এই হাত মাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল।

দু-মুহূর্তের মধ্যে এই দৃশ্যের একটা খণ্ডাংশ মাত্র চোখে পড়েছিল আসিফের। রাত ভোর হবার এই পবিত্র ফজরের মুহূর্তে। তার আরও চোখে পড়েছিল জোব্বা গায়ে তার আব্বা বিরঘিট ছুটছে গাঁয়ের মসজিদের দিকে, আর তার পিছু ধাওয়া করছে কয়েকটি সশস্ত্র সেনা।

আসিফ জানে না কখন সে ছুটতে শুরু করেছে, বাবাকে উদ্ধার করার আশায়। কয়েকটা ছুটন্ত বুলেট তার এপাশ-ওপাশ দিয়ে বিষাক্ত শিস্ তুলে ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু এই যে মরূদ্যান, যা তার জন্মভূমি, সেই আজন্ম পরিচিত বালুময়, তার প্রাণ দিয়ে ভালবাসা হাজি বিরঘিট জনপদ, যেন তাকে বার-বারই বাঁচিয়ে দিচ্ছিল। হয়তো হাজি বিরঘিট চাইছিল এই যুবা বেঁচে থাকুক ভবিষ্যতের জন্য। এক মাঘে তো শীত যায় না।

আসিফ যখন পৌঁছল মসজিদের পাশে, তখন তার দম ফেটে যাচ্ছে। মনে হয় তার মস্ত আফগানি বুকটা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মুখ নামিয়ে পাশের জানালার ছিদ্র দিয়ে সে দেখল বিরঘিটের ওপর আক্রমণ। সে বুঝেছিল ওরা যদি টের পায় যে সে হয়ে রইল এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাক্ষি, তবে এই মুহূর্তেই তাকে জবাই করে দেবে এই ক্ষুধার্ত নেকড়েরা। কিন্তু তথাপি এই মরূদ্যানের নির্ভীক রক্তই তাকে উসকে দিল, সে উন্মাদের মতো উচ্চারণ করল—হেইয়ো! তারপর পিতৃহন্তাদের দিকে ছুটে এল ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

কিন্তু ওরা, ওই ধূর্ত বায়ুসেনারা তৎক্ষণাৎ শাণিত ব্যয়েনেটে বিদ্ধ করল না, বুলেটে ছিন্নভিন্ন করল না তার দেহ। বরং ঘুষি মারল নাকে মুখে। দুজন তৎপর সেনা তার হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল আসিফ। ফলে আরও জোরে চেপে ধরল ওরা তার হাত, তারপর বেঁধে ফেলল হাত দুটিকে। সিংহবিক্রমে একবার শিরদাঁড়া ঝাঁকিয়ে মুখ ফেরাল আসিফ, থু থু ছেটাল থুক করে। তৎক্ষণাৎ পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হল তার কপালের একপাশে। রক্ত ধারা বেরিয়ে এল, পাথরের গা থেকে, চাপা ঝরণার জলের মতো। তার বাঁ পাশের চোখের প্রান্ত ঘেঁষে নিচে নামল সেই রক্তধারা। হাজি বিরঘিটের শুষ্ক বালুময় মাটি চোখের পলকে চেটে নিল তার এক সন্তানের দুর্মূল্য এই রক্তধারা।

মাটির বিভিন্নতা আছে একই দেশের। আবার দেশে দেশেও। আফগানিস্তানে যেমন বালুময় মরু আছে, বৃক্ষহীন পাহাড় আছে, প্রস্তরময় প্রান্তরও আছে। দেশে দেশেও ছড়িয়ে আছে নানান ধরনের মাটি। আর সব দেশের মাটির মুখ তার সন্তানদের রক্তে ভিজে যায়ই কোনো না কোনো সময়ে? আর ইতিহাস তো ধেয়ে চলে সর্বসময়ে। রক্তের ছাপ কি তবে অনিবার্য লেগে থাকে তাবত ইতিহাসে?

আসিফকে আর পল্লির আরও জনা পঞ্চাশেক মানুষকে তুলে নেওয়া হল হেলিকপ্টারে। শুধু হাত পিছমোড়া করে বেঁধে নয়, চোখও বেঁধে দিল ওরা। তারপর হাজতে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। তাদের সন্দেহ আলকায়দার লোকরা আশ্রয় নেয় হাজি বিরঘিটে।

আসিফকে মসজিদের চত্বর থেকে ওরা কোমড়ে দড়ি বেঁধে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটু থামলেই পেছনে লাথি মারে। অথচ আসিফের চোখ চলে যাচ্ছে বার-বারই পেছনে, মসজিদের ভেতরে। সেখানে গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া তার আব্বার শরীরটা পড়ে রয়েছে সেই শব ওখানেই। তারই পুত্র সে। তার অধিকার নেই তার পিতার কবরে শেষ মাটি দেবার? এ কারা সমুদ্র পার হয়ে এসে তাদের টুঁটি টিপে ধরেছে? বিরঘিটের দাড়ি গোঁফ দেখে নাকি তাকে ওরা সন্দেহ করেছিল ওসামা-বিন-লাদেন। কাছে এসে সম্ভবত সে ভুল ভাঙে। কিন্তু তাদের বক্তব্য. বিরঘিট নিজেই আল-কায়দার এক জঙ্গি নেতা। সে নিতান্তই এই জনপদের উপজাতি সর্দার ছিল নাজিবুল্লার পক্ষে। পরে আমেরিকানরা তালিবানদের সৃষ্টি করে, তাদের হাতে তুলে দেয় অস্ত্রপাতি। তখন জোরজুলুম করা হয় এই সর্দারের ওপর, তাকে তালিবান নেতা হিসেবে তৈরি করে আমেরিকানরাই। এখন তাদের সন্দেহ, বিরঘিট আমেরিকান সেনাদের আক্রমণ করছে, গেরিলাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। অতএব তার শাস্তি মৃত্যু। সে পেয়েছে তার যোগ্য দণ্ড। কিন্তু সেনারা গাঁয়ের কোন জোয়ানকেই ছেড়ে দেবে না, তারা ঘরে ঘরে ঢোকে। লণ্ডভণ্ড করে দেয় গরীব সংসারের সব জিনিসপত্র। বোরখা পরিহিত যারা, তারা কি নারী? নাকি আদতে তারা আত্মগোপনকারী আল-কায়দার কোন যুবক? তাজ্জা, যৌন-ক্ষুধা জর্জরিত কুকুরের মত এগিয়ে গিয়ে সেনারা ক্ষিপ্ত হাতে বোরখা খুলে নেয় নারীদের। বিবস্ত্র করে। উল্লাসে তারা ফেটে পড়ে উলঙ্গ দীর্ঘদেহিনী আফগান মহিলাদের শরীর দৃশ্যে। হামলে পড়ে কেউ কেউ বোরখা-আবৃত দেহের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য।

নিরুপায় আসিফরা যেতে যেতে দেখে এই ঘৃণ্য অপকর্ম। তাদের রক্তে আগুন ধরে যায়। কিন্তু হাত বাঁধা, কোমরে দড়ি। ঠিক এসময়ে আসিফের নজরে পড়ে হামিদকে, বালুশয্যায় শোয়ান সে। তার ডান হাতটি বাড়িয়ে ছ-বছরের হামিদ ছোঁবার চেষ্টা করছে তার মাকে। সে জানে না ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে মৃত তার মায়ের শব পড়ে আছে। সে দেহে আর প্রাণ নেই।

—হা আব্বু! চিৎকার করে ওঠে আসিফ। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের কুঁদোর গুঁতো পড়ে তার কাঁধে, শিরদাঁড়ার ডগায়। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে সে—ইনসানাল্লা!

পরিচিত কণ্ঠের এই তীব্র আর্তনাদই সম্ভবত হামিদের হুঁশ ফিরিয়ে আনে। সে মাথাটাকে, অসীম যন্ত্রণায় গুঁঙিয়ে উঠতে উঠতেও, সামান্য ওপরে তোলে। তার শিশুসুলভ অপার কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি ভাসিয়ে দেয় সে শব্দের উৎসের দিকে। সেই মুহূর্তে যন্ত্রণাবিদ্ধ পিতা-পুত্রের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। ফের হাত বাঁধা, কোমড়ে দড়ি বাঁধা আসিফ করুণ কণ্ঠে হাঁকে—হামিদ, আব্বা আমার। এরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি আর ফিরব কিনা জানি না, কিন্তু তুই মনে রাখিস তুই হামিদ বিরঘিট।

এই শব্দগুচ্ছের মানে জানে না হামিদ। সে শুধু বোঝে, তার আব্বুকেও ওরা মেরে ফেলবে। সে অন্তিম এক বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে ডাকে—আব্বু।

কিন্তু সেনারা আর মুখ ফেরাতে দেয় না আসিফকে, তার পেছনে ধাক্কা মেরে বলে—চলো। এই ছোট্ট দৃশ্যটুকু হামিদের চোখে লেগে থাকে।

এরপর হামিদ জ্ঞান হারায়।

তবু হামিদ বেঁচে ওঠে। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ এসে পৌঁছয় হাজি বিরিঘিটে। গাঁয়ের পালিয়ে যাওয়া মানুষ একে-একে ফিরে আসে। এই মরুদানের বস্তিতে কতটুকুই বা তাদের ধনসম্পদ, কী বা হাল তাদের ঘরদোরগুলির তবু দেখবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। গ্রেনেডের অগ্নিগ্রাসে সব ছাই ভস্মের স্তূপ এখন। এসব গিয়েছে বলে তেমন দুঃখ নেই গ্রামবাসীদের। তাদের জীবন জন্মাবধি এই কঠোর প্রকৃতির মতোই। কিন্তু যা তাদের চোখের জল টেনে নামায়, বুক ভেঙে দেয়—সে তাদের প্রিয়জনের ছড়ানো শব। অগ্নিতে দগ্ধ, গ্রেনেডে ছিন্নভিন্ন। কারুকে হয়তো চেনাই যায় না। শোকের কান্নায় আর হাহাকারে হাওয়া ভারি হয়ে ওঠে। আরও শোক তাদের জন্য, যাদের বেঁধে নিয়ে গেল ওই ভিনদেশি সৈনিকেরা। কোথায় গেল তারা? কেন তাদের নিয়ে যাওয়া হল? তারা কি আর ফিরবে কোন দিন? এই প্রশ্ন মুখ থেকে মুখে ফেরে। তারা তবু ফের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের খোঁজ করে, মাথা গোঁজার ঠাঁই গড়তে খড়কুটো সংগ্রহ করতে থাকে। যে জনপদে ছিল গতকাল পর্যন্ত একশো পঞ্চাশটি পরিবার, সেখানে গুণে দেখা যায়, আছে মাত্র চল্লিশজন।

পায়ে ব্যান্ডেজ, কোমরে ব্যান্ডেজ নিয়ে এক বিমূঢ় শিশু, যার দৃষ্টিতে নিবিড় শূন্যতা, যে কথা বলছে না কারুর সঙ্গে, এমনকী তার চিকিৎসা করছে যারা আন্তর্জাতিক রেডক্রশের সেই উৎসুক চিকিৎসকের সাথেও নয়, গভীর শোক বা যন্ত্রণা কি তাকে মূক করে দিয়েছে? এই দুশ্চিন্তা চিকিৎসকেরও। মনের ভারসাম্য কি নষ্ট হয়ে গেছে এই শিশুর?

গাঁয়ের লোকেরা বলছে—এর নাম হামিদ। আসিফ আর শবনমের পুত্র সে। আর আমাদের হাজি বিরঘিট গাঁয়ের যে সর্দার ছিল —সেই বিরঘিট খানের নাতি এই হামিদ। যে সর্দারকে ভিনদেশি বর্বরেরা গুলি করে মেরেছে মসজিদের ভিতরে। মসজিদের বাঁধানো মেঝেতে তাঁর রক্ত শুকিয়ে রয়েছে, আজও। সেই সর্দারের নাতি হামিদের স্থির চিত্র, তার ছবি সংবাদমাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। মানুষ দেখে মূক করে দেওয়া, পিতৃমাতৃহীন হয়ে যাওয়া এক শিশুর নির্বাক স্থির চিত্র! কোটি কোটি মানুষকে শোকস্তব্ধ নির্বাক শিশুটির পাথরের মত স্থির দৃষ্টি কি কোন প্রশ্ন করে? এই প্রশ্ন কি করে সে, কেন আমার এই পরিণতি? আমি কীভাবে দায়ী তাদের কাছে, যারা আমাকে এমন পরিণতিতে নিয়ে এল? তাদের বিচারের দায়িত্ব কার? তোমাদের নয়?

হামিদের এই ছবি আমিও দেখেছি। আমি, অচিন বসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার এক অধ্যাপক। আমি এই ছবিটি প্রকাশিত হবার পরে, এই প্রতিবেদনটি আমার সংগ্রহে রেখে দিয়েছি। কিন্তু তখনও জানতাম না আরও একজন হামিদের ছবিও, অবিকল এরই মতো, হাতে আসবে আমার।

অনুরূপ একটি ছবি প্রকাশিত হল কয়েকমাস পরেই। ফেব্রুয়ারি মার্চে গুজরাতে হিন্দুত্ববাদীরা সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনে, তারও অনেক স্থিরচিত্র প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউটনের গতির নিয়মের

তৃতীয় সূত্রটিকে হাতে তুলে নেন। গোধরার প্রতিক্রিয়াকে দায়ী করেন দাঙ্গার কারণ হিসেবে। তা যে সত্য নয়, তা জানা যায় যখন আর এস এস, বজরং আর বিজেপির উন্মত্ত বাহিনী তাদের বহুপূর্বে তৈরি সংখ্যালঘুদের তালিকা হাতে নিয়ে তাদের ঘরবাড়ি সম্পদ লুণ্ঠন করে। যখন তারা অসংখ্য পশুর মতো ধর্ষণ করে নারীদের। গর্ভবতী নারীর আবেদনে লাথি মেরে তার জরায়ু দ্বিখণ্ডিত করে দেয় তরোয়ালে। আর তখনও জীবিত ভ্রূণটিকে শিবের হাতের ত্রিশূল দিয়ে বিদ্ধ করে, এবং তখনও জ্ঞান-না হারানো মায়ের সামনে তাকে নাচায়, ছুঁড়ে দেয তাদেরই জ্বালানো আগুনে।

এই অগ্নিদাহের জন্য তাদের পূর্বপ্রস্তুতির প্রমাণ লরিতে করে নিয়ে আসা গ্যাসের সিলিন্ডার। কত লক্ষ টাকার বিনিময়ে সংগৃহীত হয়েছিল এই গ্যাস সিলিন্ডার? কত দিন লেগেছিল? যে আগুনে এর পর ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে সেই গর্ভবতী জননীকে। তবে তার আগে অবশ্যই হাত দুটি, পা দুটি তরোয়ালে টুকরো টুকরো করা হযেছিল। এবং নরেন্দ্র মোদী তথা আর এস এস কাপালিক হত্যামোদী, তার প্রশাসন যন্ত্রকে পুরো নিয়োগ করলেন নরপশুদের লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ আর হননের উন্মত্ত স্বৈরাচারে। তিনি নাকি রুচি, নাকি মানবিক, প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী নিজের মুখে আঁটা এতদিনকার মুখোশটাকে নিজে হাতে টেনে ছিঁড়লেন, বললেন—'ওরা মুসলিম, ওদের সঙ্গে বাস করা যায় না'। যখন সারা ভারতের দাবিতে মুখর—হত্যামোদীকে বরখাস্ত করো, উপ-মানব, অবমানবের মতো উপপ্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উচ্চারণ — 'গত পঞ্চাশ বছরে এমন মুখ্যমন্ত্রী তাদের একজনও আসেনি। গত এক হাজার বছরে আমরা পারিনি হত্যামোদী তাই করেছে।'

সাম্প্রদায়িকতার কুষ্ঠ ব্যাধিকে অঙ্গে ধারণ করেছে আর এস এস, বজরং, বিজেপি, তাদের ব্যাভিচারের শিকার বহুত্ববাদী ভারতবর্ষের সনাতন আর রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যৌথ সাংস্কৃতির প্রতীক ভারতবর্ষ। হিন্দুত্ববাদীরা এক হিন্দুরাষ্ট্র, এক হিন্দি ভাষা, এক সংকীর্ণ হিন্দুস্তান, গুজরাত তার পরীক্ষাগার। গুজরাত থেকে রামরথযাত্রায় যে অশুভ সংকেত, অযোধ্যায বাবরি মসজিদ ধ্বংসে যার সতর্কীকরণ, ফের গুজরাতে গৌরবযাত্রায় তার দর্পিত হুংকার। একে প্রতিরোধ করতে হবে। কুষ্ঠব্যাধি থেকে আবহমান ভারতবর্ষকে বাঁচতে হবে। নির্বাক দৃষ্টি নিযে হামিদের যে ছবি কোটি মানুষের ঘরে পৌঁছে গেছে, এখন তারই বক্তব্য। এই হামিদ গুজরাতের নারোদা পাতিয়ার। এর পিতার নাম সৈফুদ্দিন। মা ফিরদৌস। এর নানাজির নাম মৈনুদ্দিন শফি। তাদের বাড়ি লুণ্ঠিত হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছেন ফেরদৌস। এই হামিদের চোখের সামনে ঘরের মধ্যেই ছিল হামিদ, রক্তাক্ত, আহত। নরপশুরা তাকে ভেবেছিল মৃত। ফলে তার চোখে পড়ে নিজের মাতার ধর্ষণদৃশ্য। আর তারপরে তাকে খন্ড খন্ড করে প্রক্রিয়াটিও ঘটে তার চোখের সামনেই। নানাজি নিহত পিতৃমাতৃহীন হামিদ আজ ত্রাণশিবিরে বেঁচে আছে। বেঁচে আছে কিন্তু তার কণ্ঠরুদ্ধ, সে নির্বাক, তার দৃষ্টি স্থির। তার পায়ে ব্যান্ডেজ, তার পেট ঘিরে ব্যান্ডেজ, তার বুক কাঁধ, ফুলের মত নিষ্পাপ মুখটি অনাবৃত নিটোল। কিন্তু দৃষ্টি তার স্থির।

সে চেয়ে আছে আমাদেরই মুখের দিকে। গুজরাতের ত্রাণ শিবিরের এই হামিদ

অবিকল আফগানিস্তানের হাজি বিরঘিটের ত্রাণশিবিরের সেই হামিদ যেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক।

আমার ছেলে, নজরুলকে মনে রেখে আমি যার নাম রেখেছি হাম্বীর। সেই হিমু তার সমবয়সি এই দুই শিশুর ছবি দুটি নিরীক্ষণ করে আর আমার মুখটিও।

সে জানতে চায়—বাবা, এদের গায়ে ব্যান্ডেজ কেন?

—এরা যুদ্ধের, দাঙ্গার শিকার হিমু? আমি হিমুর মাথায় আলতো হাত রেখে বলি—যাদের গায়ে জোর বেশি, অস্ত্র বেশি, তারা আজ ডাকাতের মত লুটপাট করছে যেখানে যেমন পারছে।

—আমাদের এখানেও হবে বাবা? ঈষৎ উদ্‌বিগ্ন হিমুর মুখ।

আরাম কেদারায় বসে আছেন আমার বাবা হীরেন বসু। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ। ঢাকার পুরনো পল্টনের এই বাড়িতে জন্ম তাঁর। কিন্তু দেশভাগ যখন হল, স্বাধীনতার বিনিময়ে, যখন ঢাকা হল পূর্ব পাকিস্তান। অনেক সংখ্যালঘু চলে গেল ওপারে, কিন্তু বাবা গেলেন না। বললেন—এদেশ আমার জন্মভূমি, আমি কেন দেশ ছেড়ে যাব? তিনি রয়ে গেলেন। তারপর অনেক দাঙ্গা, অনেক যুদ্ধ-মুক্তিযুদ্ধ হল, বাংলাদেশ স্বাধীন হল। বাবা বললেন—আমরা আছি, আমরা থাকব, জন্মভূমি থেকে যে পালায়, সে বিশ্বাসঘাতক।

কিন্তু গুজরাটের প্রতিক্রিয়া এবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দুদিন স্কুল ছুটি হিমুর। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করেছি। ধর্মনিরপেক্ষ যারা, সেই সব ছাত্র শিক্ষক অধ্যাপক অভিভাবকদের, লেখক শিল্পী কবি নায়কদের, নাট্যকর্মী-চলচ্চিত্র অভিনেতা-পরিচালকদের দীর্ঘ মিছিল ঢাকা শহর পরিক্রমা করেছে। দাঙ্গা নয়, ধ্বংস নয়, গুজরাতের সংখ্যালঘু হত্যা বন্ধ হোক। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা যেন আর না ফেরে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বুখছি বুখব।

এই মিছিল যেমন হয়েছে কাল ঢাকায়। তেমনই আজ আবার জামাত দলের নেতৃত্বে উগ্রমৌলবাদীরা সভা করেছে বায়াতুল মোকারম মসজিদ প্রাঙ্গণে। মশাল হাতে মিছিল বের হবে সন্ধ্যায়। গুজরাতের হত্যামোদী এদের হাতে শক্তি জোগাচ্ছে। এদের তীব্র কন্ঠস্বর ডেকে আনছে আমাদের পুরনো পল্টনের বাড়ির জানালার ভেতর দিয়ে। ত্রস্ত পায়ে ছুটে আসে আমার স্ত্রী অলকা। জানালার ধারে দাঁড়ায়। শোনে কান পেতে। গুজরাতের হত্যার বদলে হত্যা চাই, লুঠের বদলে লুঠ, ধর্ষণের বদলা ধর্ষণ আর আগুনের বদলা আগুন। ওদের জান্তব কন্ঠস্বর শুনে অলকার মুখ শুকায়। সে তাকায় আমার দিকে। ছুটে এসে হিমুকে কোলে তুলে নেয়।

বাবা হাতের কাগজ নামিয়ে বলেন—কুলাঙ্গার নরেন্দ্রমোদীরা জানে না নিউটনের তৃতীয় সূত্র ধরে এখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওরা কোথায় ঠেলে দিল। মৌলবাদীরা বাপ একে অন্যের বন্ধু, ওদের পরস্পরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। আমি বলি—এখানকার জামাতরা তো এখন শাসক দলও বটে। এদের হাতে পুলিশ, কর্মচারী, অফিসার কি গুজরাতের লাইন ধরবে না?

—ধরলে কী বলার আছেরে অচিন? বাবা বলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে

পড়েন। আমি ত্রস্ত হয়ে বলি—কী করছেন বাবা, উঠছেন কেন?

—উঠব না? ওরা দাঙ্গা বাধাবে আর আমরা চুপ করে থাকব? তোরা যে অত বড় মিছিল করলি, হাজার লোক পায়ে পা মিলিয়েছিল, তাদের সবাইকে খবর দিতে হবে না?

—হবে বাবা! স্বেচ্ছাসেবকরা বেরিয়ে পড়েছে। তুমি কেন যাচ্ছ?

—আমি কোন দাঙ্গার উপক্রম হলে ঘরে বসে থেকেছি? কোনোদিন?

—না, তা তুমি থাকনি। কিন্তু এখন তোমার বয়েস হয়েছে। তুমি যাবে না, দরজা খুলবে না, বাবা। আমি বাবাকে বাধা দিতে যাই। কিন্তু ততক্ষণে বাবা ছিটকিনি খুলে ফেলেছেন। বাইরে বেরিয়ে হনহন করে ধেয়ে চলেছেন। জানি তিনি যাচ্ছেন 'দাঙ্গা বিরোধী মোর্চা'-র দপ্তরে। সেখানে অনেকে আছেন।

আমিও তাঁর পিছু নিতে দরজা দিয়ে বের হতে যাবো, অলকা আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। আমি মুখ ফিরিয়ে বলতে যাই—কী করছ অলি, আমাকে বেরতেই হবে। মাইকে ওই শুনছ না, ওরা তো এক্ষুণি হাতে আগুন নিয়ে বের হবে। একথা বলা হয় না, দেখি অলকার দুচোখে জল। দেখি হিমুও আমার দুহাটু জড়িয়ে ধরেছে।

হঠাৎ হিমু আমার হাঁটুর কাছ থেকে জানতে চায়— এখানেও দাঙ্গা হবে বাবা? হাজি বিরঘিট, নারোদা পাতিয়া, ত্রাণ শিবির, আর হামিদেরা আমার চোখে ভেসে ওঠে। আমি বাবা, ছেলের কৌতূহলের নিবৃত্তি করা আমার কর্তব্য. তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত কিন্তু কী জবাব দেব আমি এই মুহূর্তে। শুধু হিমুর মুখের দিকে চোখ রাখি হঠাৎ মনে হয় সেখানে কি দুই হামিদ-এর মধ্যেই এসে গুছিয়ে বসেছে? □

অন্ধযুগ

নী লা ঞ্জ ন চ ট্টো পা ধ্যা য়

মাত্র কুড়ি কিংবা একুশ বৎসর বয়সের বন্দিটিকে লইয়া আমার যেন দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। এই নিশীথ রাত্রে সে কী করিতেছে? নির্জন কারাগারের অভ্যন্তরে সঙ্গীহীন একা একা বসিয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে?....নাকি নিজের মনে ফন্দি আঁটিতেছে যে কীভাবে সে আমাদের, এই কারাগারের প্রহরীদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইয়া যাইবে? নাকি বিজনে বসিয়া বসিয়া, জীবনের ওপর বিশ্বাস হারাইয়া সে এখন অস্থিরচিত্তে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করিতেছে? আমি কারাগার পাহারা দিতেছি আর শুধু ভাবিতেছি ওই বন্দির কথা? কেন ভাবিতেছি? এই কারাগারে কত বন্দিকেই তো রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকেই এখানে আছে বৎসরের পর বৎসর। তাহাদের ভাগ্যে কী আছে কে বলিতে পারে? কাহারও ভাগ্যে আছে মৃত্যুদন্ড, কাহারও যাবজ্জীবন দন্ডাদেশ। আবার কেহ কেহ হয়তো কিয়তকাল কারাবাস করিবার পর মুক্তিও পাইয়া যায়। আবার এমন বন্দিও তো আছে, (যাহাদের কথা এই দেশের জনগণ জানে না; কিন্তু আমরা, যাহারা এই কারাগারের বেতনভূক কর্মচারী; এই কারাগারের প্রহরী কিংবা আরও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ; তাহারাই একমাত্র জানি), যাহাদের বিনা বিচারে দিনের পর দিন বন্দিদশা ভোগ করিতে হইতেছে। কর্তৃপক্ষ এইসব বন্দিদের লইয়া কী যে করিবে তাহা কে বলিতে পারে? অবশ্য আমরা, প্রহরীরা, রক্ষীরা কিংবা অন্যান্য কর্মচারীরাই একমাত্র জানি যে এই শ্রেণির বন্দিদের মাঝে মাঝে চিরতরে খালাস করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশের যিনি সর্বশক্তিমান শাসক; (এ ব্যাপারেও আমাদের অনেকের মনেই ধন্দ আছে। সর্বশক্তিমান শাসক যে কে তাহা আমরা এখনও জানি না। তিনি একজনও হইতে পারেন। আবার একাধিক ব্যক্তিও হইতে পারেন। এই দেশ শাসন করিবার দায়িত্বে যে ঠিক কাহারা আছে তাহা আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। আমরা শুধু এটুকুই জানি যে, যিনি কিংবা যাহারা আমাদের এই দেশের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব লইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই সাধক ব্যক্তি। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পরনে সাধুর বেশ)। তিনি অনেক দূরে — পাহাড়ের শীর্ষে এক সুরক্ষিত দুর্গ হইতে সমগ্র দেশকে শাসন করিয়া থাকেন। বরাবর তিনি অন্তরালে থাকিতেই পছন্দ করেন। তাঁহার নাম কী—আমরা, সাধারণ মানুষেরা ঠিক জানি না। তাঁহার চেহারা কেমন তাহা আমরা জানি না। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার, সেই সর্বশক্তিমানের ফোটো ছাপা হয় বটে, কিন্তু সেই ফোটো বরাবরই অস্পষ্টভাবে ছাপা হয়। এখনও অব্দি আমি সেই সর্বশক্তিমানের যতগুলি ফোটো দেখিয়াছি সেসব আমাকে ওই মানুষটির চেহারা সম্বন্ধে বিভ্রান্তই করিয়াছে বেশি। আমি দেখিয়াছি একটি ধূসর এবং জটিল জটাজাল। একটি প্রশস্ত

ললাট যেখানে থোক থোক চন্দনের প্রলেপ। পট্টবস্ত্রের কিয়দংশ। সেই ফোটোতে ত্রিশূলের ফলাও আমি লক্ষ করিয়াছি। এক্ষেত্রে বলিয়া রাখা দরকার যে এই ত্রিশূলের ফলাই হইল আমাদের দেশের শাসকের মূলচিহ্ন। ত্রিশূলের তিনটি ধারাল ফলা। ইহাই আমাদের দেশে শাসন এবং ক্ষমতার মহাপ্রতীক। শাসকের পক্ষ হইতে চিঠির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার কিংবা প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে যেসব নির্দেশ পাঠানো হইয়া থাকে, সেসব চিঠির ঊর্ধ্বে, বামদিকে অথবা ডানদিকে ছাপা থাকে ওই মহাপ্রতীক—ত্রিশূলের তিনটি ধারাল ফলা। এমনকী এই দেশের প্রশাসনিক কার্যালয়গুলিতেও ওই প্রতীক চিহ্নিত আছে এবং আমাদের এই কারাগারের বিশাল প্রবেশদ্বারেও (যা হবরাবার কথই থাকে। মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সেই প্রবেশদ্বার খোলা হয়।) উক্ত প্রতীক চিহ্নিত আছে।

যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম—আসলে আমার বয়স হইয়া গিয়াছে। আমি এখন কথই বলা চলে। এদেশে তিন-কুড়ি বয়স অবধি রাজকার্যে বহাল থাকা যায়। সেই অন্তিম বয়সে পৌঁছাইতে আমার আর বৎসরখানেক বাকি আছে। এই বয়সে স্মৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব শিথিল হইয়া যায়। অমার ক্ষেত্রেও সেই প্রকার। প্রশাসকের চেহারা বর্ণনা করিতে করিতে আমি প্রশাসনের প্রতীকের প্রসঙ্গে চলিয়া গেলাম। ... যাহা বলিতেছিলাম শেষ করি। ....সর্বশক্তিমান সেই প্রশাসকের মুখ স্পষ্টভাবে অদ্য অবধি কোনো ফোটোতেই আমরা দেখিতে পাই নাই। একে শ্মশ্রুময মুখমন্ডল, জটাজুটে, ললাটে গাঢ় চন্দন প্রলেপ ; তাহার উপর তাঁহার দুই চক্ষে রোদচশমা। ফলে তাঁহার আসল রূপ প্রত্যক্ষ করিবার কোনও উপায় থাকে না। এতকাল এই উদ্ভট দেশে বাস করিয়া যেটুকু বুঝিয়াছি তাহা হইল, সেই সর্বশক্তিমান প্রশাসক তাঁহার সদৃশ আরও অসংখ্য প্রশাসককে ছড়াইয়া দিয়াছেন সারা দেশে। নানা শ্রেণির এবং নানা মর্যাদার প্রশাসক। তাঁহারা নিজ নিজ শাসনক্ষেত্রে সর্ব-শক্তিমান সেই মহাপ্রশাসকের নির্দেশমতন এই দেশের জনগণকে শাসন করিয়া থাকেন। সর্বাপেক্ষা যাহা কৌতূহলদ্দীপক ; তাহা হইল প্রশাসনের নানা স্তরে কর্মরত এই প্রকারের অসংখ্য প্রশাসকেরও বেশভূষা একইরকম। পট্টবস্ত্র, শ্মশ্রুময় মুখমন্ডল, ললাটে গাঢ় চন্দন প্রলেপ। কাহারও কাহারও কানে জবা কিংবা ধুতুরা ফুল। এবং হাতে সেই প্রকারের ত্রিশূল। সুতরাং ইহা বলিলে বোধহয় ভ্রম হইবে না যে, আমাদের দেশে প্রশাসকদের সকলকেই দেখিতে একইরকম। কাহারও সহিত কাহাকেও পৃথক করা যায় না। আমাদের এই কারাগারের যিনি মূল প্রশাসক ; তাঁহারও চেহারা এবং বেশভূষা একইরকম।

যাহা বলিতে শুরু করিয়াছিলাম তাহা এই প্রসঙ্গ নহে, সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ। কথা শুরু করিয়াছিলাম সেইসব বন্দিদের লইয়া ; যাহাদের বিনা বিচারে আটকাইয়া রাখা হয় এই দুর্ভেদ্য কারাগারের অভ্যন্তরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। আমরা জানি কখনও কখনও সেইসব বন্দিদের প্রতি প্রশাসনের ফতোয়া জারি হয়। সে বড় ভয়ংকর ফতোয়া। বিনাশকারী ফতোয়া। এই তো কিছুদিন আগে সেইপ্রকার কয়েকজন হতভাগ্য বন্দির ব্যাপারে ফতোয়া জারি হইয়া গেল। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত সেই দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত দূর্গ হইতে মহাপ্রশাসক ফরমান পাঠাইয়া

দিয়াছিলেন কারাগারের প্রশাসকের নিকট। রাত্রিবেলা সেই ফরমান বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহা পড়িয়া কারাগারের প্রশাসক সেদিন গভীর নিশীথেই সেই মহাপ্রশাসকের আদেশ পালন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমাদের কয়েকজন প্রহরীকে ডাকা হইল। আমরা আদেশপ্রাপ্ত হইলাম যে, গুনিয়া গুনিয়া সাতজন বন্দিকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে নাকি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর হইতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আমার সহকর্মী জন্মেজয় বরাবরই একটু একরোখা প্রকৃতির। এই দেশের প্রশাসনব্যবস্থার অনেক কিছুই সে মানিয়া লইতে পারে না যেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারে না। মনে মনে গজরায়। মাঝে মাঝে আমার মতন বয়োজ্যেষ্ঠর নিকট মনের প্রতিক্রিয়া অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি তাহাকে এই প্রকারের হঠকারিতা হইতে যতদূর সম্ভব নিবৃত্ত করি। আমি তাহাকে, সেই তরুণ কর্মচারীকে বোঝাই—ওরে চুপ চুপ! আমরা সামান্য কর্মচারী। আমাদের ছোটোমুখে প্রশাসনের সমালোচনা শোভা পায় না। কর্তৃপক্ষ যদি জানতে পারে তাহলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। হয়ত চাকরি থেকে বরখাস্তও হয়ে যেতে হবে। ....তবুও জন্মেজয় গজরায়। সে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অপারগ। আজও সেই জন্মেজয় পুনরায় ফুঁসিয়া উঠিল। বন্দিদের আকস্মিক মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনিয়া সে আমাদের প্রশাসককে প্রশ্ন করিয়া বসিল — ওই বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড কীভাবে হবে? ওদের তো এখনও বিচারই হল না। কাউকে একবছর, কাউকে দু বছর, কাউকে হয়তো তারও বেশি বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে এই কারাগারে?

সবাই চুপ? সবাই ভীত। জন্মেজয় ছোকরা মহা উদ্ধত। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল কেন?

সাপের শীতল দৃষ্টিতে প্রশাসক তাকাইয়া ছিলেন সেই দুর্বিনীত যুবার দিকে।

বলিয়াছিলেন—প্রশ্ন নয়। আমরা শুধু আদেশ পালন করব।

কিন্তু সেই আদেশের কোনটা ন্যায্য আর কোনটা অন্যায্য তা ভেবে দেখাতেও দোষ? — জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম প্রশাসক জন্মেজয়-এর প্রতি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেরকম কিছুই ঘটিল না। শুধু প্রশাসকের শ্মশ্রুময় মুখমণ্ডল গাম্ভীর্যে থমথম করিতেছিল। আর চন্দনচর্চিত ললাটে কয়েকটি ভাঁজ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অথবা ত্রিপ্রহর হইবে। গগনে শশীকলার চিহ্ন ছিল না। কিন্তু বসন্তরোগ আক্রান্ত মানুষের মুখমণ্ডলের মতন সমস্ত গগন জুড়িয়া নক্ষত্ররাজির ঘন-ঘন-গভীর ক্ষত। আমরা চারজন প্রহরী নির্দেশ মতন আঁধারময় আবছায়ায় বধ্যভূমি ঘিরিয়া দণ্ডায়মান। দেখিলাম, অন্য প্রহরীরা একে একে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের আনিতেছে। তাহাদের পরনে শুধুমাত্র কৌপিন। উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। মুখ বাঁধা। হাত এবং পায়ে কঠিন শৃঙ্খল। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিরা তো সাতজন থাকিবার কথা। আটজন দেখিতেছি কেন? ওই অষ্টম বন্দি কে? উহার পদচালনা দেখিয়া মনে হইতেছিল উহাকে যেন চিনি! কে হইতে পারে? আর এক প্রহরী সুরথ আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—মহেন্দ্রদা দেখছ, এ যে আমাদের জন্মেজয়....!

জন্মেজয়! আমাদের জন্মেজয়! আমি চিৎকার করিতে যাইবার মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিলাম। কিছুই করার ছিল না। সাতজন বন্দির সহিত জন্মেজয়কেও প্রতিবাদের অপরাধে প্রাণ দিতে হইল। বধ্যভূমির অস্ত্রটিও বিচিত্র। চওড়া, ভারী এবং বিশাল এক ইস্পাতখণ্ড দুইটি লোহার দণ্ডের উপর স্থাপিত। নিচের দিকে ওই দণ্ডদ্বয়ের সাথে ইস্পাতফলার রজ্জুসংযোগ আছে। নিচে হাঁড়িকাঠে বন্দির মাথা স্থিরভাবে স্থাপিত থাকে। প্রশাসকের নিশান দেখিলেই ভীমকায় বিকটদর্শন জল্লাদ লৌহদণ্ডদ্বয়ের রজ্জুতে হেঁচকা টান দেয়। সবেগে ইস্পাতফলা নামিয়া আসিয়া ধড় হইতে মুণ্ডকে পৃথক করিয়া দেয়। সেদিন কালনিশীথে আমরা প্রহরীরা চুপচাপ সেই ভয়ংকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। একে একে সাতজন বন্দির ছিন্ন মুণ্ডগুলির সহিত আমাদের তরুণ সহকর্মী জন্মেজয়ের মুণ্ডও বধ্যভূমিতে গড়াগড়ি খাইতেছিল। ক্রোধ এবং প্রতিবাদের বিদ্যুৎ আমার শরীরময় প্রবাহিত হইতেছিল। বাস্তবতা ভুলিয়া আমার বোধহয় চিৎকার করিবার অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমার মুখচোখের অবস্থা দেখিয়া সুরথ বোধহয় তাহাও বুঝিতেও পারিয়াছিল। না হইলে কেন সে মৃদু স্বরে বলিবে—মহেন্দ্রদা! হঠকারিতা করো না। তোমার একমাত্র মেয়ে মানসীকে তাহলে কে দেখবে? ঠিক সময়ে ঠিক কথাই বলিয়াছিল সুরথ।...

ষোড়শী মানসীর মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়াছিল আমার চোখে! আমি দাঁতে দাঁত চাপিয়া টিপিয়া নিজেকে সংযত করিয়াছিলাম।

দুই

সাত দিবস পূর্বে যে নতুন বন্দিকে কারাগারে আনা হইয়াছিল তাহার কাহিনিই আসলে বলিতেছিলাম। ছেলেটির নাম তীর্থঙ্কর। উহাকে ছেলে বলাই উচিত বলে মনে করি। কারণ উহার বয়স কতই বা, কুড়ি কিংবা একুশ। পড়াশোনায়, বিশেষত অঙ্কশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রে খুবই পারদর্শী ওই যুবক। বিদ্যালয় হইতে মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই সে অধ্যাপকগণের নজর কাড়িয়াছে। তীর্থঙ্করকে যখনই দেখি মনে হয় সূর্যের তেজ উহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত। দীর্ঘ, গৌরবর্ণ চেহারা। ব্যবহারে অমায়িক। কিন্তু এই দেশের বিচিত্র শাসনব্যবস্থা লইয়া সেও যেন বিশেষভাবে চিন্তিত। মাঝে মাঝে সে বলিয়া থাকে—এই সন্ন্যাসী রাজতন্ত্র আমাদের দেশকে যে কোন্ অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মহেন্দ্রকাকা! আমি তাহাকে বলি—ওরে চুপ চুপ! এ রাজ্যে দেয়াল কিংবা গাছের পাতারও কান আছে!

তীর্থঙ্কর আমাদের গ্রামের বাসিন্দা। সে আমাদের প্রতিবেশী, ইহাও বলা যায়। তাহার পিতা একজন মাঝারি মাপের ব্যবসায়ী।

তীর্থঙ্করের জীবনে অনেক সম্ভাবনাই ছিল। কিন্তু সে এমন এক কাজ করিল যে, তাহার ভবিষ্যতই বোধহয় বরবাদ হইতে বসিয়াছে।

সেই ঘটনা বলি।....

একদিন খবর রটিল যে, এই দেশের মহাপ্রশাসক তাঁহার প্রতিনিধিকে প্রেরণ করিবেন এই অঞ্চলে একটি মন্দির উদ্‌বোধনের কাজে। আমাদের প্রশাসনের আর একটি প্রধান কর্মের কথা বলা হয় নাই। তাহা হইল, দেশ জুড়িয়া একের পর এক

মন্দির নির্মাণ করা এবং সেই মন্দিরে নিজেদের শাসনব্যবস্থার কীর্তিকাহিনি খোদাই করিয়া রাখা। মন্দির মন্দির মন্দির! দিকচক্রবালে যেদিক চোখ যাইবে, দর্শক দেখিবে শুধু নানা আকৃতির এবং নানা স্থাপত্যের মন্দির। আমাদের দেশের প্রশাসকরা যে বাসভবনগুলিতে থাকেন, তাহাদেরও আকৃতি মন্দিরসদৃশ। সন্ন্যাসীরা বোধহয় মন্দিরে থাকিতে এবং পূজা পাইতে পছন্দ করেন।

যাহা হউক, উচ্চপদস্থ সেই প্রশাসক, (যিনি দুর্ভেদ্য দুর্গ-নিবাসী সেই মহাপ্রশাসকেরই প্রতিনিধি) যে সড়ক ধরিয়া সদ্য-নির্মিত মন্দির উদ্‌বোধন করিয়ে যাইবেন, তাহা আমাদের গ্রামের সম্মুখ দিয়া গিয়াছে। আমাদের স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশমতন গ্রামবাসীরা, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে, সারিবদ্ধভাবে সেই উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিকে অভিবাদন জানাইতে প্রস্তুত। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের অভিবাদন বা সম্মান জানাইবার বিশেষ কয়েকটি রীতি সাধারণ মানুষকে পালন করিতে হয়। তাহা হইল এইরূপ। যখন যখন সেই সন্ন্যাসী শকটবাহিত হইয়া যাইবেন তখন অপেক্ষমান জনতা প্রত্যেকে নিজের নিজের শির সসম্ভ্রমে নত করিয়া তাঁহাকে সম্মান জানাইবে। যতক্ষণ তিনি যাইবেন, সড়কের সেই অংশের জনতা শির নত করিয়াই থাকিবে। নারীরা উলু দিবে, শঙ্খ বাজাইবে এবং সন্ন্যাসীর প্রতি পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিবে। নৃত্য এবং গীতে পারদর্শী বিশেষ কিছু সুন্দরী নারীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন স্থানীয় প্রশাসক। সন্ন্যাসী যখন অতিথিশালায় বিশ্রাম করিবেন, তখন তাঁহাকে সঙ্গ এবং আনন্দ দিবে ওই সুন্দরীরা। প্রশাসনের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে বরাবর এরকমই হইয়া থাকে। প্রজাদের নিকট তাঁহাদের দাবি হইল শর্তহীন আনুগত্য।

কিন্তু সেইদিন আমাদের গ্রামে অন্যরকম ঘটিয়াছিল। পুষ্পশোভিত শকটটি সন্ন্যাসীকে লইয়া ধীরে আমরা শীর নত করিয়া দন্ডায়মান। আমার পার্শ্বে কখন যে তীর্থঙ্কর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ তীর্থঙ্করের কন্ঠস্বর কানে আসিল—হে প্রশাসক, আপনাকে আমার কিছু বলিবার আছে! আমাকে কয়েক মুহূর্ত সময় দিন।...

সবাই স্তম্ভিত! প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবে শির উঁচু করিয়া প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলিবার দুঃসাহস এই যুবা কোথা পাইল?.....

তীর্থঙ্করের কথা অগ্রাহ্য করিয়া শকট চলিতেছিল। তখন সে এক কান্ড করিল। সড়কের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল — সাধারণ মানুষের কন্ঠরোধ করিয়া আপনারা এভাবে কতদিন রাজ্য চালাবেন? সন্ন্যসীর বেশভূষা আপনাদের মুখোশ! সন্ন্যাসীর ত্যাগ, উদারতা এবং তিতিক্ষা আপনাদের নাই। আপনারা অন্যের কথা শোনেন না। অন্যের ধর্মকে সম্মান জানাতে চান না। শুধু নিজেদের কিছু অবাস্তব সংস্কার, বিধি এবং উপাচার অবলম্বন করে আপনারা স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন! সাধারণ মানুষ সারাদেশ জুড়ে বিরক্ত। প্রতিবাদের আগুন কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। উন্নতা চেতনার মানুষ আপনাদের এই স্বেচ্ছাচার আর মেনে নেবে না বেশিদিন....! আমার হাত পা কম্পমান! তীর্থঙ্কর কী উন্মাদ হইয়া গিয়াছে! সে কী করিতেছে সে কী নিজেই জানে? বলাই বাহূল্য তীর্থঙ্কর সেদিন মুহূর্তের মধ্যে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। উহার হাত ও পায়ে শিকল পরাইয়া প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করিতে করিতে

সেপাইগণ উহাকে লইয়া গেল আমাদের কারাগারে।

প্রশাসন কী করিবে তীর্থঙ্করকে লইয়া? উহার কি মৃত্যুদণ্ড হইবে? তাহা হইলে আমার মানসীর কি হইবে? সেই হতভাগিনী যে তীর্থঙ্করকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে! যতদিন কারাগারে বন্দি; ততদিন মানসীও ঠিকমতন খাওয়া-দাওয়া করিতেছে না। নির্জনে বসিয়া শুধু চোখের জল ফেলিতেছে। এখন আমি কী করিব?...

কী করিব আমি? হঠাৎ এতটা হঠকারি তীর্থঙ্কর হইল কেন? আমি সামান্য বেতনভূক প্রহরী মাত্র। আমার কথা কে শুনিবে?

এখন গভীর রাত্রি। আমি আজ রাত্রি পাহারায়। আজ অবশ্য আকাশে চাঁদ দৃশ্যমান। তবে পরিপূর্ণ নয়। একফালি কুমড়ার মতন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাজি। একটি রাত্রি পাখি ডাকিতেছে। যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাথা ঠুকিতেছে। এরকমই উহার ডাক। তীর্থঙ্কর কী গারদের অভ্যন্তরে একাকী ঘুমাইয়া পড়িল? সে কী করিতেছে—একটিবার দেখিতে সাধ জাগিল।

—তীর্থঙ্কর—তুমি কী ঘুমোচ্ছ?

—না ঘুমাইনি।...আজকাল ঘুম অত সহজে আসে না। একেবারে ঘুমোব।... মহানিদ্রা.....।

—আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই তীর্থঙ্কর?

—কী?.....বলুন? আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি....।

—তোমার বয়স অনেক কম তীর্থঙ্কর। এখনও কত সম্ভাবনা তোমার জীবনে। তুমি নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাববে না?

—কী বলতে চাইছেন?

—এখনও সময় আছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে তুমি কোনওদিন কোনও সম্পর্ক রাখবে না। উপরন্তু তাদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তুমি প্রশাসনকে সাহায্য করবে এই মর্মে মুচলেকা দিলে তোমার শাস্তি অনেকটাই মকুব হয়ে যাবে। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই তুমি মুক্তি পাবে?

—আপনার কাছ থেকে এই প্রস্তাব আসবে আমি আশা করিনি। —তীর্থঙ্করের কন্ঠস্বরে ছিল চাপা ক্ষোভ ও উত্তেজনা। যাদের হাতে এখন অমাদের দেশের শাসনের ভার, আপনার কী মনে হয় তারা সুস্থ মানুষ? কত বিচিত্র আমাদের এই দেশ! নানা সম্প্রদায়ের মানুষের নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাস আছে, সংস্কার আছে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। কিন্তু আমাদের শাসকরা তো অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে গুরুত্বই দিতে চায় না। তাদের আছে সন্ন্যাসীর পোশাকে এক বিশাল গুন্ডাবাহিনী। তারা অন্য ধর্মের মানুষকে দেখলেই মেরে ফেলতে চায়। সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে তারা সারাদেশে। কিছুদিন আগে ওই গুন্ডাবাহিনী আমাদের পাশের শহরে কী নিষ্ঠুরতা চালিয়েছিল আপনি জানেন না? বিনা প্ররোচনায় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের ধর্মবিশ্বাস আলাদা, তাদের বস্তির পর বস্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে, ছেলের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে; মেয়ের সামনে বাবাকে কচুকাটা করেছে, উপাসনার কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করেছে! কী অমানুষিক এবং নির্বিচার গণহত্যা! যখন সারা শহর জুড়ে ওই সন্ত্রাস

আর দাঙ্গা চলছিল, তখন নাকি ওই প্রদেশের প্রশাসক নিজের প্রাসাদে বসে নর্তকীদের ধ্রুপদী নৃত্য দেখতে ব্যস্ত ছিলেন! আজ একটা শহরে এরা দাঙ্গা লাগিয়েছে। আগামীকাল অন্য একটা শহরে এরা দাঙ্গা লাগাবে। হাজার হাজার সন্ন্যাসীকে নামিয়ে দেবে রাস্তায়। যারা আসলে ছদ্মবেশী জল্লাদ। দাঙ্গা আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এরা সাধারণ মানুষকে বোবা করে দিতে চায়। যাতে কেউ কোনওদিন প্রতিবাদ করার সাহস না পায়? সেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে আপনি মেনে নিতে বলছেন?

লোহার গরাদের অপর দিক হইতে কথাগুলি বলিতে বলিতে তীর্থঙ্কর দৃশ্যতই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্দিক অন্ধকারে নিমজ্জিত। যদিও আকাশে প্রায়-পূর্ণ চাঁদ। সেই চাঁদের কিরণে দীর্ঘ গরাদ ছায়ার কিয়দংশ আমার শরীরেও। অনেক বয়স হইয়াছে আমার। তবুও এখন আমার মনে প্রায়শই মৃত্যুভয় ক্রিয়াশীল। কিন্তু আমার সম্মুখে বন্দি তীর্থঙ্করকে দেখিতেছি। যাহার মৃত্যুভয় নাই। শুধু অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া যাবতীয় অনাচার আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার দুর্জয় সাহস তাহার উজ্জ্বল এবং শীর্ণ মুখমন্ডলকে যেন আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেই মুহূর্তে আমি বস্তুত ভাবিতেছিলাম আমার মানসীর কথা। মাতৃহারা একমাত্র কন্যা আমার। একই গ্রামে আমাদের ও তীর্থঙ্করের বাস। সেই সুবাদেই হয়তে তীর্থঙ্কর ও মানসীর মধ্যে প্রেম জন্মিয়াছে। আমাদের গ্রামে আলতাদীঘি নামে এক বিশাল জলাশয় আছে। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইতেছি বলিয়া মানসী যে কেন কলস-কাঁখে বাহির হইয়া যাইত এবং বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব করিত তাহার কারণ, আমি, মানসীর পিতা ছাড়া আর কে ভালো জানিবে? আলতাদীঘির নির্জনে উহারা পরস্পর পরস্পরের কাছে হৃদয় উন্মোচন করিত। সব জানিয়াও আমি বাধা দিই নাই। কারণ তীর্থঙ্করের ন্যায় মেধাবী, সুভদ্র, অভিজাত যুবা মানসীকে ভালোবাসিয়াছে ইহা, মানসী ও আমার পক্ষে সৌভাগ্যই। কিন্তু এখন তো তীর্থঙ্করের সম্মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া। এখন আমার মানসীর কী হইবে?... কী হইবে মানসীর? এই প্রশ্নে কী তীর্থঙ্করকে করা ঠিক হইবে?...

—সহ্য করতে করতে মানুষের যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখনই মানুষ নিজের ভালো-মন্দ কথা ভাবে না। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ঘুরে দাঁড়াবেই! প্রতিবাদ করবেই। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। তীর্থঙ্কর আবার বলিতে লাগিল। —সেদিন যখন প্রশাসনের প্রতিনিধি সেই ভন্ড সন্ন্যাসীর গাড়ি আমাদের গ্রামের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল, তখন কে যেন আমার ভেতরে চিৎকার করে উঠেছিল, প্রতিবাদ কর! আমি তাই প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিকে সামনে পেয়ে ওভাবে প্রতিবাদ করে উঠেছিলাম! নিজের নিরাপত্তা বা ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি।

—কিন্তু অসংখ্য সাধারণ মানুষ তো এই নির্মম শাসনব্যবস্থাকেই মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে! যেমন ধর আমি নিজে। আমিও তো এই মৌলবাদী শাসকদের মেনে নিতে পারি না। কিন্তু প্রতিবাদ করতেও বা পারি কোথায়? এই অশুভ শাসনব্যবস্থার আমিও তো একটা অংশ। আমি তাদের বেতনভূক কর্মচারী। এ-কারণে আমার মনেও যন্ত্রণা আর অনুশোচনার শেষ নেই।

—আপনার হয়তো মনে হচ্ছে সবাই এই শাসনব্যবস্থাকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে। কিন্তু তা হয়তো সত্যি নয়। প্রতিবাদের আগুন কোথাও না আমাদের অজান্তেই ধিকি-ধিকি জ্বলছে। খুব তাড়াতাড়ি তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের এই শহরের সীমানার শেষে মাইল-মাইল যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল সেখানে গোপন ঘাঁটি গড়ে তুলেছে অনেক যুবক। নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা ওই জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে। নিজেদের প্রস্তুত করছে—কীভাবে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিশাল আঘাত হানা যায়। আজ আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই তাদের সঙ্গে আমারও গোপন যোগাযোগ ছিল। যে অন্ধযুগের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি সেই অন্ধযুগের শেষ তারা দেখতে চায়।...

—অন্ধযুগ ? তীর্থঙ্করের ভাষা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

—হ্যাঁ, অন্ধযুগ....। তীর্থঙ্কর দৃঢ়ভাবে বলিল। —এমন এক যুগে আমরা বাস করছি যার দুই চোখ অন্ধ। যে যুগের বিবেকও অন্ধ। অশিক্ষিত, বিবেকহীন, জ্ঞানহীন, চেতনাহীন অস্বাভাবিক এক সন্ন্যাসীরাজ আমাদের দেশকে আরও অন্ধকার, আরও হাহাকারময় অন্ধত্বের দিকে নিয়ে চলেছে। এই অন্ধযুগের অবসান চাই। যদি প্রয়োজন হয় আমার মতন অনেকের প্রাণের বিনিময়ে.....।

আবছা অন্ধকারে আমি দেখিলাম তীর্থঙ্করের চক্ষু দুটি জ্বলিতেছে। অকুতোভয় প্রাণশক্তি তাহার দুই চক্ষুতে যেন প্রতিভাত!

—কৌন হো? কৌন ? ....আমারই সহকর্মী এক প্রহরী দূর হইতে আমারই উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে প্রত্যুত্তর দিলাম। সে আমার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। হয়তো কারাগার চত্বর প্রহরা দিতে দিতে সে এই গভীর নিশীথে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমার সাথে কথোপকথন করিয়া সে মনের ক্লান্তি দূর করিতে চায়।

—তীর্থঙ্কর আমি যাই। তুমি ঘুমোও। চাপা স্বরে বলিলাম।

—চোখে ঘুম নেই। সেই মহানিদ্রার জন্যে অপেক্ষা করছি। হাসিয়া তীর্থঙ্কর বলিল।

তিন

সারাদিন গৃহে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছি। মানসী কাঁদিতেছে। আমার সাধ্য নাই তাহার কান্না রোধ করি। আমরা যাহা আশঙ্কা করিলাম তাহাই ঘটিল। প্রশাসন প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিয়াছে তীর্থঙ্করের বিরুদ্ধে। আজ দ্বিপ্রহরে কারাগারের অভ্যন্তরে সেই ধারাল ইস্পাদ-ফলা নির্দিষ্ট সময়ে সবেগে নামিয়া আসিবে তীর্থঙ্করের গলায়। মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে ধড় হইতে। দৃশ্যটি একবার কল্পনা করিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

তীর্থঙ্করের ক্ষেত্রেও বিচারের নাম প্রহসন ঘটিয়াছে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রশাসনের মিথ্যাবাদী কোটালবাহিনী একের পর এক অভিযোগ আনিয়াছে তীর্থঙ্করের বিরুদ্ধে। সাক্ষ্যপ্রমাণাদিও পেশ করিয়াছে আদালত। নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে তীর্থঙ্করের নাকি যোগাযোগ ছিল। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডই সাব্যস্ত হইয়াছে।

বেলা কিয়ত বাড়িলে মানসী হঠাৎ পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিল আমার কাছে। তাহার পদ্মসম টানা টানা চক্ষু দুটি ঘোর রক্তবর্ণ। কেশদাম এলোমেলো। পরিধানের ঠিক ঠিকানা নাই। মানসী ডাকিল—বাবা?

—কী মা? কিছু বলবি?

—বাবা তোমার পায়ে পড়ি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ....!

—কী চেষ্টা করব মা?

—চলো আমরা দুজনে যাই—!

—কোথায় মা?

—জেল অফিসারের কাছে। তুমি তো এতদিন তাঁর অধীনে কাজ করেছ। একবার অনুরোধ করে দেখি। তীর্থঙ্করের মৃত্যুদণ্ড যদি মকুব হয়। অন্তত সে বেঁচে থাকুক। তাকে তো তবুও মাঝে মাঝে দেখতে পাব।

—ছেলেমানুষি করিস না মা! পরিস্থিতি একটু বোঝার চেষ্টা কর। তীর্থঙ্করের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এসেছে এদেশের মহাপ্রশাসকের কাছ থেকে। ওসব বিচারটিচার সব ভাঁওতা। এদেশ চালিত হয় সেই শাসকের ইচ্ছেমতো, তিনি যা বলবেন তাই হবে।

—তাহলে তাঁর কাছেই যাই?.....অন্তত একবার চেষ্টা করে দেখি।

—তাঁর কাছে যাবি?....তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। তাঁর চেহারা সবাই ছবিতে দেখেছে। কিন্তু তাঁর মুখ ঠিক কীরকম কেউ জানে না। তিনি সাধারণ মানুষের অগম্য।

—তাহলে জেলখানার অফিসারের কাছেই যাব বাবা! তাঁর মাধ্যমে আমরা আমাদের আর্জি জানাব সেই মহাপ্রশাসকের কাছে।

মানসীকে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। সে যাইবেই। তীর্থঙ্করকে সে মরিতে দিবে না। শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, তাহাকে বাঁচানো যায় কিনা। মাতৃহারা একমাত্র কন্যা আমার। তাহার শুষ্ক মুখ, চোখের জল আমি সহ্য করিতে পারি না। কারাগারের অধ্যক্ষের কাছে মানসীর সহিত আমাকে যাইতেই হইল। আজ অপরাহ্নে তীর্থঙ্করের প্রাণদণ্ডাদেশ পালিত হইবে। কতটুকুই বা সময়? এখন কাহাকেও অনুরোধ-উপরোধ করিয়া কোনও ফল হইবে কী? কিন্তু মানসী যুক্তি মানিবার মতন অবস্থায় নাই—আমি জানি। এ ও জানি যে, সে তার হৃদয় সঁপিয়াছে তীর্থঙ্করের সমীপে। হৃদয়াকো যুক্তির সাজানো নিগড় মানে না।

এই কারাগারের প্রহরীর কর্মে বহু বৎসর নিযুক্ত রহিয়াছি। অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিবার ক্ষেত্রে অসুবিধা হইল না। দ্বাররক্ষীরা সকলেই আমাকে চেনে। অগ্রজ সহকর্মী বলিয়া সম্মান জানায়। তাহারা আমাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তবে কেউ কেউ বিস্মিত যে হইল না তাহা নয়। নিজের কন্যাকে লইয়া আমি অধ্যক্ষের কাছে কেন আসিয়াছি?

অধ্যক্ষও আমাদের দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। সবেমাত্র তিনি স্নান সারিয়া আহারে ব্যস্ত। সন্ন্যাসীর বেশ তাঁহার এই দেশের প্রশাসনিক রীতি অনুযায়ী। তবে তাঁহার আহার-সামগ্রির ঘটা দেখিয়া আমার চক্ষু সরিতেছিল। তাঁহার সম্মুখে অন্তত ছয়টি রুপোর থালা। প্রতিটি আমিষজাতীয় খাদ্যও দেখিতেছি। নধর এক ভেড়ার ঠ্যাং হইতে দাঁত দিয়া মাংস ছিঁড়িতে ব্যস্ত ছিলেন কারাগার অধ্যক্ষ। সেই মুহূর্তে

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। হয়তো পুরনো এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী বলিয়াই অধ্যক্ষের ভোজনকক্ষে আমার প্রবেশাধিকার ঘটিল।

আমাকে দেখিয়া ততটা নয়, কিন্তু আমার সাথে মানসীকে দেখিয়া অধ্যক্ষ মুহূর্তকাল চমকাইয়া গেলেন। তারপর আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী ব্যাপার মহেন্দ্র, কিছু বলবে?

—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন অধ্যক্ষ। আমি এসেছি—

—কীজন্যে এসেছ বল? মাংস চিবাইতে গিয়া অধ্যক্ষের দাঁতে বোধহয় ছিবড়া আটকাইয়া গিয়াছে। তিনি নিজের একটি আঙুল দিয়া প্রাণপণে তাহা বাহির করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি সম্মুখে দন্ডায়মান মানসীর দিকে ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

—আজ্ঞে আমার মেয়ে।

—তোমার মেয়ে? ....বাহ? চেহারাটা খাস তো?.....তো কী কারণে এসেছ? মেয়ের জন্যে এখানে কাজ চাও?

—আজ্ঞে না। আমি এসেছি....আমি এসেছি...তীর্থঙ্কর নামে যে বন্দির আজ...। কথা শেষ করিতে পারিলাম না। অধ্যক্ষের চন্দনচর্চিত ললাটে ভ্রূকুটির ঘনঘটা দেখিয়া হাত কাঁপিতে লাগিল। —আজ্ঞে আমি বলছি কেন এসেছি। মানসী হঠাৎ বলিতে লাগিল, আমরা চাই তীর্থঙ্করের মৃত্যুদণ্ড মুকুব করা হোক। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মতন অপরাধ ও করেনি। ওর এখন অনেক জীবন পড়ে আছে। ওর মেধা এবং প্রতিভা দেশের কাজে লাগতে পারে। আপনি দয়া করে একবার বিবেচনা করুন। ওর মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। হাতজোড় করে মিনতি করছি। মানসী প্রকৃতই কাকুতিমিনতি করিতেছিল।

আমি দেখিতেছিলাম অধ্যক্ষের মুখমণ্ডল ঘোর শ্রাবণের কৃষ্ণকায় আকাশ। তিনি আহার থামাইয়া আমার দিকে রক্তচক্ষু ফিরাইলেন।

—তোমার থেকে আমি এটা আশা করিনি মহেন্দ্র। তুমি আমাদের বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী। তুমি মেয়েকে এসব কী শিক্ষা দিচ্ছ? সে দেশদ্রোহীর মতো কথা বলেছে? প্রশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা শাস্তি জানো তো?

—আজ্ঞে জানি। কিন্তু ও তো কিশোরী। কতই বা বয়স? আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন।

—বাবা! মানসী প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল। তুমি কী বলছ? ক্ষমা চাইছ কেন? আমি তো কোনও অপরাধ করিনি? আপনারা যারা আমাদের শাসন করছেন তারাই অপরাধী। ক্ষমতার দম্ভে আপনারা সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রেখেছেন। নিত্যদিন তাদের পিষে মারছেন। তাদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন ধর্মের উন্মাদনা আর কুসংস্কার! ভবিষ্যৎ আপনাদের ক্ষমা করবে না। একজন তীর্থঙ্কর মরবে কিন্তু জেনে রাখবেন আরও অসংখ্য তীর্থঙ্কর গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে আপনাদের শাস্তি দেবার জন্যে.....!

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি। এসব কী ঘটিতেছে? এত সাহস মানসী কোথা হইতে পাইল? এখন আমি কী করিব? অধ্যক্ষের রোষ হইতে আমি মানসীকে কীভাবে বাঁচাইব?....

কিন্তু আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যখন দেখিলাম অধ্যক্ষ এতটুকু রাগেন নাই। বরং তিনি হাসিতেছিলেন। রক্তবর্ণ, টুকটুকে একটি আপেল কামড় দিয়া তিনি বলিলেন—মহেন্দ্র তোমার মেয়ের খুব তেজ দেখছি! সুন্দরীদের রাগলে খুব ভালো দেখায়। মহেন্দ্র?

—আজ্ঞে?

—আজ রাত দশটার পর তুমি তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমাদের সমাজব্যবস্থা এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করতে চাই। কী কন্যে আসবে তো?....

—অসভ্য! বর্বর! দাঁতে দাঁতে টিপিয়া মানসী বলিল।

—মহেন্দ্র! শুনলে তো? আজ রাত দশটার পর তোমার মেয়েকে—

—এ আপনি কী বলছেন অধ্যক্ষ? ও আপনারও মেয়ের মতন!

— হা হা হা হা.....। অধ্যক্ষ বিশ্রীভাবে হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, রক্তের সম্পর্কে যে আমার মেয়ে তাকে ছাড়া আর সব মেয়েকে আমি নারী হিসেবে দেখি।......রক্তমাংসের নারী!

....তাহলে ওই কথা রইল মহেন্দ্র? আজ রাত দশটার পর তুমি এই অপরূপ সুন্দরীকে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে....?

—তা আমি পারব না অধ্যক্ষ।

—পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। যদি পার তাহলে তোমার মাইনে বেড়ে যাবে। পাঁচশো মুদ্রা। আর যদি না পার...। অধ্যক্ষ থামিলেন। তারপর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, অসহযোগিতা কিংবা দেশদ্রোহিতার পরিণাম কী তা নিশ্চয়ই জানা আছে...।

চার

সূর্য অস্তমিত। সন্ধ্যার আঁধার আঁখিপল্লবের ন্যায় নিঃশব্দে নামিয়াছে। তীর্থঙ্করের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কারাগারের প্রশস্ত চত্বরে যথাযথভাবে আজ অপরাহ্ণেই পালিত হইয়াছে আমি জানি। আমার গৃহে অন্ধকার। বাতি জ্বলে নাই। ঘরের এককোণে ধূলিশয্যায় মানসী ভূলুণ্ঠিতা। অনবরত অশ্রুপাত করিতেছে। আমি নিঃশব্দে গৃহ হইতে পথে নামিলাম। আলতাদীঘির পাড়ে যে ঘন জঙ্গল তাহাই আমার গন্তব্য।

এই জঙ্গলে বিষধর সর্পের বাস, তাহা কী আমি জানি না? তাহা হইলে সেই জঙ্গলের অন্দরেই আমি প্রবেশ করিতেছি কেন? আসিয়া দাঁড়াইলাম এক প্রাচীন বটবৃক্ষের সমীপে। আমি একটি সর্পকে বন্দি করিতে আসিয়াছি। আমি তো ওঝার বংশধর। সর্প বন্দি করিবার প্রক্রিয়া আমার নখদর্পণে।

বিপুল নৈঃশব্দ। নিশ্ছিদ্র আঁধার। মাঝে মাঝে রাতচরা পাখি এবং শৃগালের ডাক। অদূরে, বটবৃক্ষের নিকটে ঝোপে সরসর আওয়াজ! এই আওয়াজ অতি চেনা। এই গন্ধ অতি চেনা। সাক্ষাৎ একটি কাল নাগিনী মিলিয়া যাইবে এতটা আশা করি নাই। আমার অঙ্গুলিতে আটকানো শিকড়ের বশে কালনাগিনীর উদ্যত এবং চাটালো ফনা নেতাইয়া পড়িল। দীর্ঘ সেই সর্পকে আমি খুব সহজেই ঝাঁপিতে পুরিয়া ফেলিলাম। তারপর সেই ভয়ংকর মৃত্যুদূতকে লইয়া হাজির হইলাম কারাগারের তোরণদ্বারে। আমার কাঁধের

ঝোলায় আছে ঝাঁপি। সেই ঝোলায় তো খাবারও থাকে। কারাগাররক্ষীর আমাকে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সে পথ ছাড়িয়া দিল।

এত রাত্রে অধ্যক্ষ আমাকে দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন।

—মেয়েকে এনেছ মহেন্দ্র? ....আমি জানি তুমি আমার আদেশ অমান্য করবে না। সবাই তো খেয়ে পরে বাঁচতে চায়—কী বলো?

—হ্যাঁ এনেছি। তবে মেয়েকে নয়।.....মৃত্যুকে!

ঝাঁপি খুলিতেই ক্রোধান্ধ কালনাগিনী বাহির হইয়া লকলকে ফনায় দুলিতেছে। উদ্যত ফনা অধ্যক্ষের মুখের সামনে দুলিতেছে। বিস্ময় এবং মৃত্যুভয় যুগপত বোধহয় অধ্যক্ষের জিহ্বাকে অবশ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না.....।

পিছনের দিকে না তাকাইয়া আমি কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। রক্ষীরা নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করিতেছে। আমি তাহাদের সহকর্মী। আমাকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ঘটে নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে একাকী মানসী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমার ডাকে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

—বাবা!

—চল মানসী। এখনই বেরোতে হবে....।

—কোথায় বাবা?

—এখন প্রশ্ন করতে নেই মা। শুধু তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে।

সারারাত দুইজনে হাঁটিতে হাঁটিতে শহর অতিক্রম করিয়া গেলাম। মানসী অত্যন্ত বাধ্য মেয়ে। আর প্রশ্ন করে নাই। পা মিলাইয়া আমার সহিত নিশ্চুপ হাঁটিতেছে। শহর অতিক্রম করিবার মুহূর্তে মানসী আর পারিল না, অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা কোথায় চলেছি বাবা?

—একজন তীর্থঙ্কর গেছে। কিন্তু আরও অনেক তীর্থঙ্কর আছে। তাদের খোঁজে। তারা এই অরণ্যেই ছড়িয়ে আছে....।

—তারা আমাদের ভুল বুঝবে না তো বাবা?

—আশা করি তারা আমাদের ভুল বুঝবে না। তাদেরই বন্ধু হিসেবে আমাদের মেনে নেবে। কারণ তাদের যা লক্ষ্য আমাদেরও তাই....।

—কী লক্ষ্য বাবা?

—এই অন্ধযুগের অবসান। ....যত তাড়াতাড়ি সম্ভব.....। □

অভিমন্যু

ভ গী র থ   মি শ্র

কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের দেখা মাত্রই সারা মন এক ধরনের অপ্রসন্নতায় ভরে যায়। প্লাটফর্মের যাত্রীদের মধ্যে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকা লোকটিকে দেখতে দেখতে বৈরাগ্যর মনে তেমনই এক অনুভূতি। না, লোকটি যে কোনো আদেখলাপনা করছে, তা নয়। কাউকে যে অকারণে বিরক্ত করছে, তাও নয়। তবুও লোকটিকে দেখতে দেখতে বৈরাগ্যেরমধ্যে এক ধরনে অপ্রসন্নতা দানা বাঁধছিল। ক্যাটকেটে ফরসা, বেঁটে, হোঁদল-কুতকুত চোহার, ফোলা ফোলা গাল, থ্যাবড়ানো নাক, জোঁকের মতো পুরু ঠোঁট, গোলগোল চোখদুটিতে বোকা বোকা চাউনি। লোকটি প্ল্যাটফর্মের একাংশ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অকারণে।

প্রথমে মনে হয়েছিল, জনারণ্যে কাউকে খুঁজছে বুঝি। কিন্তু খানিকবাদে নিশ্চিন্ত হয়, সম্পূর্ণ অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা? খদ্দরের একখানি ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরেছে। গায়ে খদ্দরের আধ-ময়লা হাঁটু অবধি ঝোলা জামা। কপালে লাল রংয়ের তিলক। কাঁধে একখানা কাপড়ের ঝোলা. চোখেমুখে এক ধরনের হাবাগোবা ভাব। ঘুরে বেড়ানোর ধরনটিও খুব এলোমেলো ও উদ্দেশ্যহীন। কেন অমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটি? কাউকে ফলো করছে? কারো ওপর নজরদারি করছে কৌশলে? লোকটাকে একটুক্ষণ লক্ষ করবার পর বৈরাগ্য নিশ্চিন্ত হয়, ব্যাপরাটা তেমনও নয়। কারও প্রতি কোনও বিশেষ মনোযোগ নেই ওর। শুধু ইতঃস্তত ঘুরে বেড়ানো ছাড়া লোকটির মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই পায় না বৈরাগ্য। তবুও কেন লোকটাকে দেখতে দেখতে ওর সারামন অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে তার কারণটা বিশ্লেষণ করতে থাকে মনে মনে। এবং খানিকবাদে ওর মনে হয়, লোকটা উপস্থিত যাত্রীকুলের মধ্যে নিতান্তই বেমানান। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের যাত্রী সবাই। ঝকঝকে পোশাক, চকচকে মুখ, ফ্যাশন-দুরস্ত বেশবাস। দামি দামি ভি-আই-পি লাগেজ, প্রজাপতির মতো বিচিত্র বর্ণের পোশাক-পরা ছেলেমেয়ে, সব মিলিয়ে এক ধরনের বর্ণাঢ্য জৌলুসের সমাবেশ। ওদের মধ্যে একটা বদখত চেহারার মানুষ রুচিবিরুদ্ধ পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবিরাম...একদল পেখম তোলা ময়ুরের মধ্যে একটা দাঁড়কাক, সাদা চোখে দৃশ্যখানা বড়োই পীড়াদায়ক। হয়ত এটাই বৈরাগ্যের অন্তনির্হিত অপ্রসন্নতার মূল কারণ।

ট্রেনের জন্য প্লাটফর্মে অপেক্ষা করবার বেলায় অতখানি নজর করবার মতো মানসিক অবস্থা থাকে না ইদানীং। আজকাল জার্নি মানেই আগাগোড়া ধারাবাহিক টেনশন। নিজেকে নিয়ে এতখানি বিব্রত ও উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়, কী করে উঠব, কোথায় বসব, অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবার ফুরসতই মেলে না। কিন্তু এই মুহূর্তে

বৈরাগ্যর তেমন কোনো তাড়া নেই। কারণ, গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস এখনও অবধি প্লাটফর্মে লাগেইনি। আজ যে কী হয়েছে গীতাঞ্জলির! ট্রেনটা ছাড়বার কথা ছিল দুপুর একটা দশ-এ কিন্তু প্রায় আড়াইটে বাজতে চলল, এখনও অবধি ট্রেন প্লাটফর্মে লাগলই না। ফলে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে-বসে অলস সময় যাপন করছে। প্রতীক্ষা করছে তীর্থের কাকের মতো।

বৈরাগ্য যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই নাকি ছ-নম্বর কোচখানা পড়বে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আশপাশের দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছে, ওরাও ছ-নম্বর কোচের যাত্রী কি না।

সকাল থেকে বৈরাগ্যর বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথার মতো এক ধরনের অস্বস্তি। ইদানিং ট্রেনে-বাসে চড়ে দূর কোথাও রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে এমনটা হয় বৈরাগ্যর। ইদানিং জার্নিটা ঝড় ঝঞ্ঝাটের, ভয়ের, বিশেষ করে রাতের ট্রেন বা বাস জার্নিতে। অনেক কারণেই ভয়। প্রথম কারণ, ডাকাতি। আজকাল আকছার ডাকাতি হচ্ছে ট্রেনে। যাত্রী সেজে ডাকতরা বসে থাকে কামরাতেই। কিংবা মাঝরাতে কোনও স্টেশনে যাত্রী সেজে উঠে পড়ে। এছাড়া রয়েছে, ট্রেনে ট্রেনে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘুমের মধ্যেই শরীরখানা তালগোল পাকিয়ে যাবে। ট্রেনের কামরায় আগুনও লেগে যায় হরবখত। যাত্রীদের সিগারেট থেকে, চাওয়ালার স্টোভ থেকে। এক কামরায় বিপদ হলে অন্য কামরায় চলে যাওআর জন্য ভেস্টিবিউল অবশ্য রয়েছে। কিন্তু রাতের বেলায় তো ওগুলো বন্ধ থাকে। আর, দুর্ঘটনাগুলো কেন জানি বেশিরভাগই ঘটে রাতের বেলায়, যখন কিনা চোদ্দআনা যাত্রী ঘুমিয়ে কাদা। ঘুমের কাছে মানুষ বড়ো অসহায়। ঘুমের মধ্যেও।

এই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে মানুষজন। বৈরাগ্য ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। এলেবেলে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই কম। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের যাত্রী বলে কথা; চেহারায়, বেশবাসে, ফ্যাশনে, চাউনিতে একটু তো স্বতন্ত্র হবেই। বৈরাগ্য লক্ষ করে, জমায়েতে সবরকমের মানুষজনই রয়েছে। লেটেস্ট মডেলের বেশভূষার যুবক-যুবতি; ফিটফাট সাহেব-মেম, প্রজাপতির মতো বর্ণাঢ্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের ছেলেমেয়েরা। কুটকুট করে ইংরাজি বলছে নিজেদের মধ্যে। বেলবটম, জিন্‌স্, ঢোলা গেঞ্জি, শালোয়ার-কুর্তা, মিডিফ্রক, বারমুডা।...। এত রকমের যে ক্যারিব্যাগ, ব্রিফকেস, সুটকেস, লাগেজ হয়, লাল টুকটুকে, ঘন নীল, চাকা লাগানো, ফিতে পরানো, ...না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এটা রেলওয়ে স্টেশন নাকি একটা পুরো দেশের অণু-ছবি। পুরো দেশটাকে একনজরে দেখে ফেলা যায়। প্রত্যক্ষ করা যায় দেশটার অগ্রগতির স্বরূপ, তার বদলে যাওয়ার ধরনটা। বৈরাগ্যর মনে হয়, বিশ-পঁচিশ বছর আগে, এ দেশের প্ল্যাটফর্মের মানুষজন, তাদের বেশভূষা, আচার-আচরণ, ট্রেনের আকার-অবয়ব, দৌড়বার ধার, এমনকি সিটি মারবার আওয়াজের সঙ্গে এখনকার প্ল্যাটফর্ম, ট্রেন ও যাত্রীদের কী বিপুল ফারাক। কতখানি স্মার্ট হয়ে উঠেছে আজকের মানুষ! কী পরিমান মর্ডান হয়েছে। বৈরাগ্য লক্ষ করে, চারপাশের যাত্রীদের মধ্যে খুব বেশি হলে কুড়ি পার্সেন্ট মানুষ ধুতি-শার্ট পরেছেন। আশিভাগই প্যান্ট-শার্ট। প্যান্ট-

শার্টের ধরনও কত বদেলেছে। মেয়েদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শাড়ি। বাকিরা শালোয়ার-কুর্তা, বেলবটস্, জিনস্, নয়তো মিডি-ফ্রক। বৈরাগ্য দেখে, বিশ-পঁচিশ বছরের প্রায় কোনও মেয়েই শাড়ি পরেনি। বিবাহিতা হলেও নয়। ওদের সবারই চুল ঘাড় অবধি ছোটো করে ছাঁটা। দুহাতের নখ লম্বা, সুচলো, রঙিন। ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক। ভুরু কামানো। মুখে উগ্র প্রসাধন। সারা শরীর জুড়ে ভুরভুরে গন্ধ এবং প্রত্যেকেরই কথার মধ্যে অন্তত ষাট ভাগ ইংরেজি শব্দ অথবা শব্দগুচ্ছ। ইংরেজি এবং নিজের মাতৃভাষাকে মিশিয়ে ককটেল বানিয়ে এক উদ্ভট ভাষা বানিয়ে নিয়েছে প্রায় সকলেই। ওই ভাষায় অবিরাম কথা বলে চলেছে অবলীলায়। গীতাঞ্জলি যাত্রায় এরা সবাই বম্বে অথবা তার আশপাশে চলেছে। মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরাই সংখ্যায় বেশি। পরিবর্তনটা এদের মধ্যেই বেশি এসেছে বিগত দু'তিন দশকে। তলার মানুষ কম-বেশি সনাতনী ধারাটাকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করছে, যদিও ওদের ছেলেমেয়েরা ওপরতলাকে অনুসরণ করতে চাইছে সম্ভাভাবে।

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মেই ভাব জমে গেল অনেকের সঙ্গে। হাতে অফুরন্ত সময় থাকলে যা হয়। ডাঃ মণীন্দ্র চন্দ্র। প্রতিষ্ঠিত সার্জন। সঙ্গে সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী অরুন্ধতী। দাদা থাকেন বম্বেতে। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন দাদার কাছে। ফিজিক্স-এর নামী গবেষক ড্ঃ গোলকপতি পালধি, স্যুট-বুট-টাই-পাইপে পাক্কা সাহেব, সস্ত্রীক চলেছেন বিজ্ঞানের একটি সেমিনারে যোগ দিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল চলেছেন অজন্তা-ইলোরা দেখতে। সঙ্গে অসম্ভব সুন্দরী প্রায়-যুবতি মেয়ে মনীষা। রাজীব তরফদার নববধূ নিয়ে গোয়ায় চলেছেন হনিমুনে। চলেছেন স্টেট সার্ভিসের অফিসে অফিসার স্বপন ঘোষ, স্বরাজ বটব্যাল এবং প্রশান্ত বাগচি। সবাই মধ্যবিত্ত চাকুরে যুবক। টকগবে। গিয়াসুদ্দিনসাহেব, দেখলেই মালুম হয় রইস আদমি, সঙ্গে বেগমসাহেবা, মুখভরর্তি জর্দাপান, ভুরবুরে গন্ধ ছেড়েছে। ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, গারমেন্টস বিজনেসম্যান, ব্রেবোর্ন-রোতে বিশাল শো-রুম। পবনকুমার শর্মা, ভুঁড়িওয়ালা দশাসই মানুষ পরনে দামি ধুতি, সিল্কের শার্ট, দামি কোট, গলায় সোনার চেন, দুহাতে পাঁচ-ছটা বহুমূল্য পাথরখচিত আংটি। বউটির গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো। এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। এখন ফুলতে ফুলতে কোলা-ব্যাঙ। চোখের কোলে পুরু মেদ, চিবুক-ঠোঁটে মিলিমিশে একাকার। ভুরুজোড়া, ওজন বৃদ্ধির ফলে নাচতে চায় না সহজে। ভারী বিছেহার গলায়। সারা মুখে একটি মাত্র লক্ষণীয় বস্তু হলো নাকের পাটায় বসানো হীরের নাকছাবিটি। এই নভেম্বরের বিকেলেও গলগলিয়ে ঘামছেন। ছোটো ছেলে দীপকুমার শর্মা। আই-আই-টি থেকে ইলেকট্রনিক-ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করের আমেরিকা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষা নিতে। পাসপোর্ট তৈরি। বছর চব্বিশ-পঁচিশের ঝকঝকে যুবক। সারা মুখে বুদ্ধি ও মেধার ছাপ।

পৃথিবীটা যে সবদিক থেকে গোল, মাঝে মাঝে তেমন প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যায়। নইলে, প্ল্যাটফর্মের জনারণ্যে আচমকা স্কুল ও কলেজের দুজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কেন। যা হয়, প্রথমে একটুখানি 'চিনি চিনি' গোছের ভাব, পরমুহূর্তেই 'হা-ই সুপ্রভাত। হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ!' গোছের তূরীয়ানন্দতে পৌঁছে যাওয়া।

—আমাকে তোর মনে আছে, বৈরাগ্য?

—মনে নেই? তোর ডাকনাম তো বেণু। রাইট?

—আরে, কেশব যে। তুই কদ্দুর। ইস্ কী ভালো যে লাগছে।

বেণু কলেজের বন্ধু। খুবই দহরম-মহরম ছিল দুজনায়। কিন্তু বেশি বয়েসের বন্ধুত্ব তো, সিমেন্ট-বালির অনুপাত এক-পাঁচ দিলেও ঠিকঠাক জমে না। সেই অনুপাতে কেশবের সঙ্গে প্রাণের যোগটা অনেক বেশি অনুভব করে বৈরাগ্য। কারণ কেশব ওর স্কুল জীবনের বন্ধু। ফাইভ থেকে ইলেভেন। হস্টেলেও রুমমেট। তিন বন্ধুতে সময় কেটে যায় তরতরিয়ে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খোঁজখবর নেয়। তিনজনেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাইভেট ফার্মে ভালো পদে। বেণু চলেছে, বদলির অর্ডার পেয়ে, বোম্বাইতে, নতুন কর্মস্থলটা চাক্ষুষ দেখে আসতে। কেশব চলেছে কোম্পানির কাজে। প্রাইভেট কোম্পানির বড় একজিকিউটিভ সে। এই মধ্য-চল্লিশে তরে কপাল-লাগোয়, মসৃণ টাক। সারা মুখে পদমর্যাদার পুরু মাখন-প্রলেপ। কথাবার্তায় বেরিয়ে এলো আরও একজন পরিচিত মানুষ কমলাক্ষ সরকার। থাকে চক্রবেড়িয়ার যে বাড়িতে, তার পরের বাড়িতেই বৈরাগ্যরা ভাড়া ছিল বেশ কিছুদিন, কথায় কথায় পাড়ার এর-ওর প্রসঙ্গ ওঠে।

কেউ মরে গিয়েছে, কেউ বেঁচে রয়েছে, কেউ উন্নতি করেছে, কেউ তলিয়ে গিয়েছে...। কমলাক্ষর ছোটো মেয়ে কস্তুরী বৈরাগ্যের এক প্রিয়জনের বড়োমেয়ের বন্ধু। ওঁর বড়োছেলে নীলাদ্রি বৈরাগ্যর কোন এক প্রাক্তন প্রতিবেশিনীর বাবার কাছে কোচিং নেয়। ধীরে ধীরে কমলাক্ষবাবু সপরিহারে নিতান্তই পরিচিত বলে গণ্য হন বৈরাগ্যর কাছে। নীলাদ্রি বিশ-বাইশ বছরের যুবক। বি-টেক-এর ছাত্র। ওর বন্ধু তিলকেশ ল পড়ে হাজরা ল কলেজে। দুজনের মধ্যে গলায় গালায় ভাব। বৈরাগ্য দেখল।

দূর দেশে রওনা দিতে গিয়ে প্লাটফর্মেই যদি দু-দুজন সহপাঠী এবং একজন প্রাক্তন পাড়াতুতোকে সহযাত্রী হিসেবে পাওয়া যায় তবে ট্রেনখানাকে আর তেমন অপরিচয়ের রাজ্য বলে মনে হয় না। তখন মনে এক ধরনের সাহস জন্মায়। আত্মবিশ্বাসটা ফিরে আসে। মনে হয়, একেবারে তেপান্তরে পড়ে নেই আমি। পরিচিতদের মধ্যেই রয়েছি, আপনজনদের। বেষ্টনীর মধ্যেই। একা মানুষ সবতাতেই ভয় পায়। একা মানুষ প্রয়োজনের মুহূর্তে বড়োই অসহায়। মানুষের মনে সাহস ফিরে আসে, যখন সে দাঁড়ায় মানুষের পাশে। যখন তার চারপাশের দলবদ্ধ মানুষ সম্প্রীতির শেকল বানায়। যখন দুজন মানুষ দুদিক থেকে হাত রাখে কাঁধে। বৈরাগ্যর মনে স্বস্তি নেমে আসে। সকাল থেকে একটু একটু করে বাড়তে থাকা বুকের মধ্যেকার চিনচিনে ব্যথাটা কখন যেন উধাও হয়ে যায়। সে এখন একা নয়। বন্ধু, বন্ধুপ্রতিম এবং সুজন মানুষদের সাহচর্যেই থাকছে সে। বৈরাগ্যর খুব নিরাপদ মনে হয় নিজেকে।

কেবল ওই ইতস্তত ঘুরতে থাকা লোকটা। ওকে দেখতে দেখতে বৈরাগ্যর মনে যা একটুখানি অস্বস্তির অনুভূতি। কেবল ও-ই নয়, বৈরাগ্যর নজরে পড়েছে, সমগোত্রীয় আরও একজনকে। সে-ও ওই এই ধরনের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। তার সামনে ঝোলা-ঝুলি, বোঁচকা-বুঁচকি ডাঁই করে রাখা। লোকটার বয়েস

পঞ্চাশের ওপর। রোগা, ঢ্যাঙা, পাকানো-চিমসানো শরীর। শুকনো হরতকির মতো লম্বাটে মুখ। খাড়াই নাক। লম্বা সরু গলা। শরীরখানা সোজা হয়ে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। প্রথম দর্শনেই বৈরাগ্যর মনে হয়, একটা ধনেশ পাখি। লোকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করতে থাকে বৈরাগ্য। লোকটির দৃষ্টি শীতল। সামনের দিকে স্থির। বৈরাগ্যর মনে হয় ওরা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। সম্ভবত একসঙ্গেই চলেছে। একজন স্থির, শীতল, অনড়। অন্যজন অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে যাত্রীদের মধ্যে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখতে দেখতে কেন জানি এক ধরনের চাপা অস্বস্তি জাগে মনে। তবে এতগুলি পরিচিত মানুষের উষ্ণতায় সে অস্বস্তি স্থায়ী হয় না।

দুই

এমন একদল সুজন সহযাত্রীর সঙ্গে ট্রেনজার্নির একটা সুবিধাজনক দিক হলো, সবাই খুব মার্জিত, সুশৃঙ্খল। ট্রেনের কামরায় উঠতে গিয়ে তাই ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি হলো না বললেই চলে। স্যুটকেস-ব্যাগ ইত্যাদি রাখা নিয়ে কোনো তিক্ত কাজিয়াও নয়। ওঠা, বসা, মালপত্তর রাখা সবকিছুতেই সফেস্টিকেশন। মসৃণতা। বৈরাগ্য বিবেচনা করে যে এবারের ট্রেনজার্নিতে সে ট্রেনের এমন একখানি কামরা পেয়ে গেছে যেখানে অধিকাংশই শিক্ষিত-মার্জিত, ভদ্র-সজ্জন ব্যক্তি। ধনেশ পাখি এবং তার সাকরেদ ছাড়াও দু'চারজন দেহাতি গোছের লোক অবশ্য উঠেছে। গোটা দুই কুৎসিতদর্শন মস্তান চেহারার যুবক। একটা খুনখুনে বুড়ো। জনাকয় পাতি-গেরস্ত গোছের মানুষ। কিন্তু পুরো কামরার অনুপাতে ওদের সংখ্যা বেশ কম। সাধারণত এমনটা দেখা যায় না যে একটা কামরার বারোআনা শিক্ষিত-মার্জিত, জ্ঞানী-গুণী, ভদ্রমানুষ। বরং আজকাল ট্রেনে-বাসে উঠলেই বৈরাগ্য সুজনমানুষের নিদারুণ অভাব বোধ করে। মনে হয়, দুনিয়ার যত রূঢ়ভাষী, অভদ্র, স্বার্থপর, উচ্ছৃঙ্খল এবং সুযোগ-সন্ধানী ধান্দাবাজ মানুষগুলি বুঝি একসঙ্গে শলাপরামর্শ করে উঠে পড়েছে ট্রেনের কামরায়। ট্রেনে ওটা থেকে নামা অবধি পুরোটা সময় শুধুই নিজের কোলে ঝোল টানবার দৃষ্টিকটু প্রতিযোগিতা। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবে না। সামান্য ব্যাপারে রেগেমেগে কাঁই। চিল্লিয়ে মাত করে দেবে পুরো কামরা। মানুষ যে সারভাইভাল অব্ দা ফিটেস্ট থিয়োরিতে বেড়ে উঠেছে, আজকাল ট্রেনে-বাসে উঠলেই তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়। আর মানুষ যে কত অপরিচ্ছন্ন জীব, সেটাও মালুম হয় হাড়ে হাড়ে, যখন সিগারেটের প্যাকেট, টুকরো, কমলালেবুর খোসা, খাবারের প্যাকেট ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই পুরো কামরাখানাকে নরক বানিয়ে ফেলে। ট্রেনে দূরপাল্লার জার্নি আজকাল তাই বিরক্তিকর, বিপজ্জনক, আতঙ্ককর হয়ে উঠেছে বৈরাগ্যর কাছে। আজই হঠাৎ কোনো এক অলৌকিক জাদুতে একটি কামরার বারোআনা মানুষই ভদ্র-সুজন, জ্ঞানী-গুণী, বন্ধুপ্রতিম এবং সহৃদয় সামাজিক হয়ে উঠেছে। ভাগ্যে বিশ্বাস করে না বৈরাগ্য, নইলে নির্ঘাত বলত, আজ ওর কপালখানা ভালো।

ইতিমধ্যেই কামরার মধ্যে নিজেদের গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়েছে সবাই। এবং কী আশ্চর্য, সিটনম্বর একটু-আধটু এলোমেলো অসুবিধেজনক যা ছিল, নিজেদের মধ্যে

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিকঠাক করে নিয়েছে। কমলাক্ষ সরকারের কিশোরী মেয়ে রিয়াকে জানলার পাশের সিটখানা ছেড়ে দিয়েছেন স্বপন ঘোষ। নিজেরা প্যাসেজের দিকে সরে গিয়ে রাজীব তরফদারকে তাঁর নববধূর কাছটিতে বসবার সুযোগ করে দিল কমলাক্ষবাবুর ছেলে নীলাদ্রি। রাতের বেলায় কোন্ বার্থে কে শোবে, বয়স ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সে ব্যাপারেও একটা সুবিধাজনক বিলিব্যবস্থা করা গেছে, টিকিটের গায়ে চাপানো বার্থনম্বরগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। এমনকী সন্ধের আগে আগে গিয়াসুদ্দিনসাহেবকে নমাজ পড়বার সুযোগ করে দিতে অন্যরা খোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্যাসেজে ঘোরাঘুরি করেছেন। বহুদিন বাদে একটা পারিবারিকস্বাদ পাচ্ছে বৈরাগ্য, যা ট্রেনের কামরায় ইদানীং আর স্বপ্নেও আশা করা যায় না। ক্রমশ বৈরাগ্যর বিশ্বাসটা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল, বহুদিন বাদে একটা মনোরম ট্রেনজার্নি হবে।

ছ-টি বার্থ নিয়ে এক-একটি খোপ। কমলাক্ষরা ছজন। পাঁচজন রয়েছেন একটি খোপে। ষষ্ঠ ব্যক্তি বৈরাগ্য। অন্যদিকে নীলাদ্রির বন্ধু তিলকেশ পড়ে গিয়েছে পাশের খোপে। বন্ধুবিচ্ছেদে মনমরা। বৈরাগ্য হাসিমুখে তিলককে ছেড়ে দিয়েছে নিজের সিটখানা। নিজে চলে গিয়েছে পাশের খোপে। ওদিকে অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল ও তাঁর মেয়েকে পাশের খোপের জানলার ধারে সিট ছেড়ে দিয়ে কেশব আর বেণু চলে এসেছে বৈরাগ্যর কাছে। বৈরাগ্যদের খোপে বৈরাগ্যরা তিনজন ছাড়াও রয়েছেন সস্ত্রীক ডঃ পালধি এবং প্রশান্ত বাগচি। ধনেশ পাখি সাকরেদসহ ঠাঁই নিয়েছে প্যাসেজের উল্টোদিকের লম্বালম্বি দুবার্থ-ওয়ালা সিট দুটোতে। ওপরের বার্থখানাতে মালপত্তর রেখেছে। নিচের সিটদুটোকে জোড়া দিয়ে বার্থ বানিয়ে মুখোমুখি বসেছে দুজন। বারোআনা দখল করেছে ধনেশ পাখি, চারআনা পেয়েছে সাকরেদ। নিজেদের জায়গায় বসা ইস্তক বিড়বিড় করে কীসব বকে চলেছে সাকরেদ। ধনেশ পাখি, সিলিং ফ্যানখানার ওপর দৃষ্টিখানি স্থির রেখে, ব্যাক-সিটে শরীরখানা ঠেসিয়ে বসে রয়েছে ভাবলেশহীন।

ট্রেন ছাড়বার পর শুরু হয়ে যায় যে যার মতো করে সময় কাটানোর খেলা। গল্পগুজব, আড্ডা-গসিপ...। 'ক'টায় ছাড়বার কথা ক-টায় ছাড়ল' দিয়ে শুরু করে তা থেকে ক্রমশ রেল দপ্তরের অপদার্থতা, দুর্নীতি তা থেকে বোফর্স, হাওলা, হর্ষদ মেহতা, সুরেশ জৈন, নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি, বি বে পি-র উত্থান, ভারতের হিন্দুত্ব, তা থেকে মৌলবাদ, কুসংস্কার... কোথা থেকে যে কোথায় চলে যাচ্ছে আলোচনা। কোনও খোপের আলোচনা হয়ত বা ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে খাদ্যসমস্যা, অবাধ অর্থনীতি ; পারমাণবিক বোমা, মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের সাফল্য ইত্যাদি আধুনিক বিষয়ে। ডাঃ পালধি বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করছিলেন পদার্থবিদ্যার উন্নতির খতিয়ান। বিজ্ঞান, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যে আগামী দিনে পৃথিবীতে কী অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়ে দিতে পারে, তার একটা তালিকা পেশ করছিলেন। এবং তাঁর বক্তব্য মতে, এ-বিষয়ে ভারতও প্রথম সারিতেই থাকবে। কারণ, অত্যন্ত গোপনে ভারত বিজ্ঞানের কয়েকটি অত্যাধুনিক

শাখায় ভেতরে ভেতরে নাকি এতখানি উন্নতি করেছে, যা পশ্চিমের দেশগুলো কল্পনাও করতে পারে না। আলোচনা চলছে, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে উগ্রপন্থা নিয়ে, নেতাদের ভণ্ডামি নিয়ে। মূলত বড়োরাই মেতে গিয়েছে এমনতর আলোচনায়। এরই মধ্যে ছেলেমেয়েরা কলকল করছে নিজেদের মধ্যে। বেশ জড়ানো জড়ানো আদুরে ইংরেজি। এলভিস প্রিসলে, মাইকেল জ্যাকসন, বেন জনসনরা আনাগোনা করছেন ঘনঘন। আলোচনায় এসে যাচ্ছে এদেশি লিয়েন্ডার পেজ এবং অক্‌শয়রা। গুনগুন করে গান করছে কেউ ওপরের বার্থে শুয়ে শুয়ে। কমলাক্ষর স্মার্ট মেয়ে রিয়া কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনছে মগ্ন হয়ে। গানের তালে তাল পা দিয়ে মৃদু তাল ঠুকছে মেঝের ওপর। পাশের খোপ থেকে নীলাদ্রি মাঝে মাঝেই বৈরাগ্যর উদ্দেশ্যে বলে উঠছে, আংকল, কিছু দরকার হলে বলবেন। জনে জনে পেঁড়া বিলোচ্ছেন পবনকুমার শর্মা, দক্ষিণেশ্বরের কালী মাঈয়ের প্রসাদ। পুত্র দীপকুমারের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা উপলক্ষে পুজো দিয়েছিলেন মা-কে। এ তো ভারী সুখের কথা, আনন্দেরকথা, এমন ছেলের বাপ হিসেবে আপনার গর্বিত হওয়া উচিত—বলতে বলতে জনে-জনে হাত পেতে নেয় মায়ের প্রসাদ। বলে, সব্বাইকে বিলোতে গেলে ফুরিয়ে যাবে যে। বাড়ি অবধি পৌঁছুবে না। পবনকুমার কর্ণপাত করেন না এমন কথায়। প্রসাদ কখনও শেষ হয় না।

বৈরাগ্য খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলে, আমি কিন্তু ঠাকুর দেবতা মানি নে। প্রসাদ-টসাদও খাই নে তাই। তবে, একটা শুভ উপলক্ষে মিষ্টি বিতরণ করছেন আপনি, রিফিউজও করতে পারছি না তাই। বলতে বলতে সসঙ্কোচে হাত পাতে বৈরাগ্য, আপনি প্রসাদ হিসেবে দিলেন, আমি মিষ্টি ভেবে খেলাম।

সে আপনি যো ভেবেই খান, কাম যা হবার হবেই। ইলেকট্রিকের তার, তার ভেবে ছুঁলেও শক মারবে, রসগুল্লা ভেবে ছুঁলেও শক মারবে। পবনকুমারজি অমায়িক হাসেন।

কমলাক্ষবাবুর ছোটোমেয়ে কস্তুরীর পেছনে লেগেছে নীলাদ্রি, আর তিলকেশ। কী একটা ব্যাপার নিয়ে অনবরত খ্যাপাচ্ছে ওকে। কস্তুরী ভয়ানক রেগে যাচ্ছে। বৈরাগ্যকে কথাটা বলতে যেতেই আরও খেপে যায় কস্তুরী। নীলাদ্রি বলে জান বৈরাগ্য আংকল, কস্তুরীর খুব ভূতের ভয়। ট্রেনের কামরায়ও ভূত থাকতে পারে, এমন ভয় পাচ্ছে ও। কস্তুরী এতখানি রেগে যায় যে উঠে এসে তার পিঠে দুমদুম কিল বসিয়ে দেয়।

মস্তান গোছের ছোকরা দুটো বসেছে দু-তিনটে খোপ পরে। মাঝে মাঝে পর্যায়ক্রমে প্যাসেজ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। চোরা চাউনি হানছে সুন্দরী মেয়েগুলোর শরীরে। বৈরাগ্য লক্ষ করে, ছোকরা দুটোর বয়েস তিরিশের মধ্যে। একটার গায়ের রং ঘোর কালো। মুখে পুরনো বসন্তের গভীর দাগ। অন্যটার রং কটা। চোখের মণি, মাথার চুল, ভুরু, এমনটি গায়ের রোম অবধি লালচে। কালোটা লম্বায় একটু খাটো। কটাটার চোখ দুটো সামান্য ট্যারা। বেশ পেটাই শরীর দুজনেরই। কালোটার চাকতিসহ রুপোলি চেন। কটাটারহাতে স্টিলের বালা। কালোটার চোখের মণিতে

হিংস্রতা, গোঁয়ার্তুমি। কটাটার চোখে শেয়ালের ধূর্ততা। নিজেদের সিটে থিতু হয়ে বসছিল না ছোকরাদুটো। খালি একা-একা কিংবা জোড়ায় কামরাময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিংয়ের পর রিং বানিয়ে চলেছে। কখনও বাথরুমে ঢুকছে। কখনও বাথরুম সংলগ্ন বেসিনের ওপর বসানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াচ্ছে। আঁচড়িয়েই চলেছে। বৈরাগ্যের সন্দেহ হয়, চুল আঁচড়ানোটা বাহানা, সম্ভব আয়নার ভেতর দিকে কোনও সুন্দরী মেয়ের প্রতিবিম্বখানা দেখছে। বৈরাগ্যর এমনটা মনে হওয়ার কারণ আছে। একটু আগে চুল আঁচড়াতে দেখল কটাকে। কটা ফিরে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেলো এসে একই ভঙ্গিমায় চুল আঁচড়াতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। ছোকরাদুটোর শরীরে অনিয়ম আর উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ সুস্পষ্ট। খালি উশখুশ করছে তখন থেকে। এক ধরনের অস্থিরতা ছোকরাদুটোকে নিজেদের সিটে কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে দিচ্ছে না। প্লাটফর্মেই দেখেছিল, ট্রেনে ওঠার পরও দেখছে, খুব বেশি মালপত্তর নেই ছোকরাদুটোর। একটা করেসাইড ব্যাগ, তাও মাঝারি আকারের, সস্তা রেক্সিন দিয়ে তৈরি।

এইমাত্র বৈরাগ্যর সামনে দিয়ে মৃদু শিস দিতে দিতে চলে গেল কটা। যেতে যেতে ঝলকে ঝলকে চোরা চাউনি ছুঁড়তে লাগল খোপগুলোর মধ্যে। বৈরাগ্য জানে, এরাই একটু পরে শের বনে যায় প্রতিটি কামরায়। মদ খায়, হুল্লোড় করে, চিৎকার করে গানগায়, মেয়েদের প্রতি অশালীন আচরণ করে। কামরার অন্য যাত্রীদের সুবিধে-অসুবিধের তিলমাত্র তোয়াক্কা না করে এরা যা খুশি তাই করে। সাধারণ যাত্রীরা, যাঁরা কনিষ্ঠজনকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার পরামর্শ দিলেও নিজেরা 'পথিমধ্যে উটকো ঝামেলা' পছন্দ করেন না, সহনশীলতার বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করেন।

কটা এগিয়ে চলেছে বাথরুমের দিকে। উল্টোদিকে দরজার দাঁড়িয়ে খুব হেঁড়ে গলায় ওকে কী একটা নির্দেশ দিল কেলো। বৈরাগ্য বুঝতে পারে না কথাগুলো। তবে ও নিশ্চিত, আজকে ট্রেনের কামরার পরিবেশটাই এমন, এরা খুব সুবিধে করতে পারবে না। ঝকঝকে জায়গায় যেমন মাছি বসতে পারে না, পিছলে যায়, এদের অবস্থাও তেমনই।

ট্রেন ছাড়বার পর থেকেই ধনেশ পাখি আসনপিঁড়ি বসে শিরদাঁড়া টানটান করে চোখ বুজে ছিল। এখনও অবধি তার ওই মুদ্রা অব্যাহত রয়েছে। সাকরেদটা বসে বসে এলোমেলো তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। কামরার প্রায় সবাই প্রথম থেকেই খুব তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছিল ওদের। কারও কারও চোখে ছিল চাপা সন্দেহ। এরা হল মিচকে শয়তান, এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে যকে বলে কাবাব মে হাড্ডি। পোশাক-আশাকে মেলে না, আচার-আচরণে মেলে না, কেমন একটা চোর-চোর লম্পট-লম্পট ভাব।

ডাঃ পালধি একসময় চাপা গলায় বলেন, হাইলি সাসপিসিয়াস। দেখলেই মনে হয় খারাপ মতলবে রয়েছে।

মিসেস পালধি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, এরাই তো দূরপাল্লার ট্রেনে নানান ধরনের কাণ্ড ঘটায়। যাত্রী সেজে উঠল, তারপর কামরার সবাই যখন ঘুমল, অমনি

শুরু হল আসল খেল। ট্রেনে-বাসে তো আজকাল এমনি করেই চুরি-ডাকাতিগুলো হয়।

কেশব বলে, হয়ত এরা দুজন নয়। হয়ত এই কামরাতেই ওদের আরও সাকরেদ বয়ে রয়েছে যাত্রী সেজে। যথা সময়ে নিজমূর্তি ধরবে।

বেণু বলে, আমার কিন্তু ওই গুন্ডা গোছের লোকদুটোকেও খুবই সন্দেহ হচ্ছে।

নীলাদ্রি এককাঁকে এসে বৈরাগ্যের কানে কানে বলে যায়, আংকল, বাবা বলল, সাইড-বার্থের দুজনকে সুবিধের ঠেকছে না। মালপত্তর সাবধান।

তিন

খড়্গপুরে সামান্য সময় দাঁড়িয়েছিল গাড়ি। তারপর জোর স্পিড নিয়েছে।

একমনে পাজ্‌ল খেলছে কস্তুরী। পাশের খোপে মনীষা সান্যাল একখানা সিনেমা-ম্যাগাজিনের মধ্যে ডুবে রয়েছে। পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে রগরগে ছবিগুলো দেখে নিচ্ছেন ডাঃ মণীন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী অরুন্ধতী। কানে অডিয়ো-ফোন নিয়ে এখনও বুঁদ হয়ে রয়েছে রিয়া।

মেঝেতে পা ঠুকেঠুকে তাল দেওয়া দেখে মালুম হলো পপ্‌ টপ গোছের কিছু বাজছে। রিয়ার সারাশরীর তালে তালে দুলছে। মনে হয়, পারলে ও উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। নাচছে না, কিন্তু চোখের তারায় ঝিলিক মারছে গানের সুর, পাতলা ঠোঁটে জমছে তার যাবতীয় মদালস আবেদন। গাঢ় নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে রিয়া। সারা মুখে উগ্র তৃপ্তির ছাপ।

গুনগুন করে গল্প জুড়েছে বৈরাগ্যরা তিনজন। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা বলছে।

নিজের কথা বলতে গিয়ে বেণুর গলায় হতাশা। বলে, কী আর হলো বল, জীবনে? পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলাম, কিন্তু দেখ্‌, কোথাও তেমন সাইন করতে পারলাম না। আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

আধুনিক শিক্ষিত ছেলে, কথায় কথায় ভাগ্যের দোহাই দিলে আগে খুব রাগ হয়ে যেত বৈরাগ্যর। এখন আর ততখানি খেপে ওঠে না। বরং হালকা শ্লেষের মাধ্যমে খোঁচা মারবার চেষ্টা করে।

বেণুর কথায় গলায় কপট গাম্ভীর্য এনে বলে, ভাগ্য-টাগ্য বাজে কথা আসল কথা হলো, লাক।

ইয়ার্কি নয়। বেণুর গলায় আরও হতাশা, লাকটা একটুখানি ফেভার করলে আমি আজ কোথায় উঠে যেতাম।

তো বসে রয়েছিস কেন? কেশবের চোখের কোণে ঝিলিক মারে হাস, হাত-টাত দেখা, কোনও জ্যোতিষার্ণবের কাছে গিয়ে পাথর-টাথর পর।

তুই এক কাজ কর। কেশবের মুখের কথা কেড়ে নেয় বৈরাগ্য, তুই বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢাল। বাঁকে করে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে যাবি কিন্তু। শুনেছি, চৌষট্টি রোগ ভালো হয়। এছাড়া, মামলায় জয়, কন্যার বিবাহ, চাকুরিলাভ, পদোন্নতি, শত্রুবিনাশ, প্রেমে সাফল্য—খুব ওয়াইড রেঞ্জে কাজ করে বাবার আশীর্বাদ।

তেরচা চোখে তাকায় বেণু। বলে, ধর্মকে নিয়ে টিটকিরি করার অভ্যেসটা তোর যায়নি দেখছি। এখনও সেই নাস্তিক রয়ে গেলি। কেশব আর বৈরাগ্য পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে। মুখ টিপে হাসে।

কেশব বলে, তোর মনে আছে বৈরাগ্য ? সেই স্কুল হস্টেলে, মুরারি না কী যেন ছেলেটার নাম, ওই যে মৃগী সারাতে সারাক্ষণ মাদুলি পরে থাকত গলায় ?

মনে নেই আবার! বৈরাগ্য হাসে। বেণুকে শোনায় ঘটনাটা।

স্কুল হস্টেলে ওদের সঙ্গে মুরারি বলে একটা ছেলে থাকত। ছেলেটার মৃগী ছিল। হোমিয়োপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি অনেক কিছু করেছে। শেষে কোনো সাধু যেন ওকে একটা মাদুলি দিল। কালো সুতায় বেঁধে পরে থাকতে হবে গলায় মাদুলিটা পরবার পর থেকে মুরারির মৃগীর টানটা আর হচ্ছিল না। আগে হস্টেলের পুকুরে চান করতে নামত না, ধীরে ধীরে সাহসখানা ফিরে আসতেই নামতে লাগল জলে। কিন্তু সাঁতার কাটতে গিয়ে,ডুব দিতে গিয়ে পাছে মাদুলিটা খুলে পড়ে গলা থেকে সেই ভয়ে ওটা বৈরাগ্যদের কারও কাছে জমা রেখে যেত। বৈরাগ্যরা ওটা পকেটে পুরে রাখত। ওই অবস্থায় আমগাছে-জামগাছে চড়ে ফল-পাকুড় পাড়ত, নিজের মধ্যে কুস্তি-মারামারি চালাত। একদিন কোন ফাঁকে মাদুলিটা পড়ে গেল বৈরাগ্যর পকেট থেকে। যখন খেয়াল হলো সেটা, মুরারি তখন মাঝ-পুকুরে মনের আনন্দে হুটোপুটি করছে বন্ধুদের সঙ্গে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে বৈরাগ্যর। কেশবকে চুপিচুপি ব্যাপরটা বলে। দুজনে মিলে খানিকক্ষণ আঁতিপাতি খোঁজে। কিন্তু ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোথায় পাবে ওইটুকু মাদুলি। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল বৈরাগ্য। মাথাটা ঠিকঠাক কাজ করছিল না ওর। অবশেষে মুশকিল আসান করল কেশবই। এক দৌড়ে জ্ঞানবাবুর বিশ্বকমা ভাণ্ডার থেকে একেবারে একইরকম দেখতে একখানা মাদুলি কালো সুতোয বেঁধে নিয়ে ফিলে এল পুকুরঘাটে। কাদামাটিতে ঘসে ঘসে ময়লা‍‍ম‍তো করে নিল, তারপর এগিয়ে দিল বৈরাগ্যর দিকে।

তারপর ? বিস্ফারিত চোখে তাকায বেণু।

তারপর আর কি ? মুরারিকে যথাসময়ে ফেরত দিয়ে দিলাম মাদুলি। ও গলায় পরে দিব্যি ঘুরতে লাগল।

মৃগীর টান আবার শুরু হলো না ?

পাগল! ওটার জন্যই বন্ধ ছিল নাকি ? ওগুলো সব বুজরুকি।

বুজরুকি তো বটেই। কত লোক ওই সব নিয়ে করে খাচ্ছে। স্বীকার করে বেণু। তবে মনে হয় এগুলোর একটা সাইকো-এফেক্ট রয়েছে। মনেই তো অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি। মনটাকে কোনও গতিকে স্ট্রং করে দিতে পারলে রোগীর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। সে তখন অটো-সাজেশন নিতে শুরু করে। পজিটিভ অটো-সাজেশন। রোগটা অনেক সময় তাতেই সেরে যায়।

বৈরাগ্য ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল বেণুর দিকে। দুচোখ বড়োবড়ো করে শুধোয়, অটো-সাজেশনটা কী বস্তু, ব্রাদার ?

—অটো-সাজেশন জানিস নে ? বেণু যেন অবাক হয়, নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া,

ধমক দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া, সাহস দেওয়া, ভয় দেখানো...। আমি আর কিছুতেই বাঁচব না। আমি নির্ঘাত মরে যাব। এমন রোগে কেউ বাঁচে না। নেগেটিভ অটো-সাজেশন নার্ভকে দুর্বল করে দেয়। আবার, আমার কিস্যু হবে না। এই তো বেশ ভালোই আছি। আমি সুস্থ হয়ে উঠবই। পজেটিভ অটো-সাজেশন। নার্ভকে সবল করে তোলে। ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ ঠিকমতো দিতে পারলে মানুষের মনে এই পজিটিভ অটো-সাজেশন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়।

বৈরাগ্য বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে থাকে। একসময় বলে, তুই তো, যদ্দুর মনে পলে, কলেজ-লাইফে অন্যরকম ছিলি। ঠাকুর দেবতা, ঝাড়-ফুঁক, কবচ-মাদুলি বড়ো একটা মানতিসনে।

—একনও যে মানি, তা নয়।

—মনে আছে? হস্টেলের সরস্বতী পুজোর প্রতিমার পেছন থেকে দৈববাণী শুনিয়েছিলাম সেকেন্ড ইয়ারের জয়দীপকে।

—ঠাকুর-দেবতা আমি এখনও মানিনে। বেণুর গলায় আপসের সুর, তবে ইদানীং মনে হয়, একটা পাওয়ার গোছের কিছু আছে। মানুষের জীবনকে সব দিক থেকে কন্ট্রোল করছে সেই পাওয়ার। আর লাক-টাক বলে যতটা ঠাট্টা করি, ব্যাপারটাকে এই বয়েসে এসে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। চারপাশের কতজন কতকিছু কত সহজে পেয়ে যাচ্ছে। অথচ আমার বেলায়...। চেষ্টা তো কিছু কম করিনি আমিও...। বলতে বলতে কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে যায় বেণু। একটু একটু করে নিজের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

ওদিকে, পাশের খোপে একই বিষয় নিয়ে তুমুল তর্কে মেতেছে নীলাদ্রি আর তিলকেশ। নিজেদের আলোচনা থেমে যেতেই বৈরাগ্যদের কানে আসে ওদের বিতর্ক।

তিলকেশ বুঝি বলেছিল, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সংঘাত নেই। বরং একে অন্যের পরিপূরক। শুনে নীলাদ্রি খেপে লাল। বলে, কোন্ ধর্মের বইতে কী লেখা রয়েছে জানিনে, কিন্তু এখন ধর্মচর্চা মানেই বান্ডিল অব কন্ট্রাডিকশন্স্ সুপারস্টিশন্স্ এবং ধোঁকাবাজি অব সাম ধান্দাবাজ আদমি ওভার মিলিয়নস অব বুরবক কমন পিপল। অ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট অব পলিটিক্যাল অ্যামবিশনস অব আ ফিউ স্কাউন্ড্রালস উইথ দ্য হেলপ অব সাম ব্ল্যাক বিজনেসম্যান, ভণ্ড বাবাজী। কেউ হাত ঘুরিয়ে রসগোল্লা বের করছে। কেউ গণেশ ঠাকুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে। কেউ যাগযজ্ঞ করে, এ তীর্থে ও তীর্থে মাথা মুড়িয়ে, নিজের গদি শক্তপোক্ত করছে। কেউ নিজের ছেলেমেয়েকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এদেশে হিন্দুত্ব ফলাচ্ছে, হিন্দু-সংস্কৃতি মারাচ্ছে। এরা সব ধোঁকাবাজ, পাওয়ার-হান্টারস। এরা সবাই ওয়ান অ্যান্ড অল।

বলতে বলতে নীলাদ্রি বেশ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছিল। তিলকেশ সে তুলনায় বেশ নরম, স্মিত। মৃদু হেসে বলে, কিন্তু ধর্মের সবটাই তো আর খারাপ নয়।

—সবটাই খারাপ। নীলাদ্রি নিজের উরুতে চাপড় মারে, অ্যা কমপ্লিট নুইসেন্স।

—তাও কি হয়? কোন কিছুরই সবাটাই খারাপ হতে পারে না। তেমন ভাবনাই অবৈজ্ঞানিক। দেখ, সাপের বিষ, তারও একটা উপকারী ভূমিকা আছে। কত ওষুধ

তৈরি হয়।

—ধর্মের কোনটা তোর মতে বেনেভোলেন্ট?

—ধর্মের যে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা এবং নীতি প্রণয়নের ভূমিকা, দুটোই প্রাচীন যুগে খুব প্রজিটিভ রোল প্লে করেছে। দেখ, তখন তো এত পুলিস-মিলিটারি ছিল না, দুহাত অন্তর থানা ফাঁড়ি ছিল না, আর-টি সেট, কাঁদানে-গ্যাস, লাঠি-গুলি, জলকামান কিছুই ছিল না। এমন জবরদস্ত ছাপানো সংবিধান, আই-পি-সি, সি-আর-পি-সি, জজ-ম্যাজিসট্রেট, আদালত-জেলখানা, এমন পরিণত ব্যুরোক্রেসি—এসব কিছুই ছিল না। তখন মানুষের পাশবিক সত্তাগুলি আরও ক্রিয়াশীল ছিল। সেই সব দিনে বলগাহীন মানুষের অপরাধপ্রবণতা কমাতে, নীতিবোধ বাড়াতে ধর্মই বিভিন্ন গল্পগাথা ফেঁদে, ঠাকুর-দেবতার আমদানি করে, পাপ-পুণ্যের ফারাক করে, স্বর্গের স্বপ্ন, নরকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সংযত রেখেছে। মানুষের মধ্যে নীতিবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কালক্রমে অবশ্য এই ফিল্ড-এ ধান্দাবাজরা ঢুকেছে। তারা মানুষের অখণ্ড বিশ্বাসের ফায়দা লুটেছে।

—কার লেখা, তিলকেশ? এ খোপ থেকে বৈরাগ্য বলে ওঠে।

—কি? তিলকেশ সহসা কথার খেই ধরতে পারে না।

—কার লেখা বই থেকে বললে এতক্ষণ? বৈরাগ্যর কথায় মৃদু খোঁচা, ল কোর্সে কি ধর্মও পড়ানো হয় নাকি আজকাল?

—হিন্দু ল, মুসলিম ল, রিলিজয়াস কোডস—এসব তো পড়ানো হয়ই, কিন্তু সেজন্য নয় আংকল, আমি বলছি আমার কনভিকশন থেকে।

একটা সায়েনস ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলেন ডাঃ পালধি, তিলকেশের কথাগুলোও কানে আসছিল বুঝি। বললেন, খুব লজিক্যালি বলল্ তো ছেলেটা।

—হবু উকিল যে! পাশের খোপ থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে নীলাদ্রি, গুছিয়ে বলাটা রপ্ত করছে আজ থেকে। বক্তৃতায় দিনকে রাত করতে না পারলে একহাজার-এক টাকা ফি চাইবে কী করে?

—ডাঃ পালধি এ-ব্যাপারে কী বলেন? বৈরাগ্য শুধোয়।

ডাঃ পালধি বুঝি সামান্য সময়ের জন্য ডুবে গিয়েছিলেন, সায়েনস-ম্যাগাজিনের পাতায়। চমকে তাকান বৈরাগ্যর কথায়, বলেন কী ব্যাপারে, বলুন তো?

—ওই যে, ঠাকুর-দেবতা, ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার...।

—এই যে ভাগ্য-টাগ্য, নিয়তি-অদৃষ্ট, জন্মান্তরবাদ...। কেশব পাদপূরণ করে।

বৈরাগ্য বলে, আপনি তো বিজ্ঞানের খ্যাতিমান গবেষক। এ ব্যাপারে কী বলে আপনাদের বিজ্ঞান?

—বিজ্ঞান এব্যাপারে কিছুই বলে না। ডাঃ পালধি অমায়িক হাসেন— ফিজিক্স-এ ধর্মের কিংবা ভগবানের ওপর কোনো চ্যাপ্টার নেই।

রসিকতাটা উপভোগ করে বৈরাগ্য। বলে, আপনি ব্যক্তিগতভাবে কী ভাবেন?

ডাঃ পালধি গম্ভীর হয়ে যান। সায়েন্স-ম্যাগাজিনখানা বন্ধ করে সরিয়ে রাখেন পাশে। বলেন, দেখুন, সো লং আই অ্যাম আ প্রফেসর অব ফিজিক্স, বলতে পারি, বিজ্ঞানের আঙিনায় ভগবান, ঈশ্বর, এদের কোনও অস্তিত্বও নেই। আসলে, মানুষ এই

ভাস্ট্ নেচারকে দেখে ভয় পেয়েছে। ভয় থেকে ভক্তি। আর, তার থেকে পুজো, আরাধনা...। এই ভাস্ট্ নেচারকেই মানুষ ভেঙে ভেঙে, টুকরো টুকরো করে ঠাকুর-দেবতা বানিয়েছে। তবে, কুসংস্কারের কথা যা বললেন, ওগুলো স্রেফ ইগ্নোরেন্স থেকে। প্রপার এডুকেশন পেলে আস্তে আস্তে কেটে যাবে।

চার

বাইরে সাঁ সাঁ করছে রাত। ট্রেনখানা উদ্দাম বেগে ছুটছে। কামরার সবাইয়ের রাতের খাওয়া প্রায় সারা। সবাই যে যার মতো খাবার বন্দোবস্ত করছে। কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে ওপরের বার্থে। বাকিরা বালিশ-টালিশ ফোলাচ্ছে। বৈরাগ্য লক্ষ করে, কেবল ধনেশ পাখি আর ওর সাকরেদই কিছু খেল না।

এতক্ষণ লোকটা একটা কথাও বলেনি। কারও দিকে তেমন করে তাকায়নি। কেবল ওর সাকরেদটা মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছে। কিন্তু তার কোনও কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারেনি বৈরাগ্য। কেলো আর কটা বারকয় হাঁটহাঁটি করে ঝিমিয়ে পড়েছে। নিজেদের সিটে চুপটাপ বসে রয়েছে দুজনায়। সম্ভবত ওরা বুঝতে পেরেছে, এ কামরায় বেশি খাপ খোলা যাবে না। প্রশান্ত বাগচি ওঠে ওপরের বাঙ্কে। বেণুও।

মিসেস পালধি নিচের বার্থে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন। সায়েন্স ম্যাগাজিনটায় এতক্ষণ মুখ ডুবিয়ে বসেছিলেন ডাঃ পালধি। একমনে পাইপ টানছিলেন। একসময় পাইপ সরিয়ে লম্বা করে হাই তুললেন। বললেন, রাত হলো। এবার ঘুমিয়ে পড়লে হয়।

ঠিক এমনই সময় ওর দিকে সরাসরি তাকায় ধনেশ পাখি। বলে, বেটা, এক থেকে দশের মধ্যে এটা সংখ্যা বল তো।

ডঃ পালধি এমন আচমকা প্রশ্নে হকচকিয়ে যান। সামান্য বিরক্তি মেশানো গলায় বলেন, কেন?

—আহ্, বল না। —সাত। — বেশ। এবার একটা ফুলের নাম বল্ দেখি। —গোলাপ।

এক চিলতে রহস্যময় হাসি চকিতের জন্য খেলে যায় ধনেশ পাখির ঠোঁটের কোণায়। ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আন একখানা চিরকুট। এগিয়ে দেয় ডাঃ পালধির দিকে। কেশব বৈরাগ্যর হাত হয়ে ওটা পৌঁছোয় ডাঃ পালধির হাতে। ডাঃ পালধি আধা-তাচ্ছিল্যে, আধা-কৌতূহলে খোলেন চিরকুটখানা। ভ্রূ কুঁচকে পড়েন। ধীরে ধীরে ভুরুর ভাঁজ থেকে যাবতীয় বিরক্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। তার বদলে একটু একটু করে জমতে থাকে বিস্ময়। যখন চিরকুট থেকে মুখ তোলেন, ধনেশ পাখির দিকে তাকান, তখন তাঁর চোখের তারায় এক ধরনের আপ্লুতভাব। সারা মুখের পেশিতে তার কমনীয়তা। টানটান শুয়েছিলেন মিসেস পালধি। স্বামীর চোখ-মুখের ভাবা পড়তে পড়তে সামান্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পালধি চিরকুটখানা এগিয়ে দেন স্ত্রী দিকে। তাঁর দুচোখ তখন সীমাহীন বিস্ময়। মিসেস পালধি চিরকুটটাতে একঝলক চোখ বোলাতে না বোলাতেই তাঁর চোখ দুটিও ডিমে তা দিতে থাকে মুরগীর

মতো তদ্‌গত হয়ে আসে। স্বামীর দিকে সবিস্ময় দৃষ্টি বিনিময় করেন তিনি। উঠে বসেন। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন ধনেশ পাখির দিকে।

ডাঃ পালধি খুব কাঁপা কাঁপা হাতে চিরকুটখানা এগিয়ে দেন বৈরাগ্যর দিকে। বৈরাগ্য এবং কেশস একসঙ্গে পড়ে নেয় তা। ওপরের বার্থে শুয়ে শুয়ে বেণুও লক্ষ করছিল পুরো ব্যাপারখানা। বার্থ থেকে ঝুঁকে পড়ে সেও চোখ বেঁধায় চিরকুটখানার ওপর। আপনি জানলেন কী করে? খুব গদ্‌গদ গলায় ধনেশ পাখিকে শুধোন ডাঃ পালধি।

মিটিমিটি হাসছিল ধনেশ পাখি। সাকরেদটির মুখেও ফেনিয়ে উঠছিল গদ্‌গদ হাসি।

ডাঃ পালধি শুধোন, কখন লিখলেন ওটা?

—কখন? আজ সকালে।

—সকালে? ডাঃ পালধির চোখ-দুটো গোলাকার হয়ে আসে, সকালে আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

—কী করে জানলাম বল্ তো? মুচকি মুচকি হাসতে থাকে ধনেশ পাখি, তোর নাম তো এখনও বলিসনি আমাকে।এই কামরায় তো কোনো প্রসঙ্গে কেউই তো পুরো নামখানা উচ্চারণ করেনি এখনও অবধি। করেছে কী?

বিহ্বল ডঃ পালধি পেণ্ডুলামেরমতো ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে থাকেন।

ইতিমধ্যে পাশের খোপের যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ব্যাপারটা। নীলাদ্রি চিরকুটখানা হাত বাড়িয়ে নিয়েছে। হাতে হাতে ঘুরছে ওটা। প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলেন ডাঃ মণীন্দ্র চন্দ্র। কথাবার্তা শুনে থমকে দাঁড়ান। কী ব্যাপার?

নীলাদ্রি চিরকুটখানা এগিয়ে দেয় ওঁর দিকে। ঘটনানা সংক্ষেপে বলে। পুরু লেন্সের চমশমার সামনে চিরকুটখানা মেলে ধরেন ডাঃ চন্দ্র। বিড়বিড় করে পড়তে থাকেন। ডাঃ গোলকপতি পালধি, ৩৬/১, একডালিয়া পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-২৯। প্রিয় সংখ্যা—৭, প্রিয় ফুল—গোলাপ, তারপর আর কীসব হিজিবিজি লেখা।

ডাঃ চন্দ্র খুব বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ধনেশ পাখির দিকে। ইতিমধ্যে আরও দু-চারজন এসে দাঁড়িয়েছে আশপাশে। চিরকুটখানা ঘন ঘন হাত বদলাতে থাকে। পাক দিয়ে বেড়ায় কামরাময়। নিমেষের মধ্যে কথাটা রটে যায় পুরো কামরায়। সবাইয়ের মধ্যে একটা ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল, কিন্তু একটা চিরকুট নিমেষের মধ্যে সবাইকে চাঙা করে দেয়। যেন একটা নিস্তরঙ্গ দিঘির মধ্যিখানে একখানা ছোট্ট ঢিল। গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় কামরা জুড়ে। নিমেষের মধ্যে ধনেশ পাখি সারা কামরায় মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছে যায়। শুরু হয়ে যায় এদেশের মুনি-ঋষি, সাধু-সন্তদের অপার বিভূতির কথা। তাঁদের ক্ষমতা ও মহিমা নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। 'ভারতের সাধক' সিরিজের সমস্ত মহাত্মাগণ একে একে উঠে আসেন বিশ্বাসী মানুষের জিভের ডগায়। এছাড়াও, প্রায় প্রত্যেকেই নিজেরে স্মৃতি থেকে অন্তত একজন ক্ষমতাবান সাধুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী উপহার দেন এবং কাহিনিটি তাঁর চাক্ষুষ দেখা বলে দাবি করেন।

পুরো দৃশ্যখানা দেখতে দেখতে বৈরাগ্য কেমন থতমত খেয়ে গেছে। একটা

মানুষকে নিয়ে যে সারা কামরা অকস্মাত এমন পাগলামো শুরু করতে পারে, এমনটা সে মোটেই প্রত্যাশা করেনি। তাও কিনা এমন একটা ব্যাপার নিয়ে যা নিতান্তই সাদামাটা, অতি সাধারণ পর্যায়ের চাতুরি। কলেজে কতবার বৈরাগ্য কতজনকে যে ওই করে বোকা বানিয়েছে। আসলে, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, একটু সাদাসিধে গোছের মানুষকে আচমকা জিজ্ঞেস করলে, সে এক থেকে দশের মধ্যে সাত কিংবা নয় সংখ্যাটাই বলে। ফুলের নামও বলে, গোলাপ। আগে থেকে টার্গেট করে লিখে রাখলে ওটি দেখামাত্তর লোকটি চমকে যাবেই আর, বাংলা সাত এবং ইংরেজি নয় সংখ্যাটি যেহেতু একই আদলের, সাত সংখ্যাটিকে তলার দিকে সামান্য বাঁকিয়ে দিলেই প্রয়োজনে সেটাকে ইংরেজি নয় সংখ্যা বলে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যায়। এই চিরকুটখানাতেও, বৈরাগ্য লক্ষ করেছে, ধনেশ পাখিও একই পদ্ধতি নিয়েছে। সাত সংখ্যাটা তলার দিকে একটুখানি বাঁকিয়ে লিখেছে।

ডঃ পালধি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। ধনেশ পাখির থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারছেন না উনি। জ্বলন্ত পাইপখানা কখন জানি নিভিয়ে রেখে দিয়েছেন ব্যাগের মধ্যে। একসময় হামলে পড়ে বলে ওঠেন, কে আপনি, কী পরিচয় ?

ধনেশ পাখির চোখের কোণে চাপা কৌতুক। বলে, আন্দাজ কর্ বেটা।

দু'চোখ দিয়ে ধনেশ পাখিকে আগাপাশতলা জরিপ করতে থাকেন ডঃ পালধি। বিড়বিড় করে বলেন, কোনো উচ্চমার্গের মানুষ তো বটেনই। কিন্তু সঠিক পরিচয়টা কী ?

চারপাশে যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদেরও চোখেমুখে ব্যাকুলতা। মানুষটির পরিচয় জানার জন্য উদগ্রীব সকলেই। ধনেশ পাখি একঝলক দেখে নেয় সবাইকে। তারপর মিটিমিটি হাসতে থাকে নিঃশব্দে। বলে, আমার পরিচয় জানার জন্য এত উতলা কেন রে ? আমি তো তোর কাছে কিছু চাইনি ? চেয়েছি ?

ডঃ পালধি বিহ্বল চোখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন।

—বলেছি কী, আমাকে পাঁচ টাকা, দশ টাকা দে ? জলপানি খাব। বলেছি ?

ডঃ পালধির মুণ্ডুখানি পুনরায় পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে দুদিকে।

—তবে ? ধনেশ পাখি এবার সামান্য গম্ভীর। মানুষের কাছে কিছু চাইতে নেই, বুঝলি। দেবার মতো কী আছে মানুষের ? মানুষ তো নিজেই এক নিঃস্ব জীব। ঠিক কিনা ?

ডাঃ পালধিই শুধু নয়, চারপাশের অন্যান্যরাও ওপরে নিচে মাথা দুলিয়ে সায় দেয় নিঃশব্দে।

—চাইতে হলে চাইবি তাঁর কাছে, যাঁর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আর, চাইলে টাকা-পয়সা ধন-দৌলতের মতো ঝুটা চিজ নয়, আসল জিনিসটাই চাইবি।

ডাঃ পালধির উদ্দেশ্যে যদিও বলে চলেছে ধনেশ পাখি, কিন্তু চারপাশের বার্থগুলো থেকে সবাই গোগ্রাসে গিলছে কথাগুলো। যারা চারপাশে এসে ভিড় করেছে, তারাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। অবাক বিস্ময়ে দেখছে লোকটিকে। সকলের চোখে বিস্ময় দেখতে দেখতে একসময় চোখ বোজে ধনেশ পাখি। সিটের গায়ে হেলান দিয়ে

স্থির হয়ে যায়।

সারা কামরা জুড়ে অস্পষ্ট গুঞ্জন। নীলাদ্রি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে ডঃ পালধির কাছে। বলে, জেঠু, লোকটিকে আপনি আগে থেকে চিনতেন? আলাপ-টালাপ হয়েছিল কোনোদিন?

ডাঃ পালধি ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন।

—আগে কোথাও দেখেছেন ওকে? জেঠিমা? জেঠুর অ্যাবসেন্সে কখনও লোকটা গিয়েছিল আপনাদের বাড়িতে? মনে করে দেখুন তো। বিস্ফারিত দুটি চোখ নীলাদ্রির দিকে মেলে ধরেন মিসেস পালধি। বিহ্বল ভাবখানা এখন অবধি কাটেনি তাঁরও। ধীর গলায় বলেন, না, বাবা, এই প্রথম দেখলুম।

—আজ প্ল্যাটফর্মে ওর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল।

—নাহ্। জোরে জোরে মাথা দোলাতে থাকেন ডঃ পালধি। ঈষৎ বিরক্তি মেশানো গলা বলে ওঠেন, যদি কোনো সূত্রে আমার নাম-ঠিকানা জেনেও থাকে, সংখ্যা আর ফুলের নামটা জানল কী করে?

—স্ট্রেঞ্জ! নীলাদ্রির দুচোখ যুগপত বিস্ময় ও অবিশ্বাস।

ডাঃ চন্দ্র আগ বাড়িয়ে বলেন, কিন্তু সাত এবং গোলাপ তো এমনি এমনি নয়, একটা সিগনিফিক্যান্স রয়েছে নিশ্চয়ই। কিছু বললেন আপনাকে?

ডঃ পালধি ফের মাথা নাড়েন।

—সেইটেই তো আসল। জেনে নিলেন না কেন? সাত এবং গোলাপ বলাতে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী?

—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করে নাও ওঁকে। মিসেস পালধি তাড়া লাগাল স্বামীকে। —আসল কথাটাই তো জিজ্ঞেস করলে না। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা যদি মাথায় খেলে তোমার! চিরকাল তো দেখছি—।

স্ত্রীর তাড়নায় ধনেশ পাখির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে উদ্যত হতেই নিজের ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বাধা দেয় সাকরেদটি। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। শুধু ধনেশ পাখির কথাবার্তা এবং চারাপাশের মানুষজনের সীমাহীন বিস্ময়টাকে উপভোগ করছিল আর নিঃশব্দে মিটিমিটি হাসছিল। এবার সে ফিসফিসিয়ে বলে, বাবা ইখন কুনো কথারই জবাব দিবেননি।

—কেন?

—তিনি ইখেনে নাই।

লোকটার কথার ধরনে গ্রাম্য টান। বৈরাগ্য লক্ষ করে, চোখেমুখেও এক ধরনের চোয়াড়ে সেয়ানাপনা।

—ডাঃ চন্দ্র বলে ওঠেন, নেই মানে?

ইখন উয়ার কেবল দেহটাই রয়েছে। উনি নাই।

উনি তবে কোথায়?

—কুথা কুথা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেদার, বদ্রী, গোমুখ, তিরুপতি, রামেশ্বর ধাম, কিম্বা কামরূপ কামাখ্যা...।

এতখানি হজম করতে পারে না কামরার অনেকেই। নীলাদ্রি বলে ওঠে, ওই তো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

—উটা ত দেহের কাজ। খুব নির্বিকার গলায় বলে সাকরেদটি—দেহের কাজ দেহ কচ্ছে, আত্মার কাজ আত্মা কচ্ছে।

পুরো ব্যাপারটা একটু একটু করে অসহ্য লাগছিল বৈরাগ্যর। প্রায় ধমকে বলে ওঠে, বাজে বকো না তো। ও ঘুমোচ্ছে। এক ঠেলা দিলে এক্ষুনি জেগে উঠবে।

চারপাশের মানুষজন আধা-বিশ্বাসে, আধা-সন্দেহে পরখ করতে থাকে, সত্যি এটা নিপাট ঘুম কিনা। অনেকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে ধনেশ পাখির মুখখানা।

বৈরাগ্য বলে, দিন না অল্প ঠেলা দিন।

কেউ সাহস করে এগোয় না।

কমলাক্ষ সরকার একটা যুক্তি অবতারণা করতে চান। বলেন, ঘুমোচ্ছেন নাকি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন, বলা মুশকিল। কিন্তু ওই যে সাত আর গোলাপের ব্যাপারটা—।

—আমি বলছি। আমি জানি। বৈরাগ্য টানটান হয়ে বসে—ওই সাত আর গোলাপের ব্যাপারটা হলো—।

ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা সোজা হয়ে উঠে বসে ধনেশ পাখি। লম্বা করে হাই তোলে। এবং সেই ফাঁকে, ট্রেনের স্বল্প আলোয় একজন দেখে ফেলে, লোকটার মুখের মধ্যে জিভখানা নেই। এমনি ওপরের বার্থ থেকে বেণুও সেটা প্রত্যক্ষ করে। শুরু হয়ে যায় তুমুল কানাঘুষো। বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে ওঠে সব-কটি প্রত্যক্ষদর্শী চোখ। কিছু মানুষ, যারা দৃশ্যটা দেখেনি, গাঢ় সন্দেহ জমে তাদের চোখে।

—জিভ নেই মান? লোকটা এক্ষুনি লকলকিয়ে কথা বলল।

—বলছি, নেই। স্পষ্ট দেখলুম।

—ঠিক দেখেছেন তো? চোখের ভুলও তো হতে পারে।

—কখখনো না। শুধু আমি নাকি? আরও কেউ কেউ দেখেছে। তখন অনেকেই তাৎক্ষণিক সাক্ষ্য দেয়। তারাও দেখেছে জিভহীন মুখ গহ্বর। বৈরাগ্যর দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে বেণু বলে, আমি স্পষ্ট দেখলুম, ভাই। জিভখানা নেই।

ডাঃ চন্দ্র বললেন, একসঙ্গে এতগুলো লোকের চোখের ভুল হতে পারে না।

—হতেও পারে। বৈরাগ্য প্রতিবাদ করে ওঠে, চোখের ভুল মারাত্মক বস্তু। রজ্জুকেও সাপ বলে মনে হয়। একটা ঘটনা বলছি—

—এমনি সময়ে ধনেশ পাখি চোখ খোলে। পিটপিট করে তাকায় বৈরাগ্যের দিকে। চোখের কোণে চাপা রোষ। আচমকা হাঁ করে মুখখানাই মেলে ধরে ওপরের দিকে। সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে থাকে হাঁ করা মুখ। এবং সকলেই নজর করে, লোকটার মুখের মধ্যে জিভের লেশমাত্র নেই।

নীলাদ্রি টর্চখানা এনে লোকটার মুখগহ্বর নিশানা করে আলো ফেলে। এবার সবাই ষোলোআনা নিশ্চিত হয়, জিভখানা মুখগহ্বর থেকে বেমালুম উধাও।

কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে কামরাময়। মুহূর্তে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যারা

বার্থে শুয়ে পড়েছিল তড়াক করে নেমে আসে। ধনেশ পাখি সবাইকে জনে জনে দেখবার সুযোগ দেয়। সবাইয়ের দেখা শেষ হলে পরে আস্তে আস্তে বন্ধ করে মুখ।

বলে, যাহ্, এবার শুয়ে পড় সব। রাত হলো।

কারোর কানেই ঢোকে না সে কথা। হরেক প্রশ্নের জোয়ার বয়ে যায়।

—আপনার জিভ রয়েছে?

—নইলে কথা বলছি কেমন করে? এই দ্যাখ্। ডাক্তারকে জিভ দেখাবার ভঙ্গিতে লম্বা করে জিভ বের করে, ধনেশ পাখি।

একেবারে দমে গিয়েছেন ডাঃ চন্দ্র। বলেন, একটু আগে যে দেখলুম নেই?

—ঠিক দেখেছিস। তখন ছিল না। ধনেশ পাখি অমায়িক হাসে, যখন কথা বলতে ইচ্ছে করে না, তখন ওটাকে ছুটি দিই। ও একটুখানি ঘুরে-ফিরে আসে।

—কোথায় গিয়েছিল আপনার জিভ? নীলাদ্রি শুধোয়। নীলাদ্রির দিকে কটমট করে তাকা ধনেশ পাখি। বলে, তোকে বলব কেন? বললে তুই বিশ্বাস করবি? এই দেখ না, তোদের দেখতে ইচ্ছে করছে না আমার। তাই চোখের মণিকে পাঠিয়ে দিলাম হেমকুণ্ডের কাছাকাছি। সেখানে কত ব্রহ্মকমল ফুটে রয়েছে চতুর্দিকে। ইস। এবং সবাইকে সবিস্ময়ে দেখে, ধনেশ পাখির চোখ দুটো খোলা কিন্তু তাতে মণি দুটোর লেশমাত্র নেই সারা চোখ জুড়ে কেবল সাদা জমি। একটু বাদে মণি দুটোকে সস্থানে ফিরিয়ে আনে ধনেশ পাখি। বলে, যাহ যাহ্ শুয়ে পড়।

কেউ শুয়ে পড়ে না। বরং যারা শুয়ে পড়েছিল, উঠে বসে। একে একে ভিড় জমায় ধনেশ পাখির আশেপাশে।

বৈরাগ্য বিড়বিড় করে বলতে থাকে, জিভখানা চোখের মণি দুটো লুকিয়ে রাখতেও পারে। কোনো কৌশল-টৌশল—ভালোভাবে রপ্ত করল—

—দূর মশাই! এবার সরাসরি খিঁচিয়ে ওঠেন ডাঃ চন্দ্র। জিভ কী বাঁধানো দাঁত নাকি যে খুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখবে! কী যে বলেন আপনি। মনে রাখবেন আই অ্যাম আ ডক্টর। অ্যানাটমিটা ভালোই পড়া আছে। মুখের মধ্যে জিভ লুকিয়ে রাখা আর চোখ থেকে মণি উধাও করে দেওয়া সম্ভব কি না আমি জানি।

ঠিক সেই মুহূর্তে বৈরাগ্য দেখতে পায়, কেলো এবং কটা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে জমায়েতের পেছনে। পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করছে ওরা।

পাঁচ

অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল বলেন, শুনেছি হঠযোগের দ্বারা নাকি এমনটা করা সম্ভব।

ফলত, সারা কামরা জুড়ে হঠযোগ নিয়ে তুমুল গবেষণা চলতে থাকে। হঠযোগের মাধ্যমে শূন্যে ভেসে থাকা, মাটির তলায় কুম্ভক হয়ে থাকা, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, আরও কী কী অসম্ভব ক্রিয়াকলাপ করা সম্ভব, যার একখানা তালিকা তৈরি হয়ে যায় মুখে মুখে। 'হঠযোগ-দীপিকা' নামে একখান৷ প্রাচীন বইয়ের রেফারেন্সও দিয়ে বলেন কমলাক্ষবাবু কস্তুরীকে বলে, মাস্ট বি আ গ্রেট ইয়োগি। মাস্ট বি ভেরি পাওয়ারফুল।

—ইয়াহ্। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দেয় কস্তুরী, ইন্ডিয়ান ইয়োগিজ ক্যান ডু অ্যান্ড

আন্-ডু এভরিথিং।

বৈরাগ্য আর কেশবের মধ্যে ঘনঘন দৃষ্টি বিনিময় চলতে থাকে। কেশব একান্তে বলে, দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ে মানুষের কেমন প্রগাঢ় জ্ঞান দেখেছিস।

—বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কোনো ইন্ডিয়ানই এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না। তেতো গলায় বলতে থাকে বৈরাগ্য।

—আমার ঠাকুরমার তো রামায়ণ, মহাভারত আর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কণ্ঠস্থ ছিল। ওপর থেকে বেণু যোগ করে।

—এর দ্বারা কী প্রমাণ হলো?

—না, মানে ইন্ডিয়ানদের রিলিজিয়াস অ্যাপ্‌টিটিউড্‌টাই বলতে চাইছি।

—মুখে জিভ না থাকবার সঙ্গে রিলিজিয়নের সম্পর্কে কী? বৈরাগ্যের হয়ে কেশবই জেরা শুরু করে এবার।

—এটাও তো রিলিজিয়নেরই একটা অংশ। বেণুর মধ্যে য়্যুনিভার্সিটির ডিবেট-চ্যাম্পিয়ন মানুষটি প্রকট হয়,—মানুষ ঈশ্বরকে পাওয়ার হরেক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে। তন্ত্র, যোগ ইত্যাদি হলো তেমনই সব প্রক্রিয়া।

—আমি বলছি। পাশের খোপ থেকে নীলাদ্রি একলাফে চলে আসে কাছে, আমার দাদুরকথা কোট করছি। দাদু বলেন, যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াকলাপগুলোকে সংযত করে যোগ।

নীলাদ্রি দাদুর রেফারেন্স দেওয়া ইস্তক উৎকর্ণ ছিলেন কমলাক্ষ। বাবাকে বরাবরই খুব শ্রদ্ধা করেন তিনি। ভয় ছিল, নীলাদ্রি দাদুর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি বলবার বেলায় যদি ঠিকঠিক কম্যুনিকেট করতে না পারে। এতগুলি মানুষের সামনে বাবা তাহলে মিস্‌রিপ্রেজেন্টেড হয়ে যাবেন। এই আশংকা থেকেই মাঝপথে নীলাদ্রিকে থামিয়ে দেন কমলাক্ষ। বলেন, ধরুন, আপনার জিভখানা সর্বদা খলবলাতে চায়, সর্বদাই ভালোমন্দ খেতে চায়। জিহ্বার অতিরিক্ত লিপ্সা ও চাঞ্চল্য মানুষকে বাচাল করে তোলে, ভোজনরসিক করে তোলে। অধিক বাচালতায় শরীরের শক্তিক্ষয় হয়। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। অধিক ভোজনের ফলে পাকযন্ত্র ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ভালোমন্দ খাদ্যগুলি নিয়মিত সংগ্রহ করতে গিয়ে মানুষ অসততার আশ্রয় নেয়। তার চরিত্রহানি ঘটে। আপনি ধরুন আপনার জিভখানাকে সংযত করলেন অভ্যাসের মাধ্যমে। আপনি বাঁচলেন। এইভাবে আপনার শরীরের ইন্দ্রিয়গুলির হাজারো দাপাদাপি আপনি থামিয়ে দিতে পারেন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয়েছে রিপু। নিবৃত্ত, নিদেন সংযত না করলে তারা প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে শত্রুতা করবে। আপনারলাইফ হেল্ করে দেবে। বাবা বলেন, চিত্ত হলো দীপশিখা। বাড়লে যেমন দীপশিখাটি অস্থিরভাবে দাপাদাপি শুরু করে, নিভেও যেতে পারে অকালে, তেমনই ইন্দ্রিয়ের অস্থির দাপাদাপিতে চিত্তের চাঞ্চল্য ও উন্মত্ততা বেড়ে যায়। আর উন্মত্ত হয়ে ছুটতে থাকা পশুর পিঠে যেমন কোনও সওয়ারই থিতু থাকতে পারে না, ঠিক তেমনই উন্মত্ত চিত্তের আধারে কোনো মহত ভাবনাই স্থিত হয় না। চিত্তরূপ দীপশিখাটিকে অকম্পমান রাখতে হলে শরীররূপ ঘরের বায়ুকে স্থির, সংযত রাখতে হবে। এবং

একমাত্র যোগের মাধ্যমেই তা সম্ভব। শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবকে ঠিক-ঠিকভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছেন এমন বিশ্বাসে খানিকটা আত্মপ্রসাদ জন্মে কমলাক্ষবাবুর সারা মুখে।

বৈরাগ্য ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল কমলাক্ষর দিকে। বিস্ময়ে তার বাক্‌রুদ্ধ অবস্থা। তাও কমলাক্ষর দিকে তাকিয়ে বলে, জিভ লুকিয়ে ফেলে খাওয়ার ইচ্ছে দূর করা, চোখ থেকে মণি উধাও করে খারাপ দৃশ্য দেখবার লোভ সংবরণ করা, জননেন্দ্রিয় শেকল পরিয়ে কাম প্রশমন করা, এগুলো একধরনের সাপ্রেশন, কমলাক্ষদা। এর থেকেই আসে যাবতীয় বিকৃতি। টোট্যালি র‍্যাশনালাইজেশন ছাড়া অপরিমিত ভোগবাসনা কমানো সম্ভব নয়। আর, তার জন্য চাই সোস্যাল কনসাস্‌নেস্‌।

—কিন্তু বৈরাগ্য আংকল্‌ তুমি কি জান, ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়েলিজম নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে পড়াশুনো, গবেষণা শুরু হয়েছে? তিলকেশ তার স্বভাবসিদ্ধ নরম গলায় বলে ওঠে, আমেরিকায় তো প্যারাসাইকোলজি নামে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলছে য়্যুনিভার্সিটিতে। ডিপার্টেড সোল-এর বিহেভিয়ার‍্যাল প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা চলছে সেখানে।

—ডিপার্টেড সোল? নিলাদ্রী সম্ভবত তিলকেশের একটুখানি পিছে লাগতে চায়,—মানে, ভূত তো? ভূতেদের কথাই বলছিস তো?

—ধর যদি বলিই, তোর আপত্তি আছে? তুই ভূত মানিস নে? গোস্ট?

—ধুস! ভূত বলে কিছু আছে নাকি?

—কী গাঁইয়ারে। গোস্ট্‌ মানে না। তিলকেশ নীলাদ্রিকে দুযো দেয়— ডিপার্টেড সোলকে তুই অস্বীকার করতে পারিস?

নীলাদ্রি হো-হো করে হেসে ওঠে, তুই ল কলেজে নাকি ওঝাদের ইশকুলে পড়িস রে? মহাকাশে মানুষ যাচ্ছে, জিনের হেরফের ঘটিয়ে পুরুষকে মেয়ে বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে টেস্টটিউবে বাচ্চা হচ্ছে, আর তুই কিনা এখনও ভূতের যুগে পড়ে রয়েছিস?

এমন কথায় তিলকেশ সামান্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, গলাবাজিতে কিছু হয় না। এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। কনভিক্‌শান। এদেশের কোটিকোটি মানুষ যা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছে, সবই ভুল? কোটি কোটি মানুষ একই ভুল করে কখনও?

সবাই মন দিয়ে শুনছিল ওদের ডিবেট। তিলকেশের শেষ কথাগুলি শুনে সোজা হয়ে বসে বৈরাগ্য। বলে, আচ্ছা, এখন বাদ দাও এসব আলোচনা। যোগ নিয়ে যথেষ্ট হলো। এখন মুখে মুখে একখানা যোগ করে দাও দেখি। সবাই একসঙ্গে করবে কিন্তু। রিয়া, কস্তুরী, নীলাদ্রি, তিলকেশ। কমলাক্ষদা, বউদি, আপনারাও করতে পারেন। অন্যরাও করতে পারেন শুরু করছি। হাজরা কুড়ির সঙ্গে হাজার কুড়ির। কত হলো?—দুহাজার চল্লিশ। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে।— বেশ। তার সঙ্গে যোগ কর রাও চল্লিশ। কত হল?— দুহাজার আশি।— রাইট। তার সঙ্গে আরও দশ। দুহাজার নব্বই।— ঠিক। তার সঙ্গে আরও দশ। —তিন হাজার।

বৈরাগ্য একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। বলে তিন হাজার হলো কি? ঠিক করে যোগ কর।

মুখে মুখে আবার যোগ করে প্রত্যেকেই। বলে, তিন হাজারই হয়। মিটিমিটি

হাসতে থাকে বৈরাগ্য। বলে তাহলে আমি যদি আমাদের দুহাজার নব্বই টাকার পর আরও দশ টাকা দিই, তোমারা আমাকে তিন হাজার টাকা ফেরত দেবে তো?

—দাঁড়াও দাঁড়াও। নীলাদ্রি যেন এতক্ষণে একটা কুইজের গন্ধ পেয়েছে। মনে মনে খানিক হিসেব করে লম্বা জিভ কাটে সে। —না, দুহাজার একশ হবে! ইস!

সঠিক হিসেবটা বুঝতে পেরে ততক্ষণে মাথার চুল ছিঁড়ছে সবাই।

মুচকি হেসে বৈরাগ্য বলে, তাহলে, সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস করলেই সেটা সঠিক হয় না, কী বল?

ডাঃ চন্দ্র এবার সরাসরি আক্রমণ করেন বৈরাগ্যকে, আপনি কি বলতে চান, স্পষ্ট করে বলুন তো। তখন থেকে সব ব্যাপারেই আপনি ফুট কাটছেন। আপনি কি বলতে চান, ঠাকুর-দেবতা বলে কিছুই নেই। এদেশে কোন অবতারই জন্মাননি?

—দেখুন, বৈরাগ্য যদ্দূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে জবাব দেয়, ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে আমার নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমার কাছেই থাকুক। কিন্তু গুরু, বাবা, অবতার সেজে এ দেশে যা হচ্ছে যা তা করে চলেছে...।

—বৈরাগ্যবাবু, বি লজিক্যাল। বি রিজনেব্‌ল।

—আমি তো লজিক্যালিই বলছি।

—না। আপনার কথার মধ্যে কোনও রিজন নেই। কোনও লজিক নেই। কেউ কেউ ভণ্ডামি করছে বলে, সবাই ভণ্ড? কেউ কেউ ঘুষ খায় বলে সবাই ঘুষখোর? বাজারে ভেজাল ঘি বিক্রি হয় তাই বলে আসল ঘি-র হয়ই না? বৈরাগ্যবাবু আপনি একজন এডুকেটেড ম্যান, আপনার কাছ থেকে আমরা রিজ্‌নেব্‌ল কথাবার্তা আশা করি।

তর্কটা ডাঃ চন্দ্রের সঙ্গে হচ্ছে বটে, কিন্তু বৈরাগ্য লক্ষ করে, কামরা প্রতিটি মানুষের মুখে ডাঃ চন্দ্রের প্রতি নীরব সমর্থন স্পষ্ট। পেছন থেকে কেউ কেউ গজগজ করতে থাকে, শিক্ষিত মানুষ হয়ে যদি যুক্তিপূর্ণ কথা না বলে তবে তো তার শিক্ষাটাই বৃথা। এমন শিক্ষার মূল্য কী!

এতক্ষণ চোখ মুদে দুপক্ষের কথা নিঃশব্দে শুনছিল ধনেশ পাখি। একসময় ধীরে ধীরে চোখ খোলে। হাত তুলে ইঙ্গিতে থামিয়ে দেয় ডাঃ চন্দ্রকে। বলে, বৈঠ্‌, যা, বেটা, বৈঠ্‌ যা। বলতে বলতে ডাঃ পালধির দিকে তাকায় ধনেশ পাখি। বলে, তোর জলের বোতলখানা একটু দিবি? ডাঃ পালধি ওয়াটার বটল্‌খানা নিয়ে ঠেলে ঠুলে এগিয়ে যান। ঝুলি থেকে একখানা ছোট্ট কাচের গেলাস বের করে ধনেশ পাখি। পেতে দেয় ওয়াটার বটলের মুখে, একটুখানি জল দেতো রে।

জলটুকু নিয়ে ধনেশ পাখি একটুক্ষণ তাকায় নীলাদ্রির দিকে, গেলাসখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, নে, খা। নীলাদ্রি সামান্য ইতস্তত করছিল। তাই দেখে ধনেশ পাখি বলে, খা, খা। গোলকপতির বোতলের জল, ভয় নেই খা। গেলাসে পরপর দুবার চুমুক দিয়ে মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে নীলাদ্রির। ধনেশ পাখি বলে, কী হলো? নীলাদ্রি বলে, বেজায় টক।

—টক! ধনেশ পাখি যেন অবাক, কী যা তা বলছিস? জলে কি তেঁতুল মিশিয়েছিস রে, গোলকপতি?

ডাঃ পালধি এতটাই হতচকিত যে ধনেশ পাখির কথার জবাবটাও দিয়ে উঠতে পারেন না। ততক্ষণে ধনেশ পাখি ঝুলি থেকে বের করে ফেলেছে আরও একখানা গেলাস। সামান্য জল ঢেলে নিয়ে গেলাসখানা এগিয়ে দেয় কমলাক্ষ সরকারের দিকে, কমলাক্ষবাবু পরপর দু-এক চুমুক দিতে না দিতেই তাঁর সারা মুখে জমাট বাঁধে বিস্ময়। বলেন, মিষ্টি লাগছে।

মিষ্টি লাগছে? বলিস কী! ধনেশ পাখি ভুরু কোঁচকায়, রেলের ট্যাপের জলে কি চিনি মেশাচ্ছে নাকি আজকাল? বলতে বলতে তৃতীয় গেলাসখানাকে জলভরে এগিয়ে দেয় বৈরাগ্যর দিকে। মিষ্টি হেসে বলে, এই তুই খা।

অন্যকে দিন। বৈরাগ্যর গলায় তীব্র রোষ, আমি ব্যাপারটা জানি।

তুই তো সব জানিস। অনেক কথাই তো বলছিস তখন থেকে। স্মিত হাসিতে ভরে যায় ধনেশ পাখির মুখখানা। ক্ষতি তো নেই। আরে ভয় নেই বিষ দিচ্ছিনে তোকে।

পেছন থেকে পবনকুমার শর্মা বলে ওঠেন, হাঁ, হাঁ, পরীক্‌সা তো কিজিয়ে।

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাসখানা নেয় বৈরাগ্য। একচুমুক মেরেই মুখখানা বিকৃত করে বলে, তেতো, হালকুচ তেতো।

তেতো? এবার ওয়াটার-বট্‌ল্‌খানা ডাঃ পালধিকে ফেরত দিতে দিতে ধনেশ পাখি বলে, কেমন জল ভরেছিস রে, গোলক? কেউ বলে টক, কেউ বলে মিঠে, কেউ বলে তেতো...। তুই নিজে একটুখানি খেয়ে দেখ তো।

ডাঃ পালধি একঢোক জল নিয়ে মুখের মধ্যে খেলাতে থাকেন। স্বাদ বোঝার চেষ্টা করেন। ঢোক গিলে বলেন, কিছুই তো লাগল না, প্লেন ওয়াটারের টেস্ট!

হা-হা করে হেসে ওঠে ধনেশ পাখি। বলে, এক বোতলের জল, কারও লাগছে তেতো, কারও মিষ্টি, কার বা টক। একই বস্তু মানুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ। যার যেমন জিহ্বা, জলের তো গন্ধ নেই, নিজস্ব কোনো স্বাদ নই।তোদের জিবের গুণে অথবা দোষে স্বাদের হেরফের। একই বস্তু, কেউ দেখছে রজ্জু, কেউ দেখছে সাপ। কেউ দেখছে ঠাকুর, কেউ দেখছে কুকুর। বলতে বলতে নীলাদ্রির দিতে তাকায় ধনেশ পাখি। বলে, ওই যে, একটু আগে টেপে গাইছিল তোদের গাইয়ে, লোক জিসে পাথর কহতে হ্যায়, ম্যায়নে উসকো ফুল কহা/জিস্‌নে য্যায়সা শোচা উসকো, ওইসি খুশবু আতি হ্যায়...।

—বাহ্‌, বাহ্‌ চমৎকার একজামপল্‌। একযোগে সাধুবাদ জানায় জনাকয়।

বৈরাগ্য বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে চারপাশের মানুষগুলি যেন বশীভূত সাপ। আর ধনেশ পাখি যেন এক দক্ষ সাপুড়ে। ওর মোহনবাঁশি বাজছে, বাঁশি দুলছে, বাঁশি-উঠছে, বাঁশি নামছে, আর তার পাশের মানুষগুলো সেই অনুসারে হেলছে দুলছে হাসছে, অবাক হচ্ছে। বাঁশিতে জ্ঞানী সুর বাজলে গম্ভীর হচ্ছে, ভক্তি সুর বাজলে গদগদ হচ্চে। মজাদার সুর বাজলে মিটিমিটি হাসছে, যাকে যা করতে বলে ধনেশ পাখি, তাই করছে সবাই। ওই একটা লোকের ওপরই এই মুহূর্ত এতগুলি চোখের মণি স্থির হয়ে রয়েছে। ধনেশ পাখির ইচ্ছের রশিতে একেবারে কব্জা হয়ে গিয়েছে মানুষগুলো। নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছে সব লোপ পেয়েছে। সকলের চোখ-মুখে এক ধরনের অলৌকিক

ঘোর। কেশবের দিকে ঘন হয়ে আসে বৈরাগ্য। ফিসফিস করে বলে, একটা কথা বলছি তোকে। ধনেশ পাখি যে জলটা খেতে দিল, তাতে ওষুধের গন্ধ। শোনামাত্র কেশবের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। — ঘুমের ওষুধ-টষুধ নয়ত? বৈরাগ্য চমকে ওঠে। বলে, হতে পারে। কিছু অসম্ভব নয়।

বৈরাগ্য ইঙ্গিতে নীলাদ্রিকে কাছে ডাকে। ওর কানের কাছে মুখ এনে বলে, লোকটা যে জল দিল, তাতে ওষুধের গন্ধ পেয়েছিলে?

ওষুধের গন্ধ? কই, না তো মনে পড়ছে না।

ছিল। তুমি খেয়াল করনি। আমি পেয়েছি।

তো? নীলাদ্রি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

বৈরাগ্য চাপা গলায় বলে, ঘুমের ওষুধ হতে পারে। একটু সতর্ক থেক। মালপত্তরগুলোর দিকে নজর রেখ।

বলতে বলতে সহসা মুখ তোলে বৈরাগ্য। আর তখনই দেখতে পায়, কেলো এবং কটা, যারা কিছুক্ষণ ধরে জমায়েতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধনেশ পাশির রেরামতি দেখছিল, একৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বৈরাগ্যর দিকে। ওদের দুচোখে হিংস্র রোষ।

ছয়

সামান্যক্ষণের জন্য বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ধনেশ পাখি, সাকরেদটি ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে। অতিশয় মধুর স্বরে বলে, বাবা, রাত অনেক হলো।

ধনেশ পাখি চমকে তাকায়। অ্যাঁ? কিছু বলছিস?

বলছি, রাত অনেক হলো।

ধনেশ পাখি কিছুক্ষণ স্থিরপলকে তাকিয়ে থাকে সাকরেদের দিকে। দু'চোখের মণিতে ভর্ৎসনা। বলে তুই পুনরায় পূর্ব-সংসারে ফিরে যা ষড়ানন। এ পথ তোর জন্য নয়। সে কথায় ষড়াননের চোখে-মুখে চোর-চোর ভাব। বলে, কেন বাবা?

ধনেশ পাখি সহসা তেতে ওঠে, কেন কী রে? রাত-দিন বলে কিছু আছে নাকি? ও তো মায়াবন্ধ মানুষের বিভ্রম। রাত, দিন এসব হলো অখণ্ড সময়ের টুকরো টুকরো মায়া। সেই মায়াজালে তুইও পড়বি?

ষড়ানন যার-পর-নাই লজ্জিত, অনুতপ্ত। বলে, আমি উটা বলতে চাইনি বাবা। বলছি, এবার কিছু মুখে দিন। শরীরটাকেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবেক।

ধনেশ পাখি অল্পক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। তারপর আপন মনে বলতে থাকে, হ্যাঁ, শরীরটাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। ওটাই তো আধার। বলতে বলতে ঝুলি হাতড়ে একটা ময়লা রঙের কালীমূর্তি বের করে আনে। বলে মা-কে না খাইয়ে কী করে খাই? মূর্তিটিকে নিজের কোলের ওপরে বসায় ধনেশ পাখি। ঝুলি থেকে বের করে একখানা দুধভরর্তি ফিডিং বোতল। বোতলখানা মূর্তির মুখে চেপে ধরে বলে, খা বেটি, খা। এইসব ভিড়-ভাট্টায় তোব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এবং চারপাশের জমায়েত বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকে, ফিডিং-বোতলের দুধ একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। নিমেষের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে কামরাময়। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এমন অলৌকিক দৃশ্যখানা স্বচক্ষে দেখবার জন্য পুরো কামরা ধনেশ পাখির

চারপাশে ভিড় জমাতে চায়। শুরু হয় ঠেলাঠেলি। ধস্তাধস্তি।

একসময় মূর্তি মুখ থেকে ফিডিং-বোতলখানা সরিয়ে নেয় ধনেশ পাখি। নিজের ডানহাতের ওপর উপুর করে ধরে। চা-চামচের একচামচ মতো দুধ ঝরে পড়ে তার হাতের তেলোতে। দুধটুকু ভক্তি ভরে পান করে ডান হাতখানি মুছে নেয় মাথার চুলে।

জমায়েত বাকরুদ্ধ হয়ে দেখছিল সেই দৃশ্য। আচমকা এগিয়ে যায় কেলো। ঝপ করে হাত পেতে দেয় ধনেশ পাখির সামনে। ঘাড় তুলে লোকটার মুখের ওপর সামান্যক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখে ধনেশ পাখি। কেলোর দৃষ্টিতে ততক্ষণে ফুটে উঠেছে অনুগ্রহ ভিক্ষার আকুতি। ধনেশ পাখির অনুকরণে নিজের বাবরি চুলে হাত মুছে নেয় কেলো।

ব্যাপারটি তৎক্ষণাত সংক্রামক রূপ নেয়। কেলোর দেখাদেখি চারপাশ থেকে হাত পেতে দিতে থাকে অন্যেরাও। একজন দুজন তিনজন...। দেখতে দেখতে পুরো কামরা দুধ-প্রসাদের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। ধনেশ পাখির তিন দিন থেকে ডজন ডজন হাত ভিক্ষা চাওয়ার মুদ্রায় অস্থির।

ধনেশ পাখি হাসে। বড়ো ম্লান, অপ্রস্তুত হাসি। বলে, সামান্য দুধ তোরা এতগুলো মানুষ কী করে বিলি করি, বল্ তো। এমন কথায় অস্থিরতা বেড়ে যায় মানুষগুলোর মধ্যে। গৃহীসুলভ চাতুরি জেগে ওঠে। বাজারে কোনো সামগ্রী আচমকা আক্রা হলে যেমন করে মরিয়া হয়ে ওঠে, তেমনই মরিয়া হয়ে উঠেছে মানুষগুলো। মুহূর্তে ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। চলতে থাকে নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা কাটাকাটি।

ধনেশ পাখি অবোধ শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলতে থাকে, এভাবে নয়। এত রোষ কলহ...। ঠাকুরের প্রসাদকি এভাবে নেয রে? তোরা লাইনে দাঁড়া। বোতলের জন্য ঝগড়া করছিসনে তোরা, ঠাকুরের প্রসাদ নিচ্ছিস।

নীতিজ্ঞানের চাবুক খেযে সামান্য সংযত হয মানুষগুলো। লাইনে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু আগে-পিছে দাঁড়ানো নিয়ে ঘোর বিপত্তি শুরু হয়। দেখেশুনে বীরদর্পে এগিযে আসে কেলো এবং কটা। বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে, দেখি, দেখি সরুন তো, লাইনে ঢুকুন সবাই। তাদের গলায় প্রচ্ছন্ন আদেশ। একে ঠেলে, ওকে সরিয়ে লাইনটাকে কোনও রকমের বানায় ওরা। পেছনের দিকে কি কারণে যেন হল্লা চলছিল। স্বপন ঘোষের দলটা। সম্ভবত লাইনের পেছন থেকে কেউ ঠেলা মেরেছে ওদের। কেলো সজোরে ধমকে ওঠে, অ্যাই, চোপ্। একটিও কথা নয়।

দীপকুমার শর্মার টাইখানা ঠেলাঠেলিতে ঢিলে হযে গিয়েছিল। শক্ত করে নিতে নিতে সেও গলা মেলায়, সাইলেন্স।

ধনেশ পাখি ইতিমধ্যে ঝুলি থেকে বের করে ফেলেছে একটুকরো তুলো। তুলোখানা দুধে ভিজিয়ে নেয়, তারপর টিপেটিপে একফোঁটা দুধ ফেলতে থাকে প্রত্যেকের হাতে চেটোয়।

মুখে অনির্বচনীয় হাসি। প্রসাদ কণিকামাত্র।

একটু একটু করে এগোতে থাকে লাইন। কেলো আর কটা বীরবিক্রমে ম্যানেজ

করতে থাকে সবকিছু।

বৈরাগ্য আর কেশব লাইনে দাঁড়ায়নি। গুম মেরে বসে রয়েছে ওরা। দেখছে, সাহেব-মেমের দল গদ্গদ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইনে। জিন্স্ আর গেঞ্জি পরা বয়কাট রিয়া, শালোয়ার-কুর্তা পরা ববছাঁট কস্তুরী, বারমুডা আর ঢোলা গেঞ্জিতে তোতন, স্টেট সার্ভিসের অফিসারবৃন্দ, একদা নাস্তিক বেণু, আইনের ছাত্র তিলকেশ, এমনকি নীলাদ্রিও বাবার পেছনে। বৈরাগ্য একবার ভাবে, নীলাদ্রিকে ডেকে নেবে। শুনে আঁতকে ওঠে কেশব। খবরদার! পাবলিক এখন মারমুখী।

পবনকুমার শর্মার এক গা গয়না পরা সুন্দরী গৃহিণী ধনেশ পাখির কাছে পৌঁছুলে পর দেখা গেল, তাঁর বাঁ হাতে একখানা ঝকঝকে লোটাভর্তি জল। হাত পেতে দুধটুকু নিয়েই তিনি লোটাখানি এগিয়ে ধরেন ধনেশ পাখির পায়ের দিকে। ধনেশ পাখির মুখখানা উদ্ভাসিত হাসিতে ভরে যায়। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ গলায় বলে, বেটি, তুই বড্ড চালাক। বলতে বলতে ধীরে ধীরে বাঁ পা-খানি নামায় ধনেশ পাখি। বুড়ো আঙুলখানা কচ্ছপের মুণ্ডুর মতো বার কয়েক নাচায়। তারপর আস্তে আস্তে করে ডুবিয়ে দেয় লোটার জলে।

দৃশ্যখানা দেখতে দেখতে লাইনবন্দী মানুষগুলোর চোখে প্রবল ঈর্ষা জমে। কেমন বুদ্ধি করে সংগ্রহ করে নিল চরণামৃত। কারোর মাথাতেই তো আসেনি ব্যাপারটা! কতখানি ধুরন্ধর হলে কাউকে কিছু না জানিয়ে একেবারে নিঃশব্দে কাজ হাশিল করে ফেলতে পারে কিছু মানুষ। লাইনের মধ্যে সহসা চাঞ্চল্য শুরু হয়। কেউ কেউ তাদের লোটা, গেলাস, ওয়াটার বট্‌লগুলো যে যার জাগয়া থেকে নিয়ে আসার জন্য লাইন ভাঙতে চায়। ব্যাপারখানা আঁচ করা মাত্রই গর্জন করে ওঠে কেলো এবং কটা। অ্যাই, খবরদার, একবার লাইন থেকে বেরোলে আর ঢুকতে দেব না। ফলে, সারা মুখে একরাশ আশাভঙ্গের বিষাদ জমিয়ে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে মানুষগুলো।

দেখতে দেখতে কেলো আর কটার অন্তরে সামান্য দয়ার সঞ্চার হয় বুঝি। গলায় অনুগ্রহ বিতরণের সুর এনে বলে, চন্নামিত্ত বিতরণের ব্যবস্থাও পৃথকভাবে করা হবে। আবার লাইন বানান অন্য। সব্বাই পাবেন।

এমন কথায় তখনকার মতো শান্ত হয় মানুষগুলো। লাইন দিতে থাকে।

আচমকা কটা বলে ওঠে, প্রসাদ তো নিচ্ছেন লাইন দিয়ে। চন্নামিত্তও চান। বাবাকে প্রণামী দিতে হবে না? সবকিছু মাগনাতে পেতে চান?

মানুষগুলো বুঝি তৈরি ছিল। কারণ, কটার কথা শেষ না হতেই ডজনখানেক মানিব্যাগে আওয়াজ ওঠে। কেলো চোখের পলকে পকেট থেকে রুমালখানি বের করে পেতে দেয় মিসেস পালধির বার্থের ওপরে। ঝনাঝন পয়সা পড়তে থাকে রুমালে। দুটাকা, পাঁচ টাকাও কিছু কিছু।

ধনেশ পাখির হাতের তুলো মুহূর্তের জন্য থেমে যায়। কেলোর দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। চোখের তারায় দুর্ভবনার মেঘ জমে চকিতের তরে। পরমুহূর্তে হাঁ হাঁ করে ওঠে পাখি, থাম, থাম্। করিস কী তোরা?

পয়সা ফেলতে উদ্যত হাতগুলো থেমে যায়। ধনেশ পাখি সারা মুখে রাজ্যের ঘেন্না জড় করে বলে, কফ-থুতু-সর্দি মোছা রুমাল, প্রণামী দেওয়ার আর জায়গা পেলি নে?

এ প্রণামী মা নেবেন? বলতে বলতে ঝুলিতে হাত পুরে বের করে আনে একখণ্ড লাল কাপড়। ছুঁড়ে দেয় সাকরেদের দিকে। সাকরেদটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোলের ওপর পেতে নেয় কাপড়খানা। পয়সা পড়তে শুরু করে লাল কাপড়ের ওপর।

কেলো আর কটার চোখে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। রোষও উঁকি মারছিল চকিত বিদ্যুতের মতো। ধনেশ পাখি নরম দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে। মোলায়েম গলায় বলে, ওই নোংরা রুমালের পয়সা আর কোন্ কাজে লাগবে! তোরাই রেখে দে। তোরাও তো মায়েরই সন্তান। আলগোছে পয়সাসুদ্ধ রুমালখানা তুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখে কটা। বৈরাগ্যর বুঝতে কোনোই অসুবিধে হয় না, সেয়ানায় সেয়ানায় কিঞ্চিৎ কোলাকুলি হয়ে গেল। এবং এ রাউন্ডেও জিতে গেল ধনেশ পাখি। বৈরাগ্য এতে বুঝতে পারে, কেলো এবং কটা ধনেশ পাখিদের পূর্বপরিচিত নয়। শুধু হঠাৎ এসে যাওয়া একটা মওকার সদ্ব্যবহার করতে চাইছিল ওরা।

কাজকামের মধ্যেও কেলো আর কটা অনেকক্ষণ ধরে আড়চোখে দেখছিল কেশব আর বৈরাগ্যকে একসময় এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। কটা বলে ওঠে আপনারা বসে রয়েছেন যে? প্রসাদ নেবেন না?

নাহ। বৈরাগ্য অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

এর মধ্যে কখন যেন দুঢোক গিলে এসেছে কেলোরা। মুখ থেকে ভকভকিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে। বৈরাগ্যর কথা শুনে ওদের চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। বলে, কেন? নেবেন না কেন?

—আমার এসবে বিশ্বাস নেই।

—কীসবে বিশ্বাস নেই?

—এইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস নেই আমার।

লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা স্পষ্টতই অপমানিত বোধ করেন। কামরা জুড়ে শুরু হয়ে তিক্ত গুঞ্জন। ডাঃ চন্দ্র বলে ওঠেন, দিস ইজ টু মাচ। ইট ইজ অ্যান ইনসাল্ট টু অল অব্ আস।

কেশব বৈরাগ্যর হাতে আলতো চাপ দেয়। খুব নিচু গলায় বলে, আহ্, বৈরাগ্য, চুপ কর্। মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বলে, লাইনখানা একটু পাতলা হলেই দাঁড়াব, দাদা।

বৈরাগ্য দুচোখ আগুন জ্বেলে তাকায় কেশবের দিকে।

কেলো আর কটা এগিয়ে আসে। একেবারে বৈরাগ্যর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কটা সরাসরি বৈরাগ্যর চোখে চোখ রাখে, বুজরুকি কাকে বলছেন? কেলো সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বুজরুকির কী দেখলেন? লাইনের মধ্যে গুঞ্জনটা বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে কেলো-কটার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দীপকুমার শর্মা। আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে সে, পরমান্ করতে পারবেন, এটা বুজরুকি? ক্যান য়্যু প্রুভ ইট?

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বৈরাগ্যকে মনে মনে স্বীকার করতে হয়, দীপকুমারের ইংরেজি উচ্চারণটা ভালো বেশ ভালো।

দীপকুমারের চিৎকারকে তিলমাত্র পাত্তা না দিয়ে কটা ঝানু উকিলের ভঙ্গিতে তর্জনী তাক করে বৈরাগ্যর দিকে বলে, আপনি না হয় নাস্তিক, ঠাকুর-দ্যাবতা নিয়ে বিলা করেন, নিজের বাপকেও স্বীকার করেন না, কিন্তু এতগুলো মানুষের বিশ্বাসকে

বুজরুকি বলেন কোন সাহসে ?

—রাইট। কামরার সমস্ত মানুষকে ইনসাল্ট করবার অধিকার আপনার নেই।—আপনিই কেবল সবজান্তা ? বাকিরা সব বুরবক ?— নিজেকে কী ভাবেন আপনি, অ্যাঁ ? চারপাশ থেকে কটুমন্তব্য অবিরাম ঝরে পড়তে থাকে শিলাবৃষ্টির মতো। এমন কি নালীদ্রিও বলে ওঠে, সত্যি আংকল্, এটা তোমার খুব অন্যায়। তখন থেকে সবাইয়ের সব অ্যাক্টিভিটিকেই তুমি ইনসাল্ট করছ।

সহসা পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল। চেঁচানির চোটে তাঁর অধ্যাপক-সুলভ ভরটা গলা আচমকা ভেঙে যায়। বলেন, আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন যে এভরিবডি হ্যাজ আ রাইট। আপনি বার-বার অব্লিক রেফারেন্স দিয়ে মানুষের বিশ্বাসের অধিকার খর্ব করতে চাইছেন।

কেলো-কটাকে দুহাতে সরিয়ে বৈরাগ্যর একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় দীপকুমার। কোমরে দুহাত রাখে মারমুখী হিরোর ভঙ্গিতে। অত্যন্ত কর্কশ গলায় বলে, আপনি উইথ্ড্র করছেন কিনা ?

কেশব আবার বৈরাগ্যর বাঁ হাতে মৃদু চাপ দেয়। ফিসফিস করে বলে, উইথ্ড্র করেনে। গোঁয়ার্তুমি করিসনে। তুই দেখছি আমাকেও বিপদে ফেলবি।

কেলো আর কটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বৈরাগ্যর দিকে। ওদের চোখগুলো দপদপিয়ে জ্বলছিল। সহসা কেলো বলে ওঠে, সালাকে জোর করে প্রসাদ খাওয়াব। খাবে না মানে ? ইয়ার্কি ! সারা কামরা জুড়ো হো হো গোছের শব্দ ওঠে। যেন ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে যায় কেলোর প্রস্তাবটা।

এমনই সময়ে উঠে দাঁড়ায় কেশব। কেলোর দিকে তাকিয়ে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ হাসে। বলে, আসছি। বাথরুম। বৈরাগ্য সহসা ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। চারপাশ থেকে ডজনখানেক জ্বলন্ত চোখ তার সারা মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। চারপাশ থেকে ধেয়ে আসছে তীক্ষ্ণ চোরামন্তব্য। দীপকুমার পুনরায় চেঁচিয়ে ওঠে, কী আশ্চর্য, এখনও কোথাটা উইথ্ড্র করলেন না আপনি ?

বৈরাগ্য খুব সংযত গলায় জবাব দেয়, আপনারা বিশ্বাস করছেন, করুন। আমি যদি না করি, তাতে কী-ই আসে যায় ?

— আসে যায়। ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল, আপনি একা না বিশ্বাস করলে, ব্যাপারটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে, সারা কামরার মানুষের খুবই এসে যায়। আপনার এই গোঁয়ার্তুমিতে যদি উনি রুষ্ট হন, তো যে কোনো মুহূর্তে কিছু একটা ঘটিয়ে দিতে পারেন। যতটুকু দেখলাম, ওঁর সে ক্ষমতা রয়েছে।

—তখন সামলাবে কে ?—আপনি ?

কথাটা মুহূর্তের মধ্যে সংক্রামিত হয় পুরো কামরায়। একের পাপে প্রায় সবাই ধ্বংস হতে বসেছে, এমনই একটা অনুভূতি অতি দ্রুত গ্রাস করে ফেলে সবাইকে। ভয় মানুষকে হিংস্র করে তোলে। সারা কামরার প্রতিটি নিরীহ মুখেও এই মুহূর্তে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ আর রোষ দেখতে পায় বৈরাগ্য। মানুষগুলো একটু একটু করে হিংস্র হয়ে উঠছে।

পেছন থেকে স্বপন ঘোষ বলে ওঠেন, আপনি দাদা সত্যি সত্যি হিন্দু তো?

—হিন্দু! হিন্দু হলে এমন কথা বলে?

—দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে কত মোল্লা ইদানীং ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তাঘাটে।

—অত কথায় কাজ কী? প্যান্ট খুলে দেখে নে না।

বৈরাগ্য স্পষ্টতই বিপন্ন বোধ করে। পুরো ব্যাপারখানা ক্রমে ক্রমে জটিল রূপ নিচ্ছে। কেশবকেও আর দেখতে পাচ্ছে না। হতে পারে বাথরুমেই ঢুকে পড়েছে সে। হতে পারে অন্য কোনো খোপে গিয়ে বসে রয়েছে। লাইনেও দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। এখান থেকে লাইনের শেষপ্রান্ত অবধি নজর যায় না বৈরাগ্যর। অকস্মাৎ সে লক্ষ করে, গিয়াসুদ্দিনসাহেব এবং তাঁর স্ত্রী, যাঁরা এতক্ষণ একজোড়া পাথরের মতো নিশ্চল বসেছিলেন নিজেদের সিটে, সন্তর্পণে চলে যাচ্ছেন ভেস্টিবিউল পেরিয়ে, অন্য কামররার দিকে।

মানুষগুলোর গনগনে চোখ বৈরাগ্যকে দগ্ধ করছিল অবিরাম। ওদের মুখের প্রতিটি রেখা, ঠোঁট, চিবুক, চোয়াল, ভেঙেচুরে, বেঁকে-দুমড়ে যাচ্ছিল তীব্র অসূয়ায়। বৈরাগ্যর ভয় এসেছিল। এতগুলি শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, পরিচিত মানুষের মধ্যে থেকেও নিজেকে নিদারুণ নিঃসঙ্গ, অসহায় লাগলছিল। পুরো কামরাখানি যেন এই মুহূর্তে এক শত্রুপুরী। যেন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য। যেন সারা কামরা জুড়ে আদিমযুগের বন্ধ, গুমোট বাতাস, অর্ধভুক্ত লাশের পচা গন্ধ। যেন ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে জ্ঞানবোধহীন একদল নখদন্ত সম্পন্ন মনুষ্যেতর জীবন। একদল বিষধর সাপ যেন ফণা তুলে দংশনোদ্যত দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে...।

ধনেশ পাখি মিটিমিটি হাসছিল। তামাশা দেখবার হাসি। পা দুটো আস্তে আস্তে একটা নির্দিষ্ট লয়ে নাচাচ্ছিল। বৈরাগ্যর মনে হয়, এই মুহূর্তে পুরো কামরাখানি লোকটার পুরোপুরি দখলে। একেবারে মুঠোর মধ্যে। লোকটা যদি এই মুহূর্তে বলে ওঠে, এই ছোকরাটা বড়োই নাস্তিক। ঈশ্বর বিরোধী। মা-কালী ওর রক্ত চান। কে এনে দিবি, ওর রক্ত? বৈরাগ্যর কোনোই সন্দেহ নেই, এই সুট-কোট পরা শিক্ষিত আধুনিক মানুষগুলোই মুহূর্তের মধ্যে উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ও শরীরখানা।

বৈরাগ্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। মুক্তির উপায় খুঁজছিল। মুসলমান-দম্পতির মতো সেও ভেস্টিবিউল পার হয়ে চলে যেতে চাইছিল পাশের কামরায়। কিন্তু কোনো উপায়ই নেই। উন্মত্ত মানুষগুলো তাকে ঘিরে রয়েছে চারপাশ থেকে। ওদের চোখের আগুন গনগনে হচ্ছে ক্রমশ। বৈরাগ্যর চারপাশে ওদের লৌহ বেষ্টনী আরও মজবুত হচ্ছে...।

রাতখানা ক্রমশ গভীর হচ্ছে। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। স্টেশন আসতে এখনও অনেক দেরি। □

নতুন ব্রতকথা

ঝ ড়ে শ্ব র চ ট্টো পা ধ্যা য়

পনের বিঘা ভূমিভাগে মস্তপুকুর। দৈর্ঘে প্রস্থে প্রায় চৌদিকে সমান। এখন চৈত্র শেষের পৃথিবী। চাষের মাঠ বাগানের মাটি পঞ্চায়েতের পাতা ইঁটের রাস্তাটাও শুকিয়ে খটখটে। ফাঁকা রোদ্দুরে পঞ্চায়েতের ইট বেয়ে গনগনে ঝিল্লি রেখা।

মস্ত পুকুরটার চওড়া পাড়। বালি মাটির গায়ে ঘাস গজিয়ে ভীষণ সবুজ। সান বাঁধানো পাকা ঘাট সংলগ্ন বড়ো চাতালের পরেই তো মন্দিরটা। মন্দির-শীর্ষে লোহার ত্রিশূল। ত্রিশূলের ডগ বেয়ে রোদের তাপ আবার রোদে ফিরে যায়, ফিরে যায় তো মাঝ বয়েসি ফরসা উর্মিলা মুখুজ্জে সেই গল্পে। তাকে ঘিরে ভক্তিমতী মেয়ে বউরা কোলে বাচ্চা নিয়ে বসে। একদম গাঁয়ের কাছে ছোটোবেলায় খেলনাপাতির বান্ধবী রাবেয়া এখন বউ হয়ে রাবেয়া বিবি। বাচ্চা কোলে বউটা মন্দির দাওয়ার দুর্বো বাছতে বাছতে বলে, বামুনদিদি—

—বলো গো মেয়ে?

মা দুর্গার শখ হয়েছে শাঁখা পরবে। তা পোটলায় শাঁখা বাঁধা শাঁখা-ব্যাপারিকে ডেকে কী বলল মা দুর্গা?

গোল ফরসা মুখ। গায়ে মাসে খানিক ভারী বুক কোমর উর্মিলার। সামনে পুকুরের জল বেয়ে তো মাঝে মাঝে হাওয়া। হাওযার আশায় গায়ের আঁচল একটু আলগা দেয়। চারদিকে গরম ঝাঁঝ। আঁচলের খুঁটে মুখের ঘাম মুছে আঙুলের দিশায় বলে, পুকুরের ওপাশে রাস্তায় লাল কাপড়ে কপালে সিঁদুর টিপ পরে মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। শাঁখা ব্যাপারির খালি পায়ে সাত দেশের ধুলো। তখন তো রাস্তাঘাট পাকা হয়নি। গাড়ি ট্যাক্সি জন্মায়নি। তা মেয়েছেলেকে রাস্তায় অমন জড়োসড়ো দেখে ব্যাপারি শুধোয়, কি গো মা? শাঁখা নিবি?

— হুঁ। তুমি দেবে ব্যাপারি?

— কেন দুবুনি মা? সে পাড়ার কত বউরা নিলো। পরলো...

— তবে দাও, বলে ডান হাতটা বাড়ায় মা আমার। ব্যাপারি কাঁধের পুটুলি সাবধানে নামায়। তার মধ্যে হরেক মাপের শাঁখা গোছানো। তবুও যেন সুমুদ্দুরের তলায় শত শত জীবন্ত শঙ্খ গিজ গিজ বেয়ে যাওয়া শব্দ পুটুলির ভিতর...

সব বউ মেয়েদের সঙ্গে ছোটোবেলার খেলার সাথী রাবেয়াও মন দিয়ে শোনে। বিধবা উর্মিলার দু-চোখে ঘোর। ফরসা মুখের লালচে আভায় আকো। উর্মিলা একটু দম নিয়ে আবার গল্পের খুঁট ধরে, ...সারা পথ হেঁটে ব্যাপারি ঘেমে নেয় যাচ্ছে। কাঁধের গামছায় চোখ-মুখ মুছে একটু ছায়া খোঁজে। গাছতলায় বসতে গিয়ে শাঁখা-ব্যাপারির

লজ্জা, পর ঘরের অচেনা বউ...! তবু গাছতলায় বসে শাঁখা পরলো আমাদের মা। দু-হাতে ফরসা কবজি জুড়ে শাঁখা...। কি খুশি মুখ আমাদের মায়ের। দু-হাত জোড় করে ভূমি ছুঁয়ে প্রণাম জানায় ব্যাপারিকে। তারপর মায়ের অমন ফরসা মুখে কালি!

ব্যাপারি বলে, কি গো মা শাঁখা পরাতে হাতে লেগেছে?

— না

— তবে?

মাথা নীচু করে মা দুর্গা, আমার কাছে তো এখন পয়সা নেই। তুমি আমার বাপের কাছ থেকে নেবে গো ব্যাপারি?

— হুঁ। তোমার বাপ কোথায় মা?

এবার মা আমাদের হাসি মুখে খুব ফুটফুটে। ব্যাপারিকে বলে, এই গাঁ-গেরাম ফেলে পর পর পাঁচখানা গ্রাম ছাড়বে। বড়ো মাঠ খুব বড়ো দিঘি পাশ কাটিয়ে প্রথম গেরামটা আমার বাপের। বলবে গিয়ে, সাত পোতায় আদি গাঙ পাড়ে বামুনদের বাড়ির বউ তোমার মেয়ে, শাঁখা পরেছে। শাঁখা জোড়ার দাম দাও গো বামুনবাবু?

রাবেয়ার নকে রূপোর নথ। দু-কব্জি ভরতি কাঁচের চুড়ি। চোখে ক-দিন আগে সুর্মার বাসি দাগ। রঙিন শাড়িতে বেশ দেখতে। অল্প বয়সে তিন-চারটে ছেলে মেয়ে বিইয়ে রাবেয়া এখন ঝাড়া হাত পা। ডাগর ডাগর ছেলেমেয়েরা মামার ঘরে খাচ্ছে। ঘুমুচ্ছে। কতদিন পর যে বাপের দেশে ছোটোবেলার সখির গায়ের কাছে! অবাক হয়ে চুড়ি ভরতি হাতটা নিজের গালে রাখে। মুহূর্তে চুড়িগুলোর রিন্‌ঝিন্‌ বাজনা। নিজের হাঁটুর উপর ঠেকানো। বিস্ময়ে বলে, তারপর কি রে উর্মি?

টিয়ারঙের শাড়ি ব্লাউজ গায়ে বউটা রাবেয়ার দিকে তাকায়। কালো রংয়ের বউটার কপালে টকটকে সিঁদুর বড্ড জ্বলে। বছর বছর সন্তান ধারণ করে কিন্তু প্রসবের আগে থেকেই মৃত। এ ব্যথায় যে বউটার বুক পুড়ে যায়। ব্যর্থতায় মুখ আঁধার শ্বশুর ঘরে! তাই বামুনদিদির দোয়া মাঙতে এসেছে এই মন্দিরে। তার মনের কথাটা বলবে, সে ফুরসত পাচ্ছে কই টিয়ারংয়ের শাড়ি? তাই রাবেয়ার আগ্রহে বিরক্ত টিয়ারংয়ের শাড়ি গায়ে বউ বলে, বামুনদিদি—

— কিরে মা?

— দিদি আমার যে বড্ড কষ্ট...

— আমার মা... মা দুর্গাকে ডাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাশে ভক্তিমতী অন্য বউরা কোলের বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়েছে ফাঁকা দাওয়ায়। মন্দির ঘিরে পাকা ছাদ চারপাশে। এই চড়া রোদে মাঝে মাঝে হাওয়া বড় পুকুরটার জল ছুঁয়ে এক ঝলক শীতলতা আনে। সে হাওয়ায় মেয়েদের বাচ্চাদের দেহে খানি শুশ্রূষা। আরও বয়ে যায় পাশের টুকরো মাঠ পার হয়ে করমচা বাগানে। ডালপালার কাঁটার খাঁজে খাঁজে লাল করমচা দোলে।

একেবারে দুলে ওঠে রাবেয়া, কী বললি উর্মি? শাঁখা ব্যাপারি খুঁজে খুঁজে বার করলো বাপকে...।

না তো কি? বাপ তো তখন ভাত খেয়ে সবে আঁচাচ্ছে কাঁসার ঘটির জলে। শাঁখারির

কাছে বৃত্তান্ত শুনে বামুন মানুষ তো অবাক! আমার মেয়ে... ! আমার তো কোনও মেয়ে ওদিকে নেই গো ব্যাপারির পো... ?

শাঁখা ব্যাপারি একটু রুষ্ট স্বরে বলে, তাই হয় গো বামুনবাবু? একেব্বারে দুর্গা প্রতিমার মতো মুখ চোখ কপাল ভরতি সিঁদুর টিপ। দেবী প্রতিমার মতো হাতের গড়ন... ! সে মেয়ে মিছে কইতে জানে না। মিথ্যা বাক্য সে মুখ দিয়ে গড়াবে নি... ! কোন দেবী অংশে জন্ম যে সে মেয়ের...

শাঁখারির এমন উপলব্ধিতে চমকে ওঠে বামুন মানুষ। তাড়াতাড়ি গায়ে ফতুয়াটা চাপিয়ে কাঁধে গামছাসহ হাঁটতে থাকে বামুন মশাই, তার সঙ্গে শাঁখা ব্যাপারি। গ্রাম্যপথ মাঠ-ঘাট পার হয়ে যখন আবার মানুষের বসবাসের মধ্যে ফেরে, শাঁখারির পায়ের গতি শ্লথ। এত মানুষ... মানুষের মধ্যে কত তরুণী বউ মধ্য বয়েসী আর বৃদ্ধা ত্রয়োস্ত্রীরা যে তার খদ্দের। তার পণ্যের বাজার... !

বামুন মশাই ঝোঁকের মাথায় অনেক পথ হেঁটে এক ঝলক পাশে তাকায়। শাঁখারি নেই। বামুন চেঁচায়, কই গো যাবে নি ?

শাঁখা ব্যাপারি পা ফেলে।

বামুন মানুষ চেঁচায়। কোন গায়ে গো ? চলো।

হাঁটতে হাঁটতে দুই মানুষে পৌঁছয়। বামুন পুকুর পাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, কই বাবা ব্যাপারি, কোথায় গো ?

সেই গাছতলা ফাঁকা পুকুরপাড় দেখিয়ে ব্যাপারি বলে, এই— এই-ইখানে গো বাবু।

— হুম। কিন্তু সেই মেয়ে কই গো ? কোথায় ? কোন বাড়ির বউ ?

— আজ্ঞে তা জানি নি

— সে কি! এখানের মানুষের বসবাস... গৃহ কই ?

শাঁখা-ব্যাপারি বড্ড আতান্তরে। বামুন মানুষ চাপ দেয়, কোন বাড়ির বউ সে মেয়ে গো ?

বেকুব শাঁখারি বলে, তাই তো ঘর বাড়ি দেখিনি। সেই মেয়েকে দেখেছি... ! সেই মেয়ে এ পুকুর পাড় ধরে হেঁটেছে। নেমেছে... নামতে... নামতে..., যখন পিছনে ফিরি, আর চোখে পড়েনি...।

ব্রাহ্মণ মানুষটি শাঁখা ব্যাপারির কথায় থই না পেয়ে উপরে তাকায়। নানা মেঘের সমাবেশে আকাশ। তার উপর মহাকাশ। ডাইনে বামে ঝোপ জঙ্গল। আম কাঁঠাল পেয়ারার গাছগাছালি। পাশ দিয়ে পায়ে পায়ে সরু মেটে পথ এঁকে বেঁকে উধাও। সম্মুখে শুধু পুকুরটা গভীর! গম্ভীর!

শাঁখা-ব্যাপারি মানুষটার বিশ্বাসে খানিক চিড়। তাই পাড়ের মাটি... মাটিতে সবুজঘাস দেখে। সেই ঘাসে পদপেষণের দাগ...। নিজে আর একটু এগিয়ে যায়। কচি লতা পাতার গা থেঁতলে ক্রমে ক্রমে পদযুগলের দাগগুলো জলের রেখায় ফুরিয়ে গেছে!

ব্রাহ্মণ মানুষটি ধীরে ধীরে জলের কাছে নামে। জোড়হাতে জল...জলাশয়ে অন্তরীণ প্রাণের উদ্দেশে বলে, কে আছ মা... জননী ? আমার কন্যা... আমি আমার নামীয় দেনা ব্যাপারিকে শোধ দিলাম। একবার... একবার মা আমায় দেখা দাও...

... তখন পুষ্করিণীর জল দোলে। মধ্য জলাশয়ে ছোট্ট তরঙ্গঘূর্ণি। ধীরে ধীরে জল চলকে একটা সুগঠিত দক্ষিণ হস্ত। নিখুঁত করাধার... নিটোল অঙ্গুলি পল্লব...! সুসম মনিবন্ধ জুড়ে ধবধবে শঙ্খবলয়।

ব্রাহ্মণ করজোড়ে প্রার্থনা জানায়, একবার মা আমার তোমাকে দেখি... দেখা দে-এ মা-আ-দুর্গা-আ।

ধীরে ধীরে পুষ্করিণী জলের মতো থির হয়। থামে না শুধু ব্রাহ্মণের আঁখি কুণ্ডের জল। সে জল ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর মধ্যে... দুর্গা কুণ্ডে মিশে যায়।

রাত বাড়ে। ঝোপ-জঙ্গালের শ্বাপদ জন্তুরা পুষ্করিণীর পাড় ঘিরে দাঁড়িয়ে। প্রভাত হয়। ব্রাহ্মণের কান্না থামে না। দুর্গাকুণ্ডের জল কাঁপে। ব্রাহ্মণ হাপুস নয়নে জলে ঝাঁপায়। ডুব দিয়ে দু-হাতে মাটি আঁকড়ায়। কত শত বছরের পুষ্করিণী। প্রবাহিত নদীপথ সভ্যতা হেজে মজে মানুষের সমাজ বসবাস মুছে গেছে কতবার...! ব্রাহ্মণের হাতে হঠাৎ শক্ত পাথরের দেহ! আঁচড়ে আঁকড়ে তুলতেই তো ওই কষ্টি পাথরেব দুর্গামূর্তি...।

উর্মিলা ডান হাতটা ঘুরিয়ে মন্দির গর্ভ দেখায়। সেখানে পাথর ক্ষোদিত দুর্গামূর্তি। তেল সিঁদুরে রঞ্জিত। উর্মিলা আরও শোনায ভক্তবৃন্দকে, সেই থেকে এই পুকুর দুর্গাকুণ্ড গো ...

তের-চোদ্দ বছরের রাবেয়া সাদী হয়ে ভিন বাড়ি। তিন চারটে ছেলে মেয়ের পর— কত বচ্ছর যে দেখতে পায়নি উর্মিলাকে। ষোলো-সতেরো বছবে পড়তে না পড়তেই উর্মিলার বিয়ে হল। দু-ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। হঠাৎ কাবখানায় গুলি গালাজ। স্বামী খতম। বিধবা উর্মিলা দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি। মা বুড়িটা ওপাশের ঘরে শুযে রোগে গোঙায়। উর্মিলা মন্দির সামলায। সামলাক। কিন্তু বাবেযা চুপচাপ তাকিযে ভাবে, আমাদের সেই উর্মি...! প্রাইমারি ইশকুলে পড়া পারতোনি। সে এমন ব্রতকথার মতো ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প কইতে শিখলো কেমন করে...?

রাবেয়ার সমীহপূর্ণ দৃষ্টিতে উর্মিলার বুকে প্রশ্ন ধাক্কা মাবে। উর্মিলা জানতে চায, রাবেয়া কিছু বলবি?

রাবেয়া কোনও উত্তর করে না। শুধু মাথা নেড়ে অস্ফুটে সব বলে দেয়।

টিযারঙ শাড়ি ব্লাউজ আবার বলে, দিদি—

— উঁ?

— আমার পেট যে বড্ড পাপী অক্কা গো...

— কবার রে বোন?

দুবার গো দিদি, বড্ড কষ্ট বাজে টিয়ারংযের শাড়ির কণ্ঠে। লজ্জার ভার সংসারে বউ হিসেবে।

— মাত্র দু-বার? সাত... সাতবার এমন দশায় পড়ে ডাক্তার বদ্যি করেও আমার মায়ের কাছে জীবন ভিক্ষা নিয়ে গেছে গো মেয়ে? সে এখন তিন ছেলে মেয়ের মা হয়ে বুড়ি।

— তাই...! টিয়ারং শাড়ি আশ্বস্ত হয়। উর্মিলা সাগ্রহে বলে, আমার দুর্গা মা আরও আরও পারতো গো মেয়েছেলে। এই যে পুকুর কষ্টি পাথরের দুর্গা মা পাওয়ার পর

দেশসুদ্ধ মানুষজন বলতে লাগলো তো 'দুর্গাকুণ্ড'। কত রোগ ব্যাধি... বলতে কি মরা মানুষের গায়ে এই কুণ্ডের জলছড়া দিলেই সেই মৃত মানুষ জীবন পেত গো...। এমন মাহাত্ম্য ছিল দুর্গাকুণ্ডুর জলে।

— তাই...! তাইরে উর্মি...

— অবশ্যই, বেশ দৃঢ়তা উর্মির স্বরে।

— মরা মানুষ জীবন্ত...! কিন্তু দুর্গা কুণ্ডুর জলের সে তেজ কোথায় চলে গেল গো... জানতে চায় রাবেয়া। টিয়ারং শাড়ি আপশোস করে, ইস কবছর আগেও যদি দুর্গাকুণ্ডুর নাম শুনতুম গো... তাহলে দিদিটা কি বিধবা হত গো? পরক্ষণে উর্মিলার গা গতর সাদা থানে বৈধব্য দেখে আচমকা বোবা টিয়ারঙ শাড়ি। বিড়বিড় করে, তাহলে... নিজের স্বামীকে বাঁচাতে পারলে নি কেন বামুনদিদিটা?

শুধু তো প্রশ্ন নয়, সবিস্ময় চাহনি উর্মিলাকে বিব্রত করে। মানুষের মুখের ভাষা থেকেও কত জোরালো যে চোখের বাক্য। তাই তাড়াতাড়ি ভক্তিমতী শ্রোতাদের বলে, সেও এক বৃত্তান্ত গো মেয়েরা—

— কী রকম? হঠাৎ প্রশ্ন করে রাবেয়া।

— সেজন্যে তো তোদের গাজী... গাজী সাহেব দায়ী গো...

অভিযোগটার খুঁটিনাটি না জেনেই রাবেয়া বলে, কি সে কাণ্ড?

পাশেই পনেরো বিঘে ভূমি ক্রমা খনিত হতে হতে মাটির গভীরে তো জলাধার প্রায় আট-ন বিঘে পরিমাণ। এখন মাঝবেলার সূর্য জ্বলছে দুর্গাকুণ্ডের জল তরঙ্গের খাঁজে খাঁজে আগুনের হলকা কেটে। দুর্গাকুণ্ডের উপর নজর বুলিয়ে উর্মিলার স্মৃতি চলে যায় রোগার্ত মায়ের মুখের দিকে। যখন মা সুস্থ ছিল, দিন রাত কত কথা যে বলতো কষ্টি পাথরের মা দুর্গাকে নিয়ে.. দুর্গাকুণ্ড নিয়ে...। বাবাটা... বাবার ঠাকুর্দার মুখের কাহিনী শোনাতো যে হাত নেড়ে... মুখ নেড়ে...!

উর্মিলা সেই বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে করতে গিয়ে আঁকুপাকু হাতড়ায় নিজের মধ্যে। অনেকক্ষণ শ্রোতারা উর্মিলার দিকে ঠায় চেয়ে। একটু উশপাশে তারা নড়ে-চড়ে। কিন্তু জুতসই ধরতাই না পেলে যে কাহিনীটা এগোতে চায় না। যেহেতু মানুষকে ঘিরে দেবতা আর পীরের গল্প, গল্পের খুঁটি পাকড়াতে উর্মিলা ওত পাতে। একটু চুপচাপ থেকে সময়কে বয়ে যেতে দেয়। নজর রাখে চারপাশের প্রবহমানতার দিকে। এই মহাবিশ্বের সময়কে তো হাতে ধরা যায় না। টের পাওয়া যায়। সেই পরম মুহূর্তটিকে যে কীভাবে বাছাই করা যায়!

এক বুড়ো ফলবাগানি হাতের ব্যাগে ফুল দুর্বো কাঁচা দুধ একখানা মুখ আঁটা কাঁচের বয়াম এনেছে। মন্দিরের দাওয়ায় পুজোর উপাচারগুলো রেখে বড্ড অভিমান জানায় মা দুর্গাকে, মা গো কত মেটাসিড ওষুধ বিশুধ গাছের গায়ে দিলুম। তবু ফল ধরে আর ঝরে ঝরে নীচে পড়ে যায়। বড় হতে দেয় না গো... কী মহাব্যাধি যে বাগানে ধরেছে...

— তাই! আচ্ছা মাকে জানাও। গাছগুলোকে ভালো করে সেবা শুশ্রূষা করো।

— দেখি মায়ের জল চরণামৃত নিয়ে বাগানে যাই...

বাগানীর বিশ্বাসের কথা কানে লাগতেই তো উর্মিলা নড়ে বসে। মন্দির... দুর্গাকুণ্ডের

মাহাত্ম্য... অতীত মুখে মুখে না শোনাতে পারলে যে প্রচার বাড়ে না। প্রচার না থাকলে ভক্তজন জুটবে না। তাই গলার স্বর ফোটায় ঊর্মিলা, ...সে অনেককাল আগে গো মেয়েরা মায়েরা...

ভক্তিমতী মেয়েদের সঙ্গে সদ্য উপস্থিত বাগানীও শুনতে আগ্রহী, হাঁ মা ... তারপর...

... ওই ওপাশের একখানা গ্রাম পরে গাজী সাহেবের বাস। তার কত সৈন্যসামন্ত ছিল। কত ওষুধ টোটকা জানতো সে মানুষ। কত রোগী ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ যেত তার কাছে। রোগ ব্যাধি মুক্ত হতে...

আমাদের দুর্গা মায়ের কাছে কত লোক আসে। এই দুর্গাকুণ্ডের জল ছড়া দেয় মাথায়। কোষ কোষ করে খায়। রোগমুক্ত হয় মানুষ। আলাদা জলে চান করে গায়ে মাথায় জল ছিটোয়। কত আধি ব্যাধি মুক্ত হয়ে যে মানুষ সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করতো! মানুষের মুখে মুখে দুর্গা মায়ের নাম। মনে হলেই জোড়হস্তে প্রণাম জানায় দেশের মানুষ।

কে কার যে সুনাম সুখ্যাতি সহ্য করতে পারতোনি? নাকি ভক্তজন বা ভক্তজনের চাল-ডাল-প্রণামী মানে ভক্তখদ্দেরের বাজার দখল নিয়ে লড়াই নাকি কে জানে? প্রায়ই গাজী সাহেবের সৈন্যদের সঙ্গে মা দুর্গার সৈন্যদের যুদ্ধ হত। গাজী সাহেব হেরে যেত। মা দুর্গার সুনাম ইজ্জত ছড়িয়ে পড়তো মানুষের মুখে মুখে। পাখিদের ঠোঁটে ঠোঁটে। এই দুর্গাকুণ্ডের জলে মানুষের রোগ সারতো— মরা মানুষ বেঁচে উঠতো। পিল পিল করে মানুষের ভিড় জমতো।

গাজী সাহেবের সহ্য হলনি। নাকি তার সৈন্যদের সহ্য হলনি? কে জানে? এক রাতে গাজী সাহেবের সৈন্যরা সানন্দে গোমাংস কাটল। কোন প্যাজি লোক যে সেই রক্তমাখা ছুরিটা লুকিয়ে এই দুর্গাকুণ্ডের জলে ধুয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডের সব জল লাল!

তারপর... ? জানতে চায় ভক্তজনেরা।

ঊর্মিলা বড়ো করে শ্বাস ফেলে, পুকুরের জল বে-পাক। অপবিত্র হয়ে গেল। কত দূর দূরান্তের থেকে মরা মানুষ নিয়ে আসে স্বজন আত্মজনেরা। মৃতের দেহে দুর্গাকুণ্ডের জল ছিটোয়। মৃত মানুষ জীবন ফেরত পায় না আর...

— হায় হায় মা দুর্গা গো! কী সম্পদ যে হারিয়ে গেল..., উপস্থিত ভক্তজনেরা সমস্বরে কেঁদে ওঠে।

রাবেয়ার কৌতূহলী মুখ শুকিয়ে ছোট। দু-চোখ ঘিরে প্রবল লজ্জা। ধীরে ধীরে ওঠে। মন্দির-দাওয়া ছেড়ে নামে। বড়ো আঁচলে গা ঢেকে ব্রীড়াময়ী পদক্ষেপ।

ঊর্মিলা বলে, রাবেয়া একটু বোস গো বোন—

— নারে বাপের দোরে যাই।

— না কেনরে ভাই? আমার বড়োছেলেটা এসে গেছে: সেই তো পূজারী। পুজোটা হোক, বাচ্চাদের জন্য একটু ফল প্রসাদ নে যাবি।

— উম্..., দ্বিধায় সাড়া দেয়। পরাজিত সে কণ্ঠস্বর।

— নাহ। ঘর যাই।

— তবে ও বেলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবি ?

রাবেয়া হাসে। ফরসা মুখে বয়সের দাগ। দাঁতে পানের কষ। হাসলেও প্রাণ জাগে না।

উর্মিলার মনে হল গাজী সাহেব আর মা দুর্গার গল্পে রাবেয়া কষ্ট পেয়েছে। কেন যে মুখে মুখে এমন জয় পরাজয়ের গল্প চলে আসছে! আবার রক্ত-মাখা ছুরি ধোওয়ার গোপনপর্ব... !

রাবেয়া বাম হাতটা দোল মেরে এগোয়। তখনই উর্মিলা খপ্ করে নাগালে পায়, আমি ফল মিষ্টি রাখবো। আসিস গো ছেলেদের নিয়ে। ঘাড়টা নাড়িয়ে সহমত জানা রাবেয়া।

সে বিকেলে সূর্য ডোবে। দুর্গাকুণ্ডুর জলে আঁধার নামে। রাবেয়া আসে না।

পরদিন প্রভাত হয়। চারদিকে প্রখর রোদ। দু-চারজন ভক্ত মানুষ মানতকারীরা পুজো দেয়। রাবেয়া দুর্গাকুণ্ডের চৌসীমানা মাড়ায় না।

আজ মধ্যদুপুর। সূর্য দুর্গাকুণ্ডের জলের মধ্যে। হাজার রূপোলি তরঙ্গের আঁকিবুকিতে ভরতি। পুকুর ঝলকাতেই উর্মিলার নতুন আলো। সম্মুখের দাওয়ায় দশবারোজন ভক্ত মানুষ। দুর্গা মায়ের অনুগ্রহ প্রার্থী। তাদের সামনে উর্মিলা মুখুজ্জে ব্রত কথা শোনায়।... ! কাহিনি বেশ তুঙ্গো...। হঠাৎ মনে হল ব্রতকথক উর্মিলার,... মাহাত্ম্য বর্ণনার শেষটায় দেবতার এত আত্মম্ভরিতা কেন... ? এটা মানুষের নীচতার গল্প হয়ে যাচ্ছে যে... !

কদিন পর নতুন নতুন মায়েরা মেয়েরা ভক্তজনেরা হাজির। তারা সাগ্রহে বলে, দিদি —তারপর... ? বার-বার তো যুদ্ধ হয় মায়েতে আর গাজীতে... তা হবে না গো ? বৃত্তান্ত অনেকখানি বর্ণনা দিয়ে একটু নাড়ি বোঝে। তারপর নতুন পর্ব সংযোজনের আগে উর্মিলা বলে, বড়লোক গরিব লোকে গোল বাধে। বড়োলোকে... বড়ো মানুষে বড়ো মানুষে তো বড্ড বাধে গো...

ভক্তজনের মধ্যে মুরুব্বিটা মাথা দেলায়, হুঁ তা বটে।

ভক্তজনেরা শ্রবণোন্মুখ। উর্মিলা নতুন গল্প গাঁথে,... তারপর গাজী সাহেবের পক্ষের মন্ত্রী এলো। দুর্গা মায়ের পক্ষে সেনাপতি গেল। তারা আলাপ আলোচনায় ঠিক করলো, গাজী সাহেব তুমি ওদিকে দরগা বানাও, বাগান গড়ে বাদশাহী আমেজে থাকো—। যে ভক্তজনের মন টানবে সে যাবে—

দূত গেল গাজী সাহেবের কাছে। খবর এল, উত্তম প্রস্তাব।

মা দুর্গার সেনাপতি বললো, মা তুমি মন্দির-পুষ্করিণী-কুণ্ড নিয়ে এপাশে হাওয়া বাতাসে থাকো।

মা দুর্গা বলে, বেশ। তাতে সকলার শান্তি তো ? অস্ত্রশস্ত্র সব আদিগাঙের পাঁকে পুতে অকেজো করে দাও।

ভক্তজনেদের মধ্যে এক বুড়ি বলে, হ্যাঁ। তাই ভালো। যুদ্ধ মানে রক্তারক্তি। মানুষের জীবনহানি...

উর্মিলা নতুন ব্রতকথা রচনা করে। কান খাড়া করে মানুষদের কথাবার্তা শোনে। দু-

চোখ মেলে মানুষের মুখভঙ্গি পর্যবেক্ষণ চালায়। ক্রমে ক্রমে ধারণা জন্মায়, ভক্তজনেরা ভক্তিমতি মায়েরা শুধু শুনছে না বরং নিজেরা দুটো-একটা পরিস্থিতির সামাধন সংগ্রহ করছে...

দমকা হাওয়ায় দুর্গাকুণ্ডের জলের খানিক শীতলতা। উর্মিলা বলে মায়েরা, কে যে কখন কোন গেরস্থ মেয়েমানুষ নিশি যাপনের নোংরা জিনিসপত্তর লুকিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল মায়ের গায়ের পবিত্র জলে... ? সেই থেকে এজল অপবিত্র। আর তো মরা মানুষের গায়ে কুণ্ডের জল ছড়ালেও মৃত প্রাণ পায় না গো...

— হায় হায় পোড়ারমুখী মাগি রাতভোর পুরুষের সঙ্গো ফস্টিনস্টি করে ধোয়া মোছা ফেলবার জায়গা পেলি নি গো...

এখন তো উর্মিলার নতুন ব্রতকাহিনি একজন দুজনের মুখে ঘোরে। সে মুখ থেকে অন্যমুখে। ▢

মানবতা কাঁদো

কা না ই কু ণ্ডু

চাইনি এমন ঘোর কালবেলা অসহিষ্ণু অবিশ্বাস ঘৃণা
হৃৎপিণ্ডে অন্ধকার
কণ্ঠরুদ্ধ দিনরাত্রে এত হিংসা বিষ

মিথিলেশকে দেখলাম যেন। জে এন ইউ-র ইতিহাসের প্রধান। সিকিওরিটি গেটের চেয়ারে। হতেই পারে না। ভুল। এমন ভুল নাকি আমার প্রায়ই হয়। যাকে দেখলে খুব চেনা মনে হয়, সে অচেনা অন্য। আবার চেনা মানুষকে অন্য ভেবে উদাসীন। পিঠের ওপর সুপারসনিক থাবড়ায় চমকে উঠি, খুব যে লায়েক হয়েছিস, অচেনার ভানে কেটে পড়ছিস।

মিথিলেশ এলাহাবাদের মানুষ। অক্সফোর্ডের ডক্টরেট এবং ফেলো।

ফ্ল্যাটে বেল দিই। দরজা খোলে না। হয়তো কেটে পড়েছে সুবেশা, আমাদের কাজের মহিলা। আমাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। কী নিয়ে যেন একদিন বলেছিলাম। ধমকে উঠেছিল, মর্দানা হয়ে এমন খিচখিচ, দুশর কোনো কোঠিতে দেখিনি।

বাব্বা যা! যার বিবি সকাল নটায় সূর্যমপশ্যা, প্রয়োজনে মর্দানাকেই জবান খুলতে হয়। সাড়ে দশ্টায় হাজিরা যে! অপমানের চেয়ে লজ্জা বেশি। বিবিজি উঠতেই তুবড়ি ছোটাই। পরের দিন থেকে সব ঠিকঠাক। হাত বাড়ালেই চা-কফি। টেবিলে টোস্ট বিস্কিট ফ্রুটজুস। বিবিজি আগের মতো ঘুমোয়। সুবেশা কাজ করে। আমি অফিস যাই।

ভয়ে ভয়ে পকেট হাতড়াই। নাহ্, ভুলিনি। ডোর লক খুলতেই মনে খিঁচ। সিকিওরিটি গেটে ফোন করি। মিথিলেশ শাস্ত্রী থাকলে পাঠিয়ে দিন।

মিথিলেশ আর আয়েঙ্গার একসঙ্গে। রত্নম আয়েঙ্গার, ইণ্ডিয়া টাইমসের সাব এডিটর। ঘরে ঢুকেই ঝাড়, মেসেজ রাখ না কেন। রোশনিভাবি কোথায়। মেট্রনকে কি দিল্লি বাজার খরিদ করতে পাঠিয়েছেন! সুলতান এসেছে? আর আমাদের আজকের হোস্ট?

ঝাড় নয় ঝড়। একে একে সামাল দিই। সুবেশা ছুটি নেব নেব করছিল। রোশনি না থাকলে ওর নাকি কাজ থাকে না। আমার লাঞ্চ অফিসে। ডিনার ফোনে। রোশনি এখানে নেই। ওর মা এসেছিলেন। দিন তিনেক আগে হাদিতে নিয়ে গেছেন।

সে আবার কোথায়? আয়েঙ্গার জানতে চায়।

মুসলিম মেয়েদের প্রথম গর্ভধারণের ফর্মালিটি।

মানে, প্রায় চার দিন আমরা আড্ডায় বসিনি।

হিসেবে তাই দাঁড়ায়।

চ্যাটার্জি লেট করছে কেন?

এক্সপেক্টেড এনি মোমেন্ট। সুলতানও আসবে। যোশি আসতে পারবে না... বলতে বলতেই দরজায় বেল। হারুন মামুদ। বাংলাদেশ এমব্যাসির চার নম্বর। আমাদের আড্ডার বন্ধু। নক্ষত্র টি ভির স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট মনোজ যোশি নাকি একজন মামুদকেই জানে। সেই থেকে হারুণ আমাদের আড্ডায় সুলতান। হাতে একটা ঢাউস প্যাকেট। বলি, ভালো করেছ। আমার ডিনারের চিন্তা থাকল না।

ক্যান, বেচেলার্স ডেন নাকি!

আপাতত!

বছরে পাঁচ মাস বাপের বাসায়। বিয়া করলা ক্যান।

ওরাই সোফা চেয়ার টেনে টেবল ঘিরে গোলাকার। কাপবোর্ড থেকে গ্লাশ, ফ্রিজ থেকে জলের বোতল, আইসপটে বরফের টুকরো, এবং অপেক্ষা। আয়েঙ্গারের ছোঁক ছোঁক বেশি। খাবার সামনে পেলে হাত নিসপিস। প্যাকেট খুলে উল্লাস। হাউ নাইস, চিলি পোর্ক! থ্যাংকস আ লট।

সুলতান বলে, ইওর মোস্ট ফেভার্ড মেনু।

আয়েঙ্গার দিল্লিতে আসার আগে অনুবাদের কাজে রাশিয়ায় ছিল। প্রিয় খাদ্য পোর্ক এবং পানীয় ভোদকা। সঙ্গো ফ্রুটজুসের হ্যাপা।

সুলতান এবং আয়েঙ্গার চিবোয়। মিথিলেশের হাত গোটানো। প্রণবেশ চ্যাটার্জি এখনও আসেনি। আমি একটা চেয়ার খালি রেখে টুল নিয়ে গোলে শামিল। সুলতান হঠাৎ বলে, একি দাশগুপ্ত, তোমার স্টকে কদলি তণ্ডুল নেই। ব্রাহ্মণ যে অভুক্ত থাইকা গেল!

সরি, বলে আমি উঠি। রোশনির সংসার হাতড়াই। মিথিলেশের কথা কানে আসে, আপনি ধর্ম মানেন না?

হা হা করে হাসে সুলতান। যাহা আচরণ করি, তাহাই ধর্ম। মসজিদে যাই না, মোনাজাত করি না। আল্লায় বিশ্বাস করি। এবং নরমাংস ছাড়া সর্ববিধ আমার ভক্ষ। হঠাৎ সাধুভাষী হয়ে যায় সে।

সুলতান ইওরোপের তিনটি কন্টিনেন্ট ঘুরে দিল্লিতে। পছন্দের জায়গা কলকাতা। সর্বাধিক প্রিয় ভাত এবং রবীন্দ্রসংগীত।

প্রণবেশ আসে। হাতে এক লিটার। অরবিট ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ। বেশ শৌখিন। স্বামী-স্ত্রীতে নির্ঝঞ্ঝাট। ছেলে বোস্টনে, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ। দিল্লিতে ছবির মতো বাড়ি, ঝকঝকে গাড়ি। প্রিয় বিষয় উদ্ভিদ চর্চা, রবীন্দ্রসংগীত এবং রাতের আড্ডা। অধিকাংশ দিনেই আমাদের পানীয়ের যোগানদার।

গ্লাসে গ্লাসে তরল সোনা, দোদুল বরফ, স্বাদু শুয়োর কুঁচি। হালকা কথা হাওয়ায় ওড়ে। মনোজের অভাব বোধহয়। সে না থাকলে আড্ডা জমে না। প্রণবেশ তার হদিশ জানতে চায়। আমি বলি, মিশন অযোধ্যা টু গোধরা।

আয়েঙ্গার বলে, আই ডাউট। হি মাস্ট বি অ্যাট আমেদাবাদ।

সুলতান বলে, আমেদাবাদ ক্যান।

ঘড়ঘড়ে গলায় আয়েঙ্গারের উত্তর, প্রতিহিংসা।

আমি প্রতিবাদ করি, দেন ইট কুড হ্যাভ হ্যাপেনড ইমিডিয়েটলি আফটার।

ই মেল পেয়েছি বিকেলে। তবে চব্বিশ ঘন্টা পরে কেন, এটাই চিন্তার।

প্রণবেশ বলে, গোধরায় যা ঘটল, অমানুষিক। মানুষ এত নৃশংস হতে পারে!

সুলতান সবাইকে থামায়, ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে না। বুদ্ধের মন্দির না রামের জন্মস্থান, নাকি বাবরের মসজিদ, হেইখানে রামের পূজা। হউক না পূজা। হে তো আনন্দের। মিস্টান্ন বিলি হয়।

মিথিলেশ বলে, সমস্যাটা কী জানেন, রাম কেবল রামায়ণে। বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। জন্মভূমি এই অযোধ্যায়, এমন প্রমাণও নেই।

তাইলে ক্যাচাল ক্যান?

রাজনৈতিক ক্ষমতা ধর্মের চুষিকাঠি। রামরথ যাত্রা দিয়ে শুরু, কোথায় থামবে জানি না। ইতিহাস ভবিষ্যতের প্রবক্তা নয়।

দেখেন তো এতগুলান ইনোসেন্ট মানুষ, খামাখা প্রাণ দিল। কী বীভৎস মৃত্যু! মানুষ অখন শকুন হইসে।

তাল কেটে যায়। অপরাধের আবহ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। এসি'র নীরব গুঞ্জন কানে বাজে। টেবলে এলোমেলো গ্লাস। খাবারের টুকরো। বরফ গলে যেতে থাকে। কেউ হাত বাড়ায় না। আলোকোজ্জ্বল দিল্লিতে রাত্রির স্তব্ধতা।

কোষমুক্ত তরবারি ঘাতকের হিংস্র সাঙ্ঘাতিক
একটি জিজ্ঞাসা নেই ওই দৃষ্টিহীন দর্শকের
চোখে বা কণ্ঠেও নেই একটি অস্ফুট উচ্চারণ :
কেন এই নিদারুণ হত্যা? কেন মায়াহীন ক্রোধ।

ছিন্নমস্তা দিন। রাজপথে রাঙা চোখের মিছিল। হাতে ত্রিশূল তরোয়াল। সদম্ভ আস্ফালন : জয় শ্রীরাম। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ঘাতকের দল। নিরস্ত্র নিরীহ প্রাণভিক্ষুকে হত্যা করছে প্রকাশ্যে। বাতাসে পোড়া গন্ধ। পুড়ছে মানুষ আসবাব গাড়ি-বাড়ি। কালো হয়ে আছে আমেদাবাদের আকাশ। পুলিশ প্রশাসন বধির। অথবা উপভোগ করছে ধর্ষণ, আগুনে নিক্ষিপ্ত নারী পুরুষের জীবন্ত দহনদৃশ্য। দায়িত্ববান মন্ত্রী জানাচ্ছেন, অবস্থা নিয়ন্ত্রণে। হতাহত সামান্য।

সমস্ত পত্র-পত্রিকায় একই রিপোর্ট, ছবি। আমি আতঙ্কিত। তবু বাবার দূরদৃষ্টিতে কৃতার্থ বোধ করি। অনেক বিচক্ষণতা ও কৃচ্ছসাধনায় আমেদাবাদের শান্ত অভিজাত অঞ্চলে ফ্ল্যাট কিনেছিল। বর্ধমানের মানুষ, কলকাতায় শিক্ষা, স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে। স্বচ্ছলতা সাফল্য। সাত বছর চাকরির পরেও কেন যে দেশের টান। তাও যদি কলকাতা হত। গোরখপুর কলেজে প্রিন্সিপ্যালের পদে দেশে ফেরা। সেখান থেকে মুসৌরি, বরোদা হয়ে আমেদাবাদ। আমেদাবাদের ইউনিভার্সিটিতে সতেরো বছর। রিটায়ারমেন্ট নিয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে এই অভিজাত এলাকার ফ্ল্যাটে।

আমার জন্ম, ছেলেবেলা, কৈশোর, শিক্ষা এবং বিয়ে আমেদাবাদে। এখানে বাবার অনেক ছাত্র, শিল্পী পণ্ডিত রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধব। বিদগ্ধ মহলে প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃতির নানা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং সাম্মানিক বৃত্তিভোগী। মা বাঙালিই থেকে গেছে।

আঞ্চলিক ভাষা এখনও বোঝে না। বলতেও পারে না। তার কলকাতা হারানোর দুঃখ চিরকালীন। একমাত্র সান্ত্বনা আমি। আমাকে ঘিরেই তার মর্মান্তিক স্নেহ।

আমেদাবাদের শিক্ষা শেষে যখন দিল্লিতে পড়তে এলাম, ধেড়ে ছেলেকে বিদায় দিতে মার সে কি কান্না! তারপরে আই এ এস পরীক্ষা, গৃহ মন্ত্রণালয়ে চাকরি। পুরোপুরি দিল্লিবাসী। আমেদাবাদের ফ্ল্যাট বিক্রি করে মা দিল্লি আসতে চায়। বলে, দোলনকে ছেড়ে আমি থাকতে পাবব না। চল, দিল্লিতে ফ্ল্যাট কিনে এক সঙ্গে থাকি।

বাবার আপত্তি। এই তো দোলনেব শুরু। ওকে একা চলতে দাও।

ছেলেবেলায় মা নাকি আমাকে কোলছাড়া করত না। কোলেই দোল দিত, ঘুম পাড়াত। হয়তো এই অভ্যেসে আমি বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলেও দুলতাম। তাই নাম হল দোলন। পছন্দের না হলেও নামটা থেকে গেল।

বাবা জেদি পুরুষ। পাশে থাকলে আমিও ফয়েলে জড়ানো চকোলেট। মা এই জেদের কাছে পুরোপুরি হেরো। একটু যেন ঘরকুনো। কথা বলে কম। চারতলার জানালায় যেটুকু ধরা যায়, চলমান জীবনেব ছবি, মেঘ রোদের খেলা, টুকরো আকাশে চিলের ঘূর্ণিপাক, বাতিস্তম্ভে কাক চড়ুইয়ের ডাক অথবা দূরের সবরমতী। এবং কাজেব মহিলার কাছ থেকে পাড়াব খবর। এই তার দিন থেকে দিনান্তব।

কিন্তু হঠাৎ এসব ভাবছি কেন। আমি কি উদ্‌বিগ্ন। বিপন্নতায় বিপর্যস্ত! ফোনটা তুলে নিই। বোতাম টিপতেই মা। ডুকরে ওঠা কান্না, দোলন?

বিগত পাঁচ বছর এই কান্নায় আমি অভ্যস্ত। ফোন করলেই মা। এবং প্রথম প্রস্থে অদর্শনের কান্না। পরে কুশল বিনিময়। এবার যেন কান্না থামতে চায় না। ভেজা কথা ভেসে আসে, ভালো আছিস তো বাবা। এদিকে সব...

বাবার ধমক। সম্ভবত মা-র কাছ থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে গম্ভীর আওয়াজ, হঠাৎ ফোন কেন?

কাগজের রিপোর্ট দেখলাম...

ওঁ সব বাড়াবাড়ি। গোলমাল হয়েছে...মাঝে মাঝে যেমন হয়।

তোমরা ঠিক আছ সবাই?

হ্যাঁ। তুমি চিন্তা কোরো না।

রোশনিরা? ওদের লাইন পাচ্ছি না।

ওরা এখানে নেই। দেশের বাড়িতে গেছে।

দিন কয়েকের জন্যে যাব ভাবছি।

না না। এখন আসতে হবে না। আমি পরে জানাব, লাইন কেটে গেল।

আমার উদ্‌বেগ কাটল না। রোশনিরা মাহেসানার বাড়িতে গেল কেন। গোলমালের ভয়ে। এখন তার আমেদাবাদে থাকা উচিত। যে কোনও সময়ে মেডিক্যাল এড. নার্সিংহোমের প্রয়োজন হতে পারে। মাহেসানার দূরত্ব অনেক। এয়ার সার্ভিস নেই। যেতে না দেওয়াই উচিত ছিল। রোশনিও আমাকে ছেড়ে যেতে চায়নি। বলেছিল, এখন আমি তোমার কাছে থাকতে চাই। প্রসবের পর ছেলে নয়, তোমার মুখ দেখতে চাই আমি। আর যদি মরে যাই, তুমি পাশে থাকবে। দফনে প্রথম মাটি দেবে তুমি।

রোশনিকে ছাড়তে আমরাও কষ্ট হচ্ছিল। বুকে টেনে চোখ মুছিয়ে দিলাম। ওদের ধর্মীয় প্রথায় বিরক্ত বোধ করছিলাম। অবশ্য আমার মা বলেছিল, এমন প্রথা নাকি হিন্দুদেরও আছে। দুই ধর্মের প্রথা নাকি সবই এক। বিভেদ কেবল নামে আর দিন তারিখে।

রোশনিকে যথা সম্ভব সতর্ক থাকা, ওধুষ বিশ্রাম ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছিয়ে দিলাম। ওর মা সঙ্গে থাকায় একটা চুমু দেবারও সুযোগ পেল না বেচারা। প্লেনে ঢোকার আগে হাত নাড়ল। আমি এক অবাক বোধহীনতায় পালটা হাত নাড়তে ভুলে গেলাম। ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল।

তার কয়েক দিন পর থেকেই কাগজে দাঙ্গার খবর, ক্রমশ বিস্তার। ছবিতে খোলা তলোয়ার ও প্রাণভিক্ষু নিরস্ত্রের কাতর প্রার্থনা। রোশনিদের ফোনে নো রেসপন্স।

তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব— অতি বৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত

নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখি। নোট ডিক্টেশন পেন্ডিং ফাইল। সময় পেরোলেও ভিজিটর ডাকি। তবু পিঁপড়ের কামড়। স্থির থাকতে পারি না। যে কাজ কখনও করিনি, ক্লার্কদের ঘরে নির্দেশের ছুতোয় ঢুকে পড়ি। অহেতুক আলাপ খোঁজ খবর। নাহ্ কারও আত্মীয় আমেদাবাদে থাকে না। ছুটির দরকার নেই কারও। অথচ টেবলে টেবলে আলোচনা। প্রসঙ্গ · আমেদাবাদ। প্রতিদিন রক্তে ভেজা খবরের কাগজে আঁশটে গন্ধ।

ক্লান্তিকর হৃদয় নিংড়ানো তিনটে দিন, নির্ঘুম রাত। হঠাৎ মনোজের ফোন : সন্ধ্যায় ফাঁকা আছ?

আকাশ যেন মুঠোয় ধরেছি। উল্লাসে আহ্বান জানাই। মিথিলেশ, আয়েঙ্গার, সুলতান, প্রণবেশকে খবর দিই। দুটো বোতল আনাই। চিপস স্ন্যাকস ফ্রাই ইত্যাদি গুছিয়ে রাখি। মাইক্রো ওভেনে গরম করে তাজা পরিবেশন। তুমুল আড্ডা হবে আজ। পুরোপুরি আউট হয়ে মোষের মতো একটু ঘুম চাই আমার।

ফুল সেশন। আড্ডা জমে গেছে। ঘড়িতে নজর রাখছে প্রণবেশ। ন-টা বাজলেই উঠি উঠি শুরু। মনোজ গল্পে মশগুল। অনেক দিন পরে তার আড্ডার সুযোগ। সুলতান সমানে তাল দিচ্ছে আয়েঙ্গার চিকেনে শশা জড়িয়ে মুখে দেয়। মিথিলেশের মশালা বিনস এবং ফ্রায়েড ক্যাজু। আমি গ্লাসে ঢালি। বরফের কুচি ভাসাই। মনোজের বেশি হলে একটু স্ল্যাং। সুলতান কাঠ বাঙাল। মিথিলেশ গম্ভীর। প্রণবেশ গুনগুন করে।

হালকা হাসি চটুল আলাপে মসগুল মজলিশ হঠাৎ মিথিলেশের বেমক্কা প্রশ্নে টাল খায়। কেমন কাটল আপনার মিশন?

একটা স্ল্যাং উচ্চারণে মনোজ বলে, হরিবল। ভোটভূমি তৈরির নরমেধ।

প্রণবেশ বলে, কেন? করসেবকদের তো আটকে দেওয়া হয়েছিল। সার্কুলার। অ্যান্ড নো লোক্যাল ট্রাফিক ফ্রম স্টেশন টু করসেবকপুরম।

বাকি অবাধ। জমায়েত দেখে মিস্টার শর্মাকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি স্বীকার

করলেন নো চেকিং। উপস্থিতির সংখ্যা দশ হাজার। ইভন আই মেট আ বাগার সাম রাজু রাও ফ্রম আন্ধ্রা। হিন্দিও বলতে পারে না।
হেই সামান্য কারণে গোধরা। বিস্ময় প্রকাশ করে সুলতান।
নেহাতই জেলাসি। মাইট বি অ্যাঙ্গার অর রিটালিয়েশন। বীভৎস এবং জঘন্যতম অপরাধ, বলে প্রণবেশ।
আয়েঙ্গার বলে, রিটালিয়েশন তো আমেদাবাদে।
মনোজের চোখ বড়ো হয়। দুটো চুমুক গিয়ে বলে, নো মিস্টার আয়েঙ্গার। আমেদাবাদে রিটালিয়েশন নয়, জাতি-দাঙ্গাও নয়? প্রিপ্ল্যানড জেনোসাইড।
আমি প্রতিবাদ করি, তুমি এত কনফিডেন্টলি বললে?
আমেদাবাদের কোনও বালকও এই কথা বলবে। গোধরার ঘটনার অনেক আগে ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স, এমনকি ভোটার তালিকা দেখে মুসলিমদের নথি তৈরি হয়। এলাকা ভিত্তিক তালিকা বিলি হয় বজরং বাহিনীর হাতে। দলিত মহল্লায় শস্তার মদ এবং টাকার ফোয়ারা উড়িয়ে হত্যাকান্ডে লেলিয়ে দেওয়া হয়।
প্রণবেশ বলে, তাহলে গোধরার ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগ নেই বলতে চাও?
গোধরার ঘটনা হয়তো মোটিভেটেড, তবে নিতান্তই কাকতালীয়। নয়তো রাজ্য পরিবহনের বাস, অ্যাম্বুলেন্স, এমন কি পুলিশের ভ্যানে সাপ্লাই হয়েছে লিটার লিটার পেট্রল, কেরোসিন, গ্যাস সিলিন্ডার। এত বুলডোজার এল কোথা থেকে, দক্ষ অপারেটর? দরগা মসজিদ গুঁড়িয়ে তৈরি হল পিচের রাস্তা। বিখ্যাত কবি ওয়ালি গুজরাতি, ওস্তাদ ফৈয়াজ আলি খাঁর বাড়ি এখন ভগ্নস্তূপ। ভি এইচ পির স্থানীয় প্রধানের খোলা ইশতাহারে ঘোষণা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচারকরা হিন্দুত্বের প্রতারক। হিন্দু পরিষদকে চাঁদা দিলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ট্যাক্স মকুব।
ঘরময় অনাকাঙ্খিত স্তব্ধতা। গ্লাসের বরফ গলে। খাবার ঠান্ডা। দুঃসহ পরিবেশ। সুলতান বলে, আপনেগো দ্যাশে আর কোনও প্রসঙ্গ নেই, সিনেমা সাহিত্য, ক্রিকেট?
মিথিলেশ বলে, আমরা ইতিহাসের সাক্ষী। সত্যকে মেনে নিতে হয়।
আয়েঙ্গার বলে, যেমন ১৯৮৪-তে ইন্দিরাজি হত্যার পর আমরা মেনে নিয়েছি তিন হাজার নিরীহ শিখের নিধন। বাবরি মসজিদের পরে পাকিস্তান বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা, বিতাড়ন।
মনোজ যোগ দেয়, ছিটেফোঁটা যা বা ছিল, কোমের সিংহাসন অটুট রাখতে নিশ্চিহ্ন। অবশ্য তিনি এখন রমনার মাঠে কালীমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পাপস্খালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
সুলতান ফোড়ন দেয়, মন্দির না হয় অইল, পূজা করব কেডা!
সামান্য আশ্বাস কুড়োতে বলি, উচ্চ মধ্যবিত্ত বা অভিজাত এলাকা নিশ্চয়ই সুরক্ষিত। প্রশাসনিক সতর্কতা প্রখর?
তুমি জান না দাশগুপ্ত, এলাকার কিছু মানুষও এখন কত নির্মম। একটা অকেশন আমি নিজে দেখেছি। মিতসুবিশি ল্যান্সার ড্রাইভ করে এসে দোকানের সামনে দাঁড়াল।

শো কেস ভেঙে এসি মেশিন, কম্পিউটার, প্রিন্টার মাইক্রোওয়েভ, সিডি প্লেয়ার বোঝাই করল গাড়িতে। ওই গাড়িরই পেট্রল ছড়িয়ে আগুন দিয়ে চলে গেল নির্বিকারে। মুসলিমদের দোকান রেস্তোঁরা হোটেল এমনকি হিন্দু পার্টনারশিপের যুগ্ম ব্যাবসকেন্দ্রও এখন ধ্বংসস্তূপ। পোড়া গাড়ি বাস অটো মোটর সাইকেলের কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুজরাট শাখার সভাপতি শাস্ত্রিজিকে প্রশ্ন করতে কী উত্তর দিলেন জান ?

মিথিলেশ বলে, তিনি বলেছেন, অতীব দুঃখজনক। একান্তই অনভিপ্রেত, এই তো ?

নো স্যার। অতি বিনীত ভঙ্গিমায় বললেন, এমনই তো হওয়ার কথা ছিল। আর এস এস তো প্রকাশ্যে হিটলার এবং তার ফ্যাসীবাদের প্রশংসা করে।

আমি আতঙ্কে চিৎকার করি, নিরাপত্তা বলে কিছুই নেই!

ব্যক্তিগত সদিচ্ছায় কোনও হিন্দু কোন মুসলমানকে আশ্রয় দিয়ে থাকতে পারে। তবে প্রশাসনিক সাহায্য মুসলিমদের জন্যে ছিল না। নয়তো কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ ছয় ঘণ্টা ধরে ডিজি সিপি ডিসিকে ফোন করেও চূড়ান্ত নিগৃহীত হয়। কারণ কী জানেন ? তিনি ছোটে সর্দারের নির্বাচন কেন্দ্রে জবরদস্ত লড়াই করেছিলেন। এরপরও নিরাপত্তার বিচার।

আয়েঙ্গোর বলে, পলিটিক্যাল মাস্তানের বিচার হয় না। তারা বলে, গাছ পড়লে মাটি কাঁপবে, ওমলেট খেতে ডিম ভাঙতে হয়। মুসলমান থাকলে অশান্তি থাকবে। আঠারো বছর আগে শিখ নিধনে কোন মাস্তানের বিচার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যায় কোনো মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়ক নির্বাসিত। প্যালেস্টিনে কোন শান্তিযুদ্ধ চলছে!

মিথিলেশ বলে, নেতা মন্ত্রীদের দোষ থাকে না, বিচার নেই। এত কাণ্ডের পরেও বি জে পি-র গোয়া অধিবেশনে তো গুজরাটের কুখ্যাত মন্ত্রীজিকে বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁর পদ্যের ক্যাসেট প্রকাশে ব্যস্ত, গুজরাটের আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। মোদিজির সাফাই গেয়ে তিনি বললেন, হিন্দু-প্রধান দেশে মুসলমানদের থাকতে হলে, আস্থা অর্জন করে থাকতে হবে।

স্বয়ং মোদিজি কি বলেছেন জানেন, মনোজ চিৎকার করে। তিনি বলেন, হিন্দুত্বের স্বার্থরক্ষার যাত্রায় এটা নাকি মহাত্মাজির ডান্ডি অভিযানের মতো। বিচারের কথা বলছেন। কে চাইবে বিচার ? বিরোধী দল ? তারা বিচার চায় না, রেজিগনেশন। তারা পার্লামেন্ট অচল করবে, মোশন আনবে, কিন্তু বিচার নয়। তারাও যে প্রায় সবাই অপরাধী, অতীতে বা ভবিষ্যতে।

সুলতান অধৈর্য হয়ে ওঠে। দূর, হেই প্যাচাল আমার ভালো লাগে না। অনেক মৃত্যু দেখসি আমি। ক্ষমতা পাইতে নেতারা দাঙ্গা বাধায়। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে। মরে আমাগো পোলাপান। আমি আর কিছু শুনুম না। একটা গান করেন প্রণবেশ।

মিথিলেশও সায় দেয়, আর যুদ্ধ মৃত্যু নয়, গান। গুরুজির গান শুনতে চাই।

প্রণবেশ বলে, আপনাদের আলোচনা শুনতে শুনতে একটা সুর মনে আসছে। কিন্তু কথা মনে নেই।

যতটা মনে আছে, হেইটাই গান, বলে সোফায় পা গুটিয়ে বসে সুলতান।

প্রণবেশ গায় : অসীম সংসারে যার কেহ নাই কাঁদিবার
সে কেন গো কাঁদিছে।
অশ্রুজল মুছিবার নাহি রে অঞ্চল যার
সেও কেন কাঁদিছে...

গান শেষ করার আগেই সুলতান চলে গেছে। অথচ রবীন্দ্রসংগীত ওর প্রিয় আরাধনা। মিথিলেশ গ্লাস উলটে হাত মুছে কাগজটা বাস্কেটে ছুঁড়ে বলে, আবর্জনা এত আবর্জনা। প্রণবেশও ওঠে। আয়েঙ্গার সঙ্গী হয। আমি এবং মনোজ মুখোমুখি। দুজনে আবার গ্লাস পূর্ণ করি। চুমুক দিই। মনোজ হঠাৎ বলে, ভাবিকে দেখছি না কেন, শরীর খারাপ?

মাথা নামিয়ে উত্তর দিই, আমেদাবাদে।

মাই গড, কবে!

দিন সাতেক হল।

ইজ সি ওকে?

জানি না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে এস্কেপ করে।

আই-ম সো সরি বলে মনোজ চলে যায়। আমি একা। চুমুক দিই। কিছুটা তলানি আছে। ঢালি। সোফায বসে ঝিমোই। হঠাৎ কখন হাত অথবা পা লেগে গ্লাস ওলটায়। ঝনঝন শব্দে জেগে উঠি। ঘড়ির দিকে তাকাই, তিনটে পেরিয়েছে। ধড়মড় করে উঠি। ড্রেস আপ করে ঘরে তালা দিই। সোজা এয়ারপোর্ট।

এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িযে
দেখ
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশগঙ্গা।

ভোরের আকাশ থেকে ভেজা হাঁসের মতো প্লেন আমেদাবাদের মাটি ছোঁয। বাইরে ঝকঝকে সকাল। বাড়িতে খবর দিইনি কেউ অপেক্ষায় নেই। ফাঁকা ট্যাকসি স্ট্যান্ড। কযেকটা মাত্র প্রাইভেট কার, কাঁচে বজরঙ দলের প্রতীক সাঁটা। তিনগুণ ভাড়া কবুল করি। এরপরও হ্যাপা। ড্রাইভার বলে, ওদিকে কারফিউ। পুলিশের কাছ থেকে পারমিট লিখিযে নিন।

দরজায বেল বাজাই। খুলেই মা বুকে জড়ায, সেই এলি বাবা, ক-দিন আগে আসতে পারলি না!

বাবা ধমক দেয়, দরজা খুলে কি নাটক শুরু করেছ তোমরা। বন্ধ কর! আমাকে বলে, এভাবে খবর না দিয়ে এলে কেন। কেউ দেখেনি তো?

বাবা এত বিরক্ত কেন। আমার গায়ে কি এখনও মদের গন্ধ! টয়লেটে যাই। জল কোলন ছিটিয়ে ফ্রেশ-আপ হযে আসি। আমার ঘরে বুক শেলফের ওপর রোশনির ছবি। শিশিরে ভেজা তরতাজা গোলাপ। বিহ্বল তাকিয়ে থাকি। মা আসে। রোশনির খবর জানতে চাই।

মা মাথা নাড়ে। উদ্যত কান্না আঁচলে চেপে অন্য ঘরে যায়। আমি দুই হাতে মাথা আঁকড়ে বসে পড়ি। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে, পৃথিবীময় গভীর শূন্যতা, অন্ধকার। রোশনিদের এত লোকবল, টাকা, প্রতিপত্তি তাও!

হাতের মুঠি শক্ত হয়, শরীর দৃঢ়। পুরোপুরি প্রতিহিংসাপরায়ণ। দুচোখে তীব্র জ্বালা। আগুন ঠিকরে পড়ছে। বলি, আমি বেরোচ্ছি।

মা আতঙ্কিত, কোথায়?

রোশনিদের বাড়ি।

নেই। কেউ নেই... পুড়ে খাক হয়ে....

দরজায় বেল, পর-পর দুবার। বাবা খোলে। আমি মায়ের ঘরে দাঁড়িয়ে। আগন্তুককে দেখতে পাই না। বাবার কথা শুনতে পাই, আমি তো কোনও হেলপ চাইনি। হঠাৎ আপনি?

লোকটি হয়তো বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। বাবার থাক...থাক। আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার? আমি অনুপ, অনপু প্যাটেল। আপনার ছাত্র ছিলাম এইট নাইনে। এখন পুলিশে, এসি।

বাহ, খুশি হলাম। ভালো থেকো। উন্নতি কর... বাবা কাটিয়ে দিতে চায়।

আমি দোলনের সঙ্গে এক ইয়ারেই, তবে বিষয় আলাদা ছিল।

তুমি চেন দোলনকে?

বাহ, এই তো সেদিন। দোলনের বিয়েতে ইনভাইটেড ছিলাম। সে তো ঐতিহাসিক বিয়ে। সম্প্রীতির মহাসম্মেলন। আমেদাবাদের প্রায় পুরো ক্যাবিনেট, পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কিা শটস, এমনকী দিল্লি থেকেও ডিগনেটরিস এসেছিলেন। একটু থেমে আবার বলে, দোলন এসেছে শুনলাম?

কই না তো? হঠাৎ বাবা মিথ্যে বলে।

হ্যাঁ। আজকের মর্ণিং ফ্লাইটে। কারফিউ পাশের লিস্টে নাম দেখলাম। এলে কিন্তু বেরোতে দেবেন না। মানুষের এখন মন বলে কিছু নেই। অবশ্য কারফিউ পাশ লিস্ট থেকে আমি নামটা কেটে দিয়েছি। একটু পবেই হয়তো এসে যাবে।

তুমি কি থ্রেট করতে এসেছ?

না স্যার। আমি আপনার ছাত্র। দোলন আমার বন্ধু। আপনাদের অ্যালার্ট করে গেলাম। প্রয়োজন হলে জানাবেন।

আমি গৃহবন্দী। পাহারায় বাবা মা। পাশের ফ্ল্যাট বা পাড়ার কেউ এলে, আমি সারভেন্টস টয়লেটে। বেশ কিছুদিন ব্যবহার নেই। কাচ ভাঙা ছোটো জানালায় তাকিয়ে থাকি। আমার আমেদাবাদ। ছেলেবেলার, কৈশোরের, প্রেমের এবং রোশনির আমেদাবাদ। সবরমতি আর দেখা যায় না। মাল্টিস্টোরিতে আড়াল। ঝুলতা মিনারের চূড়াও আগে দেখা যেত। ওখানেই রোশনিকে প্রথম দেখি। একেবারে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা। অভাব কেবল মুকুটের। ওদের পিতৃব্য পাকিস্তানে সিন্ধ অঞ্চলের জমিদার। আমেদাবাদে বছর চল্লিশেক। হোটেল আর হীরের ব্যবসা। পটেল মার্গে বাংলো বাড়ি, বাগান, শাপলা ফোটা পুকুর। মধ্য রাতের ই-মেলে আলাপ, ছবি বিনিময়, প্রেম বিরহের মালা গাঁথা। তার বি এ ফাইনালের পরে পরিণয়ের প্রতিশ্রুতি।

নির্ধারিত দিনে রোশনি মসজিদে হাজির। সেইদিনই প্রথম দেখা। সঙ্গে সাগির্দ মিঞা, বাপের মতো যে ওকে লালন করেছে। সেদিনই মৌলবি ডেকে মোনাজাত, দোয়া-এ খায়ের ও দারুদ পাঠ। পরে শহরের রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে। সাক্ষী সাগির্দ মিঞা এবং আমার বিশ্বস্ত বন্ধু সুকান্ত দোশি। তৃতীয় ব্যক্তির অভাবে রেজিস্ট্রি অফিসের কেরাণীবাবু। স্থির হল, আমরা আপন আপন ধর্ম পালন করব।

প্রায় এক মাস পরে উভয়ের বাড়িতে খবরাখবর, বিবাদ, তাপ উত্তাপ, এবং শেষে সম্প্রীতির মিলনোৎসব।

এই তার পরিণতি! অপরাধী না হয়েও আমার চোরের মতো লুকিয়ে থাকা। সামান্য শোক প্রকাশের অধিকারও নেই। রোশনিকে রক্ষায় আমি প্রতিশ্রুতিবন্ধ। দফনে প্রথম মুঠির মাটি দেবার অঙ্গীকার আমার। আগে টের পাইনি। কিন্তু এখন তো জেনেছি। তবুও লুকিয়ে থাকব!

পরদিনই ভোরে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এলাকা জুড়ে কারফিউ। নিজের আইডেন্টিটি দেখিয়ে এগিয়ে চলি। সোজা পটেল মার্গ। পাড়ায় ঢুকে দেখি, হিন্দুদের সুদৃশ্য অক্ষত বাড়ির মাঝে মাঝে উপড়ে পড়া গাছের মতো কিছু বাড়ি। রোশনিদের বাংলো চিনতেই পারি না। ধসে পড়া, পোড়া ইঁট কাঠ লোহায় হাড়গোড়ময় কিস্তুত। ঝলসে যাওয়া ফুলন্ত গাছ, ঝাউ। কাঠ লোহা টপকে ভেতরে যাই। ঘরের বিভাজন নেই, আসবাব দরজা জানালার চিহ্ন নেই। তবু ঘুরে বেড়াই। যদি কোনো স্মৃতির টুকরো পাই। হঠাৎ পাশে আওয়াজ, কুছ নি ছে। সারা লুঠেছ হে।

আদমিলোগ! আমার বিপন্ন জিজ্ঞাসা।

জ্বালা দিয়া গয়া। সির্ফ বুড়ুহা জিন্দা ছে।

কৌন?

সাগির্দ মিঞা। অব আসপাতাল ম।

কোন হাসপাতাল?

নি মালুম।

বড়ো থেকে ছোটো, ছোটো থেকে মাঝারি, কোনও হাসপাতালেই সাগির্দ মিঞাকে পাওয়া যায় না। রোশনিকে সে মেয়ের মতো লালন করেছে। তার কোলে চড়েই রোশনির পৃথিবীর রং রূপ আলো হাওয়া গন্ধ চেনা। হয়তো তাকে নিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে নিরাপদে, কোনও মসজিদে বা দরগায়, দূরের কোনও মুসলমান প্রধান গ্রামের নির্জনে। এমন নানা আশাবাদী ভাবনায় আমি বিপর্যস্ত। অবসন্ন শরীর, শার্টময় কালি, পোড়া গন্ধ মেখে রাত্রে বাড়ি ফিরি। মায়ের উদবেগের কান্না, বাবা বিরক্ত।

পরের দিন, তার পরের দিন, তারও পরের দিন আমি আমি আমেদাবাদের নানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের খাতা রেজিস্টার হাতড়াই। তিনজন সাগির্দ মিঞাকে পাই। কিন্তু তারা কেউই রোশনির মিঞাজান নয়। আবার পরের দিন বেরোতে গিয়ে দেখি বাইরের দরজা লক করা। মাকে বলি, চাবিটা দাও।

তুই কি পাগল হয়ে গেলি দোলন!

চাবিটা দাও।

তোর বাবার কাছে।

বাবার ঘরে যাই। বিছানায় বসে আছে। ঘরে ঢুকতেই, কী শুরু করেছ তুমি?

কর্তব্য।

হিন্দু হয়েও মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তুমি নিন্দিত। তোমার স্বধর্ম রক্ষা ওরা বিশ্বাস করে না। যে কোনও মুহূর্তে তোমার বিপদ হতে পারে। বেরোনো উচিত হবে না।

আমি জানি।

এমন কি তোমার কারণে আমরাও বিপন্ন হতে পারি।

আমি চলে যাচ্ছি। অবস্থার উন্নতি হলে ফিরব। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না, বলে চাবি নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ি।

সুকান্ত দোশি আমার পুরোন বন্ধু, খুবই ঘনিষ্ঠ। ওদের বাড়িতে আমি অতিথি। এবং কিছুটা নিরাপদ। সকালে বেরোই। রিলিফ ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াই। রাত্রে ফিরি। সুকান্ত সান্ত্বনা দেয়। দিল্লি ফিরে যেতে পরামর্শ দেয়। আমি পরের দিন নতুন উদ্যমে বেরিয়ে পড়ি। শূন্য রিক্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসি।

একুশটা রিলিফ ক্যাম্প ঘুরে শেষে মিশনারিদের এক ক্যাম্পে সাগির্দ মিঞাকে আবিষ্কার করি। লুঙ্গি গেঞ্জি সম্বল। ধুলোয় দাগে মলিন। পাকা নুর, মাথায় ছেঁড়া জালির টুপি। একটা হাত প্রায় কাঁধ থেকে নিশ্চিহ্ন। মামুলি ব্যান্ডেজ জড়ানো। মাছি ভনভন করছে। আমাকে দেখে দাউবেটা বলে, হাউহাউ কান্না। তারপর অভিযোগের পর অভিযোগ। রোশনিকে কেন ওই সময় আমেদাবাদ পাঠিয়েছিলাম, দাঙ্গার পহেলা খবর মিলতেই কেন তাকে নিয়ে যাইনি, আরে আমার নজনিন যে শেষ তক তোর রিহা দেখতে দেখতে খতম হয়ে গেল!

চোখের জলে দাড়ি ভেজে। বাম হাতে নিজের বুক থাবড়ায়। ধাতস্থ হলে বলে, আমার কোন হালত দেখতে এলি বেটা, কোন পাপের নতিজা। এই দোজখে আল্লা আমাকে কী দেখতে জিন্দা রাখল! আঁখের সামনে সাহেবজাদা, বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞাকে কোতল করল। শমান লুঠে নিল। বোমরা চিল্লায় তো ত্রিশুল মেরে পেট ফেড়ে দেয়।

রোশনিকেও!

হা রে আমার নাদান বিটিয়া... এই হাতে তাকে কোলে নাচিয়েছি, কাবিল বানিয়েছি, তার শাদির উকিল হয়েছি.. এই হাতে তার সুখের জন্যে দোয়া মেঙেছি, বলে দুই হাত তুলে বোঝাতে চায়। ডান হাতের জোড়ের অংশটুকু নড়ে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। দম নিয়ে আবার বলে, আমার সামনে তার ইজ্জত হারাম করল বজরঙ্গীর দল। বিটিয়ার তখন নাজুক শরীর। তাকে জমিনে আছড়ে, হাত পা চেপে, কাপড়া চোলি ফেলে নাঙ্গা করে। পরপর তিন চুহাড়। বিটিয়া চিল্লাতে চিল্লাতে কাহিল। আমি কোনও মদত দিতে পারলাম না... হায় আল্লা... হায় খুদা, আমাকে আন্ধা করে দিল না কেন। কেন আমার হাত পা গ্রিলে বেঁধে দুশমনরা কাবু করে রাখল...

বিটিয়া তখন কেবল গোঙায়। তবু আরও এক দুশমন পাশে ছুরি রেখে হামলা করে। বিটিয়া আচানক নড়ে ওঠে। পাশের ছুরি হাতে উঠায়। ভাবি, আমার বাহাদুর

বিটিয়া এবার অন্তত একটা শয়তানকে কুচলে দেবে। লেকিন না। আপন পেটে চালিয়ে দিল। বাচ্চাটা বেরিয়ে এল। হাত পা নড়ে। আঁখে নজর হয়নি। তবু মা-র দিকে যেতে চায়।

দুশমনরা তখন সিলিন্ডার খুলে ঘরে ঘরে আগুন দিচ্ছে। এক জঙ্গী বাচ্চাটাকে ত্রিশূলে গেঁথে সেই আগুনে...

আহ্, সাগির্দ মিঞা থাম থাম বলে আমি চিৎকার করি। নিজের চোখ চেপে ধরি। ভেতরে তোলপাড়। হৃৎপিণ্ড ছিটকে বাইরে আসতে চায়। শরীরময় আগুন জ্বলে।

সাগির্দ মিঞা বলে যায়, আমি তো থেমেই আছি দাউবেটা। দিন রাত আল্লাকে ডাকি, মৌত দে আল্লা। খুদা-এ-শরিফ, আমাকে মৌত দে। সিলিন্ডারের আগুন সারা কোঠিতে ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের লহু আশমানে ছড়ায়। জবরদস্ত আওয়াজে সিলিন্ডার ফাটল। আমার তো গ্রিলে হাত পা বাঁধা। সেই গ্রিলের সঙ্গে কখন কিধর ছিটকে গেলাম। তবু মৌত এল না। হোঁস আসতে দেখি, ডাহিনা হাতটা নেই। এই ঈশাহীদের লঙ্গারখানায় শুয়ে আছি।

হৃদয়ে হৃদয়ে গেঁথে
আমরা তৈরি করতে চেয়েছিলাম
সেই দীর্ঘতম সেতু
যার ওপর দিয়ে সমস্ত পৃথিবী পারাপার করতে পারে।

আমি অসীম শূন্যতায় একা। এই পৃথিবী এই মাটি আমার নয়। আমি ভারবাহী এক জড় পদার্থ। ভাবনাহীন অনন্ত অন্ধকারে তলিয়ে থাকি। আমার কেউ নেই, কিছু নেই, রোশনি নেই। আমার জন্যে আছে কেবল বীভৎস স্মৃতি। আর এক কর্তব্য।

সকালেই উঠে পড়ি। দ্রুত তৈরি হই। সুকান্তকে আতিথেয়তার ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা মিশনারি ক্যাম্প। সাগির্দ মিঞাকে ডেকে পাঠাই। আমাকে দেখেই আবার তার চোখ ছলছল। নোংরা গেঞ্জি টেনে মোছার চেষ্টা করে। হাতের ব্যান্ডেজ বদলানো হয়নি। বলে ফির কেন এলি দাউবেটা। তাকে দেখলে আমার পাপের কথা মনে পড়ে। তু ইধার আসবি না।

তোমার কোনও পাপ নেই মিঞাজান।

আছে বেটা আছে। আমি কেন জুলম করলাম না। কেন রুখে দাঁড়ালাম না। তাহলে আমাকেও ওরা ত্রিশূলে ফেড়ে দিত। আগুনে ফিকে দিত। আমাকে কিছু দেখতে হত না।

তুমি এসব ভুলে যাও। আমার সঙ্গে চল।

কোথায় যাব বেটা। এই দিল দিমাক তো সঙ্গে যাবে।

তোমার চিকিৎসা দরকার। তোমাকে নিতে এসেছি আমি।

কিধর ?

আমার বাড়ি।

ঘাড় শক্ত করে দাঁড়ায় সাগির্দ মিঞা। হঠাৎ দামাদজি, আপ বলে সম্বোধন করে। বলে, আপকা তো হিন্দু মহল্লা দামাদজি। আপ ভি হিন্দু আছেন। কোন ভরোসা! □

একদা এক বাঘের গলায়...

স্ব প ন সে ন

...হাড় ফুটিয়াছিল

বেচারা বাঘ! মাংস তার বড়ো প্রিয় খাদ্য। মাংসের সঙ্গে হাড় থাকে তাও তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তার জানা ছিল না মাংসের সঙ্গে হাড়, ছোট্ট, টুকরো, কুঁচি, গলায় ঢুকে এমন বিপত্তি ঘটাতে পারে। সে পশুরাজ। আর এক টুকরো কুচোহাড়, যাকে সে গুরুত্বই দেয়নি, তাই কিনা গলায় ঢুকে...। সারস তার উপকারই করেছিল। বাঘের গলায় সে তার লম্বা ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছিল। কেননা পশুরাজের কষ্ট সে সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই পশুরাজের মধ্যে জেগেছিল অহংবোধ, আত্মসম্মানবোধ। সে পশুরাজ। তার গলায় কিনা ঠোঁট ঢুকিয়েছে অতি দুর্বল, সামান্য এক সারস। সবাই জানতে পারলে পশুসমাজে তার আর আত্মসম্মান বলে কিছু থাকবে? চারিদিকে ঢিঢি পড়ে যাবে। আর ওই টিংটিঙে সারস কিনা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। বলে বেড়াবে সবাইকে তার কীর্তির কথা। গৌরব গাথা। আর সারসের মতো শক্তিহীন অপদার্থও যদি তার কীর্তির কথা জনে জনে বলে বেড়ায়, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তবে পশুরাজের সম্মান থাকে কোথায়। সারস না হয়ে যদি তার সমশক্তিমান সিংহ বা হাতি হত তবে হয়তো এতটা আত্মসম্মানে আঘাত লাগল না তার। আর এই সম্মানহানির ভয়েই সে, পশুরাজ, ভুলে গেছিল সারস-কৃত উপকার। বেচাবা বাঘ! প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না তার। ফলে এ গল্পের যে পরিণতি তা পাঠক, আপনার আমার সবারই জানা।

নেপোর রামায়ণ এবং...

আমাদের এই নেপো সর্বজনবিদিত 'দই মারা' নেপো নয়। তবে ঘোলাজলে মাছ ধরত না বা ফাকতালে দই মারত না-যে একথা হলফ করে বলা যায় না। পুরো নাম নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ কয়াল। সজ্ঞাগুণে কেটে-ছেঁটে 'নেপো' হয়ে গেছে কোন মান্ধাতার বাপের আমল থেকে তা আমাদের জানা নেই। একডাকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে। জাত-ব্যবসা ডকের পাড়ে ঝুপড়ির ডিবরি আলোয় চোলাই অমৃত বিক্রি। আর অমৃত যেখানে থাকে মন্থনে গরল উঠবেই সেখানে। এছাড়াও তার একটা স্বতন্ত্র পেশা ছিল। কুজনে বলে পুলিশের টিকটিকি, ইনফরমার, পেশায় টিকটিকি হলেও সে আসলে গিরগিটিই। ক্ষণে ক্ষণে রং বদল করতে পারত আমাদের নেপো। একডাকে এ অঞ্চলের সবার চেনার আরও একটা কারণ, তার ছিল অন্য একটা নেশা, রাম-যাত্রার। দল ছিল তার। রামের

পালাগান গেয়ে বেড়াত এতদ্অঞ্চলে। যথারীতি রাম সাজত নেপোই, তার অধিকার বলে, দলের সর্বাধিনায়ক বলে কথা, যদিও গড়পড়তা বাঙালি-উচ্চতা থেকে সে কিছুটা খাটোই ছিল। আর যে এক-দুমাস বা কখনও কখনও তিন মাস রাম-যাত্রা বা রামের পালাগান চলত, সেই দিনগুলোতে নেপোর অমৃতের ঠেক বন্ধ হয়ে যেত রাত আটটার মধ্যে। বায়নার সময়ানুযায়ী পালাগান কেটে ছেঁটে ছোটো-বড়ো করে নেওয়া হত। সেবার অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে, ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে কালীপুজোর পর-পরই আমাদের পাড়ার শেতলা মন্দির চত্বরে দুমাসের বায়নায় বসেছিল নেপোর রাম-যাত্রার আসর। রাত ন-টায় বসত আসর, শেষ হত এগারোটা-সাড়ে এগারোটায়। আমরা যথারীতি আসরে হাজির হতাম নেপোর পেছনে লাগার উদ্দেশ্য। নেপো শুধু রামই সাজত না। যেদিনের আসরে রামের তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত না অর্থাৎ এক সিনে বা দুসিনে রাম থাকত, সেদিন নেপো দিনের হিরোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত। সে দশরথ-ভরত-লক্ষ্মণ-রাবণ-মহিরাবণ বা কিষ্কিন্ধার রাজা যে কোনো ভূমিকাই হোক না কেন। রাম সাজত সেদিন নেপোর অন্য কোন সাঙাত। দলের অন্য কোনো 'আর্টিস'। পালা গানের প্রত্যেক দিন বেশ ভাল পরিমাণে 'প্যালা' (দক্ষিণা) পড়ত আসরে। সেই প্যালা ভাগ হয়ে যেত আয়োজক সংস্থা এবং নেপোর দলের মধ্যে। বিশেষ বিশেষ দিনে, যেমন রামের রাজ্যাভিষেক, রামের হরধনু ভঙ্গ, রাম-রাবণের লড়াই-এর দিনে প্যালার পরিমাণ আরও বাড়ত। যাত্রার আসরের বাইরেও রামরূপী নেপোর প্রতি অঞ্চলের ঠাকুরমা দিদিমাদের ছিল এক অবতার-প্রতীম ভক্তি। কেননা নেপো যখন দিনমানে কোনো বাড়ি ঢুকত, 'কি গো মা-ঠাকুমারা কেমন আছ' বলে তখন সেইসব বাড়ির বয়স্ক মহিলারা সিধে (চাল-ডাল-আনাজের নৈবেদ্য), দক্ষিণা (আট আনা থেকে পাঁচ টাকা) দিত, এমনকি পায়ে হাত দিয়ে কেউ কেউ প্রণাম পর্যন্ত করত নেপোকে রামজ্ঞানে। নেপোও যেত সেইসব বাড়িতে যেখান তার ভক্তি-পাত্তর কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। আর তাদের ভক্তি এতটাই প্রগাঢ় ছিল নেপোর প্রতি যে তারা বিশ্বাসই করত না তাদের রাম চোলাই বেচে, বেচতে পারে। তাদের দৃষ্টিতে কোনো প্রভেদ, কোনো পার্থক্য ছিল না নেপো এবং রামে। যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের মুক্তির জন্য আর এক অবতার নেপোরাম। কেননা যেই রাম, সেই কৃষ্ণ। নেপো অবশ্য ঝুপড়ির অন্ধকারে চোলাই বিক্রি করাকে কোনো গর্হিত কাজ বলে মনে করত না। তাঁর মতে, এটা তার ব্যাবসা। স্বাধীন জীবিকা। তার 'লাইসেন' নেই বলেই পুলিশকে মাসোহারা দিতে হয়। না দিলেই তাড়া খেতে হয়। ঝুপড়িতে এসে হামলা চালায়। তাই বলে কি সে অপরাধী হয়ে গেল না আসামী? "আমদানি রপ্তানির 'লাইসেন' না থাকলেই পাচার হয়ে যায় গো বাবুরা। তার মানে কোন অপরাধ, কোন দু-নম্বরি 'লাইসেন-গুণে' মহত ব্যবসা। দেহ ব্যবসাতেও তাই গো বাবুরা।" নেপোর কথা-বার্তায মাঝে মাঝেই রামের-ছটা টের পাওয়া যায়।

তো সেই ১৯৯২ সালের কাহিনি। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল নেপোর রাম-যাত্রা। আর চব্বিশ-পঁচিশ দিনেই পালাগান পৌঁছে গেছিল রাম-রাবণের লড়াইতে। তারিখটা ছিল ৬ ডিসেম্বর। পাঠক, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে দিনটি। যেহেতু ওই

দিনটিতে বাবরি মসজিদ ভাঙার মধ্যে দিয়ে ভারতের ঐতিহ্য, ধর্মকে ধর্ষণ করার সূচনা হয়েছিল। যদিও সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল তার অনেক আগেই। তো এই রাম-রহিমের যুদ্ধের ডামাডোলে টেনশনে বন্ধ হয়ে গেল রাম-রাবণের যুদ্ধ। পরদিন থেকে শুরু হল কার্ফু। বন্ধ হয়ে গেল যাত্রা-পালা। কয়েকদিন পরে কার্ফু উঠল কিন্তু যাত্রার আসর আর বসল না। আসর না বসার কারণ অবশ্য শুধুমাত্র রাম-রহিমের যুদ্ধ নয়। এর কারণ ছিল আরও অনেক। মূল কারণ, সেবার আসরে তেমন লোক হচ্ছিল না। ফলে 'প্যালা' পড়ছিল খুবই কম। কেননা তার কয়েকবছর আগে, আটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই আমরা টিভির সাদা কালো, রঙিন হরেক কিসিমের স্বপ্নের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে পড়ছিলাম। টিভির দৌলতে তার আগেই ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে রাম-মাহাত্ম্য। তখন থেকেই রাম-আনন্দ সাগরে ডুবে রাম রাজত্বের স্বপ্ন দেখা শুরু। তো নেপোর রাম-যাত্রার গ্রামীণ কলাকৌশল শহুরে চোখে সেকেলে, গেঁয়ো মনে হওয়াই স্বাভাবিক। নেপোর ভোঁতা অস্ত্রে ছিল না সাগরের যাদু বাস্তবতা। আর জনগণ বস্তুটি এমনই এক স্বচ্ছ তরল, যা আয়নার মতো ব্যবহার করা যায়। কাদা-মাটি মিশে কখনও অস্বচ্ছ হয়ে গেলেও তার স্বধর্মে স্থিত থেকে ঢাল অনুযায়ী গড়িয়ে চলে। স্বাভাবিক কারণেই নেপোর রামযাত্রা পার্টি ভেঙে গেল, যুগের সঙ্গে, আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে। সেবারই বসেছিল শেষ রাম-যাত্রার আসর। ফলে রামের যে ইমেজ বা খোলস ছিল নেপোর সঙ্গে তা ধীরে ধীরে খসে পড়ল কিছুদিনের মধ্যেই। এই খোলসে পুলিশও হয়তো প্রতিহত হত কিছুটা। কেননা ইমেজ খসে যাওয়ার দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরও হানাদারি বাড়ছিল নেপোর ঝুপড়িতে। কারণ তখন আর ওই ঝুপড়িতে রামের অমৃত নয় নেপোর চোলাই বিক্রি হত। ফলে নেপো এক্ষেত্রে শুধু রং নয়, বদলে ফেলল তার কায়াও। রাম থেকে টিকটিকি। পুলিশের। নেপো ভেবেছিল পুলিশের সঙ্গে দহরম-মহরম থাকলে, টিপস দিলে, পুলিশের হামলা কমবে।

সীতা কাহিনি

রাম বিনে যেমন রামায়ণ হয় না, সীতা ছাড়াও হয় না। আমাদের এই নেপোর রামায়নেও সীতা ছিল। সীতা সাজত আয়েষা, রহিমের স্ত্রী, নেপোর পাশের বস্তিতে থাকত। আয়েষার আগের নাম ছিল কল্পনা। রহিমকে বিয়ে করার জন্যে কল্পনাকে ধর্মান্তরিত হতে হয়নি। কেননা বহুজাতিক শহরে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় বিশেষত দারিদ্র্য-সীমার নীচুতলার মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন অনেকাংশে শিথিল বা একেবারে থাকে না বললেই চলে। আয়েষা নামটা ধর্মান্তরিত নাম নয়, রহিমের দেওয়া। যদিও রহিম ধর্মের ব্যাপারে ছিল অনেকটাই একচক্ষু হরিণের মতো, তবুও কল্পনার রূপ-যৌবন তাকে পিপড়ে থেকে পতঙ্গ করে দিয়েছিল। ফলত সীতার ভূমিকা তার কাছে গৌণ ছিল, অন্তত বিয়ে পূর্ববর্তী জীবনে। কিন্তু বিয়ের পরে আয়েষা এবং সীতাকে মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে রহিমের পক্ষে। এদিকে রাম-রূপী নেপো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি তার সীতা আয়েষা হয়ে যাবে। নেপোর তুলনায় রহিম বেশ কিছুটা সুপুরুষ ছিল, বিশেষত উচ্চতা এবং দৈহিক গঠনে, যদিও নেপো তুলনায় গৌর ছিল বর্ণের দিক থেকে। তাছাড়া রামের

প্রতি সীতার যে শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, নেপোর প্রতি কল্পনার তা ছিল না। বিশেষত রামের ভূমিকায় অভিনয়ের সময় যে দক্ষতা, যে নৈপুণ্য ছিল, অন্তত তাদের দৃষ্টিতে, তা অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না কল্পনার। অথচ ভূমিকাহীন বা খোলসহীন নেপোর প্রতি সীতার সেই অচলা ভক্তি ছিল না সম্ভবত। নেপো সেটা উপলব্ধি করেছিল অনেক দেরিতে, সীতা যখন আয়েষায় রূপান্তরিত বা রূপান্তর পর্বে। আর তখন থেকেই নেপো চাইছিল আরও ঘন ঘন রাম-যাত্রার আসর। রহিমের অবস্থান ছিল এর বিপরীত বিন্দুতে। সে বলে 'বিধর্মীর কাজ'। আয়েষার গলায় তখন কথা বলে ওঠে কল্পনা, 'কেন, বিয়ের আগেই তো আমি বলেছিলাম, আমরা একসঙ্গে বাস করলেও কেউ কারও ধর্মে হাত দেবে না, নাক গলাবে না। সীতা-অভিনয় আমি ছাড়তে পারব না।' রহিমের স্বরে ক্রোধ, 'আমি তোমার স্বামী, আমার ধর্মই মেনে চলতে হবে। অন্তত আমার সঙ্গে থাকতে গেলে।' কল্পনা উত্তরে বলে 'আমি তোমার সঙ্গে থাকি না তুমি আমার সঙ্গে থাকো?' এ প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থেকে যায়। কেননা এই প্রশ্নের সামনে রহিম কুঁকড়ে যেত। আসলে ধর্মের অনুশাসনে রহিম বাঁধতে চাইত আয়েষাকে, রাম-সীতার মিলনকে। সে বুঝত রাম-সীতার মিলনের আড়ালে নেপো-কল্পনার অন্তরঙ্গতা। ধর্মীয় অনুশাসনে যখন সম্ভব হয়নি এ মিলন আটকানো তখনই রহিম প্রয়োগ করেছিল তার শব্দভেদী বাণ, 'সারারাত নাচন-কোদন করে এসে তুই আমার পাশে শুবি? মনে রাখবি তুই সীতা নোস, আয়েষা। সীতা সাজতে চাইলে তুই দূর হ এখান থেকে।' মুখে বললেও রহিম তাড়াতে পারত না তার আয়েষাকে। এর প্রধান কারণ কল্পনার রূপ-যৌবন। দ্বিতীয় কারণ রহিম প্রকৃতই ভালোবাসত আর আয়েষাকে। ট্রাক চালাত সারাদিন। অধিকাংশ দিনই রাতে মাতাল হয়ে ফিরত। তো রহিম যে মিলন বন্ধ করতে পারেনি রাম-সীতার, সেই মিলনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বাবরি মসজিদ বা রামানন্দের রামায়ণ।

নেপোর দুই ভক্ষণ...

ইমেজ খসে পড়ার পর রাম এবং সীতা দুজনেই উপলব্ধি করে তাদের নিজস্ব অবস্থান। তাদের নিজস্ব চেহারা ধরা পড়ে পরস্পরের কাছে। ফলত রহিমের অনুপস্থিতিতে রাম সেজে বা রাম হয়ে প্রায়ই আসে সে তা সীতার কাছে, রাতের অন্ধকারে বা দিনমানে। কখনও কল্পনা সীতা হয়ে তার দুবাহুর বেষ্টনে ধরা দেয়, কখনও আয়েষা হয়ে প্রতিবাদ করে। কখনও তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে শুধুই কল্পনা। সীতা বা আয়েষার কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে ওঠে কল্পনা।

— আমি তোমার সীতা নই।

— তাহলে? তুই আয়েষা?

· তুমি বা রহিম আমাকে সীতা বা আয়েষা ছাড়া কল্পনা করতে পারো না? তোমরা আমাকে কেউ কল্পনা ভাবতে পারো না কেন? আমিও একজন রক্তমাংসের মানুষ।

তাদের এই গোপন অভিসার ক্রমশ মুখোরোচক হয়ে উঠছিল ওই বস্তি বা নেপোর ঝুপড়ি অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে। আর এইসব মৌখিক কথার ডালপালা গজায়।

তাতে ফুল ফোটে। ফুলে ফুলে বিভিন্ন রঙে রঙিন হয়ে ওঠে এইসব কথারা। রহিমের কানে পৌঁছে যায় নিশ্চিত এইসব কথার অপভ্রংশ। রহিম কিছু বলতে পারে না তবুও, যেহেতু পুলিশের সঙ্গে নেপোর ওঠাবসার কথাও শুনেছে একই প্রক্রিয়ায়। এদিকে সীতা উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না রাম, যেহেতু সে শুধুমাত্র যাত্রার নায়ক, সাজা রাম। তার সীতা বন্দি আজ রহিমের ঘরে। রহিম একজন বিধর্মী— রাক্ষস— মায়াবী। নেপো-রাম ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। বানর সেনাদের সঙ্গে সলতে পাকাতে থাকে সীতা উদ্ধারের। হিঁদুর সীতাকে অপবিত্র করেছে বিধর্মী। কেউ কেউ নেপোর এই রাজনীতির চালে অন্ধ। কেননা নেপো তখন শ্রীরাম। শ্রীরামের মাহাত্ম্য তার কণ্ঠস্বরে। আবার কারও কারও কাছে রহিম এই বস্তিরই অংশ। একজন খেটে-খাওয়া মানুষ। ধর্ম তাদের কাছে আবরণ মাত্র। পাশাপাশি থাকতে থাকতেই এই উপলব্ধি, এই মনুষ্যত্ব জন্মেছে কারও কারও মধ্যে। কিন্তু রাম-ভক্তরা সে কথা শুনবে কেন? তাদের সীতা আজ বিধর্মীর স্পর্শে অপবিত্র। তাহলে রাম-রাজত্ব হবে কীভাবে? কেউ কেউ স্বর্ণ-সীতার কথা বলে। কেননা এই বস্তি অঞ্চলে রহিম অনুগামীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

দু-মুখো কথকতা

শোনা যায় ইদানিং চোরকে চুরি করতে আর গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলার দুমুখো নীতি নিয়েছিল নেপো। তার ঠেকে যেসব মাস্তান তোলাবাজরা আসত মাল খেতে, কখন, কোনসময় তা আগাম খবর পেয়ে যেত পুলিশ। আবার এইসব মাস্তানরা চম্পট দিত পুলিশ আসার আগেই, খবর পেয়ে। সন্দেহ নেপোর প্রতিই। কেননা তার ঠেকে কখন কে আসে সে ছাড়া কেউ জানে না। এদিকে তার ঠেকে মাল খেতে খেতেই কীভাবে পুলিশ আসার সংকেত পেয়ে যেত মাস্তানরা? সে ছাড়া ওইসময় ঝুপড়িতে কে খবর দেয়? তাছাড়া যেহেতু সেই একমাত্র জানে ওই সময় পুলিশ আসবে। আর এই পুলিশি হানায় তার ব্যবসা দিন-দিন ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু রাম ভক্তদের তীর রহিমের দিকে। তাদের যুক্তি, কেউ পুলিশকে খবর দিয়ে নিজের ব্যাবসার ক্ষতি করে? রহিমই গোপনে খবর দিয়ে রামের ব্যবসা লাটে তুলে দিতে চাইছে। রহিম অনুগামীদের পাল্টা যুক্তি, রামের সঙ্গে পুলিশের ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। পুলিশের টিকটিকি সে। আবার মাস্তানদের আগাম জানিয়ে দেয় তাদের হাতে রাখার জন্যে। এবং তাদের 'রহিম পুলিশে খবর দেয়' বলে ক্ষেপিয়ে তোলে রহিমের বিরুদ্ধে। এভাবে পরস্পরের গলার কাঁটা উপড়ে ফেলতে চায় রাম, রহিম। কিন্তু সারা পৃথিবীতেই সংখ্যাগুরুদের স্বার্থ, আধিপত্য, শাসন, মতামত মেনে নিতে হয়, চলতে হয় সংখ্যালঘুদের। যেহেতু এ অঞ্চলে রাম-ভক্তদের সংখ্যা বেশি, তাই তাদের মতামতই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে সবার কাছে, প্রচারের মাধ্যমে।

রামের পোশাক উধাও

একদিন হঠাৎ নেপো আবিষ্কার করে তার ঝুপড়িতে রাখা রামের পোশাক উধাও। ইদানিং রামের ভূমিকা পালন করতে না পারা এবং সীতা অন্যের ঘরে বন্দি থাকায়

মানসিক অবসাদে ভুগছিল রাম যাত্রার নায়ক। প্রায় দিনই তাকে দেখা যেত ঝুপড়ির মধ্যে গভীর রাতে রামের পোশাক পরে সীতা উদ্ধারের সংলাপ বলতে। দেখা যেত কিষ্কিন্ধার রাজার সঙ্গে পরামর্শ করতে বা যুদ্ধের ছক কষতে, বানর সেনাদের বা বিভীষণের পরমার্শ নিতে। সেই পোশাক আজ উধাও। কে বা কারা নিল, কখন উধাও হল কিছুই বুঝতে পারে না ঝুপড়িবাসীরা।

একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক সকালে নেপোর ঝুপড়ির সামনে হইচই, চিৎকার চেঁচামেচি। নেপোর ঝুপড়ির মধ্যে রামের ঝুলন্ত লাশ। রাম আত্মহত্যা করেছে। গলায় দড়ি দিয়ে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে অন্তত তাই অনুমান করা হয়। বলা হয় নেপো মানসিক অবসাদে ভুগছিল বেশ কিছুদিন। সে তার রাম ইমেজ ভেঙে বেরোতে পারেনি। কেননা ওই ইমেজই তাকে দিয়েছিল খ্যাতি, তার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, অসংখ্য ভক্ত আর আশ্চর্য এই যে, মৃত্যুর সময়ও তার গায় ছিল রামের পোশাক। চুরি যাওয়া বা উধাও হয়ে যাওয়া রামের পোশাক কীভাবে ফিরে এল তার গায়ে তা আজও রহস্যাবৃত। তবে আশপাশের ঝুপড়ির দু-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, আগের দিন গভীর রাতে সীতা এসেছিল রামের পোশাক হাতে তার ঝুপড়িতে। আর এর কিছুক্ষণ পরে, রাম-সীতার অন্তরঙ্গ সংলাপের পরে সীতা চলে গেলে, একদল লোক এসে খুলে ফেলে ঝুপড়ির দরজা। কারও কারও মতে ওরা পুলিশের লোক। এসেছিল সাদা পোশাকে। রাম ভক্তদের মতে, সে রাতে রহিম আর তার অনুগামী দলবল এসেছিল। আর তারাই রামের গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে সিলিং-এ। এরপর থেকেই রামভক্তরা নেপোর মালের ঠেক ভেঙে গড়ে তুলতে তৎপর হয় রাম-মন্দির, রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষে।

পুনশ্চ : পাঠক, বাঘের গলার হাড় বের করতে তৎপর এখন রামভক্তরা। কেননা রাম-রাজত্বে রহিমদের কোনো স্থান নেই। অতএব বাঘ আর সারসের গল্পটি পুনর্লিখন প্রয়োজন। □

ক্ষৌর

আ বু ল   বা শা র

মেয়ে বিক্রির গল্প করছিল ওরা। শিবাজি গলার শিরা ফুলিয়ে বলবার চেষ্টা করছিল, শোনপুরের মেলায় এখনও বাস্তবিকই মেয়ে কিনতে পাওয়া যায়।

—যায় ?

—আলবাত যায়, একশোবার যায়। বলছিল শিবাজী গোস্বামী।

অলক দুম করে বলে বসল, আমি তা হলে একটা মেয়ে কিনব, কিনবই। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারছে না বলে দিলাম। কত দাম ?

—তিন-চার হাজার।

—ঠিক করে বল।

—দুই-আড়াইতেও নাকি পাওয়া যায়।

—মাত্র দু-হাজার টাকায় একটা আস্ত মেয়ে ?

—অবাক হচ্ছিস তো ! আরে ভাই ভারতবর্ষে সব হয়।

বনমৌলি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল, কক্‌খোনো না।

অন্যন্য তৎক্ষণাত বলে উঠল, মৌলির লেগেছে বোধহয়।

অভিনন্দন খ্যা-খ্যা করে বেমক্কা হেসে দেয়। এই হাসিটাই বড্ড খারাপ।

—তুমি হাসছ অভি ! কেন হাসছ, এটা হাসির কথা ? তখন থেকে শিবাজি বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে ! তনুশ্রীও তখন থেকে মিটকে-মিটকে হাসছে। আজ তোদের কী হয়েছে, আলোচনার বিষয় ফুরিয়ে গেছে বোধহয় ! এই আলোচনা এখনই বন্ধ কর, না হলে আমি উঠে যাব।

—ব্যাস।

—আবার কী !

—মানে ?

দু-তিনজনের গলায় 'ব্যস, আবার কী, মানে'—ধ্বনিত হয় জড়িয়ে-মড়িয়ে এবং শিবাজি বলবার চেষ্টা করে, সে মোটেও মিথ্যা বলছে না। শোনপুরের মেলায় সত্যিই মেয়ে কেনাবেচা হয়।

—হয় তো হয়, তাই নিয়ে আলোচনা ! তোরা মজা পাচ্ছিস ? নিশ্চয় পাচ্ছিস। বলে বনমৌলি তেরছে তাকায় শিবাজির দিকে।

শিবাজি সামান্যই লজ্জা পায় এবং আমতা-আমতা করে কী একটা বলতে চেষ্টা করে, পারে না।

অনন্য এদের মধ্যে হাই ইন্টেলেকচুয়াল এবং গম্ভীর প্রকৃতির। সে মজা পাচ্ছে কি না

বোঝা যাচ্ছে না। অভিনন্দন দাঁত বার করেই রয়েছে, অবশ্য ওর দাঁত আপনা থেকেই হামেশা ঠোঁটের বাইরে চলে আসে, মুখ-বিবরে আঁটে না। ফলে তার চেহারা সর্বক্ষণ নির্লজ্জভাবে হাসি-হাসি দেখায়।

শিবাজিই আজকে মৌলিকে উত্যক্ত করার ঘুঁটি। তার উপরই বিশেষ রেগেছে বনমৌলি। তনুশ্রীর উপরও মৌলির চাপা রাগ চোখে-মুখে ছটফট করছে

অলকের চোখে চোখ রেখে চোখ মটকায় অভিনন্দন, যার অর্থ মৌলি খেপেছে, এবার তক্কো হবে পেল্লাই। আসর জমে উঠবে। তাছাড়া মজা তো পাচ্ছেই তারা।

এরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম কথা বলে মাসুদ রেজা। রেজাকে সবাই এরা রাজা বলে ডাকে। রাজা কোনো কথাই বলছে না, চুপচাপ শুনছে।

—শোনপুর জায়গাটা কোথায় রে শিবাজি? অলকের আমুদে জিজ্ঞাসা।

—বিহারে। শিবাজির জবাব।

—তুই যাবি? অলক জানতে চায়।

—সত্যিই যাব। মেলার ছবি তুলব। এখানকার একটা হাফ-কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনে স্টোরিফিচার করব। সব কথা বলে পাক্কা করে রেখেছি। বলে ওঠে শিবাজি।

অনন্য তনুশ্রীর চোখে অন্যমনস্ক দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, ওই স্টোরি চার বছর আগেই ছাপা হয়ে গেছে। অতএব এইরকম একটা বাসি চেষ্টার মানে হয় না।

অভি দড়াম করে বলল, হায়।

অনন্য অভির দিকে চাইল। শান্ত চোখে। নিজের মুখের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, কী করে হয়? শিবাজি তো সবসময় আমাদের পুরনো স্টক অভিনন্দন। ইসে এবং ইসে।

এই 'ইসে এবং ইসে' কথাটা কোনো রহস্য আড়াল-করা সাংকেতিক কিছু, হয়তো অনন্য মদ্যপানের ব্যাপারে বলছে বা আর কিছু — রাজা বাদে সবাই চকচকে করে হাসছে। অভি দাঁত আরও বার করে ফেলেছে।

তনুশ্রী তার চোখে দুষ্টু আলো খেলিয়ে জানতে চাইল, মানে?

অনন্য চোখের রহস্যময়তা পলকে উধাও করে দিয়ে গলা গাঢ় করে বলল, ও আর কবে নতুন কথা বলেছে! তোমরা হয়তো জানো না, আলাউদ্দিন খিলজির আমলে এই বাংলায় তিনটি ছাগলের বিনিময়ে হাট থেকে একটা মেয়ে কেনা যেত, মানুষ কিনত। শোনপুর হচ্ছে তারই হ্যাংওভার। বা রেস্ট অফ দি সিসটেম। বা...

—থাক। অত সমাজতত্ত্বের দরকার নেই অনন্য। তোমরা মেয়ে কিনতে চাও কেনো, কিন্তু দুহাজার টাকায় মেয়ে হয় না। এটা বাজে কথা। বলে মুখে মৃদু একটা ঝামটা দেয় বনমৌলি।

অভিনন্দন বলল, শিবাজি সংবাদ-ফিচারফটো সহ করবে, তা করুক আগে হয়েছে, এখনও হবে। তবে তার চেয়ে বড়ো কথা, মেয়ে কেনা; ভাবছ না যে ব্যাপারটা কী রোমাঞ্চকর।

—তাই বল!

—বলব কী বনমৌলি, আমরা যাচ্ছি। আমরা এনে দেখাব।

—দেখাবে বই কি। তোমরা বড়ো টাকার পণ নিয়ে যথাসময়ে বিয়ে করবে, তা-ও জানি।

—তোমার বাবাও নিশ্চয় সেটা দেবে।

—তোকে! তোর মতো ছেলেকে, অভি? কখখোনো না? রেগে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বনমৌলি। আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়।

অনন্য হাত তোলে। শোরগোল বাদে। তনুশ্রী বলে ওঠে, এটা কেমন হল ভাই! স্রেফ একটা মজা, তাই তো? না কী? তোমরা থামো, মৌলি চলে যাস নে।

মৌলি পা বাড়িয়ে থমকায়, গোলমাল থেমে যায়, অভি, শিবাজি, অলক হিহি করছিল, মাসুদও হেসে ফেলেছে। তনুশ্রীও হইচই করার মতো করে হাততালি দিয়ে উঠেছিল। তালি দিয়ে হাসি থামাতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। শিবাজি-অভি তেরিয়া হয়ে কী বলাবলি করছিল।

মৌলি বলল, আমার বাবা পণ দেবে, এটা রীতিমতো অপমানজনক কথা। আমি এতে নেই।

—কীসে নেই? অনন্যর কপট গম্ভীর মৃদু কৌতুকমেশা প্রশ্ন।

মৌলি বলল, এই ধরনের মেয়ে কেনা, পণ ইত্যাদি।

—পণের কথা তুমিই তো তুললে।

—বেশ তো। আমি চলে যাচ্ছি।

—যাবে কেন? আমরা কেউ মেয়ে কিনছি মা। ভাড়াও করছি না। তুমি নিশ্চিন্তে বসতে পারো। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে, এ-দেশে এখনো মেয়ে বিক্রি হয়। চাইলে কেনা যায়।

—হতে পারে।

—তার মানে তুমি বিশ্বাস করছ না?

—করছি না ঠিক নয়, তবে...

—তবে?

আলোচনার টেবিলে ফিরেএলে বনমৌলি। টেবিলে হাতের ভর রেখে অনন্যর দিকে ঝুঁকে বলল, এই আলোচনাটা ভালো নয়, আমার ভালো লাগছে না।

শিবাজি বলে উঠল, আমি কিন্তু কিনছি মাসুদ। অ্যাই, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি। ও, কে? কিনবই কিনব। শস্তা, কচি এবং সুন্দরী।

—অসভ্য! বলে ওঠে মৌলি।

—আমার সভ্যতার দরকার নেই। শিবাজির মন্তব্য।

—তুই মেয়ে কিনলে, আমি পুলিশে খবর দেব। একটা মেয়ে দু-হাজারে হয় না। দৃঢ় ঘোষণা মৌলির।

—তিন হাজারে হয়। বলে শিবাজি।

—তিনটে ছাগলের দাম কত? অলক বলে ওঠে।

—তোর পকেটে কত টাকা আছে রে! মৌলির আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি।

—দশ।

—ওই তো মুরোদ।

—কেন তুই হবি নাকি!

—মানে!

—বিক্রি হবি? তা হলে আর শোনপুর যেতে হয় না। তোকে টাকা ধার করে কিনব বনমৌলি।

—তাই নাকি।

—অবশ্যই।

শিবাজির চোখে এবার আগুনের চোখ রাখে মৌলি। তারপর টেবিল থেকে হাত তুলে টেবিলের আধখানা কিনারা গোল হয়ে ঘুরে শিবাজিরই কাছে আসে। এবং গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসে।

সবাই তো হতভম্ব। চমকে ওঠে মাসুদ। অনন্যও হতবাক। অভিনন্দনের চোখমুখে একটা কেমন ফ্যালফেলে দৃষ্টি। অলক মাথা নামায়। চড় মেরে দ্রুত একটা চেয়ারে ছুটে এসে বসে পড়ে মৌলি। তারপর মুখের উপর আঁচল চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে।

শিবাজি চড়-খাওয়া গালে একটা হাত রেখে বলে, মজাটাও বুঝলি না মৌলি, তোকে কেনার মতো ছেলে এখানে নেই।

আমি ধারে বিক্রি হব। ধারের টাকায় কিনবি আমাকে। চোখের উপর থেকে আঁচল সরিয়ে বলে ওঠে বনমৌলি। তারপরই বলে, পারলে নগদে পারচেজ করে দেখা। বেশ, দুহাজারেই বিক্রি হব। নে, কিনে নে। পারবি? আছে টাকা? ক-টাকার টিউশন কবিস রে!

অলক বলল, তুমি অন্যায় কবলে মৌলি। তুমি অত সিরিয়াস না হলেই পারতে। তুমি শিবাজিকে মারলে কেন?

—ছাগলের সঙ্গে মেয়ের তুলনা! গলায় ক্ষোভ মৌলির।

—তুই পাগল বনমৌলি। বলে ওঠে অনন্য।

তুমিই একা সিরিয়াস এবং ইন্টেলেকচুয়াল। তাই না?

—নিশ্চয়। আমার তথ্যে ভুল নেই। শোনপুরে মেয়ে নিলাম হয়।

আমি তো বিক্রি হতেই চাইছি। কিনে নাও। তবে নগদে। পারবে?

তনুশ্রী বলল, কাউকে কিছু কিনতে হবে না ভাই! শোনপুরেও কেউ যাবে না। তুই মৌলি শিবাজির কাছে ক্ষমা চেয়ে নে।

—না। আমি তো বিক্রি হতেই চাইছি। বলে ওঠে মৌলি।

—এটা তোমার একটা দুর্বোধ্য জেদ। বলে ওঠে অনন্য।

বনমৌলি বলল, বেশ তাই। কিন্তু আমি রাজি ছিলাম। আমার বাবা-মা ডাক্তার। আমি বাপ-মায়ের একমাত্র কন্যাসন্তান। আমার চেয়ে চোদ্দ বছরের ছোট একটা ভাই আছে। ব্যাস। আমি দু-হাজার টাকায় বিক্রি হব। আজ যে-কোনো কারণে হোক, মন ভাল ছিল না। ওইসব ন্যাকামি-মস্করা ভালো লাগছিল না। এমন করে... শিবাজি বার বার মেয়ে কেনার জন্য এমনই করছিল যেন একটা সামন্ত, চোখেমুখে এমন একটা

ভাব... আমার ভালো লাগছিল না।

—বেশ তো। কেনো তাহলে। অনন্য উঠে দাঁড়াল। এবং নিজের কথার রেশ টেনে বলল, কারও কাছে দু-পঞ্চাশের বেশি নেই, থাকলে আজ তোমার কী হত বনমৌলি! চলো। আসর ভেঙে দাও। তুমি মাফ চাইলেও ভালো করবে, হাজার হোক আমরা বন্ধু।

—না। বলে ফুঁসে ওঠে বনমৌলি, এতই সে রেগেছে।

মাসুদ এবার ধীরে-ধীরে পাঁচশো টাকার চারখানি নোট বার করে টেবিলে রেখে দিয়ে বলে, আমি তা হলে মৌলিকে কিনে নিচ্ছি অনন্য।

সবার চোখ বড়ো-বড়ো হয়ে ওঠে। শিবাজির চোখমুখে অদম্য কিন্তু চাপা একটা হাসি ফুটে ওঠে আবেগে বুক ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু সেই হাসি মুহূর্তপর হঠাৎ-ই ছাই হয়ে যায়।

মাসুদ টেবিলের উপর অত্যন্ত নতুন পাঁচশো টাকার চারখানি নোট রেখে তর্জনি দিয়ে চেপে রেখেছে। বনমৌলিকে দেখছে না, অন্য সবার মুখে এক-এক করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে।

তনুশ্রী অনন্যর উঠে দাঁড়ানো দেখে দাঁড়িয়েছিল। ঝপ করে বোকার মতো চাউনি ফুটিয়ে বসে পড়ল।

দাঁড়িয়ে ওঠা অনন্য ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল। এই বন্ধুচক্রের সেই হয়তো নেতা, অঘোষিত-অলিখিতভাবে। প্রথমে সে রাজার তর্জনিলিপ্ত সবুজ টাকার নোটগুলি দৃষ্টি তেরছে দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ দেখার পর অশ্বগ্রীব মাসুদকে দ্যাখে—দ্যাখে তার কাত করে ঝাঁকানো ঘাড় এবং চেয়ারে বসাভঙ্গি, রাজা সামান্য বেঁকে গেছে। শাদা শার্ট এবং কালো প্যান্ট রাজার প্রিয় পোশাক।

মাসুদ, মৌলি বাদে সবাইকে একবার দ্রুত দেখে নিয়ে দৃষ্টিকে আঙুলের ডগায় নিবন্ধ করেছে, যেন সেই দৃষ্টি দিয়ে ঘূর্ণমান চক্রের মধ্যবর্তী মাছের চোখ বিন্ধ করা যায়।

মাসুদের প্রতিজ্ঞাবন্ধ আঙুল এবং চোখ বার কতক দেখে নিতে থাকে অনন্য। অনন্যই একমাত্র বন্ধু যে-কিনা মাসুদকে রাজা না ডেকে রেজা-ই ডাকে। ইন্টেলেকচুয়াল বলে নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে চায়, না কি মাসুদকে সূক্ষ্মভাবে মুসলমান শনাক্ত করতে চায়। মাসুদের মনে হয়েছে, উচ্চারণের শুদ্ধতাই একমাত্র উদ্দেশ্য না-ও হতে পারে।

অনন্য যথেষ্ট ভারী গলায় বলল, তুমি কি মজা করছ রেজা?

মাসদু দৃষ্টি না সরিয়ে হালকা মাথা নেড়ে বলল, মোটেও না। তোমাদের কারো কাছে এর চেয়ে বেশি থাকলে পিঠ মারতে পার, আমি সরে দাঁড়াব। আমার কাছে এই দু-হাজারই আছে, মেসের খোরাকি বাবদ দিতে হত।

—দেবে না?

—দেবো, পরে দেবো। অবশ্য কী করে দেবো জানি না।

—না দিতে পারলে 'মিল' বন্ধ হয়ে যেতে পারে?

—পারে। কারণ অন্যরা আমার চেয়েও হাড়-হাভাতে, এক মাসের জন্য আমার 'মিল' টানতে পারবে বলে মনে হয় না। পারলেও করবে না।

—কেন ?

—ওরা কৃপণ এবং স্বার্থপর। খুব ইয়ে...হিসেবি...অবশ্য এক জন বোধহয় ভালো। জানি না ঠিক। আসলে কী জানো...বলে চুপ করে রইল রাজা।

—হ্যাঁ, বলো! অনন্য জানতে চায়।

এবার মাসুদ আঙুল থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে অনন্যর চোখে সেই দৃষ্টি মেলে দিয়ে গলায় কেমন একটা শব্দ করে হেসে ফেলে। বলে, আসলে এটা একটা দাঁও। গতকাল এই টাকা মানি-অর্ডারে এসেছে। ভাগ্যিস পকেটে ছিল।

প্রত্যেকে মাসুদকে দেখছিল। শিবাজি একবার অলকের সঙ্গো শঙ্কিতভাবে দৃষ্টি বিনিময় করে মাসুদের অভিব্যক্তিতে মন দিল। তনুশ্রী কাঁটা হয়ে দাঁতে উড়নির প্রান্ত ধরে স্থির, তার ভ্যাবলা চাউনি ছটফট করে চলে যাচ্ছে এর মুখে, তার মুখে এবং মৌলির তপ্ত মুখমণ্ডলে। বনমৌলি ঘামতে শুরু করেছে, মাসুদের কথার যে-জোর এবং দৃষ্টির নিবন্ধতা, তাতে সে ভয় পেয়েছে। রীতিমতো ভয়ই পেয়েছে। তার ঠোঁট শুকিয়ে উঠেছে। সে আঙুলে জড়াচ্ছে আঁচল এবং চোখ বন্ধ করছে ঘনঘন এবং অর্থহীনভাবে শূন্যে কোথাও জানলার দিকে চাইছে।

অনন্য একবার একঝলক মৌলিকে দেখল। অভিনন্দনের দাঁতের দিকে চেয়ে নিয়ে তনুশ্রীকে অবলোকন করল এবং যেন তার উদ্দেশ্যেই বলল, তা হলে মজাটা আর মজা রইল না তনুশ্রী। একেই বলে হাসতে-হাসতে কপাল ব্যথা। তবে দু-হাজার টাকায় সত্যিইকি কিছু হয় ?

এই পর্যন্ত বলে মাসুদের দিকে চোখ ফেরায় অনন্য। এবং জানতে চায়, মেসে জাগয়া হবে রেজা ? তোমার মেসে ?

—না। ওটা ছেলেদের মেস।

তাহলে কোথায় রাখবে মৌলিকে ? অনন্য প্রশ্ন করেই শিবাজির দিকে চাইল।

শিবাজি বলল, সেটা রাজাকেই বুঝতে দাও। ওর জিনিস, এখন রাখা ফেলে দেওয়া ওর ব্যাপার।

জিনিস। প্রায় চমকে উঠল তনুশ্রী।

অলক অল্পই কিতকিতে হেসে বলল, জিনিসে আপত্তি তনুশ্রী! কিন্তু সেটাই সই, কেননা বনমৌলি নিলামে উঠেছিল স্বেচ্ছায়।

তোমাদের লজ্জা করছে না। তেরিয়া প্রশ্ন তনুশ্রীর।

অলক বলল, কীসের লজ্জা।

—নারী-বিলেস, না ? রোমাঞ্চ ? শোনপুর! তোমরা কারা ?

—মানে!

—এটা প্রহসন হচ্ছে নাকি! তোমরা সেই আদ্যিকালের পুরুষ, সেই...

আহা! তুমিই তো তখন হাসছিলে মিটকি-মিটকি। এখন তোমার গায়ে লাগছে কেন ? যা হবার তা তো হয়ে গেছে।

—না হয়নি। তুমি ওই টাকা পকেটে তুলে নাও রাজা। যাও, মেসে গিয়ে খোরাকের টাকা জমা করো, নইলে খেতে পাবে না। পেট শুকিয়ে তো মেয়ে কেনা যায় না। মেয়ে

কারা কেনে?

—তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ নাকি!

—দিচ্ছি বইকি।

—কেন দিচ্ছ?

—এটা অন্যায় বলেই দিচ্ছি। ইট ইজ অ্যাবসার্ড। হয় না। হতে পারে না।

—তুমি বলছ পারে না। মৌলি কিন্তু বলেনি। ও সিরিয়াসলি নিজেকে বিক্রি করেছে।

— ওর মাথা খারাপ হয়েছে। চাল নেই, চুলো নেই। মেয়ে কেনা, বললেই হল! আমি ভেবেছি, 'জাস্ট ফান'। অ্যাই মৌলি, তুই কথা বলছিস না কেন?

বনমৌলি এবার একটুখানি কেঁপে উঠল। অলক তনুশ্রীর সঙ্গে এখনো লড়তে চায়। মৌলি জানলা দিয়ে আরও দূরে দৃষ্টি চালিয়ে দেয়।

অভিনন্দন বলে উঠল, যা বাবা, সবই তো গুবলেট হয়ে যাচ্ছে। এটা তো শব্দজব্দ ছাড়া কিছুই না তাহলে, স্রেফ ভাঁওতা! ভাবলাম, মৌলি সত্যি-সত্যিই... যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি ভাই রাজা, হাত তুলে নাও।

মাসুদ টাকার নোট আঙুলে আরো সুন্দর করে চেপে ধরে বলল, তাহলে কী সাব্যস্ত হল! পণ নিয়ে বিয়ে, মৌলির বাবা দেবেন এবং তোমাদেরই মতো কেউ নেবে। তোমরা নও, অন্য কেউ। আমরা বড্ড বেশি বিলাসী এবং প্রচণ্ড সিরিয়াস, তাই না? তনুশ্রীরও উচিত হয়নি, মজাকে অসহ্য ভেবে কথা বলা। আমরা খুব জানি, আমরা কী।

অনন্য এবার হঠাৎ-ই রেগে গেল এবং বলল, তুমি তাহলে লোভে পড়ে গেছ রেজা!

কিন্তু ভেবে দেখলে না, কাকে কিনতে চাইছ তুমি?

—দেখেছি।

—দ্যাখোনি। দেখলে তনুশ্রীর কথামতো... আচ্ছা, তুমি সত্যিই কী করবে বলতে পারো? সত্যিই তো, চাল নেই, চুলো নেই আর তা ছাড়া...

—অনন্য, আমি জানি লোভটা আমার নয়, তোমার।

—সবই তুমি জানো দেখছি। কিন্তু তুমি তো মুসলমান। তাই না?

মৌলিরা ব্রাহ্মণ! আমিও অবশ্য 'মণ্ডল', দোখনে মণ্ডল। আমার লোভে ফল নাই রেজাবাবু, সব বুঝেই তনুশ্রী...

—এখন তো গুজরাট-ম্যাসাকার হয়েছে। জাতের কথা ওঠাই স্বাভাবিক। আমি জানতাম। তুমি অনন্য, গত সপ্তায় 'সাহিত্য পত্রিকায়' পত্রিকায় 'গুজরাট' নিয়ে কবিতা লিখেছ। মহৎ সব উপলব্ধির ব্যাপার। আমাকে মুসলমান ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছ না। তোমার কলম এবং তোমার মুখ এতটাই আলাদা বন্ধু।

—তুমি গরিব, এই কথাই বলতে চাইছি রেজা। তোমাদের ওয়েভ-লেংথে মিলবে না। তাই...

—কী? কী বললে, কিসের লেংথ?

—ওয়েভ-লেংথ।

—সেটা কী বস্তু?

—তা-ও জানো না?

—না। বলে টেবিলের উপরই চোখকে স্থির ধরে রাখে মাসুদ।

—তুমি শোনোনি কথাটা! বিস্ময় প্রকাশ করে অনন্য।

—না।

—এটা একটা চালু কথা। আকছার বলে লোক।

—কোথাকার লোক তারা?

—মানে হয়! আবার বিস্ময় ঘনায় অনন্যর কণ্ঠে।

মাসুদ জানতে চায়, কথাটার বাংলা মানে করো।

—তুমিই করে নাও।

এবার অলক-অভিনন্দন-শিবাজি-তনুশ্রী একসঙ্গে হেসে ওঠে। হাসির মধ্যেই অলক বলে ওঠে, রাগটা কার কীসে, বোঝা যাচ্ছে না। যাকে নিয়ে কথা সে-তো কিছুই বলছে না। ছিল নিলাম, এখন গড়াচ্ছে স্বয়ম্বরার দিকে। মুসলমান না তফসিলি, বামুন না কায়েত! ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল! না কি উলটোটা? যাকগে, দাঙ্গা বেধে না গেলেই বাঁচি।

আবার হাসি।

—'ওয়েভ-লেংথ' কথাটা টু মাচ ইন্টেলেকচুয়াল। আমি বুঝি না, বুঝতেও চাই না। শুনে থাকলেও মনে রাখিনি। বলে উঠল মাসুদ।

—তার মানে তুমি গুমোর করছ। অনন্য বলল।

—গুমোর কীসের। দরিদ্র মুসলমানের গুমোর।

—আমিও নিজেকে দোখনে 'মণ্ডল' বলেছি রেজা। তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

—মণ্ডল হলেও তুমি হিন্দু। এবং ভালো ছাত্র। তুমি এস.সি কোটায় চান্স না নিয়েই পড়াশোনা করছ। চাইলে তুমি মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে ঘরেও যেতে পারো।

—তুমি পারো না?

—না।

—কেন?

ওই যে বললে, ওয়েভ লেংথ।

তনুশ্রী এবার বলে উঠল, তুমি কিন্তু রাজা বড্ড বাঁকা-বাঁকা কথা বলছ! আমরা কেউই কমিউনাল নই, জাতধর্ম তোলাটা কি...

—কে তুলেছে তনুশ্রী! আমাকে হঠাৎ মুসলমান বলা হল কেন?

—তুমি মুসলমান বলেই অনন্য বলেছে এবং নিজেকে সে এস.সি. বলেছে।

—কেন বলল?

স্টপ, স্টপ ইট! প্লিজ! বলে উঠল শিবাজি। তারপর দু-হাতের দু-আঙুল নিজের দু-কানের লতি আলতো করে ছুঁয়ে বলল, আমারই ঘাট হয়েছে অনন্য। আমি বা অলক, কেউই শোনপুর যাচ্ছি না। মেয়েও কিনছি না। তুমিও বাসনা ত্যাগ করো রাজা!

চোখ-মুখে আশ্চর্য আহত ভাব ফুটে উঠল মাসুদের। ঘাড় গোঁজা করে চুপচাপ বসে রইল সে। বাসনা ত্যাগ করো, কথাটা মারাত্মক হল।

সবাই চুপ।

মাসুদ তাজা নোট চারখানা আঙুল দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেয়। ধীরে-ধীরে। এবং দু-আঙুলে তুলে টাঙিয়ে ধরে চোখের উপর শূন্যে, তারপর আঙুল দিয়ে টোকা বাজায় টাকার গায়ে ফুঁ দেয়। অতঃপর পকেট থেকে একটা পার্স বার করে তাতে রেখে, পার্সকে প্যান্টের পিছনে পকেটস্থ করে।

উঠে দাঁড়ায় মাসুদ। তারপর অনন্যার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হাত বাড়াও অনন্য। তুমি বস্তুত বুদ্ধিমান, আমার চোখে তোমার যোগ্যতা সন্দেহাতীত। তোমার 'ওয়েভ-লেংথ' আমার নয়, তোমার ভালো রেজাল্ট ; আরও ভালো করবে তুমি। তোমার মতো মেধাবীকে 'মণ্ডল' পদবি দুঃখই দেয়, কারণ ওটা তোমার পক্ষে অবাঞ্ছিত অ্যাপেন্ডিকস্। হাত বাড়াও।

অনন্যকে করমর্দন করে মাসুদ বলল, আমি হলাম মুসলমান মণ্ডল। পুরো নাম মুহম্মদ মাসুদ রেজা মণ্ডল। আমার দুজন দাদিমা। এক জন শাদা—একজন কালো। গাঁয়ের লোক এই দুই দাদিমাকে বলে, কালো জিন, সাদা জিন। দাদিমা, যিনি কালো, তেনাকে আমার দাদামশাই অর্থাৎ ঠাকুরদা বিহারের কোনো মেলা থেকে সত্যিই কিনে এনেছিলেন। পাঁচশো টাকায়।

বনমৌলির চোখমুখ অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছিল। মাসুদের কথায় এবার সে চমকে উঠল। দৃষ্টি ঈষৎ বাঁকা করে তপ্ত-বিষণ্ণ চেহারায় মাসুদকে দেখছিল।

শিবাজি অবাক হয়ে বলল, পাঁচশো মানে তো সেকালে অনেক টাকা!

—নিশ্চয়। অনেক টাকা। সত্যিই তো দু-হাজার টাকায় এই কলকাতায় এ-সময় মানুষ কেনা যায় না। আমি কি পাগল নাকি! কেউ নিজেকে বেচে দিতে চাইলেই কিনে ফেলা যায়? এই কফি-হাউস দাসদাসীর হাট তো নয় অলক। তাছাড়া মজাটা অন্যখানে তনুশ্রী। তোমরা একটু চমকাবে বইকি!

কালো জিনের কথাটা থামালে কেন? অভিনন্দনের জানতে চাওয়া।

মাসুদ বলল, ধলা দাদি মুসলিম সন্দেহ নেই, দাদাজির প্রথম বউ। কালো জিন খুব সম্ভত হিন্দুই।

খুব সম্ভব কেন? অলকের জানতে চাওয়া।

মাসুদ বলল, কালো দাদি নিজের ধর্ম জানেন না। উনি সিঁদুর-শাখা পরেন। নামাজের সুরা-পারা কিছুই মুখস্থ করতে পারেননি। উনি আমাকে এই কলকাতায় বিদ্যা উপার্জনের জন্য পাঠিয়েছেন। বাড়ি রাজি হচ্ছিল না। কালো জিনের ছেলেপুলে হয়নি। আমি ধরো তেনার সন্তান। যাক গে। আসল কথাটা এবার বলি।

থামল দু-দণ্ড, তার পর মাসুদ বলল, বাজারে পাঁচশো টাকার জাল নোট বেরিয়েছে। এগুলো জাল। আমি এতদূর ফাঁকি দিয়ে বনমৌলিকে কিনতে পারব না ভাই। তার মানে এখানে ওকে কেনার লোক, এই টেবিলে কেউ নেই। আমি মৌলিকে গ্লানিমুক্ত করে দিলাম। তার বদলে সে আমাকে প্রসন্ন মনে একশো টাকা ধার দিক। নাহলে আমি খেতে পাবো না, আমার 'মিল' বন্ধ হয়ে যাবে। চারখানা নোট মানি-অর্ডারে ফেরত পাঠিয়ে বলতে হবে, জাল।' ব্যাস। আমি চলি। দে মৌলি, টাকা দে। বলে বনমৌলির চোখের উপর হাতের তালু মেলে ধরে মুহম্মদ মাসুদ রেজা মণ্ডল।

সমস্ত ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে, মৌলি এখনও ভাবড়ানো অবস্থা কাটিয়ে যে উঠতে পারছে না। একটা চাপা অসোয়াস্তি তাকে পীড়া দিচ্ছিল। মাসুদের তালু তার চোখের উপর প্রসারিত। ফরসা-রক্তাভ হাতের তালুর চন্দ্রস্থানে একটা নীলাভ বড় তিল।

থতোমতো গলায় মৌলি বলল, আমার কাছে নেই অত। দাঁড়াও। তুমি আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যাবে? তাহলে দিতে পারি।

—কোথায়?

—একটা দোকানে। এসো। বলে পা বাড়ায় বনমৌলি।

তনুশ্রী বলল, ধার আমিও দিতে পারি। নেবে, মাসুদ?

অনন্য বলল, কাউকে দিতে হবে না, আমিই দিচ্ছি। বলে কাঁধের কাপড়ের থলেয় হাত ঢুকিয়ে একটা পার্স বার করে তা থেকে একটা একশো টাকার নোট তুলে নিয়ে মাসুদের সামনে বাড়িয়ে ধরে অনন্য।

বনমৌলি বলে ওঠে, টাকা রাজা আমার কাছে চেয়েছে!

—আমি দিলে ক্ষতি কী হচ্ছিল! অনন্য জানতে চায়।

—সে তো তনুশ্রী দিলেও চলত, তুমিই বা পিঠ মারছ কেন? বলে ওঠে মৌলি।

অনন্য বলল, দোকানে যেতে হবে কেন! আমি দিচ্ছি, রেজা টাকা নিয়ে চলে যাক।

—চলে যাবে মানে। অবাক হয় শিবাজি।

—ওর ট্রেন ধরার ব্যাপার আছে না! বলে অনন্য।

মৌলি বলল, তাহলে ভালোই হল। আমি ওকে শেয়ালদার দিকেই নিয়ে যাচ্ছি। দোকানটা ওইদিকেই। এসো রাজা।

মাসুদ তার পেতে রাখা শূন্যে ভাসমান হাতটা নামিযে নিয়ে বলল, আমি অন্য কোথাও ধার পেয়ে যাব অনন্য। গুডবাই, পরে দেখা হবে। বলেই চেয়ার টেনে সরিয়ে পথ করে নিয়ে মাসুদ দ্রুত ধেয়ে চলে যেতে চায় কফি-হাউসের দরজার দিকে।

মৌলি ডেকে ওঠে, দাঁড়াও রাজা, যাবে না।

—যেতে দাও বনমৌলি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। দ্রুতই বলে ওঠে অনন্য।

মৌলির ডাকে থমকে-দাঁড়িয়ে পড়া মাসুদ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে কফি হাউসের দরজার দিকে চলে যায়। একবার পিছনে ফিরেও দেখে না।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ে মাসুদ। মাসুদ অদৃশ্য হতেই অনন্য বলে ওঠে, আশ্চর্য! জাল টাকা নিয়ে মজা করল রেজা। কী ধুরন্ধর বুদ্ধি, এ তো স্বয়ং আলাউদ্দিন খিলজি। না, ও বেটার তারিফ করতেই হচ্ছে তনুশ্রী।

তনুশ্রী বা অন্য কেউ কোনো জবাব দিল না। অভিনন্দন তখন দাঁত বার করে বলল, শোনো হে অনন্য। নোটগুলো জাল না হতেও পারে।

—কী বলছিস অভি!

—হ্যাঁ ব্রাদার, জাল মনে হয়নি আমার। রাজার মতো সেনসিটিভ বন্ধু আমাদের একটিও নেই। ওর নানাজি নীলরতনের ডাক্তার ছিলেন। হাই-ফ্যামিলি ওদের! রাজা মোটেও গরিব নয়।

এই পর্যন্ত বলেছে অভিনন্দন, ওর কথা শেষ না হতে দিয়েই বনমৌলি বলে উঠল,

তোমার সঙ্গে কাল কথা হবে অনন্য। আয় তনুশ্রী। আমার সঙ্গে যাবি? বলে এক নিমেষ অপেক্ষা না করেই মৌলি কফি-হাউসের বাইরে চলে আসে। পিছু-পিছু ডাকতে-ডাকতে ছুটে আসে তনুশ্রী।

বাইরে এসে মৌলিকে আর পায় না সে। তার কিছুটা নেমে আসতে দেরি হয়, কারণ সে স্থূলাঙ্গী, সিঁড়ি দ্রুত ভাঙতে পারে না, হাঁসের মতো হাঁটে।

বনমৌলি একটা গলির মধ্যে দেখতে পায় রাজাকে। একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত দড়ি থেকে শস্তা ছোট চারমিনারে আগুন নিচ্ছে আপন মনে।

পিছন থেকে এসে আচমকা ডেকে ওঠে বনমৌলি রাজার নাম ধরে। রাজা দড়ি ছেড়ে দিয়ে চমকে উঠে পিছনে চায় এবং বোকার মতো নিঃশব্দে হেসে উঠে বিস্ময় প্রকাশ করে, তুমি!

—তুমি সিগারেট খাও?

—হ্যাঁ। অল্প দু-একটা।

—এত সস্তা খাও কেন? শরীর খারাপ করবে না?

—না।

—তুমি সরাসরি না বলছ?

—হ্যাঁ। আমার করে না।

—কম খাও বলে?

—হয়তো।

—তুমি মিথ্যা কথা বলো?

—একটু-আধটু। কিন্তু তুমি এলে কেন? অনন্য তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

—ওর সঙ্গে রোজই তো কথা হয়। কাল হবে। তাছাড়া রাত্রেও হতে পারে। ও আমার ভাইকে পড়ায়।

—ও। বলে দোকান ছেড়ে পথে নামল মাসুদ। পিছনে হেটে এসে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে বনমৌলি।

—তুমি কফি-হাউসে মিথ্যা বলেছ? প্রশ্ন মৌলির।

কথা বলছে না মাসুদ।

—তোমার নোটগুলো জাল কী করে বুঝলে? ফের প্রশ্ন।

মাসুদ মৌলির মুখের দিকে পাশ থেকে চেয়ে দেখে বলল, পঞ্চম বর বলেছে।

—পঞ্চম বর?

—বর পদবি, পঞ্চম নাম। মেসে থাকে, আমাদের সঙ্গে।

—কী বলেছে?

—চলবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর মৌলি বলল, নোটগুলো ভালো করে দেখেছ?

—আমি টাকা চিনি না।

— বর চেনে? জাল ধরতে পারে?

—বলল তো!

—কী বলল ?

—চলবে না বলল। বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলল।

—আর কাউকে দেখাওনি ? কথা বলছ না কেন ?

মাসুদ চুপ করেই থাকে। তারপর হঠাৎ বলে, ভেবেছি।

—কী ভেবেছ ?

—নোট যদি চলে, ভালো। নইলে কালো জিনের কাছে রিটার্ন যাবে। রাঘব মোদক বলেছে, নোট ঠিক আছে।

—আমাকে দাও।

থমকে পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ। পথেরই উপর কিছুটা মুখোমুখি মতন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মৌলির চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল।

তারপর মাসুদ বলল, কালো জিনকে ধাক্কা দেওয়া দরকার। ও আমাকে জোর করে কলকাতায় এম.এ. পড়তে পাঠাল, নিজে একটা গো-মূর্খ। সারাজীবনে এক লাইন সুরা মুখস্থ করতে পারেনি। তাই নিয়ে দুঃখের শেষ নেই। ওর জন্যই নয় বছর আমাদের ফ্যামিলি একঘরে ছিল, আমার ছেলেবেলায়।

—আমাকে সব বলবে ?

—কী বলব ?

—তোমার কথা।

—আমার কথা। আমার আবার কী কথা ?

—কালো জিন, ধলো জিন।

—ধুর !

—ধুর কেন ? জানাতে তোমার লজ্জা করবে ?

—না, না। লজ্জা কীসের ! আমার নিজের কেমন সন্দেহ হয়।

—কাকে ? কী সন্দেহ ?

—কালো দাদিমাকে।

—বলো না আমাকে। আচ্ছা, আমাকে দেখাবে ?

—কী দেখাব ?

—তোমার কালো জিন, ধলো জিন।

এবার হাহা করে হেসে উঠল, নির্জন পথে চমকে উঠে চুপ করে গেল মাসুদ। তারপর হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিল। তার সঙ্গে ছুটতে পারছে না মৌলি।

—আস্তে চলো, প্লিজ।

গতি কিছুটা কমিয়ে দেয় মাসুদ। পিছন থেকে প্রায় উড়ে এসে পাশাপাশি হয় মৌলি।

—নোট ফেরত গেলে কালো দাদিমা ধাক্কা খাবে, অন্যরা খাবে না ?

—কালো দাদি কাঁদবে। অন্যরা মজা পাবে।

—কেন ?

—আরে ভাই, আমার কিছু ঘাট হয়েছে কিনা।

কী ঘাট হয়েছে ?

আমার একটা অসামান্য সুন্দরী মামাতো বোন ছিল, ছিল নয়, এখনো আছে। আমার বাবা পক্ষ, মা-পক্ষ, তামাম গুষ্টি উঠে পড়ে লেগেছিল সুহানার সঙ্গে বিয়ে দিতে। কিন্তু 'সুহানা' তো বোন।

—বুঝেছি।

—কিচ্ছু বোঝনি।

—কেন?

—'বোন' একটি অনুভূতি। সুহানাকে আমি 'বোন' ছাড়া ভাবতেই পারি না। এদিকে 'বোন'টা আমাকে লাগাতার প্রচারে, ছেলেবেলা থেকে, 'বর' ভেবে বড়ো হয়েছে। কী কাণ্ড!

—তারপর?

—যাক গে।

—যাক গে কেন, বলোই না।

—'বোন একটা অনুভূতি।

—নিশ্চয়।

—আমি যতই বলি, 'বোন', সুহানা 'বোন'। ওকে বিয়ে করা যায় না। সবাই ততই বলতে থাকে, 'বোন' তো কী হয়েছে! ভাই-বোনে বিয়ে জায়েজ, অর্থাৎ আপন বোন বাদে, অন্য বোনেদের যে-কারো সঙ্গে বিয়ে সিদ্ধ, ধর্মসম্মত। তাছাড়া সুহানা রাজাকেই 'বর' বলে জেনেছে। আমি সুহানাকে একদিন ডেকে বললাম, 'তুই কী মনে করেছিস আমাকে?'

—বললে!

—কেন বলব না! বললাম, 'বোন' একটা অনুভূতি, তুই বুঝিস। এ বিয়ে হবে না।

—মুখের উপর বলে দিলে!

—হ্যাঁ।

—সুহানা তখন কী বলল তোমাকে?

—সে-একটা কান্না বটে! নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিলে। শুকিয়ে যেতে লাগল।

—তারপর?

—তোমার দোকানটা কোথায়?

—আছে। চলো।

—সত্যি বলছি, কালো জিন ছাড়া কেউ তো বুঝল না। ওই দাদিমা প্রতিবাদ করে বলল, ছেলে চাইছে না, বোনকে বিয়ে করবে না, কেন তোমরা জোর করছ। এই কথাই বলল কালো দাদি, ওমনি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা সংসার, তাকে মুহূর্তে 'হিন্দু' ঠাউরে বসল সবাই। মা পর্যন্ত বলল, আপনি 'হিন্দু' বলেই এ-কথা বলছেন। আপনি 'হিন্দু' বলেই নামাজের সুরা আপনার কণ্ঠস্থ হল না। ব্যাস।

অনেকক্ষণ ফের চুপচাপ মাসুদ। কথা কম বলে বন্ধুচক্রে, কিন্তু কারুও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একান্তে বেশ সুন্দর কথা বলতে পারে। শুধু তাই-ই নয়, আজ তো কফি-হাউস থেকেই খাপ খুলেছে। কোথায়ও একটা চাপা অপমানবোধ ওকে ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত করে

তুলেছে। তাকে 'মুসলমান' বলায় হয়তো দুঃখই পেয়েছে। তনুশ্রী এবং অনন্য মাসুদকে মুসলমান হিসেবেই দেখে।

ভাবছিল বনমৌলি। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বারবার রাজাকে চোখ তুলে দেখছিল, অবাক হচ্ছিল এবং কথা বলতে চাইছিল। এবং মনে-মনে সে রাজার কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

—তারপর বলো। তাগাদা লাগায় মৌলি।

—কী বলব? বলে চুপ করে যেতে চায় রাজা।

হঠাৎ-ই রাজা বলল, অনন্যর কাছে টাকা নিলেই ভালো করতাম বোধহয়। আমরা সবসময়ই কিছু না কিছু ভুল করি। খেয়াল করি না, কী বলছি।

—আমাকে বলছ।

—না, তোমাকে নয়। আমি নিজেকেই বলছি।

—কী ভুল বলেছ তুমি?

—আমার চুপ করে থাকা উচিত ছিল। রোজ আমি নিজেকে বলি, চুপ করে থাকো। কালো দাদিমা এত চুপচাপ থেকেও যখন একটা-দুটো কী বলত, তখনই কোনো-না কোনো ভাবে দুঃখ পেত। তাকে আমাদের ফ্যামিলি 'হিন্দু' করে রেখেছিল, গ্রামের মানুষও ভাবত মেয়েটা 'হিন্দু'। এটা এক ধরনের খেলা চলছিল সংসারে। দাদামশাই কালো জিনকে কি বিয়ে করেননি, অমনিই রেখে দিয়েছিলেন? তাই বা কেমন, কী করেই বা হয়।

—কালো দাদিমাকে তুমি কখনও প্রশ্ন করোনি?

—করেছি।

—কী বলতেন উনি?

—বলত, সমাজ করে আমাদের বিয়ে হয়নি কিনা, তাই। গোপনে হয়েছে। শুনে মনে হত, ওই বিয়েতে সাক্ষী-সাবুদ ভালোমতন জোগাড় হয়নি। কাজটা পাকা কাজ ছিল না। আচ্ছা, তোমাকে এইসব বলছি কেন?

—আমি তো শুনতেই চাইছি রাজা!

—আসলে কতকগুলো নারী-আচার করত কালো দাদি, তাই দেখে ভাবা হত, ওইসব হিন্দুয়ানি কোথায় পেল মেয়েটা! সুন্দর আলপনা দিত কালো জিন। ঘটা করে সিঁদুর পরত, শাঁখা-পলা পরত। এই দাদিমায়ের কোনো বাবা-মা সম্পর্কিত পূর্বস্মৃতি ছিল না। কোথাকার মেয়ে জানা যায় না। খুব অদ্ভুত একটা জীবন। স্পষ্ট কোনো স্মৃতি নেই, ঘর-দোর, বাপ-মা, গ্রাম সম্পর্কে গল্প নেই। আমার আজকাল অন্যরকম মনে হয়।

—কী মনে হয়?

—তুমি শুনে কী করবে, তোমার কোনো কাজে লাগবে না। তাছাড়া একটা ধারনার কথা না বলাই ভালো। দাদিমা আজও বলে না, তার অতীত কী। ওকে কোনো দালাল হয়তো মেলায় এনে বেচে দিয়েছিল। দাদামশাই বলতেন... না, থাক।

—থাকবে কেন?

—কথাগুলো কাউকে বোলো না।

—না।

—কথা হচ্ছে, আমি জীবনটাকে একেবারে অন্যভাবে বুঝেছি বন। এ ঠিক ভাসা-ভাসা কিছু নয়। তোমাদের সঙ্গে কিছুই মিলবে না। ওই যে, ওয়েভ-লেংথ-এর কথা উঠল তখন, সেটা তো ভাববার কথাই বটে। যদি ধরো, ওয়েভ-লেংথ অব ইমোশনস বলি, তাহলে সেটার বাংলা করতে হবে, 'আবেগ তরঙ্গের সাম্য' বা সমতা। খুব শক্ত কথা। তাই ওই প্রসঙ্গে যেতে ইচ্ছে করে না। অননার সঙ্গে তর্কেও আমার রুচি নেই। বুঝি একটা কথা, জীবন অপরিমেয়, অনন্য বই পড়ে কথা বলে এবং লেখে, ও জীবনের বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। নাহলে আমাকে 'মুসলমান' বলে ছাপ দিত না, এইভাবে চিহ্নিতকরণ মস্ত সাম্প্রদায়িকতা।

—সরি! আমি তোমাকে কিছু বলিনি রাজা!

—এই যে, লোকে বলে, সব ব্যাপারে 'সিরিয়াস' হওয়া ঠিক নয়, বলো না? কিন্তু হঠাৎ তুমি 'সিরিয়াসলি রিঅ্যাক্ট' করলে। না করলেই পারতে, আমিও চুপচাপ থেকে চলে আসতে পারতাম। কিন্তু হল না—না তোমার, না আমার। এবার ভেবে দ্যাখো...

—হ্যাঁ বলো, বলো।

—শিবাজি আজ কিছুদিন ধরেই শোনপুরের মেলার কথা বলছে। এটা ওর এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন। মধুমন্তী বলে একটা মেয়ে ওকে সম্প্রতি বিদীর্ণ করে ল্যাং মেরে কেটে পড়েছে। তাই এটা ওর একটা ফ্যান্টাসি, নেশার মতো করে ভাবছে। এই ওয়েভ-লেংথে আমরা কেউ নেই। ওই অলকও নেই। তাই না?

—হ্যাঁ।

—তুমি নারীবাদীদের মতো দুম করে জেহাদ করে নিলামে চড়ে বসলে। তুমি ভালো করেই জানতে, তোমাকে কেউ কিনতে পারবে না। কিন্তু মজাটা এই, আমার কাছে দৈবাত জাল নোট ছিল বা সেগুলো জাল না হতেও পারে। এর কারণ জাল নোট সবাই চেনে না। পঞ্চম বর অথবা রাঘব মোদক, কে ঠিক—এখনও স্থির করতে পারিনি। খবরের কাগজে জাল নোটের ব্যাপারে মাসখানেক আগে একটা বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েছে। ফলে, আমি এই নোট নিয়ে কী করব বুঝে পাচ্ছি না।

—আমাকে দেবে।

—পাগল।

—কেন? আমি তো ওগুলো দেখিয়ে নেব।

—কোথায়?

—লোক আছে।

—খেলাটা কিন্তু কফি-হাউসের টেবিলেই শেষ হয়ে গেছে বনমৌলি।

—না, না। তরঙ্গ এখনও বইছে। ইটস আ ভেরি বিগ লেংথ রাজা। সব ঢেউ সবার কাছে সমান নয়।

—আমি সেই কথাই বলছি।

—আমিও তাই-ই বলছি।

রাস্তার এই জায়গাটা অসম্ভব আলোকিত ; এখন সন্ধ্যা নেমেছে। গলিগুলোর একটা চৌমাথা মতন। এখানে টিউব আলো ধবধব করছে। গলিগুলো মিটমিটে। আলোয় চমকে উঠল ওরা।

দুজনই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল, লোক নেই জায়গাটায়। তবু ওরা হেসে ফেলে সাবধান হয়ে এদিক-ওদিক দেখল।

মুখে হাত চেপে ফিশফিসে গলায় মৌলি চোখে চাঞ্চল্য খেলিয়ে হেসে ফেলে সাবধান হয়ে এদিকে-ওদিকে দেখল।

—কী হল তাতে!

—হল এই যে, টাকাটা বার করো। কুইক, ভেরি কুইক।

—মানে।

—আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও।

—তোর ঠাকা!

—নয় তো কার। তরঙ্গ এখনও বইছে রাজা। তুমি দিতে বাধ্য।

—ছিনতাই করবি?

—ইয়েস।

—খেতে পাবো না মৌলি।

—চাল নেই, চুলো নেই, কেনবার সময় মনে ছিল না?

—আমি জাল নোট দিয়ে তোকে কিনতে পারি না বন।

—তুমি নিশ্চিন্ত নও।

—কী?

—জাল কি না।

—সেই কথাই তো বলছি।

—আমিও সেই কথা বলছি। তোমাকে নিশ্চিত হতে দিলে তরঙ্গ থেমে যাবে। তোমাকে আমি ভীষণ চিনেছি। তুমি পলাতক, পালিয়ে বেড়াও। অ্যাই, বার করো, বার করো। দাও, দিয়ে দাও।

—এ কিন্তু ঠিক হচ্ছে না বন, ঠিক হল না। কাতর গলায় বলতে-বলতে পার্স বার করে মাসুদ।

চারখানা সবুজ নোট দু-আঙুলে তুলে নিয়ে বলে, তুমি কিন্তু চাঁদ, আমি বামুনও নই।

—আমিও তাই বলি। বামুন কথার দুই অর্থ। কিন্তু তুমি বেঁটেও নও ব্রাহ্মণও নয়। একটু বেশিই লম্বা তুমি। দাও, এই জায়গাটা মনে রেখো। দাড়াও, আগে টাকাটা ঠিক করে রেখে দিই। এবার চলো। তোমাকে একশো টাকা নিশ্চয় দেব। ধারে কিন্তু, পরে শোধ দেবে।

—কালো জিনকে পাঠাতে হত টাকাটা।

—না, কালো জিনই তো নিচ্ছে রাজামশাই।

—তুমি কালো নও।

—তামাটে।

—ধ্যাত।

—সাহেবরা তো সেই কথাই বলে। ভারত-এশিয়ার কেউ সাদা নয়, সব কালো।

—তাহলে তো গল্পটা হয় না বোন।

—কোনটা।

—আমার দুই দাদিমা। তাছাড়া সুহানা তো টকটকে ফরসা।

—আর একবার বলো।

—কী বলব?

—ওই যে, 'বোন' একটা অনুভূতি। তোমার মুখে ভীষণ ভালো লাগল, বলো না একবার।

—'বোন' একটা অনুভূতি।

—হ্যাঁ, আর একবার।

—আবার কেন?

—শোনো, ওই কথাটা মাঝে-মাঝে বলবে। কেমন?

—বোনটা পাগল হয়ে গেছে।

—কেন?

—আমারই জন্যে মৌলি!

মৌলি চমকে উঠল। তারপর দ্রুত হাঁটতে লাগল।

২

রাজাদের বন্ধুচক্রটা নিতান্ত শিথিল ধরনের। অনন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। অভিনন্দন পড়ে কম্পারেটিভ লিটারেচার। অলক ইতিহাস। শিবাজি ইংরেজি। তনুশ্রী এবং বনমৌলি বি.এ. পড়ে। তনুশ্রী অর্থনীতি, মৌলি বাংলা। অনন্য জি.এস হওয়ার সুবাদে এবং কলেজ সোশালের সময় নাটক করতে গিয়ে তনুশ্রী ও মৌলিকে আকর্ষণ করেছিল।

সেই থেকে এরা মোটামুটি একসঙ্গে ওঠা-বসা করে। এই দলে রাজা এসেছে সব শেষে। নাটকে সে শেষ মুহূর্তে এসে জুটে পড়েছিল। নেপথ্যে থেকে তাকে নানান জীবজন্তুর ডাক ডাকতে হয়েছিল। কারণ অনন্য তখন 'হরবোলা' খুঁজছিল। কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজা 'হরবোলা' নামে খ্যাত হয়ে পড়ে। কিন্তু নাটকের বাইরে তাকে নানাভাবে চাপ দিয়েও কেউ পাখি বা জন্তুর ডাক-ডাকাতে পারেনি।

মাসুদ বলেছিল, থিয়েটারে অনন্যর কাজ চলছিল না বলে করে দিয়েছি, তা-ও পরদার আড়াল থেকে। কারও সামনে বসে আমি কখনও কিছু ডাকি না। কারণ আমি হরবোলা নই, হতেও চাই না।

এতই গম্ভীরভাবে বন্ধুদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল রাজা যে, কেউ আর চাপ দিতে সাহস পায়নি। ফলত, ওর হরবোলা খ্যাতি দ্রুতই বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

তাই বলে সে কিছু ডাকে না, কখনোই ডাকে না, তা নয়। মন খারাপ হলে সোনারপুরের কাঠপোল পেরিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে একাকি ডাক ডাকে। একা ডাকে,

একাই শোনে।

ওর একটা ধারণা, অদ্ভুতই বটে, সে মনে করে, নানান বিচিত্র ডাক ডেকে মরা ডালে ফুল ফোটানো যায়। যে গাছটা মরতে বসেছে, তার কাছে চলে আসে মাসুদ। সে গুঞ্জনধ্বনি শুরু করে দেয়। গানও করে। একটা ছোটো সাইজের মিহি আড়বাঁশি আছে, সেটি সে বাজাতে পারে।

সবটাই তার একান্ত ব্যাপার। ইদানীং সে একটা বারোমেসে সজনে গাছকে নিয়ে পড়েছে। ওটা রয়েছে একটা ফলন্ত নদীর হঠাৎ-ওঠা পৃথিবীর চামড়ার ওপর উচ্ছ্রিত জলধারার বিশেষ একটি কিনারে এবং ভেঙে পড়ে গেছে। শস্যপ্রান্তরের ভিতরে সেই জলস্রোত এবং বৃক্ষ।

ফল্গু নদীর গল্প এখানে বিস্তর। নদী এখানে পাতালে ঢুকেছে। এবং হঠাৎ কোথাও খানিকটা বয়ে যাচ্ছে মাটির উপর। বুদ্ধি দিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, একটা নদী কীভাবে মরে যায়।

গল্পটা এই যে, নদী একটা ছিল, তার চিহ্ন আছে। নদীকে মরতে দেখা মানুষের মৃত্যুর চেয়ে করুণ। মাঠের মধ্যে এসে কতবার মনে হয়েছে মাসুদের।

চেষ্টাটা তার নিজেরই কাছে বেখাপ্পা এবং হাস্যকর। তবু সে নাচার। এখানে এসে পড়তেই হয়। গুজরাটের সংখ্যালঘু-নিধন-যজ্ঞ তাকে এতই ভীত এবং বিষণ্ণ করেছে যে, বার-বার সে ফল্গুস্রোতের অর্ধমৃত স্বজনের কাজে এসেছে। রেলপথে প্রায় প্রতিদিনই সে কোনা-না-কোনোভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

সবচেয়ে যা তাকে বিমূঢ় করেছে, তা হল, ট্রেনের মধ্যে অতি প্রকাশ্য, উগ্র আলোচনা, সম্প্রদায় তুলে মানুষের কথা বলা। 'মুসলমানরা এই, মুসলমানরা ওই'—'ওদের তোষণ করা হয়', 'ওদের বড্ড বাড় বেড়েছে,' 'ওরা এখানে আছে কেন!'

এই ধরনের কথা সে কখনো আগে শোনেনি। মুর্শিদাবাদের যে-গ্রামে বাড়ি সেখানে এ-কথা কখনো বলা হয় না। তারও কারণ ওখানে মসুলমানরাই সম্প্রদায় হিসেবে সংখ্যাগুরু। বরং সেখানে হিন্দুরাই কখনও-কখনও অপমানিত হয়। গঞ্জের বাবুরা ভয়ে-ভয়ে থাকে। মুসলমানদের মনে-মনে ঘৃণা করে এবং ভয়ও পায়। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি।

মুর্শিদাবাদে একটা চালু কথা, ছড়া-স্লোগানের মতন মানুষকে বলতে শুনেছে ; ওই জেলাটা নাকি আড়াই দিন স্বাধীনতার সময়, পাকিস্তানে ঢুকে গিয়েছিল, যেমন খুলনা ঢুকে এসেছিল ভারতে—তখন মুসলমানরা পাকিস্তানি ঝান্ডা উড়িয়ে স্লোগান-মিছিল হাঁকিয়েছিল :

হাতমে বিড়ি মুহ্‌মে পান
নারা-এ তকবির, পাকিস্তান—
হাতমে বিড়ি, মুহ্‌মে পান
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান॥

খুব ছেলেবেলা থেকেই ওই স্লোগানে যে-চিত্র ফুটে উঠে, পান-বিড়ি খাওয়া জবজবে মুখ উন্মত্ত-উগ্র মুসলমানের, তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেছে মাসুদ। তার পক্ষে বোঝানো কঠিন, এই ঘৃণা তার আজও শেষ হয়নি কেন। এই উগ্র-উন্মাদনার শরিক হওয়া তো

অগাধ খাদে পড়া, পরন্তু সে এই উন্মত্ততার জন্য ভয় পেয়েছে, কষ্ট পেয়েছে, বিষণ্ণ হয়ে গেছে। এমনকী সে ওই সমাজে বাস করে মনঃপীড়ায় মাঝে-মাঝে অসুস্থবোধ করেছে।

কলকাতায় এম.এ. পড়তে এসে তার অভিজ্ঞতায় এক উলটো বিষ-বিষ্ঠা পড়ল, কে কম, কে বেশি সে আর স্থির করে উঠতে পারল না। গুজরাটের ঘটনায় তার সমস্ত আস্থা-বিশ্বাস-প্রীতি-প্রসন্নতা গু হয়ে গেল। তার শরীরে সবসময় এটা চ্যাটচেটে অনুভূতি।

মানুষ কী, আদতে মানুষ কেমন জীব—এই একটা মৌলিক প্রশ্ন তাকে তাড়িয়ে ফিরতে লাগল। সে কি পশুই আলটিমেট? সে মুখ্যত মাংসাসী-নরখাদক এবং আপন প্রজাতি ভক্ষণকারী ডাইনোসার? কী এই মানুষ?

গুজরাটময় পৃথিবীতে, আফগানময় পৃথিবীতে, কাশ্মীরময় পৃথিবীতে, পেন্টাগনের বাণিজ্য-সৌধের গলে-পড়া পৃথিবীতে—লাদেন-তালিবানময় পৃথিবীতে—যুদ্ধ-ধ্বংস-সাম্প্রদায়িকতা-বিষ-বিষ্ঠার পৃথিবী—কালো-সাদা বিদ্বেষী দুনিয়ায় মানুষ জীব হিসেবে কোথায় মৌলিক? কী তার অনন্যতা, কীসে সে আলাদা, কী ভাবে মানুষ নিজেকে মানুষ মনে করে?

—অ্যাই রাজা? শুনছ?

—হুঁ।

—হুঁ কী? কী ভাবছ বলো তো।

—'হাত্তমে বিড়ি, মুহ্‌মে পান।'

—মানে!

—মানে আর কী। একদল লোক, হাতে ধরানো বিড়ি, মুখে চপচপে পান, পিক ফেলে বেড়াচ্ছে পচপচ করে, ফু-হু-চরু-দ্রু-ফোত করচে। তলোয়ার-লাঠি--সোটা নাচাচ্ছে মাথার উপর। চপর চপর করে খাচ্ছে।

—ধ্যাত!

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। তুমি বুঝবে না বনমৌলি।

—কী বুঝব না?

—নাটকে তুমি অনন্যর প্রেমিকা সেজেছিল!

—তো?

—তুমি অভিনয় করছিলে আর ও-বেচারি বিহেভ করছিল, তোমাকে সত্যি করে চুমু খেয়েছিল, দর্শকদের দিকে পিঠ রেখে। তুমি কাউকে সেকথা বলতে পারনি।

—বাজে কথা!

—অভি আমাকে বলেছে।

—অভি কী করে জানল?

—অনন্যই অভিকে বলেছে।

—কবে?

—এরই মধ্যে কবে যেন।

—একথা হঠাৎ, এতদিন বাদে?

—গল্প করেছে।

—কেন ?

—এইসব গল্প মানুষ কখন করে ?

—কখন ?

চুপ করে রইল মাসুদ। সে তার মেসের খাটে উপুড় হয়ে রয়েছে। মেস খালি। সে একা। খাটের প্রায় গা-লাগা চেয়ারে বসে রয়েছে বনমৌলি।

মাসুদের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতি, আন্ডারওয়ারের কতক অংশ ধুতির ফাঁকা দিয়ে বাইরে ঠেলে এসেছে। গেঞ্জি ছাপিয়ে কাঁধের কাছের লোমগুলো চোখে পড়ছে মৌলির। ওখানে বাঁ-হাতের হালকা স্পর্শ দিতেই কেঁপে উঠে কাত হয়ে গেল রাজা। নিজেকে কুঁকড়ে ছোটো করে নিয়ে বলল, আমাকে অনন্য আজ একটা জায়গায় একা দেখা করতে বলেছে, কী নাকি কথা আছে!

বনমৌলি চমকে উঠে তার হাত নিজের দিকে গুটিয়ে নিয়েছে চকিতে। গলার কাছে আধমুঠি মতো করে গুটানো হাতে রেখে জানতে চাইল, কোথায় ?

—আমি কলকাতার ৯৯ শতাংশ চিনি না। পথ মনে থাকে না।

যাবে কী করে ? আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি।

—না। আমি বলেছি, যেতে পারব না।

—যেয়ো না।

—ও আসবে। আমরা দক্ষিণের একটা ছোটো স্টেশনে যাব। কথা হবে। ওকে আমি কোন্ স্টেশন বলিনি। যে-কোনোও স্টেশনে নেমে যাব। তা-ও আমিই ঠিক করব। হঠাৎ করে নেমে পড়ব।

—তুমি ভয় পাচ্ছ ?

—যদি দেখি, সঙ্গে কেউ আছে, তাহলে আর বার হব না।

—ও তোমাকে অপমান করবে মনে করছ ?

—বলা তো যায় না।

—কেন অপমান করবে তোমাকে!

আবার চুপ করে রইল মাসুদ। তারপর দু-পায়ের ফাঁকে কাপড় সামলাতে সামলাতে চিত হল খাটে। চোখ দুটোর চাউনি কিছুক্ষণ অপলক রেখে দিল সিলিং-এ। ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

সেই চিকচিকে জলে দৃষ্টি রেখে মৌলি বলল, আমি নাটকে অ্যাকটিং করেছি, বিহেভ তো করিনি রাজা!

—ও করেছে।

—তার আমি কী করব!

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে মৌলিকে একবার দেখল মাসুদ। তারপর আবার চোখ স্থির করল আগের ভঙ্গিতে। চুপ করেই রইল।

—মানুষ একটা রিসোর্স-ওরিয়েন্টেড অ্যানিম্যাল। জমি-মেয়েমানুষ-ধর্ম, এই হচ্ছে তার ওরিয়েন্টেশন। এটা তার আদি এবং প্রাথমিক ব্যাপার। এই ব্যাপারে তার অনন্ত উৎসাহ। আজও। হঠাৎ বলল মাসুদ—চুপ করে থেকে একসময়।

তারপর দু-দণ্ড চুপ থেকে বলল, মানুষের গল্প কখনো নতুন হয় না। মৌলিকভাবে মানুষ একঘেয়ে।

—কীসব ভাবছ!

—একদম ঠিক ভাবছি বনমৌলি। তুমি একটা রিসোর্স বা সম্পদ, তাই তোমাকে দখল করাটা আমাদের কাজ। পাটিয়ে-পাটিয়ে বা জোর করে। তুমি মাত্র দুহাজার টাকায় বিকিয়ে গেছ, এ-জিনিস লোকে সইবে না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি। বলে খাটে উঠে বসল মাসুদ। বসে রইল চোখ বুজে। তারপর খাট ছেড়ে নামল।

ঘরের কোণের পড়ার টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা লম্বা শাদা খাম বার করে আনল। মৌলির বসা-চেয়ারের সামনে বসে খামের মুখ হালকা আঙুলের চাপে ফাঁক করে চারখানা সবুজ পাঁচশো টাকার নোট এবং সঙ্গো একটা চিরকুট টেনে বার করল।

চিরকুটটা মৌলির হাতে দিয়ে বলল, কুরিয়ারে এসেছে, পড়ে দ্যাখো।

মৌলির চোখ বড়ো, আরো বড়ো হয়ে চিরকুটে নিবন্ধ হয়। তাতে লেখা, 'ফেরত দাও। সঙ্গো পাঁচ টাকা বেশি দেওয়া গেল। না দিলে পস্তাবে।'

ধীরে থরথরিয়ে সমস্ত দেহ কাঁপতে শুরু করল মৌলির। সারামুখ ছাই হয়ে গেল। ঠোঁটের উপর ঘাম জমল। কপাল মৃদুভাবে সিক্ত হয়ে উঠল। তারপর অকস্মাৎ ক্রোধের সঙ্গো সারা মুখে শোণিত ফিরে এসে দপদপিয়ে উঠল। রাজার চোখে চোখ মেলল মৌলি। এবং কাঁপা গলায় বলল, এ অন্যায়, এটা নোংরামি। এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

—কী করবে?

—কী করব মানে।

—দাঁড়াও, রেগেমেগে তো কিছু হবে না। আগে ভাবো কে চিরকুট লিখে টাকা পাঠিয়েছে। তাছাড়া, ব্যাপারটাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি কি না ভেবে দেখতে পারো।

—না, বলে, দু-চোখ বন্ধ করে একটা দম নেবার চেষ্টা করে মৌলি।

সহসা চোখ খুলে মৌলি বলল, তুমি কোথায় ফেরত দেবে আমাকে! এ কার হাতের লেখা! বলে চিরকুটে চোখ নামায়।

—অনন্যার নয়?

—না।

—শোনো, এ-লেখা অলক-অভি-শিবাজিরও নয়।

—কী করে বুঝলে? সবার হাতের লেখা পরীক্ষা করেছ?

—অভি বলেছে।

—কী বলেছে?

—আমাদের বন্ধু-সার্কেলে কারও হাতের লেখা এরকম নয়।

—অভির নিজের হস্তাক্ষর?

—না মৌলি। সে তো নয়ই। অভির ধারণা, বাইরের কাউকে দিয়ে লেখানো হয়েছে।

—সরাসরি লিখলেই তো পারত!

—তাই কি হয়! দ্যাখো, সে সামনে আসার ভরসা পাচ্ছে না।

—এ অত্যন্ত নিম্নমানের ব্যাপার।

—তা বইকী। ক্ষুধার্ত প্রেম নিম্নমানেরই হয়, সেটা ওত পাতে। ওই যে বলে না, প্রেম আর যুদ্ধ আসলে কোনো নীতির তোয়াক্কা করে না। ছলে-বলে-কৌশলে জেতাটাই আসল।

—তুমি বিশ্বাস কর?

—কী?

—প্রেম আর যুদ্ধ...

—লোকে বলে...ঠিকই বলে, প্রেম হচ্ছে লড়াই, দখল করার যুদ্ধ।

—তুমি ঠিক করে কথা বলো।

—কৃষ্ণ তার মামির সঙ্গে প্রেম করেছিল, সমাজের নীতি-ফিতি মানেনি। আয়ান ঘোষ বেটাও নপুসংসক, তার ওই অক্ষমতা নাকি পূর্বজন্মের অভিশাপ। নারায়ণের তপস্যা করে পূর্বজন্মে আয়ান বর চাইল, তোমার স্ত্রী লক্ষ্মীর মতো, হে ঠাকুর, আমার একটা বউ হোক। তাই শুনে ঠাকুর নারায়ণ চটে গেলেন। কী, এত বড়ো আস্পদ্দা! লক্ষ্মীকে চাইছে, আহাম্মক। যা, পরজন্মে তুই নপুংসক হবি, বউটা তোর বাগে থাকবে না। এই হল গে কথা।

—বাজে কথা।

—বাজে কথা নয় গো মেয়ে। আয়ান শাপে পড়ে 'ডিজএব্‌ল্‌ড' হয়ে সারাজীবন ফ্যা-ফ্যা করে গেলেন, রাধিকাকে বিহার করলেন কানাই। ঘটনা জাস্টিফায়েড হয়ে গেল। তাই না? লক্ষ্মীকে চাইলেই কি পাওয়া যায়, বলো? শাপ লাগবে না!

—কী বলতে চাইছ।

—তুমি গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী, তাই এত কামড়াকামড়ি বেঁধেছে। তিনটে সরল বাক্যই তো।

—কী বাক্য?

—লক্ষ করলে না! চিরকুটে তিনটে সরল বাক্যই তো লেখা আছে। 'ফেরত দাও সঙ্গে পাঁচ টাকা বেশি দেওয়া গেল। না দিলে পস্তাবে।' কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, পস্তাতে হবে কেন? পূর্বজন্মে কি শাপগ্রস্ত হয়েছি?

—তুমি পূর্বজন্ম মানো?

—মানলে কত কিছুই উপভোগ্য হয় মৌলি। ধর্ম মানি না, কিন্তু ধর্মের গল্পগুলি উপভোগ করি। যেমন ধরো আয়ান ঘোষ অসমর্থ ছিলেন, স্ত্রী-গমন করতে অপারগ ছিলেন, এর জাস্টিফিকেশন হচ্ছে, তেনার কপালে পূর্বজন্মের আরাধ্য ঠাকুরের দেওয়া অভিশাপ। নারায়ণকে আমার কেমন যেন মিসচিভাস ঠেকে; শুনেছি, কোথাও-কোথাও বলা হয় সরস্বতী নাকি তেনার উপপত্নী ছিলেন। একেই বলে বরাতজোর, সরস্বতী নারায়ণের প্রেমে রক্ষিতে হতেও তৈরি ছিলেন! চাট্টিখানি কথা!

—তুমি উপভোগ করো?

—করব না!

—না।

—কেন?

—তুমি মুসলমান। ইসলামে এইসব নেই?

—আছে। অন্যের বউকে দখল করার কেচ্ছা আছে, মৃতা কোনো নারীকে কবরে ঢুকে গমন করার গল্প আছে। কী নেই। সব আছে। সমকামিতা আছে। খোজা আছে। জারজ আছে। বৈধ-অবৈধ আছে। বলাৎকার আছে। সব একঘেয়ে, মানুষের নতুন গল্প হয় না। মানুষের মৌলিকত্ব হয় না। মানুষ যৌগিক, তার কোনটা প্রধান যৌগ জানা নেই।

—মনুষ্যত্ব?

—ভুল। ওটা কল্পনা। যেমন ধরো, 'কাক' শব্দটা কাককে, 'টিয়া' শব্দটা টিয়াকে বোঝায়। 'মনুষ্যত্ব' শব্দটা মানুষকে বোঝায় না। 'মানুষ' কথাটাও মানুষকে বোঝায় না। 'মানুষ' শব্দটা অমানুষকেও বোঝায়। মানুষের আকৃতিটা মানুষ এটাকে হিন্দু-উর্দুতে বলে 'আদমি'। মানুষের প্রকৃতিকে নির্দেশ করার জন্য বলা হয়, 'ইনসান'। আদম থেকে 'আদমি'। 'ইনসান' থেকে 'ইনসানিয়াত'। মানে, মনুষ্যত্ব। বাংলায় এক্ষেত্রে শব্দের অভাব। আদমি এবং ইনসানের পার্থক্য বোঝানোর মতো শব্দ নেই। আমার এই দেহটাও মানুষ, সে হচ্ছে আদমি, অর্থাৎ আদি মানব। এর হওয়ার কথা 'ইনসান'। এক জ্ঞানী বাউল বলেছিল, মানুষের স্বত্বই মনুষ্যত্ব। এবং বলেছিল, মান এবং হুঁশ নিয়ে মানুষ। হুঁশ হল চৈতন্য, মান হচ্ছে মর্যাদাবোধ। তাই-ই যদি হয়, তা হলে গুজরাট-আমেদাবাদে-গোধরায় নরমেধ-যজ্ঞ হয় কেন?

—সে-তো রাজনীতি।

—রাজনীতি মানে কী? নীতর রাজা। শ্রেষ্ঠনীতি; গুজরাটের শ্রেষ্ঠনীতি নরমেধ। তাই না? তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঘাস মানে ঘাস, গোলাপ মানে গোলাপ। রেল মানে রেল। নদী মানে নদী। সমুদ্র মানে সমুদ্র। নরুন মানে নাক নয়। নরুন। কিন্তু রাজনীতি মানে কী? নেতা মানে কী? মাথা মানে মাথা। নেতা মানে কি নেতা? ধর্ম মানে কি ধর্ম? তাই মানুষ মানে মানুষ নয়। 'মানুষ' কথাটা মানুষের কল্পনা। বাস্তব নয়। যেমন ঈশ্বর একটা কল্পনা, তাকে কেউ-কেউ কখনও কখনও অনুভব করেছে বলে শুনেছি। যারা করেছে, তারাই জানে ঈশ্বর কী। তেমনই 'মানুষ', অনুভব করতে পারলে ভালো। পাওয়া যায়।

—তুমি পাওনি কখনও?

—কালো দাদি মানুষ ছিল। এখন কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এক বছর হল, কথা বলে না। আগে কম বলত। এখন আর বলেই না। গুজরাটে ধর্ষিতা-মৃতা মায়ের শিশুরা মাকে ধর্ষণে-মরণে দেখেছে এবং এমন কথা বলতে পারে না। মন্ত্রীরা কথা বলে। সবসময় কথা বলে।

—তুমি আর কথা বোলো না, প্লিজ। তোমার কষ্ট হচ্ছে। বলে বনমৌলি একটা হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে নিজেকে সংবরণ করে, অন্য হাতে বিধৃত চিরকুট। সেদিকে তেরছে চেয়ে থাকে। ক্রমাগত বাক্য তিনটি সরল থেকে জটিল হয়। আকারে সরল হলেই কি ভাব সরল হয় বাক্যের? সত্যিই তো, রাজাকে পস্তাতে হবে কেন? মাসুদ কি

বিনষ্ট হবে?

ভেবেই শিউরে উঠল মৌলি। পরক্ষণেই সে ভাবল, এ কিছু নয়। এই চিঠি-চিরকুট একটা সরল বদমায়েশি বা দুর্বল লোভ অথবা ঈর্ষা। সাহস নেই। কিন্তু কুটিলতা অনেক। নির্ঘাত এ লোক অনন্য। অনন্যই এখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

মানুষ প্রতিযোগি জীব। তীব্র, সুতীব্র ভয়ানক প্রতিযোগিতা। এমনকী হিংস্র প্রতিযোগিতা।

—চুপ করো।

—আমি পারি না।

—কী পারো না?

—চাপ।

—কীসের চাপ?

—এই স্নায়ুর।

—তুমি তো এত কথা বলতে না।

—গুজরাটের পর বলছি।

—কাউকে তো বলতে হবে।

—কী বলবে?

—আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। গত রাতে পাঁচবার দেখেছি। পাঁচ রকম।

—পশ্চিমবঙ্গে তো দাঙ্গা হযনি রাজা! ভয কেন পাচ্ছ?

—তোমার লজ্জা, আমার ভয।

—হ্যাঁ। ঠিক কথা। কিন্তু একটা জিনিস, মানে ঘটনা, তোমাকে বলা দরকার। আমাদের পরিবারে আমার বাবার দূর-সম্পর্কের এক দাদা তার মেযেকে সঙ্গে করে বাংলাদেশ থেকে চলে এসে আশ্রয নিযেছে। ভযে।

—ও, তাই?

—হ্যাঁ, রাজা। আমি সেই জ্যাঠামশাইকে ভয় পেতে দেখি। মাঝে-মাঝে দুঃস্বপ্নে ঘুমের মধ্যে গোঙায়। জ্যাঠা একজন হাতুড়ে ডাক্তার, বাংলাদেশে ভালো পসাব ছিল। এখন বাবার কম্পাউন্ডারি করে, মানে করেন। এখনতো কম্পাউন্ডার বলে না, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলে। বাবা সেইভাবেই বলেন, 'আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট'। জ্যাঠা তোমাদেরই এদিকে একটা ক্লাবে সন্ধ্যার দিকে সপ্তায তিন দিন ডাক্তাবি কবতে আসেন। ওঁব এখনও সিটিজেনশিপ হযনি। এ-ব্যাপারে অনন্য ওঁকে সাহায্য করবে বলল পরশু।

—ও।

—রেশন-কার্ড করিয়ে দেবে বলেছে। তাছাড়া বোনটার বিযের ব্যবস্থাও দেখবে বলেছে। মা, সত্যি বলতে কী, জ্যাঠার সামনে দাঁড়াতে পারে না। খুব অস্বোয়াস্তি হয়। বাবা-মেয়ে কখনও পরিষ্কার করে সব ঘটনা বলে না। আমার সন্দেহ হয, পারুল রেপড্ হয়েছে। শুধু মেয়েটা মাঝে-মাঝে একলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে। আর জ্যাঠা তাঁর পূর্ব-পসারের গল্প করে। ওঁর পেশেন্টরা শতকরা নব্বুই ভাগই মুসলমান ছিল, সেকথাও বলেন। বাড়িতে সেই সব বলাবলি হয়, সেই আলোচনায় অনন্য থাকে।

—সেই আলোচনা ক্রমে-ক্রমে একটা নেশার মতন হয়েছে। অনন্য উত্তেজনা পুইয়ে চলেছে। আমি তার ওই ধরনের গল্প করা, আশ্বাস দেওয়া এবং চুকচুক করা একদম সহ্য করতে পারি না। এদিকে তুমি... বলে থেকে গেল বনমৌলি।

মাসুদ একটা অদৃশ্য চাবুকে সিধে করল তার শিরদাঁড়া। মৌলির কথা বলায় এমনই ব্যাথা আর করুণা এবং লজ্জা মিশে ছিল যে, মাসুদের নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল, তার মুখের রং সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

খাটের উপর থেকে আবার নেমে পড়ল মাসুদ। নিজেকে সে অপরাধী ভাবতে শুরু করেছে। অথচ সে কখনও বাংলাদেশ দেখেনি। বাংলাদেশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। জ্যাঠার ঘটনায় তার কোনো হাত নেই, পারুল ধর্ষিতা হয়ে থাকলেও তার কিছু করার ছিল না।

বনমৌলিদের বাড়িতে তাহলে শান্তি নেই। ওই বাড়িতে জ্যাঠা এবং তার মেয়ে আশ্রয় পেলেও তারা সুখী নয়। তারা থিতু হতে পারেনি। জ্যাঠার কম্পাউন্ডারি করতে নিশ্চয় ভালো লাগে না, কারণ মানুষটা নিজেকে ডাক্তার মনে করে। মানুষটা এখনও গোপনচারী, এখানকার প্রধান জীবনস্রোতে মিশে যেতে পারেনি। তার রেশন-কার্ড দরকার, জমি দরকার, বাসস্থান দরকার, পয়সা দরকার, পারুলের বিয়ে দরকার। হবে, হবে। অনন্য যখন চেষ্টা করছে, তখন হবে।

—অনন্য কী বলে? তুমি শুনেছ মৌলি?

—হ্যাঁ। কেন শুনব না!

—জ্যাঠাকে তোমার বাবা কী বলেন?

—কী বলবেন। বলেন, আরও ভালো করে শিখতে।

—ডাক্তারি?

—জ্যাঠা লজ্জা পান?

—কেমন একটু আড়ষ্টভাবে বাবার কাছে বোঝবার চেষ্টা করেন। আসলে নিজেকে ডাক্তার ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন কিনা। কম্পাউন্ডার বললে, কোনো রুগি যখন বলে, ওষুধ কখন খাবে না খাবে বুঝে নেবার সময় কোনো পেশেন্ট যখন...।

—বুঝেছি।

—কম্পাউন্ডারবাবু বলে যখন সম্বোধন করে কেউ, মানে কোনো রুগি, তখন জ্যাঠা রেগে যান।

—কী বলেন?

'ওহে, আমি কম্পাউন্ডার নই, আমিও ডাক্তার', পেশেন্টকে বলেন।

—শুধরে দেন।

—হ্যাঁ।

দেওয়ালে টাঙানো একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মাসুদ। একটি খোঁচে আয়নাটা ঝুলছে। ওর গালে খোঁচাখোঁচ দাড়ি। হাতের তালু গালে আলতো ঘষে দাড়ির খোঁচার আন্দাজ নেয় সে। সকাল ন-টা বাজছে।

—বাবা তখন অবাক হন, বিরক্তও হন। সামান্য। বলে ওঠে মাসুদ।

—আগে তাই হতেন। এখন বিরক্তই হন।

—জ্যাঠার নাম?

—মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি। তুমি শেভ করবে?

—হ্যাঁ।

—আমি করে দেব?

—তুমি! সে কী, তুমি কেন!

—আমি পারি। বাবার শেভ আমিই করে দিই।

পাগল না কি!

এতে পাগলের কী আছে!

—কেটে ফেলবে না?

—না।

—ঠিক বলছ?

—আরে বাবা, তোমার কাটলে আমারই বেশি লাগবে।

এবার মনে-মনে চমকেই উঠল মাসুদ। চমকে উঠে ঘাড় বাঁকিয়ে গালে হাত রেখে রাজ্যের বিস্ময় মুখমণ্ডলে জমা করে অপলকে মৌলিকে দেখতে থাকে। এ-এক নিশ্চয় খুব আশ্চর্য মেয়ে।

অপরপক্ষে মৌলি অমন একটা মুখ-ফসকানো কথা বলে ফেলে লজ্জাই পেয়েছে। এই অবস্থায় মাসুদের দিকে চেয়ে থাকতে না পেরে চোখ নামিয়ে চিরকুটটা দ্রুত তাব কাঁধে-বওয়া সরু ফিতের ব্যাগের মধ্যে—যা এখন খাটে পড়েছিল সেটাকে কাছে টেনে নিয়ে চেন টেনে ঢুকিয়ে দেয় দ্রুত এবং হাতের নখ, আঙুলে খুঁটতে থাকে, নখ বা নখের দর্পণ দেখে।

কিছুক্ষণ মৌলিকে মূঢ়-বিস্ময়ে চেয়ে দেখার পর মাসুদ পাশের ঘরে গিয়ে শেভ করার যন্ত্রপাতি, ক্রিম ইত্যাদি নিয়ে আসে। বলে, নাও, হাত লাগাও।

দাড়ি কাটার সব কিছু হাতে তুলে পরখ করে নেয় মৌলি।

—তোমার রেজার ভালো নয়। তোমাকে আমি একটা ভালো কিনে দেবো। ঠিক আছে?

—হুঁ।

—এইরকম হুঁ বলবে। 'না' বলবে না। 'হ্যাঁ' বলবে না। কখনও 'অ্যাঁ' করবে না, কাটলেও।

—এই যে বললে কাটবে না।

—কথা বললে কাটবে। মুখ-ব্যাদান করলে কাটবে। ছটফট করলে কাটবে।

—আমি করছি?

—করছ। নাও, জল আনো।

—আমার একটা ছোট খুরি আছে, মানে বাটি। ফিটকিরি আছে। আফটার-শেভ লোশন আছে। এই ব্রাশটা খারাপ?

না।

—তুমি খুব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ বন।

—শেভ করার সময় গম্ভীর থাকতে হয়, এমন গম্ভীর যাতে মনে হয় পৃথিবী কথা বলছে না। কেমন?

—হ্যাঁ।

—বাবাকে এইসব বলে থামাতে হয়। যখন শেভ করে দিই, জ্যাঠা ফ্যালফ্যাল করে দ্যাখো। কেন জানো?

—কেন?

—বাবাকে দেখে জ্যাঠাও একদিন আবদার করে বলবেন, আমারটাও দিতে পারো না মা? তাই শুনে বাবা তো খেপে আগুন। বলল, তুমি কি খেপলে নাকি মোহিনীদা, আমার মেয়ে কি সেলুন খুলেছে? ব্যস, হয়ে গেল। কী লজ্জা যে পেলেন জ্যাঠামশাই। তারপর আমি দিতে চাইলাম, কিছুতেই উনি নিলেন না। জ্যাঠা কেবল মৃদুস্বরে বলবার চেষ্টা করছিলেন, সেলুন বলছ ভাই, মেয়ে বলেই বলেছিলাম। সে-কথা বিড়বিড় করে বললেন জ্যাঠা। জিভের তলায় সারাসপ্তাহটা উনি দাড়ি না কামিয়ে রইলেন, পরের সপ্তাহেও চার দিন বাসি দাড়ি গোঁফ নিয়ে কম্পাউন্ডারি করলেন। বাবার অবশ্য একটা নরম যুক্তি ছিল, সবার শেভ করে বেড়ালে মৌলি পড়বে কখন, অনার্সের ছাত্রী। ওকে তুমি শেভ করবে বুঝি? তাই শুনে মায়ের কী হাসি। মা হেসে ফেলে বলল, পাশের বাড়ির অধ্যাপিকা শুনেছি 'শেভ' করে ইউনিভারসিটি যান। ওনার মুখে ব্যাটাছেলের মতন গজায় দেখেছি।

—মা বললেন?

—হ্যাঁ। খুরিতে আঙুল ডুবিয়ে জল নিয়ে মৌলি মাসুদের মুখে মাখাতে থাকে। ওরা দরজা আধখোলা রেখে কামান দিচ্ছিল। ব্রাশ ঘষতে থাকে মৌলি মাসুদের মুখে। ঘষতে-ঘষতে বলে, মায়ের ওই! কথা গড়াতে ওস্তাদ, খেই থাকে না। এতে হল কী, জ্যাঠা আরো অপমানবোধ করলেন। পারুলের চোখে জল চিকচিক করে উঠল। আশ্রিত মানুষের অভিমান বেশি; সংখ্যালঘু বলেই হয়তো এপারে এসেও স্বাভাবিক হতে পারেন না, যেন চোরের মতন রয়েছেন। বাবাও ঠিক বোঝে না সব। আসলে হাতুড়ে ডাক্তার দু-চক্ষে দেখতে পারে না বাবা। কিন্তু হয় কী...নাও, মুখ তোলা।

—অ্যাঁ।

—'অ্যাঁ' নয়, কোনো 'অ্যাঁ' নয়। ক্ষুর ধরলে একদম 'অ্যাঁ' করবে না। ভাববে, তলোয়ার দিয়ে দাড়ি 'চাঁছা' হচ্ছে, নজরুলের 'কৈফিয়ত' মনে আছে? ভাববে, দিস ইজ আ সোর্ড অব...

—গুজরাট!

—না রাজা। সেটা সোর্ড অব কাশ্মীরও হতে পারে। ওখানকার হিন্দু পণ্ডিতদের খুন করা হয়েছে।

—বনমৌলি!

—বলো। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মেরে তাড়ানো হয়েছে। তুমি কাগজে পড়েছ।

—হ্যাঁ।

এইসব আলোচনা বাড়িতে হয়। অনন্য করে। জ্যাঠা করেন, বাবাও করে। মা-ও

বলে বাংলাদেশটা আর হিন্দুর থাকবে না। হিন্দু-শূন্য হবে। ধীরে-ধীরে সব চলে আসবে ভারতে। ভারতমুখী হিন্দুস্রোত কখনও থামবে না হিন্দু-শূন্য হওযার আগে! এ-কথা অনন্য বাবার মাথায সেঁধিযে করিযে দিযে থাকলে আমি তো কিছুই বলতে পারিনি। বলতে গেলে, জ্যাঠা বলেছে, 'তুমি 'বিটি' থামো তো'। এই 'বিটি' কথাটা বাংলাদেশি বোধহয, জ্যাঠা অনেক মুসলমানি লব্জ বলেন হামেশা। জেঠিমা, শুনেছি, দর্জির কাজ করেন ওখানে। মোটা হাতের কাজ। ওই এলাকাব গবিব মুসলমানরা পরে। ঈদের জামা কাপড়, জেঠিমার সেলাই-ছাঁট। অনন্য অবশ্য বলে, ওটা সংবিধান বদলে ইসলামি রাষ্ট্র হযেছে। হিন্দুর থাকার কথা নয।

মাসুদের ফেনাযিত মুখে 'হুঁ, ছাডা কথা নেই। তার গালে রেজার চলেছে।

—ওখানে একটা আইনেব নাম, 'শত্রু-সম্পত্তি আইন'। জ্যাঠারা পুবোপুরি চলে এলে ওদের বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি সরকারি খাতায জমা পডবে।

—হুঁ।

—হিন্দু-মুসলমান তা হলে শত্রু?

—হুঁ।

—কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা মুসলমানেব শত্রু?

—হুঁ।

—জেঠির সেলাই ছাঁট মুসলমানবা ঈদে পবে নামাজ পড়ে। জ্যাঠাব ওষুধ খেযে বেঁচেছে।

—হুঁ।

—তা-ও শত্রু?

—হুঁ।

—পারুলকে ধর্ষণ করেছে তা-সত্ত্বেও?

—হুঁ।

—অনন্য কি শত্রু?

না।

আর 'হুঁ বলতে পাবল না মাসুদ। ওব গাল কেটে গেল 'খচ' কবে। সাদা ফেনাব মধ্যে ফুটে উঠল গোলাপি বক্তবিন্দু, প্রসাবিত হতে-হতে গাল ভরে গেল। মাসুদ একটুও কষ্ট-মাখা কোনো শব্দ প্রকাশ করল না।

মৌলির হাত থেমে পড়েছিল, সে জিভ বার কবে ফেলেছে দেবী কালিকার মতো, চোখে-মুখে লজ্জা-অপরাধ-পস্তানি। মাসুদ বোকার মতো হাসছে। খাটের উপর বসে, হাঁটুতে মেঝেয ভর-রাখা মাসুদের 'কামান' দিচ্ছিল বনমৌলি। বোকা হাসির রাঙা মুখটা মাসুদ আস্তে করে মৌলির কোলে গুঁজে দিযে কী একটা বলল, মৌলি বুঝতে পারল না। চিত্রার্পিত মৌলির রেজার-ধরা হাত শূন্যে স্থির।

দরজা ঠেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনন্য। রক্ত ফেনায ভরে যাচ্ছে বনমৌলি। কখন অনন্য ছায়ার মতো এসে দাঁড়াল, টের পায়নি ধারালো রেজার। ▢

শোভারানী

অ ম র মি ত্র

দুলাল মণ্ডলের যাওয়ার কথা ছিল শানপুকুর। ক-দিন ধরেই শানপুকুর যাওয়ার কথা বলছিল সে। সেখানে নাকি পথের ধারের মস্ত এক মেহগনি গাছ দিন দশ আগে সন্ধের ঝড়ে উড়ে গিয়ে পড়েছে মাঠের উপর। মাঠে ছিল কুমড়োখেত, হাজার কুমড়োর দফা রফা। তাছাড়া কত পাখি, কত সাপ, কত ইঁদুর যে অনাথ হয়েছে, আশ্রয়হীন হয়েছে তার ঠিক নেই। এখন সেই গাছ কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছে পাঁঠা ভাগের মতো। দুলাল হিসেব দিচ্ছিল একখানা ডালে এক জোড়া জানালা, একখানা দরজা। আর একখানা ডালে খাঁটি মেহগনি কাঠের পালঙ্ক। পালঙ্ক হয়েও যে কাঠ বাকি থাকবে তা দিয়ে একখানা চেয়ার প্রায় কমপ্লিট হবে। যেটুকু তার বাকি থাকবে, একটা পায়ার মতো তা অন্য ডালটির পড়তি অংশ দিয়ে মেলানোই যেতে পারে। মেহগনি কাঠ বলে কথা।

কথাটা দুলাল ক-দিন ধরেই চালাচালি করছিল, কিন্তু যাচ্ছিল না শানপুকুর। গুনগুন করছিল, করেই যাচ্ছিল, কিন্তু মেহগনি দেখতে যাবে যাবে করে ও বসেছিল পীরতলায়। তার কথা যদি সত্য হয় ওই মেহগনি গাছের কিছু আর পড়ে থাকবে? পাতা পর্যন্ত লুঠ হয়ে যাবে না? দুলাল সেইসব উপদেশ শুনছিল আর হাসছিল। বলছিল গাছের গুঁড়িটা কত মোটা। একশো ডিঙা বেরতে পারে ওই দিয়ে, না হলে সপ্তডিঙা। অত নৌকা একসঙ্গে যদি নামে পীরতলার খালে, তো দূর নদীতেই বান ডেকে যাবে দাঁড়ের শব্দে।

শত শত ডিঙা যাবে দুলদুলির ঘাটে।
তাহার গাত্র হবে মেহগনি কাঠে॥
মেহগনি কাঠ ভালো, ভালো তার দেহ।
মাতলা, করতাল নদী, দেখিয়াছ কেহ?
হোগল, বিদ্যাধরী, আছে কত নদী।
মহাজনে খুঁজে পায় কারো বিবি যদি॥

দুলদুলি! কোন দুলদুলি? কোথায় সেই নদীঘাট? কোথায় মাতলা বিদ্যাধরী?

দুলদুলির কথা বলেছিল দুলাল মণ্ডল? না বললেও বলেছিল মনে হয়। একশো মেহগনি কাঠের নৌকো কোথায় যাবে শোভারনীর দেশ ছাড়া? দুলাল বলছিল আর কালক্ষেপ করছিল। এক দিন, দুদিন পার হয়ে যাচ্ছিল। শানপুকুর যাবে বলে আর যাচ্ছিল না। সে কি তাহলে অপেক্ষা করছিল কোনো কিছুর জন্য? দুলালকে জিজ্ঞেস

করেও তো সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। থানা হাজতে নিয়ে গিয়ে তাকে দু-চার ঘা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু জানা যাবে কিনা সন্দেহ। দুলাল কি শানপুকুর যাওয়ার কথা বলে শোভারানীর ভাঙা ভিটের দিকেই ইঙ্গিত করছিল? নাহলে শানপুকুর যাবে বলে বেরিয়ে সে নাকবেড় দিয়ে কান ধরার মতো করে হাঁটল কেন খালপাড় ধরে? সে তো পীরতলা বাজার থেকেই খালপাড় হয়ে যেতে পারত কাছিমের পিঠের মতো ঢেউ তোলা পোলটি হয়ে। এখানে খালপোল পার হলে ওপারে ভ্যানরিকশা মিলত, ভ্যানরিকশা তাকে নিয়ে যেত শানপুকুর। ওপারে ৯১ নম্বর বাস মিলত, ওই বাস মুলুক ঘুরে শ্যামবাজার গিয়ে এই খালপাড়েই পৌঁছনোর অনেক আগে তাকে নামিয়ে দিত শানপুকুরে। সোজা পথে না গিয়ে সে কিনা খালপাড় ধরে হাঁটল পাকা ব্রিজের দিকে। সেখানে ট্রেকার মিলবে। ট্রেকারে করে চলে যাবে শানপুকুর। আশ্চর্য! গেলও সন্ধেবেলায়। সন্ধেবেলায় রওনা হয়ে রাত্রি করে শানপুকুর পৌঁছে ধুধু খেতের ভিতরে অন্ধকারে চিত হয়ে থাকা মেহগনিকে দেখে তার একটি বা দুটি ডাল সওদা করে ফিরত সে কীভাবে? মাঠের ভিতরে তো তার জন্য বসে থাকত না সরকারি নীলামদার। ওদিকে জনবসতিও তো তেমন নেই। তাহলে কি শানপুকুর, মেহগনি, মেহগনি কাঠের একশো নৌকো, সবই উপলক্ষ মাত্র। দুলাল আসলে যেতে চেয়েছিল সেই শোভারানীর ভিটেয়। তার জন্য অপেক্ষা করছিল যেন কবর কাটা মানুষটি। তাহলে কি দুলাল সব জানে? আদ্যোপান্ত সব! জানে কি শোভারানী আর ছালাম মোল্লার ফেলে যাওয়া ভিটের পিছনে বুনো ঝোপের আড়ালে কবর খুঁড়তে বসেছিল কে?

দুলাল অন্তত দিন সাতেক ধরে অলীক এক মেহগনি গাছের কথা বলছিল। মস্ত গাছ, মস্ত তার বেড়, মস্ত তার ছায়া। কত ডালপাপা, কত পাতা, কত পাখি! দিনদুপুরে তার ছায়ায় গামছা পেতে ঘুম মারো। দুলাল যখন বলছিল মেহগনি বৃত্তান্ত, বলছিল তার ছায়ায় কথা, সাত দিন ধরে বলছিল তার বিপুল বিস্তারের কথা, রাজকীয় মহিমার কথা, তখন পীরতলার মানুষের মনে পড়ে যাচ্ছিল খালপাড়েব সেই সব মেহগনি বৃক্ষের কথা। সার দিয়ে সেই সব বৃক্ষরা ছায়া রেখে রেখে চলে গিয়েছিল পুর্বদিকে, সেই বিদ্যাধরীর কূল পর্যন্ত। খালের দুপারেই ছিল মেহগনির বাতাস, মেহগনির ছায়া। দুপার থেকেই তা উধাও হয়ে গেছে কবে যেন। দুলাল তো কতরকম কথাই না বলে, সুতরাং মেহগনির কথাও সেইরকম কিছু। পীরতলা-শানপুকুর বা পীরতলা-শ্যামবাজার ভায়া লাউহাটি রুটে কোথায় কোন জায়গায় ছিল এক প্রাচীন মেহগনি, তা ঝড়ে শিকড়ছাড়া হয়ে উলটে পড়েছে ফসলের খেতে, সে-খবর কে নিতে যাচ্ছে? কে খোঁজ করবে দুলালের কথা সত্য কিনা? দুলাল কথাগুলো তো বলছিল চায়ের দোকানি, তেলেভাজার দোকানি, পানবিড়ির গুমটিঅলাদে । তাদের অত সময় নেই মেহগনি দেখতে শানপুকুর ছুটবে। তারা শুধু শুনেছিল দুলালের কথা। সাতদিন ধরেই শুনছিল আর শূন্য খালপাড়ে ফিরে তাকাচ্ছিল। তাদের স্মৃতি জেগে উঠছিল। খালেপোলের পুবের মেহগনি গাছটি কবে যে উধাও হল তা ভুলে গেছে সবাই, কিন্তু সেই গাছের ছবিটি এখনও পরিষ্কার। গাছটির কথা মনে পড়লেই তার

ছায়ার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মেঘের কথা। ওই গাছ যেন মেঘের মতো ঘিরেছিল পীরতলার আকাশ।

দুলাল কতরকম কথাই না বলে। তার কথায় বাস্তবতা না থাকুক, এমন স্মৃতি জাগানিয়া সুর আছে যে লোকে শোনে। দুলাল তাদের জানাচ্ছিল হাতির মরণ ওভাবেই যেন হয়। নিঃসজ্ঞা গাছ চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে মাঠের ভিতরে। তাকে চাঁদের আলো, তারার আলো ঘিরে থাকে সমস্ত রাত। কী চমৎকার বলেছিল দুলাল এক হাতির গল্প। আহা সেই প্রাচীন মেহগনির সঙ্গে যেন হাতিরই তুলনা হয়। কোন হাতি? না রাজার হাতি। রাজার হাতি কেউ দ্যাখেনি, কিন্তু লোকে ভাবতে পারে তা কত বড় হতে পারে। কেমন মায়াবী হতে পারে তার মেঘের মতো রং। সেই হাতি যখন মরে তার আগে তো ঝড়ই আসে। ঝড়ই তো রাজার হাতির মৃত্যু সংকেত। সেই ঝড় টর্নেডো, যার কথা সবাই জেনেছে খবরের কাগজে। শানপুকুরেও কি টর্নেডো এসেছিল? বোধহয় তাইই। ঝড় সেই প্রাচীন হস্তীসদৃশ মেহগিনি বৃক্ষকে শিকড় থেকে উৎপাটিত করেছিল। পৃথিবীর সঙ্গে তার যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করেছিল। দুলাল গত অমাবস্যা থেকে কথাটা বলছিল। তারপর তো দিন আটেক কেটেছে মাত্র। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন। অনেক অনেকদিন ধরে কথাটা যেন শোনাচ্ছিল দুলাল মণ্ডল। দু-পাঁচ বছর ধরেই যেন বলে যাচ্ছিল এক মহাবৃক্ষের পতনের কথা। যখন কথা আরম্ভ করেছিল তখন খালপাড়ে ছিল ঘোর অন্ধকার। খালের জলে আঁধারের স্রোত। বাজার আর পাকা ব্রিজের মধ্যিখানের দূরত্বে, খালপাড়ে শোভারানী, ছালাম মোল্লার পরিত্যক্ত ভিটেয় অন্ধকার। ভিটের পিছনের বুনো আমগাছটিতে অন্ধকার। শুধু চৈত্র মাস বলে ছিল আমের বোলের গন্ধ, চেনা, অচেনা ফুলের গন্ধ। অন্ধকারে সে গন্ধ কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায় তা জানত না দুলাল নিজেও। তারপর তো চাঁদ একটু একটু করে ভরতে লাগল। বড় হতে লাগল। দুলাল যেন চাঁদের অপেক্ষাতেই ছিল। চাঁদ বড়ো হলে সে হেঁটে যাবে খালপাড় ধরে শানপুকুর যাওয়ার নাম করে, মেহগনির পতন দেখার নাম করে শোভারানীর ভিটের দিকে। জ্যোৎস্না না থাকলে সে যাবে কী করে ওই দিকে, ভিটের পাশে, বুনো আমগাছটির কাছে? ওই গাছের ডালে গণধর্ষণের পরদিন সকালে শোভারানী গলায দড়ি দিয়ে মরেছিল। জ্যোৎস্না ছাড়া ওখানে যাওয়া যায়? দিনের আলোতেই কেউ যেতে পারে না ওখানে। যেতে চায় না কেউ। তাকাতে চায়না আমগাছটির দিকে। যে ডালে শোভারানী মরে ঝুলছিল সেই ডালটিও রয়ে গেছে পর্যন্ত। বুক ছমছম তো করবেই।

দুলাল গিয়েছিল। শানপুকুর যাত্রা করে শোভারানী ভিটেয়। তখন শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ মধ্যগগনে। যত জ্যোৎস্নাই ছড়িয়ে থাকুক চারপাশে, আমতলাটিতে ছিল ছায়া। জ্যোৎস্নায় গাছের ঘন গভীর ছায়া। এমন ছায়া যে ওই জায়গায় একখানি কবর খোঁড়া হয়েছে তা-ও দেখতে পায়নি দুলাল। আশ্চর্য! অন্ধকারে কেউ সরে যাচ্ছিল তা যেন দেখেছিল সে। লোকটা ঠিক ছায়ার ওপারে জ্যোৎস্নায় ছিল। তার মুখখানি ছিল ছায়ার ভিতরে তাই মুখ দেখা যায়নি। অন্ধকারে তার দিকে হেঁটে যেতেই দুলাল কবরে পড়ে গিয়েছিল। চারদিকে কত চাঁদের আলো। কবরখানিতে একটুও নেই। বুনো

আমের ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার। কে যেন কবর কেটে রেখে গেছে সেখানে।

আশ্চর্য! শোভারানীর ভিটে তো খালপাড়ে মানুষ চলাচলের পথে নয়। পথ থেকে অনেকটা পিছনে, ধানজমির গায়ে গায়ে প্রায়। দুলাল যদি শানপুকুরেই যাবে তো ওই ছাড়াবাস্তুভিটের দিকে গেল কেন? ওদিকে যেতে হলে তো পায়ে চলা পথ থেকে সরে যেতে হয়। তাহলে কি সে শানপুকুর যাওয়ার নাম করে শোভারানীর ভিটের দিকেই গিয়েছিল! সে কিছু দেখেছিল, কিছু সন্দেহ করেছিল নিশ্চয়। না করলে কবরটি খুঁজে বের করল কীভাবে?

এখন লোকে জানছে দুলাল মণ্ডলের মেহগনির কথা বানানো। কথাটি যে অসত্য তা এখন বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ দুলাল কোন কথাটিই বা বাস্তবতাকে রক্ষা করে বলে? দশদিকে কোথাও মেহগনি পড়েনি। লোকেও তা যেন জানত। তবু দুলালের কথা শুনতে শুনতে তাদের মনে হযেছিল কথাটা অসত্য কিন্তু অবাস্তব তো নয়। এইভাবেই তো মেহগনি পড়ে। পড়েছিল একদিন। একশো নৌকা না হোক, একটি নৌকাও যদি ভেসে যায় দক্ষিণ পূবে, তা শোভারনীর স্মৃতিই জাগিযে তোলে। শোভারানী এসেছিল পুবদিক থেকে, জলপথে, ছালাম মোল্লার বিবি হযে। দুলালের সব কথাই ছিল ঘোর লাগা। সে যেন আভাস দিযে যাচ্ছিল কী হতে যাচ্ছে। তার কথা কেউ ধরতে পারেনি তাই তাকে হেঁটে যেতে হল শোভারানীর ভিটে পর্যন্ত। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হল বুনো আমগাছের ছাযায় ঢাকা কবরখানি। জ্যোৎস্না রাত। চারদিক চাঁদের আলোয ধোয়া, শুধু অন্ধকারে লুকিয়েছিল সদ্য খোঁড়া কবরটি। কার কবর? কে মরেছে? পীরতলায় লুকিযে কবর খুঁড়তে গেল কে? এ তো ভীষণ ব্যাপার! কবর যে মানুষ নেবেই।

দুলাল কবরের অন্ধকারে পড়ে গিয়েছিল। তার পাযে ঠান্ডা মাটির ছোঁযা লেগেছিল। তার চিৎকারে ছুটে এসেছিল বাজারের লোকজন। বহুজন।

কাউকে দেখেছিলে?

মাথা নাড়ে দুলাল। হাঁপাচ্ছিল একনাগাড়ে।

কাউকে দ্যাখোনি?

দুলাল মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। চোখেমুখে ফুটে উঠছিল আতঙ্কের ছায়া।

কী সব্বোনাশ। শোভারানীর মৃত্যুর পর যে হানাহানি হয়েছিল পীরতলায় তা কি আবার আরম্ভ হবে? সেই গণধর্ষণ, শোভারানীর মৃত্যু, হানাহানি, কোনোটার তদন্ত শেষ হয়নি এখনো। দারোগাবাবু এখনো তো একে ওকে ডেকে পাঠায়, শোভারানীরে চিনতে?

কোন শোভা। লোকে ইচ্ছে করেই অবোধ হয়ে থাকে।

কাউকে সন্দেহ হয়?

কেন সন্দেহ? লোকে যেন কিছুই জানে না।

শোভারানী কি হিন্দু মেয়ে ছিল?

ভ্যানরিকশাওয়ালা ছালামের বিবি ছিল।

মাঝে মধ্যে শহর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট আসেন। তিনি তদন্ত করেন একইভাবে :

শোভারানী কে ছিল ?

কোন শোভা ?

যে শোভা মরেছিল।

পীরতলার দুলাল মণ্ডল গুন গুন করে :

সেই শোভা, যে শোভায় শোভে পীরতলা ॥
দারোগায় ম্যাজিস্টর দোঁহে করে ছলাকলা ॥
ছলকলা হয় কত, লেখে কত পাতা।
জোছ্‌নার রোদে দেখি ফোটে নীল ছাতা ॥
শোভারানী, শোভারানী, ছালামের বিবি।
তার নে গান গায়, পীরতলার কবি।

এখন অন্ধকার। সেইসব গান, কথা, মনে পড়ে যাচ্ছে পীরতলার বহুজনের। পীরতলার পানগুমটিওয়ালা, চাওয়ালা, ভ্যানরিকশাচালক, পঞ্চায়েত মেম্বার, চাষাভুসোদের। তারা সমস্ত রাত পাহারা দেবে শূন্য কবরটিকে। নতুবা কাকে যে খেয়ে নেবে মাটি। দিনকাল খারাপ। কিছু এদিক-ওদিক হলেও মহাজন রব তুলবে, গেল, গেল, গেল, কেন কবর, কার কবর ?

সুদিন আসিতেছে, তাহে কবর কেন ?
শোভারানী মরিয়াছে নিজে পাপে জেন ॥

মানুষজন দেখেছিল চাঁদ ঢলে যাচ্ছে খাল বরাবর পশ্চিমে। আমগাছটির ছায়া তাই পূর্বগামিনী। কবরের অন্ধকারে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। সেই আলো যেন কোনো মৃতের শরীর। শুয়েছে অন্তিম শয়ানে কবর বরাবর। কার দেহ ওটি ? কার লাশ ? শোভারানীর দেহ পোস্টমর্টেমে গিয়ে আর ফেরেনি। শোভারানী এই পীরতলার মাটি পায়নি। বাতাস না, আকাশও না। সে কবরে শোয়নি এখানে। তার চিতা এখানে জ্বলেনি। কী হয়েছিল তার দেহখানির তা পীরতলার মানুষ জানে না। এখন এতদিন বাদে শোভারানী কি তার ভাঙা ভিটেয় ফিরে শুয়েছে কবরখানিতে। পীরতলার মানুষ ভাবছে কে কেটেছে কবর, কখন ?

দুই

ছালাম মোল্লা তার ভিটে ছেড়ে কবে যে কোথায় চলে গেল সে খোঁজ পীরতলার মানুষ রাখে না। শোভারানীর জন্য কাঁদত অবিরাম। কাঁদতে কাঁদতেই বোধহয় খুন হয়ে যেত পীরতলার মস্তানবাহিনীর কোনো একজনের হাতে। তারা যাকে মিলিতভাবে ভোগ করেছিল প্রায় সমস্ত রাত ধরে, ছিন্নভিন্ন করেছিল যার কুসুম শরীর, তার জন্য কোনো বিলাপই তাদের স্বস্তি দিত না। শোভারানীর জন্য গোপন বিলাপ থাকুক, সে বিলাপ প্রকাশ্য হলে পীরতলার মাটিতে টেঁকা কঠিন। হাজার হোক সে তো ছিল ভ্যানরিকশাওয়ালা ছালামের বিবি। একটা ভ্যানরিকশাওয়ালা অমন রূপবতী বিবি নিয়ে ঘর বেঁধেছিল কোন সাহসে ? তার উপর যে ছিল আর এক ধর্মের মেয়েমানুষ।

কী রূপই না ছিল শোভারানীর। তার মতো সুন্দরী পীরতলার কোনো ভ্যান

রিকশাচালক! তার মৃত্যুর পর, পীরতলা ছাড়ারা আগে ছালাম যে কতদিন পশ্চিমের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিলাপ করেছে! বিলাপ করতে করতে মাটিতে মাথা ঠুকেছে। এখনো মধ্যরাতে, পীরতলা ঘুমোলে খালপাড়ে কেউ না কেউ জেগে বিলাপ করে শোভারানীর জন্য। শোভারানী যে এই প্রাচীন জনপদের কিছু মানুষের জীবনে পূর্ণতা এনেছিল। সে হলই বা ছালামের বিবি, ছালাম তো তাদের কারোর ভাই, কারোর চাচা, কারোর ভাইপো, কারোর পাতানো জামাই, আর সেই কারণে শোভারানী কারো ভাবী, কারোর চাচি, কারোর পুত্রবধূ, কারোর কন্যা সম্পর্কের হয়ে উঠেছিল। আত্মীয়তা তো শুধু রক্তে থাকে না, মনেও থাকে। শোভারানী ঢুকে পড়েছিল বহুজনের মনে। পীরতলার সেই বহুজনেরা কখনও ভাবতে পারেনি যে শোভারানী ওভাবে মরতে পারে। তারা ভাবতে পারেনি শেষ পর্যন্ত ধর্ষিতা হবে শোভারানী। তারা এ-ও ভাবেনি ধর্ষণকারীর দল অমলিন মুখে পীরতলা দাপিয়ে বেড়াতে থাকবেই।

পীরতলার মহাজনেরা তো শোভারানীকে নিয়ে ছালাম মোল্লা ঘর বাঁধার পর হাওয়ায় ফিসফাস আরম্ভ করেছিল, হিন্দু মেয়ে তায় অমন যুবতি, সুন্দরী, তাকে নিয়ে কোন সাহসে ছালাম মোল্লা ঘর বাঁধে? সে তো রিকশাওয়ালা ব্যতীত আর কিছু নয়। তারা ক্রমাগত ফিসফাস করছিল ছালামের ভিটেয় অমন সুন্দর মেয়েমানুষ মানায় না। পরে তারা গলা তুলে বলেছিল হিন্দু মেয়ে শোভারানীর ছালামের বিবি হয়ে থাকা ঠিক নয়। তারা জনে-জনে বলে বেড়াচ্ছিল শোভারানীকে রাখার হক ছালামের নেই। ভ্যানরিকশাওয়ালার বিবির অমন যৌবন থাকবে কেন? তারা বলছিল শোভারানী ফিরে আসুক। ছালাম তাকে ফুঁসলে নিয়ে গেছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

শোভারানী হিন্দু না মুসলমান এ নিয়ে পীরতলার মানুষের মনে ধন্দ আছে। লোকে নানারকম ভাবত। নানারকম বলত। ছালাম বলত শোভারানী নামটি তার দেওয়া। কী ওই রূপের শোভা! শোভারানীকে সে পেয়েছিল যেন গভীর নির্জন কোনো বনপথে। একাকী বিলাপ করছিল কন্যা। বাপ-মা নেই। ছিল সে তার ফুফুর ঘরে। ফুফুর ঘর দুলদুলি। দুলদুলি তেরো নদীতে ঘেরা। ফুফুবুড়ি বলেছিল, মেয়েটারে নে যা, আমি কদিন বাঁচি তার ঠিক নেই, এর বাপেরে খেয়েচে বাঘে, মারে লিয়েচে ফরেস্টারে।

ছালাম বলত, বাঘে খেয়েছে বাপেরে, মারে লিচেয়ে ফরেস্টারে, ফুফু তারে ডাকে খুকি বলে, আমি বলি খুকি কার নাম, ওর নাম শোভারানী, তা শুনে কনে মুখে আঁচল চাপা দে হাসে, চান্দের মতন মুখখানি দে তখন আলো ঝরে।

মনে পড়ে পীরতলার মানুষজনের। শোভারানীর কথা বলতে বলতে ছালাম মোল্লার মুখ ভরে উঠত হাসিতে। মনে পড়ে শোভারানীকে। গায়ের রং মাজামাজা, প্রথম বর্ষার মেঘের মতো যেনবা, মুখখানি ভরাট, চোখ-দুটি নিঃঝুম, তাকিয়ে আছে তো আছেই। শোভারানী কী যে দেখত এই পীরতলার খালপাড়ে দাঁড়িয়ে? তার কি মনে পড়ত তেরো নদীতে ঘেরা দুলদুলি দ্বীপের কথা, মা বাপের কথা? বাঘের কথা?

ছালাম পীরতলা বাজার থেকে তার ভ্যানরিকশায় মানুষ বোঝাই করে হাইওয়ে-জোড়াপুকুর পর্যন্ত যেত। এই যাওয়ার পথে বিবির গুণকীর্তন করত। তার ভ্যানরিকশায় সওয়ারি হয়েছে যে, সে-ই শুনেছে ছালামের মুখে শোভারানীর কথা। কী বলত

ছালাম? তার বিবির মুখের বুলি খুব মিঠে। বিবির হাতটি খুব মিঠে। বিবির হাতে সাজা পান মুখে না দিলে শরিফি মেজাজটাই আসে না। বিবি শোভারারী যা রাঁধে তা-ই 'অমিত্ত'। কচু ঘেচু তার হাতে কোপ্তা কাবাব হয়ে ওঠে যেন। শোভারানী খুব সাহসী। শোভারানীর বাপ মানিক মিঞা বাঘের সঙ্গো লড়াই করে মরেছে। মা এখনও ফরেস্টারের সঙ্গো লড়ছে না মরেছে সে খবর জানা নেই। শোভারানী এক কোপে এক ডাকাতের ঠ্যাং দুখান করে দিয়েছিল তার ফুফুর ঘরে থাকার সময়। দ্যাখো শোভারানীরে, বুক জুড়ায়ে যাবে। কতদূর থেকে নিয়ে এল সে মানিক মোড়লের মেয়েকে। পীরতলার খাল যেখেনে বিদ্যেধরী নদীতে গিয়ে পড়েছে, আর বিদ্যেধরী যেখেনে মাতলায় গিয়ে মিশেছে, মাতলা যেখানে ডুবেছে হোগল নদীর ভিতরে, হোগল যেখানে একাকার হয়েছে করতাল নদীর সঙ্গো, করতাল যেখানে বিদ্যা নদীর টানে ভেসে গেছে, বিদ্যা বাঘের মতো থাবা বাড়িয়ে ধরেছে যেখানে গোমর নদীকে, সেই নদীর কূলেই হল দুলদুলি। দুলদুলিতে ফুকুর ঘর। মানিক মোড়লের ঘর। মানিক মোড়লকে লোকে ডাকে মানিক মিঞা বলে। সেই মানিক মিঞার মেয়ে শোভারানী।

এ বৃত্তান্ত, ঘুরে ফিরে একই বৃত্তান্ত কতজনে না শুনেছে। শুনে ভুলে গেছে, কিন্তু খালপাড় ধরে হেঁটে যেতে গিয়ে দেখেছে নিঃঝুম দুটি চোখ যেন আকাশে তাকিয়ে আছে। আহা কী যৌবন ছিল শোভারানীর। ছালাম মোল্লা বলত, অনেক পুণ্যি করে অমন বিবি মেলে, অমন বিবির সঙ্গো সংসার বাঁধা হয়।

হয়তো নিশ্চয়। কিন্তু শোরগোলও হয় তাতে। খালপাড়ে একটা হিন্দু মেয়ে নিয়ে রসেবসে থাকবে ভ্যানওয়ালা ছালাম এ ঘটনা মেনে নেবে কে? ছালাম শোভারানীকে তো নিয়েইছে, তার বাপ, বাঘের হাতে মরা কোনো এক মানিক মণ্ডলকে মানিক মিঞা করে দিয়েছে। কী সব্বোনাশ! মন্ত্রপাঠ শুরু হয়ে গেল। শোরগোল বাড়তে লাগল।

শোরগোল বাড়তে থাকে যত, শোভারানীর রূপও তত বিস্তার নিতে থাকে। রূপের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শোভারানীকে চিনে যেতে থাকে সকলে। কেমন রূপ ছিল শোভারানীর? বর্ষায় ধান রোয়ার সময় তার রূপ মেঘের মতো হয়, জলভরা টলোমলো। এত যৌবন দ্যাখেনি পীরতলা। তেরো নদী যেন ফুলেফেঁপে উঠেছে শোভারানীর ভিতরে। অঘ্রানে ধানকাটার রসুমে সেই রূপে আসে আর এক পূর্ণতা। হলুদ হয়ে আসা শস্যখেত্রে শোভারানী দাঁড়ালে তাকেই দ্যাখে বুড়ো চাষি, ফসলে তার চোখ থাকে না। কী না পারত শোভারানী! ছালাম বলত, কামট, কুমীরে ভরা গোমর নদীতে নেমে মাছ ধরত শোভারানী, মাছ, মাছের পোনা ধরত আঁচল পেতে। ঘোর বর্ষায় ধান রুয়ে যেত সমস্তদিন। বিবি শোভারানী কী না পারত, কী না জানত! তার বিবি যা জানে না, জগতের কোনো মেয়েমানুষ তা জানে না। ছালাম যেন ফিসফিসিয়ে বলে যেত তার দিনযাপন, রাত্রিযাপনের কথা। সহবাসের কথা। শোভারানী আর সে যে কত রাত্রি পর্যন্ত খালপাড়ে বসে জ্যোৎস্না দেখত। হাসতে হাসতে বলত ছালাম, আহা অমন সুঁদুরী, মনেরও মাধুরী, মিশায়ে চাতুরি, হয়েচে আদুরি...।

আদুরী শোভারানীর কথা যত ছড়াতে থাকে, পীরতলার কিছু মানুষ তত দাঁত

ঘষতে থাকে। ছালাম যখন ভিটেয় থাকে না, রিকশা নিয়ে সওয়ারি বয় জোড়া-পুকুর-হাইওয়ে পর্যন্ত, খালপাড় দিয়ে লোক চলাচল বাড়ে। লোকে চাপা গলায় বলতে থাকে, শোভারানী কখনও ছালামের বিবি হতে পারে না। সেই কথা শুনে পীরতলার বহুজনেরও মনে হয়, কথাটা যেন যুক্তিযুক্ত। শোভারানী যদি হিন্দু মেয়ে হয়, ছালামের ভিটেয় ছালামের বিবি হয়ে সে থাকবে কেন? আবার জ্যোৎস্নারাতে খালপাড়ে শোভারানী, ছালামকে বসে থাকতে দেখে তাদের আগের মত বদলে যায়। কী সুন্দর আছে দুটিতে! ওরা যদি ভালো থাকে আমাদের কী? তা শুনে মহাজনেরা বলে, ভ্যানরিকশাওয়ালার অমন বিবি থাকবে কেন, অমন মেয়েমানুষ তার ভোগে লাগব কেন? সেই কথা শুনে বহুজন কানে আঙুল দেয়, এ কেমন ভাষা!

তারপর ছালাম গেল দুলদুলি। ফুফু মরেছে সেই খবর এল দুপুর দুপুর। ভিটেয় শোভারানী থাকল একা। মাসটা ছিল অঘ্রান। জমকা শীত। শোভারানীর ঘরে ঢুকল পীরতলার মহাজনেরা কয়েক জোড়ায়। বাঘে খেয়েচে বাপেরে, মাকে নিয়েচে ফরেস্টারে, শোভারানীরে নিল মহাজন। তারা শোভারানীর মুখে কাপড় গুঁজল, হাত বাঁধল, পা চেপে ধরল, তার গায়ের কাঁথা, কম্বল, শাড়ি ব্লাউজ টেনে খুলল।

ছালাম ফিরলে, তাকে রাস্তা থেকেই থানা তুলে নিয়ে গেল, কোথায় ছিলি?

দুলদুলি।

এদিকে যে শোভারানী—!

ছালাম ভয় পায় দারোগাবাবুর চোখ দেখে, খবরটা তো সে শুনেছে। ও খবর তো কানে কানে রটেছে। সোনাখালির ঘাটেই খবর চলে গেছে, পীরতলায় খুব গোলমাল, হিন্দু শোভারানী ছিল মোছলমানের বিবি, তাকে ছিঁড়ে খেয়েছে কারা যেন।

শোভারানী কে? জিজ্ঞেস করল দারোগাবাবু।

আঁজ্ঞে মোর বিবি।

তুই মোছলমান, তোর হিন্দু বিবি হল কী করে?

আঁজ্ঞে শোভারানী হিন্দু না।

তাহলে কী তার জাত?

আঁজ্ঞে তাও জানিনে।

দারোগাবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, এতক্ষণে বোঝা গেল কেন শোভারানীর উপর হামলা হল, তারে আগেই তো নষ্ট করেছিস তুই।

আঁজ্ঞে না, শোভারানীরে আমি ভালোবাসতাম।

তোর আবার ভালোবাসা, চালাস তো ভ্যানরিকশা।

শোভারানী আমারে ভালোবাসত।

ওসব মিথ্যে কথা, তুই কদিন হাজতে থাক, পীরতলার মহাজন, বহুজন খেপে উঠেছে, তোরে দেখলে তাদের রোষ বেড়ে যাবে।

শোভারানী কুথায়?

সে জেনে তোর কী হবে?

শোভারানীরে দেখব।

কী দেখবি, বডি এখন পোস্টমর্টেমের জন্য শহরে চালান হয়ে গেছে।

ছালাম মোল্লা কাঁদল।

কতজন গিয়েছিল শোভারানীর ঘরে? সে খবর শোভারানী ছাড়া আর কে দেবে? শোভারানী মরেছে, সেই খবর জানার উপায়ও নেই। তবে পুলিশি তদন্ত তো চলছে। চলছে এখনো।

পীরতলার মানুষ বলে, সারাদিন ধান কেটেছিল শোভারানী। ধান কাটার জন্যই সে দুলদুলি যায়নি। সেই রাত্রে শীতটা যেন বাঘ হয়ে উঠেছিল। শীতের ভয়ে পীরতলার মানুষজন দুয়ার এঁটে ঘুমিয়েছিল। যে কথা জানা যায়, তা হল শোভারানীকে পরপর নিয়েছিল কয়েকজন। প্রথমজন বলে, সে শোভারানীর গা থেকে ধানের গন্ধ পেয়েছিল। দ্বিতীয়জন বলে, সে-ও ধানের গন্ধ পেয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে প্রথমজনের গায়ের গন্ধ মিশে গিয়েছিল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমজন আর অসাড় শোভারানীর গায়ে ধানের গন্ধ পায়নি। পেয়েছিল প্রথম, দ্বিতীয়ের গায়ের গন্ধ। পরের দিকে শোভারানী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠেছিল। তারা মহা উল্লাসে শোধ নিচ্ছিল ছালাম মোল্লার উপরে। হিন্দু মেয়ের মতো-ই শোভারানীর আচরণ ছিল সেই রাত্রে। সে বাধা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। অনেকগুলি পুরুষকে গ্রহণ করতে করতে তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল তার নিজের পাপেই তার ওই শাস্তি। ছালামের জন্যই তার ওই শাস্তি।·হায় ছালাম! হায় ছালাম! কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়েছিল সে।

এইসব কথা দুলাল মণ্ডলের কাছে শোনা। দুলাল মণ্ডলকে এইসব কথা জানিয়েছিল তারা যারা সমস্ত রাত ধরে শোভারানীকে ভেঙেছিল। তার রূপময় সর্ব অঙ্গ হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে চূর্ণ করেছিল যেনবা। বিশ্বাস ভেঙেছিল, নির্ভরতা ভেঙেছিল, ভেঙেছিল কত কিছু, কহনে না যায়।

ভেঙেছিল কত কিছু, কহনে না যায়।
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে প্রাণ কত যায়॥
গম্বুজ ভাঙিয়া যায়, এমনই তো হয়।
দেহ শোভা মন শোভা ছিল রূপময়॥
ছিল তাহে স্নিগ্ধ রূপ, বাতাসের ভাব।
এসব দেখিল না কেহ, লইছে হিশাব॥

দুলাল মণ্ডল বিড়বিড় করতে করতে পীরতলায় হাঁটে। এ পাঁচালি দুলালের না কার লেখা তা কেউ জানে না। একেক ভিখিরি, ফকির একেকরকমে গেয়ে যায় পীরতলার পথে :

রাজার হাতি মেঘের রাতি মরিল যেমতি।
ছালামের বিবির হয় মরণ তেমতি॥

শুনে মহাজন হাসে। মহাজন জানে যে কাজটি করা হয়েছে তার ফলে কোনো ভ্যানরিকশাওয়ালা আর সুন্দরী যুবতি বিবি নিয়ে ঘর বাঁধতে সাহস করবে না। এবার পীরতলার নতুন ইতিহাস রচনা হবে। মহাজন গুনগুন করে :

যুবতি নারীরা এবে ভোগের হইল।
এইরূপে সুখের দিন এ দেশে আইল॥
শোভারানী পহেলা ঝাঁকি, আরো কত আছে।
এবার দেখবি তারা কোনপথে বাঁচে॥

এসব শোনে পীরতলার মানুষ। শোনে দুলাল। বলে দুলাল, শোনে বহুজন। বলে বহুজন। দুলালের মুখে যখন রাজার হাতির কথা শোনা যায়, মেঘের মতো তার রং, শোনা যায় মেহগনির কথা, আচমকা কারোর যে মনে পড়ে না শোভারানীর কথা তাই বা কে বলবে বুকে হাত দিয়ে। দুলাল নিজে দেখেছিল যেন শোভারানীকে ধর্ষিতা হতে, মরতে। হায় ছালমা! দুলাল বিড়বিড় করে, ভাগ্যি তুমি দ্যাখোনি। তোমার শোভারানীর সেই মরণ, সেই মরণে যে আমারও মরণের সাধ জেগেছিল হে।

তিন

কবর মানুষ নেয়। শোভারানীর ভিটেয় খোঁড়া কবরও মানুষ নিতে এসেছে। না হলে দুলাল মণ্ডলকে টেনেছিল কেন? তাকে তো প্রায় গিলেই নিয়েছিল। বেঁচে গিয়ে দুলাল বিড়বিড় করছে, মরল এক মেহগনি, তাহার নাম শোভারানী।

দারোগাবাবু দুলালকে জিজ্ঞেস করে, কী দেখেছিলে?

দুলাল বলল, মেঘের মতো মেহগনি।

কেন গিয়েছিলে ওখানে?

মেহগনি দেখতে।

কেন গেলে সন্ধের পর?

আকাশে চাদ ছি গো।

দারোগা টেবিলে হস্তাঘাত করে, ঠিক করে বলো, তুমিই যত নষ্টের গোড়া।

দুলাল মাথা দোলায়, বলল, ও কবর মেহগনির।

তার মানে?

দুলাল বিড়বিড় করে, তার কবর, মরণের আগে তার গায়ে ধান গন্ধ ছিল, পেথম মহাজন তা পেয়েছিল, পরের জনও পেয়েছিল অল্প, পরে ধান গন্ধের সঙ্গে মহাজনের গায়ের বোটকা গন্ধ মিশে গিয়েছিল—।

দারোগা বলে, এসব আগে শুনেছি, তুই এসব কথা একদম বলবি না, জমানা বদলে যাচ্ছে।

দুলাল বলে, ও-কবর শোভারানীর, শোভারানী মাটি পায়নি পীরতলায়, তারে কাটা ছোঁড়া করতে নিয়ে গেল, তারপর সে লাশ কোথায় গেল কেউ জানে না।

দারোগা বলল, ধান গন্ধ কথা জানলি কী করে, তুই কি ছিলি সে রাত্তিরে?

দুলাল বলে, মহাজনেরা বলেচে।

কী বলেচে?

দুলাল বলে, সবাই সব জানে, আমি তার কতটা জানি দারোগাবাবু, কিন্তু শোভারানী মাটি পায়নি, তারে কি মাটি দেবে না পীরতলার মানুষ?

কবর কি তুই কাটলি?

জিভ কাটে দুলাল, আমি তো হিন্দু বটে, চিতা সাজাতাম বরং, মহাজনেরা বলল শোভারানী হিন্দু না মোছলমান জেনে আসবে, আমি গেলাম সঙ্গে, তারপর কথা বলতে বলতে মহাজনেরা ভাঙতে লাগল শোভারানীরে, বলতে লাগল ধান গন্ধ, ঘাম গন্ধ, মেয়েমানুষের গা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল শোভারানী—আমি পলায়ে আসি তখন, হায় ছালাম!

দারোগা বলল, তুই হাজতে থাক ক-দিন, তোরে বাইরে রাখলে বিপদ—!

দুলাল ঢুকল হাজতে। হাজতে ঢুকে ছালামের ছায়া দেখল কিন্তু ছালামকে খুঁজে পেলনা। হাজতে ছিল এক ছাগল চোর, সে বলল, কবরখানি কারে নেয় ঠিক কী, তার চেয়ে হাজতবাস অনেক ভালো।

পীরতলার মহাজন তখন আসেন দারোগাবাবুর কাছে। বললেন, জয় হোক, কবর কে কেটেছে তা খুঁজে বের করুন দারোগাবাবু, শোধ নেবার জন্য হচ্ছে এসব।

কীসের শোধ?

শোভারানীর মরণের, মরতে বলেছিল কে তারে?

রেপের পর মেয়েমানুষ মরতেই চায়।

রেপ তো হয়নি শিক্ষা দিয়েছিল মহাজনেরা, হিন্দু ছিল শোভারানী, কেন সে ছালামের বিবি হল ওই রূপ নিয়ে, ছালাম তো রিকশাওয়ালা মাত্র। দেশসুদ্ধ ছিছি করছে।

করুক, দেশের লোক তো জানে না ছালামই হল আসল দোষী।

দুলদুলির কন্যে ওই সদ্বংশ জাত।
ব্রাহ্মণ কন্যা তিনি, বক্ষ শোভায় খ্যাত॥

দারোগা হইহই করে ওঠে, এ বই কার লেখা?

মহাজন বলল, আমাদের, যত মিথ্যে কথার এই হল জবাব, শুনুন তাহলেঃ

যথাকালে যৈবন আসিয়া ঘিরিল।
ভ্রমর যতেক ছিল, চারপাশে উড়িল॥
চম্পক বরণ হইল, সর্ব অঙ্গ মধুর।
সপ্তডিঙা লইয়া আসে, স্বপন বধূর॥
যৈবন সুগন্ধে ভরে, বিবাহ হইবে।
হেনকালে যবন দস্যু ছালাম আসিবে॥

শুনতে শুনতে দারোগা বলে, কী সব্বোনাশ! এ ইতিহাস দেশের লোক জানে না?

না জানে না, জানে না বলেই শোভারানীর মরণ নিয়ে মাথা খারাপ করে, শুনুন :

ব্রাহ্মণ যুবতি হেরি, দস্যু কামার্ত হইল।
সায়ংকালে নদীকূলে যুবতীরে ধরিল॥
পীণবক্ষ পীড়ন করে, চলোহ কন্যা।
মোর তরে মিলিবে সুখের হি বন্যা॥
ছালাম কহে চলো কন্যা শাহিদি করিব।
সর্ব সুখ দিব আমি, সুখেহি থাকিব॥

কন্যা থুতু দিল মুখে, দূর হ দুষ্ট।
মেয়ে অঙ্গ ছুঁইলি তুই, দেহে হবে কুষ্ঠ॥
দুষ্ট নাহি শুনে কথা, কামেতে মজিল।
নদীতীরে সন্ধ্যাকালে যৈবন লুটিল॥
শোভারানীর শোভা গেল, দুষ্টরে ধরিল।
না মরিয়া জলপথে পীরতলা চলিল॥

তারপর কী হল? দারোগা ঘামছে শুনতে শুনতে, বলল, বেশ মাখো-মাখো হয়েছে মশায়, এইটি হল আমার মনে কথা, জয় হোক!

মহাজন বলে :

যবন লুটিবে যৈবন, বাঁচিয়া থাকিবে।
হেন অনাচারে দেশ, পাপেতে ভরিবে॥
মহাজন তাই ভাঙে ছালামের শোভা
আবাব গড়িবে ফের ব্রাহ্মণ শোভা॥
শোভা, শোভা শোভা হয রূপবতী কানে।
মহাজনে ভাঙে তারে, ভোগ্য বস্তু জেনে॥
এমন নিতম্ব শোভা, দেহ অনুপম।
ভ্যান-অলা নেবে কেন, রেস্ত যার কম॥
ভালোবাসা মিথ্যা কথা, ছালামের ছল।
এতদিনে মহাজন, হয়েছে সফল॥
শোভারানীর যত কথা
এমতে হইল।
মহাজন মনে মনে
যা হয় করিল॥

দারোগাবাবু, বলল, এই তো আসল ইতিহাস।

মহাজন বলে, এই ইতিহাস বলে আসমুদ্র হিমাচল আমাদেরই দেশ, লোকে তা মনে মনে জানে, মুখে অন্য কথা বলে।

দারোগা বলে, সব সন্দেহ কেটে গেছে স্যার, কেন শোভারানী মরল জলের মতো পরিষ্কার।

এবার কবরটা নিযে ভাবা হোক। মহাজন বলে।

তদন্ত চলছে স্যার।

তদন্ত আবার কী, ও কবর ছালাম কেটেছে।

ছালাম! সে তো পীরতলায় নেই।

আছে, ভ্যানরিকশাওয়ালা হয়তো অন্ধ ভিখিরি হযে আছে, খুঁজে বের করুন।

কী করে খুঁজব?

মানুষ, দারোগা শুরু করেন, নামধাম সমেত দাগিয়ে দিলেই ধরা পড়ে যাবে, শুনুন :

নামধামে দাগাও যতেক আছে মোছলমান।
তাহার সহিত জুড়িবে ওহে এদেশী কিস্তান॥
পিতাশ্রী কহিতে যদি পারে প্রাণ ভরে।
বক্ষেতে টানিয়া লহো ভ্রাতা ভগিনী করে॥
অন্যথা হইবে যেই, মাথাটি কামাও॥
বর্ডার পারিয়া দাও, ভিনদেশী যাও॥
যাও ভিনদেশী যাও, আর নাই ঠাঁই।
চক্ষের জলেতে বিদায় ছালাম কালাম ভাই॥

দারোগার চোখে জল এসে যায়, কী দুঃখের কথা এটি, কিন্তু উপায় নাই বাপ ডাকতেই হবে।

মহাজন হাসে, তাহলে কাজ আরম্ভ হোক, জয় হোক্।

বাপ ডাকো পায় ধরো
এমতে থাকো।
যুবতী বিবিরে সবে
গচ্ছিত রাখো॥
ওহে ছালাম রিকশাওয়ালা,
শোভারানীরে দাও।
বামন হইয়া কেন,
চাঁদে হাত বাড়াও॥
জমিজমা যুবতী কন্যা।
সবই শোভারানী।
মহাজনে যাহা কহে,
চির সত্য জানি॥

সুর তুলতে তুলতে মহাজন বিদায় নেন।

বহুজন ছুটে আসে, কী কাণ্ড, মানুষ দাগানো আরম্ভ হল কেন?

দারোগা বলে, ছালাম কোথায় দেখতে চাই।

ছালাম, ছালাম কেন?

দারোগা তখন মহাজনের কথা বলে। শোভারানীর ইতিহাস বলে। ছালামের প্রতি মহাজনের সন্দেহের কথা বলে। শুনতে শুনতে বহুজনের অনেকজনের মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। তারা বলে, পাপ ঢাকতে চায় মহাজন, ও কবর শোভারানীর, শোভারানী মাটি পায়নি পীরতলায়।

দারোগা বলল :

ব্রাহ্মণকন্যা উচ্চবংশ রূপেতে আলো।
ছালামের বিবি হওয়া কোনদিকে ভালো?

বহুজন বলল :

ভিনদেশী পুরুষ দেখি, চান্দের মতন।
লাজ রক্ত হইল কন্যা পরথম যৈবন॥

দারোগা হিহি করে হাসে, মহাজনের চেয়েও এ যে আরও মধুর কথা, কে লিখেছে এ পদ্য ?

বহুজন বলল :

ছালাম লেখে কালাম লেখে, লেখে মানিক মিঞা।
রাম লেখে শ্যাম লেখে, লেখে কুসুম হিয়া॥
মইমন সিংহেতে হল এ কাব্য লেখা।
ছালাম পাইল এবে, শোভারানীর দেখা॥

দারোগা বলল :

মহাজন এতদিন হয়েছে সফল।
মানুষ দাগানো হবে, বিধর্মী সকল॥
পাগলা দুলাল পার পাবে না, পার পাবে না তুমি।
ঘর জ্বালানি পর ভোলানি, আর পাবে না ভূমি॥

বহুজন বলল :

শোভারানীর মাটি পেলে না, কবরখানি তাই।
দেহখানি নিলে বাবু, এবার ফেরত চাই॥

দারোগা হোহো করে হাসে সে দেহ পাবে কোথায়, পুড়ে ছাই।

কবরটি শোভারানীর জন্য অপেক্ষা করছে। শোভারানী পীরতলায় মাটি পায়নি। এই আকাশ, এই মাটি, বাতাস সবই ছিল তার আর ছালামের জন্মের সাথী। শোভারানী মর্গে গলে গলে ধাঙড়ের হাতে আর পাঁচটা দাবিদারহীন লাশের সঙ্গে পুড়ে গিয়েছিল। ওইভাবে পুড়লে সদগতি হয় না। মরণের পর বাতাস জোটে না, আকাশও না মাটিও না। শোভারানী মাটি চায় তাই তার কবর কেটে রেখে গেছে কেউ। কবর কেটে রেখে মহাজনদের জানান দিচ্ছে শোভারানীর মাটি চাই। কবর কেটেছিল কে ? তা খুঁজে বের করতে দারোগাবাবু মানুষ দাগাতে আরম্ভ করেছে।

শোভারানীর কাহিনি পীরতলা থেকে দশদিকে ছড়ায়।

চা দোকানের বেঞ্চিতে বসে কোনো-এক দুলাল শুনল, মানুষ দাগানোর কথা। সে ছ-বছর আগে অঘ্রান মাসে অযোধ্যা গিয়েছিল করসেবক হয়ে। ফিরেছিল কাঁদতে কাঁদতে। তারপর তার মাথাটি খারাপ হল। স্বপ্নের ঘোরে শুধু হত্যা আর ধর্ষণ দ্যাখে। দ্যাখে দালান, কোঠা, দেওয়াল, খিলান, গম্বুজ ভেঙে পড়ছে হাতুড়ির ঘায়ে। মানুষ দাগানোর কথা শুনে দুলালের মাথাটা দপদপ করতে লাগল। তখন ভ্যানরিকশাওয়ালা হাঁকছে, জোড়াপুকুর, জোড়াপুকুর।

চা ফেলে দুলাল গিয়ে বসে ভ্যানরিকশায়। রিকশার চাকা বোশেখের রোদে পাক খেতে খেতে চলে। ছালাম জিজ্ঞেস করে, ওডা কি সত্যি ?

কী ?

মানুষ দাগিয়ে মাথা কামিয়ে—

দুলাল বলল, আবার ভেঙে পড়বে মেহগনি!

সেবার, সেই অঘ্রান মাসে বাবরি কাণ্ডর পর বিবি গেল, পাঁচ মা'জনে তারে টেনে লিয়ে গেল, পরে বিবির লাশ গেল কাঁটাছেঁড়া করতে, আমি তারে মাটিও দিতি পারিনি, ফের সংসার পেতেচি...।

দুলাল মণ্ডল মাথা ঝাঁকাতে থাকে, বলল, আমারে বলো না ছালাম, আমি জানিনে, আমারে বলল নাম কীত্তন হবে অযোধ্যায়, গিয়ে দেখি কী ভীষণ কাণ্ড!

ছালাম বলল বড়ো ভয় হয়, এ বিবির দিকেও নজর করচে মা'জনে।

দুলাল বলল, আমারে বলো না ছালাম।

আমারে বলোনা ছালাম।

আমারে বলো না।

আমারে...।

দুলালের কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। □

মানুষের পিছন দিক

অ ভি জি ৎ সে ন

রাধিকার এখন কাঁদার পালা। চিৎকার চেঁচামেচি করে সে কাঁদছে না বটে, কিন্তু কান্নার তার যেন আর বিরাম ছিল না। গত দুদিন ধরে যে খালি কেঁদেই যাচ্ছে। বিশ বছর আগে সে যখন অবনীর চোখের সামনে উদয় হযেছিল, তখন কিন্তু তার চোখে জল ছিল না।

তার চোখে তখন কোনো প্রত্যাশাও ছিল না, আবার হতাশাও ছিল না।

কিন্তু সে সময়ে তার চোখে শূন্যতা ছিল না, এটা ঠিক। আবার যদি কেউ সে সময তার চোখ-মুখে কিছু প্রাপ্তি খুঁজত, তাও কি পরিষ্কার পেত ? সত্যি কথা বলতে কি, সেই বিশ-একুশ বছর আগে অবনী যেন সেরকমই কিছু তার চোখে খুঁজতে চেষ্টা করেছিল। তাকে গোপনে লক্ষ করছিল। রাধিকাকে সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল না। সে একটা অদ্ভুত সময় তাদের জীবনে। কেননা, রাধিকার চোখেমুখে কোনো প্রাপ্তি ধরা না পড়লেও শরীরে তা সাড়ম্বর ছিল। শরীরে তো লুকোবার কোনো ব্যবস্থা নেই। অবনীর সঙ্গে বিবাহিত জীবনের ছ-সাতটা বছরে একবারও তো শরীর এভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি তার। হতাশায নিজেকেই সে অভিশপ্ত ভেবেছিল। নিজেকেই দোষারোপ করেছিল রাধিকা। সে তখন খুব বোকাও ছিল। সে জানতই না, এই দোষের ভাগীদার, এমনকি পুরো কারণটাই অবনীই হাতে পারে। সেই অদ্ভুত সময়ে, যা আসলে ছিল দারুণ দুঃসময় মানুষ নিজের থেকেই অনেক কিছু বুঝে যায়। রাধিকাও বুঝে গিয়েছিল দোষটা সম্পূর্ণ অবনীরই। সেই দুঃসময়ে সমস্ত নিয়মকানুনও ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। তাই যায়। স্বাভাবিক সময়ে যা মনে হতে পারে ভীষণ অন্যায়, মনে হতে পারে এমন ভাঙন, যা আর জোড়া লাগার কোনও উপায় নেই, এমন বিপর্যয় যা থেকে আর উদ্ধারই নেই, কালক্রমে সব ঠিক হযে যায। আসলে ঠিক হওয়া ছাড়া মনুষের তো কোনো উপায়ই থাকে না কিনা। তোমার যদি একখানা অঙ্গ কাটা যায়, তুমি কী করবে ? অঙ্গ ছাড়াই তো বেঁচে থাকার অভ্যাস করবে ? কিন্তু রাধিকা এখন আর এসব বুঝছে না। সে কেবল কেঁদে যাচ্ছে। তার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, কোনোদিনই এ-কান্না সে থামাতে পারবে না। আরও বিস্ময়ের যে অবনী তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করছে না। দাওয়ার এক কোণে সে আড়ার সঙ্গে বাঁধা একগাছা জাল বুনতে নিজেকে যেন অনন্তকালের জন্য নিযুক্ত করে রেখেছে। চোখে পড়ে, কি পড়েনা, এ রকম এক চিলতে হাসিও কি ঠোঁটের পাশে লেগে আছে তার ?

এই বিশ-বাইশ বছর ধরে কান্নাটাকে লালন করলেও রাধিকা বোধহয় শেষ পর্যন্ত আশ্বস্তই হয়ে গিয়েছিল যে এ-জীবনে নতুন করে আর ওসব কথা উঠবে না। সে নিজেও ওঠাবে না, ওঠাবে না অবনী। ওঠাবে না অন্য কেউ। এই অন্য কেউ বলতে একমাত্র নন্দাই গিরিন ছাড়া, আর তো বিশেষ কেউ ছিল না। আর তারা সবাই জীবনের কাছ থেকে কিছু নতুন বন্দোবস্ত শিখেছিল। না হলে মানুষের বাঁচার আর কোনো উপায়ই যে থাকে না।

সে রকম একটা নতুন কথা দিন পনের আগে রাধিকা তার ছেলেকে বলেছিল। রাধিকা বলেছিল, বুঝলু আনন্দ, মানুষ তার পিছনটাক্ বেশি জানে না। যদি জানত, তা হলে খাওয়া-খাওয়ি, মারামারি বোধহয় অ্যানা কমই করত।

রাধিকা কুসুমপুর থেকে আনন্দকে প্রায় ধরেই নিয়ে আসছিল। কুসুমপুর থেকে জীবনসাগর দশ মাইল রাস্তা টাঙায় করে আসতে হয়। রাধিকা এবং আনন্দ আরও কয়েকজনের সঙ্গে টাঙায় বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। শেষ পর্যন্ত দশজন লোক নিয়ে টাঙাটা চলতে শুরু করেছিল। ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি করে কোনোমতে বসা। তারা বসেছিল টাঙাটার পিছনদিকে পা ঝুলিয়ে। নানারকম কথা বোঝাতে বোঝাতে রাধিকা ছেলেকে ওই কথাটা বলেছিল।

আনন্দ মায়ের এত সব কথাতে খুবই বিরক্ত হচ্ছিল। আসলে মা যে তাকে ধরে নিয়ে আসছিল, এ ব্যাপারটা তার আদৌ ভালো লাগেনি। কিন্তু করবেই বা কী? মাকে যে সে ভীষণ ভালোবাসে। তবুও তার মনে হচ্ছিল কুসুমপুরে একটা আশ্রম আছে। আনন্দ বেশ কিছুদিন ধরে বড়সড় যাত্রার আয়োজন হচ্ছিল। আশ্রমের কর্মকর্তারা এবং বাইরের দু-চারজন লোক কোনো একটু বিশেষ অভিযানের প্রস্তুত করছিল। সেই যাত্রা বা মিছিল যেন একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের, লড়াইয়ের প্রস্তুতি। আনন্দ নিজের মধ্যে উন্মাদনা টের পাচ্ছিল বেশ কিছুদিন যাবত। সে ঠিক করেছিল, এই মহাযাত্রায় সে-ও যাবে। তাতে যদি শেষ লড়াইতেও তাকে অংশ নিতে হয়, নেবে সে। আশ্রমের এক স্বামীজি তাকে বলেছিল, ঠিক রামচন্দ্রের মতো চেহারা তোমার। পদ্মপলাশের মতো চোখ, আজানুলম্বিতবাহু, বীরত্ব সারা শরীরে। অযোধ্যা মুক্ত করতে তো তোমাকেই যেতে হবে, বাবা।

আশ্রমে রামচন্দ্রের ছবি দেখেছিল আনন্দ। বীর, দর্পহারী রাম। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। ধনুকে আকর্ণ জ্যা টেনে অগ্নিমুখী বাণ ছেড়ে দিয়েছে সে শত্রুদের দিকে। দেখলে গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীর কথা শুনে একসময় সত্যি সত্যিই নিজেকে তার রামচন্দ্র বলেই মনে হতে শুরু করেছিল। সেই রামচন্দ্র। ইস্ ভাবা যায় না। যাবে সে অযোধ্যায়!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার যাওয়া হয়নি। রাধিকা দুদিন ধরে তার সঙ্গে লেগে বসেছিল যেন। ছেলেকে অনর্গল বুঝিয়ে গেছে সে। বুঝিয়েছে, ওসবে আমাদের কোনো দরকার নেই। কারুর কোনো কাজ নেই ওসব ব্যাপারে। সে বলছিল, বুঝল আনন্দ, মানুষ তার পিছনটাক্ বেশি জানে না—এইসব কথা। বলেছিল, এ মানুষগুলো কোথায় নিয়ে যাবে তোদের? কী চায় এই মানুষগুলো?

তাতে আনন্দ আরও উত্তেজিত হয়েছিল। বলেছিল, তুমি কী বুঝবে? কী বুঝবে তুমি? আমাদের যত অভাব অভিযোগ, সবকিছুর জন্য ওরাই দায়ী। ওদের জন্যই আমাদের এত দুঃখকষ্ট। অথচ ওদের—

সেই টাঙার দশ জনের মধ্যে ছজনই আনন্দর 'ওরা'। আসলে তাদের জীবনসাগর থানায় ওদের সংখ্যাই বেশি কিনা। রাধিকা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, ওই লোগগুলো তোর শত্তুর? ওই মেয়াদুটা, ওই চেংড়াটা? আর এই টাঙাওয়ালা?

এইভাবে আনন্দকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল রাধিকা। কিন্তু আনন্দ শান্ত হয়নি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল সে, যেন তার আরব্ধ কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তাতে তার ক্রোধ বাড়ল, অস্থিরতা বাড়ল। সে যা সত্য বলে জেনেছিল, তার বাইরে আর সে কিছুই দেখতে পায় না। তার অসাধারণ চেহারা তাকে আরও অহংকারী করেছিল। এক সময়ে তাব সত্যি সত্যিই ধারণা হয়ে গেল সেই রাম! অযোধ্যায় তাকে যেতেই হবে।

রাধিকা তার অস্থিরতা দেখে রাত্রে অবনীকে বলল, ও কী পাগল হয়ে গেল? কোথায় কোন্ বিপদে গিয়া নিজেব আর পরের সব্বোনাশ করবে।

অবনী বলল, কত কথা শুনছি চারদিকে। কিন্তু এসবের মধ্যে ও গিয়া পড়বে, একথা ভাবতে ভাল লাগে না। একবার গিরিনকে খবর দি, কী বল?

সেই ভালো। গিরিন রাধিকার নন্দাই। কৃষক আন্দোলন, পঞ্চায়েত, পার্টি ইত্যাদি করা শক্ত লোক সে। গিরিন অবনীর বাল্যবন্ধুও। সে থাকে পাশের থানায়। বিশ-বাইশ বছর আগের ঘটনার একমাত্র সাক্ষী সে-ই। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মানুষ। আসুক সে, এসে বোঝাক আনন্দকে।

খবর পেয়ে বউ গৌরীকে নিয়ে গিরিন এসে হাজির হল। ওপবে শক্ত লোকটার ভিতরটা তরল। সে শুধু দু-একজনই জানে। তার মধ্যে বাধিকা একজন। গিবিন বলল, আবার কী হল?

রাধিকা বলল, সে হবে'খন। আগে বসো, জিরাও, খাওয়া-দাওয়া কর,. তাবাদে কথাবার্তা হবে।

গিরিন বলল, যা বাব্বা! এ দেখি গম্ভীর ব্যাপার। আমি ভাবলাম ব্যাটার বিযাটিযা লাগাবে, সেই তংকে ডাকা।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কথায় বার্তায বেরিয়ে পড়ল আসল কথাটা। রান্নাঘরের সামনের দাওয়ায উবু হয়ে বসে গিরিন সেই পুবনো রসিকতাটা আরেকবার করল। বলল, অংকাই হয, অংকাই হয। হাতের কাছে আমরা এতজনা থাকতে মোছলমান দিয়া ছাওয়াল বানাতে গেল।

গৌরী বলল, ইস্ সারাদিন চাবাভুবোর সঙ্গো থাকতে থাকতে মুখটাও চাবাদের মতো হয়ে গেছে। বুড়া হল, তবু আক্কেপ গেল না।

রাধিকা গিরিনকে তীব্র কটাক্ষ করল। মুখে বলল, আবদার!

গিরিনের আক্ষেপ কি শুধু রসিকতাতেই? মানুষ বড়ো হতভাগ্য। আর কোনো জানোয়ারের মুগ্ধতা নেই। মানুষের মুগ্ধতা আর কিছুতেই যায় না। সে বলল, মরে

গেছি বউ, তবু আরও একবার ওইভাবে চোখ ঠারো। রাধিকা বলল, না জামাই, হাসিঠাট্টার কথা নয়। আনন্দর ভাব ভালো বুঝি না।

গিরিন বলল, ও ঠিক হয়ে যাবে। ও তো আর বোকা, কি বজ্জাত চেংড়া নয়। আমি কথা বলব ওর সঙ্গে। তুমি আরও একটু চা খাওয়াও তো।

কিন্তু অবনী একসময় বলল, গিরিন, সেই সময়টা এসেছে।

গিরিন তখন চমকে উঠে তার চোখে চোখে তাকাল।

—কোন সময়টা?

—বিশ বছর ধরে আমরা যা শিখেছি, আনন্দকে তা এখন আচমকাই শিখাতে হবে। জালের ফাঁদ একটার পর একটা আটকাতে আটকাতে অবনী বলল, রেহাই নাই, মানুষের রেহাই নাই।

প্রায় তক্ষুনি আনন্দ বাড়িতে ঢুকল। রাগী, বিরক্ত, সুন্দর, দৃপ্ত আনন্দ। গিরিন অনেকদিন বাদে ভালো করে তাকিয়ে দেখল তাকে। খুব ছোটো থেকেই পিসার সঙ্গে খুব ভাব আনন্দর। খুব অত্যাচার করত গিরিনকে। তাতে বিরক্ত না হয়ে মজা পেত গিরিন। খেপাবার জন্য বলত, তুই তো মোছলমানের ছাওয়াল। রাস্তা থিকা আমরা তোক্ কুড়ায়ে আনিছি। হাসপাতালের সামনে কোন্ মোছলমান যেন ফেলাস গিছিল তোক্।

শিশু আনন্দ খুব রেগে যেত। 'শালা, শুয়ারের বাচ্চা,' বলে পিসার চুল ধরে ঝুলে পড়ত।

গিরিন খুব ভালো মানুষের মতো বলত, আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজের মা-বাপকেই জিজ্ঞেস কর।

খুব রেগে যেত আনন্দ। কেঁদে, চেঁচিয়ে, দুমদাম করে কিল ঘুষি মারত গিরিনের পিঠে, বুকে। গিরিন বলত, থাম্ থাম্—আরে থাম্। তারপর যেন অকাট্য প্রমাণ হাজির করত। প্রতিবেশী মুসলমান শিশুদের তুলনা তুলে গিরিন বলল, এই দেখ, তোর নংকু হামিদ, লতিফের মতো, আগাকাটা। বিমল, রতনের তো এংকা নয়!

সেই পাঁচ-সাত বছর বয়সেই আনন্দ এসব জানত। তার সত্যি সত্যিই দ্বন্দ্ব লেগে যেত। প্রতিবেশী শিশুদের শিশ্নের সঙ্গে নিজের শিশ্ন মিলিয়ে উল্টেপাল্টে দেখত।

এতকাল পরে গিরিনের হঠাৎ মনে হল, সেই নির্বোধ রগড় থেকেই কি আনন্দের মনে সে বিরোধের বীজ বুয়ে দিয়েছিল। অথচ এই বিশ বছরে সে, অবনী, রাধিকা, এমনকি গৌরীও কি অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি। মানুষ তার পিছনকে কতখানি জানে? কতখানি পিছন সে দেখতে পায় বা দেখা সম্ভব?

সেই শৈশবের মতোই আনন্দকে ডাক দিল সে। বলল, 'এই শালার বেটা শালা, মোছলমানের ছাওয়াল, সামনে খাড়া হ।'

আনন্দ দাঁড়াল বটে কিন্তু তার রক্তাভ চোখ-দুটিতে ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন ধিক্‌ধিক্ করে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে গেল তার। রৌদ্রতপ্ত অশান্ত দৃপ্ত চেহারাতে অসম্ভব অহঙ্কার তার। পিসি-পিসার আসা টের পাওয়া মাত্রই সে বুঝতে পেরেছিল, এসব ব্যবস্থা তার জন্যেই। আরেকটা অস্বস্তিকর বোঝাপড়ার দিন। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে

আচমকা ক্রুশ্ধ প্রতিবাদ করে উঠল। বলল, এরকম চাষার মত কথা বলো কেন?

অবনীর গলা থেকে বিস্ময়ের একটা অস্ফুট আর্তনাদে চমকে উঠল। হাত থেকে বোনার কাঁকই-কাঠিটা ছিটকে দাওয়া থেকে সুতো খুলতে খুলতে গড়িয়ে উঠোনে নামল। গুটনো সুতো খুলে যাচ্ছে। এমন হওয়ার কথা নয়। সে গিরিনের মুখের দিকে তাকাল। বিশ্বাসে আচমকা চিড় ধরা, মুখের ওপর সরাসরি থাবড়া খাওয়া চেহারা। বিস্মিত, হতবাক, অপমানিত এবং আহত। কিন্তু তার স্নায়ু অনেক ঘাতসহ। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। আনন্দের মনোজ্জগতে বিপর্যয় অনেক বড় মনে হচ্ছে। বাপ-মায়ের থেকে পিসার কাছেই না আবদার এতকাল বেশি করে এসেছে সে?

উঠোনে আনন্দর অবস্থান রান্নার ঘরের থেকে অপেক্ষাকৃত কাছে। রাধিকার হাতের কাছে উনান খোঁচাবার বাখারিটা। আনন্দর কথাটা শুনে ওই বাখারিটা হাতে নিয়েই লাফ দিয়ে নিচে নামল সে। মুখে বলল, হারামজাদা, কাক্ কী কবার হয়, আজ তোমাকে শিক্ষা দিয়ে দিমো।

গৌরী পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে।

অ্যাই, অ্যাই বউদি।

বাপরে! বিশ বছরের জোয়ান চ্যাংড়ার গায়ে হাত দেবে নাকি বউ!

আনন্দ কযেকমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে পিছন ফিরল। ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিযেছে গিরিন। দাওযা থেকে লাফ দিযে নেমে এসে ধরে ফেলল আনন্দকে।

—আয আমার সঙ্গো।

—না, আমি যাব না।

—তুই যাবি না তোর বাপ যাবে। চল।

আনন্দর কাছে এই ভঙ্গি এই মুহূর্তে অত্যন্ত নির্বোধ ও স্থূল লাগে। সে বলল, আঃ, ছাড় পিসা।

কিন্তু গিরিন তাকে ততক্ষণে দুহাতে ধরে ফেলেছে। সে বলল, আমি তো চাষাই। চাষের কাম করি, চাষাদের কাম করি। তুইও তো চাষা, চাষার বেটা চাষা। আমরা চাষা হলে, তুই কি বাবু হবি? কিন্তু তোর হয়েছে কী?

—আমি অযোধ্যা যাব।

—অযোধ্যা যাবি? কেন সেখানে কী?

আনন্দ চুপ করে থাকে।

গিরিনই আবার বলল, আমি সব জানি। কুসুমপুরের আশ্রমে কী হয, কারা আসে, কারা কী বলে, কী চায় তারা আর কেনইবা চায, সবই জানি। তোরা কি জীবনসাগরে একটা দাঙ্গা লাগাবি নাকি রে, আনন্দ?

আনন্দ চুপ করে থাকল। কিন্তু ভঙ্গিটা হল, এসব বক্তৃতা সে পছন্দ করছে না। পিসা রাজনীতি করা লোক এবং পিসাদের দলকে তার ভালোই চেনা হয়ে গেছে। সবাই স্বার্থপর, সবাই ধান্দাবাজ। সবার ওপরে উড়ন্ত চুল, পূর্ণ তূর্ণ, শত্রুসংহারক রাম তার মনশ্চক্ষে।

সে বলল, ছাড়ো আমাকে। মালদায় কী হয়েছে তুমি জানো? মুর্শিদাবাদে?

অযোধ্যায়, মথুরায়? সে ক্ষিপ্তের মত আরও কীসব বলে যেতে লাগল। লাগামছাড়া, বানানো, শেখানো, অতিরঞ্জিত সব অভিযোগ। তুমুল মিথ্যার অন্ধকার প্রচার সে আবিষ্টের মতো গিলেছে, সেকথা বোঝা যায় তার আবেগে। তার চোখ ছবির ধনুর্ধারী রামের অপ্রেমময় এবং ঘূর্ণিত।

রাধিকা ননদকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফের গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। আচমকা আবার বেরিয়ে এসে সরোষে বলল, ওক্ বল, জামাই, ওক্ সব বল। ওক্ জানবা দেও যে অয়ঁ কে। কান্নায় তার কণ্ঠস্বর বিকৃত। সে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, জামাই মানুষকে তার পিছন দেখাবাই লাগে। মানুষ কি জানে কে তার বাপ, কে তার ঠাকুরবাপ, আর তার কর্তার বাপই বা কে? কিন্তু জামাই, মানুষের জানা উচিত। ওই হারামজাদাটার জানা উচিত ওর বাপ কে?

আনন্দ খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল। কী বলছে এরা? কে তার বাপ? এ সবের মানে কী?

ওই যে অর্ধেক বোনা জালগাছা ধরে বসে আছে, ওই লোকটা তার বাপ নয়।

বিশ বছর আগে অবনী তার ভগ্নিপতি গিরিনকে নিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে জল্লা স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়েছিল। স্টেশনের কাছে পাকিস্তানি বাংকার খুব মজবুত ছিল। সেই একাত্তরের যুদ্ধের কথা। হিন্দুস্থানি মিলিটারি টন টন মরটার দেগেও সেই বাংকার ভাঙতে পারেনি। যুদ্ধের শেষ দিকে হিন্দুস্থানিরা বাংকার অবরোধ করে ফেললেও খানেরা আত্মসমর্পণ করল না। মাইক নিয়ে হিন্দুস্থানি অফিসার বারবার আত্মসমর্পণ করতে বললেও বাংকার ছিল নীরব। তারপর পাশের একটা পুকুরে পাইপ লাগিয়ে দিয়ে বাংকারে পাম্প করে জল ঢোকাবার ব্যবস্থা হল। অবনীর ধারণা হয়েছিল, রাধিকা, যাকে মাস ছ-সাত আগে খানেরা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, যদি কোথাও থাকে তো ওই বাংকারে। তারা শুনেছিল বাংকারের ভিতরে অনেক মেয়েমানুষ আছে। গিরিনের বাড়ি ছিল সীমান্তের এপারে আর তার ছিল ওপারে। মাঝখানে মাইল দশেকের ফারাক। শালা-ভগ্নিপতি দুজনে থম করে স্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়েছিল। খানেদের মারণক্ষমতা তখন শেষ।

বাংকারের ভিতর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল কিছু অস্ত্রশস্ত্র। কেউ ভিতর থেকে সেগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলেছিল। জল ঢোকানো তখন বন্ধ হল। তারপর খানিক চুপচাপ। তারপর বেরলো একটা মেয়েমানুষ। লজ্জার জায়গা আর বুকে কোনওমতে চেপে ধরা একটা ছেঁড়া সবুজ মিলিটারি কুর্তা।

তার পিছনে আরেকজন, পিছনে সার দিয়ে আরও অনেক। অনেকের অঙ্গেই সুতোগাছাও নেই। জীর্ণভগ্ন চেহারা অধিকাংশের। পেটে বাচ্চার অস্তিত্ব অনেকের উলঙ্গতাকে বড়ো বেশি করে প্রকট করে তুলেছিল। অনেকের শরীরে অসম্ভব অত্যাচারের চিহ্ন। মোট একশ-সাতাশ জন। অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে গিরিন এবং অবনীও তাদের গুনেছিল।

সেই একশ-সাতাশজনের মধ্যে একজন রাধিকা। খাঁকি কুর্তাটা তার উঁচু পেট আড়াল করতে পারেনি। সবশেষে মাথার ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে ছিল খানেরা।

সিনেমার ছবির মতো দৃশ্য। রাধিকা তড়কালাগা রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল। তার গলায় চির ধরে স্বর বিকৃত হয়ে গেল। গিরিন আনন্দকে মাঝ উঠোনে রোদ্দুরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সরে এসে উত্তর দিকের একটা বাঁশ ধরে স্থির হয়ে রইল। হে ভগবান, মানুষ তার পিছনটাকে কেন জানবে। যদি তাকে জানাতেই হয়, তবে সে কাজ তার মা-ই করুক।

আনন্দ অসহায়ের মতো তিনদিকের দাওয়ায় বসা তার স্বজনদের দিকে ফিরে ফিরে দেখতে থাকে। দম ফুরিয়ে আসছে তার। কোন্ ঘাট দিয়ে উঠবে সে? কে ওঠাবে তাকে হাত ধরে? সে প্রথমে তার মায়ের দিকে এগালো।

চিৎকারে রাধিকার গলা দিয়ে রক্ত উঠে এসেছিল। সে যেন উন্মাদ। থুকরে একদলা রক্তমাখা থুতু উঠোনে ফেলে সে বলল, শুনে রাখ আনন্দ, শুনে রাখ, শুনে রাখ চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষলতা, কেন কি আজ পর্যন্ত কেও জানে না এই চ্যাংড়ার বাপ কে! কেউ সাক্ষী নাই! অন্ধকার গুহার মধ্যে এই চ্যাংড়াক্ আমি প্যাটে ধরিছি।

এরপর সে থেমে থেমে প্রত্যেকটি কথা পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করল, এই চ্যাংড়ার বাপ হইল-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরজনা খান মিলিটারির একজনা, আর সেই একজনা যে কে তা আমিও ক-বার পারমো না!

হেঁসোর এককোপে কাটা কলা গাছের মতো আনন্দ উঠোনের মাঝখানে ভেঙে পড়ল দুহাতে মুখ ঢেকে। রাধিকার গলা কাঁপা গোঙানো স্বরে আক্ষেপের কান্না ভেসে আসছিল। সে তার ননদের দেহে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে হুহু করে কেঁদে যাচ্ছিল। সে স্বগতোক্তির মত নীচু সুরে কান্নার একটা রোল তুলে বলতে লাগল, সারাটা জীবন আমার নিজেকে অশুচি লাগিছে, আর সারাটা জীবন তোকে বুকে জড়ায়ে নিজেকে শুচি করিছি—সারাটা জীবন আমি পাপপুণ্যের ধন্দে ফালা ফালা হইছি—আর তুই!

সেই থেকে রাধিকার কাঁদার পালা শুরু। তার কান্না আর কিছুতেই শেষ হয় না। □

কিছু মুহূর্ত সংকটের

ত প ন ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

টেলিফোনের শব্দটা একটু থেমে থেমে বাজলেই আমরা বুঝতে পারি ওটা সুরাটের কল। এই ফোনটার জন্যই তো আমরা অপেক্ষা করি ঘুম আর জাগরণের প্রতিটি মুহূর্ত। আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের উল্লাস, স্বস্তি ও সুখ সবটাই নির্ভর করে ফোনের ওপাশ থেকে কী বার্তা ভেসে আসে তার উপর। বার তিনেক পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক করতেই দুদ্দাড় ছুটে গিয়ে তুলে ধরি রিসিভার, হ্যালো—

—বাবা, ও নাগপুরে জয়েন করেছে কাল। চার্জ বুঝে নিয়েই একটা ঘর ঠিক করে তিন-চারদিনের মধ্যে চলে আসবে আমাদের নিতে।

—তাই! আহ্লাদের একটা নিবিড় স্রোত হু হু করে বয়ে গেল আমার অন্তর্গত রক্তের ভিতর।

—আরও তিন-চারটে দিন একলা বুবুনকে নিয়ে থাকতে হবে এই যা মুশকিল।

—সাবধানে থাকিস। বাড়িঅলাকে বলিস যেন তোদের খোঁজটোজ নেয়।

—ওরা খুব ভালো লোক, বাবা। তোমরা চিন্তা কোরো না।

শ্রাবণীর ফোন এসেছে বুঝতে পেরেই রান্নাঘর থেকে পড়ি কি মরি করে ছুটে এসেছে গায়ত্রী। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, হাঁপাচ্ছে ভারী শরীর নিয়ে, অবধারিতভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিল, কই, দাও—

এস টি ডি কলের চার্জ যাতে বেশি না ওঠে সে কারণে কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না শ্রাবণীর সঙ্গে। সপ্তাহে দুবার কি বড়োজোর তিনবার ফোনে কথা বলাবলি হয়, তাও মিনিট মেপে মেপে। তাতেই আমাদের আর ওদের মিলিয়ে হাজার দুয়েক টাকা বিল ওঠে প্রতি সাইকেলে। প্রতিবার বিল পাওয়ার পরেই মনে হয় নাহ্, এবার থেকে কথা বলা কমাতে হবে। এত টাকা ফোনের বিল দিয়ে টাকা নষ্ট করা সম্ভব নয়। ভাবি, কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যাই, সে শ্রাবণীই ফোন করুক, কিংবা আমরা।

আসলে একমাত্র মেয়ে অতখানি দূরত্বে থাকে, ট্রেনে প্রায় দুদিনের রাস্তা, টিকিট কাটতে হয় দু-মাস আগে, ইচ্ছে করলেই গিয়ে হাজির হওয়া যায় না বলে সারাক্ষণই চঞ্চল থাকে মনটা। এতটাই উৎকণ্ঠায় থাকি যে, ফোনে কথা বলা শুরু করলে সময়ের হুঁশজ্ঞান থাকে না কোনও দিন। আগে শুধু শ্রাবণী আর রণদীপ ছিল, এখন শ্রাবণীর কোলে বুবুন আসায় আরও উদ্বেল হয়ে উঠছি প্রতিদিন। বুবুনের সঙ্গেও কিছু হিজিবিজি কথা না বললে ঠিক স্বস্তি হয় না।

আজ আমি অল্পতেই ছেড়ে দিলেও গায়ত্রী এখনও কথা বলে চলেছে হুড়মুড় করে। শ্রাবণীর পর বুবুনের সঙ্গো কিছুক্ষণ হিজবিজবিজ করে বলল, তোর মাকে দে, কিন্তু বুবুন ফোন ছাড়বে না। সেও কলকল করে চলে বহুক্ষণ। তার তো মিনিট মাপার বয়স হয়নি। তারপর শ্রাবণীই বোধহয় ফোন নিয়েছে আবার। গায়ত্রী তখন বলছে, সাবধানে থাকিস, নাগপুরের অফিসে ফোন আছে তো? কিন্তু অফিসের পর তো আর ফোনে যোগাযোগ করতে পারবি নে? বললি তো একটা মেসে থাকবে এই ক-দিন। কী মুশকিল, বল? তাহলে ওর কোনও কলিগের ফোন নম্বর নিয়ে রাখ। রাতবিরেতে যদি দরকার হয়, তখন যাতে কথা বলতে পারিস। হ্যালো, হ্যালো—

বুঝতে পারি ওপাশে ফোনের লাইন কেটে গেছে। শ্রাবণীই কেটে দিল, না কি এস টি ডি লাইনটাই কেটে গেল বুঝতে না পেরে গায়ত্রী তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে রিসিভারটার দিকে। তারপর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল, ধুর—

গায়ত্রীর কথা হয়তো তখনও ঢের বাকি ছিল, কিন্তু লাইনটা কেটে যাওয়ায় সে এখন বহুক্ষণ মুখ ভার করে ঘুরে বেড়াবে, কিংবা মেয়ে অত দূরে থাকা তার কাছে যে দুর্ভাগ্যের তা বলে গজগজ করতে থাকবে নিজের মনে। রিসিভারটা ক্র্যাডলে রেখে বলল, এখন রণদীপ তিন-চারদিনের মধ্যে ওদের নিয়ে গেলে বাঁচি।

যতটা মন খারাপ হওয়ার কথা গায়ত্রীর, ততটা না হওয়ায় একটু স্বস্তি। সুরাট থেকে রণদীপ নাগপুরে বদলি হওয়ার খবরে এমনিতেই কিছুটা স্বস্তিতে আছি কয়েকদিন। এতদিন সুরাটে ছিল, সেই তিন বছর আগে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই। বছরে একবারের বেশি যাওয়ার সুযোগ ঘটত না আমার। কিন্তু গায়ত্রী মেয়ে-মেয়ে করে এতটাই পাগল যে, ইদানীং একাই চলে যাচ্ছিল সুরাটে। একমাস-দেড়মাস হয়ে যায় কলকাতা ফেরার নাম করে না। ফোন করলেই বলে, কী করে যাই বলো, ঝুম্পি তো ছেলেটাকে নিয়ে পেরে ওঠে না। ওদিকে রণদীপের সকালে উঠেই অফিসে যাওয়া। তার চা-জলখাবার তৈরি করা তো আছেই। তবু ভাগ্যিশ, দুপুরে একঘন্টার জন্য হলেও খেতে আসে। সকালে উঠেই রান্নার ঝামেলাটা তো নেই।

গায়ত্রী তো মেয়ে নিয়েই ব্যস্ত, এদিকে আমার অফিসে যাওয়া ও হাজারো কাজের ঝামেলায় গায়ত্রীকে যে সর্বক্ষণ লাগে তা বোধহয় তার মনে নেই। আসলে আমি বুঝি যে ও এখন বুবুনকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত। বুবুন এতই মিষ্টি আর দুষ্টু হয়েছে যে, তাকে সারাক্ষণ কোলে নিয়ে ঘুরতে পারলেই ওর স্বস্তি।

আসলে সুরাট জায়গাটা আমাদের কাছে বড্ড দূরের পথ ছিল। সুরাট যেতে সময় লাগে বিয়াল্লিশ ঘন্টার মতো। আর নাগপুর মাত্র কুড়ি-বাইশ ঘন্টা। নাগপুরের ট্রেনও বেশি। ভাড়াও কম। ইচ্ছে করলে কয়েকঘন্টার জার্নিতে পৌঁছোনো যাবে মেয়ের কাছে।

সেদিন রাতে বেশ টেনসন হচ্ছিল আমাদের কেননা শ্রাবণী ছেলে নিয়ে কয়েকদিন সুরাটের ফ্ল্যাটে একা থাকবে। বুবুনের বয়স এই দেড় পেরোল সবে। কিন্তু তা ছাড়াও উৎকণ্ঠার আর একটা কারণ শ্রাবণী দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা। এসময়ে একা থাকা মোটেই সমীচীন নয়। কিন্তু রণদীপের না গিয়ে উপায়ও ছিল না। বছরখানেক ধরেই সে চেষ্টা করছিল কলকাতার কাছাকাছি পোস্টিং নেওয়ার। প্রধানত আমাদের কথা

ভেবেই। এতদিন পরে বদলির আদেশ পেতে সে আর একটুও দেরি না করে জয়েন করতে গেছে নাগপুরে। শ্রাবণীকে বলেছে কলকাতার কাছাকাছি থাকতে হলে এটুকু রিস্ক তো নিতেই হবে। মাত্র কয়েকটা তো দিন।

বদলিটা হঠাৎই হওয়ায় গায়ত্রী যে কয়েকদিনের জন্য সুরাটে গিয়ে ওদের কাছে থেকে সামাল দেবে সে ফুরসতও পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে একই সঙ্গে সুরাট, নাগপুর ও কলকাতায় হাপিসটিপিস চলবে যতক্ষণ না রণদীপ নাগপুরে বাসা ঠিক করে এসে নিয়ে যাবে শ্রাবণী আর বুবুনকে।

রাতটা ভালোয় মন্দয় কেটে গেল শ্রাবণীরা নাগপুরে থাকলে কতটা সুবিধে হবে তা নিয়ে হাজারো জল্পনা-কল্পনায়। গায়ত্রীর চোখে প্রায় ঘুম নেই। তার মধ্যেও খুঁতখুঁত করছিল শ্রাবণীরা ক-দিন একা থাকবে এই ভেবে। আমি বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম মোটে তো ক-টা দিন এই বলে। অতএব খুঁতখুঁত ও সান্ত্বনায় ঠোকাঠুকি হচ্ছিল বারবার।

রাতটা কেটে গেলেও পরদিন সকালে কাগজের হেডলাইন দেখে ঘুরে গেল মাথাটা। গুজরাটের গোধরায় একটা ট্রেনের কয়েকটা কামরা আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছে—যে কামরাগুলিতে কিছু করসেবক ফিরছিল অযোধ্যা থেকে। কারা আগুন লাগিয়েছে তা বোঝা যায়নি তখনই। দুষ্কৃতীরা সবাই পলাতক। কিন্তু করসেবকদের পোড়া দেহ থেকে ধোঁয়া ওড়া বন্ধ হয়নি। ঘটনাটা পড়ে কেমন খটকা লাগল মনে। জায়গাটা গুজরাট বলেই ট্রেনের কামরা থেকে ছিটকে বেরনো ধোঁয়ার সঙ্গে কয়েকটা ফুলকিও আশে-পাশে ছড়িযে পড়তে পারে এমন মনে হল। গায়ত্রীকে কিছু বলিনি কিন্তু সেও কয়েকবারের গুজরাট ফেরত, চমকে উঠে বলে, দেখেছ, কী ঝামেলা হল!

খুব টেনশন হচ্ছিল তবু সারাদিন এড়িয়ে থাকতে চাইছিলাম আলোচনাটা। প্রধানত গায়ত্রীর কথা ভেবেই। গায়ত্রী খুবই টেনশন-কাতর। অল্পেই তার চোখে হলুদ পৃথিবী। কিন্তু সমস্যাটা এড়ানো গেল না কারণ গোধরার আশে-পাশে তখন ফুলকিগুলো ধারণ করেছে আগুনের গোলার। টিভির একশোটা চ্যানেলের কোনও কোনওটা সেই আগুনের গোলাগুলো দেখাচ্ছে বেশ ফলাও করে।

ঘটনাটা আমেদাবাদের, সুরাট থেকে সাড়ে চার ঘন্টার ট্রেনপথ। কিন্তু দুটো শহরের মধ্যে বোধহয় এক অদৃশ্য রোপওয়ে আছে যার অস্তিত্ব বোঝা যায় ওখানে ক-দিন বসবাস করলেই। গায়ত্রী টি ভি চ্যানেলের কেরামতি দেখতে দেখতে শিউরে উঠে বলল, কী হবে বলো তো?

ঠিক দুপুরের দিকে এস টি ডি-চার্জ সবচেয়ে বেশি। শ্রাবণীকে আমরা ফোন করি রাত এগারোটার পরে যেসময় ফোনচার্জ সবচেয়ে কম। কিংবা খুব ভোরের দিকে। এখন বেলা তিনটের সময় ফোন করলে ফোনের বিল হুহু করে বাড়বে জেনেও গায়ত্রী বলল, একবার ফোন করে দেখব সুরাটেও কোনও ঝামেলা হচ্ছে কি না!

একটু ভেবে বলি, এখনই ফোন করে দরকার নেই। হয়তো ভয় পেয়ে যাবে। দরকার হলে ও-ই ফোন করবেখন।

গায়ত্রী অস্থির হয়ে চোখ রাখে টিভির পর্দায়। কয়েকটা চ্যানেলে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

দেখাচ্ছে আগুনের ফুলকিগুলো, তারপর সেই ফুলকি কীভাবে ফুলে উঠছে বেলুনের মতো, কারা ফোলাচ্ছে তাও দেখাতে চাইছে যতটা সম্ভব, কীভাবে আগুন গোলার আকারে পড়ছে এক একটা মহল্লায় তা দেখাচ্ছে যেমন তথ্যচিত্রে দেখায়। গায়ত্রী কিছুক্ষণ পর বলল, বরং ফোন করে ওকে জিজ্ঞাসা করি ওখানে কোনও ঝামেলা হচ্ছে কি না।

গায়ত্রীর চোখ-মুখে তখন ভীষণ অস্থিরতা। মেয়ে-অন্ত প্রাণ ওর। তার উপর পর পর কবার সুরাটে গিয়ে থেকে বুবুনকে নিয়ে কাটানোর ফলে কলকাতায় এসেও সুরাটে পড়ে থাকে ওর মন। এখানে ঘোরেফেরে আর বলে, জানো, এখন নিশ্চয়ই বুবুন ঘুম থেকে উঠেছে। ওর মা এখন মুসম্বির রস খাওয়ানোর জন্য ধস্তাধস্তি করছে।

কিংবা কখনও বলে, এখন নিশ্চয়ই ওর গাড়ির ব্যাগ উপুড় করে খেলায় মত্ত।

রকমারকম গাড়ি কিনে তা নিয়ে খেলা বুবুনের প্যাশন। বাইরে বেড়াতে বেরলেই বায়না ধরবে গাড়ি কিনে দাও। ছোটোবড়ো নানা ধরনের রঙিন গাড়িতে ওর ব্যাগ বোঝাই। সেই বুবুনের কথা ভেবেই গায়ত্রীর আরও অস্থিরতা। কলকাতায় ফেরার পর থেকেই ছক কষে আবার কবে মেয়ের কাছে যাবে। তাদের ভাবনায় এতটাই নিবিষ্ট থাকে যে, কলকাতার সংসারের কথা তেমন করে ভাবেই না এখন। আজও ঘুরছে ফিরছে আর বলছে, এবার ফোন করব?

বাধ্য হয়ে বলি, ঠিক আছে, করো। কিন্তু দেখো, বেশি ভয়টয় না পেয়ে যায়।

গায়ত্রী তৎক্ষণাত রিসিভার হাতে নিয়ে আঙুলে মনোযোগ দিল সুরাটের নম্বর ছুঁতে। একটু পরেই ওপাশ থেকে সাড়া পেতেই গায়ত্রীর উল্লসিত কন্ঠস্বর, তোরা কেমন আছিস, ঝুম্পি?

ও-প্রান্ত থেকে কী শুনল কে জানে, গায়ত্রী আবার বলল, তাই নাকি? ওরা কারা? কজন আছে? কী বললি? টি ভি-তে দেখাচ্ছে সব? তোরা সাবধানে থাকিস। একদম দরজা খুলবিনে। রণদীপের কোনও খবর পেলি? ফোন করেছিল? কিছু বলল। ও বোধহয় এখনও জানে না। বলল বাসা খুঁজছে? কাল সকালে পাকা কথা হবে? বাড়িটা ওর পছন্দ হয়েছে?

ঝড়ের মতো কথাগুলো বলে ফোনটা নামিয়ে রাখে গায়ত্রী। রেখেই বলল, ও মা, তোমাকে ফোনটা দিতে ভুলে গেলাম যে। আসলে এখন তো ফুল চার্জ। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল মিটার উঠছে।

বলি, আরে, ঠিক আছে। একজন কথা বললেই হল। কী বলল ঝুম্পি?

গায়ত্রী তখনও ঘামছে দরদর করে। যতটা না গরমে, তার চেয়েও উত্তেজনায়। হড়বড় করে যা বলল তার মানে দাঁড়ায় তাতে সুরাটের অবস্থা বিশেষ ভালো ঠেকল না। কেমন থমথমে হয়ে গেছে পথঘাট। ওদের বাড়ির সামনে একটা মোড় আছে। সেখানে কয়েকজন লোক জটলা করছে। কী বলছে তা বুঝতে পারছে না ও। তবে দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওদের পাড়ায়।

ঘটনাটা বেশ চমকে দেওয়ার মতো। সুরাট শহরটা এমনিতে বেশ ভালোই। লোকজন খুবই ধর্মপ্রাণ। বহু ভালো ভালো মন্দির আছে। মন্দিরে প্রণাম করতে এসে

একশো টাকা প্রণামী দিতে দেখে অনেকবারই অবাক হয়েছি। কিন্তু অর্থবান শহর সুরাটের উপর দিয়ে গত কয়েকবছর এত ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে যে আমরা প্রতিনিয়ত ঝুম্পিদের কথা ভেবে আশঙ্কায় থাকি।

সুরাটে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রবণতা তো আছেই, কিন্তু কোনও কারণে কিছুকাল বন্ধ আছে অসুখটা। তবে শান্তি নেই শহরটায়। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ তাপ্তী নদীর একটা ড্যাম থেকে এত জল ছেড়েছিল যে, গোটা সুরাট শহর তিনদিন জলের তলায়। রণদীপ জল ছাড়ার খবর পেয়ে সমুদ্রের ধারে তাদের কাজের জায়গায় সাবধান করে দিতে ছুটে গিয়েছিল বাইক নিয়ে, তারপর জলের তোড়ে বাইকসুদ্ধ ভেসে যাওয়ার উপক্রম। কোনও ক্রমে ফিরে এসে তিন দিন ঘরবন্দি। তাদের দেড়তলার ফ্ল্যাটের বারান্দায় আর একটু হলেই জল ঢুকত। একতলার বাসিন্দারা তো দরকারি জিনিষপত্র নিয়ে তাদের ঘরে উঠে এসে ছিল ওই তিন দিন। ঝুম্পি ফোন করে বলেছিল, কী সাংঘাতিক দিন যে গেছে, মা, তোমাদের ফোন করে তো সব জানাইনি। তিনদিন কোনওমতে খাওয়াদাওয়া হল, ভাতে ভাত, ব্যস, চার দিনের দিন জল নেমে যেতে তবে স্বস্তি। আর একদিন জল থাকলেই হয়েছিল। ঘরে তখন চাল ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না।

বন্যার পর গেল ভূমিকম্পের ধাক্কা। কোথায় ভুজ, সেখানে ভূমিকম্পে গোটা শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন, কিন্তু সেখান থেকে আঠারো ঘন্টা ট্রেনপথের দূরত্বে যে-শহর সেই সুরাটেও তিন-তিনটে বহুতল ধূলিসাত। পঁয়তাল্লিশজন মানুষের জীবন্ত সমাধি। শ্রাবণীরা আগে যে বাড়িটাতে থাকত, সেই চারতলা বাড়িতে মস্ত ফাটল। সেই বাড়ির এক পরিবার ভয়ে শ্রাবণীদের ফ্ল্যাটে এসে তিন-চারদিনের জন্য উঠেছিল। এখনকার বাড়িটা দোতলা বলে রক্ষা। তবু প্রতিদিনই প্রায খবর পেতাম গুজরাটে আবার ভূমিকম্প হবে। যে কোনও দিন যে কোনও মুহূর্তে। নানা ভবিষ্যদবক্তা গুজব ছড়াচ্ছিল আবার কোনও শহর সেঁধিয়ে যাবে ভূগর্ভে। ভয়ে কাঁটা হযে থাকতাম কখন কী সংবাদ আসে সেই আশঙ্কায়। ফোন বাজলেই কেঁপে উঠত বুকের ভিতর। সকালের খবরের কাগজ খুলতাম ভয়ে ভয়ে। তার মধ্যেই আবিষ্কার করতাম মৃদু কম্পন হয়েই চলেছে কখনও কচ্ছে, কখনও আমেদাবাদে, কখনও সুরাটেও। তেমন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও যা আতঙ্ক সারাক্ষণ বিজবিজ করত তাতে ভয় হত আমার স্ট্রোক না হয়ে যায়। ওদের বলেওছিলাম, তেমন বুঝলে এখানে চলে আয়, কোথাও না কোথাও একটা চাকরি পেয়ে যাবি।

শ্রাবণী বলত, তোমাদের কি মাথা খারাপ! চাকরির যা বাজার! ওখানে কোনও চান্স নেই।

বাস্তব যে এরকমই তা তো আমার জানাই। তবু ওরা এরকম অনিশ্চিতের মধ্যে পড়ে আছে ভেবে রাতে ঘুম আসত না। গায়ত্রীর অবস্থা তো আরও খারাপ। আমি বেশ বুঝতে পারতাম রাতে জেগে কেবলই কাঁদত বালিশে মুখ লুকিয়ে।

মাঝে কিছুদিন কিছুটা নিশ্চিন্তে ছিলাম ভূমিকম্পের আতঙ্কটা কমে আসায়। তারপর এতদিন পর আবার গোধরা।

সেদিন রাতেই টিভিতে জানাল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা আমেদাবাদ। আগুন ধরানো হয়েছে কয়েকটা বাড়িতে। কয়েকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি গোধরায়। সেখানে অবাধে খুনখারাপি চলছে। কিছুক্ষণ সাংবাদিকের কাঁপা কাঁপা গলায় ভাষ্যপাঠ শুনে বন্ধ করে দিই টি ভি-টা। গায়ত্রীর গলার স্বর আরও কাঁপতে শুরু করল, কী হবে বলো তো!

সেদিন রাতে খুবই অস্থিরতার মধ্যে কাটতে থাকে। বার-বার ঘুম ভেঙে যায়। মধ্যরাতে চোখ মেলে দেখি গায়ত্রীর চোখ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মশারি পেরিয়ে ছাদের দিকে।

পরদিন সকালে কাগজ খুলতেই চোখ স্থির। ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি। কাঁপতে থাকে শরীর। গোধরার আগুন হুহু করে ছড়িয়ে পড়ছে গুজরাটের এখানে ওখানে সে-দৃশ্য বেশ ফলাও করে ছাপিয়েছে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়। কিছুক্ষণ খবরটা পড়ার পর গায়ত্রী আর থাকতে না পেরে ফোনের বোতাম টেপে, কী রে, কী খবর তোদের ওখানকার?

ঝুম্পি বেশ ভয় পেয়ে গেছে তা বুঝে ফেলি গায়ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনেই, কী বললি, কয়েকজন লোক ধারালো ছোরা নিয়ে ছুটে গেল তোদের পাড়া দিয়ে? সব দোকানপাঠ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট? বুবুন কোথায়? মেঝেয় বসে নিজের মনে খেলা করছে? কী করবি এখন? তোদের বাড়িঅলার বাড়িতে সবাই বাড়ি আছে? নেই? সকালে উঠেই বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেশের বাড়িতে গেছে লোকটা! কী সর্বনাশ! অতবড়ো বাড়িটাতে তুই একা?

গায়ত্রী আরও কতক্ষণ কথা চালিয়ে যেত কে জানে, লাইনটা কেটে গেল আপনা থেকেই। নিশ্চয়ই কলকাতার আরও বহু লোক ওদিকে ফোন করছে যার যার আত্মীয়ের খোঁজ নিতে। এদিককার কত লোক গুজরাটে চাকরি করে তা এই ক-বছর শ্রাবণীদের কাছে যাতায়াত করার সুবাদে জেনেছি। গায়ত্রী তখনও রিসিভার হাতে স্থানু। শূণ্য রিসিভারের মতো গায়ত্রীও দাঁড়িয়ে আছে শূণ্য হয়ে। তার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তহীন। তাকে সংবিতে ফিরিয়ে আনতে বলি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, ওখানে প্রশাসন তো আছে, নিশ্চয়ই থেমে যাবে গোলমাল। রণদীপের কথা কিছু বলল?

গায়ত্রী বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিচ্ছে, কথাই বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে, শুধু বলছে, রণদীপ অত দূরে গেছে, আর ঠিক এই সময়েই কিনা এত গোলমাল!

—তুমি অত উতলা হয়ো না। দেখো, ঠিক থেমে যাবে সব। সুরাটের লোকজন এত ধর্মপ্রাণ। গোলমাল বাধতেই দেবে না। রণদীপ কোনও ফোন নম্বর দিয়েছে? তা হলে একটা ফোন করা যেত।

গায়ত্রীর মাথা নাড়া দেখে বুঝতে পারি রণদীপের কোনও ফোন নম্বর পায়নি এখনও। সবে আটটা বাজে, এখনও অফিস শুরু হতে ঢের দেরি। অফিস খুললে হয়তো ফোন করতে পারবে শ্রাবণী। ততক্ষণ বুবুনকে নিয়ে ঘরবন্দি থাকতে হবে ওকে। কিন্তু রণদীপকে ফোনে সব জানিয়েও তো কোনও লাভ হবে না। ফোন করলেই তো ও এখনই এত পথ পেরিয়ে ছুটে আসতে পারবে না সুরাটে। নাগপুর

কি সুরাট থেকে কম পথ! তাছাড়া রেলের টিকিট পাওয়াও যে কম ঝামেলার নয় তা তো জানাই আছে।

গায়ত্রী এত অল্পতেই ভেঙে পড়ে যে বেশ কিছুক্ষণ কোনও কাজেই মন বসাতে পারল না। খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে আমিও থম মেরে থাকি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে কী করা যায় তা ভাবতে থাকি চোখ বুজে। আমাকে অমন চুপচাপ দেখে গায়ত্রী এসে বসে আমার পাশে, তোমার কি মনে হচ্ছে খুব ঝামেলা হতে পারে?

—না না, আমি জোরে জোরে ঘাড় নাড়ার চেষ্টা করি, ও কিছু নয়, একটা ঘটনা ঘটেছে, তার প্রতিক্রিয়ায কিছুটা অস্থির হযে উঠেছে এলাকার মানুষ। তবে প্রশাসন তো আছে, এলাকায আরও মানুষজন তো আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কন্ট্রোল করে ফেলবে দেখো।

গায়ত্রী আমার কথায় কতটা সান্ত্বনা পেল কে জানে, একটু পরেই বলল, আর একবার ফোন করে দেখব রণদীপের ফোন পেল কি না! ও তো জানেই না ঝুম্পিরা এমন ঝামেলায় পড়েছে।

তার একটু পরেই আবার বলল, হযতো জেনেছে, কী বলো? টি ভি-তে দেখাচ্ছে তো সব।

বলি, কী জানি কোথায় আছে, মেসে টি ভি আছে কি না কে জানে!

গায়ত্রী ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার টি ভি-র সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, একবার ফোনের কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করে, আবার আমার কাছে এসে বলে, দ্যাখো না একবার ফোন করে রণদীপের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হল কি না।

গায়ত্রীর অস্থিরতা বুঝতে অসুবিধে হয না আমার। আমি নিজেও কি কম তোলপাড় হচ্ছি ভিতরে ভিতরে! কিন্তু গাযত্রীকে সামলাতে গেলে তো নিজেকে সংযত থাকতেই হবে। তাকে আবারও বলি, ধৈর্য ধরো, গায়ত্রী। এত দূরে থেকে দুশ্চিন্তা করা ছাড়া আর কীই বা করার থাকে বলো। রণদীপের ফোন পেলেই বা কী হবে! ও তো আর এক্ষুণি সুরাটে ছুটে আসতে পারবে না!

টি ভি-তে তখন ইনিয়েবিনিয়ে সেই একই দৃশ্য দেখিয়ে চলেছে যাতে বোঝা যায় ফটোগ্রাফাররা কত ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গার দৃশ্য তোলে। তাদের কেরামতি জনগণ দেখে, দেখে ঘনঘন শিউরে ওঠে, উত্তেজিত হয, চোখে লাল রক্ত জ্বালিয়ে গজরায় আক্রোশে, ক্রোধে। বিস্ফোরিত হয় নিজের ভিতর। কিন্তু সেই দৃশ্য যে এত দূরের মানুষজনকে কী অসহায় করে তোলে তা বোঝে না, হয়তো বুঝতে চায়ও না। যত বেলা বাড়তে থাকে হিংসার আকার আরও ধারণ করে তীব্রতা। ফেনা উঠতে থাকে হিংসার গহ্বর থেকে, ফেনা গড়াতে থাকে হিংসার কষ বেয়ে। দেখতে দেখতে টি ভি-টা হঠাৎ বন্ধ করে দিই। মানুষের এই নিষ্ঠুরতা চোখে দেখা যায় না।

এমন প্রবল নিষ্ঠুরতার মধ্যেই বাড়ি কাঁপিয়ে আবার ফোন এল। গায়ত্রী কাছে ছিল না, বার তিনেক বাজতেই ছুটে গিয়ে হাতে তুলে নিই রিসিভার। সঙ্গে সঙ্গে ও

প্রান্তে মেয়ের গলা, বাবা, কী হবে বলো তো!

শ্রাবণীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা আতঙ্ক উপচোচ্ছিল যে টাল খেয়ে যায় আমার শরীর। কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করি, কেন রে, কী হল?

—বাবা, ওরা একটা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

চমকে উঠে বলি, কোথায়?

—এই তো, আমাদের ফ্ল্যাট থেকে দেখা যাচ্ছে। কী ছুটোছুটি চলছে রাস্তায়। কেউ কেরোসিন নিয়ে ছুটছে, কেউ খড় নিয়ে। কী চেঁচামেচি করছে সবাই।

আমার হাত থেকে রিসিভার খসে পড়ার উপক্রম হয়, কারা ওরা?

—সবাইকে চিনি না। কয়েকজন আমাদের বাড়ির কাছেই যে রিক্সাস্ট্যান্ডটা আছে সেখানে আড্ডা মারে রোজ দেখেছি। কেউ কেউ রিক্সাও চালায়।

ততক্ষণে গায়ত্রী কোথায় ছিল ছুটে এসেছে টেলিফোনের শব্দ শুনে। বুঝতে পারছি আমার হাত থেকে রিসিভারটা নেওয়ার জন্য নিসপিস করছে তার হাত। বোধহয় আমার শেষ কথাগুলো তার কানে গেছে, কিংবা আমার মুখে যে রক্তশূন্যতার প্রলেপ তা তার শঙ্কিত চোখে ধরা পড়তে দেরি হয়নি। বলল, কী হয়েছে, কী বলছে ঝুম্পি?

আমি হাত ইশারা করে এমন ভঙ্গি করি যেন তেমন কিছুই হয়নি, ওদিকে প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করি, রণদীপের ফোন পেয়েছিস?

—পেয়েছি, বাবা, ও বলল বাড়িঅলার সঙ্গে কথা পাকা হয়নি। বড্ড বেশি ভাড়া চাইছে। কাল সকালে আবার যেতে বলেছে। ভাড়া ফাইনাল না হলে আমাদের নিয়ে গিয়ে কোথায় তুলবে।

—কবে রওনা দিতে পারবে তা কিছু বলল?

এদিক থেকে গায়ত্রী বলল, ঝুম্পিকে বলো কাল সকালে নয় আজই যেন কথা ফাইনাল করে। তারপর কাল সকালেই যেন সুরাটে চলে আসে।

ওদিক থেকে শ্রাবণী বলছে, এখনও চার্জ বুঝে পায়নি। আরও চার-পাঁচদিন নাকি লাগবে।

—চার-পাঁচদিন! বলে শিউরে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অ্যাকসিলেরেটর থেকে পা তুলে ড্রাইভার যেমন সাডেন ব্রেক কষে তেমনই সংলাপটা কঁত করে গিলে বললাম, তাড়াতাড়ি চার্জ বুঝে নিতে বল তা হলে। বল ওখানকার পরিস্থিতি তেমন সুবিধের নয়।

—বলেছি তো, বাবা, কিন্তু ও বলছে যে চার্জ দেবে সে ইচ্ছে করেই ঢিলেমিশি করছে। বলছে এত তাড়া কীসের আপনার?

—বাহ্, এটা কোনও কথা হল! তোরা অত দূরে পড়ে আছিস। সঙ্গে একটা বাচ্চা। তারপর তোর আবার—

কথাটা আবার গিলে ফেলে বলি, তোকে কোনও ফোন নম্বর দিয়েছে?

—ওদের অফিসের ফোন খারাপ, বাবা।

—খারাপ! আমি চিৎকার করে বলতে চাই, ফোন খারাপ হওয়ার আর সময় পেল

না! কিন্তু কথাটা আবার ঢোকের সঙ্গে গিলে ফেলি, বললাম, যদি আবার ফোন করে বলিস যত তাড়াতাড়ি পারে যেন চলে আসে, তোর মাকে তো চিনিস, কীরকম উতলা হয়ে থাকে তোদের কথা ভেবে। আর সাবধানে থাকিস, দরজা বন্ধ করে থাকবি। কেউ ডাকলেও দরজা খুলবি নে। তোর মায়ের সঙ্গে কথা বল, বলে গায়ত্রীর বাড়ানো হাতে তুলে দিই রিসিভার। আমি জানি শ্রাবণী এরপর খুব বেশি কথা বলতে পারবে না।

বেশিক্ষণ পারার কথাও নয়, মিটার আজ মাত্রাছাড়া বেড়ে গেছে। পরক্ষণেই মেয়ের কথা শুনে গায়ত্রী বলল, ঠিক আছে, আমি রাখছি। তোর বাবার কাছ থেকে সব শুনে নিচ্ছি। রাখি।

রিসিভার রেখেই গায়ত্রী হামড়ে পড়ে আমার উপর, কী বলল ও? খুব খারাপ অবস্থা ওখানে? রণদীপের আসতে দেরি হবে?

ঠিক যতটা বললে গায়ত্রীর অস্থিরতা সবচেয়ে কম হবে ততটাই বলি মাথা ঠান্ডা রেখে। আমি বেশ বুঝতে পারছি গায়ত্রী বেশি উতলা হলেই বলবে, চলো আমরা সুরাটে যাই। যেন সুরাট যাওয়াটা এসপ্লানেড যাওয়ার মতোই পৌনে এক ঘন্টার পথ।

যতই কণ্ঠ নিস্তেজ রাখার চেষ্টা করি না কেন, গায়ত্রী বারবার খোঁচাতে থাকে, তুমি কিছু একটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছ। বলো না, কী হয়েছে?

বলতে চেষ্টা করি, আরে না না, তেমন কিছুই নয়। টি ভি-তে ছবি দেখে একটু তো ভয় পাবেই। বলেছি সাবধানে থাকতে। একটা ঘটনা ঘটলে তার একটা প্রতিক্রিয়া তো হবেই। কিন্তু ওখানকার প্রশাসন তো আর চুপ করে বসে থাকবে না। নিশ্চয়ই অ্যাকশন নিতে শুরু করেছে। কাল সকালেই কাগজে দেখতে পাবে সব।

পরের দিন সংবাদপত্রে যা খবর ও ছবি বেরল তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হল। গুজরাটের নানা শহরে জারি করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু। জ্বলছে গোটা আমেদাবাদ শহর। ইতিমধ্যেই প্রচুর মৃত্যু ঘটে গেছে এ-শহরে ও-শহরে। প্রশাসন ভাবছে সেনা নামাবে কি না। এমনকী সুরাটেও পরিস্থিতি খুব খারাপ।

গায়ত্রী রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল, ছুটতে ছুটতে এল কাগজে চোখ পড়তেই শিউরে উঠে বলল, ওই দ্যাখো, কী সর্বনাশ ঘটছে! তুমি আমার কাছে কাল চেপে গেছো সব। টি ভি পর্যন্ত খুলতে দিলে না রাতে!

আমি তখন খুঁটিয়ে কাগজ পড়তে ব্যস্ত। গুজরাটের একটা বড়ো অংশে গোলমাল ছড়িয়ে পড়েছে খুব দ্রুত। মৃতের সংখ্যা কত তা কোনও দিনই খুলে বলে না প্রশাসন। আহতের সংখ্যা তো নয়ই। সবই আন্দাজে লেখে কাগজের লোকেরা। তা ছাড়া যত ঘটনা ঘটে তার কতটুকুই বা আর জানতে পারে কাগজের লোকেরা। তাতেই যা লিখেছে তা অতীব ভয়াবহ চিত্র। পলকে চোখের সামনে ভেসে উঠস শ্রাবণীর মুখ। এমনিতেই একটু ভীতু স্বভাবের মেয়ে, তার উপর একা একটা বাচ্চা নিয়ে কীভাবে কাটাচ্ছে ওই বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে তা ভেবে কূল করতে পারি নে। মাথার ভিতরটা তালগোল পাকিয়ে গেল মুহূর্তে। বললাম, ধরো তো ওকে ফোনে। দেখি কী ব্যাপার।

গায়ত্রী এতটাই শক পেয়েছে যে শ্রাবণীদের ফোন নম্বরটাই ভুলে গেল সেই

মুহূর্তে। ছোটো লম্বা ডায়েরিটা হাতড়াতে লাগল পাগলের মতো। আমার তো কোনও দিনই কারও ফোন নম্বর মনে থাকে না। গায়ত্রী খুঁজে পাচ্ছে না বলে আমিই এগিয়ে গিয়ে খুঁজতে থাকি নম্বরটা। পেলামও তক্ষুনি। বোতাম পুশ করতেই ওদিকে শ্রাবণীর গলা, বাবা, আমার কী ভয় করছে। কী গোলমাল চলছে এখানে।

রক্ত চলকে ওঠে ভিতরে, কেন, কী হয়েছে!

আমার গলার কাঁপ চাপা থাকে না ওর কানে। শ্রাবণী আর আমাদের মাঝখানে তিন হাজার কিলোমিটারের ব্যবধান, তবু যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে মনে হচ্ছে শ্রাবণী কথা বলছে পাশের ঘর থেকে।

—এখানে সারা শহরে কার্ফু জারি করেছে। কেউ ঘর থেকে বেরতেই পারবে না। বেরলেই গুলি চালাবে বলেছে।

আমি ঘামতে থাকি, তবু সাহস, জোগাতে চাই শ্রাবণীকে, কী আর করা যাবে, বল! চুপ করে ঘরবন্দি হয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। রণদীপের কোনও খবর পেলি?

—সেইজন্যেই তো আরও ভয় পাচ্ছি। কাল অনেক রাতে ফোন করে বলল আজ সকালেই ঘর ফাইনাল হবে। হলে আজ সন্ধের ট্রেনেই রওনা দেবে। কিন্তু কী হবে এখন! এদিকে কার্ফু!

—নিশ্চয়ই কার্ফু উঠে যাবে এর মধ্যে। প্রশাসন যখন অ্যাকশন নিচ্ছে—

গায়ত্রী ততক্ষণে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে রিসিভারটা নেওয়ার জন্যে। সেটা বুঝেই ওর হাতে তুলে দিই তিন হাজার কিলোমিটার দূরের সংযোগ। গায়ত্রী সঙ্গে সঙ্গে হামড়ে পড়ে, তোরা কীরকম আছিস, ঝুম্পি?

শ্রাবণীর কথা শুনতে শুনতে গায়ত্রী ছটফট করতে থাকে। কী করে তিন হাজার কিলোমিটার দূরের পথ এক নিমেষে উড়ে যাওয়া যায় তা-ই গায়ত্রীর একান্ত অভিপ্রায়। সেটা যে একান্তভাবেই অসম্ভব ব্যাপার তা বুঝে হা-হুতাশ আর শঙ্কায় সিঁটিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমি কাছে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখি, আর দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়ে দিতে থাকি বাতাস। একেবারে অচেনা একটি শহর, যেখানকার ভাষাটাও সে জানে না, হিন্দিতে কাজ চালিয়ে নেয় কোনও ক্রমে, কোনও আত্মীয়স্বজন নেই কাছে, সেই এলাকায় একটি বাঙালি পরিবার পর্যন্ত নেই, এমন প্রবাসে একদম একা, একটা বাচ্চা নিয়ে, তার উপর এমন শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যে বাস করছে আমাদের একমাত্র কন্যা, ভাবতে পারা যায় না।

শ্রাবণীকে সেই ছোটো থেকে কী যে কষ্টে বড়ো করে তুলেছি, কত ঝড়ঝাপটা গেছে তাকে ঠিকঠাক মানুষ করতে, তার অসুখ হলে দুজনে সারারাত কোলে করে পার করেছি কী দীর্ঘ দীর্ঘ রাত তা আমি আর গায়ত্রী আলোচনা করতে থাকি। প্রায়ই করি, আজ আবার। তাছাড়া সেই যে বিখ্যাত প্রবচন—আসলের চেয়ে সুদের মায়া বেশি, শ্রাবণীর চেয়ে তার পুত্র বুবুনের কথা আলোচনা করেই তো আজকাল আমাদের দুজনের কত আলস্যের দিন, কত বিনিদ্র রাত কাটে। তারা দুজনেই ঘোর বিপন্ন, বিভুঁয়ে সংকটের মধ্যে আছে, কোনও উপায়ই নেই এই ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্য

তেকে বেরিয়ে আসার, কিংবা কেউ কাছে নেই যে বাড়িয়ে দেবে সাহায্যের হাত।

এস টি ডি-র মিটার চড়চড় করতে উঠতে থাকায় এক সময় রিসিভার রেখে দিতে হয় ক্র্যাডলের উপর। রেখে দিয়েই যে-অশ্রু এতক্ষণ খুবই কষ্ট করে চেপে রেখেছিল গায়ত্রী তা উদ্গত হল হুহু করে। সোফায় বসে দু হাতে মুখ আড়াল করে বলে উঠল, তুমি এক্ষুণি আমাকে সুরাটে নিয়ে চলো।

এরকম অসহায়, ভয়ংকর মুহূর্তে মাথাটা কাজ করে না আমার। মুখের কথা খসালেই যে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা যায় না তা গত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় গায়ত্রী ভালোই জানে। তাকে এখন কীভাবে নিবৃত্ত করা যাবে, কোন প্রক্রিয়ায় তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে কানে আসে গায়ত্রীর ফোঁপানির শব্দ।

কিছুক্ষণ পরে কান্না থামিয়ে সে অমোঘ প্রশ্নটিই করল, ওখানে তো কার্ফু, রণদীপ কী করে আসবে।

সেই ভাবনাটাও আমি ভাবছিলাম, কিন্তু এতক্ষণ উচ্চারণ করিনি গায়ত্রীর টেনসন বাড়াতে না চাওয়ায়। কিন্তু আমার অনেক আগেই সে ভেবে ফেলেছে কার্ফু-আক্রান্ত একটি গুজরাটি শহরে এক বাঙালি যুবক কীভাবে এসে পৌঁছোবে, পৌঁছোলে তার পরিণাম কী হবে। তাতে পরিস্থিতি আরও কতখানি গুরুতর হতে চলেছে তা একাই আলোচনা করে চলে অবিশ্রাম। আলোচনাটা এমনই যে তাতে গায়ত্রীর উত্তেজনা যেমন বাড়ে, আমার তার চেয়ে বোধহয় বেশি। বাধ্য হয়ে তাকে থামাতে বলি, রণদীপ বুদ্ধিমান ছেলে, নিশ্চয়ই পুলিশের সাহায্য চাইবে, কিংবা অপেক্ষা করবে কোনও নিরাপদ জায়গায়, অথবা—

আমার ভাবনার পরিধি থমকে দাঁড়ায় সহসা কেননা আমার সান্ত্বনাবাক্য গায়ত্রীর আশঙ্কায় জল ঢালতে পারে না। গায়ত্রী মাথা নাড়তে থাকে ঘনঘন, কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখায় তাকে। একটা কার্ফু জারি করা বিভুঁই শহরে মেয়ে পড়ে আছে অসহায়, জামাই রওনা দিচ্ছে সেই কার্ফুর মধ্যে ঢুকতে, তার বউ-বাচ্চার সংকটে পাশে দাঁড়াতে, আমাদের জীবনে এর চেয়ে ভয়াবহ সময় বোধহয় আর আসেনি।

টি ভি-টা এক-একবার খুলে দেখছি কার্ফু উঠল কি না, স্বাভাবিক হচ্ছে কিনা জনজীবন, কী বলছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, কীই বা ঘটে চলেছে আমেদাবাদে, সুরাটে, অন্য অন শহর বা গ্রামগুলিতে। কিন্তু টি ভি বেশিক্ষণ খুলে রাখা যায় না। এভাবে, এমন বীভৎসভাবে একটা রাজ্য জ্বলতে পারে তা আমাদের ধারণার বাইরে। মানুষের কান্না, তাদের সব হারানোর যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠা মুখ, বাচ্চাগুলোর নির্বাক চাউনি দেখে শিউরে উঠি। টি ভি-র নব ঘুরিয়ে দিই। ভাবি আর খুলব না ওই নারকীয় দৃশ্যের ধারাবিবরণীর বাক্স। কিন্তু যে-শহরে পড়ে আছে আমাদের দুজনের হৃৎপিন্ড, সেখানকার প্রতি মুহূর্তের শেষতম সংবাদ না জেনেই বা কী গত্যন্তর।

হঠাৎ ফোনের রিং বেজে উঠতেই গায়ত্রী লাফিয়ে ধরল রিসিভার, শ্রাবণীর ফোন ভেবেই, কিন্তু পরক্ষণে নিস্তেজ গলায় বলল, না রে, ওখানকার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কার্ফু জারি করেছে সারা শহরে।

তারপর আরও বহুক্ষণ কথোপকথন ও শিউরানোর ঘটনা ঘটে দু-পক্ষেই। নীরব

দর্শক হয়ে বসে থাকা ছাড়া আমি আর কীই বা করতে পারি। তারপর শুরু হয় ফোনে শ্রাবণীদের খবর নেওয়ার পালা। যেখানে যত আত্মীয় আছে আমাদের, যত বন্ধু, যারাই জানে আমাদের মেয়ের বিয়ে হয়েছে সুদূর গুজরাটে, সবাই একে একে খবর নিতে শুরু করল ওরা কেমন আছে, কী আসলে ঘটছে সুরাটে, কার্ফু জারি হয়েছে শুনে সবারই জিজ্ঞাসা 'তা হলে কী হবে', রণদীপ বাইরে আছে শুনে প্রত্যেকেরই তীব্র প্রতিক্রিয়া, সে কী! ওরা একা আছে কী করে! কী করবে ওরা এখন! কী হবে!

কী যে হবে তা তো আমরাও জানি নে। আবারও এক নিদ্রাহীন রাত। পরদিন সকালেও 'রণদীপ কোথায় আছে, পৌঁছোতে পারবে কি না' এই ভেবে তোলপাড় হচ্ছি দুজনে, হঠাৎ সকালের কাগজে দেখি বন্‌ধ ডেকে দিয়েছে গোটা গুজরাটে। কাল রাতে টি ভি-তে কখন যে বনধের ঘোষণা হয়েছে সে খবর পাইনি। ইতিমধ্যে শ্রাবণীর ফোন, তারের ওপাশে তার ভয়ার্ত গলা, 'মা, কী সর্বনাশ হয়েছে জানো, মিলিটারি নেমেছে পথে। ফ্ল্যাগ মার্চ করছে,' শুনে এদিকে ভয়ে কাঁপতে লাগল গায়ত্রী, শুধু বলতে চাইছে, 'তুই দরজা এঁটে বসে থাক, ঝুম্পি, ভগবানকে ডাক, ভগবানই তোদের রক্ষে করবেন'। আমি ওদের কথোপকথন শুনে আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি নে, গায়ত্রীর হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিয়ে বলি, 'ভয় পাস নে তুই। মিলিটারি নামলে অন্তত খুনজখম বন্ধ হবে।' কিন্তু শ্রাবণীর আতঙ্ক তাতে একছিটে কমে না, কমবে না তা আমিও বুঝতে পারি। কলেজে পড়ার শেষ দিনগুলিতে কলকাতায় আমরা যে পাড়ায় থাকতাম, প্রায়ই নকশাল ধরতে পাড়ায় হানা দিত ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিটারি। তাদের বুটের শব্দে উড়ে যেত প্রাণ, সামনে যাকে চোখে পড়ত—কিশোর থেকে যুবক, ধরে টেনে তুলত জাল-ঘেরা কালো গাড়িতে। আমরা কে কোথায় ইঁদুরের গর্তে লুকোব ভেবে দিশে করতে পারতাম না। সে এক ভয়ংকর দিন ছিল।

তাও তো সেসময় চারপাশে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শির ভিড় ছিল। তবুও সেই বুটের দাপাদাপি, রাইফেল হাতে ছুটে যাওয়ার বীভৎস শব্দ আজও ভুলতে পারিনি। আর এখন ওই বিভুঁয়ে আমাদের ভীতু মেয়েটা এক একটা দুধের শিশু নিয়ে কি না—

কিছু ভাবতেই পারি না আর। গায়ত্রী মাথা ঘুরে পড়ে যাবে কি না এই ভেবে সন্ত্রস্ত হই। তার গা টলছে হাঁটার সময়, চোখে উদভ্রান্তি, কেমন অস্থিরতা তার আচরণে। এই সংকটকালে কী করতে পারি, কীভাবেই বা অতিক্রম করব এই ক্রান্তিকাল ভেবে আমারও শরীরে ঘুলিয়ে ওঠে ঝড়।

কিন্তু কিছু করার থাকে না। রণদীপ কখন পৌঁছোবে, আদৌ পৌঁছোতে পারবে কি না, কী করবে কার্ফুর মধ্যে সুরাটে পৌঁছে ভেবে অস্থির-অস্থির লাগে। তবু সে পৌঁছোলেই শ্রাবণীর সুরক্ষা হবে, অন্তত একজন কাছের লোক পাবে মেয়েটা সেটাই ভাবতে চাইছি। এতসব অস্থির ভাবনা ভেবেই পার হতে থাকি প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট, বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত। কিন্তু মিনিটগুলো, এমনকী সেকেন্ডগুলোও যে এত দীর্ঘ, এত যন্ত্রণাবহুল হয়, বেঁচে থাকাটাও হঠাৎ এত কষ্টকর হয় তা এরকমভাবে যেন আগে বুঝিনি। টিভিটা খুলতে গেলেই ভয় আর আতঙ্কে ঘিরে ধরছে বারবার।

সময়ের হিসেব কষে দুজনে জেরবার হওয়ার মুহূর্তে বেলা দুপুরের দিকে আবার শ্রাবণীর ফোন, মা, ও ট্রেনে আটকে পড়েছে গুজরাট সীমান্তে। নন্দুরবাড় বলে একটা স্টেশন আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। বনধ বলে ঢুকতে পারছে না।

এদিকে গায়ত্রীর ফ্যাঁসফেসে গলা, তুই কী করে জানলি?

—ও ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বুথ থেকে ফোন করেছিল।

—তা হলে কী হবে? আজ তো আর ট্রেন ছাড়বে না? অন্তত কাল সকালের আগে—

—তাও ছাড়বে না। কাল আবার মহারাষ্ট্র বনধ। গাড়ি ওখানেই এখন দুদিন—

গায়ত্রীর হাত কাঁপতে থাকে, তা হলে কী হবে? দুদিন পড়ে থাকবে পথে! এই অবস্থায়!

—না। ও বলছে ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছে অনেকে। বলছে কোনও বাসটাস ধরে আজ সন্ধের মধ্যে সাঁপুতারা পৌঁছোবে। তারপর কাল সকালে ঢুকে পড়বে গুজরাটে।

কথোপকথন দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বলে ফোন রেখে দিতে হয় একসময়। অথচ শ্রাবণীর সঙ্গে কথা বলাই এখন তাকে সাহস জোগানোর একমাত্র পন্থা। কিন্তু কথা বলারও তো একটা সীমা আছে। শুধু সে এস টি ডি চার্জের কথা ভেবেই ফোন রেখে দিতে হচ্ছে তা নয়, লাইন হঠাৎ-হঠাৎ কেটে যাচ্ছে সম্ভবত গুজরাটের লাইনের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে বলেই।

রণদীপ গুজরাট সীমান্তে পৌঁছে গেছে শুনে গায়ত্রীর সামান্য স্বস্তি। তবু বার-বার জিজ্ঞাসা করছে নন্দুরবাড় জায়গাটা ঠিক কোথায়। গুজরাটে ঢোকার কিছুটা আগের একটা স্টেশন শুনে পরবর্তী প্রশ্ন, নন্দুরবাড় থেকে সাঁপুতারা কত দূরে। সাঁপুতারায় কোনও গোলমাল হচ্ছে কি না। সাঁপুতারা থেকে সুরাট ঠিক কত মাইল।

গায়ত্রী প্রায় শিশুর মতো জিজ্ঞাসা নিয়ে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। কিন্তু ও ভাবতে পারছে না সুরাটে ঢোকা এখন কতটা ঝুঁকির। এখন এই সাংঘাতিক অবস্থায়। যেখানে গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিচ্ছে, গলা কেটে ফেলছে নিরীহ বাচ্চা আর মেয়েমানুষদেরও সেই পটভূমিতে পা রাখা কী যে বিপজ্জনক! রণদীপ এমন ঝুঁকির মধ্যে এগোচ্ছে তার বউবাচ্চার কাছে, আর আমরা দুজনে এতদূরে বসে হাপিসটিপিস করছি মুহূর্তগুলো হাতের তেলোয় নিয়ে গুনতে গুনতে। শ্রাবণীর কথা তো ভাবতেই পারছি না। তবে পরিস্থিতি মানুষকে বোধহয় শক্ত করে। বরং এখন ও-ই সান্ত্বনা দিচ্ছে আমাদের, তোমরা অত চিন্তা কোরো না, মা, ও ঠিক সুযোগ বুঝে চলে আসবে, ও জানে কোন দিক দিয়ে ঢুকলে সবচেয়ে কম ঝুঁকিতে আসা যাবে।

শ্রাবণীর কণ্ঠস্বর সত্যিই অবাক করে দিচ্ছে আমাদের। জানতাম মানুষ বিপদে পড়লে লড়াই করতে শেখে। ওর সামনে জীবনের সবচেয়ে কঠিন লড়াই। বাইরে মিলিটারির বুটের শব্দ, বনধের টানটান উত্তেজনার মধ্যে কার্ফু, বাইরে রাস্তায় স্বামী, সেখানে একা লড়াই করতে গিয়েই বোধহয় তার এই সাহস অর্জন।

কিন্তু তাদের কথা ভেবে আমি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় মন বসাতে পারছি নে। কাগজ খুললেই দেখছি কিছু উন্মত্ত লোক যা খুশি করে চলেছে গোটা রাজ্য দাপিয়ে।

টি ভি আর কাগজ জুড়ে তার ভয়ংকর ছবি ও কাহিনি। কিছু অবিবেকি মানুষের জন্য হাজার হাজার মানুষের কী সাংঘাতিক টানাপোড়েন। ক'টা দিন ক-টা রাত কী করে যে পার করছি গুজরাটের আগুনের হলকায় পুড়তে পুড়তে তা ঈশ্বর জানেন।

রাত পার হয়ে ভোর হতে আবার টানাপোড়েন শুরু হয়। রণদীপকে এখন কার্ফুর মধ্যে ফিরতে হবে সুরাটে। শ্রাবণীকে ফোন করে জানতে পারি এর মধ্যে সকালে দুঘন্টার জন্যে কার্ফু তুলে দিয়েছিল গভর্নমেন্ট, তার মধ্যেই, 'জানো, মা, ঘরে কিচ্ছু ছিল না, আমি বুবুনকে কোলে নিয়ে নীচে গেলাম, ঠেলায় করে একটা আনাজঅলা আনাজ নিয়ে এসেছিল তার কাছ থেকে অনেক কিছু কিনে নিয়ে এসেছি। তিনচারদিন চলে যাবে।' গায়ত্রী শুনতে শুনতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। অগ্নিগর্ভ একটা রাজ্যের পথে নেমে বাজার করাটা যেন বিরাট সাহসিকতার কাজ। কী আর করবে শ্রাবণী! ঘরবন্দি হয়ে থাকলে খাবারে যে টান পড়বে তা তো অবধারিত।

আমি আরও সাহস জোগাতে বলি, দু-একদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। প্রশাসন যখন অ্যাকশন নিচ্ছে—

শহরে আবার কার্ফু জারি হয়, নিমেষে শুনশান হয়ে যায় রাজপথ, বন্ধ হয়ে যায় বাড়িঘরের সমস্ত দরজা-জানালা, একটা বাচ্চার কান্নাও শোনা যায় না, থমথম করতে থাকে গোটা শহর, তার মধ্যেই মিলিটারি বুটের একটানা খটখট খট খট খট খট শব্দ। শ্রাবণীর কাছ থেকে শহরের বর্ণনা শুনতে শুনতে ব্যস্ত সুরাটের একটা নিদারুণ চিত্র ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তার মধ্যেই কখনও শুনতে পাই কার্ফু উপেক্ষা করে দুর্বৃত্তেরা আগুন দিয়ে চলেছে বিশেষ বিশেষ বাড়িতে। শহরে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী, তাকে এলেক দিয়ে কে বা কারা রক্ত ছড়াচ্ছে মহল্লায় মহল্লায়।

রণদীপ এই বীভৎস উল্লাসের মধ্য দিয়ে তার বউ-বাচ্চার কাছে কীভাবে ফিরবে ভেবে নীল হতে থাকি ক্রমশ। ওদিকে শ্রাবণী, এদিকে আমরা দুজন, ভারতবর্ষের দু প্রান্তে বসে একই আতঙ্ক ভাগাভাগি করে মুড়ে নিই শরীরের চারপাশে। যাকে নিয়ে আমাদের চেতনা কেন্দ্রীভূত সেই রণদীপ কী করছে কে জানে! কিছুক্ষণ পর পর ফোন করে জিজ্ঞাসা করি, 'কী রে, ঝুম্পি, কিছু খবর এল?' কোনও খবর পায়নি জেনে আরও দম বন্ধ হয়। আবার কখনও ফোনের লাইন পাই না। বার পাঁচেক বোতাম পুশ করেও যখন শ্রাবণীর সাড়া না পাওয়া যায় গায়ত্রী মুখচোখ ছলছল করে বলে, 'দ্যাখো তো, তুমি পাও কি না।' একটানা কঁক—কঁক—শব্দ শুনে ছটফট করি। বলি, নাহ্। আসলে আরও তো বহু মানুষ চাইছে তাদের প্রিয়জনের খবর পেতে।

তখন গুনতে থাকি আমাদের চেনাজানা আর কাদের প্রিয়জনেরা বাস করে গুজরাটে। হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় আরও বহু বাঙালিঘরের ছেলে কেউ একা কেউ বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে কেউ বরোদায়, কেউ আমেদাবাদে, কেউ জুনাগড়ে। তা ছাড়া যে কয়েক হাজার সোনার বা হিরের বাঙালি কারিগর গোটা গুজরাট জুড়ে বছরের পর বছর থাকে, বছরে হয়তো কদিনের জন্যে ফেরে দেশে, তাদের যেন ধর্তব্যের মধ্যেই আনতাম না এতকাল। তাদেরও তো মা বাবা ভাই বোন বাস করে এখানে। তারাও তো এই মারণযজ্ঞের খবর কাগজে পড়ছে, পড়ে আমাদেরই মতো সিঁটিয়ে

বসে অসহায়ের মতো ফোনের বোতাম ছুঁচ্ছে। তবু গায়ত্রী বলল, অন্যেরা তো ঝুম্পির মতো একা নেই। আমাদেরটাই সবার চেয়ে অন্যরকম, তাই না?

বহুক্ষণ ফোনের লাইন না পেয়ে আমরা আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। সুরাটের লাইন কি কেটে গেল। এ ক-দিন ফোন থাকার ফলেই শ্রাবণীর সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ। সেই সামান্য সূত্রটুকুও যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলে তো ঘোর বিপদ। গায়ত্রী পাগলের মতো বোতাম টিপতেই থাকে। আমি ওকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি। বলি, কিছু সময় পরে করো। নিশ্চয়ই পাবে। এখন আরও সবাই চাইছে লাইন।

কিন্তু তাকে এসময় নিবৃত্ত করা কি যায়! উদভ্রান্তের মতো বলে, ঠিক এই সময়েই তো ফোনটা জরুরি ছিল। আর এখনই কি না—

এখন যেন আমাদের একটাই চিন্তা রণদীপকে নিয়ে। শ্রাবণী যে কার্ফুতে আক্রান্ত শহরে বিপন্ন হয়ে আছে, তার চেয়েও রাস্তায় থাকা রণদীপের কথাই বেশি করে ভাবছি আমরা। সে এখন সুরাটের দিকে কীভাবে এগোচ্ছে, তার বউ-বাচ্চার কাছে পৌঁছোনোর জন্য কীভাবে। বিপন্ন করছে নিজেকে তা ভাবতে থাকি নিশ্বাস বন্ধ করে।

বোধহয় অনেকটা রাতে আবার ফোন বেজে ওঠে করকরিয়ে। মাঝে মাঝেই বাজছে। বেশিরভাগই আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের। এবার কিন্তু থেমে থেমে বাজছে। গায়ত্রী লাফ দিয়ে ওঠে রিসিভার তুলতে। পরক্ষণেই 'কী খবর রে তোদের? রণদীপ একটু আগেই ফিরল?' শুনে আমার দরদর করতে থাকা ঘামতে থাকা শরীর শুকোতে থাকে সহসা। কেমন হালকা লাগে শরীরটা। কেউ যেন পালক বুলোতে থাকে আপাদমস্তক। গায়ত্রী ততক্ষণে কলকল করে কথা বলে চলেছে শ্রাবণীর সঙ্গে, 'কী করে ফিরল?' কোথায় দেখা হল পুলিশের সঙ্গে?' ইত্যাদি নানা প্রশ্নে মুড়ে দিতে চায় মেয়েকে। যেন তিনদিন ধরে রণদীপের সুরাট ফেরার কাহিনি সে এখনই শুনে ফেলতে চায়।

রণদীপ ফিরল মানেই তো বিপদ কেটে গেল তা নয়। শহরে কার্ফু চলছে। মিলিটারি টহল দিলে পরিস্থিতি একরকম, না দিলে বেড়ে যায় দুদ্দাড় ছুটোছুটি, ফিসফাস। কোথায় কে চিৎকার করছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও,' কোথাও সব হারানোর হাহাকার। কোথাও নারীকণ্ঠের নিদারুণ কান্না।

তার মধ্যেই ফোনে খবর পাই, মা, গোছগাছ করছি। কার্ফু উঠলেই বেরিয়ে পড়ব। কপালে যা থাকে তাই হবে। কিন্তু এ শহরে আর থাকা যাচ্ছে না।

তিন হাজার কিলোমিটার দূরে বসে আমাদের বুক কাঁপতে থাকে। টিভি-তে চোখ রেখে একের পর এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে থাকি, আর ভাবতে থাকি এই রক্তপাত কবে বন্ধ হবে, আদৌ হবে কি না। সেদিন এক অগ্রজ আমাকে বলছিলেন, ' যে দেশের ইতিহাস কখনও ঠিকমতো লেখা হয়নি, সে দেশে এই রক্তক্ষয় হবেই।' কথাটা তোলপাড় করেছিল আমাকে। শুধু কি ইতিহাস লেখার উপরই নির্ভর করে দাঙ্গা! তা হলে মানবিকতার কোনও অস্তিত্ব নেই! তাহলে মানুষ যে সভ্যতার দীর্ঘপথ পেরিয়ে এলো কোন ইতিহাসের নিরিখে।

টি ভিতে চোখ রাখি। খবরের কাগজ গিলতে থাকি গোগ্রাসে। তন্নতন্ন চোখ রাখি কখন কার্ফু শিথিল হবে একটু। এই ক-বছরে কম জিনিসপত্র তো আর জমেনি ওদের।

সেইসব সংসার এক কি দুদিনে গোছগাছ করে কোনও ট্রাকে তোলা সেও তো আর এক কঠিন কাজ।

খুনজখম চলতেই থাকে, কাগজে পড়তে থাকি ধারাবাহিক মারণযজ্ঞের ইতিহাস, তার মধ্যেই একদিন কার্ফু শিথিল হতেই ওরা বেরিয়ে পড়ল নতুন কর্মস্থলের দিকে, সে এক বুদ্ধশ্বাস ফেরা। ফোনও পেলাম পরেব দিন, 'মা, আমবা ঠিকঠাক পৌঁছে গেছি নাগপুরে,' শুনে আমাদের চোখে সবুজ আলো জ্বলে, যেন ওরা ঠিক থাকলেই হল, ওরাই আমাদের পৃথিবী।

পবক্ষণেই ফিরে এলাম সংবিতে। ওখানে আরও বহু মানুষ তো বযে গেল, তাদেব কী হবে! তাদের কথাও তো ভাবতে হ.ব এবার। □

লজ্জা

জাহান আরা সিদ্দিকী

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিক থেকে বিভিন্ন শহরে গোলমালের খবর আসছে। দিল্লিতে তুমুল উত্তেজনা। প্রচন্ড সতর্কতা। যে-কোনও মুহূর্তে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।

ঠিক এমনই সময় ফারুক বোম্বেতে ট্যুরে চলে গেল। বাড়িতে ফারজানা একলা। সঙ্গে চার বছরের কন্যা ফারিন। আর বাড়িতে মাঝবয়সি কাজের মাসি, রহিমের মা। ফারুক অফিসে যাবার পথে ফারিনকে স্কুলে নামিয়ে দেয়। স্কুলটা কাছেই, সে না থাকায় রহিমের মা সে দায়িত্ব নিল। তবুও ফারুক বাড়িতে না থাকাতে ফারজানা একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকল।

দুদিন পরের সকালবেলা। ফারজানা নাস্তার টেবিলে দৈনিক পত্রিকা উল্টোচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে ফারিন সুন্দর হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। ধবধবে ফর্সা রং, মাথা ভরতি কালো চুল, মিষ্টি চেহারা। বলল, আজকে বিকেলে প্রীতির জন্মদিনে যাবে তো?

কথাটা ফারজানা ভুলেই গিয়েছিল। ফারিনের ক্লাশমেট প্রীতির বাবা মিস্টার দাশগুপ্ত কদিন আগে তাদের ফোন করে প্রীতির জন্মদিনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফারিনের হাত দিয়ে কার্ডটাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই পরিবারটির সঙ্গে তাঁদের কন্যাদের মাধ্যমে এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ফারিন প্রায়ই স্কুল থেকে ফিরে প্রীতির কথা বলত। তাদের স্কুলে প্রীতিই তার সবচাইতে প্রিয় বান্ধবী। শুনতে শুনতে একদিন ফারজানা ফারিনকে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রীতির পুরো নামটা কি?

—দাঁড়াও বই খুলে দেখি।

প্রীতির একটা বই তার কাছে ছিল। ওটা সে ফারজানাকে এনে দেখিয়েছিল।

ফারজানা আর ফারুক দৃষ্টি বিনিময় করেছিল। ফারুক বলেছিল, পদবী দাশগুপ্ত, তবে তো বাঙালি।

মিস্টার দাশগুপ্তের সঙ্গে কদিন পরই ফারুকের পরিচয় হয়ে গেল। স্কুল ছুটির পর যে যার কন্যাকে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। ছুটির ঘন্টা বাজতে, ভেতর থেকে প্রীতি আর ফারিন দুজনে হাত ধরাধরি করে গল্প করতে করতে বের হলো। যে যার বাবাকে দেখে খুশিতে ছুটে এসে হাত ধরল। কন্যাদের হাত ধরে ভদ্রলোক দুজন দুজনের দিকে তাকালেন।

ফারিন হাত বাড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, -বাবা ও প্রীতি।

ফারুক জিজ্ঞেস করল, আপনি কি তবে দাশগুপ্তবাবু?

ভদ্রলোক হেসে দুপা এগিয়ে এসে বললেন, —আর আপনিই নিশ্চয় ফারুক সাহেব?

সেই শুরু। দুপক্ষ দুপক্ষের বাড়িতে বেড়াতে গেল। মিসেস দাশগুপ্ত ফর্সা, কোঁকড়া চুলের সুন্দরী মহিলা। এককালে নাচ করতেন। এখন দিল্লীতে এসে আর নাচের চর্চাটা হচ্ছে না বলে দুঃখ করলেন। তবে ওদের চারজনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুই হলো ফারিন আর প্রীতি। দুপক্ষ মিলে গবেষণা করে উদ্ধার করতে চাইল ওদের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে যেখানে প্রায় সবাই হিন্দি ভাষার ছাত্রছাত্রী, সেখানে কীভাবে এই দুই বাঙালি নিজেদের খুঁজে বের করে। এটা নিয়ে ওরা বেশ হাসাহাসিও করল। সেই থেকে ওদের মধ্যে যাতায়াতও শুরু হয়। ঈদের সময় প্রীতির মা ফারজানাকে বললেন, আমি কিন্তু সেমাই খেতে পছন্দ করি ওটা থাকবে তো? ফারজানা তাঁর জন্য স্বহস্তে দুরকমের সেমাই রান্না করে।

আর পুজোর সময় ওদের বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট হাতে এলেন দাশগুপ্ত পরিবার। ফারজানাদের নিয়ে বিভিন্ন মন্ডপ ঘুরে দেখালেন। ছোটরা, ফারিন আব প্রীতি, গলাগলি করে মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রতিমা দেখে বেড়াতে থাকে।

সেই প্রীতির জন্মদিনে না গেলে ভাল দেখায় না।

কিন্তু ট্যাক্সি করে একলা ফারিনকে নিয়ে যেতে সাহস পেল না ফাবজানা। শহরের অবস্থা যেরকম থমথমে তাতে একলা সন্ধ্যাবেলা বেরানোব রিস্ক না নেওযাই ভালো। কখন কী ঘটে যায় কে জানে। ফারুক থাকলে সমস্যা ছিল না। সেই ড্রাইভ করে নিয়ে যেত আর সবচেযে বড় কথা দাশগুপ্তবাবুদের বাড়িটা বেশ দূবে। যেতে কম করে হলেও আধঘন্টা মতো সময লাগবে। ফারজানা একলা না যাবাব সিদ্ধান্ত নিল। তবুও মনের ভেতরটা খচখচ করতে থাকল। ফারিন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিযে নিশ্চয খুব আনন্দ করত। মেয়েকে আদর করে কোলে তুলে ফারজানা বলল, মা, তোমার বাবা তো এখানে নেই। আমরা একলা কীভাবে যাব?

ফারিন নির্লিপ্তভাবে বলল, চলো ট্যাক্সি করে যাই।

—এখন চারিদিকে গন্ডগোল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে—

এটুকু বলেই সে সহসা থেমে গেল।

ফারিন অবাক দৃষ্টিতে ফারজানার মুখের দিকে তাকিযে জিজ্ঞেস করল, হিন্দু কী মা? মুসলমান কী?

ফারজানা এটুকু বলেই বিব্রত হযে চুপ করে গিযেছিল। এতটুকু মেযের সামনে এসব কথাবার্তা বলা ঠিক না। ওর নিষ্কলুষ মনে বিষাক্ত প্রভাব পড়তে পারে। এমনিতেই চারিদিকে যে বাজে পরিবেশ। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিযে কথাবার্তা হচ্ছে আর ফারিন সেসব শুনছে, ফারজানা এসব প্রসঙ্গ ওর কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে। অত সতর্কভাবে কথা বলা যাচ্ছে না।

নিজেকে সামলে নিয়ে ফারজানা বলল, সে তুমি এখন বুঝবে না। বড়ো হও তখন বুঝতে পারবে। ফারিনেরও এনিয়ে জানার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। সেকথা না বাড়িয়ে মুখটা ভার করে হতাশকণ্ঠে বলল, তাহলে যাওয়া হবে না।

—না মা, পরে তোমাকে একদিন নিয়ে যাব।

—কিন্তু আজকে আমি না গেলে ওর জন্মদিন যে হবে না। ফারজানা ওর গালদুটো

টিপে আদর করতে করতে বলল,

—কে বলেছে হবে না? ও জন্মদিন ঠিকই করবে।

ফারিন মাথা নাড়িয়ে গম্ভীর মুখে জানাল।

—না মা প্রীতি বলেছে আমি না গেলে ও জন্মদিন করবে না।

মনে মনে হাসি পেল ফারজানার। কি অবুঝ শিশু। পৃথিবীটা কত জটিল এখনও জানে না। নির্বোধের মতো আশা করে আছে তাকে ছাড়া প্রীতির জন্মোৎসব হবে না।

ফারজানা নিজেই ফোন করে জানিয়ে দেবে ভাবছে এমন সময় ফোন করলেন দাশগুপ্তবাবুই, আপনারা আসছেন তো?

বিব্রতা কণ্ঠে ফারজানা বলল, ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু ও বোম্বেতে। বুঝতেই পারছেন, শহরে টেনশন, এ অবস্থায় আমি একলা—

দাশগুপ্তবাবু ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলেন। বললেন,

—বুঝতে পেরেছি, আপনার একলা আসাটা ঠিক না, আমি এসে নিয়ে যেতে পারতাম—

ফারজানা লজ্জিত হয়ে বাধা দিয়ে বলল,

—না না, অতদূর থেকে আপনি এসে নিয়ে যাবেন কেন? আপনার ড্রাইভার নেই।

—সেটা কোনো সমস্যা নয়। আসলে সমস্যা হচ্ছে আজই আমাদের কোম্পানির জরুরি মিটিং, প্রায় ছ-টা পর্যন্ত চলবে। নইলে—

—শুনুন, ও বোম্বে থেকে ফিরলেই আমরা আপনার বাসায় যাব। এখন বরং একগাদা লোকজনের ভিড়ে কথাবার্তা হবে না।

—হ্যাঁ, সেটাও মন্দ হবে না। সন্ধ্যেবেলা আপনারা চলে এলেন, ওরা খেলাধূলা করল। রাতে একবারে ডিনার সেরে আপনারা চলে গেলেন।

—ঠিক আছে সেটাই ভালো হবে।

ফারজানা ফারিনকে ডেকে বুঝিয়ে বলল। ফারিন চুপ করে শুনল, ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল না প্রস্তাবটা তার মনে ধরেছে কি না।

দুপুরবেলা রান্নাঘরের পাশ দিয়ে আসছে ফারজানা। হঠাৎ দুজনের কথাবার্তা কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। রান্না ঘরের মেঝেতে পিঁড়িতে বসে রহিমের মা গল্প করছে ঠিকে-ঝি মনীষার সঙ্গে। একজনের পরনে শাড়ি, অন্যজনের নীল শালোয়ার কামিজ। মনীষা বাংলা বলতে পারে না। তবে রহিমের মায়ের সঙ্গে বিগত দুবছর ধরে একসঙ্গে কাজ করতে করতে ওর কথাবার্তা বুঝতে শিখেছে। মনীষা রহিমের মাকে সতর্ক করে দিয়ে হিন্দিতে বলেছে, দিদি, তুমি মুসলমান, সাবধানে থেক। সহজে বাইরে বেরিয়ো না। দাঙ্গা হচ্ছে

রহিমের মা বলছে,

—তুমিও একটু দেখে শুনে পথ চলো, দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গেলে মুসলমানরা তোমাকেও মেরে ফেলতে পারে।

ফারজানা আর দাঁড়াল না। সরে এল। আশ্চর্য! এরা দুজন প্রায়ই কাজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি করে। অথচ আজ দুজনে দুজনের বিপদের আশঙ্কায় কত ব্যাকুল।

বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফারজানা বাইরের প্রকৃতির শোভা দেখছিল। এমন সময় দাশগুপ্তবাবুর ফোন এল, আপনি কি একটু কষ্ট করে আমার বাড়ি আসতে পারবেন? আমি গাড়ি নিয়ে আসছি যদি তৈরি হয়ে নিতেন।

ফারজানা বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, এখন! আপনার জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, এসময় আপনি কি করে বের হবেন? তাছাড়া সবেমাত্র অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।

—প্লিজ আপনি আসুন। আপনারা না এলে অনুষ্ঠানটা হবে না।

—সে কী বলছেন?

—শুনুন, অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি সে এক মহাকান্ড, একগাদা অতিথি এসে গেছে, অথচ প্রীতি জেদ ধরে বসে আছে ফারিন না এলে সে কেক কাটবে না। সে ফারিনকে কথা দিয়েছে—

ফারজানা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—

—সে কী! ওকে ফোন দিন, ফারিন বুঝিয়ে বলবে। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে দাশগুপ্তবাবু অসহায়ভাবে বললেন, ও তো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। ফারিন যতক্ষণ না আসবে ও ততক্ষণ দরজা খুলবে না।

—ঠিক আছে আপনি আসুন আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ফোন ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ফারজানাকে দেখে ফারিন। ও নিশ্চয় পেছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ওদের কথোপকথন শুনছিল। ফারজানা বলল,

—চল, প্রীতিদের ওখানে যেতে হবে, ও তোমাকে ছাড়া কেক কাটবে না।

ফারিন তেমনি নিষ্পাপ হাসি দিয়ে বলল,

—তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, আমি না গেলে ওর জন্মদিন হবে না।

মেয়েকে জামা পরাতে পরাতে ফারজানা চিন্তা করতে শুরু করল। ঘরে এমন কিছু নেই যা প্রীতিকে জন্মদিনে উপহার দেওয়া যেতে পারে। আগে জানলে সে একটা কিছু কিনে রাখত। খালি হাতে মেয়েটার জন্মদিনে যাওয়া এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হবে। শাড়ি পরতে পরতে ফারজানা এসব ভাবছে, এমন সময় ওকে অবাক করে দিয়ে ফারিন একটা বারবি ডল হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—ও কি? ওটা তুমি কোথায় পেলে?

—বাবা সেদিন যে ডলটা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন, ওটা এখন প্রীতিকে দিয়ে দেব, পরে তো বাবা আমাকে কিনে দিতে পারবে।

আধঘন্টার মধ্যে ঝড়ের বেগে দাশগুপ্তবাবু এলেন। লম্বা কালো চেহারাটার ওপর ক্লান্তির ছাপ। চুলগুলো অবিন্যস্ত। তবু মুখে মৃদু হাসিটা লেগে আছে। ফারজানা তৈরি ছিল। ফারিনের হাত ধরে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকল। দাশগুপ্তবাবু ফারিনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তারপর গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। ফারজানা বাইরের দিকে তাকাল। সূর্যটা এখনও অস্ত যায়নি। চারিদিকে সোনালি আভা।

প্রীতিদের বাড়ির সামনে অজস্র গাড়ি। বোঝা যাচ্ছে প্রচুর লোকজন এসেছে। সামনের লনটাতে ফুলভরতি টব এনে সাজানো হয়েছে। ঘন সবুজ পাতাভরতি রবার

গাছের নীচে গার্ডেন চেয়ারে লোকজন বসে আছে। কতগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। ওরা গাড়ি থেকে নেমে দাশগুপ্তবাবুর সঙ্গে ড্রয়িং রুমে ঢুকল। বিরাট ড্রয়িং রুমটা আজ বিশেষ ভাবে সাজানো। নতুন রঙিন পর্দা ঝুলছে। সোফার সামনে কারুকার্যময় টেবিলের ওপর অজস্র ফুলের ডালি। কেউ কেউ সোফায় বসে ছিল। কেউ কেউ ঘোরাঘুরি করছিল। ফারজানাকে দেখেই মিসেস দাশগুপ্ত এক গাল হাসি দিয়ে এগিয়ে এলেন, 'যাক বাবা, এসে পড়েছেন। কী দুশ্চিন্তায় যে ছিলাম, একমাত্র মেয়ে, জন্মদিনের দিন বকাঝকা করে ঘর থেকে বের করব সে উপায় নেই। অযথা আপনাকে কষ্ট দিতে হলো।'

ফারজানাও বলল, আজকাল একটা-দুটো বাচ্চা হয়ে ওদের খুব কদর বেড়ে গেছে। আমাদের যুগে কিন্তু বাবা মা-রা কড়া শাসনে রাখতেন।

—হ্যাঁ, যুগ পালটে গেছে, কই ফারিন, এস, তুমি তো আজ আমাদের চিফ গেস্ট।

ফারিনের হাতটা ধরে মিসেস দাশগুপ্ত ড্রয়িং রুমের অপর প্রান্তে সংলগ্ন ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, ওকে ডাক, বল তুমি এসেছ।

ড্রয়িংরুমে এতক্ষণ যারা বসেছিল বা যারা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছিল, সবাই সকৌতূহল দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকাল। ফারজানার পাশে সোফায় উপবিষ্টা এক মোটাসোটা মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, ওই বুঝি প্রীতির বান্ধবী? ওর জন্যই বুঝি এত সব হচ্ছে? মেয়েটা ঘর থেকে বেরুচ্ছে না।

ফারজানা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ। মহিলা নিজে থেকে তার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি প্রীতির পিসি। আপনি বুঝি ওর মা?

ফারজানা হেসে বলল, হ্যাঁ।

ততক্ষণে দরজা খুলে গেছে। ছোট্ট একটা মিষ্টি শিশু হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছে। প্রীতি অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে একগাল হেসে ফারিনের কাছে এগিয়ে এল। তারপর একটা চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা হলো, দুজনে গলাগলি করে হাঁটতে হাঁটতে ড্রয়িং রুমের মাঝখানে এগিয়ে এল। মিসেস দাশগুপ্ত প্রীতিকে তাড়া দিলেন। তাড়াতাড়ি এসে কেক কাটো। দেখোতো সবাই কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

সে কথায় শিশুদের কোন তাড়া আছে বলে মনে হলো না। ওরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের মধ্যে আপনমনে কথা বলে যাচ্ছে।

প্রীতির পিসি আবার ফারজানাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুঝি রায়টের ভয়ে আসতে চাইছিলেন না?

ফারজানা কী উত্তর দেবে ভাবছে এমন সময় করতালির শব্দে ঘর মুখরিত হয়ে উঠল, ওরা দুজনে ঘুরে তাকাল। প্রীতি কেক কাটছে। পাশে দাঁড়িয়ে ফারিন। দু-তিনটে ক্যামেরার বালব একসঙ্গে ঝলসে উঠছে। সবাই গাইছে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। মিসেস দাশগুপ্তা প্রীতিকে কেক কাটতে সাহায্য করছেন। কেকের একটা টুকরো হাতে করে ফারিনের মুখে তুলে দিল প্রীতি। দুজনের মুখে অনাবিল আনন্দ।

প্রীতির পিসি ফারজানার দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে করে বললেন, বাচ্চা মেয়েদুটো আমাদের বড়ো লজ্জা দিয়ে দিল। □

কঙ্ক'র লাশ

সা ধ ন চ ট্টো পা ধ্যা য়

নদীতীরে গতকাল যে-অজ্ঞাতপরিচয় মড়াটি ভেসে এসেছিল পুলিশ কোনো হদিসই দিতে পারল না এটি হত্যা নাকি স্রেফ দুর্ঘটনা— শনাক্তকরণ খুবই মুশকিল। পচে, মাছে খেযে, জলে খসে দেহটি কিম্ভূত কিমাকার। প্রাগৈতিহাসিক মনে হয। যেন শত শত বছর ধরে ভেসে এই কূলে এসে ঠেকেছে এবাব। কেউ কেউ মন্তব্য করল—কোনো লখীন্দব হবে।

—মানে ?

বিশাল নদীতে মাঝে-মাঝেই দেখা যায মশারি-টাঙ্গানো কলাব ভেলায সাপেকাটা কোনো মৃতদেহ। কোন্ চোখের জলে, কোন্ আশায কোথা থেকে ছাড়া হয এগুলো—কেউ টের পায না। অজানা গাঁযেব মানুষ এদের বলে লখীন্দব। ঢেউযে, জলের দাপটে মশারি ও ভেলা কযেকদিনের জলযাত্রায নিশ্চিহ্ন হযে গেলে, মড়াগুলো এখানে-সেখানে তীরে এসে ঠেকলে প্রবল পচা গন্ধ ওঠে। মানুষজন টের পায এবং বলে — লখীন্দরের মড়া। পুলিশ এ-যুক্তিতে নিঃসন্দেহ হল না। তবে ?

নৌকাডুবি ? প্রাযই হচ্ছে ইদানীং। বিশেষ করে তীর্থ এবং মেলা-উৎসব থাকলে তো কথাই নেই। খড়ের গাদাব মতো ঠাসা মানুষের তাল নিযে মোচার খোলাগুলো যখন ঢেউয়ে দোলে কিংবা ভুটভুটি সামান্য হেলে পড়ে, যে-যার উশৃঙ্খল বাঁচার চেষ্টায যায় তলিযে। দশ বিশটা সাঁতরে ওঠে কিন্তু শিশু-মহিলারা জলসমাধির হাত থেকে রক্ষা পায় না। সবার নাম পরিচয়ের হিসেব তো থাকে না কিন্তু দুর্ঘটনার খবর থানায বা চৌকিতে আসবেই। সম্প্রতি পুলিশের হাতে এমন কোনো রেকর্ড নেই।

তাহলে কি প্রত্যন্ত গন্ড কোনো অস্পৃশ্য-টোলায় গণহত্যা ঘটল ? লাশ সরিযে নদীতে ফেলে দিযেছে ? বুলেট বা আগুনের চিহ্ন থাকত তাহলে। লোকটা হেসে বলে—থাকলেও কি এতদিনে জলদেবতা ধোযা-পাখলা কবে রাখেনি ?

বহুকালের প্রবাহিনী বিশাল নদীর দু-তীরে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ, বর্ণ, গোষ্ঠীর বাস ! সংঘর্ষ লেগেই আছে। ফসলের অধিকার থেকে রক্তের পরিচয — যে কোনো মতলবে গণহত্যা ঘটে। শবগুলোকে শনাক্তকরণ করা যায না। কাউকে কাদায় পোঁতে, জলে ফেলে, গাদা করে জ্বালিয়ে দেয়, টুকরো টুকরো করে ছালায় ভরে অথবা সতীর একান্ন পীঠের মতো, দেহের নানা প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে দেয বিভিন্ন দেশে। কুড়িয়ে জোড়া লাগাতে পুলিশের পেছন ফাটে। এমন ভুরি ভুরি মামলা আদালতে ধুলো খাচ্ছে। কিন্তু সংঘর্ষের সংবাদটাতো হজম কার যায় না। পুলিশ জানবেই। কই, এমন কিছু ঘটেছিল ?

পুলিশ নিঃসন্দেহ হয় না।

তবে এমন একটি সম্ভাবনা যখন মুখিয়া থেকে দারোগাবাবু — সবাই মেনে নিয়ে স্নায়ুচাপমুক্ত হতে যাচ্ছিলেন যে, হত দরিদ্র চামার-চন্ডালের পরিবারের সন্তানদের যেমন ঘাট-খরচার অভাবে মুখে সামান্য নুড়োর আগুন ঘুরিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়, এটি তাদেরই একটি নমুনা ; কোনো দহে আটকে ছিল, অতি বাসি হয়ে স্রোতে ঠেলে এসেছে এখানে, তখনই উন্ধবের মুখে কাহিনিটি শোনা গেল। কিন্তু সব শোনা-টোনার পর টোলার সাধারণ মানুষ খানিকটা সহমত হলেও, পুলিশ গেল ভীষণ ক্ষেপে। এবং সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে উন্ধবের ডাক পড়ল থানায়।

এমনিতেই উন্ধবকে নিয়ে এলাকায় উঁচু জাতদের মধ্যে কিছু টকর-টকরি আছে। সে একবার অর্থবান ভূমিহার পরিবারের কুন্তীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছিল। এই গন্ডগ্রামে শস্যের দাপটে প্রেম-ট্রেম সুনজরে দেখে না মানুষ। আর উন্ধব জাতে মুচি। যদিও জাত ব্যবসা করে না, দুটো পাস দিয়েছে, কাহানি লেখে কিন্তু ও-সব কে পোঁছে। হাটে-বাজারে গাওনা গেয়ে ছড়া কাটে, দু-চারজনের দস্তখত লিখে দেয় মাতৃভাষায় এবং বলে — কৃষ্ণ অর্থাৎ কিষণজি ছোটোবেলায় ননী চুরি করে খায়নি। কেন খাবে? গোয়ালাতো ছিল না, আসলে ছিল কিষাণ!

তো, আগের দিনকাল হলে কুন্তীর বাপ ধন্যু সিং ওকে স্রেফ ভয়সার সঙ্গে জোত লাগিয়ে ভুট্টার খেত চষিয়ে ছাড়ত। কিন্তু এখন গাঁও-টোলায় সামান্য ঠেলাঠিলি লাগালেই গুলি-বন্দুক বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ, আখবরের লোক, পলিটিশিয়ানবাবু—নানা নকশা শুরু হয়ে যায়। তাই ধন্যু গিয়ে পড়ল মুখিয়ার ঘরে—চাইল বিচার। কুন্তী তার মেয়ে, কিছু লেখাপড়া শিখেছে, ফিল্ম দেখে, নতুন ঢংয়ের পোষাক-আশাকে উৎসাহী—তাই বলে সবকিছু মূল্যবোধ বদলাযনি। তেল আর ঘিযের ফারাক থাকবেই।

বিচারে উন্ধবের দুশো টাকা জরিমানা হয় নচেৎ বিশ ঘা লাঠি। উন্ধব টাকা দিল না, দন্ত দেখিয়ে লাঠির ঘা সহ্য করে মুখে হাসি-হাসি ভাব বজায় রাখল। ধন্যু সিং এটাকে মনে করল, নিজের জাত আভিজাত্য ও বংশের পরাজয়। তখন বাড়ির উঠোনে উন্ধবকে টেনে এনে, ধন্যু পালোয়ান দিয়ে মেয়ের ঠ্যাং মুচড়িয়ে আহ্বান করল — চুথিয়া! তোর মহব্বতের যদি এতই জোস থাকে এসে ঠেকা!

কুন্তীর চিৎকাব যন্ত্রণায় মা ফুলমতী মায়া-মমতা ও সমবেদনা চাপতে গিয়ে ভয়ে দোতলায় দাঁতকপাটি লাগিয়ে পড়ে রইল।

উন্ধব এগিয়ে গেল না ; মাথা নীচু করে চলে গেল উঠোন ছেড়ে। এই পরাজয় খানিকটা বদলার শান্তি এনেছিল ধন্যু সিং-এর বুকে। এরপর অঢেল পয়সায় মেয়ের চিকিৎসা করিয়েছে কিন্তু খুঁড়িয়ে চলা থেকে রেহাই পায়নি কুন্তী। বাপ মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছে, কুছ পরোয়া নেই। মোহর ঢেলে মেয়ের সাদি দেবে। যেন আপশোস না করে!

ধন্যু কথা রেখেছিল। এখন খোঁড়া কুন্তীর তিন ছেলেমেয়ে। রাজরানীর মতো মোটরগাড়িতে গাঁওটোলার ধুলো উড়িয়ে রাজধানী থেকে বাপের বাড়ি আসে, দিন চার যেন উৎসব লেগে যায় বাড়িতে। শোনা যাচ্ছে জামাই এবার টিকিট পাবে চুনাওতে।

ধন্যু সিং কথা দিয়েছে, ক্ষেতি-জমি দরকার হলে কিছুটা বেচে দেবে, পাস বাবাজীবনকে করতেই হবে! দেশসেবার চেয়ে বড়ো গৌরব আর কী আছে!

তো, উদ্ধব নদীতীরের কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে কখন যে মিলেমিশে ছিল, নজর রাখেনি কেউ। বর্ষাকালে নদীতীর খুবই দুর্গম — জংলা-ঝোপ, কাদা, কোথাও বুকসমান ঘাস। কিন্তু ভিড়টা কিছুই বাধা মানছে না। অচেনা বাসি মড়াটার শনাক্তকরণই এখন সকলের ধ্যান-ধারণা। মুখিয়া ভেবে নিলেন, উচ্চবর্ণের কাউকে গোপনে গুম করে বদলা নেওয়া হলো না তো? যদি তাই হয়, হিসেব তবে সাত-দুই। ঘোপেঘাপে, পুলিশের সাহায্যে ইতিমধ্যে সাতজন অস্পৃশ্য পরিবারের কাপ্তেনকে হাওয়া করা হয়েছে এবং বদলায় কে বা কারা নটবর সিং-এর গলা নামিয়েছিল ভাদুরিয়ার বিলে। আর এটি যদি তেমন হয়, তবে হিসেব সাত দুই।

নদী এখানে বিশাল। বর্ষায় যেন ফেঁপে-ফুলে আলিশান। ওপার গাছপালায় নীলাভ আবছা হয়ে আছে। শিল্পাঞ্চল ও বড়ো মোকাম ওদিকে, মাঝে মাঝে দিগন্তে ধোঁয়ার টুকরো দেখা যায়। এ-দিকটা কিছুটা অনুন্নত —কেবল খেতি আর খেতি। ভালো জাতের মোষ পাওয়ার জন্য খ্যাতি আছে মুলুকটার। পক্ষকালের পশু হাটে নৌকো-ভুটভুটি আসে কেনাবেচার জন্য। জলে ভেসে মোষ, সাইকেল, মানুষ যায় গাদাগাদি।

দু-দুটো মোষের পিঠে প্যাংলা চেহারার দুটো ছেলে ডুবঘাসে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে কৌতূহলী জনতাকে দেখছিল যখন, উদ্ধব মজায় চেঁচিয়ে 'এটা কঙ্কর লাশ' বলেই খানিক দৌড়ে মোষের পিঠে চেপে ঘাস-জঙ্গলে জলার নির্জনতায় হারিয়ে গেল।

পুলিশের টনক নড়বেই। জিজ্ঞেস করল - কোন হারামি?

—উদ্ধবুয়া!

—কার লাশ বলল?

এবার রাষ্ট্রশক্তি নিঃসন্দেহ হল সাক্ষী-প্রমাণ মিলে গেছে। নামটা শ্রবণযন্ত্রে ক্রমাগত রিনরিন করল—কঙ্ক! কঙ্ক! কঙ্ক!

উদ্ধব ব্যাটাকে সহজে পুলিশ খুঁজে পায় না। থানার লোকদের সে বলে — গিরিফতার করবে? ওয়ারেন্ট দেখাও!

কী আপদ! গ্রেপ্তারের কথা উঠছে কেন? থানা বা চৌকি ডাকলেই কি তা গ্রেপ্তার হয়? ওয়ারেন্ট ছাড়া কি থানামুখো হওয়া যায় না?

উঁহু! উদ্ধব বলে, টোপি-চোদদের বিশ্বাস করি না!

আজেবাজে কথা শুনলে কার খোপড়ি না তেতে ওঠে! হাড্ডি চুরিয়ে না দিলে থানাবাবু দারোগা সিং-এর জ্বালা মেটে না। তবু এ-সব মামুলি শান্তির দিনে, নিছক একটা মৃতদেহের শনাক্তকরণে কী দরকার মারধোরের। ছটুলালকে, তাই বলা হল, শালাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে আয় বাবা, কঙ্কটা কে জেনে নেব! বলা যায় না ওপরওয়ালাদের মর্জি কখন কোন বাতাসে ধুলো ওড়ায়! একটু পরিচয় দিয়ে জবাব তো খাড়া করা যাবে? ডি সি সাহেব খোদ রাজপুত, কুরমি থানাদারের গাফিলতি খুঁজে পেলে, স্রেফ খতরনক চৌকিতে দেবে ঠেলে। ডাকু এলাকায়। তখন 'সর্দার তোমার নিমক খেয়েছি' বলে রেহাই চাইলে, হাসতে হাসতে জবাব পাবে 'আব গোলি

খা' !

অবশেষে ছটুলালই কাঁধে হাতফাত দিয়ে, উদ্ধবকে থানায় হাজির করালো। ভাঙা ঠেকনো চেয়ারে বসার সুযোগ পেল উদ্ধব এবং ফ্রিতে একগ্লাস চা। ওর আশঙ্কা ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার। উদ্ধব তবু প্রথম দশ পনেরো মিনিট থানাদারের সামনে নয়-ছয় করল মজার মজার কথা বলে।

রাম নাকি ভরতকে আসলি খড়ম দেয়নি, বলেছিল বানিয়ে নিতে। প্রজারা তাই-ই আসল ভেবে নেবে!

রাবণ নাকি নিজে নয়, গোটা দশেক পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে সীতাকে নিজের পুরীতে আনিয়েছিল!

এতে তো কঙ্কর পরিচয় জানা যায় না। থানাদার ক্রমে লিবারেল মুখোশটি খুলতে থাকলে, উদ্ধব ধরতে পারল লাশের খোঁজটিই মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন সে মুখ খোলে। শর্ত ছিল উদ্ধবের বলার সময় কোনো আল-ফাল প্রশ্ন করা চলবে না।

থানাদার তো ভেতরে ভেতরে উদ্ধবের বেলেল্লাপনায় চরম অপমানিত। বুঝতে দিলেন না। উদ্ধবের কঙ্কপরিচয় শুরু হল এভাবে, গ্রামীণ দেহাতি ভাষায়।

গ্রামে গুণরাজ নামে ব্রাহ্মণের একটি পুত্র জন্মায়। শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ তার পিতামাতার মৃত্যু হয়। বাপ-মা-খাওয়া ছেলে! তখন প্রতিবেশীদের নানা সংস্কার। অপয়া ভেবে কেউ তাকে ছুঁয়ে দেখল না পর্যন্ত। আঙিনায় পড়ে কাঁদে। কেউ কোলে টেনে নেয় না।

অর্ধেক দিন ধরে বেচারা জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছড়াচ্ছিল, বিনা দুধে মৃতপ্রায়, কেউ তাকে কোলে তুলল না। পাছে পিতৃত্ব ঘাড়ে চাপে, কেউ দেখেও যেন দেখতে পায় না। যে জন্মেই বাপ-মাকে খেয়েছে তাকে কি বুকের দুধ খাইয়ে বাড়িতে আনা যায়? মুরারি চন্ডাল এতসব শাস্ত্র-টাস্ত্র জানত না। ব্যাটার আজন্ম কর্ম ছিল, শবের কাঠ জোগানো। চন্ডালের ছায়া মাড়ালে জাত যায় সবার। সে এসে ছেলেটিকে কুড়িয়ে নিল। নিঃসন্তান, বউ কৌশল্যা কুড়িয়ে পাওয়া চোদ্দ আনার আহ্লাদে আটখানা। চন্ডাল পাড়ায় উৎসব লেগে গেল। কৌশল্যার দুধ নেই; এ আসে ও আসে—মাই দিয়ে যায়। মাগীর গর্বে আর ত্যানা জোটে না। এভাবেই পাঁচটা বছর কাটল। ছেলের নাম রেখেছিল চন্ডালিনী, কঙ্ক! কথায় বলে কপালপুড়ির পুত সয় না। চন্ডাল বস্তিতে বসন্তরোগে মুরারি কৌশল্যা দুটোই প্রাণ হারাল। কঙ্ক অনাথ। লোকে বলল, সংস্কারগুলো কি শাস্ত্রে এমনি-এমনি লেখা হয়েছিল? ফল তো হাতেনাতে। কঙ্কর জন্ম বাউনগর্ভে হলে কি হবে, পাঁচ বছর ধরে চন্ডালদুগ্ধ আর অজাতের অন্ন খেয়ে পেট ভরিয়েছে। ব্রাহ্মণত্ব থাকল কোথায়? আশ্রয় দিয়ে জাত-কুল খোয়াতে সাহস পেল না কেউ। তখন পাঁচ বছরের বাচ্চা চোখের জলে শ্মশানে ছাই মেখে মাটিতে পড়ে থাকে, ঘুমোয়, জাগে আবার কান্না করে। ছাই আর অশ্রুতে যেন ছোটোখাটো ভস্মলোচন!

ব্রাহ্মণ গর্গ ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিদ মহাপন্ডিত, সমাজের অবিসংবাদিত নেতা। খুবই

শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। ইক্তাদার পর্যন্ত গর্গর নিদানের ওপর বুলিং দিতে সাহস পায় না। তো গর্গ নামাবলি গায়ে শ্মশানের পাশ দিয়ে নদীতে স্নানে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বালকের কান্নায় থমকে দাঁড়ালেন। এমন নির্জন ভয়াবহ স্থানে তো শিশুর অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়। খানিকটা এগিয়ে কঙ্ককে দেখে বিস্মিত হলেন। ভাগ্যিস বাঘ-শেয়ালে টেনে নেয়নি। নামাবলি দিয়ে ধুলোবালি মুছে, নদীর জলে বালককে চান করিয়ে, হাজির হলেন নিজের কুটিরে। ব্রাহ্মণপত্নী সাবিত্রীদেবী অবাক। লীলা নামে একটিমাত্র কন্যা তার। স্বামীর কোলে বালকটিকে দেখে আনন্দিত।

—কাকে আনলে ?

—মথুরার কৃষ্ণ।

—কী বলছ দিনদুপুরে! ভালোমন্দের ক্ষণ থাকে জানো ?

তখন গর্গর মুখে বৃত্তান্ত শুনে সাবিত্রীদেবীর উচ্ছ্বাসে সামান্য গ্রহণ লাগল। আস্তে জিজ্ঞাসা করল —এর কুল ?

—অজ্ঞাত!

—বংশ ?

—ভবিষ্যৎ কর্মে বোঝা যাবে!

সাবিত্রীদেবী উচ্ছ্বসিত হলেন না কিন্তু স্বামীর দৃঢ় ও কঠিন উত্তরে নিশ্চুপ। গর্গর ঘরে শিশু প্রতিপালিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ সমাজও ব্যাপারটা প্রীতির চক্ষে দেখল না। কিন্তু নেতার বিরুদ্ধে সহসা ঘোট বাঁধতে সাহস নেই। কঙ্ক বড়ো হতে থাকে।

সুরভি নামে একটা গাই ছিল গর্গর, কঙ্ক দুপুরে গোচারণে যেত, বাঁশি বাজাত, আর সকাল সন্ধ্যায় খেলা করত লীলার সঙ্গো। ক্রমে বালক ১০-এ পড়ল। গর্গ দেখলেন এই অজ্ঞাতকুলশীল অত্যন্ত মেধাবী। তিনি কঙ্ককে মুখেমুখে সংস্কৃত ভাষা শেখাতে থাকলেন। কঙ্কও দ্রুত শিখতে থাকল এবং ছড়া তৈরি কবার প্রতিভায় অনেকেই মুগ্ধ হলেন। হেটো মানুষরা তো 'কবি কঙ্ক' নাম দিয়েই ফেলল।

গর্গ তখন নিজের বাড়িতে সমাজের সভা ডেকে প্রস্তাব দিলেন—কঙ্ককে সমাজে গ্রহণ করা হোক!

সভা স্তব্ধ। যেন বাজ নিক্ষেপিত হয়েছে।

—আমার প্রস্তাব, প্রতিভাময় গুণী ছেলেটিকে সমাজে গ্রহণ করা হোক। নান্দু বাউন সব ইতিহাস শুনে জবাব দিলেন — যে-ছেলে পাঁচ বছর চন্ডালের ভাত খেয়ে, তাদের সংসর্গে মানুষ, সেই হতভাগার ব্রাহ্মণত্বের কোনো দাবী থাকতে পারে না।

গর্গ বললেন—যদি তা পাপ হয়, সে ইচ্ছাকৃত করেনি। আপনাদের কাছে মমতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করছি।

—তাহলে মুসলমান এবং গোমাংস ভক্ষণের পরও, জাতে নেওয়ার দাবা তুলতে পারেন আপনি।

গর্গ চুপ করে থাকেন।

সভায় চাপা গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু গর্গের সরাসরি বিরোধিতায় মুখ খুলতে সাহস পায় না অনেকেই।

—সংস্কার কি পাপ? একজন প্রশ্ন রাখলেন।

গর্গ বললেন — সংস্কার পাপ নয়। কিন্তু হে পন্ডিত, বলুন ব্রাহ্মণত্ব কি সংস্কার? নাকি কর্মযোগ?

—উভয়ত।

—তাহলে কর্মের ভাগ, কঙ্কর প্রতিভাকে বিচার করছেন না কেন?

—আপনি সমাজপতি হয়ে, কুলের প্রশ্ন উড়িয়ে দিতে পারেন না।

—কুল তো গর্ভের বস্তু। .....চির অন্ধকার। আর অন্ধকার মানে আলো নেই যে-স্থান। ....নেই এর বিচার কী করে হয়? বিচার 'আছে' নিয়ে।

যুক্তির জটাজালে অন্যান্য সভ্যরা গর্গর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। ক্রমে সভাভঙ্গ হয়। পরাজয় ও অপমান অহংবোধে দ্বিগুণ ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং গভীর ষড়যন্ত্রে গর্গ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ক্রমে টের পেলেন ভীষণ একাকি হয়ে গেছেন। ততই তাঁর ক্রোধ বাড়তে থাকে।

কঙ্ক তখন যুবক। সমাজের আলোড়ন তাকে ভাবিয়ে তোলে। আপন জন্ম পরিচয়ের কুহেলি কুরে কুরে খায়। বৃত্তি শুকোতে থাকে এবং গর্গের নেতৃত্ব খোয়াবার জন্য, কঙ্ক নিজেকে সম্পূর্ণ অপরাধী ভাবতে থাকে।

একদিন কঙ্ক নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে অনাহারে, শুকনো মুখে নিরাশ্রয় বৃক্ষতলে পড়েছিল। কাব্য, সংগীত কিছুই মনের উৎস থেকে উঠে আসে না। যেন চতুষ্পার্শ তাকে ছলনা করছে। বিকেল পড়ে এসেছে। বাতাসে হিমভাব ফুটে উঠেছে। পাখ-পাখালি ডাকছে গাছে, বহু বেদনা নিয়ে রোদটুকু গাছের মাথায় এমন গুটিসুটি দিয়েছে যেন এক্ষুণি নিঃশব্দ চোখের জলে গোধূলির মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে।

কঙ্ক তন্দ্রার আবেশে স্পষ্ট দেখতে পেল—তাকে নরককুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে এবং যমদূতরা নির্মমভাবে মুগুর-পেটা করবার জন্য হিহি হাসছে। ঠিক তখনই এক রক্তগৌর পুরুষবর কঙ্ককে হাত ধরে উঠিয়ে বললেন—আমার সঙ্গে আইস।

কঙ্ক টের পেল স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষটি স্বয়ং গৌরাঙ্গ। নদীয়ার চাঁদ। কঙ্ক রাত থাকতে থাকতে গর্গর গৃহত্যাগ করে চৈতন্যদেবকে দেখতে ছুটল। কিন্তু নদী তখন বর্ষাশেষের জলে ভীমাকৃতি হয়ে আছে নদীয়ায় পৌঁছন হল না তার। পথে নৌকাডুবি হওয়াতে কঙ্কর মৃত্যু হয়!

উদ্ধবের কাহিনি থানাদার এবং সিপাইরা নাকচোখ কুঁচকে শুনছিল। একজন ফস্ করে জিজ্ঞেস করে —চৈথ্নাদেব কৌন? উদ্ধব জবাব দেয় না।

—ওর কাছে কঙ্ক যাচ্ছিল কেন? মাদারচোদ কি বড়িয়া লিডার?

এবারও উদ্ধব নিরুত্তর।

কেবল থানাদার ভাবছিলেন, এতো বহুত পুরানো কাহিনি! লাশ কি যুগযুগ ধরে জলে ভেসে বেড়ায়? উদ্ধবের মতলবটা কী? কী বোঝাতে চায়?

পুলিশ এবারও নিঃসন্দেহ হতে পারল না। □

পুকার

সু ব্র ত মু খো পা ধ্যা য়

এই চৈত্রের উতল হাওয়ায় এখন যে গানখানি উড়ছে সে বলছে, হরি ওম তৎসৎ। পাহাড়ি ঠুংরী। আর কী আশ্চর্য, তুমি, যে কি না জটা রায় নামক তিন পয়সার কমপাউন্ডার, বসতি গঙ্গা কামড়ানো দুকামরার বেড়ার ঘর, তিন তিনটি সা-যুবতী মেয়ে আর পরিবার সমেত সংসারটি ই এস আই ডাক্তার সদানন্দ লম্পুর নড়বড়ে ডিসপেনসারি কপচে ও কিছু বারোযারি কলেখাটা বিহারি রুগি দিগে সুঁই দিযে, ওষুধের জল এবং জলের ওষুধের বিনিময়ে দুটি করে টাকা ক্বচিৎ নগদে বাকিটা খাতায়, তার কি না এই ঘোড়া রোগ। তা না হলে রেশন অফিসের বড়বাবুর বার বারান্দার অন্ধকারে তুমি কোন মুখে ঘাপটি দিয়ে গান শোনো। তোমার না মুখময় সুবৃহৎ দাড়ি আর মাথার দুধারে কাঁচাপাকা চুলের সঙ্গে নোঙর ফেলা দুগাছি অকারণ জটা। ফলে তুমি শ্রমিক মহল্লায় সুঁইদেনেওয়ালা জটা ডাগদর। যেমন কি না তোমার কিঞ্চিৎ অন্নদাতা ডাক্তারের গাঙ্গুলি পদবি লুপ্ত হযে কোন কুক্ষণে এল এম এফ পাস করার দরুণ লম্পু। নিপাতনে সিদ্ধ।

নিপাতনে সিদ্ধ থেকেই বুঝি গাঁধির গুজরাটে ২৭ ফেব্রুযারি গোধরা রেল স্টেশনে বন্ধ রেল কামরায় আগুন ধরানো হয়। অভাগা রামভক্তরা কী অসহায়। রামলালা স্বযং এই জ্বলে পুড়ে খাক সন্তানদের বীভৎস আগুনে গলিত আর এদেহ ওদেহের ঘাড়ে উদোর-পিণ্ড হয়ে যাওয়া দেহাবশেষ দেখে চোখে হাতচাপা দিয়ে বসেন। তাঁর ধাঁধা হয় মানুষ না রামসেবক কোনটি আগে আর তাব জবাবিতে কত শত হাজার সংখ্যালঘু মানুষের শরীর সংসার জ্বালিয়ে দেওয়া হয—বদলা নেবার খাণ্ডবদাহনে। তাহলে বলো—সংখ্যালঘু না মানুষ কোনটি আগে? তুমিই বলো জটা রায়।

কী বলব আমি। বলার মুখ থাকা চাই। থাকলেও সবাই বলতে পারে না। তাহলে আর বলিয়ে কইয়ে বলেছে কেন। তার ওপর যদি থাকে এই গান শোনা ঘোড়া রোগ। তাও কি না ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত। উঃ, নারকেলের দন্তভাঙা তক্তি খাচ্ছে যেন।

ওরা যখন প্রকল্প তৈরি করছিল রামভক্তদের ছাই থেকে ললিতাবেন ও মসুবেন নামে দুই রমনীর অস্থি বেছে নিয়ে অস্থি যাত্রা করবে, সেই অস্থি সবরমতি, সরযূ আর প্রয়াগে বিসর্জন দেবে তখন শাহ আলম দরগার লাগোয়া ত্রাণ শিবিরে কমসে কম পঁচিশ হাজার আর্ত মানুষ নতুন করে দিশাহারা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফতোয়া হাঁকছেন—ঘরে ফিরে যাও তোমরা ভাই সকল। হায়, ঘর কোথায়? ঘর কোন দেশে?

তাহলে হরি ওম তৎসৎ—এই ঘরখানির বাসিন্দা মানুষটির আপনার ঘরের খবর

কতকাল যে হারিয়ে গেছে। পাকিস্তানের পাঞ্জাবের কসুর অঞ্চলের এই মানুষ স্রেফ গানা গানে কে লিয়ে স্বদেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে এলেন, সবরঙ, সদারঙ বড়ে গুলাম আলি খাঁ। আহা—তস্কর, ঘাতক, লম্পট রাজনীতিকদের শতবর্ষ কেন পঞ্চাশ থেকে আশি-নব্বুই তক্ বছর বছর শুভ জন্মদিন, ফুলমালা সাজানো পৃথুল কদর্য মুখচ্ছবি, সদ্য জেল খালাসান্তিক দু-আঙুলি বিজয় চিহ্ন, এসব ছাপিয়ে, এতসব মারণ কাণ্ডের রক্ত ছাইভস্ম পত্র উপচিয়েও হতভাগ্য এই ২০০২, সেই ঠিকানা হারানো মানুষটির জন্মশতবর্ষ। তথাকথিত ধর্মাধর্মের ছায়া থেকেই কত যোজন দূরবর্তী। হরি ওম্ তৎসৎ। কোনটি আগে? মানুষ না শিল্পী? হরি না রহিম আগে? না মানুষ?

তাহলে কি এমন হয়েছিল গুলাম আলির পাঠান পূর্বপুরুষ বাবা ফজল পীরদাদ খানের? কেন তিনি আফগানিস্তানের গজনি থেকে এসে উঠলেন ফকিরবেশে হিমালয়ের অরণ্যে শুধুমাত্র সংগীতে মোক্ষ পেতে? তুমি কি এ সবের রহস্য বোঝো জটা? এই গূহ্য সাধনতত্ত্ব তো তোমার ওই জল ওষুধ—ওষুধ জল নয়। ওই ফকির বাবার তরফ থেকেই যে সংগীতে মোক্ষ লাভের কারুকার্যটি অধস্তনে নেমে এসেছিল। ফলে গুলাম আলি খাঁ। ২০০২ তাঁর শতবর্ষ। কলকাতা শহর তাঁর প্রিয় সাধনপীঠ। ফুঃ, কে মনে রাখে। তার চেয়ে সমাজবিরোধী রাজনীতিকের জন্মদিনে গোলাপে গোলাপে শতফুল বিকশিত হোক। বনস্পতি মার্কা মাতাজির হাজতবাস অননুমোদন মুহূর্তে শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও। রাম রহিম এক হ্যায়। হরি ওম্।

তোমার মনে আছে জটা রায়—একবার কলকাতার এক আসরে তিনি গাইছিলেন সন্ধ্যার রাগ হাম্বির। সেটা বুঝি পাঁচের দশকের মাঝামাঝি। সেই আসরের পরবর্তী শিল্পী তখনকার আর এক ডাকসাইটে গাইয়ে। বনেদি হিন্দুই শুধু নন, রীতিমতন ফোঁটা তিলকধারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। শোনা যায়, তাঁর গানের সময় কোনও বিধর্মী সামনে দিয়ে গেলে তাঁর গানে ব্যাঘাত ঘটত। তো যাই হোক, তাঁর আগে হাম্বির গাইতে বসে গুলাম আলির নজরে এসেছিল আসরময় হায় হায় উঠলেও পণ্ডিতজির মুখের একটিও রেখা টলেনি। যতই প্রাণ ঢেলে দেন না কেন, ওই বিদগ্ধ শ্রোতার তিলমাত্র হেলদোল নেই। এক সময় —এক সময় একটি দুঃসাধ্য পুকারের মুখে যখন গোটা আসর তীব্র টান টান অথচ পণ্ডিতজি অবিচল—আর পারলেন না বড়ে গুলাম। আর ধৈর্য রাখা গেল না। গাইতে গাইতেই বলে উঠলেন, পণ্ডিতজি, হামারি তরফ ধ্যান নহি হ্যায়।

পণ্ডিতজি বিস্ফারিত হেসে কী বললেন তা শোনা না গেলেও গুলাম আলির চকিত প্রতিক্রিয়া শুনতে পেল সবাই, ধ্যান তো থোড়ি হ্যায়।

গোধরায় প্রধানমন্ত্রী এলেন। জীবন্ত দহন কামরার ছাইপাঁশ নমুনা দেখলেন। তাঁর সঙ্গী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শিউরে ওঠার ভাব ধারণ করলেন। সেই শিহরণের সঙ্গে বড়ে গুলামের বুক নিঙড়ানো পুকারের কোনও মিল না থাকলেও চড়া পর্দার কারণে কী ভারি মিল। প্রধানমন্ত্রী যখন মুখ্যমন্ত্রীকে রাজধর্ম পালন করতে বললেন তখন মুখ্যমন্ত্রীর সাথ সঙ্গতে, তাই তো করছি সার। সেই সারে মিলে গেল চমৎকার পরিকল্পিত পুলিশ-মন্ত্রী-আমলা এবং আমলা-মন্ত্রী-পুলিশ এই ত্রি-কায়দায় মানুষ নিধনের আশ্চর্য ছক। হত্যাকারীদের চাপা গর্জন, ইয়ে অন্দর কি বাত হ্যায়, পুলিশ হামারা

সাথ হ্যায়। বড়ে গুলাম গাইছেন, হরি ওম্ তৎসৎ মহামন্ত্র হ্যায়।

মহামন্ত্র হ্যায়। পুলিস হামারা সাথ হ্যায়। অথচ কী আশ্চর্য, এই ২০০২-এর ২ এপ্রিল আপনি একশো বছর পার হলেন। এখনও আপনার কণ্ঠ চড়াই ভাঙতে ভাঙতেও কী অমলিন মধুর। ত্রিসপ্তকে যাতায়াত করতে কোনও অস্বস্তি নেই। হায়, সেই কবেকার ত্রিশের দশক থেকে শহর কলকাতায় আপনি গলা ঢেলে দিয়ে বসে আছেন, কত দিনরাত একাকার করে দিয়েছেন। এই এপ্রিলই তো আপনার জন্ম মাস। সেই সময়েই, আপনি একশো পেরনোর কালেই গুজরাটে নরমেধ কান্ড তুঙ্গে। আপনার জন্ম মাস কত মানুষের মৃত্যু মাসের দিকে ঢলে পড়ল। আকবরনগর, রহমতনগর, ইসলামনগর, মদিনানগর—সব জ্বলছে। মানুষের গৃহ জ্বলন কাজে পুলিশ জনতার সঙ্গে এসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রাক্তন গৃহমন্ত্রী। পুড়ছে মানুষ, ধ্বংস হচ্ছে পাঁচশো বছরের মসজিদ স্থাপত্য ইমানপুরে। উর্দু কবি ওয়ালি গুজরাতির দরগাহ ধ্বংস করা হচ্ছে। মানবাধিকার কমিশন ধিক্কার দিচ্ছেন। আর গুলাম আলি সাহেব, আপনি এ সবের পাশ কাটিয়ে চুপি চুপি একশো পেরোচ্ছেন। কেউ টেরও পাচ্ছে না। আর আমি জটা রায়, শ্রমিক মহল্লায় সুঁই দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই এক ঘোড়া রোগের দরুণ আপনার কণ্ঠস্বর শুনছি আধো অন্ধকারে ঘাপটি দিয়ে।

এছাড়া তুমি আর কী বা করতে পারো জটা রায়। প্রতিবাদ মিছিলে তোমায় তো কেউ ডাকে না। জনসভাতেও তোমার গলা নেই। তার বদলে তুমি—একমাত্র তুমিই পারো মনের পুরনো গিঁট নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে মনে করতে—এই তো সেই এপ্রিল মাস। তার এপাশে ওপাশে ১৯০২ আর ২০০২। এপ্রিল মাস—চৈত্র হাওয়ার অঢেল রাত। কোথায় পাকিস্তানের কসুর। কোথায় কলকাতা। কোথায়ই বা গুজরাট।

হাওয়া দিচ্ছে হুহু । হুহু মাতাল হাওয়া। পার্ক সার্কাসের ঘরে বসে মাথাব ওপর ঘুরন্ত পাখার সঙ্গে গলা রাখছেন বড়ে গুলাম। একজন রেগুলেটারে এক দুই চড়াচ্ছে। তান করছেন বড়ে গুলাম। তানের রকম বাড়ছে। তান ঘুরছে ঘুরন্ত পাখার সঙ্গে সমান তালে না হলেও প্রায় সমানে সমানে। আয়ে না বালম। বসন্ত এবারেও এল। তবু আপনার গলায় চিরকেলে হাহাকার—বসন্ত এল না, এল না। গুজরাটে এই বসন্তেও গভীর শীত। প্রধানমন্ত্রী পৃথিবীর কাছে মুখ দেখাবেন কেমন করে। মুখ্যমন্ত্রীর সে ভাবনা নেই। তিনি রাজধর্মই পালন করে চলেছেন। আর আমি, দু-পয়সার ঘোড়া রোগি কমপাউন্ডার আপনার কণ্ঠ ছুঁয়ে বসে আছি বুড়ি ছোঁয়ার কায়দায়। তাতে কার বা কী এল গেল। বাড়ি ফিরলে অন্নচিন্তা। তিন-তিনটি সা-যুবতী মেয়ের পাত্র চিন্তা। গৃহিণীর নিঝুম মুখের সামনে কতকাল বসন্তের আদল নেই। গুলাম আলির হাহাকার ওইখানে সত্যি হয়ে গেছে।

বেড়ার ঘরের ওপারে গঙ্গা বইছে। রাত্রির অস্থির গঙ্গা। নদীর জলে হাওয়া পড়েছে। আকাশের তারারা নিভৃত চোখ লুকোচ্ছে বিপুল জলস্রোতে। গৃহিণী বলছে, একটা রোজগেরে ছেলে থাকলে কি আর ভাবনা থাকত আমাদের।

বারান্দা থেকে মেয়েরা বুঝি সে কথা শুনে ফেলেছে। বড়োমেয়ে তার শির বার করা হাত নেড়ে আর দুবোনকে ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছে, মেয়েদের বিয়ের ভাবনা তুলে

রেখে বাবা-মা আবার একসঙ্গো শোওয়ার ফন্দি করছে!

ফন্দি করছে লুঠেরা খুনির দলবল। রাজধর্ম পালনকারীরা। গুলাম আলি গুটিগুটি পায়ে একশো পেরোচ্ছেন।

আহা— এই একশো বছরেও সব মানুষ মানুষের ধর্ম শিখল না। তা বাদ রেখে রাজধর্ম। রাজধর্মই তো মানুষের ধর্মের অতীত। রাজধর্মই পারে মানুষকে রাজার মতন স্থান করতে। ভুলিয়ে দেয় এক ফকির বাবার বংশধর বড়ে গুলাম আলির অর্জিত একশোটি বছরকে। ধ্যান তো থোড়ি হ্যায়।

বড়োবাবুর টেপ ডেকে ফিতে ঘুরছে। ফিতের বুকে এবার মিশ্র খাম্বাজ। সঙ্গো জল যমুনা ক্যায়সে যাউ।

কোথাকার তীর কোথায় বিঁধল আবার। মসজিদ, রাম জন্মভূমি, যমুনার চিকন কালার প্রাণ-বিরহিণী রাধিকা সুন্দরী—একশোটি বছরের ধূলোয় বুঝি এবার ঘূর্ণী ঝড় উঠল, এই চৈত্র রাতে। সবরং গাইছেন শ্রীরাধার জন্যে। গেয়ে চলেছেন শাহ আলম দরগা সংলগ্ন ত্রাণ শিবির থেকে ধরে আরও কত না সন্ত্রস্ত মানুষের জন্য। সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য। সে গান কেউ শুনছে কি? শুনছে কি বিপন্ন মানুষ সবরঙের প্রাণপণ পুকার!

ধ্যান তো থোড়ি হ্যায়। □

মহামতি বুশ, বিশ্বায়ন এবং সুজাউদ্দীন মণ্ডল

রা ম র ম ণ ভ ট্টা চা র্য

হরিনারায়ণবাবু টালমাটাল মাতালের মতো দৌড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বেসিনের ওপর। মুহূর্তে উদ্‌গত লাভার মতো হুড়হুড় করে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রবল গতিতে.....আবার .....আবার। দেওয়াল সংলগ্ন দুই প্রান্ত শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে মাথাটা নামিয়ে আনলেন বেসিনের ওপর। মাত্র চার-পাঁচবার তাতেই খালি হয়ে গেল পেট। ......বোধ হতে লাগল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। এই অর্ধচেতন মুহূর্তেও নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন—ভাগ্যিস সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কিংবা ল্যান্ডিং-এ হয়নি। তাহলেই কেলেংকারির একশেষ। এই অবস্থাতেও কলটা খুলে দিয়ে ধুতে লাগলেন বেসিনটা। .....একবার তাকিয়েই বন্ধ করলেন চোখ। দেখতে ইচ্ছে করে না। ....কেন করে না। ঘৃণা না ক্লান্তি! এক মুহূর্ত আগে যা ছিল শরীরের মধ্যে কেন তার প্রতি এত বিতৃষ্ণা! দুর্বিষহ অবস্থাতেও পীড়িত হতে লাগল তাঁর চৈতন্য।

একি স্যার আপনি? কী হয়েছে! ছুটে এসে দুহাতে হরিনারায়ণবাবুকেই জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল সুবোধ—ইংরেজি শিক্ষক সুবোধ বসু, বছর দুয়েক হল স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এসেছে এই স্কুলে।

বিব্রত হরিনারায়ণ কিছু বলতে গেলেন। সুবোধ চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, শব্দ শুনেই বুঝেছিলাম কেউ বমি করছে — কিন্তু আপনি, তা বুঝতে পারিনি.....ব্যস্ত হবেন না স্যার। আপনি বড় বড় শ্বাস নিন.....ইস! কি ভয়ংকর কাঁপছেন!

সুবোধ হরিনারায়ণবাবুকে বেসিনের ওপর তোয়ালে রাখার রডটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, স্যার, একটু কষ্ট করে এক মিনিট দাঁড়ান আমি এখনই আসছি।

এক মিনিট লাগল না। তার আগেই টিচার্স রুম থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে ফিরে এল সুবোধ। একটা প্রান্ত ভিজিয়ে মুখ-মাথা মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর হবে বলে মনে হচ্ছে?

—না-না!

কী খেয়েছিলেন? কোনো গোলমাল হয়েছে?

না তো—রোজ যা খাই তাই খেয়েছি — হরিনারায়ণবাবু কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল নিমাই মাইতি। বাঁ হাতে এক গ্লাস জল, ডান হাতে একটা ট্যাবলেট। খাওয়াতে গিয়ে থেমে গেল। বলল, না এখানে নয়, বাথরুমের বাইরে চলুন।

দুজনের দুহাত ধরে বাইরে এলেন হরিনারায়ণবাবু। ট্যাবলেটটা গিলে নিয়ে গ্লাসের সব জলটা খেতে যেতেই বাধা দিল নিমাই : না-না, একবারে নয়, আস্তে আস্তে অতটা জল হঠাৎ গেলে স্টমাক রিভোল্ট করতে পারে.....আবার হ্যাঁ, এইভাবে। শোন সুবোধ, স্টাফ কাউন্সিলের সভা আমরা আজকে মুলতুবী রাখার দাবি জানাই।

হরিনারায়ণবাবু চমকে উঠে বললেন, না-না, কিছুতেই না — সভা হবে। চল। একটা অনুরোধ রাখবে। মিটিংয়ে আমার বমি-টমির প্রসঙ্গ একদম তুলবে না — চল অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল — সবাই এতক্ষণে চলে এসেছেন। হরিনারায়ণবাবুকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না।

তিনজনে দোতলার স্টাফরুমে ঢুকে দেখল হরিনারায়ণবাবুর অনুমান অত্যন্ত সঠিক। সকলেই এসেছেন। প্রধান শিক্ষক বললেন, এই যে মাস্টারমশাই, আপনার খোঁজে দশরথকে আবার পাঠালাম। এখন দু-টো কুড়ি। তার অর্থ প্রায় পনেরো মিনিট সময় আমাদের নষ্ট হয়েছে। কোথায় ছিলেন আপনি?

অন্তরালে বসে সপার্ষদ কৌশল ঠিক করছিলেন — মন্তব্যটা ভেসে এল রণবীর বাবুদের দিক থেকে কিন্তু মুখ নীচু করে কথা বলায় চিহ্নিত করা গেল না বক্তাকে। তবু ছাড়বার পাত্র নয় নিমাই। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠল : মুখ নীচু কেন, সাহস থাকলে মাথা তুলে কথা বলুন।

সভা আরম্ভের পূর্বেই একটা উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে দেখে প্রধান শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। সে ভাষণের মর্মকথা : এটা শিক্ষকদের সভা, সুতরাং আশা করা যায় সকলেই শিক্ষকসুলভ আচরণ করবেন। একজনের বলার সময় মাঝপথে কেউ বাধা দেবেন না এবং গলা চড়িয়ে কথা বলবেন না। একজনের কথার জবাব অন্যে দেবেন না — কিছু বলার থাকলে সভাপতিকে জানাতে হবে.......হরিনারায়ণবাবু একটু অন্যমনা হয় পড়লেন। ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। একটু শুয়ে পড়তে পারলে খুব ভালো হতো। তা তো হবার নয়। জোর করে তাকালেন। দেখলেন ঠিক সেই ছবি। প্রধান শিক্ষকের ডান দিকে ওঁরা, বাঁ-দিকে আমরা — হ্যাঁ হরিনারায়ণের অনুরাগীরা। রণবীরবাবুরা যার নামকরণ করেছেন 'হরিসাধক'।

আজকাল প্রায় সব সভাতেই এই দৃশ্য দেখা যায়। অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই, থাকা উচিতও নয়। স্কুলের মধ্যে এজাতীয় গোষ্ঠীতন্ত্রের তিনি ঘোর বিরোধী। বহুবার আপত্তি করেছেন, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। কি এক অজানা শক্তির আকর্ষণে দু'পক্ষই দূরত্ব বৃদ্ধিতে যেন মরীয়া। পাহাড় থেকে ভেঙে-পড়া পাথর যেমন সমস্ত আত্মীয়তাকে অস্বীকার করে ছুটে চলে ঠিক সেই রকম। ওরা আড্ডা দেবে একসঙ্গে, দল বেঁধে টিফিনের সময় বাইরে যাবে — ছুটিতে বেড়াতে যাবে, সেখানেও গোষ্ঠীতন্ত্র বিন্দুমাত্র ব্যাহত হবে না। কী আছে বিরোধের কেন্দ্রে?

হরিনারায়ণবাবু মাথা নাড়েন চোখ বুজে। না বামফ্রন্টের পক্ষে এবং বিপক্ষে? ঠিক পুরোপুরি নয়। এ বি টি এ-র পক্ষে-বিপক্ষে? তাও নয় — তিনজন সমিতির সদস্য প্রকাশ্যে মদত দেন রণবীরবাবুকে। আবার নিমাই-এর কথা শুনে চলে এমন দুজন আছেন, যাঁরা দ্বৈত সদস্যপদ নিয়ে থাকেন প্রতিবছর। প্রশ্ন করলে পরিচ্ছন্ন অভিমত

ব্যক্ত করেন না। এইসব মানুষের মনের কথা বোঝার উপায় নেই। এরা যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা করে না। এর নাম নাকি আধুনিকতা। নিজের মনোভাবকে যে যতটা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে সে তত উন্নত শ্রেণির মানুষ — বৌদ্ধিক বিকাশ ছাড়া এটা সম্ভব হয় না। ....রণবীরের দক্ষিণ হস্ত ইংরেজির শিক্ষক মলয়বিলাসের তত্ত্ব এসব.....ওর কোচিং কারখানার মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ....মলয় বলে মনকে নগ্ন করা শরীরের নগ্নতার চেয়েও কুৎসিত....ওটা গ্রাম্যতা। .....না-না, কখনোই না — আমি আপনাদের এ দর্শনকে মানি না.......হরিনারায়ণ দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়তে থাকেন ....সরলতা মানে গ্রাম্যতা — এর নাম মানব সভ্যতার নগরায়ন—আমি মানি না। এই যদি সভ্যতা হয়, তাহলে এ সভ্যতার ধ্বংস কামনা করি আমি......তাহলে আমরা শুরু করি। আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন নাকি ?

প্রধান শিক্ষকের ডাকে মুখ থেকে হাত সরালেন হরিনারায়ণবাবু। কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব। ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, না, তেমন কিছু নয়, আপনি বলুন।

সভাপতির মাধ্যমে সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে আজকের সভা বন্ধ করুন। স্যার, মানে হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায অত্যন্ত অসুস্থ। একটু আগে তিনি ভয়ংকর বমি করছিলেন একতলার বেসিনে —আমি গিয়ে না দাঁড়ালে....সুবোধের কথা শেষ হবার আগেই একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষক নিজের চেয়ার ছেড়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বললেন, আপনার মুখ দেখে আমার প্রথমেই একটা সন্দেহ হয়েছিল। আমি তো ঠিকই করেছিলাম — ইয়ে, রণবীরবাবু তাহলে সভাটা আজকে হচ্ছে না — আপনারা সকলে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন তো ?

অধিকাংশই সম্মতি জানালেন । চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন রণবীরবাবুও। বললেন, আমরা কেউ অমানুষ নই। একজন অসুস্থ মানুষকে আরও অসুস্থ করে তোলার ইচ্ছা আমার নেই।

হরিনারায়ণবাবু একটা পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস নিলেন। রণবীরবাবুর কণ্ঠে যেন একটা সন্ধি ও সহযোগিতার সুর। একথা সত্য হরিনারায়ণবাবু এই সভা চাননি। জীবনে এই প্রথম একটা আপোসকামী মনোভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। আসলে অবসরের আর তিন দিন বাকি। আজ শনিবার, কাল আঠাশ, রবিবার, তারপর উনত্রিশ। ত্রিশ-একত্রিশ। যাবার আগে প্রিয় সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততায় লাঞ্ছিত হোক এটা তিনি চান না। অবশ্য সুজাউদ্দিন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন তার থেকেও সরে আসতে চান না — তবু সার্বিক ঐক্যের স্বার্থে অন্তর থেকে নমনীয় ভূমিকা নিয়ে এসেছেন। রণবীরবাবু এবং তাঁর গোষ্ঠীও এই দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন সুতরাং ধূর্ততার সঙ্গে একটা চাপ সৃষ্টি করে এসেছেন স্টাফ কাউন্সিলের সভা নিয়ে। হরিনারায়ণবাবু অকৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে মুখ তুলতেই রণবীর বললেন, চলুন হরিদা, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি — কি হে নিমাই, ওষুধপত্র কিছু দিয়েছো ?

হ্যাঁ, একটা শুধু এ্যাভিল টোয়েন্টি ফাইভ খাইয়েছি।

হুঁ, — তাই এমন ড্রাউজি দেখছি—যান বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে নিন। সন্ধ্যায় ডাক্তার

দেখাবেন। তারপর প্রধান শিক্ষকের দিকে ঘুরে বললেন, খাতায় আমাদের সকলেরই প্রায় সই হয়ে গেছে সুতরাং এটাকে মুলতুবী সভা ধরে নিতে আইনত কোনো বাধা নেই। তাহলে আগামী মঙ্গলবার আমরা বসি — কী বল মলয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হোক। সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য দুদিন হাতে সময় থাকল। আর একত্রিশ তারিখটা আমরা মধুরেণ সমাপয়েত্ করতে চাই।

হঠাৎ অবাধ্য ছাত্রের মতো লাফিয়ে উঠলেন হরিনারায়ণবাবু। বললেন, সভা আজই হবে — অন্যদিনে নিয়ে গেলে সে সভা আমি বয়কট করব।

'বয়কট' শব্দটার জেদ এবং কর্কশ ধ্বনি পীড়িত করল হরিনারায়ণবাবুর নিজের কানকেই। কিন্তু কিছু তো করার নেই—রাইফেলের গুলির মতো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল শব্দটা।

মুহূর্তের মধ্যে আবার পাল্টে গেল ঘরের পরিবেশ। একের জেদ চোখের পলকে পরিণত হয়ে গেল অনেকের জেদে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রধান শিক্ষক ফিরে গেলেন নিজের চেয়ারে। আরও একটু সময় দিলেন ঘরের ভারী আবহাওয়া যাতে খানিকটা হালকা হয়। তারপর বললেন, বেশ তো তাহলে তাই হোক, আমি শুরু করছি।

প্রথমে যা ঘটেছে সেইটে আমি বলতে চাই। সকলেই আপনারা জানেন। কিন্তু কারও কারও জানায় বেশ কিছু ফাঁক-ফোকর আছে। কেউ কেউ সেই সব ফাঁক নিজের পছন্দমাফিক তথ্যে পূরণ করে নিয়েছেন। এটা ঠিক নয়। যাই হোক ঘটনাটা ঘটেছে এ মাসের আঠারো তারিখে, ক্লাশ টুয়েলভ বি সেকশনে। সময়, সিক্সথ্ পিরিয়ড। রণবীরবাবুর ক্লাশ ছিল— উনি বেশ কয়েক মিনিট পরে গিয়েছিলেন। ঢোকার সময়ই মনিটর সুজাউদ্দীন মণ্ডলের সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটে। সুজা নিজের হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলে — স্যার আপনি প্রায় ষোলো মিনিট লেট। রণবীরবাবু প্রতিবাদ করে বলেন, আট মিনিট — দুটো ঘড়ির কোন্‌টা সঠিক তাই নিয়ে বিতর্ক বাধে। অন্যান্য ছাত্ররাও এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। রণবীরবাবু চেয়ারে বসার পরও এই বিতর্ক থামা তো দূরের কথা, আরও বেড়ে যায় এবং ঘড়ির সময় ছেড়ে অন্য দিকে মোড় নেয়। সুজার একটা শব্দ অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অশালীন বলে মনে করেন রণবীরবাবু। আমিও ছেলেদের কাছে অন্যদিন প্রশ্ন করে জেনেছি শব্দটা সুজা ব্যবহার করেছিল। বলেছিল — স্যার আমি সত্যি কথাটা বলেছি বলে আপনি মেনে নিতে পারছেন না — খচে যাচ্ছেন। রণবীরবাবু ওকে অশালীন শব্দ ব্যবহার না করে ভদ্রলোকের ছেলেদের মতো ভাষা ব্যবহার করতে বলেন। এমন সময় অন্য একটি ছাত্র—তার নাম সুমন, রোল এইট — উঠে দাঁড়িয়ে বলে — স্যার 'খচে' ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দ। এটা অসমাপিকা ক্রিয়া। ধ্বন্যাত্মক শব্দ খচখচ-এর এসেছে। হরিনারায়ণ স্যার আলোচনা করতে গিয়ে একথাটা একদিন বলেছেন। হঠাৎ মাঝখানে হরিনারায়ণবাবুর প্রসঙ্গ ওঠায় রণবীরবাবু উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন......

আই অবজেক্ট — আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি আপনার কথায়। রণবীরবাবুর প্রবল চিৎকারে সকলে চমকে উঠলেন। .... প্রধান শিক্ষক থতমত খেয়ে বললেন, কিসের আপত্তি? আমি তো ঘটনাটা বলছি।

না মাস্টারমশাই, আপনি ঘটনার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। আপনি তা পারেন না এবং দেবেন না। হরিবাবুর প্রসঙ্গ ওঠাতেই আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম এটা আপনার ইন্টারপ্রিটেশন — ইট ইজ নট ফ্যাক্ট — আমি ভিন্ন কোনো কারণে কিংবা আরও আগে থেকেই উত্তেজিত হয়ে থাকতে পারি।

প্রধান শিক্ষকমশাই কেমন যেন একটু দমে গেলেন। তারপর বললেন, ঘটনার ব্যাখ্যাটাও তো ঘটনাসাপেক্ষ, বিষয় বহির্ভূত কিছু নয়। যাক সে কথা। আমার কথা শেষ হোক তারপর যা বলার আপনি বলবেন। হ্যাঁ — যা বলছিলাম। রণবীরবাবু প্লাট্‌ফর্ম থেকে নেমে সুজার সামনে গিয়ে বলেন — তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম আমি দেরি করে ক্লাশে এসেছি, সে জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে? উত্তরে সুজা বলে -- আবার আপনি আমার কথা বিকৃত করছেন। আমি শুধু .....সুজার কথা শেষ হবার আগেই তার বাঁ গালে একটা চড় মারেন। বেশ জোরেই মেরেছিলেন রণবীরবাবু। তারপর ফিরে গিয়ে ক্লাশ শুরু করতে যাচ্ছিলেন — এমন সময় সুজা উঠে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড জোরে নিজের ডান গালে নিজেই একটা চড় মারে। ঘটনার অবিশ্বাস্যতায় এবং আকস্মিকতায় চমকে ওঠে গোটা ক্লাশ। রণবীর দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করেন সুজাকে — কী ব্যাপার! সুজা বলে — আপনি আমাকে অন্যায়ভাবে মেরেছেন তাই ওটা ফিরিয়ে দিলাম।

রণবীরবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে যান। সেদিন উনি আমাকে কিছু বলেননি। কিন্তু ছুটির পর টুয়েলভ্ কমার্স আমাকে এসে সব কথা বলে। সত্যি কথা বলতে কি সুজার ডান দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম। নিজের গালে নিজে যে কেউ এমন করে মারতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন — পরিষ্কার চারটে আঙুলের ছাপ মাংস কেটে বসে গিয়েছিল। তারপর এই ক'দিনে যা ঘটেছে এবং ঘটছে আপনারা সবাই জানেন। এখন আপনারা বলুন সুজার এই আচরণ আত্মনিগ্রহমূলক একটা স্যাডিস্ট বিহেভিয়ার না শিক্ষকের প্রতি কানিং মিসবিহেভ — কীভাবে বিবেচনা করা হবে। তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, নিলেই বা কি শাস্তি তাকে দেওয়া হবে। আমি আশা করব এবং আবেদন করব আপনারা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ ঘটনাটা অত্যন্ত অনভিপ্রেতভাবে অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। আমার প্রতি মুহূর্ত আতঙ্কে কাটছে এই বুঝি টিভি চ্যানেল ছুটে এল কিংবা সংবাদপত্রে আমরা ঠাঁই পেয়ে গেলাম।

কথাটা প্রধান শিক্ষক অযৌক্তিক কিছু বলেননি। কয়েকজন বিশেষ করে, ঘটনাটা নিয়ে তিল থেকে তাল করেও তৃপ্তি পাচ্ছেন না। প্রথম দুদিন অন্তত সবাই খুব সাধারণভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করেছিলেন। সুজার কান্ডটা বেশ চমকপ্রদ এমনই সকলে বলেছেন। রণবীরবাবু অমন করে চড়টা না মারলেই পারতেন এমন কথাও উঠেছে। পরদিন রণবীরবাবু নিজেও বলেছেন —সুজার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে তাঁর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা লঘু পাপে গুরুদন্ড হয়েছে। তবু দিন তিনেক পর কে বা কারা চাউর করে দিল — সুজা অশিক্ষিত মুসলমান বাড়ির ছেলে, তার কাছ থেকে মার্জিত ব্যবহার আশা করা বাতুলতা। মুসলমানরা উদ্ধত, অমার্জিত এবং বেপরোয়া — এই বার্তা রটে গেল ছেলেদের মধ্যে বিশেষ করে উঁচু ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে। সেখান

থেকে অভিভাবকদের ভেতরে সে গুজব প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল টিচার্স টেবিলে। সুজা নাকি রণবীরবাবুকে 'খচ্চর' বলেছে।

বিষয়টা প্রথম কানে আসার পর হরিনারায়ণবাবু অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। আসলে বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হলেন নিজের প্রতি। জীবন নামক যাত্রাপালার চার অঙ্ক তো শেষ হয়ে গেল অথচ নিজের স্বদেশ, সমাজ এবং স্বজনদের স্বভাব তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। এদেশে গুজব ছড়ায় বিদ্যুতের থেকে দ্রুতগতিতে। এখানে বিশ্বাসের জন্য কোনো তথ্য কিংবা যুক্তির দরকার পড়ে না। কোথায় থাকে এই ভয়ঙ্কর শক্তি। পথে-ঘাটে, সভায়-সমিতিতে যে মানুষ দেখি সে মুখে তো খুঁজে পাওয়া যায় না একে।

বায়োলজির শিক্ষক রমেশবাবু বলেন — ওরা গর্তের সাপের মতো জীবচক্ষুর আড়ালে থাকে, ওরা কুন্ডলী পাকিয়ে বসে থাকে সাম্প্রদায়িক অহংকারের গর্তে। খোঁচা খেলেই ওরা ......

তাহলে রণবীরবাবু আপনার কি বলার আছে এবার বলুন।

প্রধান শিক্ষকের কথায় ঘোর কাটল হরিনারায়ণবাবুর। তিনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ? চোখের পাতাগুলো আঠার মতো আটকে যাচ্ছে। সময়ে স্নায়ুকে চাবুক মেরে সোজা হয়ে বসলেন হরিনারায়ণবাবু। লক্ষ করলেন রণবীরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গোষ্ঠীর সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন ঃ আপনি যা ঘটেনি তা যেমন বলেছেন, তেমনই যা ঘটেছে তাও সবটা বলেননি।

— যেমন

—যেমন, সুজা দ্বিতীয়বার আমাকে ঘড়ি দেখাবার সময় ডান হাতটা মুঠো করে প্রায় আমার নাকের সামনে নিয়ে এসেছিল। এই আচরণটা অনেক কথা বলে। আমি দেরি করে ক্লাশে গিয়েছিলাম এটা সত্য। আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম, স্বীকার করছি। কিন্তু কতকগুলো ছোট ছোট ঘটনা অনিবার্য কার্যকরণ সূত্রে গ্রথিত হয়ে একটা বড় ঘটনা সৃষ্টি করে এটাও বোঝা দরকার......।

রণবীরবাবুর কথায় বাধা দিয়ে প্রধান শিক্ষক বললেন ঃ হ্যাঁ, সুজাউদ্দীনের ঘড়ি দেখানোর কথাটা আপনি আগেও বলেছিলেন। ক্লাশে অনুসন্ধানের সময় এই প্রশ্নটা আমি রেখেছিলাম ; সেখানে প্রায় সমস্ত ছাত্র নিরপেক্ষ ছিল — তারা বলে তারা কিছু দেখেনি। চার-পাঁচজন আপনার অভিযোগ সমর্থন করেছে, আবার সমসংখ্যক বিরোধিতাও করেছে। এরকম অবস্থায় আমি কি সিদ্ধান্ত করব বলুন ?

হঠাৎ রমেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ স্যার, আমার একখান কথা আছে।

— বলুন

যে চার-পাঁচজন রণবীরবাবুকে সমর্থন দিচ্ছে তারা সকলেই মলয়বিলাসবাবুর ইয়ে মানে কোচিং-এর ছাত্র — কথাডা ঠিক কি না ?

—হ্যাঁ ঠিক।

—ঠিক কি বেঠিক সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

—না এটাই বাস্তব, একশো ভাগ বাস্তব।

—আমরা তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি — প্রতিবাদ করছি।

—কোচিং সেন্টারের প্রশ্ন তুলে ঘটনাকে ডাইলুট করে দেবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত.......

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের হট্টগোলে সভা গুলজার হয়ে উঠল। দুপক্ষের মন্তব্যে, ব্যক্তিগত আক্রমণে, চিৎকার-চেঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রধান শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : এরকম চললে আমিই সভা ছেড়ে চলে যাব। আবার অনুরোধ করছি দয়া করে আপনারা চুপ করে বসুন। হরিনারায়ণবাবু আপনি আপনার প্রস্তাব রাখুন। অন্য কোনো প্রসঙ্গ এ সভায় আলোচিত হবে না। সংক্ষেপে বলবেন।

হরিনারায়ণবাবুকে সুযোগ না দিয়ে নিমাই বলল : আমরা শুনেছি রণবীরবাবুরা আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন যে চিঠির ভিত্তিতে আপনি জরুরি সভা ডেকেছেন। চিঠিটা আমরা শুনতে চাই।

আমি দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত — প্রধান শিক্ষকের অনুতপ্ত কন্ঠ শুনতে কারও ভুল হলো না।

চিঠিটা প্রথমেই আমার পড়ে দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, চিঠিটা লিখেছেন মলয়বিলাসবাবু। সই করেছেন আরও দশজন। ওঁরা লিখেছেন—আমি মোদ্দা কথাটা বলছি — প্রথম দাবি, দুর্বিনীত আচরণের জন্য সুজাউদ্দীন মন্ডলকে রণবীরবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দ্বিতীয় দাবি, রণবীরবাবুসহ আরও কযেকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোচিং, টিউশন ইত্যাদি 'মিথ্যা' অভিযোগ তুলে তাঁদের চরিত্রহনন করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আর শেষ দাবি, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে স্টাফ কাউন্সিলের সভা না ডাকলে ২৯.০৭.২০০২ তারিখ থেকে তাঁরা ক্লাশ বযকট করতে বাধ্য হবেন— মলয়বাবু ঠিক বলেছি তো? ঠিক আছে বলুন আপনি।

হরিনারায়ণবাবুর মনে হতে লাগল হঠাৎ তাঁর শরীরের ওজন কযেকগুণ বেড়ে গেছে। চেয়ারের দুটো হাতলে ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সংক্ষেপেই বলব — বেশি কথা বলার সামর্থ আমার নেই। তবে দু-একটা পুরনো কথা স্মরণ না করলেই নয়। সুজাউদ্দীন মন্ডল ফাইভ থেকে এই স্কুলে পড়ছে। মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছে। সে ভালো ফুটবল খেলে। সে জেলা রিপ্রেজেন্ট করেছে এই স্কুলে। অলস্কোয়ার ছাত্র হিসেবে দুবার পুরস্কার পেয়েছে। চড়া গলায় কড়া শব্দ ব্যবহারের বদ অভ্যাস তার আছে তবু সে এই স্কুলের সম্পদ। মাধ্যমিকে ইংরেজিতে সে লেটার পেয়েছে অথচ টেস্টে মলয়বাবুর হাতে সে পায় চল্লিশ। এ নিযে সে সময় বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্র এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয় খাতা আবার দেখার জন্য। তখন কথা উঠেছিল সুজার নেতৃত্বে কিছু ছাত্র স্কুলের বাইরে একটা ছাত্র সম্মেলনে মলয় বিলাস বাবুর কোচিং সেন্টার সম্পর্কে অপমানজনক কিছু মন্তব্য করার জন্যই সুজার এই পরিণতি.....

মিথ্যা কথা — মিথ্যা কথা — লাফ দিয়ে উঠল মলয়বিলাস। .....না আমি চুপ করব না। প্রসঙ্গ যখন উঠেছে আমাকে বলতে দিতে হবে। আমার কোনো কোচিং সেন্টার নেই — আছে আমার স্ত্রী এবং ভাই-এর। এহ বাহ্য। ক্লাশ টেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুজাকে আমি বিনা বেতনে পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলাম — কী উত্তর দিয়েছিল সুজা সেদিন? সে কথাগুলো উঠছে না কেন?

— না-না, সেসব কথা এখন থাক।

— কিন্তু আমরা শুনতে চাই — মলয় বলো তুমি।

সেদিন এগজ্যাক্টলি সে যা বলেছিল তাই বলছি। সুজা বলেছিল, স্যার আপনি খুব ভালো ইংরেজি জানেন এবং পড়ান কিন্তু আপনার থেকেও ভালো ইংরেজি জানেন এবং পড়ান এমন শিক্ষক অনেক আছেন — আমার প্রতি করুণা দেখানোর জন্য আপনাকে আমার প্রণাম। .....কিন্তু আমাকে পড়াতে চান আমার জন্য না আপনার কোচিং-এর গুডউইল বাড়ানোর জন্য? আমি আমার শিক্ষকবন্ধুদের কাছে জানতে চাই সুজার এই আচরণ কি শোভন? কেউ কি সেদিন পিছন থেকে সুজার পিঠ চাপড়ে দেননি?

—আমার কথা যদি কও তাইলে কইতে পারি কথাখান সত্য, কিন্তু অপ্রিয় সত্য। আর আমাগো মুনি-ঋষিরা কন অপ্রিয় সত্যম মা বদঃ।

আঃ প্লিজ স্টপ ইট....। প্রধান শিক্ষক চা খাওয়ার শূন্য গ্লাসটা দিয়ে নিজের অজান্তে টেবিল ঠুকতে লাগলেন।

—মাস্টারমশাই আপনি আপনার প্রস্তাব রাখুন।

—আমার প্রথম প্রস্তাব সুজা ক্ষমা চাইবে না, কারণ সে ক্লাশের মনিটর হিসেবে তার কর্তব্য পালন করেছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব রণবীর দুঃখ প্রকাশ করুক সুজার কাছে। যদি সেটা মর্যাদায় আঘাত করে, তাহলে এখানে আমাদের সামনে ক্ষমা চান। এটা আমার প্রস্তাব — সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এই সভার এবং আপনার। আমার শেষ কথা ......কথাটা কিভাবে গুছিয়ে প্রকাশ করব বুঝে উঠতে পারছি না..........তবু বলি রণবীরবাবুর লেট করে ক্লাশে যাওয়া, নিজের গালে সুজার চড় মারা কিংবা এই ঘটনা ঘটছে অন্যত্র। আপনার রিপোর্ট অনুসারে অধিকাংশ নয়, আট-দশজন বাদে ক্লাশের প্রায় সব ছাত্র নীরব ছিল— এই নীরবতায় আমি এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। — হ্যাঁ, এটা আমার বলতে পারেন একান্তই ব্যক্তিগত প্রতীতি। অন্যের সঙ্গে নাও মিলতে পারে।

রণবীরবাবুকে ঘড়ি দেখাবার সময় ঠিক কি ঘটেছিল তা নিয়ে আমরা ধন্দে থাকতে পারি, কিন্তু ছেলেরা তো সব দেখেছিল তবু তারা চুপ করে থাকল। আরও একটা নিবিড় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ছাত্রই তাদের অভিভাবকদের পরামর্শে এই কাজ করেছে। এটা একটা সুপরিকল্পিত আচরণ। সত্য কথা বললে শিক্ষকদের এক অংশ বিরূপ হবেন, আবার মিথ্যা বললে অন্য অংশ। অতএব দরকার কি ঝামেলায় মাথা গলিয়ে। সবাইকে অনুরোধ, একবার ভেবে দেখুন তো, এর নাম নিরপেক্ষতা! না —এর নাম স্বার্থপরতা, এর নাম আত্মকেন্দ্রিক সুবিধাবাদ। ভয়ের সঙ্গে সুবিধাবাদের এমন মিলন একদিনে একজনের দ্বারা তো হয়নি। আমরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি শিক্ষার প্রতি শিক্ষকের দায়বদ্ধতার ব্যাভিচার ঘটছে না? আমরা কি উচ্চ কণ্ঠে বলতে পারি সামাজিক নৈতিকতার সুরক্ষার প্রশ্নে আমরা ভাবের ঘরে চুরি করছি না? এটা কেবল আমাদের স্কুলের সমস্যা নয়, কমবেশি সব স্কুলের এবং শিক্ষকরাই এই সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য ষোলো আনা দায়ী তাও বলছি না — এর পিছনে .....

—ব্যাস! রচনা গরু খুঁজে পেয়েছে। এবার আসবে বুশ-বিশ্বায়ন-নয়া সংস্কৃতির বিশ্ব

অভিযান — হঠাৎ করে মলয়বিলাসের বাধাদানে হরিনারায়ণবাবু চুপ করে গেলেও অন্যরা সরব হয়ে উঠল। কিন্তু সভাপতি নয় আবার একটা প্যান্ডেমনিয়াম বন্ধ করে দিলেন এবার রণবীরবাবু। বললেন : হরিবাবু এসব কথা আজ থাক অন্যদিন শুনব। তারপর প্রধান শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি সকলের কাছে দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্ষমা চাইছি কিন্তু তার দ্বিতীয় প্রস্তাব তো এখন কেমন করে কার্যকরী হবে বুঝে উঠতে পারছি না। কারণ সুজা তো আজই আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে।

সুজা ক্ষমা চেয়ে গেছে। ঘরে যেন বাজ পড়ল এমন ভাবে চমকে উঠল সুবোধ।

শুধু সুজা নয় তার মাকেও নিয়ে এসেছিল। মা করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে গেছে। কিছু মনে করো না সুব্রতবাবু। তোমরা রাজনীতির সিঁড়ি ভাঙার অঙ্কের পথে চল। একটা স্টেপ ভুল হলে তারপর না পার এগোতে, না পার পিছিয়ে আসতে। সময় থাকতে সতর্ক হও নইলে সুজারা তোমাদের আরও বড়ো দুঃখের কারণ হবে — তোমাদের মুখে কালি মাখাবে।

প্রধান শিক্ষক এক মুহূর্ত সময় দিলেন না। বললেন : ঠিক আছে, তবু সোমবার সুজাকে আমি ডাকব। আমার সামনে আপনিও তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করবেন। সভার কাজ আমি এখানে শেষ করলাম। সভা ভঙ্গ হলো।

সেই যে দুহাতের কনুই-এ ভর দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকেছিলেন হরিনারায়ণবাবু প্রায় ঘণ্টাখানেক সেইভাবেই রইলেন। তখন প্রায় ছ-টা। কিন্তু ঘরের ভেতরে মনে হলো যেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আসলে আকাশটা এসময় এরকম ঘন মেঘে ঢাকা থাকার জন্য আলো বড় ম্লান।

সকলে চলে গেলেও সুবোধ, নিমাই যায়নি। ছিল সম্ভবত আশেপাশেই। এবার কাছে এসে বলল: স্যার এবার তো আমাদের যেতে হয়। আর সুজারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে — আপনি কি কিছু বলবেন।

হরিনারায়ণবাবু হাত নামালেন। নির্মল, শান্ত অনাবিল দৃষ্টিতে তাকালেন সুজার দিকে। সুজার সঙ্গে আরও অনেকে এসেছে। মনে হচ্ছে বাইরেও আছে অনেকে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুজা বলল : স্যার আপনাদের সভার সব কথা শুনেছি — বিশ্বাস করুন, আমি ক্ষমা চাইনি........

পুলকিত বিস্ময়ে তির তির করে কেঁপে উঠল হরিনারায়ণবাবুর চোখের তারা।

সুজা বলল : আপনি তো জানেন স্যার আমার বাবা নেই, মামাদের সাহায্যে সংসার চলে। গত দুদিন মলয় স্যাররা দল বেঁধে মামাদের ভয় দেখিয়েছে — নানাভাবে মায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। অনেক কিছু ঘটেছে স্যার ....সেসব অনেক কথা.....আপনাদের আমি বলিনি। মা জোর করে আজ স্কুলে এসেছে........স্যার আমি — আপনি বলুন, আমি কি অন্যায় করেছি?.........আমি — আমরা স্যার ছাড়ব না .....সোমবার আমরা........

না সুজা, না। তোরা কিছু করিস না — অন্তত এই ক'টা দিন........

হরিনারায়ণবাবু অত্যন্ত শক্ত মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাঁর কোনো সহকর্মী কিংবা ছাত্র এই প্রথম তাঁকে কাঁদতে দেখল। □

লজ্জা

শ চী ন   দা শ

চিৎকারটা কি হচ্ছে এখনও ? নাকি শব্দটা থেমে গেল ? থামল, না নতুন করে শুরু হওয়ার আগে আবারও একটি প্রস্তুতিপর্ব। ঠিক যেভাবে সকালের দিকে হইহই করতে করতে এসে পড়েছিল ওরা। পরনে হাফপ্যান্ট। সাদা। গায়ে টি-শার্ট। কপালে সবারই প্রায় কাপড়ের ফেট্টি। হল্লা করতে করতে, আক্রোশে ফুলতে ফুলতে, উন্মত্ত ও ভয়ংকর একটা ঢেউয়ের মতোই এসে আছড়ে পড়েছিল ওদের মহল্লায়। এবং এরপরেই সেই নারকীয় উল্লাস। ছুরি হাতে, লোহার রড নিয়ে, তলোয়ার উঁচিয়ে মকাইয়ের ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়া দলবদ্ধ পঙ্গপালের মতো। প্রায় লাফিয়েই নেমেছিল ওদের ঘরবাড়ির ওপরে। নেমেই এরপর দরজা ভাঙা, ঘরে আগুন লাগানো এবং ঘর থেকে বেরোতে না দিয়ে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা। কিংবা মেয়েদের টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এসে জোর করে জামা কাপড় খুলেই এরপর সেই লজ্জাজনক ঘটনাটি। একের পর এক অনেকের ওপরেই, ঠিক যেভাবে আচমকা ঢুকে রেশমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওরা। শুধু রেশমা কেন, ঝাঁপিয়ে ছিল ফরিদার ওপর, টেনে নিয়ে গিয়েছিল হামিদাকে। আর সোফিয়াকে তো ধরল ওরা দুজনে, তারপর চর্চর করে ওর সালোয়ার কামিজটা ছিঁড়ে, টেনে খুলে, ওর পা দুটো ধরে উল্টে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল বাইরের চাতালটার কাছে। এবং এরপর ওকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে পরপর ওই দুজনে মিলে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল না সোফিয়ার দেহটা। রেশমা ওই সময়েই সুযোগটা নিয়েছিল ; জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তাঁর ছুঁড়ে ফেলা দেহটাকে কোনোরকমে টেনে তুলেই সবার অলক্ষে একটা দেওয়ালের পাশে চলে গিয়েছিল। এরপর একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে যেতে প্রায় হঠাৎই দৌড়। আর কীভাবে যে তারপর প্রায় একনিঃশ্বাসে দৌড়ে এখানে একে এই ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, তা নিজেও জানে না রেশমা। জানল এখন, এই এতক্ষণে ঝোপের ভেতরে বসে, চারিদিকে তাকাতে তাকাতে।

রেশমা চমকে উঠল।

কোথায় কী একটা শব্দ হল ! ঠিক যেন শুকনো পাতার ওপর কিছু একটা এসে পড়ল। পড়ল, না লাফিয়ে কেউ নামল গাছ থেকে। মানুষ না জানোয়ার। শেয়াল হতে পারে। কিংবা ভাম। হয়তো পোড়া মাংসের গন্ধে সাবরমতীর ওপাশ থেকে ধূর্ত পায়ে এগিয়ে এসেছে। নাকি গিধ্বর ! আসমান থেকে লাফিয়ে নেমেছে নিঃশব্দে। হয়তো

গন্ধ পেয়েছে পোড়া মাংসের। গন্ধ পেল, না আকাশ থেকেই লক্ষ করেছে ওকে। কিন্তু দেখল কী করে? চারপাশে যা কাঁটা ঝোপ। গুল্মলতা। লতার গায়ে পোকামাকড় আর অন্ধকার। সে অন্ধকারে কীটপতঙ্গ ও মচ্ছর। ঘুরছে ফিরছে; বিনবিনিয়ে উড়ছে। কিন্তু উড়লেও প্রায় পাথরের মতোই রেশমা। নড়বে যে তারও উপায় নেই। একে ঝোপঝাড়, গায়ে অনবরত কাঁটায় খোঁচা, তার ওপর শরীরের এখানে ওখানে পোড়া মাংসের দহন ও নিম্নাঙ্গে নাভিপ্রদেশ থেকে আরও খানিকটা নীচে যৌনাঙ্গের চারপাশে তীব্র এক যন্ত্রণার বিবক্রিয়া। যন্ত্রণা যত না, তার চেয়ে ভীষণ এক লজ্জার অনুভূতি। কেন কিনা, এই মুহূর্তে আর কোনো পরিধেয় নেই তার শরীরে। সাতসাতটা শকুনে ঠুকরে-ঠাকরে, কামড়ে-খুবলে, টেনে-হিঁচড়ে শেষ সুতোটাও তুলে নিয়েছে তার অঙ্গ থেকে। ফলে বস্ত্রমুক্ত এখন রেশমা এবং তার বছর পনেরর রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ দেহটা কাঁটাগুল্মের অন্তরালে, সবার অলক্ষে। বেরোবে যে সে চিন্তাও করেছে না। বরং ভয়; ভয় ও আতঙ্ক ওই চিৎকারের শব্দে। কেননা চিৎকারটা এখনো অতিশয় স্পষ্ট এবং এতটা দূর থেকেও। মাঝে মাঝে অবশ্য ভেসে আসছে, আচমকা এক-একসময়, এরপরেই আবার নিশ্চুপ, নিথর। কী জানি বলা যায় না, হঠাৎ করে আবার এদিকেও এসে পড়তে পারে। আসার অবশ্য কথা নয়, কেননা নির্জন নদীতীর, কোনো মহল্লাও নেই এদিকে, কেবল জঙ্গল, জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। তবু খবরটা পেলে হয়তো এদিকেও ছুটে আসতে পারে। রেশমা তাই স্থির, নড়ছেও না এখন ঝোপের ভেতরে। তবে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। ওপরে এবং আকাশের দিকে। এই আকাশেই বিকেলের রং নেমে এলে, পূবের দিকে ছায়া ঘনালে ও ছায়াটি প্রলম্বিত হতে হতে একসময় হারিয়ে গেলে তারপরেই অন্ধকার। আর ওই অন্ধকারেই একসময় বেরোবে, ভেবেছে সে। কিন্তু বেরিয়ে? কোথায় যাবে ও। কোনদিকে। ভাবছিল রেশমা। এবং ওই সময়েই আবারও ওই শব্দটা। কিন্তু এবার আর 'ঝুপ' করে নয়, যেন চাপা একটা পায়ের শব্দ। শুকনো পাতার গায়ে চেপে বসে আসার মতো। তবে কি টের পেয়ে গেল ওরা! নাকি দেখে ফেলেছে কেউ! হয়তো শেষ মুহূর্তে কারো চোখে পড়েছে, ভর দুপুরে আগুনের লেলিহান শিখার প্রান্ত থেকে উঠে কোনো রকমে পালাচ্ছে একটি উলঙ্গ শরীর।

সাবধানে, সতর্ক চোখজোড়া একবার পেছনে রাখে রেশমা। কিন্তু পুরোপুরি আর ঘাড় ঘোরাতে পারে না। না পারার কারণ তার এই শরীর। আর শরীরটা যেহেতু উন্মুক্ত, তার নিরাভরণ ধবধবে দুই হাত তাই বুকের ওপরে। আড়াআড়িভাবে স্তনদুটিকে আড়াল করা এবং ততোধিক আড়ালে তার দুই উরুর মধ্যবর্তী অংশটি। ফলে দেখতে আর পারল না কিছু; তবে অনুমানে বুঝল শব্দটা এবারে ঠিক তার পাশেই। কিন্তু ঝোপের ভেতরে যে ঠিক কোথায় তা আর বুঝতে পারল না রেশমা। না পেরে আতঙ্কে সে এখন নিথর প্রায়। তবে ভাবলও আবার, বোধহয় মানুষ নয়। মানুষ হলে তার উপস্থিতি কি এত নিঃসাড়ে হয়!

ভাবছিল এসবই। এই সময়ে হঠাৎই ডানা ঝাপটানোর শব্দ একটা। এবং শব্দটা

যেন উড়ল। আর উড়ে এসে রেশমার সামনে দিয়ে চকিতবেগে সরে যেতেই রেশমা দেখল দুটো মুরগা। পালা বেঁধে একে অন্যের পেছনে এসে লেগেছে। ঝাঁপাচ্ছে তাই। আবার গোপনপায়ে লুকিয়েও ফেলছে নিজেকে। লুকিয়েই ঝোপঝাড়ের এখানে-ওখানে, পা টিপে টিপে এগোচ্ছে।

রেশমা হাঁপ ফেলে ; যাক, তাহলে ওদের কেউ নয়। মুরগি দুটোই ঘুরছে ঝোপের ভেতরে। শুকনো পাতার ওপর ; তাই অমন মৃদু খুচখাচ, থেকে থেকে একটা শব্দ উঠছিল।

রেশমা চোখ তোলে। আর তুলতেই চোখে পড়ে, কেমন একটা ঘন ছায়া। ওই ছায়ার ভেতরে যেন অস্পষ্ট কিছু সূর্যাস্তের আলো। আলোটা কমছে, কমে আসছে আস্তে আস্তে। রেশমা নড়েচড়ে বসে একটু। তাকায় আবারও ঘনঘন, আকাশের দিকে।

এবং আরও পরে, আকাশের আলো নিভে এলে, চারপাশে যখন গভীর অন্ধকার, ঝিঁঝি ডাকছে, জোনাকি উড়ছে, ঠিক সেসময়ে আস্তে আস্তে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে রেশমা। বেরিয়েই এপাশে ওপাশে তাকায়। কিন্তু তাহলেও ঠিক ঠাহর পায় না। কেউ কি দেখছে ওকে। নাকি নিজেকে নিয়ে ওর নিজেরই লজ্জা। রেশমা উঠে দাঁড়ায়। উঠেই পায়ে পায়ে এগোতে থাকে। কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। একটা চাপা জ্বলুনি যেন শরীরের চারপাশে। হালকা বাতাসে পোড়া চামড়ায় যেন টান ধরেছে। সেই সঙ্গে দুই উরুর মাঝখানের জায়গাটায় তীব্র এক যন্ত্রণার অনুভূতি। রেশমা চোখ রাখে সন্তর্পণে। এরপর আবারও পা ফেলে। কিন্তু এগোতে গিয়েও পারে না। পায়ের পাতায় কোথায়ও যেন জড়তা এসে যায়। অথচ দুপুরের ওই সময়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে দগ্ধ, ধর্ষিত ও উলঙ্গ দেহটা নিয়ে সে যে কী করে এখান চলে এসেছিল সেটা ভেবেই অবাক এখন। অবাক এই জন্য যে এমন শরীর নিয়ে বেরিয়ে সে এল কী করে, বেরিয়ে কী করেই বা এতটা রাস্তা পার হল দিনের আলোয় : তখন লজ্জা হয়নি ? অথবা সংকোচ ! সম্ভবত লজ্জা বা সংকোচের কোনাটার কথাই আর মনে ছিল না তখন। থাকার অবশ্য কথাও নয় ; কেননা প্রাণভয়ে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তখন যে যেভাবে পেরেছে দৌড়ুচ্ছে।

রেশমা পা বাড়ায়। সন্তর্পণে আবার হাঁটতে থাকে। এবং যতটা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে, রাতের অন্ধকারে। না লুকোলে কে যে কখন দেখে ফেলে ! অবশ্য দেখবেই বা কে ! এদিকে আর কোনো জনপ্রাণী আছে নাকি ? মহল্লার পর মহল্লা পুড়ে তো ছাই। মরেও তো গেছে অনেকে। মরেছে নয়, মেরে ফেলা হয়েছে। ঘরদোরে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে, টেনে টেনে যাকে যে মন পেয়েছে আগুনে ঠেলে দিয়েছে। বুক থেকে গলার কাছাকাছি কান্না একটা ঠেলে ওঠে রেশমার। কিন্তু কাঁদতে আর পারে না। উদ্‌গত কান্নাকে চেপে রাখে শব্দের ভয়ে ; কেননা কাঁদলেই তো শব্দ এসে যাবে, ভাষা এসে যাবে। রেশমা পা ফেলে সাবধানে। মাঝে মধ্যে দাঁড়ায় ও দাঁড়িয়ে দূরে

তাদের মহল্লা খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না সেসব। সবই কেমন ঝাপসা, তাল তাল অন্ধকারে ঢাকা। অথচ কালও ওখানে কত আলো, কত হইচই আর কথাবার্তা। টিভি চলছে। সিনেমা হচ্ছে। মহল্লায় মহল্লায় কারো কারো ঘরে হাসি, কোথায়ও বা কোনো বাচ্চার কান্না। আবার রাত একটু বাড়লে, বা নির্জনে যখন চলে যাচ্ছে রাতটি, ঠিক সে-সময়ে সাবরমতী থেকে ভেসে আসা কোনো বাঁশির সুর। মৃদু হাওয়ায় সে সুর যেন হারিয়ে যাচ্ছিল কোন দিগন্তে। বুঝতে তবু পারেনি রেশমা! শুধু রেশমা কেন, এ-মহল্লার কেউ কি ধরতে পেরেছিল? বুঝেছিল কি, এমন কিছু এটা ঘটতে চলেছে। তবে না বুঝলেও, আব্বা বোধহয় অনুমান করেছিল কিছু। মনে মনে বোধহয় খানিকটা আন্দাজও করেছিল। তাই একটু দুশ্চিন্তায়ও ছিল সে এবং আম্মার ভেতরেও সে ভাবনাটা একসময় চারিয়ে দিয়েছিল।

নাহ্, অবস্থা কিন্তু ভালো বুঝছি না নাসিমা বিবি...আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে—

ভয়! ভয় কীসের? নাসিমা অবাক। রেশমাকে সামনে বসিয়ে তার দুই হাতের তালুতে মেহেন্দি করছিল যত্ন নিয়ে। আব্বার কথায় মুখ না তুলেই অবাক হল।

ততক্ষণে আবার সরব হয়েছে আব্বা। হলেও তার গলায় চাপা স্বর। উদবেগ ও উৎকণ্ঠায় মেশানো।

কী জানি, বাজারে সব ফিসফাস আলোচনা আর চাপা চাহনি। কেউ কারও সঙ্গে দিলখুলে বাতচিত্ত করছে না। আমার এতকালের বন্ধু কেশুভাই...কথা বলতে গেলাম...কিন্তু সে কেমন এড়িয়ে গেল।

কিন্তু তা তো হওয়ার কথা নয়—

নীচু হয়ে হাতের তালুর ওপর কোণ চেপে রং বের করে আলপনার ডিজাইন তুলতে তুলতেই উত্তরটা দিল নাসিমা, এতদিনের ঘনিষ্ঠতা...একসঙ্গে পড়াশোনা করেছ, গল্পগুজব করেছ তা সে কেন এমন করবে! ও তুমি ভুল দেখেছ।

ভুল হলেই ভালো।

বুক থেকে গভীর একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল ইরফানের। ইরফান আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। এবং এরপরেই সোজা আবার দোকানের দিকে। পরে দোকান থেকে ফিরলে, একটু রাতের দিকে নাসিমাই আবার তুলেছিল প্রসঙ্গটা।

কী হল, দেখা হল এবেলা—কেশুভাইয়ের সঙ্গে?

নাহ্। কেন বল তো? ইরফান অবাক।

নাসিমা মাথা নাড়ল, এমনিই। সকালে বলেছিলে তো...

যা বলেছিলাম ও-বেলা তা এখনও বলছি নাসিমা। আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভালো লাগছে না! কিছু একটা হচ্ছে কোথায়ও যা আমাদের অজানা। সেই যে কথায় আছে না, চেহরা মন কা আয়না হো। মুখই হল মনের আয়না...।

কেন, একথা বলছ কেন? নাসিমার স্বরেও এবার যেন কোথায়ও একটা অস্বস্তি। এ জীবনে সে-ও তো কম দেখল না, যতই তার বয়স পঁয়ত্রিশ হোক।

ইরফান ঠোঁট ওলটায়, বললাম মানুষের মনের ভাষাটা পড়তে পারছি বলে। তাছাড়া কত নতুন নতুন যে লোক ঢুকে পড়েছে শহরে—

তারা কারা! আর তাদের নিয়ে তোমারই বা কেন এত শোচ্না!

হাতে সরবতের একটা গেলাস ছিল। ইরফানের দিকে এগিয়ে দিতেই ইরফান সেটা এক চুমুকে শেষ করল। পরে গেলাসটা রেখেই নাসিমার দিকে চোখ তুলল আস্তে আস্তে।

ভাবছি কী আর এমনি এমনি নাসিমা। মন বলছে আবারও একটা দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা হচ্ছে এখানে—

দাঙ্গা! হায় আল্লা। কী বলছ কী তুমি?

ঠিকই বলছি বিবি। তুমি মিলিয়ে নিয়ো। কম দিন তো হল না এই শহরে। প্রায় চারপুরুষ।

কিন্তু—

নাসিমা কী ভেবেই আবার বলে সঙ্গে সঙ্গে, পাড়াপড়শিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তো কিছু বুঝতে পারছি না। ওই তো রঙ্গার মা, হরিচরণের মা-বাবা, শিউভাই, নলিনীভাই রোজই আসতে যেতে দেখা হয় ওদের সঙ্গে। বিকেলেও তো রঙ্গার মা-র সঙ্গে দাঁড়িয়ে কত কথা। কিন্তু—

মুখ গম্ভীর করেছিল ইরফান। পরে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল, সেটাই তো ধরতে পারছি না। তবে ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে তো ডরাবেই।

বলে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ইরফান। মহল্লা পার হয়ে একসময় বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেছিল। অন্ধকারে মুখ তুলে ছেলেবেলার অভ্যেসের মতো, আকাশের তারা গোনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। একটা গুনতে গিয়েই দেখে তার পাশে আর একটা, সেটা ধরতে গিয়েই দেখে তারও পাশে আরও একটা ফুটে উঠেছে। অনন্ত সীমাহীন আকাশে অজস্র নক্ষত্রমালা। ফলে কত আর গুনবে। কিন্তু গুনতে না পারলেও রাশি রাশি ওই নক্ষত্রের মাঝে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়ছিল কত কথা। সেই কবে এসেছে এখানে, কবে যে ঠিক মনে নেই এখন আর। তার পূর্বপুরুষের একজন এসেছিল প্রথমে প্রাচীন খাম্বাজ শহরে। সোনারুপোর বাসন বিক্রি করত সে। প্রায় তিনশ বছর আগে খাম্বাজ শহরে আসবাবপত্র বা থালাবাসন বলতে কিছুই ছিল না। শহরের অভিজাত বাসিন্দাদের পছন্দ ছিল সোনা বা রুপোর তৈরি থালা। তাতেই তাদের আহার ছিল। পূর্বপুরুষ নাদির আমল গ্রামে ঘুরে ঘুরে নিপুণ কারিগরদের ধরে তাদের দিয়ে ওই সব থালা বাসন তৈরি করিয়ে আনত। এনে শহরের একপাশে দোকান সাজিয়ে সেগুলি বিক্রি করত। এতে ব্যবসায়ী হিসেবে তার নামযশ যেমন হয়েছিল, তেমনি পয়সাও করেছিল সে। ক্রমে শহরের মাঝামাঝি মাহি নদীর পাড়ে বাড়িও একটা তৈরি করে সে। পাথর আর চুন-সুরকির গাঁথনির ওপর সুদৃশ্য টালির ছাদ, দেওয়ালের গায়ে কারুকার্য, সামনে দাঁড়

করানো ঘোড়ায় টানা গাড়ি। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েন, গুর্জরের প্রজাদের বিদ্রোহ, পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও পরে পরেই ইংরেজ বণিকদের শহর দখল নেওয়ার চেষ্টায় খাম্বাজ শহরটি তার কৌলিন্য হারাতে থাকে। ফলে পূর্বপুরুষ নাদির আলমও খাম্বাজ ফেলে চলে আসে আহমাবাদ এবং তারও পরে আর একটু পিছিয়ে শাহপুর। এই শাহপুরেই ইরফানের জন্ম। শুধু ইরফান কেন, ইরফানের আব্বাজান, তারও আব্বার জন্ম এই শাহপুরে। পূর্বপুরুষ ছিল ব্যবসায়ী। ঘাড়ে করে করে কাপড়ে বেঁধে বাসনকোসন বিক্রি শুরু করেছিল ; ফলে বারে বার উচ্ছেদ ও বসতি স্থাপনেও রক্তের সেই নেশাটি তার যায়নি এবং তাই শুধু নয়, উত্তরকালের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও সেই বৃত্তির বীজটি সে বপন করে দিয়েছিল। এবং সেই সূত্রেই বংশপরম্পরায় তারা ব্যবসায়ী। কিন্তু হলেও ব্যবসা করতে করতেই ইরফানের বাবা গিয়াসুদ্দিন জড়িয়ে পড়েছিল দেশের আজাদির লড়াইয়ে। বাপুর সঙ্গে সত্যাগ্রহেই প্রথম তার হাতেখড়ি। তারপর মিছিল মিটিং আইন-অমান্য। ইংরেজ তুমি দেশ ছাড়ো। এ দেশ আমার, আমাদের। এই দেশই আমার মাতা। মেরি মা। তুমি তাকে দখল করে রাখতে পাবো না। কাজেই হটো। হট যাও।

শাহপুরে বড়ো একটা মুদি দোকান দিয়েছিল ইরফানের দাদা ইজ্জাজ। ইজ্জাজুদ্দিন। বড়ো ছেলে গিয়াসুদ্দিন দোকানে বসতে বসতে মাঝেমধ্যে যে উধাও হয়ে যেত, সে খবরটা জানত। কিন্তু কোথায় যে যেত সেটা বুঝতে পারত না প্রথম প্রথম। ভেবেছিল, বা ভাবত, লেড়কা তার বড় হয়েছে, অমন যৌবন তার শরীরে, হয়তো কোথাও কোনো লেড়কিকে দিল দিয়েছে। তাই অমন উদাস দৃষ্টি। থেকে থেকে কী যে ভাবে, কী যে করে, কাজে যেন মন নেই তার। এর চেয়ে সাদি দিলে বোধহয় শান্ত হবে ছেলেটা। কাজকর্মেও মন দেবে। এমনই ভাবনাচিন্তায় যখন ইরফানের দাদা ইরফানের দাদির সঙ্গে নানা শলাপরামর্শ করছে সেই সময়েই একদিন, প্রায় হঠাৎই ধূমকেতুর মতো একটা খবর। লেড়কা তার ধরা পড়েছে। ধরেছে একটা মিছিল থেকে। ইংরেজ সিপাই। অতএব জেল। এবং জেলেই আছে সে বিনা বিচারে।

দাদা তো স্তম্ভিত। এই কিনা তার প্রেম!

শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে ফেলেছিল দাদা। এবং এরপর আর কোনোদিনই ছেলের বিষয়ে মাথা ঘামায়নি। ভাবেওনি তাকে নিয়ে

ইরফান মুখ নামায়। নক্ষত্রমালা থেকে মুখ নামিয়েই আবার হাঁটতে থাকে। আজ ক'দিন ধরে দিনের দিকে খরখরে একটা গরম পড়লেও হালকা বাতাসে রাতে আবার সিরসিরেভাব। গায়ে লাগলে বেশ আরামই লাগে।

কিন্তু আরাম লাগছিল না ইরফানের। মাথায় কোথায়ও একটা অস্বস্তি। আর অস্বস্তিটা যেন একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। এবং সেই সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন ভয়। ভয়টা এই জন্যে যে, কোথায়ও কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু সেটা আর ঠিক বুঝতে বা ধরতে পারছে না সে। এই শহরে ওদের এতকালের বসবাস, ওর নিজেরও

পঞ্চাশ হয়ে গেল প্রায়। এই পঞ্চাশবছরে ও নিজেও তো শহরটাকে চিনেছে নিজের হাতের তালুর মতোই। দাঙ্গা দেখেছে। দুর্ভিক্ষ দেখেছে। দেখেছে খরা ও বন্যায় মানুষকে অবহেলায় মরতে। তবু সে সময়টাকে একরকম বুঝত। কিন্তু এখন—! এখন যেন সবকিছু তার বোধের বাইরে। কারা এরা! এবং এই সমস্ত অচেনা মুখ। আজ ক'দিন ধরেই শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এক একটা অটোয় আসছে, যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাজারে দোকানে, দোকানের গোপন কামরায়, চুপচাপ-ফিসফাস আলোচনা। কী আলোচনা করছে এরা!

অনেকটা এগিয়েও আবার ফিরতে থাকে ইরফান। মাথার ভেতরে তখনো হিজিবিজি নানা ভাবনা। ভাবনার সুতোগুলো যেন জড়িয়ে জড়িযে মাথাব ভেতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। জড়িয়ে আরও যাচ্ছিল টুকরো টুকরো, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নানারকম চাপা সংলাপে : ইয়ে দেশ তুম্‌হারা নেহী, তোমাদের নয়। এখানে থাকতে বলে আমাদের কথা শুনতে হবে। আমাদের মতো করে চলতে হবে...সামঝা—!

চাপা একটা স্বর। চাপা, অথচ ক্রুর। কেটে কেটে, ভাঙা গলায কেউ যেন কাকে বলছিল কিছু। কিন্তু বললেও পালটা উত্তর কিছু শোনেনি। না শুনলেও, না-শোনা কথাটা যেন গভীর কোনো খাদে পড়ে আবার ওপরে ওঠার জন্য ছটফট করছিল। কিন্তু উঠতে তাকে আর দেওয়া হযনি। চাপে রেখে, চাপেব মধ্যেই খাদের অতলে কোথায়ও সবিযে দিযেছিল। সরালেও কথাটা উঠে এসেছে বারবার, সেই যেমন আগেও এসেছিল একসময, দেশভাগের ঠিক পরে পরেই, গিযাসুদ্দিনের কাছে। কিন্তু অবাক হয়নি গিযাসুদ্দিন। জানত, বা অনুভব করেছিল সে, যে বিষ ঢুকছে একবার জাতির শরীরে, কোনো দাওয়াই বেরোয়নি এখনও সে বিষকে শরীরমুক্ত করতে। বরং তীব্র বিষক্রিয়ায় আস্তে আস্তে ওই শরীরেই ধরবে একদিন পচন ; তারপর তার এখানে ওখানে কেটেছেটে তাকে ব্যবচ্ছেদ করা ছাড়া উপায থাকবে না আর।

চাপে পড়লেও তাই যায়নি গিযাসুদ্দিন। নড়েনি এই মাটি থেকে। কেননা এই মাটিতেই ঘুমিয়ে আছে তার পূর্বপুরুষেরা। এই মাটির সম্মানেই সে আজাদির লড়াইযে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একদিন। কাজেই সে কেন যাবে এই মাটি ছেড়ে। যায়নি তাই গিয়াসুদ্দিন। ছেলেদেরও তাই বুঝিযেছিল সে। ভাইদেরও একান্তে বলেছিল। কিন্তু ভাইরা মানেনি সে কথা। দেশভাগের পরে পরে, দাঙ্গার ভেতরেই ছেড়েছিল তারা দেশ। এবং করাচিতে তারাই এখন মুজাহিদ।

ইরফান থমকে দাঁড়ায়। কে দাঁড়িযে আছে ওখানে! মহল্লার ভেতরে ঢুকতে গিয়েই ইরফান আবিষ্কার করে নাসিমা। নামিসার পেছনে যেন রেশমাও দাঁড়িয়ে আছে।

কোথায় গিয়েছিলে তুমি...ইত্‌নি রাত হুয়ি—

ইরফান হাসে একটু।

রাত কাঁহা! চলো অন্দরমে—

ভেতরে এসেছিল ইরফান। কিন্তু এলেও ঠিক স্বাভাবিক হয়নি। কী যেন ভাবতে

ভাবতে, ভাবনার ভেতরেই একসময় সে নিঝুম হয়ে পড়েছিল। ধরতে তবু পারেনি। পারল পরেরদিন, সকাল ন-টায়, হঠাৎই একটা চিৎকারে। চিৎকার কেন?

ইরফান দৌড়ুল। চটপট ঘরের বাইরে এসেই ছাদের সিঁড়িটা ধরল ; কিন্তু সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠতেই ভীষণ চমক। বাইরে রাস্তার ওপারে অন্তত এক-দেড়শ সশস্ত্র লোক। ভোজালি আর তরোয়াল উঁচিয়ে দৌড়ে আসছে। সেই সঙ্গে পাথুরে বৃষ্টি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে এদিকে। উড়তে উড়তে শার্সিতে পড়ছে, ছাদে ভাঙছে এবং মহল্লার বাড়িগুলোর গায়েও অনবরত, অবিরত ছোঁড়া তীরের মতো, প্রচণ্ড গতিতে উড়ে এসে ছিটকে যাচ্ছে।

দেরি আর করেনি ইরফান। যেমন দৌড়ে উঠেছিল ঠিক তেমনিই আবার তরতর করে নেমে এসেই হুঁশিয়ারি। কিন্তু তারও বুঝি সময় পেল না ; তার আগেই ওই সশস্ত্র দলটি জলস্রোতের মতো বিশাল একটা ঢেউ তুলেই তীব্র শব্দে আছড়ে পড়েছে মহল্লার ভেতরে। এরপর জায়গায় জায়গায় ঢেলেছে পেট্রল, পেট্রল আর কেরোসিন এবং তারপরেই বারুদের স্ফুলিঙ্গ একটা ; স্ফুলিঙ্গ উঠতেই দাউ দাউ আগুন, আগুনের দামাল শিখা, দপ্ করে জ্বলে উঠেই ছড়িয়ে পড়েছিল সারা মহল্লায়। সেই সঙ্গে একটা নারকীয় উল্লাস : 'কাটো...কাটো ইন্ লোগকো...জ্বালা দেয়ো ইয়ে সব মোকান, আওর কোঠি!'

তা জ্বালিয়ে দিয়েছিল মুহূর্তেই এবং তখনই রেশমার চিৎকার। আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল রেশমা। চমকে উঠেছিল এই দেখে যে, তার আব্বা ইরফানের ঘাড়ে, প্রায় পিঠের ওপর থেকে আচমকা একটা তলোয়ারের কোপ এসে পড়ল এবং কোপটা ফেলেই রক্তাক্ত দেহটাকে লোহার রডে খুঁচিয়ে কেউ ফেলে দিল আগুনের ভেতরে ; বাধা দিতে এসেছিল নাসিমা। মুহূর্তে তুলে তাকেও, মুখ চেপে বস্ত্রমুক্ত করে, অশ্লীল চিৎকারে দেহটি ছেড়ে দিল তিন কিশোরের হাতে। বলাবাহুল্য এরপর আর দেখারও সময় পায়নি রেশমা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টের পেয়েছিল, রোমশ ঘন কুচকুচে দুটি কালো থ্যাবড়া হাত, তুলে নিয়ে ওকে, প্রায় ছুঁড়েই দিল পৃথুল দুই বয়স্কের কোলে। এবং এরপরেই ওই দুই শকুনে মিলে ছিঁড়ে খুবলে তৃপ্তিতে খেয়েছে ওকে, অনেকটা সময় ধরে। আর তারপরেই ওই আগুনে নিক্ষেপ। কিন্তু কী করে যে বেঁচে গেল রেশমা!

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে পড়ে রেশমা। পেছনে একবার তাকায় ; আবার সামনেও চোখ ফিরিয়ে আনে। ওই তো, ওই দূরেই বোধহয় ওদের মহল্লা। ধোঁয়া উঠছে কি এখনো ওই অন্ধকারে, ধ্বংসস্তূপ থেকে? নাকি আগুন জ্বলছে এখনও ধিকি ধিকি! প্রাণের সাড়া আছে কি! এবং আম্মা? আম্মা কোথায়! আর সাকিল? ঘরে আগুন লাগাবার পরেও তো ছোটোভাইটা ঘরেই ছিল। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল না সে! তপ্ত আগুনের আঁচে মেঝের টাইলসগুলো গরম হয়ে ওঠায় আতঙ্কে ছোটাছুটি করছিল না সাকিল?

রেশমা গলা উঁচু করে, তাকায়। দূরে কি একটা আলো দেখা যাচ্ছে? আলোটা কি এদিকে আসছে? চটপট একটা গাছের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নেয় রেশমা। আড়ালে থেকে লক্ষ করে। কিন্তু আলোর হদিস আর পায় না সে। না পেয়েই রেশমা আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, সন্তর্পণে হাঁটতে থাকে।

যদিও এটা নদীতীর, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় ও বড়ো বড়ো বৃক্ষেরা দাঁড়িয়ে আছে, তবুও রাস্তা একটা আছে এখানে। কাঁচা হলেও এ-রাস্তায় বয়েল গাড়ি চলে। লোকজনের যাতায়াতও পাওয়া যায়। সাইকেল যাত্রীও থাকে মাঝেমাঝে। কিন্তু সকালের ওই ঘটনায় রাস্তাটি এখন এদিকে নির্জন ; শুধু মাঝেমধ্যে দু-একটা কুকুরের ডাক, দূর থেকে যেন ভেসে আসছে।

ভয় হয় রেশমার। যদি একবার কুকুরে দেখে ফেলে তবে আর ছাড়বে না ওকে। তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। অন্ধকারেই আশেপাশে তাকায় রেশমা। এরপর আবার পা ফেলে। কী করবে, কোথায় যাবে বুঝতে না পেরে আন্দাজে মহল্লার দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু শরীর দিচ্ছে না, থেকে থেকে যেন পা দুটো ভেঙে আসছে। হাঁটুর জোড় যেন খুলে যাবে এখুনি। বরং গলাও শুকিয়ে কাঠ। একটু পানি পেলে হত। পানির আগেও দরকার এক টুকরো কাপড়া। বুকের ওপরে হাতদুটো তুলে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে রেশমা।

কৌন— !

রেশমা জড়সড়ো। কে যেন দাঁড়িয়ে না ওখানে?

কৌন হুঁ— ? অস্ফুট গলায় কোনোরকমে বলেই একটা হাত নামিয়ে দেয় সে নীচের দিকে। নাভিপ্রদেশর আরও নীচে। এতে ওর দেহ বিভঙ্গাটি অদ্ভুত হয়, হলেও লজ্জা তো ঢাকে খানিকটা। কিন্তু ঢাকলেও ভয় পায় রেশমা। কে ও! নারী না পুরুষ? ঘন অন্ধকারে ঠিক বোঝা না গেলেও অনুমানে টের পায়, নারীই হবে এবং তারই মতো উন্মুক্ত শরীরে ; কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন ওখানে? তবে কি ওদেরই মহল্লার কেউ?

রেশমা মুখ তোলে। কিন্তু তুলতেই অবাক। কেউ তো নেই। তবে একটু আগে যে দেখল ওখানে! তাহলে কি ভুল দেখল ও! ভুলই হবে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারেনি রেশমা। এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে বিভঙ্গাটি পালটে সাবধানে এগিয়ে যায় রেশমা। আর এগোতেই একটু পরে মহল্লার মুখে।

কিন্তু চিনেও যেন ঠিক চিনতে পারে না রেশমা। এ কোথায় এল! এ কোন্ জায়গা? কোথায় সেই ঘরবাড়ি? কোথায় সেই হাসি-কান্না আর আলো! জায়গাটা যেন গোরস্থানের মতো স্মৃতিসৌধ নিয়ে পড়ে আছে।

অন্ধকারে, ভাঙা-পোড়া, দগ্ধ ও অর্ধদগ্ধ ঘরবাড়িগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়ে রেশমা। এটা কাদের মোকান। সামনে পোড়া ভাঙা দরজা। নীচে কালো পোড়া জল-থকথকে জঞ্জাল। হয়তো পরে আগ নেভানেওয়ালারা এসে পানি ঢেলে ঢেলে আগুন নিভিয়েছে। রেশমার চোখজোড়া আচমকা জ্বলে ওঠে এবং তারপরেই চোখ বেয়ে হু হু

করে কান্না। কিন্তু পানি নেই যেন সে কান্নায়। কান্নাটা যেন বুক থেকে গলা বেয়ে উঠে গলার মাঝামাঝি কোথায়ও আটকে যাচ্ছে।

রেশমা জায়গাটা পার হয়। পার হতেই এবার সে চিনতে পারে। ওই তো, ওই বড়ো ইউক্যালিপটাস গাছের পাশেই তাদের বাড়ি। ওই তো দরজাটা। তবে পাল্লাটা পুড়ে গিয়ে ভাঙা, ভেঙে নীচে পড়ে আছে। কিন্তু ওরই পাশে ওটা কী? রেশমা একটু তাকিয়ে বুঝল স্কুটার একটা। পোড়ানো হয়েছে সম্ভবত। সম্ভবত এই কারণে যে, একে অন্ধকার তার ওপর নীচে জল থইথই ; ফলে ঠিকমতো দেখতে আর পারছিল না সে। তবু আন্দাজ মতো আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে রেশমা। ঢুকেই এপাশে ওপাশে চোখ রাখে। খুঁজলে ঘরের কোথায়ও কি সালোয়ার কামিজ পাওয়া যাবে না দুএকটা। ওর কিংবা মা-র? কিংবা মা-র কোনো শাড়ি! অন্ধকারে পা বাড়ায় রেশমা। কিন্তু বাড়ালেও দাঁড়িয়ে পড়ে একসময়। যদিও পানি দিয়ে আগ নেভানো হয়েছে তবুও ভেতরে একটা গুমোট গরম। সেইসঙ্গে পোড়া জিনিসের গন্ধ একটা। ছপ ছপ, করে জলে পায়ের পাতা ভিজিয়ে এগোয় রেশমা। কিন্তু কিছু নেই। কোথায়ও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

চুপ করে অন্ধকারেই থমকে দাঁড়ায় আবার রেশমা। আর দাঁড়াতেই চমকে ওঠে। এই তো সেই জায়গাটা। এখানে এসে দাঁড়াতেই তো আব্বার ঘাড়ে তরোয়ালের কোপটা নেমে এসেছিল। আর তখনই আগুন লাগিয়েছিল না ঘরে? এবং এই আগুনেই তো ছুঁড়ে ফেলেছিল ওরা আব্বাকে। কিন্তু আম্মা? আম্মা কোথায়! আম্মা কি বেঁচে আছে কোথাও! বুক থেকে, গলা বেয়ে, কণ্ঠনিঃসৃত একটা কষ্ট যেন পাক খাচ্ছে আবারও রেশমার চারপাশে। কিন্তু কান্না নেই তবুও কোথায়ও। চোখ ফেটে ঝাপসা হয়ে এলেও পানি নেই একফোঁটাও চোখে। রেশমা হাত বাড়ায়। হাত বাড়িয়েই দেওয়াল ধরে। আর ধরতেই বিস্ময়। আবারও সেই ছায়ামূর্তি।

কে! কে ওখানে? রেশমা সচকিত। ভয়ে দু-পা যেন পিছিয়েই আসে। কৌন হ্যায়?

চুপ করে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে রেশমা। কিছু একটা যেন সরে গেল না সামনে থেকে! কোনো মানুষ কি? নারী না পুরুষ! একটু আগে মহল্লার বাইরে এ-রকমই কাউকে যেন দেখেছিল রেশমা!

কৌন হ্যায় তুম?

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে রেশমা। কিন্তু নিজের গলা নিজের কাছেই যেন দূরের বলে মনে হয়। রেশমা অন্ধকারেই দৃষ্টি সূচালো করার চেষ্টা করে। কে? কৌন হ্যায়—!

ম্যায় কুলসুম।

কুলসুম!

হ্যাঁ!...তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, আমি কিন্তু তোমাকে চিনি—

চেন?

হ্যাঁ।

কী করে চিনলে?

তোমার মতো আমিও এক টুকরো কাপড় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে...

পঞ্চাশ বছর!

হ্যাঁ। কেননা তোমার মতো আমি দাঙ্গার শিকার। আমাকেও রেপ করে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়।

তাহলে!

সাড়া দেয় না কুলসম। রেশমা তাকায়। চাপা স্বরে ডাকে একবার কুলসুমকে। কিন্তু রা নেই কুলসুমের। রেশমা আবার ডাকে। আবারও। আর ঠিক তখুনি অন্ধকারে পোড়া মহল্লা কাঁপিয়ে একটা গাড়ির শব্দ। একটা ট্রাক যেন এসে থামল। তারপরেই ঝুপঝাপ ভারী পায়ের শব্দ।

লাও ভাই, দেখো অন্দরমে...কই মুর্দা হায় তো ওঠা দেয়ো ট্রাক মে...

রেশমা স্তব্ধ। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে তার। আর সেই অবস্থায় একটু পিছিয়ে আসে সে। একটা ভাঙা দরজার আড়ালে চট করে ঢুকে যায়। এবং ঢুকতেই দু-তিনটে আলোর রেখা। আড়াআড়ি ঘুরতে ঘুরতে মহল্লা পার হয়, পার হতে থাকে। হতে হতে একসময় ভারী বুটের শব্দগুলো মিলিয়ে যেতেই এবার দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে রেশমা। বেরিয়েই নিচু হয়। প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই এগোতে থাকে। কেন কিনা, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে পোড়া জঞ্জালের স্তূপের ভেতরে যেন এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া দেখেছে রেশমা। কিন্তু যেমন চকিতে দেখেছে তেমনই চকিতেই আবার হারিয়ে গেছে কাপড়ের টুকরোটা। তবে হারালেও রেশমা হাত বাড়ায় আন্দাজে। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজতে থাকে। খুঁজতেই থাকে। □

জমানা

দে ব দ ত্ত রা য়

অনেকদিন দেখা সাক্ষাত হচ্ছে না। ক-দিন ধরেই মামাবাবু ভাবছিলেন হীরেনের সঙ্গে একটু দেখা করে আসবেন। কী হল কে জানে। শরীর-টরীর কেমন আছে তাইবা কে জানে? ইদানিং মেজাটাও হীরুর বিগড়ে যাচ্ছে। কথায় যেন বেশি উচ্চকণ্ঠ। দেখাই যাক গিযে একটু।

সময় পেয়েই চলে এলেন দেখা করতে। সকালে বেড়ানোর অভ্যাস। ঘণ্টাখানেক ফাঁকা মাঠে বড়ো ট্যাংকের পাশে রোজই আসেন। সুগারটা বেড়েছে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ, সকাল বিকাল ঘন্টাখানেক করে পায়ে হাঁটুন। ওষুধেব চেয়ে বেশি কাজ হবে। উন্নতি হবে।

উন্নতিটুন্নতি বুঝতে পারছেন না, তবে পরামর্শটা মেনে নিযেছেন। অক্ষরে অক্ষরে। হঠাৎ সকালেই হীরুর কথা মনে হল। বেড়াতে বেড়াতে।

ফেরার পথে একটু ডান দিকে বেঁকে গেলেই ঠাকুরপাড়া। বেশ বড়োসড়ো পাড়া। অনেকে বলে বড়োপাড়া। উলটোদিকে একটা পাড়া আছে। সেটা ছোটোপাড়া। একটা বড়ো একটা ছোট—এইভাবেই চিহ্নিত আর কি।

হীরেন নতুন বাড়ি করেছে? ছোটোখাটো হলেও সম্পন্ন। ছিমছাম। একটু তো শৌখীন-শৌখীন বটেই।

কলিংবেলটা টিপলেন মামাবাবু। আওযাজটা বেশ মিষ্টি। মনে হল যেন পাখি ডাকছে। ঘনঘন।

বেরুতে একটু দেরিই হল। হীরুর। তার মানে এখনও ঘুম ভাঙেনি। হয়তো ছুটির দিন বলেই।

চটিতে পা গলিয়ে ল্যাছড়াতে ল্যাছড়াতে এসে ছিটখিনি খুলল। শব্দ পেলেন মামাবাবু। তারপরও মনে হল তালা খুলছে। ভেতরে তালাও তাহলে দিতে হয।

সময়ের চেয়ে একটু দেরিই হল। দরজা খুলেই অবাক, আরে, মামাবাবু! হঠাৎ এত সকালে?

—সকাল? মামাবাবু একটু ভাঁজ ফেলেন কপালে। আটটা বেজে গেল। আর তুই বলছিস এত সকাল?

মাথা চুলকোয় হীরু, না মানে, এখন উঠতে উঠতে দেরিই হয়ে যায়। আসুন। ভেতরে আসুন। আসলে, একটু লাজলাজ গলায় বলে, আপনার বউমা? একটা বদ অভ্যাস করে ফেলেছে। রাত করে ছবি দ্যাখে। আর টি.ভি. তো এখন সবই গিলে

ফেলেছে। সময়ও।

— ঠিকই বলেছিস। তো রোজ রাতেই সিনেমা দ্যাখে শিবি?

— হ্যাঁ। সঙ্গে আমিও বসে পড়ি আরকি। কেমন নেশার মতো। দেখব না দেখব না ইচ্ছে করলেও ঠিক আফিং গিলে ফেলি।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন মামাবাবু। ঠিকই বলেছিস, সবটাই যন্ত্রটা গিলে ফেলছেরে। এটা তোর বাইরের ঘর? এইখেনেই বসি! কেন যে বলে দূরদর্শন বুঝিনে। আমি তো বলি হৃদ্যাদর্শন। বসছি।

— না, না, আপনি ভেতরে চলুন। ভেতরের ঘরে বসে কথাবার্তা হবে। বাব্বোব্বা! কতদিন পর এলেন! বাইরে বসে হয়। ঝাড় তো কপালে আছে বুঝতেই পারছি। আসুন আমার সঙ্গে।

ততক্ষণে শিবানী উঠে পড়েছে। একটু-আধটু গুছিয়ে-টুছিয়ে উঁকি দিয়ে ডাকে, আসুন মামাবাবু, কতদিন পর দেখছি!

— হ্যাঁ প্রায় বছরখানেক হবে। বিছানায় ছেলেটা তখন শুয়ে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বলেন, এটা ওঠেনি এখনও? খুব জ্বালা না?

—সে আর বলবেন না। কে বলবে তিন বছরের। যেমন টরটরে তেমনি পাকাপাকা কথা, এখানটায় বসুন। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, বেশ ক্ষোভের সঙ্গে, দ্যাখো রেণুদি এখনও আসেনি। দিনে দিনেই দেরি করছে। সব পড়ে আছে কিচেনে।

রেণু কাজের লোক মামাবাবু বুঝতে পারলেন। ঘরটার চারদিকে দেওয়ালে ছাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, রেখেছিস নাকি এখন?

—কী করব বলুন? এক হাতে নয় সব? রাখতেই হল। কিন্তু ওই নামেই রাখা। দেখছেন তো এখনও পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারল না। প্রত্যেক রোববারে রোববারে আবার ছুটি!

মামাবাবু উঠে ছেলেটার নাকটা টিপে দিলেন। মাথায় হাত বুলালেন, দ্যাখ নাকটা ঠিক হীরুর মতোই হয়েছে। একটাতেই সময় পাচ্ছিস না। আরেকটা এলে কী হবে? সত্যিই নাকটা— হীরেন যেন অসাধারণ সমর্থন পেল। অভিজ্ঞতার, দক্ষতার মতামত। সুতরাং মামাকে শেষ করতে না দিয়েই দারুন খুশি হয়ে শিবানীকে লক্ষ করে বলে উঠল, কী হল এবার! সেদিন তোমার বন্ধুরা তো খুব গ্যাস গিয়ে গেল, নাকটা ঠিক তোর মতো হয়েছে। খুব নাচছিলেন না। এখন? মামাবাবুর মতো লোক কী বলছেন!

শিবানী ঝাঁঝাতে যাচ্ছিল। মামাবাবুই থামিয়ে দিলেন, সকাল সকাল কী করছিস বলদিনি? নে, যা, তোদের দুজনের মতোই হয়েছে নাকটা। এবার হল তো। নে, এবার একটু চা কর। বেড়িয়ে-টেরিয়ে বাড়িতে ঢুকেই এক কাপ চা না পেলে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করে। কর এক কাপ চা! কালো, মানে শুধু লিকার। নো চিনি। বয়স তো। ঠিক ধরে ফেলেছে।

ততক্ষণে রেণু একটু দ্রুতই ঘরে ঢুকে একেবারে হেসেলের দিকে পা চালালো,

শিবানী ভুরু কুঁচকে বলে ওঠে, আজও তোমার দেরি রেণুদি। দ্যাখো তো এদিকে বাড়িতে লোক এসে বসে আছেন। একটু চা দিতে পারছিনা।

'লোক' কথাটা মামাবাবুর কান এড়াল না। কিন্তু কিছু বললেন না। মুহূর্তের মধ্যে মনে হযেছিল মামাবাবুর বলেন যে এবার উঠি। কিন্তু সামলে নিয়ে সামনে পড়ে থাকা টেলিগ্রাফের গ্রাফিটিটা তুলে নিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতেও নজরে পড়ল রেণুর জিভ কাটা অস্বস্তির প্রতি। মামাবাবু চোখ তোলেন, এই তোদের কাজের লোক?

মাথা নাড়ে হীরেন. অকাজেরও বলতে পারেন। কিন্তু উপায় নেই। এখন এরাই ডাণ্ডা ঘোরাচ্ছে। একটু গলা চড়ালে দিব্বি পাছাটি দেখিয়ে কেটে পড়বে। তারপর বোঝ ঠ্যালা! আমাদের রেণুদি অবশ্য অতটা না। একটু ইযেটিযে আছে। একেবারে চোখ উল্টে দিতে পারেনা। বলতে বলতেই চোখ যায বিছানার দিকে। ছেলে বুবুন উঠে বসেছে। বসে-বসেই হিস করে দিলে। পরক্ষণেই অচেনা মামাবাবুকে দেখে মুখ ঘুরিযে নিল বুবুন।

হাসতে হাসতে হীরেন বলে ওঠে, ইস্ ইস্ দিলি তো দাদার সামনেই হিসু করে। না, না লজ্জা করতে হবেনা। দাদু হয।

মামাবাবুও বাচ্চাটার লজ্জা লজ্জা চোখ আড়াল করা দেখে হেসে ফেলেন। বাহ্ বেশ মিষ্টি হযেছে তো ছেলেটা! এসো, এসো দাদুভাই, আমার কাছে উঠে এসো। হাঁটতে পারে তো? কী নাম রেখেছিস?

— হ্যাঁ তিন বছর হযে গেল। হাঁটতে পারবে না? রীতিমতো ছোটাছুটি। ওকে সামলানোই তো দায। কখন যে কী করবে তার ঠিক নেই। এটা ভাঙছে, ওটা ছুড়ছে। ওর মাই ডাকনাম রেখেছে। বুবুন।

— বুবুন! বেশ নাম তো।

—পরে একটা ভালোনাম রাখব। ভাবছি কে.জি-তে দিযে দেব। এখন থেকেই। অভ্যাসটা ভালো হবে। ওর মা-ও কিছুক্ষণ রেহাই পাবে। বাংলাগুলোতে তো আজকাল পড়া হচ্ছেনা। শুধু টাকার হিসেব। এই ফাঁকে শিবানী ফ্রিজ থেকে ডিশে গোটা দুই কলাকাঁদ এনে হীরেনকে চোখের ইশারায টি. টেবিল টেনে দিতে বলে।

ডিশটা শিবানী মামাবাবুর সামনে রাখতেই হেসে ওঠেন মামাবাবু, না-না নারে মা। এসব আর চলছে না। রক্তে চিনির মাত্রা আড়াইশর ওপর! এখন তো মিঠাই আমার কাছে বিষ রে।

—সে কি একটা অন্ততঃ। আমি টোষ্ট করে দিচ্ছি চায়ের সঙ্গে।

— না ওসব কিচ্ছুনা। তুই বরঞ্চ দিবি তো বাটিতে খানিকটে মুড়ি দে। অল্প একটু তেল মেখে দে। তা হলেই অমৃত খাদ্য আমার!

—মুড়ি। চমকে ওঠে শিবানী। মনে মনে ভাবে, যা বাবা এমন বেমক্কা ধাক্কায় পড়ে যাবে যেন ভাবতেই পারে না। হীরুরও সেই অবস্থা। দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে হীরু বলে, ঠিক আছে আমি এনে দিচ্ছি। একছুটে এক্ষুনি।

ততক্ষণে চা টোস্টটা দাও! মামাবাবু চোখ তোলেন। দুজনের অপ্রস্তুত ভাব দেখে নিজেও কিছুটা বিব্রত, বলেন, তালে এমনিতেই দে-না। ওই এক মুড়ি হলে একটু যুতসই হয় আর কি।

আমতা আমতা করে হীরু, আসলে এসব পাট তো প্রায় উঠেই গ্যাছে মামা। ঘরে আর আনিনা। শিবানীও খায়না। পছন্দ করে না। বুবুনটাও হয়েছে তেমনি। আমিও প্রায় ভুলে গেছি। এখন ওই ট্রেনে গেলে শখ করে ঝালমুড়ি হয়তো খাইটাই। ঘরে যে আনব, এমনকি রেণুদিও বলে আমাকে রুটিই দিয়ো গো বউদিমণি।

হীরুর অস্বস্তি বুঝতে পারেন মামাবাবু। সামাল দেবার জন্যে বলেন, না-না, এটা যে তোর ঘরে একা তা নয়। দিনকে দিন আমরা কেমন যেন স্বজাতিচ্যুত হয়ে পড়ছি। এখনতো সব দখল করে ফেলেছে ফার্স্ট ফুড। চাও নুডল ম্যাগি-পিজা। এসব না হলে কি প্রেস্টিজ থাকে! কেমন খানিক বোকার মতো হাসে হীরেন। মাথা চুলকোয়, পুচকেটা তো চাও পেলে আর কিছু খেতে চায় না। এমন বদ অভ্যাস হয়েছে ভাত পর্যন্ত খেতে চায় না। সবসময় বলবে, চাও দাও চাও। দুধ তো খাওয়ানোই যায় না। হয় কমপ্ল্যান নয়তো মাইলো।

রেণু ততক্ষণে দুপিস টোস্ট আর চা নিয়ে হাজির। ট্রেটা টেবিলে নামাতে নামাতে বলে, চিনিটা আলাদা রেখেছি। কতটা খান জানিনে তো।

মামাবাবু হেসে ওঠেন, সকাল সকাল কী ভদ্রতাই না শুরু করেছ গো তোমরা। সিরিফ এককাপ কালো চা, তাও বিনা চিনিতেই যথেষ্ট!

এইফাঁকে শিবানী বুবুনের ভেজা প্যান্ট-ট্যান্ট ছাড়িয়ে বেসিনের ধারে নিয়ে আসে। চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে কিছুটা ছাফাটাফা করে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। মামাবাবুর দিকে দেখিয়ে ছদ্ম অভিযোগে বলে, বুবুন কই তুমি তো দাদুকে গুডমর্ণিং করলে না এখনও। ঘুম থেকে উঠে কাউকে না। কী হল তোমার আজ!

বুবুন মায়ের কথায় প্রতিক্রিয়া দেখায় না। বরঞ্চ মায়ের কোল ঘেষে ঘেষ্টাতে থাকে। শিবানী আবার গলা চড়ায়, কী হচ্ছেটা কী? যাও দাদুর কাছে! ডাকছেন গুডমর্ণিং করো।

বুবুন অনড়। যা ভেবেই হোক, খোচা-খোচা দাড়ি, হাতে মোটা লাঠি, সাদা-কালো মেশানো চুল সব মিলিয়ে বুবুন মায়ের নির্দেশে সাড়া দেয়না। বরঞ্চ মায়ের গা ঘেষে চাপতে থাকে। আসলে সকালর আড়ষ্টতা কাটেনি এখনও আরকি।

মামাবাবু হাসলেন, মনে হচ্ছে তোমার ছেলের পছন্দ হয়নি আমাকে। এরপর সেজেগুজে আসব যদি পছন্দ হয় ক-টা রুম করেছিস রে হীরু? সোফার ঢাকনাগুলোও তো বেশ দামি মনে হচ্ছে। কাজ করাই কিনেছিস না শিবি করেছে? দারুন ম্যাচ করেছে কিন্তু

হীরু দ্রুত বলে ওঠে, কেনা, মামা কেনা। তবে পছন্দটা শিবানীর। গত মাসেই কলকাতা গিয়েছিল, নিউমার্কেট থেকে নিজেই দেখে শুনে এনেছে। মামাবাবু তারিফ

করেন, না ওর ঠিক একটা চান্স আছে। তালে এবার উঠিয়ে হীরু। শিবানী সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ দেখায়, ঘরগুলো ঘুরে দেখবেন না একটু। এই রুমটা ছাড়া ওপাশে আরেকটা একস্ট্রা রুম আছে। ওপাশে কিচেন, টয়লেটস।

মামাবাবুরও কৌতূহল হয়। বলেন, চল দেখেই যাই। এসেছি যখন! আবার কবে আসব না আসব। হীরুর তো আজকাল কোথাও দেখা পাওয়া যায়না। কোন প্রোগ্রামেই না। আগে তো তবু অকেশনেও সভাটভাগুলোতে যেত-টেত! দরকারে তুলিটুলিও বোলাত দেওয়ালে। এখন সব শেষ। হীরেন মাথা চুলকোয়, বলে, আসলে কেমন যেন জড়িয়ে গেলাম মামা। ঘর সংসার, ছেলে বউর বায়না বাজার হাট কখন যে গিলে ফেলল বুঝতেই পারলুম না। এবার পঁচিশে বৈশাখেও রবীন্দ্রমূর্তিতে মালা দিতে যেতে পারিনি। ছুটি ছিল, কিন্তু শিবানী এমন গোঁ ধরল, কলকাতা যাবে। যেতেই হল।

মামাবাবুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, তুই তো দারুণ দেওয়াল লিখতি। স্লোগান দিতি। সেসব তো অনেকদিন চুকে-বুকে গ্যাছে। বড় পাড়ায় আসার পর যোগাযোগটাও থাকছে না প্রায়।

—তা দায়টা কার, শিবানীর? না নিজের ইচ্ছের? মামাবাবু ইচ্ছে করেই ঠেস দিলেন একটু। নাকি ভাবছিস প্রয়োজন ফুরিয়ে গ্যাছে!

—কী বলব বলুন। সব মিলেজুলেই কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি।

মামাবাবুকে নিয়ে ততক্ষণে শিবানী পাশের রুমটায় ঢুকল। বেশ সাজানো। দেওয়ালে গোটা দুই পেইন্টিং। খাটে ধবধবে চাদর। শুধু বেমানান মোটর সাইকেলটা। ঝকঝকে হলেও মাঝখানটায় দাঁড় করানো। আসলে ঘরটা যে ব্যবহার হচ্ছে না বোঝাই যাচ্ছে।

মামাবাবু মোটর সাইকেলটার ওপর সযত্নে হাত বুলালেন, নতুন কিনলি?

—হ্যাঁ! মাস পাচেক হল। হিরোহন্ডা। খুব কাজে লাগে। ছুটবাট যাওয়া-আসা তারপর বাজারটা দূরে। সময়, পয়সা দুই বেঁচে যায়। রিকশা খরচই এত দিতে হচ্ছিল। কিনেই ফেল্লুম। তবে ইনস্টলমেন্টে। আজকাল তো এটা একটা ভালোই হয়েছে। কিছু পয়সা দিতে হয় ঠিকই। তাহলেও ম্যানেজ হয়ে যায়।

মামা কী যেন ভাবলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। বছর দুই আগেও হীরেন উল্টোদিকের ছোটপাড়ায় ছিল। ভাড়া বাড়িতে। খুব খারাপ কিছু ছিলনা। ছোট্ট দু'টো ঘর। ভাড়া হলেও ছিল বেশ গোছগাছ করা। বুবুন তো ওখানে থাকতেই হয়েছে। সেদিনের সে সময়ের হীরেন-শিবানী আর আজকের হীরেন-শিবানীতে কেমন যেন একটা ফারাক তৈরি হয়ে গ্যাছে। অফিস কাজ কম্ম, ঘরবার সব দেখার পরও হীরেন দেওয়ালে তুলি ধরত। প্রায় সবকাজে কম্মেই তো থাকত। তার উপস্থিতি ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। অনেকে ঠাট্টা করে বলত-মামার ক্যাসাবিয়াংকা। মামার নির্দেশের জন্যে একপায়ে খাড়া। কেউ কেউ বলত চামচে। কোন কিছু গায়ে মাখেনি তো হীরেন! মাখত না। ছেলেটা আসতেই সব ঢিলে-ঢালা হতে থাকল। একটু একটু করে। মাঝে মধ্যে বলতেও হয়েছে, কিরে তোকে যেন আজকাল কম দেখা যাচ্ছে!

মাথা চুলকে কিছু অজুহাত দিয়ে সামাল দিত হীরু। কখনও ছেলে, কখনও বউয়ের

রোগ-ব্যারাম, কখনও অর্থ চিন্তা। এই আর কি!

মামা হাসি মশকরা করে বলতেন, তোদের মাইনে বাড়ার পর যেন সময়টা কমে যাচ্ছে রে হীরু? তারপর শুনছি দু-একটা টিউশনিও নাকি ধরেছিস!

হীরু চোখ গিলেছে, ছেলেটা এত ভুগছে, সামাল দিতে পারছিনা মামা। এত খরচ বেড়েছে কি বলব বল?

—সে তো বটেই। সংসার বলে কথা! তারপর নিজের। এখন আর বিশ্বসংসারের কথা কে ভাবে বল!

ঠেসটা বুঝতে পারলেও ঝিম ধরে থাকে হীরু। এক ধরনের স্বীকৃতি আরকি!

মামাবাবু তখনই আঁচ করেছিলেন সম্বন্ধটা ফিকে হচ্ছে। ভাড়া বাড়ি হলেও হীরুর একটা বিশেষ আইডেন্টিটি ছিল! ওর ঘরে ঢোকার মুখেই চোখে পড়ত ওরই হাতে আঁকা কার্ল মার্কসের একটা ছবি। সত্যি ছবিটা দারুণ প্রাণবন্ত ছিল। সমস্ত বাড়িটার পরিবেশটাই হয়ে গিয়েছিল অন্যরকম। অন্যদের চেয়ে আলাদা আলাদা।

সেই হীরু! মারার অজান্তেই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। ভেতরে একটা গা মোচড়ানো ভাব। সুদূর অতীত থেকে দ্রুত ফিরে আসেন মামাবাবু। হীরুর সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িটাই দেখলেন। ঘুরে ঘুরে। বাইরে ভেতরে।

বাইরে ওপরের দিকে চোখ পড়তেই জিগ্যেস করেন, দোতালা হবে নাকিরে।

— না না। এখন ওসব ভাবছিই না। মাথায় বহু ধার-দেনা। ধারে ধারে প্রায় সব বিকেয়েই আছে। কন্ট্রাক্টর পাবে। মাল সাপ্লাইওয়ালা পাবে। গাড়ির ইনস্টলমেন্ট সব মিলিয়ে মাস কাটতেই চায়না।

কিন্তু তোদের তো এখন ভালো মাইনে রে। তারপর মা-দেশে মারা যাওয়ার পর টাকাপয়সাও পাঠাতে হয়-টয়না।

— হ্যাঁ, এটা ঠিকই! কিন্তু একটা সোর্স বন্ধ হয়ে গেলনা?

—কী সোর্স রে!

—দুটো ব্যাচই বন্ধ করে দিতে হল তো! বারো বারো চব্বিশজনের ব্যাচ ছিল। প্রায় হাজার তিনেক গচ্চা। টিউশনিটার ব্যাচ দুটো চলে গেল! বলার মধ্যে কেমন যেন চিন্তার ভাঁজ! একটু অসন্তুষ্টিও! যারা পারছিল তারাইতো পড়াচ্ছিল। তাহলে? এখন ভাবছি এত ধার কৰ্জ্জা শুধব কী করে? শেষ পর্যন্ত না সব ডোবে!

মামাবাবু এবার একটু গম্ভীর হন, আসলে ব্যাপরটা একটা নীতির প্রশ্ন। কতটা পারা যাবে বলা মুশকিল। দেখা যাক না একটা পরীক্ষা করেই!

হীরেন কিছুটা বিরক্তিই প্রকাশ করে, হোক পরীক্ষা। তবে আমরা আছি। ভাবনা তো তেমন ছিল না। ভাবনা ওই ধারগুলোর জন্যেই।

মামাবাবু এবার একটু সাহস যোগান, ধারের জন্য ভাবিস না। সারা দুনিয়াটাই তো ধার আর সুদের ওপর। ঠিক দেখবি সামাল হয়ে যাচ্ছে। নে, যা করেছিস দেখছি ভালই তো গ্যাছে। ওয়াশিং মেশিনি, কালার টিভি। পর্দাগুলোও বেশ দামিইরে! ঘাড়

নুইয়ে আবার মাথা চুলকায় হীরেন। পেছনে পেছনে ঘুরছিল শিবানীও। ছেলের হাত ধরে। দরজার কাছ পর্যন্ত সবাই এগিয়ে এল। মামাবাবু আরও একবার চোখ বুলালেন বাইরে থেকে। নিজের অজান্তেই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। বললেন, আজ চলিরে তাহলে। সম্মতির হাসি নিয়ে হীরেন-শিবানী দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়ে।

—আজ চলি দাদুভাই, বুবুনকে গাল টিপে আদর করেন মামাবাবু। তোমার যা হোক একটা কিছু পাওনা রইল। সেটা পরদিন হবে। চলি। আজ।

মামাবাবু বেরিয়ে এলেন। যদিও রাস্তাটা সমতলই। গেট পর্যন্ত। তাহলেও মামাবাবুর মনে হল তিনি যেন সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। এক ধাপ এক ধাপ করে। হীরেন-শিবানী সমতল থেকে অনেকটা উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল মামাবাবুকে। ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল ঠিকই। কিন্তু তিনি যে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন একটা স্রোত যেন বৃত্ত ভেঙে অন্য স্রোতে মিশতে চাইছে। মিশছে। এবং অতি দ্রুত গতিতে। তা হলে ? তাহলে কি কোথায় ভুল-ভাল কিছু একটা হচ্ছে ? □

ভারতবর্ষ ১৯৯০

কিন্নর রায়

একটা আস্ত নীল আকাশ জলের ওপর ভেসে থাকলে নিয়মমতোই 'ভাগাড়'-এর রং বদলে যায়। গঙ্গা তার নানা বাঁকে দিয়াড়াভূমিকে উর্বর করতে করতে মানুষের ফসল আর জমির চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা বাড়াতে বাড়াতে কখন যেন কোনো গ্রামের পোষা জলাভূমি হয়ে যেতে পারে। স্রোত থেকে হঠাৎ সম্পর্ক আলগা হয়ে যাওয়া এই থই-থই জল বিহারের এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে 'ভাগাড়'।

গ্রাম পুনিয়া, থানা শাহাপুর, জেলা ভোজপুর। খুব সহজেই খবরের কাগজের ডেট লাইন হয়ে নামগুলি পর পর আসে ষাট-সত্তরের অগ্ন্যুৎপাতে, আশির স্থবিরতায়, পুনর্জাগরণে, নব্বইয়ের বিশ্বাসহীনতায়।

বর্ষায় ভাগাড় ভরে। মাছ আসে। সাদা বালির পাড় চাঁদের আলোয় অনেক স্বপ্ন নিয়ে পড়ে থাকে। জুতো ছাড়া খালি পায়ের এলোমেলো দাগের গভীরতায় যেটুকু অন্ধকার, তা যেন জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর নির্জনতাকে ডাকে। গ্রীষ্মে জল কমতে কমতে তলানি। তখন স্নানে সুখ নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দ নেই।

এই মধ্য আশ্বিনে আকাশ যতটা নীল হওয়া দরকার, ঠিক ততটাই নীল। শ্যাওলার গাঢ় সবুজ বুকে নিয়ে দাঁড়ানো জলতলে শেওল মাছেরা। পাড়ে চতুর মাছরাঙার বর্ণালী। ঝাঁপ দিলে তার ডানার রঙে রঙে দশ দিক আলো হয়ে যেতে পারে। সূরজ খাড়া পাড় ধরে নিচে নামতে নামতে এই সব রং অথবা প্রকৃতির বুনে যাওয়া হাজার নকশার একটিও দেখতে পাচ্ছিল না। তার চোখে তখনও ঘোর। খালি পা বালিতে ডুবে যেতে যতটা সময় নেয়, তুলে নিতে তার বেশি লাগে না। হাফ প্যান্ট, বুকের বোতাম-ছেঁড়া ফুলহাতা সুতির জামায়, কপালে উড়ে আসা বালি একটু একটু করে নিজেদের জায়গা করে নিতে পেরেছিল। সূরজ টের পাচ্ছিল তার গালে, চোখের পাতায়, শরীরের আরো কোথাও কোথাও কী জানি কি জড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ সেদিকে তেমন মন দেওয়ারও সময় নেই। বছর সাত-আটের উত্তেজনা নিয়ে একটি মাছকে সে দেখতে পাচ্ছিল, যা বুড়বুড়ি তুলেই ঘন দামের পেছনে নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলতে পারে। সূরজ বারে বারে বোকা হয়ে যাচ্ছিল। আর এটুকুই ছিল তার জেদ বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট।

অনেকটা উঁচু পাড়ে, বেলা দশটার রোদ যেখানে অনেক বেশি তীব্র, নির্মম, সেখানে সাবুয়া দোসাদ, কুন্তা আহির, লল্লু চামার, রামেশ্বর মিশ্রা, শিউপূজন সিং — সকলেই দাঁড়িয়ে বসে অথবা নিচু হয়ে সূরজ চামারকে দেখছিল। আর একটু এপাশে ঘামে ভেজা জবজবে মুখে দাঁড়ানো সাব্বির একই ভঙ্গিতে ঝুঁকতে চাইছিল।

যাব কি না, আমরা নেবে যাব কি না—দেহাতি ভাষায় এই শব্দগুলি বারবার আছড়ে পড়ছিল ভাগড়ের সবুজ আর নীলে মাখামাখি বুকে। ওদের গলার শব্দে হয়তো ভয় পেয়ে মন দিয়ে শিকারের দিকে চোখ রাখা মাছরাঙা উড়ে পালিয়েছিল।

খুব দ্রুত বালি ভেঙে নেমে আসতে চাইছিল সাবুয়া, কুন্তা, রামেশ্বর, লল্লু, শিউপূজন। পায়ের শব্দে, শরীরের ওজনে বালি ভাঙছিল। শব্দ পেয়ে গালাগালি দিয়ে ওদের ফিরে যেতে বলছিল সূরজ। কেউ তার কথা শুনতে চাইছিল না। জল যেখানে বালিকে ছুঁয়েছে সেই ভেজা ভেজা নরম শীতলতায় পা রেখে—সবাই সূরজকে বোঝাতে চাইছিল আমরা সবাই শেওল মাছ ধরতে চাই—ব্যাপারটা দেখতে চাই।

বালকেরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছিল। ভাগড়ে এখন স্নানের মানুষ কম। একজন বয়স্কা নারী। পাশের কাচ্চিতে বয়েলগাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, সঙ্গে কোনো ফিল্মি গানের কলি —গঙ্গা যমুনা সরস্সতি...

পাড় ভেঙে প্রায় গড়িয়ে নেমে আসায় তেমন কোনো ক্লান্তি নেই। উঠে আসায় কিছু মেহনত আছে। বয়স্কদের কখনও হাঁফ ধরে। তবু জীবনের শুরুতে অনেক দম থেকে যায় বুকে। উঠে আসতে আসতে সাব্বির বলল, গঙ্গাজির কসম, যা ডর লাগছিল সূরজ একেলা নেমে যেতে। যদি সাঁপ থাকে। ডঁশলে শেষ।

সূরজ কোনো কথা বলছিল না। একটা শেওল মাছ ধরতে পারলে তাদের একবেলার ব্যঞ্জনটুকু ভাতের সঙ্গে, চকিত বিদ্যুৎরেখার মতো কখনও আমিষ, সেটুকু খেলার ছলে মুছে গেলে রাগের তলানি পড়ে থাকে। পিচ্ কেটে বালির ওপর থুতু ফেলে পায়ের পাতায় আবার তা মাড়িয়ে সূরজ উঠে আসছিল। তার পা-ফেলায় অসফলতার ক্লান্তি ছিল। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত অনাহারে থাকার অভাবটাও।

বয়েস প্রায় কাছাকাছি হলেও নামের শেষে যে পদবী, সেই অনুযায়ী তারা বিভিন্ন টোলিতে থাকার জন্যে দায়বন্ধ। জন্মাবধি এমনই নিয়ম। আর একটু বড়ো হয়ে উঠলে—আঁখ মিচৌলি, ডাল-ডাল-পাত-পাত, দোলহা-পাতা, গুলি-ডাং, কাচের গুলি খেলার বয়সটুকু পেরিয়ে গেলেই এরা গম্ভীর হবে। ছুয়া-ছুত নিয়ে ভাববে, ছানবিন করবে। চুনাও, মত্দান, মণ্ডল-কমিশন, মাইনরিটি, সিডিউল কাস্ট—তখন কত যে ভাঙার অঙ্ক।

সূরজ আচমকা ভাগড়ে এসে মাছের পেছনে পড়ে যাওযায় সকালের খেলা প্রায় মাটি হতে চলেছে। সাব্বির সেই উত্তেজনায় জ্বালানী দিয়ে বলতে চাইছিল—গুলি খেলব আমরা। এখন তো কোনোই বেলা হয়নি। সাব্বিরের এই প্রস্তাবে প্রায় হৈ-হৈ করে উঠেছিল সবাই। জানতে চাইছিল ডিম না পিল?

রামেশ্বর বলল, ডিম। লল্লু, শিউপূজন বলল, পিল। কুন্তা, সূরজ ও সাব্বির বলল, পিল। গুলি কোন নিয়মে খেলা হবে, তা নিয়ে এটুকু কথা কাটাকাটি বোধহয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। সাদা বালির পাড়, শান্ত নির্জন ভাগাড় অনেকটা গভীর, সবুজ শ্যাওলা আর নীল আকাশ জড়িয়ে তেমনি তরঙ্গহীন। সেখানে শেওল মাছেরা নতুন করে বুড়বুড়ি তুলছিল। আর কিছু দিন পর শীত নামলে এখানে পাখিরা, হাঁসেরা অনেক দূর থেকে উড়ে এসে বসবে।

সাব্বির-এর কোনো টোলি নেই। গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে তারা একটিই মুসলমান পরিবার—ভাগাড় থেকে কিছু দূরে, একটি বড়ো মাঠের ভেতর নিম, পাকুড়, বটের সবুজ পেরলে মাটির ঘর, খাপরার চাল। এ বাড়ির উঠোনে একটি ছায়ালো হলুদ কলকে ফুলের গাছ আছে। সমস্ত বসন্ত ঋতু, গ্রীষ্ম আর সারা বর্ষায় ফুল ফুটিয়ে এ গাছ বুঝি বা কিছু ক্লান্ত। কলকে ফুলের গাছের গোড়ায় দুটি সন্তানসহ একটি বকরি। তার সাদা-কালো শরীর, ভারি স্তন, বাচ্চাদের চেহারা, লাফঝাঁপ বলে, ওর মা হওয়ার বয়েস খুব বেশিদিনের নয়।

উঠোনে শরতের রোদ পড়েছিল। সুন্দর নিকোনো মাটির দাওয়া। তার ভেতরে ঘরের অন্ধকার চৌখপ্পি, দরজা খোলা থাকায় এই আঁধারটুকু চোখে বড় বাজে। সাব্বিরদের এক্কা থাকে উঠোনে। মাঝবয়েসী ঘোড়াটি লালে-সাদায়। গলায় পেতলের ঘুঙুর, ঘণ্টা। পা ঠুকে ঠুকে ডাঁশ বা মশা তাড়াতে তাড়াতে তার যে মনোহর ভঙ্গিমা, সেটি চোখ ভরে দেখার। কিংবা মুখে ঘাসের থলি আটকে, ঠুলি পরানো চোখে খাবারে মনোযোগি থাকার ছবিটি। এসবই সাব্বিরের চোখে কোনো নতুন দৃশ্যাবলী হিসেবে আসে না। বরঞ্চ নিত্য, গতানুগতিক। কখনও ক্লান্তিকর।

কলকে গাছের আরও ওপাশে একটি বারোমেসে পেয়ারা গাছ। সেখানে ফল থাকা দূর অস্ত। ডাল পাতা থাকাই মুশকিল। সাব্বিরদের তো এই গাঁয়ে কোনো টোলি নেই। ফলে সব বসতির বাচ্চাই ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ে গাছে, ছিঁড়ে খাওয়া, নষ্ট করার মধ্যে বুঝি বা মানুষের আদিম আনন্দ লুকিয়ে থাকে। কলকে ফুলের গাছের পাশে গৌরাইয়া-এর ঝাঁক। তাদের কিচিরমিচির। এছাড়াও এ গ্রামের আকাশে, গাছের ডালে, ঘরের পাশে আছে কাউয়া (কাক), পাণ্ডু, ময়না।

আম্মা, আম্মা—গলার শির তুলে সাব্বির তার গুলির কৌটো চাইছিল। বড়েভাই রসুল টাঙা নিয়ে বেরিয়ে গেছে কামাইয়ের ধান্দায়। বাবা আরায় রিকশা টানত আগে। স্টেশন থেকে কাছেরি। কাছেরি থেকে বাসগুমটি। ইদানীং বুক-পায়ের জোর কমেছে। ঘরেই থাকে। সাব্বির জানে আর কিছুক্ষণ থাকলেই বাবার কাশির একঘেয়ে আওয়াজ ভেসে আসবে ঘর থেকে। একটানা, বিরতিহীন।

আম্মার পঞ্চাশের টানটান শরীরটি চোখে পড়ে। টিপশূন্য পরিষ্কার কপাল। গোটা মুখ জুড়ে অগভীর চেচক-এর—বসন্ত দাগ। সিঁথির দুপাশে চুলে সাদা রং লেগেছে। মুখে দাগ ধরিয়েছে বয়স। বড়ো দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়া এই নারী, তার ঠিক পেছনে বছর নয়েকের একটি কন্যা — তার পাঁচ সন্তানের একটি। উঠোনে ঘুরে-বেড়ানো মা-মুরগি তার ডানায় আগলানো বাচ্চাদের নিয়ে তখনই একটি হানাদার কাকের দিকে তেড়ে যায়।

হাতের ঘষায় কৌটোটি তার ব্র্যান্ড নেম হারিয়েছে। তার গায়ে কোথাও কোথাও ঘষে যাওয়া টিনের রুপোলি উজ্জ্বলতা। সাব্বির সেটুকু ছিনিয়ে নিয়ে আর দাঁড়াতে পারে না। আর পেছন পেছন তার সঙ্গীরাও নিম, পাকুড়, বটের যে ছায়াভূমি, সেখানে সূর্যের আলো যেন বা কিছু মাধুরী মাখানো। এখানে গুলি খেলার যে গর্তটি আছে, যাকে পিল বলা হয়ে থাকে, তাকে ঘিরে সাব্বিররা গুলি খেলার জন্যে গুনে গুনে ভাগ

হয়ে যায়। 'পিলাও' — এই ধ্বনিটি এই সবুজ, ফাঁকা মাঠে যেন বা রণধ্বনি হয়ে জেগে ওঠে। ছেলেরা খেলায় মাতে। সুরজ এই উত্তেজনার আগুনে নিজের শরীরের গভীরে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাওয়া খিদের জ্বালাটিকে তেমন করে আর বুঝতে পারে না। কাচের গুলির ঠকাঠক শব্দে, জয়ের উল্লাস অথবা পরাজয়ের হতাশায় বারে বারে বাতাস কেঁপে ওঠে। শিবালা—শিবমন্দিরের কসম, আঁখ কি কসম—এসব প্রতিজ্ঞা অনায়াসেই উঠে আসতে থাকে খেলার সঙ্গে সঙ্গে। এমনকি সাব্বিরও খুব সহজেই জোচ্চুরি করছি না, এটুকু জানাতে গঙ্গা মাইয়া, রামজ্বি বা শিবালার কসম খেয়ে নিতে পারে।

ধীরে ধীরে বেলা নিজের মতো বেড়ে যায়। খেলা জমতে জমতে একসময় সুর কাটে। প্রতিটি গুলি গুনে, গুছিয়ে হিসেব মিলিয়ে সাব্বির বাড়ি যেতে যেতে টের পায় বেলার সঙ্গে সঙ্গে রোদও তার তেজ বাড়িয়েছে।

বাড়ির উঠোনে দুটি মা-মুরগি, তাদের এগারোটি ছানা, ঘাড় উঁচু-করা বড় লাল মোরগটি মাঝে মাঝেই ছুটে গিয়ে কলকে গাছের তলায় পোকা খুঁজে নিতে চাইছিল। তার অহংকারী পাখায়, যেটুকু আলো আটকে যাচ্ছিল তাতেই যেন আরও আলো হয়ে উঠছিল চারপাশ। সাব্বিরের এসব কোনো কিছুই দেখার সময় ছিল না। তাদের এ গ্রামে তারাই একমাত্র মুসলমান। তাই তাদের বাড়ি মুরগা-মুরগি। অথচ গোটা গ্রাম জেগে ওঠার জন্যে ভোরের প্রথম শব্দটি শুনতে পায় মুরগার 'বাঙ'-এ। সূর্যের গায়ে মেঘ, কুয়াশা অথবা অন্ধকারের যে শেষ খোসাটুকু লেগেছিল, তা ছিঁড়ে যেতে থাকে এই ডাকাডাকিতে।

সাব্বির ঘরে ঢুকে প্রথম দেখতে পেল ওজু সারার পর কাবা-র দিকে মুখ করে আব্বা নামাজে বসেছে। ক্ষয়ে-যাওয়া শরীরে পুরো হাতা জামা, হাঁটুঝুল লুঙ্গি। মাথায় কাপড়ের টুপি।

সাব্বির জানে তার আব্বা সুলেমান জোহরের নামাজ সেরে খাবারে বসবে। তারও কিছু পরে বড়েভাই ঘোড়াকে আদর করে করে ডাকবে নূরমহল, নূরমহল! তারও খাবারের সময় হয়ে যাবে। দাওয়ায়, বাঁশের পাতায় ঝোলানো শুগা—টিয়াটি কী যেন কি বলে উঠবে, একবার দুবার-তিনবার। আম্মা যদি ওর ঠোঁটে একটা পাকা মিরচা এনে ধরে দেয়—ওহ্, হো —সে কি লাফালাফি।

ভাতে বসার সঙ্গে সঙ্গে সাব্বির বিকেলে যে গোটি খেলা হবে, তার ছকটি নিজের মনে মনে করে নিতে চায়। খাপরা ভাঙা দিয়ে তৈরি ঘুঁটি দিয়ে—এসব ভাবনার ভেতরই ভাতের গ্রাস কখন যেন গভীরে নেমে এসে প্রাণের আরাম হয়ে যেতে থাকে।

ঘরে বসে বসেই উঠোনে এক্কা রাখার শব্দ টের পেল সাব্বির। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গায়ের চিকন ঘামের গন্ধ মিশল বাতাসে। নূরমহল পা ঠুকেছে। রসুল তার পিঠে আদুরে চাপড় মেরে বলল, আ বে —। যেন সে তার প্রাণের ইয়ার অথবা শাদি কার বিবি। হাতে ঘামমাখা ঘোড়ার গা-টি ছুঁতে ছুঁতে রসুল একইসঙ্গে পরিশ্রমের গরম আর ঘেমে-ওঠা শীতলতা বুঝে নিতে পারবে। কলকে গাছের অনেকটা ছায়া উঠোন জুড়ে। খাঁচার দরজা আটকানো টিয়া না থেমে জোরে জোরে একটানা বলে যেতে থাকে—মেহমান

আয়া। মেহমান আয়া! তার সেই ডাকাডাকিতে জোশ পেয়ে সবে কয়েক মাস মা হওয়া বকরি ভেজ্ঞিয়ে উঠতে পারে, আবার নাও পারে।

আগুনের এক পাশে কুয়ো। তাও সেই পেয়ারাতলার কাছাকাছি। সেখানে কপিকলে লাগানো দড়িতে বাঁধা বালতি। শরতের এই মাঝামাঝি সময়ে তীক্ষ্ণ রোদে ভেপসে ওঠা চরাচরে গভীর থেকে তুলে আনা জল বড়ো আরামের। তার স্পর্শে ক্লান্তি কাটে।

রসুল ইক্কাবালা বিশ্রামের পর গোসল করবে। তার আগে চবুতরায় কাঁধের গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাবে। তার ছায়াটি রোদের অবস্থান অনুযায়ী ভেঙে চুরে নিকোনো মাটির দেয়ালে নড়ে-চড়ে উঠবে বারে বারে। সাব্বির ভাতের শেষ গরাসটি মুখে পুরতে পুরতে বিকেলে গোটি খেলার ছকটি ভেবে নিতে থাকে।

ইয়া-ইয়া-জেতার আনন্দ স্বপ্ন হয়ে দুচোখের সামনে দুলতে থাকে।

খাপরার চলে শরতের রোদ এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে পেছিয়ে যাচ্ছিল। রসুল ইক্কাবালা দুপুরে খেয়ে দু-দশ মিনিট গড়িয়ে আবার ধান্দায় চলে যাবে। ঘোড়ার পায়ের খপ, খপ, গাড়ির চাকার যান্ত্রিক আওয়াজ মুছে গেলে সাব্বির ডুবে যাবে ঘুমে।

এখন আর কেউ ডাকবে না। মাঝে মাঝে আব্বার কাশির শব্দ এই নৈঃশব্দ, এ অন্ধকার ছিঁড়ে দেবে। দিদি সুরাইয়া নিজের পুতুল-পরিচর্যায় খেলনাপাতি সাজানোয়, নিজস্ব স্বগ্নতোক্তিতে নিজের জগৎ তৈরি করে নেবে। এভাবেই চলবে, সময় গড়াবে।

আম্মা একটু ঘুরে শুলে তার আঁচলের গন্ধ, গায়ের বাসটুকু ঘুরে যাবে। আর সাব্বির তার পেটের কাছে দু-হাঁটু এনে আধো-ঘুমে সেই ভাগাড়টিকে দেখতে পাবে। যার বুকে শ্যাওলার সবুজের সঙ্গে আকাশের নীল মাখামাখি হয়ে গেছে।

খাঁচায় ঝোলানো পাখিটি অকারণেই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। ডাকবে, একবার, দুবার। অনেকবার। তার সবুজ ডানায় যেটুকু রোদের রং, তাও সরে যাবে বড়ো তাড়াতাড়ি।

ঠিক তখনই নিজেদের পাকা বাড়ির একতলায় ঘুমের ভেতর অনাইট ব্রহ্মবাবাকে দেখতে পাচ্ছিল শিউপূজন সিং। গল্পের ভেতর দিয়ে কবেকার এক মিথ তার মাথায় শেকড় মেলেছিল। বর্মার যুদ্ধে মেডেল পেয়েছিলেন ঠাকুর্দা। তাঁর কাছে জল-চাওয়া কোনো ব্রাহ্মণ প্রবল দুপুর রোদে জল না পেয়ে নিমগাছের নীচে দেহত্যাগ করে। সে সময়টি তো যে কোনো গল্প গড়ে ওঠার সময়। টেলিভিশন নেই: টেকনোলজি কত না পেছনে।

বারবার শোনা গল্পের সেই ব্রাহ্মণ মহুয়া কুড়োতে কুড়োতে মহুয়াতলা পেরিয়ে আসে। তার মিলিটারি ইউনিফর্ম, বার্মার যুদ্ধে মেডেল পাওয়া পিতামহর কাছে এসে জল জল—এই দুটি শব্দ খুব কষ্ট করে উচ্চারণ করে। মিলিটারি পোশাক খুব গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ এখনই জল কেমন ভাবে দেব! তৃষ্ণার হাহাকার যে কতখানি, সেটুকু হয়ত তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

ব্রাহ্মণ পড়ে, মারা যায়। সেখানে পিপল কি পেড়, নিম কি পেঁড় ধীরে বেড়ে ওঠে তিরিশ, চল্লিশ বছর ধরে। অনাইট ব্রহ্মবাবার আস্থানটি গড়ে দেয় যুদ্ধ ফেরত মানুষটি। কারণ সে স্বপ্ন পায় ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা আস্থান চাইছে। রাতারাতি গড়ে ওঠে, ব্রহ্মবাব

খড়ম পায়ে খটখটিয়ে হেঁটে যায় গভীর রাতে। গ্রামের অমঙ্গলের আগেভাগে আকাশে ভেসে ওঠে অগ্নিগোলক। কেউ কেউ বিপদ কাটানোর প্রার্থনা নিয়ে ভক্তি ভরে প্রণাম করার সময় বুঝতে পারে বোধহয় তিনি এলেন। ভবুদ, রাখ (হোমকুণ্ডের ছাই) মানুষের নানা সমস্যার সমাধান হয়ে দাঁড়ায়। কাহিনি-মাহাত্ম্য মুখে মুখে বাড়ে।

শিউপূজন তার বিশ্বাস নিয়ে পাশ ফিরতেই স্বপ্ন মুছে গিয়ে ঘরের দেয়ালে জেগে ওঠে। সেইখানে পেরেকে টাঙানো ক্যালেন্ডারে শ্রীদেবী, রামজি, হনুমানজি। বেলা পড়ে আসা আলো শিউপূজনকে মনে করায় এই সময়টি গোটি খেলার সময়।

শিউপূজন যে ঘুমের নদীর ভেতর এতক্ষণ ছিল, তা থেকে বেরিযে নিজেকে খুঁজে পেয়ে উঠে বসে। দেয়ালে শ্রীদেবী হালকা হাওয়ায় দুলে ওঠে। পাশে রামজিও। তার মাথার গভীরে তখনও অনাইট ব্রহ্ম আস্থানের আগুন গোলা। দুটি চড়াই বাইরে থেকে উড়ে ঘরে এসে নিজের জায়গা করে নিতে চায়।

গুটি খেলা জমে উঠতে সময় নেয় না। সাব্বির, শিউপূজন, সুরজ, লাল্লু, রামেশ্বর, সাবুয়া। খাপরার ঘুঁটি, শরীরী কসরত, চিৎকার, উত্তেজনা—সব মিলিয়ে কোনো ঝাঁঝালো আরক।

খেলায় খেলায় শিউপূজন ভুলে যেতে থাকে ঘুমের গভীরে পাওয়া মহিমাময় আস্থানের কথা। সন্ধ্যা নিজের নিয়মেই নেমে আসে পৃথিবীর গায়ে।

যেমন সন্ধ্যের পর রোজই, সাব্বির আজও ঘরে ফিরে দেখতে পায দাওয়ার সামনে শিস ওগরানো লম্ফের শিখাটি। বকরি, মুরগা-মুরগি খোঁয়াড়ে তুলে দিয়েছে মা। আশ্চর্য, শান্ত একটি সন্ধ্যা এ বাড়ির আকাশে। বাবা এখনই নমাজে বসবে। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে বড়োভাই। তারপর রান্নাঘর থেকে রুটির গন্ধ। সবজির সুবাস। রাতটুকু ঘুমে ঘুমে।

আসলে দিন রাত তো এভাবেই যায়। ভাগড়ের আশেপাশে সাদা বালি হাওয়ায় নড়ে চড়ে নানান পায়ের দাগ মুছে দিয়ে আবার নতুন নতুন চিহ্ন এঁকে নেওযার জন্যে বুক পেতে তৈরি হয়ে থাকে। কলকে ফুলের চিকন সবুজ পাতায়, পেয়ারার নবীন ডালে জ্যোৎস্না পড়লে সাব্বিরের মনেই হয় এ বাড়ি তার একেবারেই অচেনা। খাপরার চালে, বাঁশের বেড়ায়, কাদা-মাটি নিকোনো পরিষ্কার আঙনে চাঁদের খেলা। রাত বাড়লে বাতাসে বোধহয় একটু-আধটু শীত মিশে যায়। ভাগড়ের দিকে যেতে সেই যে খেলার জায়গা, নিম-পাকুড়-বটের জড়ামরি সবুজ, কিছু অন্ধকার, কিছু আলো—সেই রহস্যময়তার এই জ্যোৎস্না আরও একপ্রস্থ মায়ার প্রলেপ দিতে পারে। সেই দূর সবুজে বুনো চাঁদের শেকড় জেগে থাকে। সাব্বির এত সব ভাবতে পারে না। কিন্তু তার ভালো লাগে। এত সুন্দর গ্রাম আর কি কোথাও আছে? এমন আলো, এত আকাশ!

শোয়ার আগে খাঁচার পাখিটিকে দাওয়ার ভেতরে তুলে রাখতে মা ভোলে না। নূরমহল তখন চার পায়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখে ঘাসের থলি। কান পাতলে চিবোবার শব্দ শোনা যাবে।

গায়ের চামড়া কাঁপিয়ে ডাঁশ বা মশা তাড়াচ্ছিল নূরমহল। ওর গায়ের শাদা জায়গাগুলোতে চাঁদের রং ডুবে গেছে। সামনের পা ঘন ঘন ঠোকার শব্দ সাব্বির

বুঝতে পারল নূরমহল তার মালিককে বলছে, আমার মাথা ঢাকা ছাউনির নীচে তুলে দাও। ও মালিক, আমার মশা লাগছে।

রাত আরও একটু বেড়ে গেলে এ বাড়ির চোখে ঘুম নেমে আসে, সমস্ত গ্রামের সঙ্গে।

পরদিন সূর্য ওঠে কোনো নাটক না করেই। ভাগড়ের পাশে বালির উঁচু পাড়ে পদচিহ্নগুলি দিনের আলোয় নতুন জীবন পেয়ে যায়। শিবালায় আরতির ধূপ-ধুনো, ঘণ্টাধ্বনি। কালি মন্দিরে আরতির আলো। শিবালার ভেতরই বজরঙ্গাবলীর সামনের রেকাবিতে মানতের লাড্ডু। বজরঙ্গাবলীর সিঁদুরমাখা লাল শরীর, ধাতুর দৈবী-চোখ ধূপের ধোঁয়া প্রদীপের আলোয় আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ গ্রামে কোনো মসজিদ নেই। তাই ফজর, জোহর, আছর, মগরেব বা এশা— কখনই আজান শোনা যায় না।

ভাগড়ের ধারে আজকের নতুন খেলাটি আবিষ্কার করে শিউপূজন। কিছুটা হেঁটে নীচের দিকে নেমে এসে সে 'জয় শ্রীরাম' বলে একটি লাফ দিয়ে জলে পড়ে। নরম বালি-কাদায় পায়ের পাতা-ডোবা জলে তার শরীরটি ওই পাতাটুকু ডুবিয়েই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আর এভাবে বালক-বাহিনীর সবাই, এমনকি সাব্বিরও। তার ধারণায় এটি নতুন এক খেলার হুংকার মাত্র। ভাগড়ের জল, বালি, আকাশ এইসব কচি গলায় বারে বারে চমকে ওঠে। জলে চোখ রেখে স্থির থাকা মাছরাঙা চমকে, ডানা নাড়িয়ে, একটু দূরে উড়ে বসে।

এই জলের বুকে পা ডুবিয়ে আকাশকে কেমন যেন গোল মনে হয় সাব্বিরের। সূর্যকে ঠিকমতো ঠাওর হয় না। দূরে, পাথর দিয়ে তৈরি ঘাটটায় কোনো স্নানার্থিনী। শিউপূজন সাব্বিরকে জল ছুঁড়ে মারে, সাব্বির সূরজকে, সূরজ লল্লুকে, লল্লু সাবুয়াকে, সাবুয়া কুন্তাকে, কুন্তা সাব্বিরকে, সাব্বির শিউপূজনকে—এভাবেই ঘুরে ঘুরে। সে এক ভাগদৌড় হয়ে যাওয়া যাকে বলে। পাথরের পাটায় পা-ঘষা মহিলাদের কেউ কেউ এই জল বর্ষণে বিরক্ত হয়ে দেহাতি কথায় গাল দেয়। তাতে জলখেলা উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

দুপুরে রসুল ফিরে আসে। এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপর। খাঁচার টিয়াটি অভ্যাসে চেঁচায়, মেহমান আয়া। মেহমান আয়া ....

বড়োভাই আশ্চর্য গম্ভীর। কাচ্চি পেরিয়ে পাকা রাস্তার ওপারে উঠে এলে যে রুজি -রোজগারের জায়গাটি, সেখানে রসুল ইক্কাবালা বেশ কয়েক বছর পর 'সব পাকিস্তানি কো মারকে ভাগা দো' —এই শব্দে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার সবুজ লুঙ্গি, নীল পাঞ্জাবি খুব সহজেই তাকে 'পাকিস্তানি' বানিয়ে দেয়। নিরুপায় মানুষের অপমানিত হওয়ারও কোনো জায়গা থাকে না। তাই রসুল ইউনিফর্ম পরা পি.এ.সি.-র হাতে শুধুমাত্র নিজের পোশাকটির জন্যে, অথচ এ পোশাক তো যে কোনো গরিব ভারতবাসীরই হতে পারে, অথবা নামে রসুল 'পাকিস্তানি' হয়ে যায়। শান্তিরক্ষকদের কেউ কেউ তার নামটি জানতে চায়। এতগুলি সরকারি পোশাক রসুলকে ধন্দে ফেলে। খুব সংকোচে, ভয়ে, নিজের নামটি বলে দিতে পারে রসুল। তার জানা ছিল না মীরাটে পি.এ.সি. গুলি চালিয়ে সংখ্যালঘু হত্যায় নেতৃত্ব দেয়। তার পোশাকের রং, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয়

রীতিনীতি—যার অনেকটাই রসুল মানার সময় পায় না, হাসি-ঠাট্টার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

অটোমেটিক রাইফেল, চকচকে ব্যাজ, টুপি, ক্রিজঅলা দামি ইউনিফর্ম— নেহাত গাড়ি খারাপ হয়েছে বলেই তারা কয়েকজন রসুলের টাঙায় চেপেছে এবং তাকে ধন্য করেছে—এমন একটা মেজাজে বাসস্টপ পর্যন্ত যাওয়ার যে পথটুকু, তার মধ্যেই রসুল 'পাকিস্তানি' হয়ে গিয়ে আতঙ্কে থাকে। এই ভয় শুধু তার পোশাক, ধর্মীয় পরিচয়, নাকি নামটিরই কারণে তা বুঝে ওঠার পরিস্থিতি তৈরি হয় না। বরং এক অন্ধ ত্রাস তাকে তাড়া করে।

চারজন বসা যায় এমন এক্কায় ছজন পি.এ.সি। তাদের অটোমেটিক রাইফেল-নলে আশ্বিনের রোদ আরও গম্ভীর হয়েছিল। নূরমহল আস্তে চলছিল।

আবে ইক্কাবালে, ঘোড়ে কো দানা নহি খিলাতে হো?

জি সরকার।

উত্তর ঘোড়াকে দানা খাওয়ানোর স্বীকারোক্তি, নাকি দানা না-খাওয়ানোর সমর্থন, বোঝা যায় না। অথচ ছটি সরকারি ইউনিফর্ম হেসে ওঠে। বাঁ হাতে খৈনি-চুন টিপতে টিপতে ফুঁয়ে অতিরিক্ত ধুলোটুকু উড়িয়ে নিচের ঠোঁটের লালায় রাখতে রাখতে একজন রসুলের নাম জানতে চায়। আর একবার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে 'পাকিস্তানি' বিশেষণ পেয়ে যাওয়া।

বাড়ি ফিরে দুপুরের খাবার গলায় আটকে আসে রসুলের, সেই কবন্ধ সন্ত্রাস তাকে তাড়া দেয়, সেই যেবার পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্ডিয়ার যুদ্ধে আমরা বিশ মাইল দূরের গাঁ ছাড়লাম, রাতারাতি। তখনও তো একই কথা—'শালে পাকিস্তানি লোগকো মারকে পাকিস্তান ভাগাও।' সাব্বির, জুলেখা তখনও হয়নি। আব্বাজান তখন তাগদদার রিকশাবালা। রাতে চার পাশে আলো নেই। সবাই ভয়ে ভয়ে গাঁও ছাড়লাম। তখনও আমাদের কোনো খেতি ছিল না। এখনও নেই। সাত-আট ঘর গরীব মুসলমান ছড়িয়ে গেল সাত/আট গাঁয়ে। আবার নতুন করে ঘরবসত। মেহনতের কামাইয়ে এটুকু জমি, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই। একটা ঘোড়া সমেত এক্কা। আমার তো সেই সময় ছয়-সাত। দুই বহিনেরই তখন শাদি বাকি।

আঙনায় বসে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রসুল কিছুতেই বুঝতে পারছিল না তাকে কতটা মুসলমান আর কতটাই বা ভারতীয় হয়ে উঠতে হবে। কাচ্চি থেকে পাকা রাস্তায় সওয়ারি ধরার আগে সদাশিব পানবালা তাকে বলেছিল, শহরের হাওয়া কদিন ধরে গরম হয়ে আছে—যে কোনো সময়—

রসুল তখনও অতটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু এই প্রশাসনিক-পেশী দেখার পর তার ভেতরের বিশ্বাস খুব স্বাভাবিক কারণেই চিড় খেয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাসের ফাটলটি স্পষ্ট করে। —আমি তো নিজেকে মুসলমান হিসেবে এতদিন আলাদা কোনো গুরুত্ব দিইনি। গরীব মানুষের বেঁচে থাকাটাই নিয়মিত যন্ত্রণা। যা ম্যাহেঙ্গাই—লাফিয়ে লাফিয়ে জিনিসের দাম বাড়ছে। সবুজ লুঙ্গি, নীল কুর্তা অনেকটাই তো ময়লা আটকানোর রং। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ এত সাবান খরচের বাবুয়ানি কোত্থেকে করে! তার জামা লুঙ্গিও তো এই একটা, একটাই!

এত সব অনিশ্চয়তার ভেতর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রসুল ঘামছিল। তার আম্মা কখন যেন পানির ঘটি নামিয়ে রেখে গেছে। কেরায়া ঘোড়ার গাড়ির একজন অসহায় ঘোড়ার গাড়ির চালক আশ্বিনের রোদে তার নিজের ছায়াটিকে ছোট হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছিল। কলকে ফুলের গাছে তখন অনেক চড়াই। আকাশে সোনালি উৎসবের রং। কলকের ছায়ায় মা-বকরি দুপুরের ঝিমোনি অথবা জাবরের আয়োজনে। খুঁটে খাওয়া মুরগা-মুরগিরা আরও একটু দূরে, পেয়ারা গাছের গোড়ায়।

পাশে তৃষ্ণার জল, শুকনো কাঠ গলা নিয়ে রসুল এসেছিল। এই টানাপোড়েনে সে কি আরও মুসলমান হয়ে উঠবে? ধর্মবিশ্বাসে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে—নিজেকে চিহ্নিত করবে আমি শুধুই মুসলমান? এমন ভাবনার কাটাকুটিতে তার চোখে ক্লান্তি নামছিল।

'এক ধাক্কা আউর দো/বাবরি মসজিদ তোড় দো'। 'হম হ্যায় সব কামকা/বাচ্চা বাচ্চা রামকা'—এই দুটি ছড়া খুব সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারে সাব্বির শিউপূজন অথবা রামেশ্বরের কাছ থেকে। অনাইট ব্রহ্ম-আস্থানের স্বপ্ন-দেখা শিউপূজন তার বাড়িতে বাবা, কাকা, বড়ভাই—সকলের কাছ থেকেই এই ছড়া দুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শিখে নেওয়ার জন্যেই যেন বা এত আয়োজন। আর এই প্রথম কপালে হলুদ আর লাল চন্দনের পরসাদি টিকা লাগিযে খেলায় আসে শিউপূজন, রামেশ্বর। সাবুয়া, কুন্তা, লল্লু, সুরজ এই টিকাচিহ্নকে অবাক চোখে দেখে। কিছুটা স্বাতন্ত্র তৈরি হয়েই যায়। বিচ্ছিন্নতার বেড়া। আর সাব্বিরতো আরো দূরে।

ভাগড়ের গভীরে শ্যাওলার তেমনই শ্যামলিমা। রোদ পড়লে সেখানে পান্না রং আরও গাঢ়। শাদা বালিতে পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে বালকেরা তেমনই জল ছুঁইয়ে চলে আসতে পারে। তাদের পায়ের শব্দে উড়ে পালায় মাছরাঙা। বাড়িতে উচ্চারিত দুই দুই চার লাইন বারবার কথায় ফুটিয়ে তুলে শিউপূজন আর রামেশ্বর নিজেদের খেলার মাত্রা করে নিতে পারে। সাব্বিরেরও কিছু করার থাকে না। সেও নিতান্ত মজায়, উত্তেজনায় লাইন চারটি বলে। কখনও জল ছেড়ে পাড় বেয়ে ওপরে উঠে এসে, কখনও বা দৌড়ে নিচে নেমে জলের কাছাকাছি এসে, জল ছিটিয়ে, জল ঘুলিয়ে তারা এই চারটি লাইন মুখে মুখে বাতাসে মিশিয়ে দিতে থাকে। এভাবেই বেলা বাড়তে বাড়তে খেলার নির্দিষ্ট সময়টি পার হয়ে যায়।

নিজেদের পেয়ারা গাছটি ছুটে পেরিয়ে এসে আঙিনায় 'এক ধাক্কা আউর দো/বাবরি মসজিদ তোড় দো' বলতে বলতে এক পাক ঘুরে নেয় সাব্বির। তারপর 'হম হ্যায় সব কামকা/বাচ্চা বাচ্চা রামকা'।

আর তখনই রসুলের এক্কাটি এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে।

সাব্বির তখনও নতুন শেখা দুই দুই চার লাইনের ঘোরে। গাড়ির চাকার যান্ত্রিক শব্দে নূরমহলের প্রায় শব্দহীন ল্যাজ নাড়ায় সেই গলার স্বর চাপা পড়ে না। আর রসুল তখনই লাফিয়ে টাঙা থেকে নেমে একটি চড় মাড়ে সাব্বিরের গালে। ভারি হাতের কঠিন থাপ্পড় সাব্বিরকে এক পাক ঘুরিয়ে দেয়। 'আম্মা' বলে কেঁদে উঠতেও তার পিছু বিহ্বল সময় যায়। কপালের ঘাম গামছায় মুছতে মুছতে সাব্বিরকে মারার জন্যে আবারও হাত তোলে রসুল। এটুকু আলোড়নেই খাপরার চালে বসা দুটি কাক ভয়

পেয়ে উড়ে যায়।

চালক, সওয়ারবিহীন এক্কাটি এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিহুল রাবেয়া তার কোলপোঁছা পুত্র সন্তানটির জন্যে দৌড়ে আসে। ধুলো থেকে সাব্বিরকে কুড়িয়ে নিতে নিতে সে রসুলের দিকে কিছু ভয়, কিছু জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায়। কপাল মুখ মোছা গামছাটি জোরে উঠোনে আছড়ে রসুল খর পায়ে কুয়োতলার দিকে যেতে থাকে। মায়ের আঁচলে, বুক ঠিক নয়—স্তন ও নাভির মাঝামাঝি —স্নেহের ছায়ায় সাব্বির আরও জোরে ফুঁপিয়ে ওঠে। তার নাকে রসুন-পেঁয়াজ বাটার সঙ্গে মায়ের গন্ধও ঢুকে পড়ে। দুই করতলে সাব্বিরের মাথা সজোরে নিজের শরীরে মিশিয়ে দিতে দিতে অসহায় রাবেয়া ভেবে পায় না তার বড় ছেলেটি কেন এত রেগে উঠল।

পৃথিবীর নিজস্ব নিয়মে শরৎ শীতে পৌঁছে যেতে চাইছিল। হাওয়ায় হালকা হিম মিশে যাচ্ছিল। আর শেষ রাতে কুয়াশা যদি চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে তার চিত্রকল্পটুকু অস্পষ্ট নারী হয়ে উঠতে পারে, এই ভাগাড়ের ধারে—যেখানে জল আরও নিচে নেমেছে। দামেরা হয়েছে আরও কালচে সবুজ। জ্যোৎস্নায় তারা খুব সহজেই প্রেতিনীর এলোচুল হয়ে যায়। রোটি-শাক, অড়হড়ের দাল, পেঁয়াজ-কাচ্চা মিরচা—এমন সব সাধারণ উপাদানে আম-আতরাফ মানুষজন খুশি থাকে। আরও শীত পড়লে পরদেশী পাখির ঝাঁক নামবে ভাগাড়ে।

এরকমই এক শীতের দুপুরে রসুল আর তার ভাঙা এক্কা ফিরে আসে। যে চারটি কাঠ যাত্রী বসার আসনের চারটি কোণে থাকে, তার একটি উপড়ে নেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর তালি দেওয়া ত্রিপলের ঢাকনাটি ধারালো ত্রিশূলের খোঁচায় ফুটো হয়ে যায়। অযোধ্যাযাত্রী করসেবকরা 'জয় শ্রীরাম' —উচ্চারণে যা প্রায়ই র-ফলা বিহীন হয়ে পড়ে, তার এক্কাটি দখল করে নেয়। ভীত রসুলের কিছু করার থাকে না। ত্রিশূল এবং লাঠি, গেরুয়া, কপালের লাল-হলুদ টিকা—এ সবই তার বিপন্নতার কারণ হয়ে ওঠে। সে বিনীতভাবে গন্তব্যে যেতে না চাওয়ায় হুংকার, ভাঙচুর। দু-একটি 'ধর্মীয়' চড়-থাপ্পড়ও জুটে যায়।

পাকা রাস্তায় অনেকটা তার এক্কায় সওয়ার হয়ে করসেবকরা বাস ধরার জায়গাটিতে পৌঁছয়। রসুল তাদের ইচ্ছেমতো ভাড়াটি নিতে মৃদু আপত্তি করায় আবারও এক প্রস্থ ধমকধামক। ট্রেন-বাস-সর্বত্র বজরঙ্গাবলী আর শ্রীরামের জয়জয়কারে বিনা টিকিটে অনায়াস-যাত্রা। পথে পথে খাবার পাওয়ার লঙ্গার—সেখানে তারা যে ভাড়া দিচ্ছে একদজন ইক্কাবালাকে, যার পোশাক সবুজ লুঙ্গি এবং নীল পাঞ্জাবি—সেটাই যথেষ্ট নয় কি!

সেই বিকেলেই সাব্বিরের বাইরে খেলতে যাওয়া বারণ হয়ে যায়।

তারপরও তো জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসে। সূর্যের আলোয়, উষ্ণতায় আরাম পায় কুঁকড়ে-যাওয়া মানুষ। শীতের পাখির ডানা ঝাপটানিতে, ডাকে ভাগাড় গোটা দিন জেগে থাকে।

সাব্বিরদের দরজা কে যেন ধাক্কা দিয়ে যায় রাতে। সে কি বাতাস! খাপরার চালে মাটির ঢেলা এসে পড়ে। একি কোনো ভূতের কাণ্ড! ধাড়ি ছাগলটি চুরি হয়ে যায় একদিন।

তারপর এক অন্ধকার রাতে, কৃষ্ণপক্ষে তো পৃথিবী নিজেকে আড়ালেই রাখে, এ গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ আসে নি, তাই নিজেদের যা না হলে চলবে না, এমন কিছু এক্কায় তুলে দেয় রাবেয়া, বুড়ো মানুষটি মাথায় টুপি দিয়ে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। পরনে পরিষ্কার কাচা লুঙ্গি, শাদা পুরোহাতা হাঁটু ঝুল কুর্তা। আধঘুমন্ত সাব্বির, চোখে বিস্ময়, হয়ত কান্নাও। পাশে টিয়ার খাঁচাটি। পাখি তো আস্তানা বদলের অনিশ্চয়তা তেমন করে বোঝে না। তাই সে আবারও ঘুমে। দুটো বকরির বাচ্চা। বড় মুরগা-মুরগি তিনটেকে হালাল করে গোস্ত্‌ হয়েছে। দুবেলাই এ বাড়ির বাতাসে মাংসের সুঘ্রাণ। বহুদিন পর। মুরগির ছানারা একটা বড় খাঁচায়, দু একটা কাঠ-টিনের বাক্স-প্যাঁটরা, হ্যারিকেন, জলের জায়গা। মানুষের গেরস্থালীতে তো আরো কত কি থাকে!

নূরমহল ঘাসের থলিতে মুখ ডুবিয়ে চলার রসদ গুছিয়ে নিচ্ছিল। হয়ত তাকে সারারাত হাঁটতে হবে, ছুটতে হবে। সব গোছগাছ করার ফাঁকে ফাঁকে রসুল মাঝে মাঝেই অল্প ঘেমে উঠছিল। কাঁধের গামছায় মুছে নিচ্ছিল ঘামের দানা। তার পরনে আজও সবুজ লুঙ্গি, নীল কুর্তা।

অনেক দূরে, আকাশের গায়ে শীত কুয়াশামাখা একটি তারা ছিল। সুরাইয়া-সাব্বির-রসুলের আব্বাজানের মনে পড়ছিল পঁয়ষট্টির বাস্তুত্যাগের ছবি। এমনই ব্ল্যাক আউটের রাত! আমরা এরপর কোথায় যাব! আরো দূরে! কত দূরে, কোথায়? শুধুই নিজের কওমের মানুষের কাছাকাছি। এককাট্টা হয়ে ছুরি শানাব, বন্দুকে টোটা ভরব, লাঠিতে তেল মাখাব—আমরা মুসলমান, শুধু এটুকুই আমার পরিচয়! অথচ আমার ইসলাম, আমার ইমান তো তা বলে না। তার শাদা, গোল টুপি পরা পাকা মাথাটি বেদনায়, বিষাদে সামনে বারবার ঝুঁকে পড়ছিল।

অন্ধকারে পা বদলাচ্ছিল নূরমহল। রাবেয়া নেমে আসার আগে শেষবারের মতো আগুনের বাঁশের বাতাটি ধরে নারী হয়ে ভেঙে পড়ল। এমন তো হয়েই থাকে। খাপরার চাল থেকে ঝুলে-নামা মাকড়শার পুরনো জাল তার এলোমেলো চুলে জড়িয়ে যাচ্ছিল, পুনিয়া গ্রামের স্মৃতি যেমন। এই আকাশ, নক্ষত্রমালা, এই বাড়ি, পেয়ারা, কলকে গাছ, ভাগাড়, তার জল-বিশাল বালিভূমি।

আব্বুজান—! রসুলের গলায় উৎকণ্ঠা, তাড়া ছিল।

মাথা নিচু করে পিঠ বেঁকিয়ে নিজেকে এক্কার ভেতর ছুড়ে দিতে পেরেছিল এ পরিবারের বৃদ্ধ কর্তাটি। সুরাইয়া ততক্ষণে জেগে গেছে। এক্কায় বসার আগে ছুটে গিয়ে পেয়ারা গাছটিকে একবার ছুঁয়ে, ফিরে আসতে গিয়ে, ফিরে না এসে আবারও অন্ধকারে একটা ছোট হোঁচট খেয়ে নিজের সন্তানের মতোই তাকে জড়িয়ে ধরল রাবেয়া। শীতের একটি বুড়ো, হলুদপাতা শিশিরে ভিজে তার ঘাড়ে নিজের নিয়মেই খসে পড়ল, রাবেয়া টেরও পেল না।

মা-কে ডেকে নিয়ে আসতে অনেকটা অন্ধকার ভাঙতে হলো রসুলকে। এক্কার তেলের আলোটুকু অব্দি জ্বালা হলো না। পাকা রাস্তায় উঠে তারপর। এক্কাতে গুটিসুটি মেরে বসেও রাবেয়ার চোখের পানি বন্ধ হচ্ছিল না।

শুধু নিজের হাতে অভ্যাসে যত্নে ভেজিয়ে আসা দরজাটি তারা বেরিয়ে যাওয়ার

আগেই হাওয়ায় খুলে গিয়ে হা-হা শূন্যতা আর চৌকো অন্ধকার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই চৌকোণা আঁধার-ভূমিতে একটি-দুটি জোনাকি ঢুকে পড়ে আলোর ফুল বুনেছিল, যত্নে। এসব দেখার কোনো লোক ছিল না।

পরদিন সকাল সকালের মতো এসেছিল। লোটা হাতে মাঠ-সারতে যাওয়া মানুষ ভাগড়ের দিকে যেতে যেতে এই ফাঁকা ঘর, শূন্য গৃহস্থালী খুব মন দিয়ে দেখেছিল। তাদের অনেকেরই কানে জড়ানো শাদা পৈতে। কেউ কেউ দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়েছিল ভেতরে কোনো প্রয়োজনের জিনিস পড়ে আছে কি না। দাঙ্গা ছাড়াই, আগুন বন্দুকের শব্দ বাদ দিয়ে যে একটা আস্ত বাড়ি, জমির দখল পাওয়া যায়, এ তারা হয়ত প্রথম দেখেছিল।

শুধু শিউপূজন, রামেশ্বর আর আরো কেউ খেলতে খেলতে একটি নতুন ছড়া বানিয়ে ফেলতে পেরেছিল—

'সাব্বির পাকিস্তানি ভাগ গ্যয়া
ডরকে মারে চলা গ্যযা'

ছড়াটি রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের 'গরম হাওয়ায়' পুনিয়া গ্রামের মুখে মুখে ফিরেছিল। □

উগ্রবাদী

বারিদবরণ চক্রবর্তী

অভির ঘুম ভাঙতে সদ্য ভূমিষ্ঠ বাছুরের মতোই কিছুক্ষণের জন্যে নিথর চোখে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে থাকে। তারপর কম্বলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে। কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে ঘরের মধ্যে দৌড়োদৌড়িই শুরু করে দেয়। বাগুইআটির দেশবন্ধু রোডের ঘরটা ছিল পুবমুখোই এবং বরাবর সে লেট-রাইজার। এক একদিন ঘুম ভাঙতে খাট-বিছানা-ঘরকে নেয়ে যেতেই দেখছে।

কিন্তু সে-সূর্যের সঙ্গে এ-সূর্যের যে তুলনাই হয় না। তবুও তো জানলাগুলো করোগেটেড কাচে কাচে মোড়া, কাচগুলোও আবার সেকেলে ভূর্জপত্রের মতো কর্কশ কাগজের পরত দিয়ে ঢাকা। তা সত্ত্বেও কেমন যেন মনে হয় ঘরটা হয়ে উঠেছে শীতল আগুনের গোলাক বিশেষ।

অভি না দেখতে পাওয়া পূর্ণেন্দুর উদ্দেশে এবার 'দাদা' ডাকটা ছেড়ে ঘটাং করে ছিটকিনিটা খুলে বাক্সের মতো ব্যালকনিটায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু উচ্ছ্বাসটা নিমেষেই উবে যায় পরিবর্তে চাপা হাহাকারের মতোই একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার করে ওঠে—উঃ!

সংলগ্ন ভেতর-ঘরটায় শেভিং সেরে আফটার-লোশনটা সবেমাত্র গালে ঘষতে শুরু করেছিল পূর্ণেন্দু, যেমন ছিল তেমনই রেখে ছুটে আসে।

অভি ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিলেও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি, তাই জবাবদিহি নয়, ঠাকুর্দা পূর্ণেন্দু দত্তের আঙুলের খোঁচা খেয়ে ভর্ৎসনা করার মতো করেই বলে ওঠে—দেখ দেখ, সুন্দর সকালের সূর্য ওঠাটাকেও এরা কী বিচ্ছিরি নোংরা করে তুলেছে!

পূর্ণেন্দু বুঝতে পারে হোটেল চত্বরের সীমানাধরা সারি সারি বালির বস্তাগুলো আর পাঁচিল বরাবর ঝোলানো পাটকিলে রঙের দড়ির জালগুলোর কথা বলছে, উড়ো বাতাসে যত রাজ্যের পলিপ্যাক সেলোফেন পেপার কার্টন সহ যত রকমের উচ্ছিষ্ট বর্জ্য পদার্থ তার মধ্যে বিচ্ছিরিভাবে আটকে আটকে গিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে—ছবি-আঁকা তার চোখ স্বাভাবিকভাবেই এসব সহ্য করতে পারছে না। পূর্ণেন্দু ম্লান হেসে গায়ের ভারি কম্বলটা এক সেকেন্ডের জন্যে বিস্তারিত করে তার মধ্যে চোদ্দ বছরের নাতি অভিজনকে টেনে নিয়ে বলে ওঠে—বাঙ্কার তো থাকবেই। আর ওই দড়ির জাল! কালই তো বলেছিলাম—বোম টোম যাতে পড়েও সেভাবে বাউন্স না করতে পারে তার জন্যেই ওই দড়ির জাল।

অভি ভ্রূ কুঁচকে ঠাকুর্দার দিকে তাকায়—হ্যাঁ, কালই এইসব কথাগুলো বলেছিল বটে। কোনো কথা না বলে চুপ করেই থাকে।

পূর্ণেন্দু দত্তের কেমন যেন মনে হয় অভি মনের চোখে দেখে চলেছে, সে রকমের এক পরিস্থিতিতে এইসব ব্যাঙ্কার আর দড়ির জাল কতখানি ভূমিকা নিতে পারে! অভির কপালের ওপরের উড়ো চুলগুলোকে বিন্যস্ত করতে করতে পূর্ণেন্দু নিজেকে যুক্তিবহ করতে আর এক দফা বলে চলে—তোকে তো বলেছিলাম অভি, মনের চোখে কাশ্মীর বলতে যা যা দেখেছিস তা কিন্তু কিছুই দেখতে পাবি না। এ কাশ্মীর উগ্রপন্থী কার্যকলাপে ফেটে চৌচির। উগ্রবাদী আতঙ্কে একেবারে জবুথবু। তবুও তো তুই কাশ্মীর নামেই নেচে উঠলি। এখন বোঝ!

অভি কাল শ্রীনগর এয়ারপোর্টে নামার পর থেকে ঠাকুর্দার মুখে এই নিয়ে আট থেকে দশ বার উগ্রবাদী কথাটা শুনল। কথাটার থোক অর্থ সে জানে। জানার কোনো অসুবিধে নেই। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরাও কথায় কথায় বলে। টিভির নানা অনুষ্ঠানে আকছার তো বলাই হয়। নিউজ পেপারগুলোতেও পাতায় পাতায় কল্যামে কল্যামে কথাটার ছড়াছড়ি থাকে।

অভি চঞ্চল বাছুরের চোখেই পূর্ণেন্দুর চোখে চোখ রাখে—উগ্রবাদী মানুষ কেন হয় গো দাদা!

অভি বুলি-ফোটা অবস্থা থেকে দা-দা-দা করতে করতে দাদাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরের লোকজনের উপস্থিতিতে যদিও দাদুই বলে, কিন্তু একান্তে দাদাই সম্বোধন করে।

—কেন আবার? যখন বেশ কিছু লোক মনে করে তাদের অনেক কথা আছে এবং যে কথাগুলো ন্যায়সঙ্গত, অথচ সেসব কথাকে কোনো মূল্য তো দেওয়া হচ্ছেই না, উলটোপালটা অন্যায্য কথাগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং যাতে একের পর এক ঘোরতর দুর্দশা সঙ্কট নেমে আসছে দেশ-দেশের জীবনে, তখনই মানুষজন উগ্রবাদী হয়ে ওঠে আর কি!

—কাশ্মীর কেন উগ্রবাদী হয়ে উঠল?

—এবার অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্যে বাংলা রচনা হিসেবে তো তৈরি করেছিলিস। মনে পড়ছে বুঝি সবকিছু!

—হ্যাঁ।

—তা মনে পড়লে মনে পড়ুক। কিন্তু আসল কথা যেন মনে থাকে, যে জন্যে আসা। সবার আগে সে কাজটাই সারতে হবে।

যে কাজটার জন্যে আসা, কথাটা উচ্চারণ করতে করতেই এক ঝলক হিম হাওয়াই যেন নতুন করে পূর্ণেন্দুর হাড়ে বিঁধে যায়। কাল বিকেল থেকে কয়েকবার মনে হয়েছে কথাটা। বাগুইআটির দেশবন্ধু রোডের বাড়িতে বসে যেমন মনে হয়েছিল, তার থেকে ব্যাপারটা যে এত হাজার গুণ শক্ত এবং জটিল কাল ওই বিকেল থেকে বারেবারেই মনে হয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে আসার এই সময়টার মধ্যে কম তো চেষ্টা করা গেল না— পোর্টার, ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে শুরু করে হোটেলের বড় মেজো ছোট সব কর্মচারীকেই তো যতটুকু টেম্পার টিপে টিপে দেখেছে—সবারই বাক্ রোধ। বুঝেছে পরিস্থিতি কত সঙ্গিন হলে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় যে কথা বলা, সেখানেই মানুষ

কুলুপ ঝুলিয়ে দিয়েছে। অথচ এই কুলুপ ঝোলানো পরিস্থিতিতেই তাকে খুঁজতে হবে শালওয়ালা সাদিক বাটমল্লিকের ঠিকানা।

ছেলে পুন্ডরীক যদিও বাধা দিয়ে বলেছিল—যে জন্যে যাচ্ছ সেটা যে কতটা করে উঠতে পারবে তা জানি না। ট্রেসই পাবে না সেই সাদিক বাটের। বেঁচে আছে না কীভাবে আছে কে জানে? তবে এটা ঠিক, আর আসবে না। আসবার উপায় থাকলে ঠিকই আসত। ছ'হাজার দু'শো টাকা তো কম নয়, তার ওপরে আবার শালের ওই ভারী গাঁটরি। সবচেয়ে ভালো করতে, কোনও ঝুটঝামেলা মনঃপীড়া কিছুই থাকত না যদি কাশ্মীর গভর্নমেন্টের ইনফরমেশন ও পাবলিক রিলেসনস্ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা-সমতে মালগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে যেমনটি হয়েছে তেমন তেমনটি বলে দিতে পারতে।

ঝুটঝামেলা এড়াবার জন্যে সেটাই যে ছিল সহজতম পদ্ধতি তা পূর্ণেন্দু যে ভাবেনি তা নয়। ভেবেছিল। কিন্তু সায় পায়নি একেবারে। গত কয়েকটা বছর যেভাবে কাশ্মীরের রাজ্য সরকার চলছে তাকে ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক সরকার বলে মেনে নিতেই পারেনি পূর্ণেন্দু। কেবলই মনে হয় কতকগুলো ওপরতলার পা-চাটা হম্বিতম্বিমার্কা লোক শাসনের নামে নিজেদেরকেই গুছিয়ে নিচ্ছে। কাশ্মীরের মাটি ও মানুষের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই নেই। ছ'হাজার দুশো টাকাটা নয়ছয় হয়ে যাবে। একদিনের জন্যেও তারা সততার সঙ্গে সাদিক বাটের খোঁজখবরের উদ্যোগ নেবে না। তা ছাড়া অনুরাধাও তো একটা বাধা হয়ে আছে না! কেমন যেন মনে হয় শেষ পর্যন্ত অনুরাধার সঙ্গে সাদিকের সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একটা গভীর পর্যায়ে। অনুরাধার মৃত্যুতে ছেলে পুন্ডরীককে সেভাবে কাঁদতে দেখেনি। কেমন যেন মনে হয় সাদিক যখন শুনবে অনুরাধা মারা গেছে, ঠিক কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু এসব কথা তো বলা যায় না। শুধু প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়ে বলে উঠেছিল— না না। খুঁজে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না। তিন-তিনটে ঠিকানা আছে। তার মধ্যে দুটো খোদ শ্রীনগরেরই, আর একটা তার দেশের বাড়ি। তারপর সাদিকদের বংশ বলে কথা!

—তাহলে যাও। কাশ্মীর তো। তার একটা চার্ম আছেই। যতই মিলিটারি শহর হয়ে উঠুক না কেন। হোটেলগুলো তো সব আছেই। বেশি সাহস-টাহস দেখাবে না। আ। তা ছাড়া তোমার একটা ব্রেকও দরকার। ষাটটা বছর একটানা খাটাখাটুনির পর ক'দিনের জন্য একটু ঘুরে-ফিরে আসাও খারাপ নয়। হলে হোক না সাদিক উপলক্ষ।

কোনো ভাবনাই ছিল না সাদিক বাটের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া নিয়ে। মূল ভাবনাটা ছিল নাতি অভিকে নিয়েই। লাবনি আর পুন্ডরীকের ছাড়াছাড়িতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে না অভিরই। যতটা না বোঝার তার থেকেও যেন বেশি বুঝে গেছে। লাবনি চলে যাবার পর থেকে সেই যে নির্বাক হয়ে গেছে মা সম্পর্কে, তার অন্যথা একটা দিনের জন্যেও ঘটাতে চায়নি। পুন্ডরীকের সঙ্গেও কথা বলাটা কীভাবে যেন কমিয়ে নিয়েছে। কোনো কিছুর একটা উপলক্ষে অভিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লে ছেলেটাকে যে দেহে-মনে আস্ত রাখা যাবে না এ নিয়ে যেন একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছে গিয়েছিল পূর্ণেন্দু। স্ত্রী-বিয়োগটা পূর্ণেন্দু সহজের থেকে সহজভাবে নিয়েছে। নিতে পারেনি লাবনি আর পুন্ডরীকের

ডিজোর্ডটা—বিশেষত যার সঙ্গে ওইভাবে যুক্ত অভি। কোনো দিন ভুলেও মা-বাবার জীবন নিয়ে কিছু জানতে চায়নি, শুধু বেশি বেশি করে লিপ্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে। অনুরাধা থাকতেই যদিও, মা বাবা তো নয়ই এমন কি ঠাকুমাকেও ডিঙিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্কটা পাকতে শুরু করেছিল। তবু পুণ্ডরীক তো শেষাবধি ওর বাবাই! কিন্তু প্রস্তাব শুনে শুধু ছেড়েই দেয়নি, বরং উৎসাহিত হয়ে বলে উঠেছিল— না, না। আমার মত থাকবে না কেন! বরঞ্চ ভালোই হবে। তুমি একটু রেস্ট্রেইনড থাকবে। প্রকারান্তরে তো উর্দি শাসনই না! তুমি একটা উটকো লোক গিয়ে সাদিক বাট সাদিক বাট বলে ঘুরে বেড়াবে, নানান ধরনের সন্দেহ প্রশ্ন আসতেই পারে, সেটা থেকেও তোমাকে কিছুটা দূরে রাখতে পারবে অভি। আর কিছু না হোক একটা নালায়েক আনপড় ছেলেকে দিয়ে নিশ্চয় এস্‌পিয়োনেজ বা স্যাবোটেজের কাজকম্ম—

ন্‌ ন্‌, এসব কিছুই নয়। বড় খটকাটা পূর্ণেন্দুর লেগেই ছিল অভিজনের দিক থেকে ভাবতে গিয়ে। কিচ্ছু ভাল্‌লাগেনা'র দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলা হবে না তো! বাড়িতেও আপাতত সে-পরিস্থিতিতে ছেলেটা আছে ঠিকই। কিন্তু তবুও তো বাড়ি—জন্ম হয়েছে, চোখ ফুটেছে এই পরিবেশেই, এখানকার আলোবাতাসের সঙ্গে ভাব-আড়ির সহজ সম্পর্ক, আর তুষারাবৃত সেই কাশ্মীর! তাই যাত্রাপথটাকে যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর করার জন্যে বিমানেরই টিকিট কেটেছিল পূর্ণেন্দু দত্ত। তবুও—

তবু ওর ভয়টা একেবারেই পূর্ণেন্দুর ছেড়ে গিয়েছে শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছনোর পর থেকে। চরকির মতো দু'চোখ বনবন করে কেবলই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেছে আর তার শার্টপ্যান্টের খোঁট খামচে খামচে ধরে চাপা স্বরে ফিসফিসিয়ে গেছে— দাদা, ওই দেখ, ওয়াকিটকি। ওই দেখ, ওই দেখ— ওই গুলোকেই বলে না, সেলফ লোডিং রাইফেল— আচ্ছা, একবার ট্রিগার টিপলে ঠিক কত গুলি বেরোয় গো! আচ্ছা, ওই যে ওই তিন কাঠির ফাঁসিকাঠের মতো স্ট্রাকচারগুলো খাড়া করা রয়েছে, আর সমস্ত লোকজন তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে— আমাদেরও তো ওর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে না! ওকেই কী বলে মেটাল ডিটেক্টর, না!

কিন্তু নতুন করে আর একটা ভয় চেপে বসে যে পূর্ণেন্দুর। যে জন্যে আসা সেই সাদিক বাটকে খুঁজে পাওয়া যাবে তো! রাস্তার দু'দিকে যেভাবে বালির বস্তা, কাঁটাতারের বেড়া, মধ্যে মধ্যেই পপলার গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে জোড়া নতুন নতুন চেকপোস্টের ঘের! যেভাবে ঝাঁ চকচকে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বাসাডারটা থেকে ড্রাইভার ছোকরাটা ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার ভঙ্গিতে তাদের গাড়িতে উঠিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলে গেল— চলুন, চলুন তো, হোটেল যাবেন তো, হোটেল পৌঁছে যা হোক একটা কিছু দেবেন, ব্যাস্‌! তাতে সেই ভয়টাই যে চেপে বসল। খুঁজে পাওয়া যাবে তো সাদিক বাট নামের সেই যুবকটিকে! সেভাবে চেহারাটাও তো মনে নেই। বরফ-কুচির প্রলেপ লাগানো পাইনের হাওয়াতেও পর্ণেন্দু দত্তর মাথাটা ঘামতে শুরু করেছিল।

সেই ঘামটাই নতুন করে বিনিবিনিয়ে উঠতে থাকে পূর্ণেন্দু দত্তর। সেই গাড়িটাই আসবে। কালই বলা-কওয়া হয়ে গেছে। আসবে ঠিক এগারোটায়। হঁ, ব্রেকফাস্ট সেরে

অনেক আগে থেকেই ঘর থেকে হোটেল-লাউঞ্জে এসে যায় পূর্ণেন্দু দত্ত নাতি অভিজনকে নিয়ে।

লাউঞ্জটা ভালো ঠিকই। কিন্তু আরো ভালো ছিল ঘরটা। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে তো কথাই ছিল না। মেঘ রোদ কুয়াশা আকাশ যেমনটি যেভাবে দেখতে ভালো লাগে, ঠিক তেমনটি। কিন্তু গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছিল ছাড়া-ছাড়া পাইনগাছগুলো! কেমন যেন পূর্ণেন্দু দত্তর কল্পনার মধ্যে এসে গিয়েছিল, ওই— ওইটুকু সময়ের মধ্যেই। ওরা সব কানাকানি হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছে তার এই আজব ভ্রমণ নিয়ে, থেকে থেকে দু'একজন বড্ড প্রগল্‌ভ ভঙ্গিতে শাখাপ্রশাখা দোলানোর ছলে ছুঁড়ে দিতে শুরু করেছিল অশোভন মন্তব্য— বুদ্ধ গাছে ফলে না, মানুষের মধ্যেই থাকে।

গড়পড়তা পর্যটকদের কথা ভেবে এমন জ্যামিতিক সৌষ্ঠবে তৈরি হয় যাতে ঘর তো ঘর, লাউঞ্জেও প্রকৃতির উদার অভ্যর্থনা ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেদিক থেকে লাউঞ্জে এসেও পাইনগাছগুলোর অসভ্যতা থেকে পার পাবে না, পূর্ণেন্দু ভেবেই নিয়েছিল। কিন্তু তবুও লাউঞ্জ তো। এটা-সেটার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ থাকবে। দু'চার জন পর্যটক বা ট্যুরিস্ট তো থাকবেই, তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েও সময় কাটাতে পারবে। ইচ্ছে হলে ভাবতে পারবে সামগ্রিক পরিকল্পনাটা নিয়ে আরো একবার। তা না হলে সবকিছুকে দূর ছাই করে দিয়ে ভাবতে পারবে মৃত স্ত্রীকে নিয়ে, পুত্র-পুত্রবধূর ডিভোর্সটা নিয়ে, নাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা পাইনগাছগুলোর নিরঙ্কুশ গ্রাসের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে না।

তাই সময় নিয়েই ঘর থেকে লাউঞ্জে নেমে এসেছিল পূর্ণেন্দু। এবং সময়টার পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করে চলেছিল নাতি অভিজন। ছুটে ছুটে ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে দূরবীনটা চোখে ধরে ধরে নিবিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আর বুঝি পারে না। দূরবীনটা বুকে ঝুলিয়ে নিয়েই এগিয়ে আসে দাদু পূর্ণেন্দু দত্তের দিকে অভি— আচ্ছা দাদা, আমাদের এই হোটেলটার ঠিকানা তো রেসিডেন্সি রোডই, স্টেট ব্যাঙ্ক— যেখানে আমরা যাব সাদিকের খোঁজে। সেটাও তো এই রেসিডেন্সি রোডই না! আমরা হেঁটে গেলেই তো পারি।

—তা তো পারিই—

—তাহলে চল না আমরা বেরিয়ে পড়ি। তুমি তো আগেও কাশ্মীরে এসেছ। চিনে নিতে পারবে না?

—দু দু'বার এসেছি। যদিও অনেক আগে। একবার তোর দিদার সঙ্গে বিয়ের ঠিক আগে, একবার বিয়ের ঠিক পরে। সেসব তো অনেক দিনের ব্যাপার। তবুও অসুবিধে হবার কথা নয়। আর কেনই বা হবে, স্টেট ব্যাঙ্ক বলে কথা! কিন্তু যেভাবে কাঁটাতারের ফেন্স, ব্যাঙ্কার, অ্যাসল্ট কালাশনিকভ রাইফেল নিয়ে নিয়ে মিলিটারিরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে পদব্রজ কি ঠিক হবে! ফ্যাসাদে পড়ে যেতে পারি। গাড়িই ভালো। তবুও মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন থাকবে। তারপর ড্রাইভার ছেলেটাও স্মার্ট। কী যেন নাম বলল?

—গোলাম রসুলকর।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, গোলাম রসুলকর।

গোলাম রসুলকর সম্পর্কে আর কোনো জাবর কাটায় উৎসাহ না দেখিয়ে অভি এবার দাদুর হাত ধরে টান দেয়— চল না চল। কী সেই থেকে এক নাগাড়ে এক জায়গায় বসে আছ!

— কিন্তু যাবটা কোথায়?

ছেঁড়া ছেঁড়া কাগজের পরত লাগানো কাচ আর গ্রিলের বিশাল দরজাটা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ায় অভি। ঝোলানো দূরবীনটা দাদুর হাতে দিয়ে বলে ওঠে—দেখ না দেখ, যে কোনো একটা মিলিটারিকে দেখ, দেখেছ তো ওদের আর্মসগুলো। আচ্ছা, ঝাঁকে ঝাঁকে যে ওইসব যন্ত্র থেকে গুলি বেরনোর কথা শুনি, তার মানে কী বল তো। ঝাঁক বলতে কতগুলো গুলিয়ে বলে? গুলি যাতে থাকে তাকে তো ম্যাগাজিন বলে। একটা ম্যাগাজিনে কতগুলো গুলি থাকে গো? একটা এইরকম আর্মসে কতগুলোই বা ম্যাগাজিন রাখা যায়?

এইভবে ফৌজিলোকদের হালচাল নিরীক্ষণ করা সমীচীন নয়, তবু অভির অনুরোধ ঠেলতে না পেরে মুহূর্তের জন্যে চোখে তুলে আবার মুহূর্তের মধ্যেই দূরবীনটা নামিয়ে নিয়ে বলে ওঠে— অত কী আর জানি, তবে কোনো কায়দায় নিশ্চয় দুটো একটা বেশি ম্যাগাজিন জুড়ে নেওয়া যায়? তা না হলে আর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটবে কী করে!

কাল মনে হয়নি, আচম্বিতে এখনই মনে হয় পূর্ণেন্দু দত্তর, যদি কোনো কারণে গোলাম রসুলকর না আসে তবে আজকের দিনটা কি বৃথাই কাটিয়ে দেবে! নাতিকে তো গর্ব করে বলল দু-দু'বার কাশ্মীরে আসার গল্প। তা সত্ত্বেও কি রেসিডেন্সি রোডের স্টেট ব্যাঙ্কটায় যেতে পারবে না! অনেকগুলো বছরের ব্যবধান নিতান্তই পলকা যুক্তি। বেড়াতে মানুষ কেন আসে! যদি না তার থেকে কিছু সঞ্চয় নিয়ে যেতে পারে, যাতে ব্যবহারিক জীবন কিছু ভরসা খুঁজে নিতে না পারে! দু-দু'বার কাশ্মীরে এসেছে, কাশ্মীর শ্রীনগরের এই রেসিডেন্সি রোড কলকাতার চৌরঙ্গি রোডের মতো, অথচ জানতে চায়নি এই রাস্তাটার শুরু কোথায় শেষই বা কোথায়? কানেকটিং রাস্তাগুলোর নাম কী কী? দু-দু'বার সময়গুলো কাটিয়েছে শুধু পপলার পাইন চিনার বিচ এলম চিনে চিনেই। আর যেখানেই গেছে, সে বাজার দোকান হোক বা ডাল লেকের শিকারা,বৈষ্ণোদেবীর মন্দির, সেলিম চিস্তির দরগা, ঝিলমের সেতু— সব, সবখানেই শুধু কান পেতে রেখেছে মানুষজনের মুখের ভাষার দিকে। এই কয়েকটা দিনে যদিও কিছুই বোঝা যায় না তবু লক্ষ্য করে গেছে ডোগরা, লাদাকি, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি। লোকে বলে কাশ্মীর উপত্যকা নাকি ফুলের রাজ্য। তার তো মনে হয়েছে ভাষার রাজ্য। বড় বড় এইসব ভাষাগুলো ছাড়াও আরো কত ভাষাই না আছে— কষ্টবাবি, রমাবনি, শিবাজি, কোন্ডলি—

না, নিজেকে নিয়ে আর বিব্রত হতে হয় না পূর্ণেন্দু দত্তর। হাজির হয় অ্যাম্বাসাডার ড্রাইভার গোলাম রসুলকর। তড়বড়িয়ে ওঠে অভি। কিন্তু যাবে কোথায়? লালচওক না প্রতাপ পার্ক কোথায় নাকি ক্র্যাকডাউন হয়েছে। নতুন করে সারা অঞ্চল জুড়ে মিলিটারি ব্যারিকেড পড়ে গেছে।

দূরদর্শনের দৌলতে সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দি শুনতে শুনতে উর্দু-ঘেঁষা হিন্দি শোনার কানই

পায়নি অভি। তার ওপরে 'ক্র্যাকডাউন' কথাটার অর্থই বোধ হয় সেভাবে বুঝতে পারে না। তবু মোদ্দা কথাটা যেন বুঝেই যায়, এলোপাথাড়ি গুলির লড়ায়ের মতোই একটা কিছু হবে। দাদু যদিও বলে দিয়েছে বড়রা কথা বললে ছোটদের শুনতে হয়, মন্তব্য করতে নেই, তবু দাদুকে বলে ওঠে—অন্য কোনো বাইপাসে যাওয়া যায় না?

রসুলকর বাংলা না বলতে পারলেও বোঝে। ঘাড় মাথা চুলকে বেরিয়ে পড়তে রাজি হয়ে যায়। আর সেই কোন্ সকাল থেকেই তো নাতি-দাদু তৈরি হয়ে বসে আছে লাউঞ্জে। পলকও লাগে না পা বাড়াতে।

কিন্তু গাড়ি স্টার্ট দিতেই ছুটে আসে ফৌজি অফিসার। এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করতে করতে মাথা ঝুঁকিয়ে গাড়ি থেকে ব্যাগটা টেনে নেয়। বার করে ফেলে ক্যামেরাটা। উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে ক্যামেরার রিলটা বার করে নিয়ে ফেরত দিয়ে দেয় ফাঁকা ক্যামেরাটা। তারপরই টান দেয় অভির গলায় ঝোলানো দূরবীনটায়। দূরবীনটা কিন্তু ফেরত না দিয়েই ফর্মের মতো কী একটা কাগজে ঘষঘষ করে কিছু একটা লিখে পূর্ণেন্দুর হাতে গুঁজে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যায়।

অ্যাম্বাসাডার স্টার্ট দেয়।

পূর্ণেন্দু বিড়বিড় করে ওঠে—

—দূরবীনটা বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না!

—কেন, পাওয়া যাবে না?

—এখন তো সিজ করল, পরে দেখবে কতটা রেঞ্জের এটা। তেমন দূরত্বের হলে হয়তো পাকাপাকি ভাবে সিজ করে নেবে। কেননা ওদের বিবেচনা বলবে একজন সিভিলিয়ানের পক্ষে এতটা দূরত্বের বায়নাকুলারের দরকার হয় না।

— বা রে, পাহাড়-উপত্যকায় মানুষ তো লং লং ভিউ দেখবার জন্যে দামী দামী বায়নাকুলারই নিয়ে আসে।

—সে তো আমাদের কথা, ওদের কথা অন্য।

অভির চোখটা ছলছল করে ওঠে। দূরবীনটা তার খুব প্রিয় ছিল। মনের সুখে সে সকাল থেকে ব্যবহারও করে যাচ্ছিল। সান্ত্বনার মতো করে পূর্ণেন্দু নাতির কাঁধে ডান হাতটা ছড়িয়ে রাখে। কিন্তু তাতে যেন দুঃখটা নতুন করে উথলিয়েই ওঠে— দূরবীন নেই, ক্যামেরা নেই। অথচ ঠিকই কাজে যাচ্ছি, কিন্তু ফেরার পথে এদিক-ওদিক করতে করতে—

— মন দিয়ে দেখবি বুঝবি, মগজে ছবি তুলে রাখবি। মন এবং মগজ দুটোই তো তোর আছে না কি!

—ঠিকই।

পূর্ণেন্দু দত্তর মজ্জাতরাম শর্মা নামের সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ে। সেই যে দ্বিতীয়বার কাশ্মীরে যখন এসেছিল, তখন ভাড়াগাড়ি সেই অস্টিনটার ড্রাইভার ছিল। কী কথাই না বলত! বিয়ে করেই ঠিক পর পর এসেছিল অনুরাধাকে নিয়ে। যুবক গোছের কোনো তৃতীয়পক্ষই সে ভ্রমণে কাম্য নয়, তবু কী করেই না ছেলেটা জায়গা করে নিয়েছিল। কাশ্মীর মানেই না খোলা আকাশ খোলা বাতাস খোলা মন। মনে পড়ে সাদিক

বাটকে। ওই কাশ্মীরী-মন থাকার জন্যেই না অনায়াসে ভাই হয়ে উঠেছিল। প্রথম এ
ঠেস দিয়ে অনুরাধাকে বলত 'কী, তোমার পাতানো ভাইয়ের খবর কী!' তারপর ক্র
ক্রমে পাতানো কথাটাই জিভে তুলতে লজ্জা পেত। অথচ সত্যি বলতে পাতানো
আর কী! কাশ্মীর থেকে ফিরি করতে আসা এক শালওয়ালা যুবক এক ঝড়বৃষ্টির
শালের গাঁটরি ভিজে নষ্ট হয়ে যাবার ভয়েই সামনে বড়সড় বাড়ি দেখে একদিনের ব
গাঁটরিটা রেখে যাবার প্রস্তাব করেছিল এই তো! যেহেতু সেই বছরটায় শীতের দিনগু
প্রায়ই ঝড়বৃষ্টির উৎপাত লেগে থাকত সেই হেতু প্রস্তাবটা প্রায়ই আসত। এবং ক্র
ক্রমে তারই বাড়িটা ওইসব মালপত্তরের সাময়িক আস্তানা হয়ে উঠেছিল।

ওই মজাতরাম শর্মা আর সাদিক বাটের তুলনায় গোলাম রসুলকরের আচরণকে
বিসদৃশ মনে হয় পূর্ণেন্দুর। রসুলকর কি পারে না তার পাশের জায়গাটায় অভিকে বে
নিয়ে বসাতে? যেটুকু বাংলা বোঝে তারই সম্বল নিয়ে তাকে সঙ্গ দিতে? যেভ
এয়ারপোর্ট টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে রাস্তায় নামা মাত্রই গাড়িটাকে চক্কর দিয়ে তা
সামনে দাঁড় করিয়ে প্রায় হাত ধরেই টেনে তুলল, তাতে তো বেশ বোঝা য
যষ্ঠেন্দ্রিয়ের দিকটা তার খুবই প্রখর। সেই প্রখরতা দিয়ে কি বুঝতে পারছে না এই ব
মানুষটি কিশোরটিকে নিয়ে প্রায় নাজেহাল হয়ে উঠেছে, এই একটা দিনের মধ্যেই। এ
আবর্ত থেকে টেনে আনতে গিয়ে আর এক ভয়ঙ্কর আবর্তের মধ্যে এনে ফেলেছে।
কি পারে না বয়সোচিত একটা সঙ্গ দিতে? ফারাকের মধ্যে কতটুকুই বা ফারাব
একজন কিশোর, অন্যজন সদ্য-যুবক।

সাদিক বাটের প্রথম ঠিকানাটা ছিল, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শ্রীনগর শাখ
রেসিডেন্সি রোড। তার সহোদর মকবুল বাট, আলিগড় য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট, এ
শাখারই অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউনটেন্ট। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দাঁড়াতেই পূর্ণেন্দু দত্ত
গোলাম রসুলকরের ওপর ভাসা-ভাসা প্রত্যাশাটা একেবারে বিপরীতমুখী ক্ষোভে পরিণ
হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক শ্রীনগর শাখা এই-ঠিকানা থেকে উঠে গেছে পঁচিশ নম্বর শেরওয়া
রোডে। আপাতত এটা হয়েছে সেনাবাহিনীর ইন্টারোগেশন সেন্টার। সন্দেহভাজন লোকেদে
এখানে ধরে এনে ঘন্টার পর ঘন্টা জেরা করা হয়।

ভারি অদ্ভুত লাগে পূর্ণেন্দু দত্তর। স্টেট ব্যাঙ্কের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছ'মা
ধরে তার ঠিকানা বদল করেছে, অথচ সে-খবর রাখবে না স্থানীয় ট্যাক্সি ড্রাইভার
বয়সের অধিকার নিয়েই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না, আরে
দুর্বোধ্য ভাষার আড়াল নিয়ে কী যে সব বলে যায়! পূর্ণেন্দু বুঝতে পারে, ইচ্ছে করেই
ভাষার আড়ালটা রেখে চলেছে। সময়ে সময়ে এই বহুভাষী দেশে ভাষা ধর্মগুলো এই
আড়াল করার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে চলে। নাহলে ভাষা ধর্ম তো কোনো বাধাই নয়!

নতুন করে মনে পড়ে যায় সাদিক বাটি মল্লিকের কথা। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের
শেষের দিকে কি অক্টোবরের প্রথমে আসত সাদিক, বিক্রিবাটা করে ফিরে যেত এপ্রিলের
প্রথমেই। তিন থেকে চার বছরের এই ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই কী করে যে কাশুর নামের
কাশ্মীরের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল অনুরাধাকে। অনুরাধা ভাষাতত্ত্বের
মেধাবী ছাত্রী ছিল ঠিকই। তবু কয়েকটি মাসের কয়েকটি দিনের ওই রকমের আলগা

আলগা আলাপচারিতার মধ্যে থেকেই! কাশ্মীরের সংস্কৃতের অপভ্রংশ কাশুর, যা ছিল জনপ্রিয় কথ্য ভাষা। ওই ভাষাতেই সে বলে গিয়েছিল তার পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত।

বহু-বহু বছর আগে অমরনাথ মন্দিরের শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেছিল তাদেরই পূর্বপুরুষ—আক্রাম বাট মল্লিক। মেষ পালনই ছিল তাদের পুরুষানুক্রমিক জীবিকা। মেষ চালনার পথে ঝড়ঝঞ্ঝা-তুষারপাতের এক দিনে আত্মরক্ষার্থে গুহাগহ্বরে আশ্রয় নিতে গিয়েই দর্শন করেছিল ওই তুষারলিঙ্গকে।

সেই থেকে আজও এক-প্রথা চলে আসছে, হিন্দুতীর্থ অমরনাথ মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ওই আক্রাম বাট মল্লিক বংশেরই একজন।

আজও মনে পড়ে সেদিনের কথা। যেদিন এ গল্পটা বলেই হো হো করে হেসে নিয়ে সিম্বাত্ত টেনেছিল সাদিক— সেহি লিয়েই তো বোলতা হ্যায় দিদি, রিলিজিয়ন কী লিয়ে যো কুছ হোতা সব ভি এক্সপ্রয়েটশন কা লিয়ে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কা লিয়ে।

—হ্যাঁ, যেমন তুমি আমাকে এক্সপ্লয়েট করে যাচ্ছ, তেমার পিতৃপুরুষ সেই আক্রম বাটের গল্প শুনিয়ে আমার বাড়িটাকে তোমার শাল-গুদোম বানিয়ে। বিনা পয়সার গুদোম।

—বিনা পৈসা কেন বোলছেন দিদি? যেমন যেমন মাসভর আদায় করি, আপনার কাছে তো রাখি না কি! আপনি তো তা থেকে ফায়দা তুলে নিতে পারেন। মাহিনা চার-পাঁন্চ তো আপনার কাছেই পাঁচ-ছ'হাজার রুপেয়া থেকে যায়।

পাতানো ভাইবোনের মধ্যে পূর্ণেন্দু সচরাচর মাথা না গলালেও সেদিন বলে উঠেছিল— না, সাদিক না। শালটাল রাখতে তবুও না হয়— কিন্তু যেভাবে হাজার হাজার টাকা রাখতে শুরু করেছ তাতে... যদি কোনোভাবে কোনোদিন বেপাত্তা হয়ে যাও—

—তাহলেও তো হামার পাত্তা থাকলই। শ্রীনগরের দুটো এড্রেস তো দেওয়া আছে না, আরও একটা ভি গাঁওকুঠির এড্রেস লিখে রাখুন— কাশ্মীর, জিলা অনন্তনাগ, ভিলেজ সিরকাঙ্গালিগুণ্ড।

বলতে বলতেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল অনুরাধাকে— চোলেন না দিদি চোলেন, হামরা গাঁও চোলেন, দেখবেন ঝর্ণা, বরফ, নদী। দেখবেন বুধ্‌ধিস্টদের ভি গুম্ফা হামাদের ভি মসজিদ— মাজার— দাগা, আপনাদের ভি মন্দির। বুঝতে ভি পারবেন না কোন আদমি হিন্দু মুসলিম বুধ্‌ধিস্ট আছে?

—সে কী করে হয়। এতগুলো ধর্ম যখন হয়েছে এবং আছে। তখন তাদের চেনারও ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি। ইয়ে বাত ঠিক হ্যায়। এক আদমি থেকে দুসরা আদমির হাথ পাও মুহ হোটে যেমন আলাদা আলাদা হয় না! চোলেন না দিদি চোলেন, একবার ভি হামারা সঙ্গে কাশ্মীর কা গাঁওদেশে চলেন। দেখবেন কাশ্মীর আমজনতা কী চিজ আছে!

সেদিন বোধ হয় একটু বেশিই কথা বলেছিল সাদিক বাট। সিরকাঙ্গালিগুণ্ড গ্রামের কথা। তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কথা। জীবিকার কথা। যেহেতু মুসলিম ঘরানা, একাধিক স্ত্রী নিয়ে দিন গুজরান করা কোনো অপরাধ নয়, সেহেতু শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত তাদের বংশের মানুষজনের পেশায় এসেছে ভিন্নতা, বিচিত্রতা। যেমন তার সহোদরেরা লেখাপড়া শিখে সরকারি সওদাগরি কাজে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি কেউ কেউ থেকে গেছে ওই

খেতির কাজে, খোঁয়ারের কাজে। কেউ কেউ বা ওই অমরনাথ তীর্থমন্দিরের ছড়িদারির কাজে।

রসুলকরের ভাবলেশহীন মুখের চামড়া আর পাথুরে চোখ দুটো যতই দেখতে থাকে ততই পূর্ণেন্দু দত্তর নতুন করে মনে পড়ে যেতে থাকে সাদিককে। সাদিককে তার খুঁজে পেতেই হবে। শেরওয়ানি রোডে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু সেই শেরওয়ানি রোডটা ঠিক কোথায়? আজই যাওয়া যাবে কি না— এইসব জিজ্ঞাস্য নিয়ে উচ্চবাচ্য করতেই কেমন যেন অবসাদ লাগে।

অবসাদের দুর্ভার বোঝা নিয়েই হোটেলে ফিরে আসে পূর্ণেন্দু দত্ত। ঘরে যাবার উৎসাহই যেন হারিয়ে ফেলে। লাউঞ্জের সোফাতেই ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ে।

—দাদা! ও দাদা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চোখ খুলতেই দেখে পাশে এসে বসেছে অভি।

—না। কিছু বলবি মনে হচ্ছে!

—এ কে সাতচল্লিশ আর এ কে ছাপান্ন রাইফেল চিনতে পারলে?

— কী করে চিনব, বন্দুক রাইফেলই বা আমাকে দেখাল কে?

—কে আবার দেখাবে? অত যে সব মিলিটারি দেখলে না রাস্তায়, ওদেরই হাতে হাতে ছিল।

—কথায় বাহাদুরি নেবার জন্যে ওইসব রাইফেল বন্দুকের নাম আমরা করি বটে, কিন্তু সত্যি কি চেনা যায়?

—কেন, আমি তো চিনতে পারি। চিনতে পারলামও।

পূর্ণেন্দু দত্ত চমকে নাতির মুখের দিকে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে ওঠে— তোকে তো আমরা কখনো টয়গানও কিনে দিইনি। এসব চিনলি কী করে?

— বা রে, চিনিয়ে না দিলে, হাতে উঠিয়ে না দিলে কিছুই চেনা যায় না, হাতে নেওয়া যায় না, এ তোমাকে কে বলল?

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওঠে যেন পূর্ণেন্দু দত্ত। বড্ড তাড়াতাড়ি যেন বড় হয়ে গেল অভিটা। নতুন করে রাগ হয় ছেলে ছেলের-বৌয়ের ওপর। ওরাই ওদের কলহ কটুকাটিব্যের মধ্যে দিয়ে ছেলেটাকে বড় করে দিল। শিরশিরে অনুভূতিটাই নিয়ে বলে ওঠে—চল, কিছুই যখন করা যাবে না, ঘরে গিয়ে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ে দাদু নাতিতে মিলে জমিয়ে গল্প করা যাক।

কোনো যুক্তিতেই পূর্ণেন্দুর ছোট ছেলেদের এই বড় বড় ভাবটা ভালো লাগে না। বড় বড় ভাব দেখলেই মনে হয় তাদের এই বাড়ন্ত ভাবটা দু'দিনের মধ্যে গুটিয়ে যাবার নামান্তর মাত্র। তাই বড় বড় ভাবটা দেখলেই মনে হয় গানে গল্পে ছবিতে আকাশ-বাতাসের সমারোহে সব শূন্যস্থান ভরাট করে দিতে। কিন্তু কী যে করবে? কী যে বলবে বুঝে উঠতে পারে না। বাইরে এত সুন্দর আকাশ বাতাস মেঘ ফুল, তা সত্ত্বেও কাচ-আঁটা ঘরে কম্বলের তলায় থেকে যেতে হচ্ছে।

কথা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই বলে ওঠে পূর্ণেন্দু— গুলিবারুদ রাইফেল রিভলবারের সব খবরই তো জানিস, বল্ দিকিনি আজ পর্যন্ত কাশ্মীরের শাসন টাসনগুলো যারা চালিয়েছে

সেই-সব টপ কর্তাব্যক্তিদের নামগুলো। বল্ বল্— যেমন ক্যুইজের যুগ এসেছে, আর তুই পারটিসিপেট করতে চাস।

— ফারুক আবদুল্লাহ, শেখ আবদুল্লাহ, জগমোহন, কে ভি কৃষ্ণারাও— মুফতি

— দুর দুর, এ তো মোটে চারটে-পাঁচটা নাম বললি। প্রথম থেকে ভালো করে বল্— শেখ আবদুল্লা, বক্সি গোলাম মহম্মদ, সামসুদ্দিন, সাদিক, মীরকাশিম, ফারুক আবদুল্লো, জে এম শাহ, তারপর এইসব জগমোহন, গিরিশচন্দ্র সাকসেনা, কে ভি কৃষ্ণারাওরা—

—প্রত্যেকেই কি কাঁটাতার ঘিরে ব্যাঙ্কারের আড়াল থেকে এইভাবে শাসন চালিয়ে গিয়েছে—

— অভি!

— দেখছ না যেভাবে সবকিছু চলেছে, আদ্যিকাল থেকে এসব চলতে চলতে এটাই এখানকার জীবনের হাড়মাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে। একদিকে স্পিকটি নট—বোবার জগৎ, অন্যদিকে পুলিস মিলিটারি আর আমাদের মতো কিছু বাইরের লোকজন। উঃ, দেখছ না, সবাই কী রকম চুপচাপ! সাত চড়ে রা কাড়তেও চায় না।

পূর্ণেন্দু দত্ত ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে। বয়স্ক মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে কী ভয়ঙ্কর উপলব্ধিতে পৌঁছে যাবার কথাই না বলছে অভি! এবং যে উপলব্ধিতে পৌঁছে দিল তারই বেতাল বেওকুফ বাক্যস্ফূর্তি! তবে কি পরিবেশ-পরারিপার্শ্বিকতার কাছে সবকিছুই বালির বাঁধ! মানুষের ইচ্ছাশক্তি কি কিছুই নয়!

— কিন্তু আমার তো আর চুপ করে থাকলে চলবে না। আমাকে যে সাদিককে, নিদেনপক্ষে তার বাবা মা ভাই বৌ ছেলে এমনকি কোন নিজের লোককে খুঁজে বার করতেই হবে। পরস্ব-ধন ভোগদখলের অধিকার আমার কিছুতেই থাকতে পারে না।

—ভোগ আর করলে কই! কয়েক বছর তো সমানেই দেখছি ন্যাপথলিন আর পোড়া লঙ্কার গুঁড়ো ছড়ানো শালের সেই গাঁটরিটা আলমারির থাকে একইভাবে আছে, আর টাকাটা—

—ন্ ন্। যার জিনিস তার কাছে না থেকে অন্যের কাছে থাকা মানেই—

—ঠিক আছে। এত ছটফট করছ কেন? কালই তো ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে। শেরওয়ানি রোড নিশ্চয় প্রপার শ্রীনগরের মধ্যেই হবে।

কিন্তু শেরওয়ানি রোড এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শ্রীনগর শাখা যথাস্থানে যথাযথভাবে থাকলেও কোথায় মকবুল বাট! কে দেবে তার হদিশ! নামটিই যেন কোনো কালে কেউ কখনো শোনেই নি। দু-দু'বারের অভিজ্ঞতায় পূর্ণেন্দু দত্ত জানে কাশ্মীরীরা কী সুন্দরভাবেই না ভিন প্রদেশী অতিথিকে ভাষায় বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়— সংস্কৃত-পারসি-পাহাড়ি-হিন্দি-উর্দুর যোগাজোড় নিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। এখন দেখে ঠিক তার উল্টো। কত অল্পে, নির্বাচিত শব্দসমষ্টির দুর্বোধ্যতায় নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে। দোভাষীর কাজ চালানোর জন্যে টেনে আনতে চায় রসুলকরকে। কিন্তু মিলিটারি, বেয়নেট, কাঁটাতারের ঘের, পার্কিং জোন উজিয়ে

তারও যে আসার পথ বন্ধ। আর এলেই যে সে এই-নীরবতা ভাঙতে পারবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

পূর্ণেন্দু দত্ত বিড়বিড় করে ওঠে— এখন উপায়!

— উপায় একটা বার করতেই হবে।

— নিশ্চয়ই বার করতে হবে। কিন্তু কীভাবে বার করব বল্ তো—সবাই যদি এভাবে বোবা হয়ে গিয়ে অসহযোগিতা করতে আরম্ভ করে...

অভিজন কোনো কথা বলে না। দাদুর কব্জিটা শক্ত মুঠোয় ধরে নিয়ে পার্কিং জোনের উদ্দেশে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে।

রেসিডেন্সি রোডটা যেমন দেখেছিল এই শেরওয়ানি রোডটাকেও অভি একই রকম দেখে। উর্দিপরিহিত পুলিস-মিলিটারিতে একেবারে ছয়লাপ। মিলিটারি ট্রাক শক্তিপুঞ্জও মহাগর্জনে থরহরি কাঁপন ছড়িয়ে ছড়িয়ে একইভাবে এদিক-ওদিক ছুটে ছুটে যাচ্ছে। আন্তর্প্রাদেশিক কিছু বাস যে চলাচল করছে না তা নয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যেই হুটহাট করে যত্রতত্র থামিয়ে পুলিস-মিলিটারির লোকজন উঠে পড়ছে, সম্ভবত খানাতল্লাশিই নিচ্ছে। পরশু বিকেলে এয়ারপোর্ট থেকে আসতে রাস্তার দু'ধারে খুব সস্তা বিসদৃশ একটেরে কিছু কনস্ট্রাকশন দেখেছিল, রেসিডেন্সি রোডেও দেখেছিল। এখানেও দেখে, তার রহস্যটা বোঝে— প্রত্যেকটি কনস্ট্রাকশনের ফাঁকফোকর থেকে বেরিয়ে আসা রাইফেলের নল।

তবুও এরই মধ্যে দু'চার জন ট্যুরিস্ট বিচিত্র রংদার জামাকাপড়ে অলস পায়ে হেঁটে যে চলছে না তাও নয়। ঝাঁপ-তোলা দোকানপত্তর থেকে এটা-ওটা কিনছে যে না, তাও নয়। রসুলকরের অ্যাম্বাসাডারে বসতে বসতে সেই ধরনেরই এক অসমসাহসী পরিবারকে অতি গভীর বিস্ময় দেখতে থাকে। সম্ভবত ইউরোপীয়। চারজনের পরিবার— ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা, সঙ্গে গুড়ি.গুড়ি দুটি বাচ্চা, একেবারে পিঠোপিঠি, একজনর বয়স যদি চার হয়, অন্যজনের হবে সাড়ে পাঁচ কি ছয়। বাচ্চা দুটি তাদের হাতের ফ্রুটি নিয়েই কাড়াকাড়ি করে চলেছে, বড়টি নিজের ভাগটি শেষ করে দিয়ে ছোটটির ভাগে ভাগ বসাতেই যেন চায়। ছোটটি রাগে জেদে হাতের ফ্রুটির সেই আধ-খাওয়া প্যাকেটটিই ছুঁড়ে দেয় চলমান ট্রাকের তলায়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফটাস্ ফট্ দুটো আওয়াজ ওঠে, অভি ঢলে পড়তে দেখে ছোটটিকে রাস্তায়। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা হতচকিত হয়ে সবটা বুঝে ওঠার আগেই সন্ত্রস্ত পায়ে দুপদাপ শব্দে ছুটে আসে লাইট মেনিসগান নিয়ে দু'জন জওয়ান। নিমেষের মধ্যে চক্কর দিয়ে এসে থামে মিলিটারি জিপ। বুট বাজিয়ে নেমে পড়ে অফিসার। ভদ্রমহিলা রক্তাক্ত মেয়ের শরীরটা আধবসা অবস্থায় একবার ঝাঁকিয়ে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে লাইট মেসিনগান হাতে জওয়ানটির ওপর। অফিসারটিও দ্বিরুক্তি না করে মহিলাটিকে সরিয়ে দেয়। অভি শোনে চোস্ত ইংরিজেতে অকাট্য যুক্তির কথাটি।

— কী করা যাবে! স্টিক গ্রেনেড তো এইভাবেই ছুঁড়ে দেওয়া হয় না? একই রকম ভাবে কাটে। কী করে বোঝা যাবে কোন্‌টা সেই গ্রেনেড, কোনটাই বা সফ্ট ড্রিঙ্কসের কার্টন। সবটাই ব্যাড লাক।

সঙ্গে সঙ্গেই পিব্ পিব্ শব্দ আর ঘূর্ণায়মান আলোর সঙ্কেতওয়ালা মিলিটারি অ্যাম্বুলেন্স এসে থামে। রসুলকারও দ্বিরুক্তি না করে ফুল স্পিডে গাড়ি ছেড়ে দেয়।

সারাটা পথ শ্বাসবোজা নীরবতাতেই থাকে অভি। কিন্তু হোটেল-টেরেসায় গাড়ি পৌঁছানো মাত্রই যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে লাউঞ্জে ঢুকে পেপার-কর্নার থেকে স্থানীয় দৈনিকটা টেনে নিয়ে নির্দিষ্ট ক্যালামে নির্দিষ্ট কোণটা খুঁজে পেয়ে কিছুটা যেন স্বস্তিরই নিশ্বাস ছাড়ে। তারপরই পাশে দাঁড়ানো ফোঁসফোঁসে নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকা দাদুর উদ্দেশে বলে ওঠে— দেখ, দেখ!

— হ্যাঁ দেখছি তো একটা স্ট্রে নিউজ— 'টু সিভিলিয়ান্স্ ডায়েড অন দ্য স্পট!' বাট হোয়াট্স্ দ্য মাটার! হোয়াট্স্ দি সিগনিফিক্যান্স্—

অভি ছলছল চোখে দাদুর রাগত চোখমুখের ভাবটা লক্ষ্য করে কিছু আর বলে না। ধীরে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিজেদের ঘরে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। অনেক কথা যে তার ক্রমশ জমে উঠছে। দাদু ভিন্ন কাকেই বা বলবে! জানে দাদু এখনই আসবে, দিনের ভাড়ার টাকাটা রসুলকারকে দিয়ে আবার আগামীকাল ঠিক সময়ে আসার চুক্তিটা করে নেবার মতো যেটুকু সময়ের অপেক্ষা। যথাসম্ভব নিজেকে গুছিয়েই নেয়— কাল থেকে এদের এখানকার কাগজগুলোয় যতই চোখ ফেলছিলাম এখানে-ওখানে দু'একটা এই রকমের স্ট্রেনিউজ দেখছিলাম। দুঃখপ্রকাশ নেই, বিচারবিভাগীয় বা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের কোনো তদন্তের কথা নেই। শুধু দু'লাইনের বর্ণনা দিয়ে, ব্যাস্! ভাবছিলাম কীভাবে হচ্ছে! এখন বোঝা গেল মৃত্যুগুলো কীভাবে ঘটছে। কালও থাকবে দেখো এইভাবেই— ওয়ান সিভিলিয়ান ডায়েড অন দি স্পট—

— তাহলে কি লেখা হবে, ওয়ান পুয়োর কিড— ? আগুনে ঘি না পড়ার মতো করেই তো এইরকম পরিস্থিতিতে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। কী ভাবিস বল তো, জীবনটা নয়ছয় করে ফেলাবর জিনিস? এত বড় দেশের দায়িত্বটা বুঝিস? কতখানি ত্যাগ তিতিক্ষা সহনশীলতার এখানে দরকার! বাবা-মা'র ঝগড়া শুনে শুনে বড্ড পেকে উঠেছিস, না!

বলতে বলতে থেমে যায় পূর্ণেন্দু দত্ত। অনুভূতিশীল সুকুমার হৃদয়বৃত্তির একটি কিশোর একটি নিরীহ মৃত্যু দেখে চঞ্চল তো হয়ে উঠবেই। তার সেই চাঞ্চল্যের এভাবে তির্যক অর্থ করে দিচ্ছে কেন সে? প্রথমে ঠোঁটের ওপর দাঁতের কামড় বসিয়ে তারপর কপালে দু'আঙুলের সাঁড়াশি চাপ দিয়ে বসে পড়ে পূর্ণেন্দু দত্ত।

অভি দাদুর কপালচাপা হাতটাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে— কী বলছিলে বল না!

— না, আর কিছু বলার নেই। কালই একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে।

— কীভাবে?

— বুঝলি না, শহুরে মানুষজনের চরিত্র সব এক। অত্যাধিক প্যানিকি হয়ে ওঠা!

— মানে!

— মানে তো খুব সোজা। সাদিকের ওই ভাই মকবুল বাট যার নাম, নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে উগ্রবাদীদের সঙ্গে কোনো একটা রিলেশ্যানে জড়িয়ে পড়েছিল, যে কারণে তার চাকরিটা যায়, যে কারণে অফিসের মধ্যে তাকে নিয়ে এমন একটা প্যানিক ছড়িয়েছে যাতে কেউ ওই নামও উচ্চারণ করতে চায় না। শালিমার বাগ নিশ্চয়

শেরওয়ানি রোডের স্টেট ব্যাঙ্ক নয়। আর আবদুল রহমান লোন নামের লোকটাও নিশ্চয় চাচা আপন প্রাণ বাঁচা টাইপের হবে না। দেখিস আর হ্যাপা পোয়াতে হবে না।

— কীকাজ করে ভদ্রলোক! কনজারভেটর?

— ন্ ন্। অতবড় হযতো কিছু নয়। হয়তো কনজারভেটরের অফিসের কোনো কেরানি-টেরানি হবে।

কিন্তু কোথায় সেই অফিস? কোথাযই বা সেই আবদুল রহমান লোন। যে সাদিকের খোঁজ দিতে পারবে। যার ঠিকানা সাদিকই এক সময দিয়েছিল। শক্ত কাঠামোর চোয়াড়ে চোখের নানা স্তরের রক্ষী মিলিটারি ছাড়া আর কেই-ই বা কোথায়! কতকাল ধরে যেন কিছুর দেখভালই হয় না পাথর-বাঁধানো পায়ে চলার পথ, ঘোরানো ঘোরানো সুন্দর সব সিঁড়ি খসখসে পাতায় ভরে আছে। লেজতোলা কাঠবিড়ালি আর বুকে হাঁটা গিরগিটি ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্বই বা কোথায়! অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছের ঝোপঝাড়ে দু'চার জন মানুষের জটলা থাকলেও জনসমাগমের সেই বিস্তার কোথায়। সমস্ত কিছুই যেন শেষের সেদিনের প্রতীক্ষায়। কে কাকে কার খোঁজ দেবে?

তাও বা যদি খোঁজখবর করা যেত জেড-প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তায় সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাজভবন থেকে কোন্ এক মহামান্য অতিথিই যেন এসেছে শালিমারবাগ দর্শনে।

অভি বলে— দাদু, জেড-প্লাস ক্যাটগরির নিরাপত্তা মানে কী জান?

— না। আমি কি মিলিটারি-ম্যান যে জানব?

— সে কী কথা? এখন তো সবাই জানে। চারটে বুলেট-প্রুফ গাড়ি, আটটা মারুতি জিপসি, পেছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স, ডান বাঁযে পেছনে দেড়সো কমাণ্ডোর দল। চারটে ওই বুলেট-প্রুফ গাড়ি সব সমযেই থাকবে তৈরি। কোন্টায যে বিশিষ্ট সেই মানুষটি শেষ মুহূর্তে উঠবেন আগে থেকে কেউ জানবে না। সিদ্ধান্ত নেবে ঘনিষ্ঠ পার্শ্বজনেরাই। যে পার্শ্বজনেরা ফালতু আত্মীয বন্ধু কেউ নয, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডসদের কর্তাব্যক্তিরাই। ওদের পরিভাষায় বলা হয় 'ইনার রিং'।

বুকের মধ্যে চাপ অনুভব করতে থাকে পূর্ণেন্দু দত্ত। ছেলেটা এসব কী বলছে? বাবা-মা'র ঝগড়াঝাঁটি ছেলেটাকে কোন্ কঠিন কর্কশ পৃথিবীতে এনে ফেলেছে!

আর সময়ের অপেক্ষাতে থাকতে পারে না। মরিয়া হযেই ছোটে পূর্ণেন্দু রাইফেলাধারী এক সৈনিকের কাছে আবদুল রহমান লোনের খোঁজখবরাদি জানতে। কিন্তু জবাব তো সেই এক!

—হাম কুছ নাহি জানে। আশপাশ কোই হমারে অফিসার হ্যায়। উন্‌কো সাথ বাত কর লিজিয়ে।

অভি এসে দাঁড়ায়। দুঃসহ তার উপস্থিতি। তার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতেই শালিমার বাগের ঐতিহাসিকতা নিয়ে এবার গল্প জুড়তে হয় পূর্ণেন্দু দত্তকে— অভি, জানিস শালিমার বাগ কথাটার অর্থ কী?

— জানি। প্রেমের স্বর্গোদ্যান।

— জানিস, কোন্ সালে এই বাগানটা হযেছিল?

— জানি, ষোলশো উনিশে।

— জানিস, এ বাগানটা কে কার জন্যে করেছিল?

— জানি, জাহাঙ্গীর নূরজাহানের জন্যে।

অভি এবার সরাসরি দাদুর কব্জি ধরে ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে—মনে হচ্ছে তোমার আর কিছু বলার নেই। এবার আমি যা জানতে চাইছি সরাসরি উত্তর দাও তো।

— বল্।

— টাকাগুলো সব এনেছ? সাদিক বাটের টাকা?

— হ্যাঁ।

— ফিরিয়ে দিতে চাও তো?

— ছিঃ, এসব কথা কেন? কোনোদিনই পরস্ব অপহরণে কোনো আগ্রহই নেই। তার ওপরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরলোক আত্মা এসব বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। অনুরাধার আকুলিবিকুলি আমি চোখ বুজলেই শুনতে পাই।

— ঠিক আছে, দাও টাকাটা।

থরথরে কাঁপুনিতে ব্যাগ থেকে টাকার বান্ডিলটা বার করে।

— বাঃ সুন্দর। একেবারে নাম ঠিকানা সহ খাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো।

আশ্চর্য সম্মোহনেই পূর্ণেন্দু নাতি অভিজনকে অনুসরণ করে চলে। অযত্নে বেড়ে ওঠা একটা লতানো গোলাপঝাড়ের কাছে এসে থামে।

— এখানে রাখ, উড়ো বাতাসে উড়ে যাবে না। গোলাপ কাঁটা পাহারা দেবে।

— মানে!

— মানে আবার কী? যথাস্থানে টাকাটা পৌঁছে যাবে!

— কী পাগলামি করছিস অভি?

নলি-ছেঁড়া চিৎকারে ধমকেই উঠতে চায় পূর্ণেন্দু। কিন্তু সে-স্বর বেরোয় না। গুমগুম স্বরে গর্জন করে ওঠে অভিই— পাগলামি করছে কে? তুমি না আমি? বুঝতে পারছ না সাদিক বাটের কী হতে পারে! এখানে ওর ভাই-বন্ধুদের নাম কেউ উচ্চারণ করতেই চায় না ভয়ে! এরপরেও তুমি যাবে ওই অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও-এর পথে সিরকাঙ্গালিগুন্ড? সাদিকের দেশের বাড়ি?

— হ্যাঁ, যাব।

— তাই তো বলছি অত পরিশ্রম তোমাকে করতে হবে না। সাদিক বাট যদি বেঁচে থাকে তবে এখানে টাকাগুলো রেখে দাও— ইঁদুর টিকটিকি গিরগিটি, কাঠবিড়ালি, না হলে পাখি, নাহলে আলোবাতাস ঠিকই পুলিস-মিলিটারির চোখ এড়িয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আর সে না বেঁচে থাকলে তার আত্মীয়বন্ধুদের কাছে ঠিকই পৌঁছে যাবে— তার আত্মার শান্তিতে লাগবে। তুমি তো আবার এসব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুবই বিশ্বাস করতে শুরু করেছ।

নির্জলা অক্ষিকোটিরের জ্বালা নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে পূর্ণেন্দু দত্ত অভিজনের দিকে। তারপর সজোরে এক থাপ্পড় মেরে বলে ওঠে— বড্ড তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছিস, না! বড্ড তাড়াতাড়ি সবকিছু বুঝে নিতে চাইছিস, শুধু বুঝতে চাইছিস না ত্যাগ

তিতিক্ষা সহনশীলতার দিকগুলো, না?

কিন্তু কী করা যাবে! এটাই না স্বাভাবিক! স্বামীস্ত্রীর নষ্ট-সম্পর্কের জেরে ছেলেমেয়েরা যেমন তাড়াতাড়ি নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজে নিতে বড় হয়ে উঠতে চায়, তেমনি দেশ ও শাসনব্যবস্থায়... চুলোয় যাক। দেশের কর্ণধারেরাই তা নিয়ে ভাববে। সে আর দেরি করবে না এক মুহূর্তও। রক্তপায়ী নৈরাজ্যের এই পরিবেশে থাকলে অন্তি— তার অভিজ্ঞনও হয়ে উঠবে উগ্রবাদী। □

বৃত্ত

জ্যো ৎ স্না ম য় ঘো ষ

সুবোধ ঢোকে না, বাইরে থেকেই বলে, 'সতুবাবু আসছেন। মনে হয় এখানেই।'

শুনলেনই না হয়তো। থুম ধরে বসে আছেন। কদিনেই কেমন যেন বদলে গেলেন। অমন ধন্বন্তরী চিকিৎসক—দশ গাঁয়ের গরিব গুর্বোর একমাত্র ভরসা—তারও চিকিৎসায় ভুল হয় আজকাল। কোন কিছুতে মন নেই। কি যে হলো মানুষটার।

কথাটা বলতে হয় আবার।

তখনই বাইরে থেকে সত্যব্রতর গলা ভেসে এল, 'ডাক্তার আছেন নাকি?'

সুবোধকেই বলতে হয়, 'আছেন। আসুন।'

ভেতরে পা দিয়েই সত্যব্রত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন, 'আপনাকে হয়তো বিরক্ত করা হলো।'

কেমন যেন কাঠকাঠ গলায় প্রবাল বলে, 'বসুন। সুবোধ, ভেতরে যা।— জানতাম আপনি আসবেন।'

'তাই!' ছোট্ট করে হাসলেন। —'ডাক্তার কি আজকাল অকাল্ট সায়েন্সের—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তার ভেতরই প্রবাল গুঁজে দেয়, 'ভয় দেখানোটা বাকি থেকে গেছে না এখনও।'

সত্যব্রতর মুখে রক্ত ছড়াল। দীর্ঘদেহী মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন। খুবই বিচলিত দেখাল তাকে। কিন্তু নিজেকে ফিরিয়ে আনলেন সহজেই। ষাট বছরেরও বেশি সময় রাজনীতিতে রয়েছেন। প্রবৃত্তির ঝোঁক কাটিয়ে ওঠার শিক্ষা কি আজকের! খুব সহজভাবে বললেন, 'চলুন, বাইরে বসা যাক।'

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই কোয়ার্টার্সটি ছোট, কিন্তু তার চারধারে অনেকটা খোলামেলা জায়গা। কম্পাউণ্ড ওয়ালের কোন বালাই নেই। বদলে, বাঁশের চৌখুপি বেড়া। বেড়ার গা বেয়ে উঠেছে লতানে গাছ—অপরাজিতা বোগেনভেলিয়ার ঠাস বুনুনি। বাগানটি ছিমছাম। দিশি মরশুমি ফুলের ঝলমলে বিন্যাস। মন ভরে যায়!

এই মুহূর্তে অবশ্য ফুল দেখার মত মন ছিল না তাদের। বাইরে এসেও নিজেকে কঠিন করে রাখল প্রবাল। সত্যব্রতর অস্তিত্বই যেন উপেক্ষা করতে চাইল। সত্যব্রত বোঝেন, প্রত্যাঘাত করার জন্য যেন মুখিয়ে রয়েছে ছেলেটি। ভালও লাগে। চাপের মুখে বড় সহজেই ভেঙে পড়ে লোকেরা আজকাল। 'শক্ত ধাতের মানুষ' নামে প্রজাতিটি যেন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' তত্ত্বটি কেমন যেন অসার মনে হয়

ইদানীং। যারা টিকে রইল, টিকে থাকে, তাদের যোগ্যতম বলে ভাবতে ভেতর থেকে কোন সাড়া পান না।

শীতের বিকেল বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। রোদ এখনও আছে, কিন্তু তাত নেই। উত্তরায়ণের সূর্য তার স্বধর্ম হারিয়েছে। প্রকৃতির এখন রিক্ত হওয়ার কাল।

কম্পাউণ্ডের ভেতর হঠাৎ একটি ধনেশ পাখি নজরে আসতেই কথা বলার উপলক্ষটি পেয়ে যান, 'আজকাল আমাদের এদিকে ধনেশ পাখি বেশ দেখা যায়। এ-সময়টাই আসে, পদ্মা পেরিয়ে, পাসপোর্ট ছাড়াই।'

প্রবল সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'পাখিদের ভেতর ভাগ্যিস হিন্দু মুসলমান নেই।'

খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না। প্রসঙ্গ পাল্‌টে জিগ্‌গেস করলেন, 'সুহৃদ কেমন আছে? সদরে গিয়েছিলেন শুনলাম?'

প্রবাল ঝলসে উঠে; 'সুহৃদবাবুর যেমন থাকা উচিত হতো বলে সাব্যস্ত করেছেন আপনারা, তিনি তেমনটি নেই।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সুবোধকে দেখে থমকে গেলেন। ট্রে নামিয়ে রেখে সে চলে যায়। সত্যব্রতর সামনে বিস্কুটের প্লেট, চায়ের কাপ ধরে দিয়ে প্রবাল, এই প্রথম, সহজভাবে বলল, 'নিন—'

চায়ের কাপ তুলে নিয়ে সত্যব্রত জিগ্‌গেস করেন,'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'মনে তো হয় ভালই আছেন। তবে—মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত। ওর বিশ্বাস, বা সংস্কার, যাই বলুন না কেন, প্রশাসনের কথা মত কাজ করলে, তার পাপে, ওর গর্ভে যে এসেছে, তার ক্ষতি হতে বাধ্য।'

কথাটির গুরুত্ব বুঝতে পারেন সত্যব্রত। এই প্রথম মা হতে যাচ্ছেন যিনি, সন্তানের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি তো বিচলিত হবেনই। শুধু প্ল্যাসেন্টা নয়, আরও কত রকমের সুরক্ষার প্রাচীর তুলেই না প্রাণের বীজটিকে নিরাপদে রাখতে চান মা। ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের আভ্যন্তর লালনের দায় এবং গৌরব তো তারই। সন্তানের প্রতি তার এই উৎকণ্ঠাকে সংস্কার বলে তিনি উড়িয়ে দেন কি করে।

কেবল ডাক্তারের কথাই ভেবেছেন। তার স্ত্রীর কথা ভাবা হয়নি। সত্যব্রতর শরীর-মনে অস্বস্তির ঢল নামে।

খানিকবাদে গেটের মুখ থেকে কেউ বলে, 'ডাক্তারবাবু আছেন নাকি?'

'কে?—আসুন।'

কাঠিকাঠি চেহারার লোকটি এগিয়ে আসতেই সত্যব্রতকে দেখতে পায়। তড়িঘড়ি বলে ওঠে,'অ, সতুবাবুও রয়েচেন। আদাব, আদাব। দেকতি পাইনি।'

'জামিল না?'

'হ, বাবু।'

'এখানে কি মনে করে?'

'শরীলডা ভাল যাচ্ছে না। তাই—' বাকি কথাগুলো বলে না।

'হাসপাতালে এলে হতো না?'—প্রবাল বলে।
'প্যাটের ধান্দায় দশ গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। সুমায় পাব কনে।'
প্রবাল আর কথা বাড়ায় না। গলা তুলে সুবোধকে ডাকে, 'স্টেথোটা দিয়ে যা তো।'
সত্যব্রত বলেন 'তোমার তো পেটের ধান্ধায় দশ গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবার কথা নয়, জামিল। দু-দুটি জোয়ান ছেলে রয়েছে তোমার।'
'হ, বাবু, তা রয়েচে। তবে— আমারই ছাওয়াল তো তারা।'— বলতেই মুখখানা নুয়ে পড়ে।
প্রবালের ডাকে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
'কষ্টটা কি?'
'প্যাটের মদ্দি বড় দুক্খু, ডাক্তারবাবু। মরিচ বাটার মত জ্বলে।'
'জিভ দেখি— জিভের তলায় জল কাটে?'
জামিল মাথা নাড়ে।
চোখের পাতা টেনে ধরেই ছেড়ে দেয়। কোলের দিকটা বড্ড ফ্যাকাশে। হবারই কথা, মনে মনে বলে। পেটে হাত রাখে। অল্প চাপেই আর্তনাদ করে পিছিয়ে যায় জামিল।
মুখখান থমথমে হয়ে ওঠে প্রবালের। মাথা নিচু করে বসে থাকে। এইসব রোগীর সামনে বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে।— কাকে বলবে যে যে-ভাইরাসের তারা শিকার ডাক্তারিশাস্ত্রে তার কোন চিকিৎসা নেই।
'ডাক্তারবাবু কথা বলচেন না ক্যান! রোগ সারবে না?'— কথাগুলো যেন বুক চিরে বেরিয়ে এল।
জামিলের দিকে তাকায়। মুখ ভর্তি রেখা আর রেখা। প্রতিটি রেখারই হয়তো আলাদা আলাদা ইতিহাস রয়েছে। অথবা সে ইতিহাস হয়তো একই। দুঃখ বঞ্চনা গ্লানি অসম্মান দারিদ্র্যের একই কাহিনীই হয়তো ধরা রয়েছে এইসব রেখায়।
বুঝতে পারে, লোকটি কিছু শুনতে চায় তার কাছে। হাসতে হয়। ইনটার্ন থাকার সময় বারবার এ উপদেশ শুনতে হয়েছে যে ডাক্তারের প্রসন্ন মুখ রোগীকে আশ্বস্ত করে। রোগীর অবস্থা যখন এখন-তখন, তখনও ডাক্তারের বিচলিত হওয়া নেই। প্রতিটি চিকিৎসককেই এই অভিনয় করে যেতে হয়।
প্রসন্ন হেসে বলে, 'ঘাবড়ে যাওয়ার মত কিছু নয়। নিয়ম করে যা হোক কিছু খাবেন। সেরে উঠবেন।'
পাঁজরার ভেতর থেকে কি রকম একটা আওয়াজ বেরয়। তার চাপেই যেন রেখাগুলো ফেটে যায়, 'খেতে বলচেন। পাব কনে!'
প্রবাল সত্যব্রত দিকে তাকায়। সত্যব্রত চোখ নামিয়ে নেন।
'থাকেন কোথায়?'—ইচ্ছে করেই বুঝি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইল।
'শালতড়ি।'

'শালতলি, মানে— যেখানে আনোয়ার আলি আর সুরিদবাবুর ওপর'—

জামিল মাথা নাড়ে।

'সেদিনের মিটিং-এ ছিলেন?'

জামিলের যেন অস্বস্তি হয়। সত্যব্রতর দিকে একনজর তাকিয়ে বলে, 'আসলে এসব মিটিনে আমার মত লোক ডাক পায় না। চাষের এক ছটাক জমিনও নেই যার, ডীপের মিটিনে তার কি ঠ্যাহা, কন?'—থেমে যায়। মনে মনে যেন গুছিয়ে নিতে থাকে। তারপর কারো দিকে না চেয়ে বলে যায়, 'তবে গিয়েচিলাম। ওই আনোয়ার আলি আর সুরিদাবাবু এক রহম জোর করেই নিয়ে গেল। গিয়ে দ্যাহা গেল, সবাই তেতে রয়েচে। সকলেই নিজের গাঁয়ে ডীপ বসাতি চায়। মেলাই কতা কাটাকাটি, চিৎকার চেঁচামেচি হলো। তহন, সুরিদবাবু বললেন, ডীপ বসা উচিত দশ গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায়— শালতলি। কতাডা য্যান মনে ধরল সকলের। তো তাই ঠিক হলো। মিটিন শ্যাষ হলো। যে যার বাড়িমুহো হাঁটা দিল। হটাস, আন্ধারে কারা য্যান ঝাঁপায়ে পড়ল আনোয়ার আলি, সুরিদবাবুর ওপর। তারপর তো'—ঘনঘন দম নিতে থাকে, যেন হাঁপিয়ে পড়েছে। হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে ওঠে, 'অমন মানষের মত দুটো মানুষ—আপদেবিপদে কার পাশে না দাঁড়িয়েচে কন? তাদের গায়ে হাত তোলা। হাতগুলান পচে যাবে রে, শালোরা। কুষ্ঠ হবে। গরিব-গুর্বোদের দ্যাহার আর কেউ রইল না। —আচ্ছআ ডাক্তারবাবু, সুরিদবাবু এহন কেমন আচেন? লোকজন বলচে, সে-ও নাহি বাঁচবে না।'

প্রবালের কাশি পায়। সত্যব্রতর চোখে বুঝি সায়াহ্নের অন্ধকারই তিরতির করে কাঁপতে থাকে। মুহূর্তগুলো ভারি হয়ে ওঠে।

তিনিই বলেন, 'সদরের হাসপাতালে চেষ্টার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। তবে বাঁচা মরার কথা কি কিছু বলা যায়, বল?'

'হ-অ। —জামিল মাথা নাড়ে।—'একখান কতা কই। দুষ পাবেন না, ডাক্তারবাবু। সুরিদবাবুরে আপনের কাচে নিয়ে আসেন, এই হাসপাতালে। আপনে তারে ঠিক সারায়ে তুলতে পারবেন। আনোয়ার আলিও বাঁচত, এহানে থাকলে।'

বুকের ভেতরটা চিন্‌চিন্ করে ওঠে প্রবালের।

জামিল একসময় বুঝতে পারে, তার কথাটা কানেই নিল না কেউ। এ-রকমটাই যেন হবার কথা। আজ পর্যন্ত তার কথা মানে নি কেউ। মানুষ হিসাবে এত নগণ্য সে, এত ধারাবাহিক তার অসাফল্যের ইতিহাস যে তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনা কেউ। সব অর্থেই সে প্রান্তিক মানুষ। এক সময় কষ্ট হতো, এখন আর তা-ও হয় না।

'চলি। বেজায় বেশকম কিচু কয়ে থাকলে মাপ করে দিয়েন।'

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায় প্রবাল। বড় শূন্য হাতে ফিরে যাচ্ছে মানুষটা। বোঝে, কথাগুলো বলার কোন মানে হয় না, তবু বলবনা বলবনা করেও বলেই ফেলে, 'খালি পেটে থাকবেন না।'

জামিল হাসে, মুখখানা বড় করুণ দেখায়, 'ইচ্ছে করে কে আর না খেয়ে থাকে,

ডাক্তারবাবু!'
'তবু চেষ্টা করবেন।'
'চুরি ডাকাতি ছাড়া কোন চেষ্টারই কসুর করি নাই।'
'তাই করবেন এবার।'
'চুরি-ডাকাতি!'— জামিল স্তম্ভিত হয়ে যায়।
'নয় কেন! থাকলেন তো ভাল মানুষ হয়ে। কি পেলেন! কিছুদিন খারাপ হয়েই দেখুন না।'
সত্যব্রতর ওপর নজর পড়তেই জামিল ঘাবড়ে যায়। লোকটার কথায় থানা পুলিশ ওঠে বসে। তার সামনেই কিনা— কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে থাকে।
জামিল গেটের বাইরে চলে যেতেই সত্যব্রত বলেন—বিরক্তি চাপার কোন চেষ্টাই করেন না, "এসব কি করছেন। এ তো রীতিমতো অ্যানার্কি! ও কিছু একটা করে বসলে, বাঁচাতে পারবেন?'
'আমি না পারলেও আপনি তো পারবেন।'
'চোর ডাকাতদের বাঁচানো আমার কাজ নয়।'
'তাই নাকি!'—বিদ্রূপে ঝলসে ওঠে।
'মানে!'—উত্তেজিত দেখায় তাকে। উঠে দাঁড়ান।
'ওই যে লোকটা চলে গেল, কি রোগ ওর জানেন? ক্ষুধা। বহু বছরের বাসি ক্ষুধা নিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আইনের প্রতি অনুগত, পাপ এবং দোজখের ভয়ে ক্লিষ্ট ওই মানুষটা। কখনও কোন অন্যায় করে নি। এই সৎ লোকটাকে বাঁচান। চোর-ডাকাত বাঁচাতে বলছি না।'
'এ-দেশে কত লোক দারিদ্র্যরেখার তলায় রয়েছে জানেন?'
'অ্যাবস্ট্রাক্ট পরিসংখ্যানে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি জামিলের কথা বলছি। আমার পেশেন্ট।'
সত্যব্রত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তখনই হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে যান্ত্রিক আওয়াজ আর পোড়া পেট্রোলের ঝাঁজ ছড়িয়ে সাঁ-সাঁ করে ঢুকে পড়ল একটি জিপ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডি-এমের মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল, 'বাহ্ একেবারে দার্জিলিং ফ্রেবার। ডিস্ট্রিক হেড-কোয়র্টারেও এ জিনিস পাই না আমরা। কোতথেকে পান, সার?'
প্রবাল হাসে। জেলার প্রশাসনিক প্রধানকেও অভিনয় জানতে হয়।
'নাকি, ম্যাডামের হাতের গুণ।'
লোপা মুচকি হাসে।
'ওঁর রান্নারও খুব হাতযশ।'—এই জরুরি খবরটা দিয়ে সত্যব্রত যেন হাল্কা হলেন।
'রিয়েলি!'— ডি-এম যেন এই প্রথম শুনলেন বাঙালি গৃহিনীদের রান্নাও আসে। কাজেই উচ্ছ্বাসটুকু ধরে রাখতেই হলো। —'সুট করে চলে আসব একদিন। খাঁটি বাঙালি

রেসিপি চাই কিছু। ঢেঁকি শুকতুনি নালতে শাক—নালতে শাক বোঝেন তো, [illegible]? ওহ্‌হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনারা তো আমাদের প্রতিবেশী হতে যাচ্ছেন। যখন খুশি পাত পেড়ে বসে গেলেই হলো—'

'আপনাদের প্রতিবেশী হতে যাচ্ছেন কি রকম!'— ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেও সত্যব্রত অবাকই হলেন।

'বাহ্, সারা জীবন ডা. মিত্র এখানেই পড়ে থাকবেন নাকি! কম দিন তো হলো না। এবার ওকে ছেড়ে দিন।'

'আমরা কার ভরসায় থাকব?'

খুনসুটি। আটাত্তর পেরনো নেতা আর পঞ্চাশে পা রাখা প্রশাসকের। একজন কিছুতেই ছাড়বেন না, অন্যজন জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাবেনই। প্রবাল বোঝে, সরাসরি প্রস্তাবটা এলে ঘুষের মত দেখাত। টোপ যে, বুঝতেই দেয়া হচ্ছে না। খেলাটা চলতেই থাকে।

চোখ তুলতেই দেখে, লোপা তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, একদৃষ্টে। মুখখানা ফ্যাকাশে, নাকের দুপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আঁচলের একটা কোণ বাঁ হাতের তর্জনীতে ক্রমাগত জড়াচ্ছে আর খুলছে। কোন কথায় ভেতর থেকে সাড়া না পেলে আঁচল নিয়ে এই খেলাটা, হয়তো অজান্তেই, চলে আসে ওর। চোখের ইশারায় লোপাকে আশ্বস্ত করতে চায়।

ততক্ষণে ডি-এম উঠে দাঁড়িয়েছেন। কণ্ঠে রীতিমত উদ্‌বেগ তার, 'না না, সার, ও-সব কোন ব্যবস্থাই নয়। গড ফরবিড, কোন কমপ্লিকেশন দেখা দিলে? কিস্যু করার থাকবে না। আমাদের ওখানে ওয়েল-ইকুইপ্‌ড সব নার্সিং হোম রয়েছে। মিসেস মিত্রকে নিয়ে গ্যাম্বলিং করতে যাব কেন আমরা!'

সত্যব্রত হার মানলেন, 'যা ভাল বোঝেন?'

ডি-এম লোপার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা করবেন না। সব ঠিকমত হয়ে যাবে। আমরা তো আছি।'— একটু থেমে লোপার প্রতিক্রিয়া হয়তো বুঝতে চাইলেন। পরক্ষণেই অনেকখানি হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'আমরা এখন একটু বাইরে বসব, আপনার বাগানে, খোলামেলায়। কিছু মনে করবেন না।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রবাল ফিস্‌ফিস্ করে বলে যায়, 'ভাবছ কেন? সব মাছই কি টোপ গেলে!'

ডি-এম ডালিয়ার বেডের সামনে দাঁড়ালেন। নুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে সামনের ফুলটিকে যেন আদর করলেন। প্রকৃতই একজন পুষ্পপ্রেমিক বলে মনে হচ্ছিল তাকে।

প্রবাল মানতে বাধ্য হয় যে, একজন মানুষের ভেতর যে কতরকম মানুষ লুকিয়ে থাকে, বাইরে থেকে তা বোঝবার জো নেই। ফুলের সামনে, প্রকৃতির এই অকৃপণ দাক্ষিণ্যে লোকটির মুগ্ধতা তার ভাল লাগে।

প্রায় তখনই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। প্রবালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গিয়েছিলাম

শান্তভঙ্গি। ল অ্যান্ড অর্ডারসটা বহুকে দেখে এলাম। ওপর থেকে জেলায় চাপ আসছে। অযোধ্যার ঘটনাতেও আমাদের জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ছিল। আর— বুঝুন, একটা ডীপ টিউবওয়েল কোথায় বসবে, তা নিয়ে দু-দুটো মানুষ খুন হয়ে গেল। এরপর ও-এলাকায় উন্নয়ণের কোন কাজ আর হবে! বোঝাবেন কাকে? টেনস্ড হয়ে রয়েছে পুরো এলাকা। না পঞ্চায়েত, না পোলিটিক্যাল লীডারশিপ, কিস্যু নেই। পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। কিন্তু একা পুলিশ কখনও দাঙ্গা ঠেকাতে পারে— আমরা সবাই মিলে যদি সহযোগিতা না করি? বলুন?'

প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে ভিন্ন কথা বলে প্রবাল, 'দু-দুটো মানুষ খুন হওয়ার কথা বলছিলেন। সুহৃদবাবু কি মারা গেছেন?'

ডি-এম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'যাওয়া উচিত। এলাকার মঙ্গলের জন্য মরে যাওয়া উচিত ছিল তার। এ-লোক নাকি রাজনীতি করত আবার। তার কমরেড ইন-আর্মস খুন হলো, সে লোকটা বেঁচে আছে কোন লজ্জায়।' সত্যব্রতর ওপর চোখ পড়তেই যেন কুণ্ঠিত হলেন, 'কথাগুলো হয়তো আপনার ভাল লাগল না। কিন্তু এটা তো মানবেন, ভদ্রলোক বেঁচে গেলে যে কোন সময় কমিউনাল ফ্রেয়ার আপ হতে পারে। সেটা নিশ্চয়ই আমরা কেউ চাইব না।'

প্রবাল যেন সত্যব্রতকে আলোচনার বাইরে রাখতে চায়। বলে ওঠে, 'কিন্তু সুহৃদবাবুর ইনজুরি এমন কিছু ফেটাল নয় যে তিনি মারা যেতে পারেন।'

'আপনার ওই মেডিকেল রিপোর্টটাই তো কাল হয়েছে।'— ডি-এম ধমকে ওঠেন। —'না হলে, সদর হাসপাতালে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যেত এত দিনে। ওখানকার ডাক্তাররা খুবই কো-অপারেটিভ। আপনি মেডিকেল রিপোর্টটা পালটে দিন। বাকি কাজটা ওরা করবেন। ডাক্তারি বিদ্যে দিয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করবেন না।'

প্রবালের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। ভেতরকার উত্তেজনা শুধু মুখে নয়, গলায়ও ধরা পড়ে, 'ডাক্তারের কাজ মানুষ বাঁচানো, মারা নয়।'

'ও-সব এথিক্সের কথা রাখুন তো। দেশটা এথিক্সে চলছে! ছেড়ে দিন এ-সব বুকিশ কথা। দাঙ্গা দেখেছেন কখনও? কত মানুষ মারা যেতে পারে একটা দাঙ্গায়, অনুমান করতে পারেন? একজন মানুষের মৃত্যুতে যদি অনেক মানুষ বেঁচে যায়, এলাকার শান্তি সম্প্রীতি রক্ষিত হয়—কোনটা চাইবেন আপনি? ড. মিত্র, হিপোক্রিটাস এ-রকম কোন সঙ্কটের কথা অনুমানও করতে পারেন নি। যাকগে। আমি এখন যাব। কাল ডি-এম-ও আসবেন আপনার মেডিকেল রিপোর্ট আর ট্রান্সফার অর্ডার নিয়ে। পুরনো রিপোর্টটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে একটা রিপোর্ট লিখে দেবেন। কি লিখতে হবে তার ড্রাফ্‌টও তিনিই করে আনবেন। আর, ব্যাক ডেটে ট্রান্সফারের একটা দরখাস্ত লিখে দেবেন। মিটে গেল। ও-কে? পুরোটাই নিজের হাতে রাখবেন না। মিসেসের সঙ্গে কথা বলুন। মেয়েরা অনেক প্র্যাকটিক্যাল হন। সত্যব্রতবাবুও আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। চলি।'

পেছন ফিরে আর দেখলেনও না। সোজা জিপে উঠে পড়লেন। স্টার্ট নেওয়ার মুখে হাতের ইশারায় ডাকলেন। কাছে এলে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এখানে দাঙ্গা হলে তার জন্যে দায়ি হবেন আপনি। কথাটা মনে রাখবেন।'

প্রবাল যেন পাথর হয়ে যায়।

সময় জমে জমে পাথর হতে থাকে। সেই কখন যেন প্রশ্নটা করেছিল প্রবাল, 'সুহৃদবাবু তো শনি আপনার হাতে তৈরি। আপনি চান, আমাদের হাতে তিনি খুন হোন?'

হাসপাতালের সামনেই রাস্তা। কিছু দিন আগে ইট বিছানো হয়েছে। এখন লাল ধুলো ওড়ে। ধুলোর একটি মিহিন চাদর চড়ন্ত বেলায় রাস্তার চারপাশে শূন্যতায় ভেসে বেড়ায়। রাস্তার ওপাশ থেকে দিগন্তরেখা পর্যন্ত অবারিত মাঠপ্রান্তর। যখন শস্যে পূর্ণ, কত বিভঙ্গ তার, সবুজ হলুদের কত রকমফের। এখন খাঁ-খাঁ, নিঝুম। প্রান্তরেখা ঝাপসা হয়ে আসছে। সন্ধ্যা নামছে সেখানে। সামনের খেত জুড়ে গোধূলির বিষন্নতা। দূর থেকে মাইকে ভেসে আসে আজানের বিলম্বিত সুর। খানিকবাদেই ক্যাসেটে ধ্বনিত হবে ঈশ্বরের মহিমা।

সুহৃদ আনোয়ারের কথা মনে পড়ে। প্রায় তারই বয়েসী। হঠাৎ হঠাৎ চলে আসত লোপার গান শুনতে। গণসঙ্গীতের একটা ক্যাসেট উপহার দিয়েছিল। ওদের আশা ছিল সে-সব গান লোপা তুলে নেবে। ওদের গণসঙ্গীতের স্কোয়াড পরিচালনা করার মত সে-রকম কেউ ছিল না। লোপাই সে অভাব পূর্ণ করবে একদিন, ধরেই নিয়েছিল। লোপা হাসত।

খুব প্রাণবন্ত ছিল। সব সময় যেন ফুটছে। এ-রকম নিঃস্বার্থ কাজ-পাগল মানুষ দেখাই যায় না আজকাল। কাছের মানুষ ছিল সবার। দুটি নাম একসঙ্গেই উচ্চারিত হতো। সেই লোক দুটিকে— কারা, তারা কারা? কেন তারা সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ওদের? এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে ধরতে পারে নি। কেন? প্রশাসনের এই গয়ংগচ্ছ ভাব লাগামহীন গুজবের জন্ম দিচ্ছে শুধু—

'ডাক্তার'—

সত্যব্রতর ডাক কানে যেতেই প্রবাল নিজেকে গুটিয়ে আনে। মানুষটির দিকে তাকায়।

সত্যব্রত রায়—জেলার কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতি। কৈশোরে স্কুলে পড়ার সময় যুগান্তর দলের সান্নিধ্যে আসেন। জেলা জজ ক্যাম্পবেল হত্যা মামলায় প্রথম সাজা—রাজশাহী জেলে পাঁচ বছর। সেই শুরু, ১৯৩২। ষোল বছরের কিশোর তখন। জেল থেকে বেরিয়ে এলেন কমিউনিস্ট হয়ে। শেষবার জেলে যেতে হলো ১৯৬৩। ছেষট্টি-তে বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি পঞ্চাশ। সাঁইত্রিশ থেকে পার্টির কাজে। 'প্রফেশনাল রেভল্যুশনারি' বলা হতো। কথাটার আর চল নেই আজকাল। এখন হোলটাইমার। মাঝে, পঞ্চাশে, অতি-বামপন্থী ঝোঁকের অভিযোগে, দল থেকে বহিষ্কৃত হন।

জেলা জুড়ে কত কিংবদন্তী মানুষটিকে নিয়ে। দল নির্বিশেষে তাকে শ্রদ্ধা এবং সমীহ করে সবাই। এম-এল-এ হতে পারতেন, মন্ত্রী হতে পারতেন, জেলা কমিটির সম্পাদক হতে পারতেন। হলেন না। শুভানুধ্যায়ীদের পীড়াপীড়িতে সঙ্কুচিত হন। বলেন,'আরে আমি হেলাম চাষাভুষো মানুষ। আমাকে কি ও-সব মানায়!' চাষাভুষোদের সঙ্গেই থেকে গেলেন।

অন্ধকারে মুখখানা আবছা আবছা দেখা যায়। চেয়ে আছেন সামনের দিকে। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। দূরে তারার মত দু একটি জোনাকি ফুটছে সবে।

'ঠিকই শুনেছেন, আনোয়ার সুহৃদ আমার হাতেই তৈরি। সাবেক কমিউনিস্ট তো আমি। সেই ছাঁচেই তৈরি ওরা। বড় নিশ্চিন্তে ছিলাম।'— বলতে বলতে থেমে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। প্রবালের মনে হলো, বড় দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে। খুবই বিচলিত যেন তিনি। পুত্র শোকের বেদনায় মুহ্যমান মানুষটিকে দেখে কষ্ট হয় তার। কথাটা বলা তার ঠিক হয় নি, বোঝে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'মনটা বড্ড এলোমেলো হয়ে আছে। আঘাতটা যে আপনারই সব থেকে বেশি করে লাগার কথা—'

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। খানিকবাদে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, 'ব্রিটিশ পিরিয়ডের শেষ দিকে, খোঁজ নিয়ে দেখবেন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় কমিউনিস্টদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত গবমেন্ট। তারাও জানত, কমিউনিস্টরাই দাঙ্গা ঠেকাতে পারে। কারণ, দু-সম্প্রদায়েরই আস্থাভাজন ছিল তারা। আর আজ—' বোধ হয় হাসলেন, তারপর নিজেকেই যেন ধিক্কার দিলেন, 'এ-গ্লানির কথা কাকে বলব! কিছু সমাজবিরোধীর হাতে আনোয়ার মারা গেল। মৃত্যুর পর ওর মুসলিম পরিচয়টাই একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠল। ওর কমিউনিস্ট পরচিয়টা মনেই রইল না কারো। আমারও বোধহয়—' মাথা নুয়ে পড়ল, লজ্জায় গ্লানিতে। মাথা না তুলেই বললেন, 'বসুন বউমা। আমি বরং উঠি।'

'কেন! আমি অসুবিধে করলাম? আমি ওদিকটায় বসছি। আপনারা কথা বলুন।'— লোপার গলায় অভিমান চাপা রইল না। হাত বাড়িয়ে একটি মোড়া তুলে নেয়।

'বউমা, বসুন।'

লোপা বসে। তিনটি ছায়ামূর্তি নির্বাক হয়ে বসে থাকে। অন্ধকার সরিয়ে নক্ষত্রেরা উঁকি দিতে থাকে দু-এক করে।

লোপাই শেষ পর্যন্ত কথা বলে। বুকের গভীরে যে প্রশ্নটি আটকে ছিল, বুক খুঁড়ে যেন তা বেরিয়ে এল, 'সুহৃদবাবুকে মরতে হবে কেন? তিনি তো কোন দোষ করেন নি।'

নৈঃশব্দ্যেই ভাল ছিল, সত্যব্রতর মনে হয়। তবু উত্তর দিতে হয়, 'সুহৃদকে যদি মরতে হয়ই তো জানবেন, আমাদের অযোগ্যতাই তার কারণ। মসজিদে মসজিদে মিটিং করে বলা হচ্ছে— প্রতিপক্ষের উশকান তো রয়েছেই— দুটি মানুষ আক্রান্ত হল, বেছে বেছে মারা গেল আমাদের ছেলেটিই। বলছে, আগে থেকেই সবঠিক করা ছিল হিন্দুদের। মুসলমান আনোয়ার তাই বাঁচে না। আর হিন্দু সুহৃদ'—গলাটা কেঁপে ওঠে। একটা দীর্ঘ

নিঃশ্বাস চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করে কোন রকমে বলেন, 'এই প্রচার রুখতে পারি নি আমরা। আমাদের এই অযোগ্যতার মূল্য কাউকে তো দিতেই হবে।'

সব কথা বুঝি শেষ হয়ে গেল। এখন বুঝি শুধু শোক আর নীরব স্মরণ।

আকাশ জুড়ে তারায় তারায় ইশারা। প্রবাল ভাবে, ওইসব সংকেতের অর্থ যদি জানা থাকত তার! ওই নক্ষত্রপুঞ্জ, ওই ছায়াপথ কত সভ্যতার উত্থান-পতনের মৌন সাক্ষী। ওই জ্যোতির্লোক থেকে তারা যেন নিয়ত বার্তা পাঠায় আমাদের, 'সাহসী হও, সতর্ক হও, আমাদের মত তোমরাও জ্যোতির্ময় হতে পার।'

আভ্যন্তর এক আবেগে সত্যব্রতবাবু। আসুন না, আমরা দুজনে মিলে গ্রামে গ্রামে সত্য কথাটা বলি। এব্যাপারে যদিও আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবু আমার বিশ্বাস, প্রচারটা রোখা যাবে। মানুষের উদ্ধার শেষ পর্যন্ত তো মানুষেরই হাতে।'

সত্যব্রত হকচকিয়ে যান। এ-রকম একটা প্রস্তাবের জন্য তিনি আদৌ তৈরি ছিলেন না। প্রবালের হাতখানা মুঠোর ভেতর টেনে নেন। হাতখানা কাঁপছে। বুঝতে পারেন, ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে রয়েছে ডাক্তার।

দুচোখে উদ্বেগ নিয়ে স্বামির দিকে তাকায় লোপা। দুম করে কথাটা না বললেই চলছিল না। ডাক্তার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবে! সতুবাবু সঙ্গে থাকলে ভয়ের কিছু নেই ঠিকই, তবু—

সত্যব্রত উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'কথা বলে দেখি'— তাকপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান।

লোপা চেঁচিয়ে বলে, রাতে একা একা চলাফেরা করা কিন্তু উচিত নয় আপনার।'

থামেন। মুখ ফিরিয়ে কিছু বলতে গিয়েই বোঝেন, গলার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। গেটের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন। এক সময় কোন রকমে বলেন, 'একাই তো হয়ে গেলাম।'

গেট বন্ধ করার শব্দ হয়।

প্রবাল ভাবে, এই ভাল, অন্ধকারে ডুবে থাকা। আলোর কাছে কোন ফাঁকি চলে না। নানা প্রশ্নের সামনে সে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন শুধু দীর্ণ হওয়া। সে-সময় তো রইলই। চিকিৎসক প্রবাল আর সামাজিক প্রবালের ভেতর সেই রক্তাক্ত দ্বৈরথের জন্য সময় তো রইলই। এখন চুপচাপ বসে থাকা শুধু।

লোপা বোঝে, প্রবাল এখন একা থাকতে চায়। কোন জটিল রোগের চিকিৎসার বেলায় যখন সে নিশ্চিত হতে পারে না, তখন এমনি করেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। লোপা জানে, ভেতরে ভেতরে সৃষ্টিরই এক প্রক্রিয়া চলে তখন। সে উদ্‌ভাসের মুহূর্তটির জন্য একাকী হতে হয় মানুষকে।

লোপা উঠব-উঠব করছে, তখনই প্রবাল বলে 'একটা গান গাইবে?'

তখনই পারে না। গুছিয়ে নিতে সময় লাগে। যতই না কেন প্রবাল বলুক, 'তুমি কোন চাপ নেবে না', চাপ এসেই যায়।

একটু কেশে নেয়। এক সময় উঠে আসে সুর আর বাণী, 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি—'

প্রবালের চোখে হঠাৎ ধরা পড়ে, তার চারপাশে বস্তু বলে কিছু নেই। বস্তুর কঙ্কাল সব। লোপাকেও এক রেখায়িত দ্বিমাত্রিক মূর্তি বলে মনে হয়। এ যেন তার পরিচিত কোন জনপদ নয়, প্রাচীন এক সভ্যতার ধ্বংস অবশেষ, সময় যাকে জীর্ণ করে ফেলেছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের হাতে যা ধরা দিয়েছে একদিন। সেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপকে শান্তির বারিতে নিষিক্ত করতে চাইছে যে-নারী আগামী দিনে সে মা হবে। তার এই আকুলতা যেন তার সন্তানের সুরক্ষার জন্যই—'হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক—' এই সময়েই আর্তি তার কণ্ঠ বেয়ে যেন নির্ঝরের মত নেমে আসতে থাকে।

গান শেষ হতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে লোপা।

অনেক রাতে ঘুম থেকে তুলে থানার বড়বাবু খবরটা দিয়ে গেল—সুহৃদ মারা গেছে।

থুম ধরে বসে রইল প্রবাল। নিজেকে বড় অপাংক্তেয় মনে হয়। আর কিছু করার রইল না। ছেলেটি যেন দায়মুক্ত করে দিয়ে গেল তাদের। এবার স্থগিত শোকসভাটি হওয়ার আর কোন বাধা রইল না—আনোয়ার সুহৃদের যুক্ত শোকসভা। পুলিশ ক্যাম্প উঠে যাবে। উত্তেজনামুক্ত সাম্প্রদায়িক সদ্‌ভাব ফিরে আসবে।

তবু কেন যেন মনে হয়, এই গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে সুহৃদ তাদের উলঙ্গ করে রেখে গেল। কি করে মুখ দেখাবে সে!

মনে হতেই সমগ্র স্নায়ুগ্রন্থি ঝনঝন করে ওঠে। তা যেন এমনি করেই বেজে যাবে, অনন্তকাল। □

গাঙচিলের স্বপ্ন

শুভংকর গুহ

নদীর পারে ঢালু জমিটা ঢেউ খেলতে খেলতে গিয়ে মিশেছে ফসলের জমিতে। কিছুটা আবার বাবলা ও আশশ্যাওড়ার ঝোপে। জঙ্গলা ঝোপসমেত জমিটার ব্যাপকতা গিয়ে থেমেছে নিকটবর্তী শহরে। লম্বা লম্বা জলজ ঘাসের পাশ কাটিয়ে পোনা মাছের পিঠের মতো কালচে রঙের মেঠো পথটা আচমকা নেমেছে নদীর ঘাটে। পাকা ঘাট নয়, এলোমেলোভাবে ইঁট পাথর দিয়ে, দুই তিনটে গাছের গুঁড়িকে কোনোরকমে ঠেস দেওয়া হয়েছে। মানুষের নেমে যাওযার গতির ভারসাম্য সামলে দেওয়ার জন্য সামান্য আয়োজন। ঘাটটা একাই দখল করেছে গগন মন্ডল। গ্রামের মানুষরা বলে গগন জেলের ঘাট।

গগন মাঝারি আকারের হাত জালটা কাঁধে নিয়ে মেঠো পথটা ধরে নেমে গেল নদীর ঘাটে। জেলে ডিঙিটা নদীর জলের ঢেউযের সাথে সাথে দোল খাচ্ছে। গাঙচিলটা উড়ে এসে ঘুরতে ঘুরতে ডানা ঝাপটাল। মেজাজটাকে চাগিয়ে নেওযার চেষ্টা করল। কখনও ডানা টানটান করে, আবার কখনও ডানা ঝাপটিযে যুদ্ধ বিমানের মতো বেপরোয়াভাবে ডিঙিটার গতিকে অনুসরণ করতে থাকল।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। অথচ নদীতে মাছ নেই। মাছগুলো সব হঠাৎ করেই বেপাত্তা হয়ে গেল। নদীর জলের তলায ঘুমিযে থাকা কাদা মাটির রহস্য গগনকে ক্ষেপিয়ে তুলল। শীতটা প্রায ফুরিযে এসেছে। কনকনে ঠান্ডাটা দিন পনের আর নেই। আর কয়েকদিন পরেই গাছের পাতা খসে পড়বে। কাঁচা হলুদ রঙ চারদিকে ছড়িযে পড়ছে। নদীর জল বেলার দিকে বেশ গরম হয়ে ওঠে। তাই বলে মাছতো নদীতে থাকে। কোনোবছর এমন তো হয় না।

সাত-আট মাসের পোযাতি পাবনি। গগনকে রোজ বলে,—

মাছ খাওযার জন্য পেটের ভেতর মানুষটা লাল ফেলছে। রোজ রোজ গুগলি, কাঁকড়া, আর কুচে চিবিয়ে শরীরটা গুলিয়ে উঠেছে। বমি বমি লাগে।

গগন চুপ করে থাকে। পোড়াকপালী নদীটা শুকিয়ে মারবে। জলের গভীরে মাছগুলো কোথায় যে লুকিয়েছে তা, গগনও যেমন জানে না, জানেনা ওই গাঙচিলটাও।

শুকনো বাদামী রঙের গাছের পাতা গাছের ডালে যেমন কখনো কখনো সটকে থাকে, ঠিক গগনের চৌদ্দ বছরের বাদামী রঙের রোগাটে ছেলেটা ঢেউ খেলে যাওয়া জমির ভাঁজে তেমন আটকে থাকে। ছেলেটার ফ্যাকাশে কুদে দুটো চোখও ঘুরতে থাকে গাঙচিলটার উড়ে যাওয়ার গতির সঙ্গো সঙ্গো। গগন ও পাবনি দুজনেই ছেলেটাকে ডাকে, চুনাই বলে। চাঁচারি আর শুকনো ডালপালা ঠেসান দিয়ে গগনের

আশ্রয়। ঝড় তুফান এলে আশ্রয়টা এলোপাথারি পড়ে যায়। জেলে পরিবারটিকে উলঙ্গ করে দেয়। গগনের আশ্রয়ের উঠোনে চুনাই হেঁটে চলতে শিখেছে কাশফুল ধরার খেলা খেলে। ভোর হলেই চলে আসে নদীর ঘাটে, গগনকে অনুসরণ করে। এই কচি বয়সেই জীবিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। জেলে জীবন তার, পোক্ত বয়সে চোখের জল নদী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে বেশির ভাগ দিনই গগন চুনাইকে নিয়ে মাছ ধরতে যায় না। চুনাই নদীর ধারে একা একা বসে থাকে। যতোক্ষণ না নদীতে ভাসতে ভাসতে গগন ফিরে আসে। চুনাই নিমগাছের ডাল ভাঙ্গে, দাঁতন বানায়। বিক্রী করে। ভেপু বাঁশি কেনে। সবদিন তো নয়, আগের দিন বৃষ্টি হলে মাঠেঘাটে ঘুরে ঘুরে কাঁচপোকা ধরে ধরে শিশিতে ভরে রাখে। পোকাগুলো যাতে না মরে যায় এক-দুই চিমটি মাটি ও ঘাস ঢুকিয়ে দেয় শিশিতে। কেমন সুন্দর লাল মখমলের মতো জামা পরে থাকে কাঁচ পোকাগুলো। অথচ তার উদলা শরীর। সাপের গায়েও জামা আছে। মধ্যে মধ্যে মাটিতে ফেলে রেখে যায়। বেশ লম্বা লম্বা বড় বড় সাপের খোলস। হাতে তুলে নিলেই চড়াই পাখির চেয়েও ক্ষুদে মনটা কেঁপে ওঠে চুনিয়ার। গরীব জেলে ও জেলেনীর মিথুন ক্রিয়ার দুর্ঘটনা এই বাদামী রঙের মাংসপিণ্ডটার মনটা শক্তপোক্ত হয় না। ঘুমিয়ে থাকে পাহাড়ী ভূমির নিস্তব্ধতায় । নদীর পারে খরগোশের গর্তের সন্ধান তার জানা আছে। চুনাই এই পাখিগুলোকে অনেক দেখে। বিশ্রামের সময় উঁচু গাছের ডালে বসে থাকে। জোয়ার-ভাঁটার সময় নদীতে চলে আসে সদলবলে। শরীরের অর্ধেকটা ডুবিয়ে আবার কখনো সমস্ত শরীরটা ডুবিয়ে মাছ ধরে। গাছের ডালে বসে ভিজে ডানা শুকিয়ে নেয়। বাবার কাছ থেকে জেনেছে, গয়ার পাখি। পাখিগুলো একসাথে যখন চি-গী, চি-গী করে ডেকে ওঠে তখন চুনাইয়ের ভীষণ একা একা লাগে। মনে হয় ওই পাখিগুলোর সঙ্গে মিশে যেতে পারলে সে আর একা একা থাকত না। কিন্তু চুনিয়ার ভালো লাগে গাঙচিলটাকে। গগন বলে, শয়তান। অনেকদিন আগে মরে যাওয়া বটগাছ। এই গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান বিশু মাস্টার বলে, যেদিন মস্কোতে লেনিনের মূর্তিটা ফেলে দিল বুশরা ঠিক তার কয়েকদিন পরেই গাছটা ঝিমিয়ে মরতে শুরু করল। বিশু মাস্টারই বলেছে পাখিটার নাম শঙ্খচিল। চুনাই উচ্চারণ করতে পারেনা। তবে গগনের মতো শয়তান বলে না। বলে, জলচিল। চিলটার পিঠটা মরচে পড়া লোহার মতো লাল। মাথা আর পেটটা ধবধবে সাদা। চিলটা চুনাইয়ের চেয়েও একা। একা একাই ওড়ে। মরা বটগাছটার শাখায় কাঠিকুটি ও রবারের চটির ছেঁড়া ফিতে ও ভাঙ্গা ঝুড়ি দিয়ে বেশ বড়ো আকারের বাসা বানিয়েছে চিলটা। বিবর্ণ ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেই বটগাছটা, সেই বটগাছের মূল কাণ্ডটা ধরে চিলের বাসায় বাচ্চাগুলোকে দেখেছে চুনাই। বাচ্চা হওয়ার আগে ধূসর আর গোলাপি, সাদা ও লালচে বাদামী ছিট দেওয়া ডিমগুলোকেও চুনাই দেখেছে। চিলের বাচ্চাগুলোর পালক গজায়নি। থ্যাবড়া চোখ। মনে হয় ফোঁড়া হয়েছে। চামড়া ছাড়ানো মাংসপিণ্ড। চুনাইয়ের ঘেন্না করছিল। কেমন বোকা বোকা আর অবোধ। চুনিয়াকে দেখতে পেয়েই গাঙচিলটা উড়ে এসেছিল ছোবল মারবে

বলে। কিন্তু চুনিয়া গাছটাকে আগলে দ্রুত নেমে আসে সাপের গতিতে। তার খরখরে হাতের পাঞ্জার চাপে গাছটার মূল কান্ড থেকে উইপোকার বাসা ঝুরঝুর করে পড়ে যায় গাছের গোড়ায়। ভিজে গাছের গোড়া থেকে ডানা গজানো উইপোকা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে। চুনিয়াকে ছেড়ে উইপোকাগুলোকে চিলটা ধরে ধরে খাচ্ছিল। চুনিয়া জানে নদীর ধারে গিরগিটি, মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, সাপ গোবরে পোকা খেয়ে খেয়ে চিলটা শেষ করেছে। চুনিয়ার রাগও হয়, আবার বাচ্চাগুলোর কথা ভাবলে তার ক্ষুদে মনটা হাওয়ার মতো ফুরফুর করে খেলে বেড়ায়। চুনিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে জলচিলটার উইপোকা ধরার দৃশ্য দেখে। ডানা ঝাপটানোর শব্দে বাচ্চাগুলো সব চিৎকার করতে থাকে। চিলটাও ভাঙা গলায় কর্কশভাবে ডাকে। সমস্ত আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হযে ভেসে যায় সবুজ মাঠ, ফসল, বাবলা ও আশশ্যাওড়ার ঝোপের ওপর দিকে। মনে হয মৃত বটগাছটা জীবন্ত হয়ে উঠছে মা গাঙচিলটার স্পর্শে।

বর্ষাকাল হলে চিলটার কোনো চিন্তা ছিল না। ডোবা ধানক্ষেত ও মাঠেঘাটে কিছু না হয় কপালে জুটে যেত। নদীতে মাছ নেই তাই চিলটাকে উড়ে চলে যেতে হয় শহরে। যদি শহুরে এঁটো-কাঁটা আর ময়লার গাদায কিছু খাবার সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু রোজ সকালে গগনকে সে কিছুক্ষণ অনুসরণ করে অনেকটা দূরে চলে যাবে। কয়েকদিন ধরেই গগন ইলিশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। দুই-চারটে ইলিশ ধরা পড়লে অনেক সমস্যাই জল হয়ে যেত। পাবনির ওষুধ, চুনিয়াই বা কতদিন আর টুকরো কাপড় জড়িয়ে হাড়গিলে চেহারাটাকে আড়াল করবে। পোযাতি পাবনির শরীরের বাযনাও কম নয়। পা দুটো ফুলে গেছে। হাতে-পায়ে যন্ত্রণা। আবার ইলিশ খাওয়ার ইচ্ছেটা দুজনেরই ভীষণ বেড়ে গেছে। হলুদ রঙের পাতলা ঝোল। সবুজ গোটা কাঁচা লঙ্কা ভাসছে। নোন্‌তা ইলিশের ঝোল গরম ভাতের সঙ্গে ভাবলেই জিভে জল এসে যায। ঢোক গিলতে হয়। পেটের ভেতরটা পাকিয়ে ওঠে। গোটা ইলিশের আঁশ ছাড়িয়ে নেয়। টুকরো করার আগে জলে ধুযে ফেলে। টুকরো হযে গেলে গরম কড়াইয়ে ছেড়ে দেয। সঙ্গে একটু বেগুন, ক্ষেত থেকে তুলে আনে কাপড়ের আঁচলে লুকিয়ে, আর জংলী কুমড়োর টুকরো। উনুনে লকলকিয়ে আগুনে বৃষ্টির ফোটার মতো ইলিশ মাছের ঝোল ফোটে। নোন্‌তা মধুর গন্ধ বালিশ ও লেপতোষক এবং চাটাইয়ে মাখামাখি হযে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে-গগন বিড়িতে দম দিয়ে হাতের তালু থেকে সুড়ুৎ করে এক নিশ্বাসে গন্ধ নেয়। পায়ে পাতা দুটো হাতিয়ে ভাবে এই দুনিয়াতে সুখী সে, যে পেটভর্তি খাওয়ার খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে।

একটা ছোটখাটো কালচে রঙের মেঘ ছুটে এসে আবার ছাড়িয়ে গেল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে। মেঘটা এলে হয়ত দুই-চারটে বেলে মাছ পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। মেঘটা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঙচিলটাও উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে চলে গেল নদী ছাড়িযে মৃত পশুর নাড়িভূড়ির খোঁজে অথবা শহুরে আবর্জনার সন্ধানে। জালটা বাঁশের মাচায ছড়িয়ে দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল পাবনি। পাবনি কিছু বলল, গগন শুনেও শুনল না। জালটা বাঁশের পোক্ত মাচায় ঝুলিয়ে রাখা হয়ে গেলে মাছের খালি ঝুড়িটা উঠোনের এক কোণে প্রায় ছুঁড়েই রেখে দিল। বারান্দার এক কোণে পাবনিও কুপিটা

রাখল। বারান্দা ঠিক নয়, মাটি উঁচু করে ঘরের সামনে একটু অন্যরকম মেঠো ব্যবস্থা। কুপির পেটে তেল একদম তলানিতে চলে এসেছে। এই জন্য কুপির পেটটা টং করে উঠল। পাবনি এখন খুব কষ্টে চলাফেরা করে। পেটের ভেতরে মানুষটার ওজন বইতে বইতে সে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। জলঢালা ভাতে কাঁচা লঙ্কা ডলে আর সামান্য নুন যে গলা দিয়ে নামতে চায় না। সেই সকালে দুই-এক মুঠ ভাত যা পড়েছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গো গেছে পাবনির। বলল—

—মাছের নেশায় আর ঘুরিস না গগন। মাছ পাওয়ার কপাল তোর পুড়েছে। শহরে চলে যা। কামলার কাজ করগে। নগদ পয়সা তো পাবি। চুনাইটাকে দেখেছিস ? খেতে না পেয়ে ছায়া হয়ে গেছে ?

গগন চুনাইকে দেখল। পাতলা শুকনো হাড় জিরজিরে বাদামী রঙের ছেলেটা খেতে পায় না বলে, অভিযোগ করে না। হয়ত সে বুঝে গেছে সবাই এই দুনিয়াতে পেট ভরে খেতে পায না। কোনোরকমে শরীরের নিম্নাঙ্গাকে আড়াল করেছে এক টুকরো কাপড়। চুনিযার তাতে লজ্জা নেই। নদীর পাড়ে সমস্ত গাছ যে উলঙ্গা হয়ে থাকে। ভগবান তো তাদের পোশাক পরায না। কোনোরকমভাবে খেযে বেঁচে থাকার যুদ্ধে গগন কাত হয়ে যাচ্ছে। টাল সামলাতে পারছে না।

নদী গগনকে টানে। তার শরীরে রক্তের বদলে নদীর জলের স্রোত বইছে। ক্ষিদের যন্ত্রণায়, দুঃখ ও কষ্টে তার চোখ দিয়ে নদীর জল গড়িয়ে পড়ে। তার শরীরে নদীর জল কাদার গন্ধ। সে ঘুমিয়ে ঘুমিযে নদী দেখে। নদীর পারের মানুষ গগন, নদীই তাব ঘর। নদীর বুকে ভেসে বেড়ায দিনরাত্রি। সে শহরে যাবে কি করে ? গগন তাই পাবনিকে বলে,—

নদী সাগরের মোহনা থেকে নোনা বাতাস ছুটে আসে। এই বাতাসে নেশা আছে, এই নেশা শহরের বাতাসে নেই। শহরে বাবুদের ফুলকাটা রঙীন জামাকাপড, কি তেলতেলে শরীর। উদলা শরীরে কাটিযে দিলাম রে। নদীর জলের তলায মাছ। সেই মাছ ধরতে ধরতে কপালটাকে ভাসালাম। কপালটা আমার মজে গেল পাবনি।

সারাদিন রোদ, জল, বাতাস, ডিঙি আর নদীর সঙ্গো পাল্লা দিয়ে মানুষটা ক্লান্ত হয়ে আসে। পাবনিকে কাছে টেনে নেয়। লেপ তোষকের দুর্গন্ধ তার রক্ত মাংসের সঙ্গো মিশে যায়। গোটা সংসারটার গন্ধ লুকিয়ে আছে। ভীষণ আপন মনে হয। বাইরে ক্রমশ ঝিঁঝি পোকার ডাক গগনের যৌন ক্ষুদাকে টান টান করে মেলে ধরে। পাবনির পেটের ভেতরে আরেকটা নদীর মানুষ ধুকধুক করে। গগন পাবনির পেটে কান রাখে। পাবনি মেছো মানুষটার মাথা জাপটিয়ে ধরে। রাত্রি ক্রমশ গভীরতা ছুঁযে ফেলে। গগনের দুই চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চুনাই শুয়ে শুয়ে গাঙচিলটার বাচ্চাগুলোর কথা ভাবে। এখন হয়তো ঘুমোচ্ছে। বুনো খরগোশের গায়ের গন্ধ খোঁজে চুনাই। ক্ষিদে, আর বাবার মাছ না পাওয়ার কষ্টটা সাপের খোলসের মতো যদি পাল্টে যেত ! একটু ঠান্ডা লাগছিল। হাঁটু ভাঁজ করে, হাত দুটোকে পেটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শরীরটাকে ছোট করে পাশ ফিরে কাত হয়ে গেল। চুনাইয়ের চোখে ঘুম নেই।

পাতলা সাদা রঙের ভোর। ঘন কুয়াশার চাদর। ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে ভোরবেলা। বড়

বড় বড় গাছগুলো অস্পষ্ট। ভোরের পাখিগুলো গাছের ডালে চুপ করে বসে আছে। কুয়াশায় ভিজে মাটির পথটা গিয়ে মিশেছে সীমানাহীন সাদার মধ্যে। যেখানে নদীটা লুকিয়ে আছে। ফাল্গুনী ভোর। গোটা শীতকালটা গ্রামের মানুষকে অনেক কিছুই দিয়ে গেল। শাক, সবজি, মাছ, খেজুরের রস আর শেষবেলায় অন্তহীন সাদা, মানুষের মনের ভেতরের দাগ মুছে দিচ্ছে।

গগন চুনাইয়ের হাত ধরে, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ভিজে মাটির পথটা আঁকড়ে আস্তে আস্তে নেমে গেল নদীর ঘাটে। এই কুয়াশা আচ্ছন্ন ভোরে গগন কি মাছ পাবে? চুনাই বৈঠা দিয়ে জল কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। মন্থর গতিতে ডিঙি ভেসে চলেছে। কুয়াশার সোঁদা সোঁদা গন্ধটা এদদমে টেনে বুকের ভেতরে জমা করছিল চুনাই। বীবর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, গগনের মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে নদীর বুকটা গগন ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। গগন বলল,

—আজ মোহনার দিকে যাব।

চুনাই বুঝতে পারল নদীর সঙ্গে বাবার আজকে একটু যুদ্ধ হবে।

গাছের মাথায় ভোরের পাখিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। কুয়াশা সরতে শুরু করেছে। কুয়াশা সরিয়ে পেঁয়াজের খোসার চেয়েও পাতলা রোদ ছড়িয়ে পড়ছে নদীর জলের ওপরে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই রোদটা টান টান হয়ে উঠল। আর গাঙচিলটাও ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে গগনের ডিঙির কাছে। ঢেউগুলো চনমনে রোদের স্পর্শে মুক্তোর মতো চমকাচ্ছে। শান্ত সুস্থির নদী।

— ওই দেখ চুনাই, শয়তানটা চলে এসেছে। মাছ উঠলেই ছোঁ মারার ফন্দি করবে। বৈঠা ঘোরাবি, পালিয়ে যাবে।

গাঙচিলটার সঙ্গে গগনের একদিন একটা মোক্ষম লড়াই হবে। গগন গাঙচিলটাকে গালাগালি দিলেই চিলটা নেমে এসে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কর্কশভাবে ডেকে ওঠে। জলের কাছে গোঁত্তা মেরে উঠে যায় আবার অনেকটা ওপরে।

গহিন মোহনার কাছাকাছি চলে এসেছে ডিঙিটা। ছন্নছাড়া ছোটবড় দলছুট কালো মেঘ ভাসছে আকাশে। দক্ষিণ দিকের আকাশে একটা কালো সমান্তরাল রেখা অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। গগন উল্লাসে বলে উঠল,

—আজ মাছ উঠবে রে চুনাই।

চুনাই উৎসাহিত হয়ে ডিঙির গতি বাড়িয়ে দিল। গগনের শরীরে রক্ত-মাংস নেচে উঠছে। তার চোখের সামনে জ্যান্ত স্বপ্ন ভেসে উঠল। ডিঙিটা মাছে মাছে ভরে উঠবে।

ভোর পালিয়ে যেতে না যেতেই, একটু বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে ছায়া ছায়া অন্ধকার। ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল। সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া। নদীর জলটা কালিবাউস মাছের গায়ের কালচে রঙা হয়ে উঠেছে। গগনের খালি পেটের ভেতর থেকে দমকা হাওয়া উঠে এল। ঢেকুর তুলল। শুধু পিক্কাতে টান মেরে কত আর ভুলে থাকা যায়। দুজনের পেটের ভেতরেই পান্তা কখন যে হাওয়া হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি। নদীর পারে শহরমুখী গ্রামটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। জাল টানতে গিয়েই গগন বুঝতে পারল চোরা স্রোতের টান। চুনাইকে তাই ইশারায় জানাল, ডিঙিটাকে আর

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নদী এখানে চওড়া। একূল-ওকূল অস্পষ্ট। সোঁ সোঁ হাওয়া ক্রমশ ঝোড়ো হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে। গগন একটু ভয় পেয়ে গেল তুফানী হাওয়াটা সাগর থেকে ছুটে এসে ডিঙিটাকে ধাক্কা মারবে নাতো। নদী এখানে মুক্ত। বন্ধনহীন। শাসন মানে না। মাঝে মাঝে শুশুক মাটির কলসীর মতো ফুড়ুৎ করে ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। সাগরের দিক থেকে উড়ে আসা পাখিগুলো হাওয়ার টানে ভাসতে ভাসতে ভারসাম্যহীন হয়ে গোত্তা মারছে। বংশানুক্রমে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে গগন বুঝে নেয়, নদীর ঠিক এইখানে মাছের উপস্থিতিটা যেন টের পাওয়া যাচ্ছে। গগনের কপালে পাকা মাছ শিকারীর দাগ ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো ইস্পাতের চেয়েও চকচক্ করছে। শরীরের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত, করে জালটাকে ছুঁড়ে মারল। কি জানি, কি রহস্য নিয়ে উঠে আসবে জালটা? নোনা হাওয়া গলা বুক শুকিয়ে কাঠ করে দিয়েছে।

বেশ ভারী ভারী লাগছে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। গগনের রুক্ষ গালে হাসির ভাঁজ ফুটে ওঠে। অনেকটা কায়দা করে, রয়েসয়ে জালটা তুলে আনল ডিঙির ওপরে। রুপোর চাকতির মতো চকচকে মাছ জড়িয়ে গেছে জালে।

—ছাড়িয়ে নে চুনাই। ঝুড়িতে তুলে ফেল।

চুনাই একা পারছে না। একটা ঝুড়িতে রাখে তো অন্যটা লাফ দিয়ে পালিয়ে যেতে চায়।

চুনাই বলল, — তুইও রাখ, লাফাচ্ছে!

—মাছের ঝাঁক আছে। দেরি হলে পালিয়ে যাবে।

গাঙচিলটা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে একটু ওপরে উঠে গেল। চক্রাকারে উড়তে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। সব মাছ টপ টপ কুড়িয়ে তুলে ফেলল গগনও।

জাল ফেলেই মাছ পাচ্ছে। ফুলের চেয়েও সুন্দর। মন ভোলানো আঁশটে গন্ধ। কাঁচা লোহা আর রূপালি রঙের। দুপুর গড়িয়ে গেল। মাছ পাওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছে গগন। আকাশে কালো মেঘ হঠাৎই ছিঁড়ে গেল। তবুও মেঘলা হয়ে আছে। গগন উৎসাহে বলে উঠল - আর একটু এগিয়ে চল চুনাই। মোহনায়।

চুনাই বুঝতে পারল বাবাকে এখন স্বপ্নের মাছ হাতছানি দিচ্ছে।

চওড়া ও সীমাহীন জলরাশির মধ্যে ডিঙিটা পাখির পালকের চেয়েও হাল্কা হয়ে দুলছিল। অসর্তক হলেই বিপদ। টাল সামলানো যাবে না হয়তো। চুনাইয়ের পক্ষে সামাল দিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। গগনও জাল ফেলার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। নদীকে আজ সে মাত করে দিয়েছে। নদীর জলের তলায় ঘুমন্ত কাদামাটি আজকে সমস্ত রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছে। হাত জাল নদীর গভীরে খুব একটা যায় না। এইজন্যই তার স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছিল না। যদি ঝাঁক থেকে একটা দুটো দলছুট হয়ে চলে আসে তাহলে, গগনের জালে ধরা পড়তেই হবে। ঘোলাটে নদীর জল মোহনার কাছাকাছি এসে অনেক হাল্কা রঙের ও স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। ঢেউগুলো উঠেই যেন হঠাৎ করে এখানে ভেঙে যায় না। ঘুরপাক খায়, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

ডিঙিটা জলের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে জলের উপরে উঠে এল। একটু ভয় ধরে

গেল। স্বপ্নের লোভে পড়ে তাকে অনেক দাম দিতে না হয়। ডিঙিটাকে নিয়ে তার মোহনার কাছাকাছি চলে আসাটা হয়তো ঠিক হয়নি। চুনাইও ভয়ে একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গগনের উৎসাহে একটুও ভাটা পড়েনি। জালটা টেনে যখন তুলছে তখন রুপোর চাকতি রঙের মাছটা একবার গোত্তা খেল। চুনাই উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠে দাঁড়াল। কল্পনায় গন্ধটা গগনের নাকে এসে হোঁচট খেল। নোনা গন্ধ। মাছ নামক আত্মসমর্পিত জীবনের গন্ধ। পাখির ঝাপটানো যেন, ফরফর করে লাফাচ্ছে। বন্দী জীবনের আর্তনাদ। গগনের দোক্তাপাতায় ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলো দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে উঠল। অনেকদিন পরে তার জালে আটকেছে স্বপ্নটা।

—দেড় কেজি হবে রে মাছটা। চুনাই দেখ, কেমন পেটানো শরীর। ঠাসা। সেদ্ধ হলে রসগোল্লার মতো লাগবে।

চুনাইয়ের জিভটা লকলক করে উঠল।

ডিঙিতে পড়ে আছে মাছটা। দুই-একবার লাফিয়েই নেতিয়ে পড়ল। লেজটা কাঁপাল। পাখনার তলায় তলপেটটা শ্বাসকষ্টে ওঠানামা করছিল। আহ্লাদিত হয়ে দুজনেই মাছটাকে দেখছিল। দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দুজনেই বুঝে উঠতে পারেনি। হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়বে গাঙচিলটা। গগন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে পা দুটোকে ঝুলিয়ে আবার ঝাঁপিযে পড়ার চেষ্টা করছে শয়তানটা। ছোঁ মারল। কিন্তু ইলিশ মাছটার নাগাল পেল না। উড়ে গিয়ে গোত্তা খেযে শরীরটাকে বিদ্যুতরেখার চেযেও দ্রুতগতিতে ভাসিয়ে পর পর কয়েকবার চেষ্টা করতে লাগল। বৈঠা হাতে তুলে নিল গগন। চিলটাও তার উড়ে যাওয়ার গতিকে অস্বাভাবিক করে তুলল। ক্রমশ রুক্ষ হযে গেল। যুদ্ধবাজ যেমন হয়। ইলিশ শিকারের জন্য কোনও ভযই আজ তাকে রুখতে পারবে না। গগনের বৈঠাও নয়। ডিঙির ওপরে দুটো বাদামী রঙের মানুষের মাথার ওপর দিয়ে যুদ্ধবিমানের মতো ঘুরতে থাকল। ইলিশটাকে ছোঁ মেরে নিযে যাবে, ঠোঁটে গুঁজে দেবে বাচ্চাগুলোর সুস্বাদু ইলিশ।

গগন বৈঠা হাতে প্রস্তুত। আক্রোশে চিৎকার করে উঠল গাঙচিলটা। আর ক্রমাগত ছোঁ মেরে যাচ্ছিল। গগনের বৈঠাও নাগাল পাচ্ছিল না। গাঙচিলের গতির কাছে গগনের সমস্ত শক্তি ও ক্রোধ পরাজিত হয়ে যাচ্ছে। চুনাইকে চিৎকার করে বলল,—ঢুকিয়ে ফেল ঝুড়িতে। শয়তানটা ছোঁ মারছে। মাছটারে বাড়িতে নিতে দেবে না রে শয়তানটা।

গগনের চোখ দিয়ে প্রায় জল এসে যাচ্ছে। এবার যতটা সম্ভব গলা তুলে চিৎকার করে উঠল, আজ শয়তানটা মেরে ফেলল। এত কাছে শয়তানটাকে গগন কোনদিন দেখেনি। দেখেছে চুনাই। পিঠটা মরচে পরা লোহার মত লাল. মাথা আর পেটটা ধবধবে সাদা। গগন বলে, কত বড় রে পাখিটা!

বিশু মাস্টার একটা নাম বলেছিল। চুনাই বাবাকে বলে, জলচিল।

গগনের দুরন্ত বৈঠা ক্ষেপে গিয়ে এবার আঘাত করল চিলটাকে। কর্কশ শব্দ আকাশটাকে মাতিয়ে দিল। যন্ত্রণার শব্দ...কোক্-কোক্। নদীর জলে আছড়ে পড়ল পাখিটা। যেন ভেঙে পড়ে গেল। ভাঙা চোট খাওয়া ডানার টুকরো টুকরো পালক

ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। পালকের আবরণে সাজানো পাখিটা এলোমেলো হয়ে গেল। চুনাই উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ বাবার সঙ্গো গাঙচিলটার যুদ্ধে হাঁটু ভাঁজ করে বসেছিল। চুনাই জানত দুজনের লড়াইটা এভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাবে। ইলিশটাকে চটপট ঢুকিয়ে ফেলল ঝুড়িতে। গয়ার পাখিগুলো চিলটার ভাসমান দেহের কাছে এসে জড়ো হল। ডাকতে থাকল, চি-গী, চি-গী করে।

চুনাই মনে মনে অস্থির হয়ে গেল। ডিঙিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল চিলটার কাছে। নদীর জলের ওপরে ভাসতে ভাসতে দাঁপড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নেতিয়ে পড়ল। ডিঙিতে তুলে আনল চুনাই। মোলায়েম ও আলতোভাবে চিলটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। ধারালো ঠোঁটটা ফাঁক করে, পরিশ্রমী, জেদী, আহত ও ক্লান্ত শ্রমিকের দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল চুনাইয়ের দিকে। সাদা তুলো তুলো নরম মেঘ ভাসছে আকাশে। গাঙচিলের নীলাভ চোখের গভীরে সাদা মেঘের প্রতিফলন। গগনের দিকে তাকিয়ে চুনাই বলল,—

—জলচিলটা মরে গেছেরে বাবা। চোখের পাতাটা কাঁপছেনারে।

আকাশে ভাসমান কালো মেঘ সরে গেছে। মধ্যাহ্নের ঝিমিয়ে পড়া রোদ। একটা গোটা দিনের স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে অবেলায়। গগন বুকচিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধটার আজকেই জয়লাভ হবে, ভাবেনি সে। অনেক মাছের মধ্যেও আজকে সে সঞ্চয় করেছে, স্বপ্ন। চুনাইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেই সে হোঃ হোঃ করে হাসছে।

গাঙচিলটার জীবনহীন ছেঁড়া পালকের দেহটার কাছে গুম হয়ে বসেছিল। গগনের ডিঙিটা ফিরে যাচ্ছে শহরমুখী গ্রামের দিকে। গহীন মোহনা পিছনে সরে যাচ্ছে। গগনের নাকে ভেসে এল ইলিশ মাছের ঝোলের গন্ধ। পাবনি আর কিছুক্ষণ পরেই তার পাতে দেবে। কাঁচালঙ্কা, হলুদ, ইলিশের গন্ধে তার বাড়িটা আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে আজ। পাবনির পেটের ভিতরের মানুষটাও আজ চেটেপুটে মাছ খাবে। গগনের পেটেও আজকে রাক্ষুসে খিদে। ইলিশ মাছের ঝোলের সঙ্গো মাঠভর্তি ফসল আজকে সে খেয়ে ফেলবে। পাবনি আহ্লাদে গরম ফুটন্ত ঝোলের ধোঁয়া কাটিয়ে গগনকে বলবে—এই গাদাটা নে গগন, বড় আছে।

গগন না বলবে। বলবে, চুনাইকে দে। ছেলেটা না থাকলে ইলিশ আজ খাওয়াই হত নারে।

চুনাই এখনও গুম হয়ে বসে আছে। দুটো চোখের নিচে স্যাঁতস্যাঁত করছে।

নদীর পাড়ে ঢালু জমিটার ভাঁজে গিয়ে আটকে গেল ডিঙিটা। কিন্তু গত কয়েকদিনের মতো মাছ না নিয়ে ফেরেনি। ঝুড়ি ভর্তি মাছ নিয়ে গগন উঠে এল নদীর ঘাট থেকে। হাতে ইলিশ মাছটাকে ঝুলিয়ে, ঢালু জমিতে কোনওরকমে টাল সামলে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। চুনাইকে বলল,—

জালটা জমিতে বিছিয়ে দিস। ভাল করে টান টান করে ছড়িয়ে দে। তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। মাছের ঝুড়িটা বাড়িতে রেখে এসে, জালটা ভাঁজ করে তুলে রাখব।

কালকে আর নদীতে যাব না।

চুনাইয়ের পক্ষে যতটা সম্ভব দ্রুত জালটাকে বিছিয়ে দিল জমিতে। তারপরে ছুটে

এসে গগনের পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। বাবার হাতে লটকানো ইলিশটাকে দেখছিল। মাছটা অস্বাভাবিক মাত্রায় দুলছিল। শহরমুখী গ্রামের জমিটাও সমতল হয়ে আসছে। চুনাই এই সমতল জমির অপেক্ষায় ছিল। জলচিলটার চেয়েও দ্রুত ছোঁ মেরে ইলিশ মাছটাকে ছিনিয়ে নিল চুনাই। গগন চমকে উঠল।

— এই, এই শয়তান ? দে ? মাছটা দে ? কোথায় ছুটে যাচ্ছিস ?

—জলচিলটার, বাসায়,

—চিলটার বাসায় ? কেন ?

—জলচিলটার বাচ্চাগুলোকে মাছটা খাইয়ে দিয়ে আসিগে। সারাদিন বাচ্চাগুলোন না খেয়ে আছে রে,

চুনাই দ্রুত ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। মৃত শুকনো ডালপালা ছড়ানো বটগাছটার দিকে। গগনের স্বপ্নটা চুনাইয়ের হাতে লটকাতে লটকাতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান বিশু মাস্টার ঘটনাটা দেখে চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

চুনাইয়ের কথাগুলো তার কানে ভাসছে। এই ফাঁকা মাঠ কাঁপিয়ে কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

গগন বলে, দেখলেন কর্তা, শয়তানটার ক্ষ্যাপামি। চুনিয়াটা মানুষ হবে না কর্তা। □

সহমরণ

দীপঙ্কর দাস

শরীরটাকে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা কাচের প্লেট থেকে দুটো কাজু তুলে নিয়ে দাঁতে কাটতে কাটতে মুরলিমোহন বললেন,—লেকেন যোগেশ্বরীর ওই বস্তিতে তো কিছু কিছু হিন্দু লোক ভি থাকে।

—থাকে। তবে তারা সবাই বাগরি আউর কোরি। এছাড়া বেশির ভাগটাই মুসলিম। সবাই লেবার লোগ। আমাদের ভোটারও নয় তারা।...পানীয়র গ্লাসে মৃদু চুমুক দিয়ে হরিপ্রসাদ ভোরা বললেন। —জবর দখল ঝোপ্পর পট্টি বানিয়ে এতখানি জমি—তাও আবার শহরের এমন রইস এলাকায়—ওরা কতবছর আটকে রেখেছে বলুন তো। এসবও দিনের পর দিন চেয়ে দেখে যেতে হবে।

—আরে না না। দেখে যাবেন কেন? আমি তো আর আঙুল চোষার জন্য বসে নেই। মুরলিমোহন হরিপ্রসাদকে আশ্বস্ত করার জন্য ডানহাতটা সামনের দিকে এমনভাবে প্রসারিত করলেন যেন তিনি হরিপ্রসাদকে দেখাতে চাইলেন তাঁর হাতের দৈর্ঘ কতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তারপর বললেন,—কেবল একটা মওকা আসতে দিন। তারপরেই আমার খেলাটা দেখবেন।

—মওকা তো এসেই গেছে। এখনও যদি এই মওকা থেকে ফয়দা তুলতে না পারি, তাহলে পরে পস্তাতে হবে। হরিপ্রসাদ অস্থির গলায় বললেন।

মুরলিমোহন চোখ বুজে কিছু যেন ভাবলেন। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,—ধীরজ রাখুন হরিপ্রসাদ। মওকার চরিত্রটাকে ভাল করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করুন। এখন কি আর সেই দিন আছে যে মনগড়া মওকা তৈরি করে আগুন লাগিয়ে বস্তি সাফা করে জমি হাতিয়ে নেবেন? প্রেস আছে। টিভি কোম্পানি আছে। কত অর্গানাইজেশন আছে যারা আম আদমির সুরক্ষার জন্য হল্লা করে চলেছে। এরা কি তখন চুপ করে বসে থাকবে ভেবেছেন? ওদের চাপে হয় বস্তিবাসীদের জমিন ফিরিয়ে দিতে হবে। নয়তো সরকারকেই অ্যাকোয়ার করতে হবে। তখন বদনাম হবে। আবার জমিও যাবে।....বলতে বলতে গ্লাসের তলানিটুকু চুমুক দিয়ে গ্লাসে পুনরায় পানীয় ঢালতে ঢালতে বললেন মুরলিমোহন,—এর জন্যই চোখ কান খোলা রাখতে হবে। জমিন হাতাবার মত জমিন তৈরি হওয়ার মতো সময় দিতে হবে।

ধনীরাম খেমকা এতক্ষণ একমনে কাজুবাদাম আর উষ্ণ পানীয়র স্বাদ গ্রহণ করছিলেন। হয়ত মুরলিমোহন এবং হরিপ্রসাদের বাক্যালাপ শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে। কিংবা মনের সেই বহু আকাঙ্খিত স্বপ্নটাকে মস্তিষ্কের কোষকলায় ছড়িয়ে পড়া

উত্তেজক পানীয়র রঙিন বাষ্পে জারিত করে রূপদানে মগ্ন হয়েছিলেন। শহরের পশ্চিমপ্রান্ত ছোঁয়া যোগেশ্বরীর ডিহিচকের ওই বস্তিটার জমির জরিপের কাজটা তো ধনীরাম আর হরিপ্রসাদ অনেকদিন আগেই সেরে ফেলেছেন। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা ধনীরাম অনেক পরিশ্রম করে উদ্ধার করেছেন,—জমিটার মালিকানা যে এখন ঠিক কার—সে বিষয়ে বস্তিবাসীরা যেমন, ঠিক তেমনি পৌরসভাও ঘোর অন্ধকারে। তবু সদ্য সমাপ্ত পৌরনিগমের নির্বাচনে জিতে বোর্ড গঠন করে ধনীরামের শ্যালক বেদমাওয়া আশ্বস্ত করেছেন,—জিজাজি, জমির মালিক না থাকল তো কি হয়েছে। আমি আপনার নামে ল্যান্ড-টার মিউটেশান করে দেব। প্ল্যানও স্যাংশন হয়ে যাবে। আপনি কেবল জমিনটাকে সাফা করার কাজটা সেরে ফেলুন।

এরপর থেকেই তো ধনীরাম তার মানসলোকে ডিহিচকের বস্তি ঘিরে তাঁর আকাঙ্খিত আবাসন প্রকল্পটি রচনা করে ফেলেছেন। সেই আবাসনের ঘরদালানে রঙ চড়িয়ে দিয়েছেন হরিপ্রসাদ। কালার ম্যাচিং-ও খুব লাগসই হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে শহরে প্রোমোটারি ব্যবসা শুরু করেছেন দুজনে। সংস্থার নাম দিয়েছেন 'লালকমল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি'। শহরের বেশ কিছু জায়গায় বেশ কয়েকটা বহুতল আবাসন বানিয়ে মোটারকম নাফাও ঘরে তুলেছেন। কেবল গতবছর শীতের শেষে রাজ্যের পশ্চিমাংশ জুড়ে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল, দু-চারটে জেলার ঘরবসতি মাটিতে মিশে গেল, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাল, তখন ধনীরাম এবং হরিপ্রসাদকে কটা দিনের জন্য শহর ছেড়ে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। কারণ এই শহরে ভূমিকম্পের প্রভাবে যে কটা বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি ভেঙে পড়েছিল, প্রাণনাশ হয়েছিল বাসিন্দাদের সে কটা ফ্ল্যাটবাড়ির সিংহভাগই নির্মিত হয়েছিল 'লালকমল' কনস্ট্রাকশন কোম্পানি দ্বারা। পাশের বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি যেখানে সম্পূর্ণ অটুট সেখানে ধনীরামদের তৈরি করা ফ্ল্যাটবাড়ি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে। এই দৃশ্য জনরোষের সৃষ্টি করেছিল। জনতার চাপেই পুলিশকে ধনীরাম এবং হরিপ্রসাদের নামে স্থানীয় আদালতে একটি মামলাও দায়ের করতে হয়েছিল। তবে ওই তিনমাস। তিনমাস পরে দুজনেই শহরে ফিরে আসেন। মামলাও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির অভাবে খারিজ হয়ে যায়। এতসব কিছু তো সামলে ছিলেন মুরলিমোহন নিজেই। তারপর থেকে লালকমল তেমন ফুটছে না। জমি নেই হাতে। তাই এখন নজর পড়েছে ডিহিচকের বস্তির ওপর।

সেই বস্তি নিয়ে ডিল পাক্কা করার জন্যই আজ সন্ধ্যারাতে মুরলিমোহনের বাড়িতে বৈঠকে বসেছেন ধনীরাম আর হরিপ্রসাদ। মুরলিমোহন কেবল এলাকার এম এল এ-ই নয়, ধনীরাম এবং হরিপ্রসাদের পথ প্রদর্শকও। মুরলিমোহনের পার্টি এখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আছে। আবার মুরলিমোহনকে তেলেজলে সিক্ত করে রেখেছেন ধনীরাম আর হরিপ্রসাদ। দীর্ঘদিন ধরেই দু-পক্ষের মধ্যে সুন্দর বন্দোবস্ত গড়ে উঠেছে।

ধনীরাম এবং হরিপ্রসাদের ভবিষ্যত এখন নির্ভর করে আছে ডিহিচকের বস্তিটার ওপর। অথচ এরকম পরিস্থিতিতে মুরলিমোহন ধৈর্য ধরার কথা বলছেন। মুরলিমোহন আবার ল্যাজে খেলাচ্ছেন না তো। চিন্তাটা স্বাভাবিক কারণেই ধনীরামের চওড়া কপালে কয়েকটা গভীর রেখা এঁকে দিয়ে গেল। এই তো সেদিন দেশের তিন-চারটে

রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হয়ে গেল। প্রতিটি রাজ্যই হাতছাড়া হয়ে গেছে। তিনমাস ধরে সীমান্তে দেশের সমস্ত সেনাবাহিনীকে মজুত করে রেখে একটা যুদ্ধযুদ্ধ বাতাবরণ সৃষ্টি করেও রাজ্যগুলিকে হাতে রাখা গেল না। এখন বলার মত এই একটি রাজ্যই তো হাতে আছে। কিন্তু এই রাজ্যের ঘাড়ের ওপরেও তো নির্বাচন শ্বাস ফেলছে। হাতে বেশি সময় নেই। একারণেই তো পার্টির শাখা সংগঠনগুলি আজ দেশ জুড়ে রামলহর তৈরির জন্য আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে। এই রাজ্যেও ভূমি প্রস্তুত হয়ে আছে। এখন প্রয়োজন কেবল একটা ভারী দাঙ্গা। দাঙ্গা আর কি? কোথায় কোন মহল্লায় বিরোধীদলের ভোটাররা বসবাস করছে, —তাদের সাফ করে দেওয়া। তা না হলে মুরলিমোহন আসন্ন নির্বাচনে বিধায়ক হবেন কি করে? আর মুরলিমোহন মাটি হারালে ধনীরামদের লালকমল কনস্ট্রাকশন ফুলে-ফুলে ফুটবে কেমন করে।

এতসব কথা মুরলিমোহন জানেন না এমন তো নয়। বরং একটু বেশিরকম জানেন। এরপরও যখন মওকা এবং ধীরজ-এর কথা বলছেন, তখন বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে কোথাও একটা জট ধরে আছে। জট খুলছে না।

সেই জট খোলার জন্যই ধনীরাম বললেন,

—ঠিক আছে এম. এল. এ. সাহাব, আমরা আপনার কমিশনটা আরও ফাইভ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছি। সামনে ইলেকশন। আপনার খরচাপাতি আছে। এ সময় আমরা যদি পাশে না দাঁড়াই তবে আর কে দাঁড়াবে।

—বলছেন? মুরলিমোহনের মুখ এতক্ষণে উজ্জ্বল হল।—তাহলে ধরেই নিন ডিহিচৌকের ঝোপরপট্টি সাফা হয়ে গেছে। আপনারা প্ল্যান পাক্কা করে ফেলুন।

দুই

কুলুঙ্গীতে পবনপুত্রের গলায় মালা। পায়ের কাছে ফুল-বেলপাতা। হাতে এক ডজন ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পবনপুত্রের মূর্তির চারপাশে বারকয়েক ঘুরিয়ে ধূপদানিতে কাঠিগুলি গুঁজে দিয়ে কুলঙ্গীতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সারলেন মনসুখলাল রামানি। তারপর ম্যানেজারবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, দোপিজি এদিকটায় একটু খেয়াল রাখবেন। আমি বেরুচ্ছি।

মনসুখলাল চক পেরিয়ে রামরিক মেহেতোর গদির দিকে এগুলেন।

গোমতীপুর শহরের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। ডাল, গম, বজরা, ছোলা-কলাই থেকে শুরু করে রসুই বনস্পতি তেল মায় কৃষি কাজে ব্যবহৃত সার—সব পণ্যের আড়ৎদারদের গদি এখানেই। সপ্তাহে দুদিন—মঙ্গল আর শনি, —প্রচন্ড ব্যস্ততায় কাটে গোমতীপুরের চক। এই দুদিন কেবল শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকা থেকেই নয়, দূর দূর জেলা থেকেও পাইকাররা আসে মাল কেনার জন্য। লরি, ম্যাটাডোর, টেম্পো থেকে শুরু করে ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, ভ্যান রিকশার সমাবেশে এই দুটো দিন শহরের পশ্চিমাংশের এই খন্ডে গোমতীপুর অভিমুখী সব রাস্তাই যানজটে একরকম অচল হয়ে পড়ে। এভাবেই চলে সারা দিন। সূর্য পশ্চিমেব দিকচক্র ছোঁযার পর গোমতীপুর হালকা হয়। পাইকাররা পণ্য নিয়ে ফিরে যায়। কুলি-কামিন, মুটে-মজুরের দলও রোজ বুঝে

নিয়ে ঘরমুখো হয়। তখন গদিতে গদিতে মালিক, ম্যানেজার, কর্মীরা একটু হাঁফ ছাড়ার সময় পায়।

আজ মঙ্গলবার। সকাল থেকে মনসুখলাল মুখে জলটুকু দেওয়ার সময় পায়নি। এখন বেলা মরে এসেছে। তাই অবসর পেয়েছেন একটু হাত পা ছাড়ানোর।

ফাল্গুন ফুরিয়ে এল বলে। এ সময় এদিকে আরবসাগর ডিঙিয়ে এক ধরনের মনখারাপ করা বাতাস বয়। লোককথা আছে এই বাতাসে ভর দিয়ে একদিন দ্বারকাধাম থেকে কৃষ্ণ কানহাইয়া বৃন্দাবনধামে তার বাঁশির সুর পৌছিয়ে দিতেন। তবু মনসুখলালের মন সিক্ত হল না। চক পেরিয়ে গেলেন নিজের মনে।

রামরিক লস্যির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে পানের খিলিটা মুখে দিয়েছেন সবে, এমন সময় মনসুখলালকে দেখে আপ্যায়নের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। —রাম রাম জি। আসুন আসুন। আপনার জন্যই তো অপেক্ষায় ছিলাম।

—ঠান্ডা না গরম, কোনটা চলবে আপনার। রামরিক জিজ্ঞেস করলেন।

—ঠান্ডা ভাইয়া, ঠান্ডা দেও। সকাল থেকে পেটে বড় বেশি হাওয়া খিলছে। মনসুখলাল জবাব দিয়ে বাইরের দিকে একবার চোখ বোলালেন। তারপর নজর ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, -- রামরিক ভাইয়া, একবার ওদিকটা দেখুন।

গোমতীপুরের পূবপ্রান্তে ছোটাচকের দিকে রামরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন মনসুখলাল। নতুন করে আর কি দেখবেন রামরিক। দেখছেন তো আজ বেশ কিছুদিন ধরেই। আগে গোমতীপুরের আড়তদারদের মধ্যে একতা ছিল প্রশ্নাতীত। কেউ কোনদিন পৃথক রাস্তায় হাঁটার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। আজ কিছুদিন ধরে গোমতীপুরের আড়ৎদারদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টানা হয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় কিছু আড়ৎদার হঠাৎ ঘোষণা করে দিল তার আড়ৎদার মহাসঙ্ঘের ছড়ি ঘোরানো আর মানবে না। সঙ্ঘের বেঁধে দেওয়া বিক্রয় মূল্য অনুসারে পণ্য বিক্রয় করবে না। তারা ছোট ব্যাপারি। অল্প পুঁজি তাদের। সঙ্ঘের অহেতুক বর্ধিত বিক্রয মূল্যে মাল বিক্রি করতে গিয়ে তারা দেখছে কোন পাইকারই তাদের আড়ৎ থেকে মাল তুলছে না। সবাই গিয়ে ভিড় করছে বড় বড় আড়ৎদারদের গদিতে। এমন অসম প্রতিযোগিতায তারা পেরে উঠছে না। ভুখা মরতে বসেছে। তাই তারা কারোর ফতোয়া নয়, নিজেদের লাভলোকসান বিচার করেই পণ্যের বিক্রয় মূল্য ধার্য করবে।

এদের নেতৃত্ব দিল ছোটাচকের ইসমাইল আর আনোয়ার। তাদের আশ্বাস পেযে ছোটা চকের আরো দু-চারজন ব্যাপারি এসে জড়ো হয়েছে এক ছাতার নিচে। সঙ্ঘের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে নিজেদের সামর্থ মতো কমদামে পণ্য ছাড়া শুরু করল। ফল ফলতে সময় লাগল না। পাইকাররা এসে ভিড় করল ছোটাচকের ব্যাপারিদের গদিতে। এখন মনসুখলাল কিংবা রামরিকের পরিচিত পাইকাররাও তাদের এড়িয়ে চলছে। সেদিন নিয়ামতগঞ্জের পাইকার শশীকান্ত রামরিকের মুখের ওপর শুনিয়ে দিল, —আমরা নগদে মাল কিনি শেঠজি। যেখানে ভাও কম পাব, সেখানেই কিনব। এখানে ধরমকরমের বিচার আসছে কেমন করে? রামজি এসে তো আমার পরিবারের ডালরুটির ব্যবস্থা করে দেবেন না। শুনতে শুনতে রামরিকের রক্তচাপ বেড়ে গেছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেছিলেন রামরিক। —শালা হারামখোর সব। শেষ পর্যন্ত জাত-ধর্ম খুইয়ে বিধর্মীদের পানি খাচ্ছিস। আচ্ছা, এবার মওকা আসতে দে। তখন হিসাব চুকিয়ে দেব।

যখন সমস্ত গোমতীপুরের চত্বর খালি হয়ে গেছে, পাইকারদের অস্তিত্ব নেই, বেলাও মরে এসেছে, আরও একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, সান্নাটা ছেয়ে গেছে,—তখনও ছোটাচকের ব্যস্ততা কমেনি। এখনও ওদিকে পাইকারদের ভিড় লেগে আছে। লরি, ম্যাটাডোর, টেম্পোর আনাগোনা লেগে আছে। ধূলোয় ভারী হযে আছে ওদিক কার আকাশ।

—আর দেখে কি করব মনসুখলালজি, এখন তো ওদেরই রাজ। আমাদের এবার ভুখা মরতে হবে। রামরিক ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন,—আনোযার, ছিল তো দু'পয়সার মুদিওয়ালা। এখন ছোটাচকের সম্রাট। একই মহল্লায় থাকি তো। তাই দেখছি বেইমানটার বাড়বাড়ন্ত। তিনতলা মকান বানিয়েছে। দুটো গাড়ি। তার মধ্যে একটা আবার ইমপোর্টেড। আর আমাদের তিন পুরুষের গদি। দিনদিন অবস্থা পড়ে যাচ্ছে। এসব দেখলে কার না মাথায আগুন জ্বলে বলুন।

—আলবৎ জ্বলে। আমার কেবল মাথায কেন, সাবা শরীর জ্বলছে। ওদের এমন উন্নতি দেখে আর স্থির থাকতে পারছি না। আমাদের বিজনেস হাফ হয়ে গেছে। আর ওদের বেড়েই চলেছে। এখুনি যদি কোন ব্যবস্থা না নেই, তাহলে এই বলে রাখলাম রামরিক ভাইয়া, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যর সব কন্ট্রোল ওদের হাতেই চলে যাবে। আমরা নিজের দেশেই পরদেশী হযে যাব।

—স্বামীজি কি বলছেন। নিচু গলায জিজ্ঞেস করলেন রামরিক।

—বলছেন আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরতে। একটা মওকা আসতে দিন। তারপরেই ছোটাচকের সাফাই-এর কাজ শুরু হবে।

—মওকা, মওকা আব মওকা। রামরিক অসহিষ্ণু গলায গর্জে উঠলেন। —কতদিন হয়ে গেল রাজ্যে বাজ করছে আমাদের দল। সামনে ইলেকশন, ইলেকশনে কুর্সি উল্টে গেলেই কি মওকা আসবে। আরে ভাই মওকার জন্য বসে থাকতে থাকতে আমরাই যে সাফা হযে যেতে বসেছি।

হক কথা। এরপব আর আলোচনার অবকাশ নেই। অনেক [illegible] করেছেন তারা। এতদিন বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এসেছেন তারা। পণ্যের দাম এবং মান তাদের ইচ্ছে মত নির্ধারিত হয়ে এসেছে। মুনাফার টাকাটা এতদিন কেবল তাদের ঘরেই মজুত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাহীন বাজারের প্রশ্নাতীত সম্রাট ছিলেন তারাই। সেই সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করবে কি না কয়েকজন সংখ্যালঘু আব নিচাবর্গের কযেকজন উঠতি ব্যাপারি! না, না। এ আর সহ্য হয় না। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, —সঙ্ঘকে তারা সময়সীমা বেঁধে দেবেন। এর মধ্যে ছোটাচকের ব্যাপারিদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। সঙ্ঘ না পারলে সাফা করার কাজটা তাদেরই করতে হবে।

তিন

এক অভাবিতভাবে মওকা এসে গেল। একে সীমান্তবর্তী রাজ্য। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের শাসকদের ক্ষমতার কুর্সি সামলাতে হয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্ধ শত্রুতা লালন করে। ভুখা পেটে যুদ্ধের মাদক খাইয়ে ওদেশের রাষ্ট্র নায়করা দেশবাসীকে নিযন্ত্রণে রাখে। যুদ্ধের উত্তেজনাকে স্থাযিত্ব দেওযার জন্য প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরন্তর ছায়াযুদ্ধ চালিযে যেতে হয। ফলে সীমান্ত পেরিযে ছায়াযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ লেগেই আছে এই রাজ্যে। ছায়া যোদ্ধাদের তৎপরতায এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরণ, গণহত্যা অগ্নিসংযোগ নিত্যদিনের ঘটনায় দাঁড়িযে গেছে।

এইরকম এক প্রেক্ষিতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। রাজ্যের ভেতর কোন এক রেল স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিযে গোটা দুই কামরায় অগ্নিসংযোগ ঘটানো হল। ওই দুই কামরার যাত্রীরা জীবন্ত দগ্ধ হল। এরা সবাই ছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদাযের। গরিবগুর্বো মানুষ সব। এরা ফিরছিল সুদূর অযোধ্যা থেকে মন্দির নির্মাণের কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দিযে।

ক্ষেত্র তো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। কে বা কারা ট্রেনের দুটি কামরা বাইরে থেকে বন্ধ করে অগ্নি সংযোগ করে অসহায যাত্রীদের পুড়িযে মারার মত পৈশাচিক কাজ করল. এই নরমেধ যজ্ঞে বহিশত্রুদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভূমিকা আছে কি না, —নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে একান্ত জরুরি প্রশ্নগুলির উত্তব খোঁজার জন্য অনিবার্যভাবেই ন্যূনতম যেটুকু সময এবং মানসিক সুস্থিরতার প্রয়োজন পড়ে, সেই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করল না কেউ। আগে থেকেই তো পরিকল্পনার মানচিত্রে শেষ তুলিব আঁচড টানা হয়ে গেছিল। অপেক্ষা ছিল উপযুক্ত মওকার। তদন্তের নামে কালক্ষেপ করলে যে পরিকল্পনা বাস্তবাযিত হয না। ফলে প্রশাসন থেকে রাজ্যের শাসকদল সবাই নেমে পড়ল নরসংহারে।

আগুন ছড়াল রাজ্যের শহর থেকে শহরে। গ্রাম থেকে গ্রামে। গোমতীপুরের ছোটাচক-এর সাফাই-এর কাজ দক্ষতার সঙ্গেই সুসম্পন্ন হল। যোগেশ্বরীর ডিহিচকের বস্তিও জ্বলে উঠল। অগ্নি সংযোগের পরে বস্তিবাসীরা পাছে পালিযে যায়, আশ্রয় নেয কোন নিরাপদ স্থানে, তাই মুরলিমোহনের দলের ছেলেরা ডিহিচকের বস্তি থেকে নিস্ক্রমণের সব রাস্তা বন্ধ করে দিযেছিল। দিনভর অমানুষিক পরিশ্রমের পর রাতের ডালরুটি পেটে দিয়ে বস্তিবাসীরা তখন ঘুমের অতলে তলিযে গেছে। ঝোপড়পট্টির আগুনের শিখাগুলি লাফিযে উঠে ফাল্গুনের শিশির ভেজা আকাশ ছুঁযে দিল।

যজ্ঞ সুসম্পাদিত হওয়ার পরে পুরোহিত যেমন স্বয়ং নিছক আত্মপ্রসাদ লাভের মোহে যজ্ঞস্থলে একবার পরিভ্রমণে আসেন, ঠিক সেই জাতীয় কোন সুখলাভের আকর্ষণে পরদিন ভোর সকালে মুরলিমোহন ধনীরাম এবং হরিপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে ডিহিচকের নরমেধ যজ্ঞস্থলে পরিভ্রমণে এলেন। তৃপ্ত মনে দেখলেন পরিকল্পনা মতই ভস্মরাশিতে পরিণত হয়েছে ঝোপড়পট্টিগুলি। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে বাঁশ-বাখারি, টালি-টিনের দগ্ধাংশের স্তূপ। কোন কোন জাযগায ভস্মস্তূপ থেকে এখনো নীল ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিযে আকাশে উঠে যাচ্ছে।

বস্তির জমিটার চার সীমানা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খালি চোখেই পরিমাপ করা যাচ্ছে জমির দৈর্ঘ, প্রস্থ, পরিমাপ। চোখের ডিম ঘুরিয়ে জমির পরিমাপ করতে করতে ধনীরাম এবং হরিপ্রসাদের মুখ যখন লালায় ভরে উঠছিল, ঠিক তখনই মুরলিমোহন ভয়তাড়িত কন্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, দেখুন ধনীরাম, ওদিকে একবার নজর দিন হরিপ্রসাদ।

দেখলেন ধনীরাম, দেখলেন হরিপ্রসাদ। ভস্মস্তূপের বাইরে, এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য নারী, পুরুষ, শিশু, বৃন্ধ, বৃন্ধাদের দগ্ধ লাশ। তবে একটি লাশও বিচ্ছিন্ন নয়। এক নারী জড়িয়ে ধরেছে আর এক নারীকে। এক পুরুষ দুহাতে আলিঙ্গানবন্ধ করেছে আর এক পুরুষকে। এক বৃন্ধ দুর্বল হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেছে আর এক বৃন্ধের হাত। আগুনে দগ্ধ হলেও শবদেহগুলি এতখানি দগ্ধ হয়নি যে দেখে বোঝা যাবে না কোন দেহটা এক মুসলিম মজুরের। কোন দেহটা বাগরি কিংবা কোরি সম্প্রদায়ের। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

এমন অভাবনীয় সহমরণের দৃশ্য দেখতে দেখতে অসময়ের এক শীতবোধ মুরলিমোহনের শরীর কেঁপে উঠল। ধনীরাম এবং হরিপ্রসাদের তলপেটে খিমচে ধরল এক আতঙ্ক। আলিঙ্গানাবন্ধ মুটে-মজুরদের শবদেহগুলি যেন খুব স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করছে, আজ মরলাম ঠিকই। তবে একদিন ঠিক বাঁচব। এভাবেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তোমাদের সব হিসাব উল্টে দেব।

আর পারলেন না মুরলিমোহন। এই দৃশ্যের মধ্যে যে মারাত্মক সঙ্কেত ধ্বনিত হচ্ছে, তা যে কোন পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই বিস্ফোরক সমগ্র উপমহাদেশকেই নাড়িয়ে দিতে পারে।

তাই মুরলিমোহন চিৎকার করে উঠলেন, – কৈ হ্যায়! হটাও, লাশ হটাও।□

জেবনভর খুঁজে যাই

বি দি শা ঘো ষ দ স্তি দা র

সাড়ে-চারটের বাসটা ধুলো উড়িয়ে শিবতলার মোড়ে দাঁড়াতেই, বিড়িটায় কষে টান লাগায় সুজন। বাস থেকে পিল্‌পিল করে মানুষ নামছে, তাদের হাতে লাউ, বেগুন, কুমড়ো থেকে শুরু করে পা বাঁধা, মাথা ঝোলানো মুরগী আর কচি নধর ছাগলছানা, কিছুই বাদ নেই। সুজন দুঃখী দুঃখী মুখ ক'রে ওদের দেখে, 'দুঃ শালো! একটিও পেসেন্‌জার লাই'। এই সব লোকগুলোর হাঁটু অবধি লাল ধুলোর আস্তরণ, পায়ের ফাটা গোড়ালি দেখলেই বোঝা যায়, দশবিশ ক্রোশ হাঁটা এদের কাছে কোনোই ব্যাপার না।

সুজন সন্ধানী চোখে ভীড়টা জরিপ করে, একমাত্র হাসপাতালে যাবার মত রোগী কেউ থাকলে, তবেই ওর রিক্‌শাটা ভাড়া হবে, এই গ্রাম দেশে কেইই বা আর ঝুটমুট পয়সা খরচ করে রিক্‌শা চড়ে?

বাস থেকে ধীর পায়ে এক দম্পতি নামে, দেখলেই বোঝা যায় না-খেতে পাওয়া ঘর থেকে এসেছে। বৌটি কালোকোলো, শীর্ণ, চোখে মুখে ভয় আর অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট, বরটির রোগাভোগা শরীরে বেমানান তার বাম পা-টি, কেননা ঐ অঙ্গটি তার ভীষণ ফোলা, রসে টস্‌টস্‌ করছে, উবুর কাছটায় দগ্‌দগে ক্ষত, তা থেকে পুঁজ গড়াচ্ছে। একটু আগে খাওয়া ভাত ডালের সবটাই সুজনের গলা বেয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। পরম বিতৃষ্ণায় ও মাটিতে থুথু ফেলে, তার পেডালে চাপ দিয়ে রিক্‌শার মুখ বড় রাস্তার দিক্‌ থেকে ঘুরিয়ে নেয়।

'হঁ ভাই, শুনো কেনে, আঁসপিতেল'ট কুন দিক্যে গ—।' সুজন ঘাড় ঘোরায়, সেই দম্পতি, বরটি কথা কইছে, তার পরিবারের খসে যাওয়া ঘোম্‌টা এতক্ষণে যথাস্থানে, রুলি পরা শীর্ণ দুটি হাত, অপটু স্বামীর একটি হাত শক্ত করে আঁকড়ে রয়েছে। সুজনের বিরক্তি আর চাপা থাকে না—'দেড় কোশ পথ আঁইজ্ঞা, দুট্যি ট্যাকা দিব্যেন তো লিয়ে যেত্যে পারি'—

—হঁ! দু টাকা?

—হঁ হঁ, উয়ার ক'মে হব্যেক লাই—। বৌটি ফিসফিসিয়ে স্বামীর কানে কানে কিছু বলে, স্বামীটি বেজার মুখে অতিকষ্টে পা টেনে টেনে রিক্‌শায় ওঠে। লোকটির ক্ষত থেকে গা গোলানো গন্ধ ছড়ায়, সুজন নাক মুখ কুঁচকে, প্রাণপণ শক্তিতে পেডাল চালাতে শুরু করে।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যে বেলায় দু একঢোঁক 'লেশ্যা' করা সুজনের অনেক দিনের অভ্যাস। গগনদার দিশি মদের দোকানে আজ ভীড় উপচে পড়ছে। সামনের দুদিন বড় বাঁধের ধারে মেলা বসবে, তাই এদিক-ওদিক থেকে ধান্দা করতে আসা লোকেরা এখন থেকেই আড্ডা গেড়েছে। সুজনের চোখে পড়ে কয়েকটি আদিবাসী কামিন, গগনদার গা ঘেঁসে বসে নেশা করছে। সুজনকে দেখতে পেয়ে গগনদা হাঁক পাড়ে, 'অ্যাই! সন্ঝেবেলা লেশ্যাটি চাই, লয়? তুর পাঁচ টাকা চাইরআনা ধার রয্যাঁছে, সিঁট ভুলিস নাই' —

গগনদার বাজখাঁই আওয়াজে কেউ কেউ মাথা তুলে তাকায, সুজন একটু ফেকাশে হাসে, তারপর ভীড়ের মাঝে জায়গা করে নেয়। কোণের দিকে এক আধা-মাতাল গান ধরেছে—

'খাটি মদ খেঁয়্যে আমার
লেশ্যা হ'ল না
তুকে দেখ্যে ধইরল্যে ল্যেশা
তেঁতুলে তা কাট্যে না
লেশ্যা—আ—আ হল্য না—'

এই 'তেঁতুলে তা কাট্যে না' পদটি সুজনের ক্রমশ উত্তপ্ত হযে ওঠা মস্তিষ্কে সেঁধিযে যায, ও বারংবার এটি আবৃত্তি করতে থাকে।

সন্ধে গড়িযে রাত হয. গগনের দোকানে ভীডও ক্রমশই পাতলা হতে থাকে, সুজন একসময় উঠে পড়ে, ওর তেমন নেশা হয নি, শুধু পা একটু টলছে মাত্র, এখান থেকে ওকে যেতে হবে সেই ইষ্টিশানে, কেননা রিক্শা জমা রাখার শেডটি ওইখানেই। সুজন ট্যাঁকে হাত দেয, সাত টাকা সত্তর পযসা, এর থেকে দু-টাকা দিতে হবে রশীদ আলীকে রিকশার ভাড়া বাবদ। তা হলে বাকি থাকে পাঁচ টাকা সত্তর, তা দিযে তারপর চার আনার বিড়ি, একটা মাচিস্, এক টাকার কেরাসতেল আর ...আর কী ও মনে করতে পারে না। কামিনী আবার মুখঝামটা দেবে। দূর হোক গে যাক, হাফ্ কিলো মুড়িই না হয় কিনে নেওযা যাবে। সুজন রিক্শার তলায ছোট্ট লন্ঠনটা জ্বালায়। অল্প আলোর চারপাশে অন্ধকারকে আরো নিকষ দেখায়।

স্টেশন রোডের গা ঘেঁষে রশীদ আলীর শেড্। রিক্শা রয়েছে সাকুল্যে পাঁচটি, সুজন দেখে, অন্য চারটে গাড়িই এতক্ষণে শেডের তলায় ঠাঁই নিয়েছে। কালীপদ, জনাব, ভক্ত্যা আর শিবে, বিজলী বাতির থামের তলায় দাঁড়িযে বিড়ি ফুঁকছে। সুজন সাবধান হয়ে টাকাগুলো একবার দেখে নেয়। আগের দিন, ওরা হই হই করে ভক্ত্যার ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করে, তাই দিয়ে মুড়ি পেঁযাজী খেয়েছে, কে জানে আজ হয়ত ওর পালা। সুজন রিক্শার সিট তুলে একটা ময়লা থলি বার ক'রে, পয়সাগুলো তার মধ্যে পুরে নেয়।

কালীপদ সুজনকে দেখে হাসে, সুজন, ওর হাসির পেছনে একটা মতলব রয়েছে টের পায়। অবশিষ্ট দুটি বিড়ির একটিকে কানের পাশে গুঁজে, সুজন ওদের দিকে এগোয়। কালীপদ নিজের বিড়িটি থেকে সুজনকে আগুন দেয়, তারপর বলে—'হাঁ শুন্, মেলাকে দুকান দুব, তু কামিনীকে বল কেনে, খাঁদু, দুগ্গা, ইয়াদের সঙ্ ফুরলী,

বেগিনী ভাইজবেক, খুম্ লাভ হব্যেক, কেমন, লয়?'

সুজন এই আকস্মিক প্রস্তাবে অবাক হয়। তারপর মাথা নাড়ে, 'ধুঃ, শালো, পাগল হয়্যাছিস? তুর আমার পরিবার যাব্যেক মেলাকে? খেপা বঠে!'

কালি, ভক্ত্যা রে রে করে ওঠে, 'কেনে, কেনে, যাব্যেক নাই কেনে, দুটঁ, চারট পয়স্যা হব্যেক, তুর সইহ্য হচ্ছে নাই, বটে?'

সুজন জনাবের দিকে তাকায়, ওদের পাঁচজনের যতই ভাব থাক, জনাবের বিবি রোশেনারাকে কামিনী, দুগ্‌গা কিংবা খাঁদুবালা দলে নেবে না, কেননা ওরা 'মুছনমান।' সুজনের অস্বস্তি হয়, কালীপদ, ভক্ত্যা অথবা শিবে, এই ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করছে না। সুজন অগত্যা বলেই ফেলে—'তুরা সব মহা সাথ্‌থোপ্‌পর হয্যেঁ যেইছিস্, জনাব কি মেলাকে যেতো পাইরবেক্? হ্, এঠি বিচার কর্ কেনে।'

কালিপদ, ভক্ত্যা চুপ্ করে যায়, শিবে মিন মিন করে বলে—'হঁ, উয়াকে অন্য দুকান দিতে বল্ কেনে'—

সুজন ধমক দেয়—'চুপ যা, খোপরাকে সব ক্যারা সিঁধুইছে, বঠে? দুকান দিব্যেক, দুকানদারের বেটা দুকানদার সব'—

কালীপদ নিঃশব্দে বিড়ি টানে, জনাব ছিক্ করে থুথু ফেলে, আর হঠাৎ সবাই চুপচাপ হয়ে যায়।

সুজনই আবার কথা বলে—'ঘর যা, যা ঘর সব! খেঁয্যে দেযেঁ ঘুমা গা—।'

সকলে আড়মোড়া ভাঙে, কালীপদ হঠাৎ হেঁড়ে গলায গান ধরে—

'শালবনীতে কাঠ কেট্যে
লিয়ে যাব বেলপাহাড়ী—ই-ই—
মেলার থিক্যে কিনে দুব
লালফিঁত্যে আর রেশমী চুড়ী।'

সবাই হেসে ওঠে,—এতক্ষণে জমে ওঠা অস্বস্তির মেঘ কেটে যায়। সুজন টের পায় নেশা কেটে মাথার শিরা দপ্‌দপাচ্ছে। ও ভক্ত্যার কাঁধে হাত দেয়, তারপর ক্লান্ত গলায় বলে—'চ বাপ, ঘরকে চ'—। ছোট্ট স্টেশনটা কাঁপিয়ে ঝম্‌ঝম্ শব্দে একটি দূরপাল্লার ট্রেন চলে যায়। জনাব, কালী, সুজন, ভক্ত্যা আর শিবু ঘরের পথে পা বাড়ায়।

* * *

ইষ্টিশানে প্যাসেঞ্জার নামিযে একটি বিড়ি ধরাতেই সুজন দেখল, টুকটুকি দিদিমনি আসছেন। তাড়াতাড়ি বিড়িটা নিবিয়ে কানের পাশে গুঁজে রাখল সুজন, রিক্‌শা থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসেন আঁইজ্ঞা, হাঁসপিতেল যাবেন, লয়?' টুকটুকি দিদিমনি হাসলেন—'কেন? আমাদের কি মেলায যেতে নেই, সুজন?' —সুজন কেবল হাসে, ওর মুখে কথা যোগায় না। টুকটুকি দিদিমনি হাসপাতালের মেট্রন। এখানকার গরীব গুরবো মানুষের উপর অনেক ভালোবাসা তাঁর। তাই ওরাও দিদিমনিকে মান্যি করে খুব।

দিদিমনিকে হাসপাতালের গেটে ছেড়ে দিয়ে, একটু গামছার বাতাস খায় সুজন। হাসপাতালটা একটু উঁচু জমির ওপরে, এই চড়াইটা ভাঙ্গাতে বেশ দম লাগে।

হাসপাতালের দারোয়ান রাখোহরির ঘর থেকে চায়ের সুবাস আসছে। সুজন একটু চঞ্চল হয়, রাখোহরির সাথে ওর বেশ দোস্তি আছে, এ সময়ে একটু চা হ'লে মন্দ হ'ত না।

রাখোহরির এক কামরায় কোয়ার্টারের একফালি বারান্দার অর্ধেক বেড়ায় ঘিরে, ওর বউ সনকা রান্নাবাড়া করে, বাকি অর্ধেক খোলা বারান্দায় চাটাই পেতে রাখোহরি সুজনকে বসতে দেয়। এনামেলের মগে চা এগিয়ে দিয়ে, গলা নামিয়ে বলে, 'হঁ, কন্বো কী যে ভাল্‌তে হব্যেক গো বন্ধু, এই জেবনে'....সুজন ওর গলার স্বরে গোপন এবং রসালো গল্পের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পায়, চায়ের মগ মাটিতে নামিয়ে রেখে বলে—'কেনে, হল্যাটা কী বেঠে ?'

—'হঁ, শুনো কেনে ভাই, মোছনমানের ছেল্যা, হিঁদু ঘরের মেয়্যাটিক্ তুল্যে লিই, ভেগ্যে গেল্য, —নাকি ভালোবাসা হয়্যাছিল, হেঃ—'

—'হঁ! তা বাদে ?'

—'তা বাদে, ফির, মেয়্যাটির বাপ, খুড়ায় মিল্যে, ছেল্যাটিক্ বেদম মের্যাছে টাঙ্গি বসায়ে দিয়্যাছে, এই দাপ্‌নার কাছকে—'

—'হঁ, এমোন বিত্তান্ত! তা বাদে ?—'

—'তা বাদে, ফির মেয়্যাটি বেঁকে বস্যেছে, সোযামিক্ ছাড়্যে যাব্য নাই বুল্যে,—'

[illegible] বাদে ?'

—'বাপ খুড়া ছাইড়লেও, যমে ছাড়্যে নাই গ বন্‌ধু, কাল বৈকালবেলা হেথাক্ ভরতি কর্যাছে, আজ সকাল না হত্যে, হঁ, ভালো কেনে, কাঁট্যা দাঁড়াইছে গ' শরীলে, অমন সোন্দর ছেল্যাটির পা খানি বাদ হয়্যাঁ গেল—'

—'হঁ! বাদ হয়্যাঁ গেল।'

—'হঁ, গ, হঁ, কি বুইলছি, উয়ার পরিবারের কান্দনটো দেইখলে চ'খে আর জল ধইরবে নাই গ, অ, হ, হ—'

বেড়ার আড়াল থেকে সনকা মুখ ঝামটা দেয়—'অ, হ, হ, দুখ যে লদীর পাবা ফুল্যে উঠ্যেছে গ, বানধ দাও কেনে, উখান্‌কী উয়ার পরিবার বেঠে, হিঁদুর মেয়্যা, মোছনমানের সাথ পিরিতি। ভালোবাসা! মার ঝ্যাটা, কলিকালের ঢঙ্ বেঠে'—

সুজন বেশি কথা বাড়ায় না। চট্‌পট্ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। আগের দিন বাসস্ট্যাণ্ডে দেখা রুগ্ন ছেলেটির মুখ, মনে করতে চেষ্টা করে সুজন, বধূটির শীর্ণ মুখে সিঁদুরের টিপ্ ছিলো, আর ছিলো উদ্বেগ ভরা এক্‌জোড়া চোখ। বিশ্রী দূষিত ঘা দেখে ঘেন্না পেয়েছে, এই লজ্জা ওকে কুরে কুরে খায়!

মোড়ের মাথায় আসতে না আসতেই প্যাসেন্‌জার পেয়ে যায় সুজন। এরা সব মেলার যাত্রী। মেলাতলায় আলো জ্বলছে সারি সারি। ভেঁপু আর অনেক মাইকের চিৎকারে কান পাতা দায়। সুজন খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমারোহ দেখে, আজ অনেক রোজগার হয়েছে, প্রায় চৌদ্দ টাকার মত, তাই এখন একটু বিশ্রাম নিলেও চলে।

একটা রিন্‌রিনে মৃদু স্বর কানে আসে সুজনের। শব্দের উৎসটি ঘিরে কিছু মানুষের জটলা, অস্পষ্ট আলো আর বিড়ির ধোঁয়ায় স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন। সুজন এগিয়ে মানুষের

বৃত্তের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, হয়তো বা বিস্মিত হবার শক্তিও যায় হারিয়ে।

সেই ঘোম্‌টাখসা শীর্ণ মেয়েটি গান ধরেছে, দুই চক্ষু মুদ্রিত, শরীরে অল্প দোলা গানের তালে তালে, ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে সুরসম্পৃক্ত শব্দমালা—

'বাসরে কাট্যেছে সর্প
পতি প্রাণ ছাড়ে
কেমনে ছাড়্যিবো প্রাণ-
পতি লখীন্দরে'—

হয়তো বা অধিক রোদনে কন্ঠস্বর ঈষৎ ভগ্ন, কিন্তু গানের ভাব, শ্রোতাদের মনের তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে বোঝা যায়, কেননা তারা নির্বাক, হয়তো আপ্লুত।

সুজন লক্ষ্য করে মেয়েটির সামনে পেতে রাখা তেলচিটে একটি গামছায়, খুচরো পয়সা জমে উঠেছে, অর্থাৎ গান চলছে অনেকক্ষণ।

সুজন একটু অপেক্ষা করে। গান শেষ হবার পরও, ভীড়টি একটু থম্‌কে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে পাতলা হয়।

মাইকে বিদ্যুৎকুমারীর অলৌকিক ক্ষমতা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। মেয়েটি পয়সাগুলো কুড়িয়ে গামছায় বাঁধে, গোনে না। হয়ত গোনবার ক্ষমতা এবং শক্তি কোনোটাই ওর নেই। সুজন পায়ে পায়ে ও'র দিকে এগোয়, গলায় কাশির শব্দ ক'রে।

মেয়েটি চমকে ওর দিকে তাকায়, দৃষ্টিতে আতঙ্ক, অবিশ্বাস। সুজন ফেকাশে হাসে। তারপর ধরা গলায় বলে—'মা'—

মেয়েটি অধিক আতঙ্কিত হয়, সুজন বোঝে, এভাবে কিছু বলাটা ঠিক নয়। কিন্তু ওর উপস্থিত বুদ্ধি কাজ করে না, কোনরকমে বলে, 'চিইনত্যে লারছ্য মা, আমি রিস্‌কা চালাই গ, কাল তুমরা আল্যে ন' আমার রিস্‌কা কে'—

মেয়েটির দৃষ্টি একটু স্বচ্ছ হয়, তথাপি ভীতি দূর হয় না। সুজন আবার বলে—'আমি সব শুন্যেছি গ' মা, মনিষ্যির দুখদরদ মনিষ্যিই বঝে, কী বল ? তা এই রাত বিরেতে বেঘোরে কুথায় কুথায় ঘুইরবে গ', চল কেনে, আমার ঘরকে চল্য।'

মেয়েটি ওর তেলচিটে পয়সার পুঁটুলিটি বুকে চেপে, মাথায় বড় করে ঘোমটা দেয়, এবং চলবার উপক্রম করে। সুজন আবার ওর পথ আটকায়, 'মা সেতলার কিড়া গাইলছি গ মা, আমার কুনো বদ মতলোব লাই'—তারপর একটু চিন্তা করে বলে—'আমি সুজন বেঠে, টুকটুক দিদিমণিকে শুধাও কেনে, আমি মন্দ লোক লই গ'—

টুকটুকি দিদিমণির নাম শুনে মেয়েটি মুখ তোলে। সুজন আবার বলে—'আমার ঘরকে মেয়্যাছেল্যা রয়্যাছে গ, হ্যাঁ ভালো কেনে, মাথার উপ্পর চুলগুলি সব সাদা হঁই গিয়াছে, —তুমার কুনও ডর লাই গ মা লোক্‌খি'—

মেয়েটি থমকে দাঁড়ায়। হয়তো সুজনের গলার স্বরে সন্দেহের খানিকটা দূর হয় ওর।

মেয়েটি অনেক দ্বিধা নিয়ে সুজনের রিকশায় ওঠে। আর তক্ষুনি সুজনের মনে

হয়, এই রকম একটি মেয়েকে হঠাৎ ঘরে তুললে কামিনী তাকে আর আস্ত রাখবে না। একটু ভয় ভয় করে সুজনের, আবেগের বশে এই বিপদ ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছে, তাই নিজেই নিজেকে গাল দেয়।

পেডালে চাপ দিতে দিতে সুজনের খুব রাগ হয়ে যায়—'হঃ, কামিনী, উ আমার পরিবার, না আমি উয়ার পরিবার বঠে? আমার ঘরকে আমি যাক্ খুশি লিয়্যে যাব'—

রাস্তার দুপাশে ধানক্ষেতে জোছনা লুটোপুটি খাচ্ছে, সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎই সুজনের মন ভালো হয়ে যায়। আজ বিকেল থেকে পুষে রাখা গ্লানি আর অপরাধবোধের বোঝাটা অনেক হাল্কা লাগে তার।

সামনের পড়ে থাকা সর্পিল চকচকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে খুশি মনে হঠাৎই সুজন গান ধরে—'ভবের হাটে পাগ্যল হয়্যে

ভালোবাসা খুঁজিলাম—
পিরিতির কাঁচে ভুল্যে—
কান্চন্কে ছাড়িল্যম—
ও পাগল মন রে—
ভালোবাসা কিনবি কি দিয়ে—
হীরা নহে মোতি নহে—
এ [illegible] ধন চাহে
ভালোবাসা অম্‌রিতো হে
জেবনভর খুঁজে যাই'—

চড়াই উৎরাই এর রাস্তার মাঝে মাঝেই ওর স্বরভঙ্গ হয। সেই ভগ্ন অথচ সুরেলা কন্ঠ হাওয়ায ভেসে জ্যোৎস্নাপ্লুত ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে অনেক দূর ছড়িযে পড়ে। দমকা বাতাস গাছের পাতায ঢেউ খেলিযে যায। □

দৈববাণী

সু নী ল গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

একটা শান্ত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পারিবারিক পরিবেশ তছনছ করে দিলো একটা টেলিফোন।

রাত সাড়ে নটা, সদ্য টি ভি প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে, এবার নৈশ ভোজের সময়। টি ভি থামবার পর মিনিট পাঁচেক অখণ্ড নিস্তব্ধতা। তারপর মিংকা নিজের পছন্দ মতন রেকর্ড বাজাতে শুরু করে স্টিরিওতে। টি ভি'র ইংরিজি খবরটা শোনার পর সুরজিৎ হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে চলে যায় বারান্দায়, এখন তার আকাশ দেখার সময়। সুমিত্রা চলে যায় বাথরুমে শরীর জুড়োতে, রান্নাঘরে আলু ভাজার শব্দ হয়।

এই সময় বেজে উঠলো টেলিফোন।

কে টেলিফোন ধরবে, তা ঠিক করার আগে চার পাঁচবার বাজে। সুরজিৎই আকাশের তারাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে বসবার ঘরে এসে রিসিভারটা তোলে। সে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যায়।

সুরজিৎ কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে আসে। বেনিফিট অব ডাউট দেওয়া যেতে পারে। লাইন পেলেও যেকোনো মুহূর্তে কানেকশন কেটে যাওয়া কলকাতা শহরে আশ্চর্য কিছু নয়। আবার এমনও হতে পারে, মিংকার কোনো ছেলে বন্ধু-টন্ধু...মিংকার বয়েস এখন সতেরো।

এক মিনিট পরেই আবার টেলিফোন বাজলো।

সুরজিৎকে কিছু বলতে হলো না, মিংকাই চেঁচিয়ে বললো আমি ধরছি, বাপি! এবারও বাজলো পাঁচবার। মিংকা রিসিভার তুলেই বিরক্তির সঙ্গে বলোল, যাঃ, লাইন কেটে গেল।

বাকি রইলো সুমিত্রা। সাঁইত্রিশ বছর বয়েস, এখনো অনেকেই সুমিত্রাকে মিংকার দিদি বলে ভুল করে। সুতরাং তারও বিশেষ টেলিফোন-বন্ধু থাকা সম্ভব। কিন্তু সুমিত্রা তো মিনিট পনেরোর আগে বেরুবে না বাথরুম থেকে।

মিনিট পাঁচেক বাদে তৃতীয়বার টেলিফোন ঝনঝন করেতই সুরজিৎ বাথরুমের দরজায় এসে টোকা দিয়ে বললো, এই!

ভেতরে ধারাজলের শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কিছুটা অলৌকিক সুরে সুমিত্রা বললো, কী?

—তোমার টেলিফোন!

—কে? কে ডাকছে?

—তোমার চার নম্বর প্রেমিক।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র দেরি করে সুমিত্রা বললো, ধরতে বলো!

কিন্তু তার আগেই মিংকা ধরেছে এবং আবার কেটে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুমিত্রা সুরজিৎকে বললো, প্রায়ই দুপুরবেলা একজন কেউ ফোন করে, আমি ধরলেই লাইন কেটে দেয়। মনে হয় কোনো মেয়ে তোমায় পাগলের মতন খোঁজে।

সুরজিৎ বললো, উইক ডেইজ-এ আমি দুপুরে বাড়িতে থাকবো, একথা যদি কোনো মেয়ে ভাবে, তা হলে সে পাগল তো বটেই।

টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। সুরজিৎ আর একটু হুইস্কি নেবে কিনা তাই নিয়ে দোনামনা করছিল, শেষ পর্যন্ত না-নেওয়াই ঠিক করলো।

খাওয়া শুরু করার পরই বাজলো আবার টেলিফোন। সুরজিৎ স্ত্রীকে বললো, তোমার টার্ন!

সুমিত্রা হেঁটে হাতেই উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলো। এবার একজন বললো উঃ, কতক্ষণ ধরে লাইনটা পাওয়ার চেষ্টা করছি, কিছুতেই পাওয়া যায় না, আপনি খবরটা শুনেছেন তো?

মহিলা কণ্ঠ। সুমিত্রা প্রথমে ঠিক চিনতে পারলো না। পেছন ফিরে স্বামীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সে আবার নরম গলায় বললো, না, কোনো খবর শুনিনি তো। কী হয়েছে? আপনি...

—আমি মিসেসে সেন বলছি? অমিতাভ'র মা।

সুমিত্রা এবার অত্যন্ত বেশী উৎসাহের সঙ্গে বললো, ও, মিসেস সেন, বলুন, কী খবর?

—মিসেস মৈত্র, এত রাতে আমি ফোন করলুম, আগে অনেকবার চেষ্টা করেছিলুম, মানে আমি ভাবলুম, আপনি যদি খবরটা না শুনে থাকেন।

—কী খবর?

—অভ্রের ঝড়!

—অভ্রের বর? কী বললেন?

—আপনাকে অরিজিৎ কিছু বলে নি?

বিল্টু অর্থাৎ অরিজিৎ আর কোকো অর্থাৎ অমিতাভ একই স্কুলের ক্লাস এইট-এ পড়ে। এদের দু'জনার মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে স্কুলের টিফিনের সময়, এক সঙ্গে ফিরেছেও কয়েকবার। এবং এর বাড়ি ও ওর বাড়িতে দু'বার দুটি নিমন্ত্রণও হয়েছিল। পরস্পরের কাছে এদের পরিচয় অরিজিতের মা আর অমিতাভ'র মা, কিন্তু এই পরিচয় অনেকটা ঝি ঝি শোনায় বলে এরা পরস্পরকে মিসেস সেন ও মিসেস মৈত্র বলে সম্বোধন করে। কেউ কারুর নাম জানে না, কিংবা জানলেও তা উচ্চারণযোগ্য ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এত রাতে টেলিফোন করবার মতন ঘনিষ্ঠতাও নয়।

—না, বিল্টু কিছু বলেনি। ও ঘুমোচ্ছে। আপনি কী খবর বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। অন্দরের ঘর? তার মানে কী.

—অভ্রের ঝড়! অভ্রের ঝড়! কাল ওদের 'এসে' আসবে...বাংলা পরীক্ষায়।

—অ্যাঁ? বাংলা পরীক্ষার এসে—

—হ্যাঁ।

—আপনি কী করে জানলেন? মানে, জানা গেল কী করে? কে বললো?

—আমাকে সন্ধেবেলাতেই ফোন করে বলেছিলেন মিসেস ঘোষাল। তখনই ভাবলুম আপনাকে জানিয়ে দিই। কিন্তু টেলিফোনে...। মিসেস ঘোষলকে বলেছেন অণিমাদি...আপনি অণিমাদিকে বোধহয় চেনেন না।

—হ্যাঁ চিনি। সিদ্ধার্থের মা তো?

—হ্যাঁ। সেই অণিমাদির বাড়িতে গগনানন্দ মহারাজ এসেছেন, জানেন তো? তিনি শুধু বড় সাধক নন, খুব জ্ঞানী, আগে রামযশপুর কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম একদিন...তিনি আজ অণিমাদিকে বলেছেন, খোকা কি অভ্রের ঝড় বিষয়ে কিছু জানে? একটু শিখিযে পড়িযে দাও, কাল পরীক্ষায় কাজে লাগবে।

—উনি বললেন এই কথা?

—হ্যাঁ। কালকেই যে বাংলা পরীক্ষা তাও উনি জানতেন না, এমনিই বললেন... আর অণিমাদি কি ভালো দেখুন, কথাটা শুনে উনি শুধু নিজের ছেলের জন্যই তো..তা নয়, উনি কিন্তু সবাইকে বলে দিচ্ছেন, এখনো তৈরি করে নেবার সময় আছে..

পাঁচ মিনিট বাদে ফোন রেখে সুমিত্রা যখন খাবার টেবিলে ফিরে এলো, তখন তার মুখ দেখে মনে হয়, সে সদ্য ভূত দেখেছে।

শৈবালের অনেকখানি খাওয়া হয়ে গেছে, সে মুখ তুলতেই সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলো, অভ্রের ঝড়! তার মানে কী? অন্ধ্রতে খুব ঝড় হচ্ছে বুঝি?

মেয়েদের পক্ষেই যখন তখন এরকম উদ্ভট কথা বলা সম্ভব, তা সুরজিৎ জানে, তাই সে অবাক হয় না।

সে বললো, নিউজে তো কিছু শুনিনি।

—নিউজে তো আজেবাজে কথাই বলে বেশী, আসল দরকারি খবর...কী কবে এখন জানা যায়!

—কিন্তু অভ্রের ঝড় হচ্ছে কিনা...হাউ ইজ ইট সো ইম্পার্টেন্ট টু যু?

—বিল্টুদের কাল বাংলা পরীক্ষায় রচনা আসবে...অভ্রের ঝড়।

—আজকাল মিশ্‌নারি ইস্কুলেও কোশ্চেন লীক হয়ে যাচ্ছে বুঝি?

—একজন বলেছে, ডেফিনিটলি আসবে।

—সেই একজনটা কে? কোনো জ্যোতিষী?

—তুমি নাম শোনো নি, কিন্তু গগনানন্দ মহারাজ খুব বিখ্যাত, ওঁর মুখের প্রত্যেকটা কথা ফলে যায়।

—সাধু? মাই গাড্! তোমরা আজকাল ছেলের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন জানবার জন্য সাধুদের কাছে যাচ্ছো? তাও ক্লাস এইটের পরীক্ষা!

—আমি যাই নি...মিসেস সেন খবরটা দিলেন...উনি কত ভালো, কষ্ট করে এত রাতে...

—গুরুদেরও এতখানি ডিজেনারেশন....

—শোনা, কোথা থেকে অন্ধ্রের ঝড় বিষয়ে জানা যায় বলো তো?

—ফরগেট ইট অ্যাজ আ ব্যাড জোক্!

—ইট্স ভেরি ইজি ফর ইউ টু ফরগেট এভরিথিং।

সুরজিতের ইচ্ছা হলো এক্ষুনি দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরতে। এরপরেই সুমিত্রা একে একে বলে যাবে অনেকগুলো অভিযোগ, সুরজিৎ বাড়ির কোনো খবর রাখে না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সব দায়িত্ব তো সুমিত্রাই এতদিন...এত চেষ্টা করেও একজন অঙ্কের টিচার পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি তো এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দাও...

প্রাণপণে অন্যমনস্ক থাকবার চেষ্টা করে সুরজিৎ শুধু সুমিত্রার বাক্য-স্রোতের শেষ অংশটা শুনলো।

—যদি সত্যিই কাল আসে এই রচনাটা, বিল্টু এক লাইনও লিখতে পারবে? অন্ধ্রের ঝড় বিষয়ে আমি নিজেই কিছু জানি না। বিল্টুদের বাংলার টিচারটা মহা পাজি...ক্লাসে কিছু পড়াবার নাম নেই, পরীক্ষার সময় শক্ত শক্ত প্রশ্ন দেবে...

মিংকা খাবার সময় মিল্স অ্যাণ্ড বুন্স উপন্যাস পড়ে, নইলে খাওয়াতে তার মনই লাগে না। বাবা মায়ের কথা কাটাকাটিতে সে কখনো অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু আজ বিল্টর পরীক্ষার প্রসঙ্গ উঠেছে বলেই সে কান খাড়া করে শুনেছে।

এবার মিংকা প্রশ্ন করলো, মা, হোয়াট ইজ সো স্পেশাল অ্যাবাউট অন্ধ্রের ঝড়? ঝড় তো সব জায়গাতেই হয়।

সুমিত্রা ঝংকার দিয়ে বললো, আমি তা কী করে জানবো। রেডিও স্টেশানে ফোন করলে ওরা বলতে পারবে? কিংবা আলিপুরে ওয়েদার অফিসে...

সুরজিৎ বললো, কয়েক বছর আগে অন্ধ্রের কোস্টাল রিজিয়ানে একটা বিরাট ডিজাস্টার হয়েছিল...দারুণ ঝড়ে সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, তিন চারতলা উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা গ্রাম, বোধহয় কয়েক হাজার মানুষ...

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুমিত্রার মুখ। পথহারা যেন পেয়েছে আলোর সন্ধান। কিংবা ধোপার হিসেবের খাতার মধ্যে যেন পাওয়া গেছে একটা একশো টাকার নোট।

—ঠিক বলেছো! এটাই তো রচনার সাবজেক্ট! সেই জন্যই গগনানন্দ অন্ধ্রের ঝড়ের কথা বলেছেন। এখন কী হবে!

সুরজিতের খাওয়া হয়ে গেছে, সে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

সুমিত্রা অনুনয় করে বললো, এই শোনো, লক্ষ্মীটি, তুমি একটা লিখে দাও, বেশ পয়েন্ট ধরে ধরে—

সুরজিৎ প্রকাণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমি লিখবো বাংলায় রচনা? আর ইউ ক্রেজি! জীবনে এক পাতা বাংলায় চিঠি লিখিনি কখনো...বেঙ্গালি আমার সেকেন্ড সাবজেক্ট ছিল, কোনোরকমে তেত্রিশ পেয়েছিলুম!

—তোমাদের বেলায় খুব সুবিধে ছিল। এখন বাঙালীদের কিছুতেই বেঙ্গালি

সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ নিতে দেয় না.... মহা ঝামেলা! বিল্টু শুধু বাংলাতেই উইক।

মিংকা বললো, হোয়াট অ্যাবাউট বিল্টুর বাংলা টিচার, মা?

—তাকে এত রাত্রে কোথায় পাবো? তা ছাড়া ছেলেটি বড্ড কামাই করে, কিচ্ছু পড়ায় না, ওকে আর রাখবো না ভাবছি।

সুরজিৎ বললো, সে ছোকরা কবিতা লেখে না? প্রথম দিন চেহারা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল.....ঐ ধরনের ছেলেরা জেনারেলি আনরিলায়েবল হয়।

—ছেলেটি এ পাড়াতেই কোথায় থাকে না, বিল্টুর খাতায় বোধহয ঠিকানা লেখা আছে। তুমি প্লীজ একটু দেখবে? ওকে ডেকে এনে যদি রচনাটা লিখিয়ে ফেলা যায়, আমি বিল্টুকে মুখস্থ করিয়ে দেবো?

সুরজিৎ ভাবলো, তার মতন নরম স্বামীদেরই বউয়েরা এরকম উৎকট অনুরোধ করার সাহস পায়। রাত সাড়ে দশটার সময় সে যাবে ছেলের প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি খুঁজতে? সে কি শ্যামবাজারে ছিট কাপড় বিক্রি করে না যাদবপুরের আলুওযালা? সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। মুস্কিল হচ্ছে এই, সুমিত্রার মতন মেয়েরা হুইস্কি বা সিগারেট খেতে শিখেছে, পার্টিতে গিযে দিব্যি ইংরেজী বলে, ডিস্কো বাজনার সঙ্গে নাচতেও জানে অন্য পুরুষের সঙ্গে, কিন্তু জ্যোতিষী কিংবা গুরু ঠাকুর ছাড়তে পারে নি এখনো। কে না কে বলেছে অশ্বের ঝড়!

সামান্য কারণে সুমিত্রা যখন দারুণ উৎকন্ঠিত হয়ে ওঠে, তখন তার মুখখানি দারুণ সুন্দর দেখায়। মুখের চামড়া যেন টস্‌টস করে। এই সময সুরজিৎ তার স্ত্রীর মনে কোনো আঘাত দিতে চায় না।

রূঢ় কিছু বলার বদলে সে অমাযিক ভাবে হেসে বললো, আমি গেলেই কি তোমার বাংলার টিচারকে এখন বাড়িতে পাবো ভাবছো! ঐ সব কবিটবিরা রাত দেড়টা-দুটোর আগে বাড়িই ফেরে না। তাও কী অবস্থায ফিরবে...কাল সকালে চেষ্টা করো।

—কাল সকালে মাত্র দু'ঘণ্টা সময়। আচ্ছা, তুমি অন্তত পঁযেন্টসগুলো বলে দিতে পারবে? কোন্‌ বছরে ঐ ঝড় হয়েছিল?

—তা তো ঠিক মনে নেই।

—কত লোক মরেছিল?

—এগজ্যাক্টিলি তা-ও বলতে পারবো না। যত দূর মনে আছে, কয়েক হাজার।

—এরকম শক্ত এসে দেবার কোনো মানে হয়, তুমি বলো?

—আসবেই যে তুমি কী করে জানছো? হযতো সব ব্যাপারটাই....

—আমি জানি, আসবেই! নইলে উনি এমনি এমনি বলবেন? ইস্‌, মিসেস সেন যদি সন্ধেবেলাতেও খবরটা দিতে পারতেন...

মিল্‌স অ্যাণ্ড বুন্‌স থেকে আবার মুখ তুলে মিংকা বললো, মাদার টেরিজাকে ফোন করো না? ডেড অর ডায়িংদের ব্যাপারে শী নোজ্‌ এভরিথিং!

সুরজিৎ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো মেয়ের দিকে। তারপর একটু কড়া গলায় বললো, হাতের এঁটো শুকিয়ে গেছে, যা ধুয়ে আয়।

মেয়ের প্রস্তাব সামান্য সংশোধন করে সুমিত্র বললো, রামকৃষ্ণ মিশন নিশ্চয়ই

জানবে। কিংবা খবরের কাগজ! স্টেটসম্যানে তোমার কে যেন চেনা আছে না?

—তুমি খবরের কাগজে ফোন করো, তারপর কালই কাগজে ছাপা হয়ে যাবে যে বিল্টুদের স্কুলে কোয়েশ্চেন আউট হয়ে যায়। তারচে ছেড়ে দাও না, বাংলায় একটু কম নম্বর পেলে কী ক্ষতি হবে? ওর বাবাই বাংলা জানে না, ও কী করে বাংলায় দিগ্‌গজ হবে!

—আমি তোমার চেয়ে অনেক ভালো বাংলা জানি।

—তুমি বাংলা নভেল পড়ো, তা হলে তুমিই লিখে ফেলো রচনাটা—

—ফ্যাক্‌টস অ্যাণ্ড ফিগারস জানতে হবে তো! তোমার কাছ থেকে তো কোনো সাহায্য পাবার উপায় নেই।

সুরজিতের আবার কান চাপা দিতে ইচ্ছে হলো।

রাত পৌনে এগারোটা, তবু সুমিত্রা নিরুদ্যম হলো না। সে একটার পর একটা টেলিফোন করে যেতে লাগলো। আর যেহেতু এখন সুরজিতের পক্ষে বিছানায় শুয়ে পড়া অপরাধ হবে, তাই সুরজিৎ বসবার ঘরে সোফায় এলিয়ে বসে পাইপ ধরালো।

যাকে নিয়ে এত ব্যাপার, সেই বিল্টু এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। বিকেলবেলা দারুণ খেলাধুলো করে বলে বিল্টু একদম রাত জাগতে পারে না। পরীক্ষার আগে মাথা ঠাণ্ডা রাখার দরকার বলে সুমিত্রাও তাকে সাড়ে আটটার মধ্যে খাইয়ে দেয়। পরীক্ষা থাক আর না থাক, ঘুমের আগে কিছুক্ষণ কমিক্‌স পড়া চাই-ই বিল্টুর।

কৈশোরের সুন্দর, মসৃণ, নির্ভেজাল ঘুম মাখা আছে তার মুখে।

কার কার কাছ থেকে যেন বেশ কিছু তথ্য যোগাড় করে ফেললো সুমিত্রা। টপটপ কাগজে লিখেও ফেললো সেগুলো।

তারপর এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে সে পা বাড়ালো বিল্টুর ঘরের দিকে।

সুরজিৎ মৃদু আপত্তির সুরে বললো, তুমি এখন বিল্টুকে পড়াবে। এত রাত্তিরে?

সুমিত্রা এমন একটা ভ্রূভঙ্গি করলো, যার ওপর আর কোনো কথা চলে না।

তাছাড়া, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তার কিছু বলারও অধিকার নেই। কেননা, অন্যান্য অনেক আদর্শ স্বামীর মতন, সে কখনো নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াবার চেষ্টাও করে নি। ডায়াসেশানে পড়া মেয়েকে সে বিয়ে করেছে তো এই জন্যই প্রায় বলতে গেলে।

সুমিত্রা খুব আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বিল্টুকে জাগালো। প্রথমে সে জেদীর মতন দু'হাত দিয়ে মাকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছিল, তারপর এক সময় চোখ মেলে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, মা?

—দুধটা খেয়ে নে তো, লক্ষ্মী সোনা।

ঘুমের ঘোরেই দুধটা খেতে খেতে বিল্টু এক সময় পরিপূর্ণ সজাগ হলো।

—শোন্ বিল্টু, কাল বাংলা পরীক্ষায় যদি অন্ধ্রের ঝড় সম্পর্কে এসে আসে, তুই কিছু লিখতে পারবি?

—অন্ধ্র কী মা?

—অন্ধ্র হচ্ছে ইণ্ডিয়ার একটা স্টেট।

—আঃ, বাংলায় বলো না! স্টেট বাংলায় কী?

—স্টেট হচ্ছে রাজ্য। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যেমন একটা স্টেট! সেই রকম অন্ধ্র হলো সাউথে।

বিল্টু ভালো ছেলে, পড়াশোনায় তার আগ্রহ আছে। সে মায়ের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগলো। অবশ্য এক একবার তার চোখ বুজে আসছে, আর মা তাকে আদর করে বলছে, আর একটু শোন, এইটাই লাস্ট পয়েন্ট, তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে, তা হলে তুমি কী করতে? স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন... দুর্গতদের সেবা।

প্রায় দেড় ঘন্টা চললো এরকম। সুরজিদেরও ধৈর্য কম নয়, সেও জেগে বসে আছে। বিল্টুর ঘর থেকে সুমিত্রা বেরিয়ে আসবার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার পিঠে হাত রেখে গাঢ় গলায় বললো, সত্যি, ইউ আর গ্রেট!

সুমিত্রা বললো, তোমার তো কোনো হুঁস নেই, আজকাল বাংলায় ফেল করলে পুরো ফেল!

পরদিন সকালে, শুধু স্নানের সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময়, এমনকি খাবার সময়েও বিল্টুকে পাখি পড়াতে লাগলো। বিল্টু একবার একটু আপত্তি করেছিল, কেননা, আজ বাংলার সঙ্গে জিওগ্রাফি পরীক্ষাও আছে, কিন্তু মা জিওগ্রাফি পড়তে দিচ্ছে না। কিন্তু জিওগ্রাফির জন্য সুমিত্রার চিন্তা নেই, ওতে বিল্টু বরাবর এইট্টি পারসেন্ট নম্বর পায়।

মধু দিয়ে টোস্ট আর এগ্‌পোচ বিল্টুকে খাওয়াতে খাওয়াতে একেবারে শেষবারের মতন সুমিত্রা মনে করিয়ে দিলো, ভুলে যাস না, ভলান্টিয়ার্স-এর বাংলা হলো স্বেচ্ছাসেবক। স-এব-ফলা আছে। আর দুর্গত...আর লঙ্গরখানা হলো যেখানে ফ্রি খাবার দেওয়া হয়—।

মহাপুরুষদের দিব্যদৃষ্টি একেবারে মিথ্যে হয না। গগনানন্দ সম্ভবত সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, তাই তাঁর দিব্যদৃষ্টি একটু অন্যদিকে সরে গিয়েছিল। বিল্টুদের রচনা এসেছে, পশ্চিমবঙ্গে বন্যা।

প্রশ্নপত্রটি পড়বার পর মায়ের ওপর খুব অভিমান হলো বিল্টুর। সমুদ্রের ঢেউ এসে বন্যা হয় কি না তা সে জানে না। ঝড় থেকে হয়? অন্ধ্রে স্বেচ্ছাসেবক থাকে, পশ্চিমবাংলায় তাদের কী বলে? মা কেন এসব বলে দেয়নি?

একটু দূরে বসা অমিতাভর সঙ্গে চোখাচোখি হলো বিল্টুর। দুজনের চোখে একই রকম ভাষা।

দুই অভিমানী কিশোর মুখ গোঁজ করে বসে রইলো খাতার সামনে। □